অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ॥ কলকাতা-৭৩

Achintya Kumar Rachanavali (Vol. 2)
Achintya Kumar Sengupta
(Chronological Collected Writings)

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯

উপদেষ্টামণ্ডলী :
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
যোগজীবন চক্রবর্তী,
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মুদ্রক :
শুকদেবচন্দ্র চন্দ
বিবেকানন্দ প্রেস,
১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
রূপায়ণ, কলকাতা-৬

আলোকচিত্র :
অজিত দত্ত

সূচীপত্র

উ
প
ন্যা
স

আ ক স্মি ক

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

করকমলেষু

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২১. ৫. ৩০

★

এই উপন্যাসখানি নামান্তরে প্রগতি-তে ১৩৩৫-৩৬ সালে প্রকাশিত হ'য়েছিল। পরে দেখা যায় 'আকস্মিক' নামই সার্থকতর।

অ. কু. সে.

নদীটি ঐখান হইতে বাঁকিয়া একেবারে অস্পষ্ট, অদৃশ্য হইয়া গেছে। এ-দিকটায় অবিশ্রান্ত মাথা খুঁড়িয়া চুল ছিঁড়িয়া একেবারে হয়রান্ হইয়া যেন ঐ বহুদূরে বসিয়া জিরাইয়া লইতেছে,—চাহিয়া থাকিলে তাহাই মনে হয়! শুধু শুভ্র একটি জলরেখা একটি সস্নেহ ইসারার মত চোখ মেলিয়া থাকে।

পার ধরিয়া বরাবর পাটের ক্ষেত ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া রহিয়াছে। সেই ক্ষেতের মধ্য দিয়া সরু পথ, কোথাও পথের উপর বিশ্রী কাদা জমিয়া আছে, কোথাও ফণী-মনসার ঝোপ,—সব উত্তীর্ণ হইয়া তবে নদীর কিনারে আসিয়া হাটুরে নৌকা ধরিতে হয়। ছেলেমেয়েগুলি ক্ষেতের মধ্যে ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলিতে-খেলিতে আগাইয়া চলে।

ভোর বেলাই সেদিন বর্ষা নামিয়াছে। নদীর পারে আসিয়া নৌকা ডাকিতে যাইবে, এমন সময় অদূরে কি একটা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বেহারি তাহার মাথার মাটির কলসের ঝাঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া অগ্রসর হইল। বেশি দূর যাইতে হইল না, চেঁচাইয়া উঠিল, -রজনী, রজনী!

রজনী তাহার তরিতরকারির ঝাঁকা লইয়াই ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—আরে, এ যে গিরি-গয়লানি!

যাহারা পসরা নিয়া পরপারের লাভের আশায় আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারা সবাই ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিল।

বেহারি ফের চেঁচাইয়া উঠিল,- ওরে, এখানে যে একটা ছেলে পড়ে' আছে।

শশী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল,—এখনো মরে নি। তোরা যা কর্‌বার কর্, আমি চল্‌লাম বাড়ি। বলিয়াই সদ্যপ্রসূত মৃতপ্রায় শিশুটিকে কাপড়ের মধ্যে বুকের তলায় লইয়া উবু হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্ দিল।

শশীর বৌ নিস্তারিনী উঠানে বসিয়া বৃষ্টির মধ্যেই গত রাত্রের এঁটো বাসনগুলি মাজিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—দেখি, দেখি, কোথায় পেলে,—কার গো? বেঁচে আছে?

তাড়াতাড়ি শিশুটিকে কোলে লইয়া এঁটো হাতেই উহার গাল টিপিয়া দিল, বুকের কাছে কান নিয়া নিশ্বাস শুনিবার চেষ্টা করিল,—সমস্ত গা বিবর্ণ হইয়া গেছে। স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—শিগ্‌গির আগুন কর খানিক।

পরে শূন্যে নিরুপায় ও নিরুৎসাহ দৃষ্টি মেলিয়া নিস্তারিনী বলিয়া উঠিল,—রাখ হরি!

হরি রাখিলেন।

এ-দিকে নদীর পারে ভিড় খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছে। বেহারি মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল,—যখনই করতাল নিয়ে মাগী গেরুয়া এঁটে কুলের বা'র হ'য়ে এলেন, তখন এম্‌নি ধারা কেলেঙ্কারি একটা ঘটবেই, বহুবার বলেছি আমি। বলি নি পঞ্চু ?

পঞ্চু একটা যাত্রার আখ্‌ড়া খুলিয়া বেশ দু'পয়সা হাতাইতেছে আজকাল। চেহারাটি আগাগোড়া ইস্ত্রি-করা, পকেটে গাঁজার কল্‌কে, কানের পিঠে বিড়ি গোঁজা, গলায় একটা রুমাল বাঁধা,—চোখ দুইটা যেন সহজে চোখে পড়িতে চাহে না, একেবারে ডুবিয়াছে। কথা বেশি কয় না, যা কয় গান বাঁধিয়াই সারে। লম্বা ঠ্যাং দুইটা দুই পাশে দুলাইতে-দুলাইতে গাহিয়া উঠিল :

তালে-তালে পা' ফেলি' দিত শুধু করতালি,
গেরুয়া গায়েতে টেনে হইল উধাও।
আর নাহি করতাল, না'-এ তুলে' দাও পাল,
লগি ছেড়ে অতলেতে এবার উজাও॥

রজনী গিরির মৃত্যু-ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ভেঙচাইয়া বলিয়া উঠিল,—কি কীর্ত্তিই করলেন!

পঞ্চু ফের গাহিয়া উঠিল :

এসেছিল কীর্ত্তিনাশা সকল কীর্ত্তি নাশে গো
তারে দেখেই হাসে মাটি, তারেই ভালোবাসে গো।

জগু ধমক দিয়া উঠিল—থাম্‌, পঞ্চু।

পঞ্চু দেখিল, কি নিদারুণ অসহ্য যন্ত্রণায় গিরির মুখ একেবারে বিকৃত হইয়া গেছে, বুকের পাঁজরাগুলির দিকে চাহিয়া মনে হয় যেন বহুদিন খাইতে পায় নাই, পা দুইটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেছে, যেন কোন্ কাঁটা-জঙ্গলে আশ্রয় লইতে গিয়াছিল, পরে নদীর ডাক শুনিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল বুঝি,—আর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে নাই,—সাহসেই কুলায় নাই হয় ত'। কিম্বা, এই মাটির কাছেই হয় ত' উহার একটি ঋণ ছিল, তাহা শোধ করিয়া গেছে।

বেহারি একবার তাহার পা দিয়া গিরির মাথাটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—না, নেই—

রজনী কহিল,—কি হবে ওর ?

বেহারি কহিল,—কে ওকে ছোঁবে ? দে বেটিকে নদীতে ফেলে'। বলিয়া পা দিয়া জোরে একটা ঠেলা মারিয়া গিরির মৃতদেহটা আগাইয়া দিল। সকলেই

একটা দুইটা করিয়া লাথি মারিয়া সাহায্য করিল, তার পরে নদীই কোলে করিয়া লইল।

পঞ্চু গাহিয়া উঠিল :

মেঘের মত-কালো কেশে
নদীতে যাও লো ভেসে,—
মেঘের মত কালো কেশে—

কাহারও আর হাটে যাওয়া হইল না;—গলায় কণ্ঠি ঝুলাইয়া. দাঁতে মিশ দিয়া, কপালে রসকলি আঁকিয়া, খোঁপায় জুঁইফুল গুঁজিয়া ও হাতে তানপুরা নিয়া যে সব বৈষ্ণবী বাউরি হয় তাহাদের চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক নয় এই সম্বন্ধেই গবেষণা চলিতে লাগিল। বৃষ্টির দিনটা কাটিল ভালো। তবু খালি এ ওর মুখ-চাওয়াচায়ি করে।

পঞ্চু আসিয়া হাঁকিল,—শশী! ছেলেটা আছে?

বেহারি চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল,—বলিস্ কি? আছে? কেন বাপু ঝঞ্ঝাট্, একসঙ্গে নদীতে ফেলে' দিলেই ত' চুকে' যেত—

শশী বলিল,—তা কি হয় বেহারি? ছেলেটা যে জ্যান্ত—

বেহারি মুখব্যাদান করিয়া বলিল,—তুই ওকে পাল্‌বি নাকি? মরাই যার উচিত, একটা অজাত ছেলে,—নোংরা—

ঘরের ভিতর হইতে মুখ ঝামটা দিয়া নিস্তারিনী বলিয়া উঠিল,—নিজের ছেলেপিলেদের দিকে চেয়ে যেন এ সব কথা বলা হয়—

সবাই রাগ করিয়া চলিয়া আসিল। সন্ধ্যা না হইতেই শশীর নামে গ্রামে একটা ভীষণ দুর্নাম রটিয়া গেল।

বিকালের দিকে পঞ্চু আসিয়া শশীর দোর-গোড়ায় দাঁড়াইয়া ঠ্যাং দুলাইতে-দুলাইতে গাহিয়া উঠিল :

চন্দ্রেতে যেটুকু দাগ, তারি তরে অনুরাগ,
তোমার চোখের মণি কালো, তাই তোমারে বাসি ভালো;
তাই তোমারে ভালোবাসি
যে-ফুলটি হয়েছে বাসি॥

গান থামাইয়া ডাকিল,—ওরে শশী, বৌকে বল্ একটু আগুন দিতে, এক ছিলিম সেজে ফেলি,—আর বল্, ছেলেটাকে যেন জিইয়ে রাখে, আমার দলের সখী হবে। সখী রে—

সুর পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠে।

প্রার্থনা করিবার কেহই ছিল না বলিয়া নিস্তারিনী আর রহিল না। দুই বার ভেদ বমি হইল মাত্র, তারপর শরীরটাকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া গোটা তিন মোচড় দিল, মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল, মুখের মধ্য হইতে জিভটা বাহির হইয়া আসিয়া দাঁতের কাছে আটকাইয়া রহিল।

রাখহরি তখন বেশ ডাগর হইয়াছে,—ছয় বছরের।

পঞ্চু আসিয়া কহিল,—খাসা মেয়ে শশী,—ছয়ছোট্ট, তাজা তিল-ফুলটির মত। আমার মাসতুত বোনের পিস্তুত ননদ, তুই একটি বার শুধু দেখে আয়। বলিয়াই গান ধরিল :

ছুরির মত চাউনি চোখের ওলো ছুঁড়ি ঠাকুর-ঝি,
তোরে আমি দেখেই ভুলেছি।

শশী কনে দেখিয়া হাঁ-করা মুখ আর বুজাইতে চাহে না। পরে গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলে,—আমার আর কি, হাঁড়ি-কলস নিয়েই থাকি,—অসুবিধে যত রাখ-র। ভারি ন্যাওটা ছিল।

সমস্ত দেহে যৌবনের জোয়ার নিয়া দামিনী আসিল, আসিয়াই মাথার ঘোম্‌টা ফেলিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া সংসারে মাতিয়া উঠিল। বলিল,—কি ছিরি ঘর-দোরের, এমন জায়গা থেকে যমও ভাগে। লোকটার চোখে কি ছানি পড়েছে?

নূতন করিয়া উনুন পাতে, উঠান ঝাঁটাইয়া একেবারে তক্‌তকে করিয়া তোলে, পিঁড়ে লেপিতে বসিয়া সমস্ত হাত-পা কাদায় মাখামাখি হইয়া উঠে। নিজের মনে বলে,—কোথা থেকে কোথায়—

রাখ ছুটিয়া আসিয়া মা বলিয়া দামিনীকে জড়াইতে যায়, দামিনী লাফাইয়া উঠিয়া দূর-দূর করিয়া উঠে। শশীকে লক্ষ্য করিয়া বলে,—আমার বাড়িতে এই সব অনাছিষ্টি কাণ্ড চল্‌বে না বল্‌ছি। ঐ বেজন্মা ছেলেটাকে বা'র করে দাও।

রাখ তাহার আলিঙ্গনোদ্যত হাত দুইটি ধীরে-ধীরে গুটাইয়া আনে। শশী বলে,—তা কি হয়?

দামিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠে,— না হয়, ত' রইল তোমার এই ঘর-দোর, আমি কি ঐ বেজন্মার ছোঁয়া সইব নাকি? বলিয়া হাতের গোবরের গাম্‌লাটা ছুঁড়িয়া ফেলে।

শশী হাঁ- হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল,—তার ব্যবস্থা একটা হবে'খন। যাবার দরকার নেই।

দামিনী ফের কাজে মন দেয়, বলে,—বেশ ডাগর ত' হয়েছে, চা-বাগানের কুলি করে' দাও না—

শশী বলে,—দেখা যাক্।

দামিনী উঠানেই রাখ-কে একটা কলাপাতা করিয়া ভাত ধরিয়া দেয়, পোষা কুকুরটাকে পাশে লইয়া রাখ তাহাই দু'মুঠা খাইয়া উঠে। সমস্ত দিন কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায় কেহই খবর রাখে না; সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আবার ফিরিয়া আসে, কলাপাতা হাতে নিয়া উঠানে তীর্থকাকের মত বসিয়া থাকে, কুকুরটা পাশে ঘুমায়। কোনদিন খাওয়া পায়, কোনদিন বা লাকড়ির বাড়ি—দাওয়ায় কাঁথা জড়াইয়া কুকুরটাকে পাশে লইয়াই শোয় আর মা'র কথা ভাবিয়া ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদে।

পঞ্চু প্রায়ই আসে। রান্নাঘরের উদ্দেশে হাঁকে—কি রাঁধ্‌ছ ঠাকুর-ঝি, দাও না চাট্টি খাই। ঘরে ঢুকিয়াই একটা থালা লইয়া বসে। যা রান্না হইয়াছে তাহাই খানিকটা দামিনী ঢালিয়া দিয়া বলে,—তরকারিটাতে নুন দিয়েছি কিনা দেখ ত'।

খাইতে-খাইতে পঞ্চু গাহিয়া উঠে:

কি রান্নাই রেঁধেছ বধূ,
তোমার অন্নে মধু, অঙ্গে মধু—

বলিয়াই দামিনীর আঁচল ধরিয়া বলে,—ওটুকু আর নিয়ে যাচ্ছ কেন, ঢেলেই দাও।

দামিনী বলে,—ছাড়, দিচ্ছি।

পঞ্চু ফের গাহিয়া উঠে:

তুমি হ'য়ো চন্দ্রবদন, আমি হ'ব মুখের আঁচল,
তুমি হ'য়ো নয়ন-মণি, আমি হ'ব কালো কাজল।

দামিনী ঠোঁটের কোণে উদ্গত হাসিটি চাপিয়া রাখিয়া গলা ভারি করিয়া বলিল,—আচ্ছা পঞ্চু-দা, গিরি-বোষ্টমির সঙ্গে তোমার বন্ধুর যে অপবাদ রটেছে, সে কি সত্যি? তবে হতচ্ছাড়া ছেলেটাকে তাড়ায় না কেন?

পঞ্চু গানেতেই উত্তর দেয় :

যদি শোন অপবাদ, দিয়ো তার সকলি বাদ,
আমি গলায় পরেছি যে গো কলঙ্কেরি অলঙ্কার—
নেই ক' আমার বসন-ভূষণ, তাই ত' পরের মিথ্যা-ভাষণ—

গান শেষ না হইতেই দামিনী ঠোঁট ফুলাইয়া বলে,—না, ঠাট্টা নয়, পঞ্চু-দা। আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করবই।—বলিয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া তোলে। জলন্ত উনুনের মধ্যে অনবরত কাঠের খোঁচা মারিয়া রুদ্ধ ক্রোধটা নিবৃত্ত করিতে চায়।

এক-এক দিন শশী আসিয়া পড়ে। দামিনী সন্ত্রস্ত হইয়া মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া দেয়, পঞ্চু শুক্‌নো তোব্‌ড়ানো মুখের উপর তাহার স্বাভাবিক হাসি বিকশিত করিয়া গাহিয়া উঠে :

কেন হেন অবগুণ্ঠন,
পিপাসী ভ্রমর চাহে মুখ-মধু-লুণ্ঠন—

কীর্ত্তনের করুণ সুর শুনিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত দামিনীর মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

শশী কঠিন হইয়া পঞ্চুকে বলে,—তুই রোজ সকালবেলার খাওয়াটা এখানেই সেরে নিবি নাকি ?

যে-গোগ্রাসটা মুখের কাছে তুলিয়াছিল, তাহা অর্ধপথে শূন্যে থামিয়া রহিল,—পঞ্চু তবু হাসিয়াই কহিল,—তোর বৌকে বল্। কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়ে না। দামিনীকে বলি, - তোর সঙ্গে দু'টো কথা কয়ে'ই পেট ভরে আমার ; তোর বৌ বলে,—আমার ভরে না তাতে, চাট্টি খাও। আর, সত্যিই শশী, তোর এই রান্না-ঘরটিতে এসে ঢুক্‌লেই উপোসি পেট্‌টা চন্‌চন করে' ওঠে। সেই দুক্কুর কাঠ-ফাটা রোদে তিন-কোশ পায়ে হেটে নিজে দু'টো ফুটিয়ে নিতে হবে না ভেবে ভারি আয়েস লাগে। দুপুর বেলাটা নদীর পারে বটগাছটার তলায় শুয়ে' তোফা এক ঘুম দিই—

কথা শেষ না হইতেই আবার গিলিতে আরম্ভ করে।

শশীর সমস্ত শরীর একেবারে রি-রি করিয়া উঠে। ইচ্ছা করে, পঞ্চুর হাড়গিলের মত সরু গলাটা ক্যাঁক্ করিয়া টিপিয়া ধরিয়া একেবারে চ্যাপটা করিয়া দেয়। রুক্ষ স্বরে বলে,—তার জন্যেই বুঝি নিজের গাঁয়ের মেয়ে এনে তাকে দিয়ে দানছত্র খুলিয়েছিস্। এ সব এখানে চল্‌বে না, পঞ্চু।

বলিয়াই শশী সামনের খাইবার জলের গ্লাশটা পা দিয়া লাথি মারিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ঘরের ভিতর হইতে দামিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—কেন চলবে না শুনি ? সাত

শো বার চল্‌বে। আমার ভাতের ভাগ আমি যাকে খুসি তার মুখের কাছে তুলে ধর্‌ব। তোমার কি?

শশী ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দামিনীর ঘোম্‌টা খসিয়া গিয়া কতকগুলি কালো চুলের গুচ্ছ কাঁধ বাহিয়া বুকে আসিয়া সাপের ফনার মত লুটাইয়া পড়িয়াছে, অনাবৃত দৃপ্ত মুখ রাগে একেবারে রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে, যেন এখুনিই হাতের থালাটা শশীকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিবে।

শশী তেমনি দাঁড়াইয়াই রহিল, কি বলিবে কিছুই ঠাহর করিতে পারিতেছে না যেন। দামিনী হঠাৎ নীচু হইয়া পঞ্চুর পাতে ভাত ঢালিয়া দিতে-দিতে জোরে বলিতে লাগিল,—তুমি খবরদার উঠো না, পঞ্চু-দা—আমার মাথা খাও, তোমাকে আজ পেট ভরে'ই খেয়ে যেতে হবে। দেখি ওর কি সাধ্যি, আমার গাঁয়ের লোককে অপমান করে। মাইরি, উঠো না বল্‌ছি।

দামিনীর আলুলায়িত চুল প্রায় পঞ্চুর পাতে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আনমিত, আয়ত দুইটি চোখের পানে চাহিয়া পঞ্চুর আর পলক পড়িতেছে না। বুকের মধ্যে গানের কলি তোলপাড করিয়া উঠিতেছে বুঝি। কিন্তু হাত গুটাইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

শশী উপরের দাঁতগুলি দিয়া নীচের দাঁতগুলি একবার খুব জোরে ঘষিয়া লইয়া বলিল,—এবারে যাও, নিকুঞ্জ-যাত্রা-পার্টির সখী সাজ গে!

বলিয়াই নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

পঞ্চু ভাতের থালা সরাইয়া রাখিয়া বিরসমুখে কহিল, আমি এবার উঠি, দামিনী। গলা দিয়ে ভাত আর যাচ্ছে না—

বলিয়া দামিনীর মুখের দিকে চাহিল। সে-মুখে আর সেই উজ্জ্বলতা নাই, অভিমানে সেই মুখখানি যেন অতিশয় কোমল ও করুণ হইয়া আসিয়াছে। দুইটি চোখে একটি নীরব বেদনার অস্পষ্ট ধূসরতা ধীরে-ধীরে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চু পিঁড়ি হইতে উঠিয়া কহিল,—আমি যাই, দামিনী।

দামিনী প্রথমে কোন কথা কহিল না, ধীরে-ধীরে মাথার উপরে ঘোম্‌টাটা একটু তুলিয়া দিল শুধু। পঞ্চু আবার কহিল,—সোয়ামির সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করতে নেই।

দামিনী গাঢ়স্বরে উত্তর দিল,-তবে কেন ও তোমাকে এম্‌নি খামোকা অপমান কর্‌বে?

পঞ্চু কহিল,—করুক্‌। তবু আমি তোর কেউ নই।

দামিনী ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল,—না, কেউ নও! এ-রকম সোয়ামির মুখে

আগুন। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। তুমি বেছে-বেছে আমার ভালো বর-ই জুটিয়ে দিয়েছিলে, পঞ্চু-দা। যম-ও ছিল ভালো। বলিয়াই. দামিনী ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পঞ্চুকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া দামিনী তৎক্ষণাৎ চোখের জল মুছিয়া দরজার চৌকাঠ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু কবে আস্‌বে আবার শুনি?

পঞ্চু যাইতে-যাইতে বলিল,—আর আস্‌ব না।

দামিনী উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—শোন গো, শোন, পঞ্চু-দা। আমার মাথার কিরে, একটা কথা শুনে যাও, লক্ষ্মী।

পঞ্চু ফিরিল। কহিল,—কি?

দামিনী একটু হাসিয়া কহিল,—না হয় রাগ করে' গরিবদের ঘরে আর ভাত খাবে না। কিন্তু তোমাকে তো আর ঠ্যাঙা দিয়ে তাড়া করে' বাড়ির বা'র করে' দিই নি। তুমি এস কিন্তু। তোমার কাছে আমি গান শিখব।

পঞ্চু কৌতুক বোধ করিয়া তাহার কোটরস্থ চক্ষু দুইটা ঠেলিয়া তুলিয়া কহিল, —বলিস্‌ কি?

—হ্যাঁ,—মাইরি গান শিখব। গান শেখা হ'লে সখী হ'য়ে তোমার দলে গিয়ে ভর্তি হ'ব। নেবে ত' আমাকে?

পঞ্চু সেই কথা কানে না তুলিয়া কহিল,—ঐ ছাখ্‌, তোর ছেলে উঠোনে পাত পেতে বসে' আছে। ওকে ভাত দে।

বলিয়াই তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া একটা সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাখ সেই কখন হইতে পাশে তাহার বুড়া কুকুরটাকে লইয়া পাত বিছাইয়া বসিয়া আছে, কাহারও ঠাহর নাই। বাড়ির সাম্‌নের পচা ডোবায় কয়েকটা ডুব দিয়া কুকুরটাকে স্নান করাইয়া, নিজের পরনের ছোট্ট কাপড়টুকু দিয়াই দু'জনের গা মুছিয়া, পথের পারের একটা কলাগাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়াছে,—মুখে একটিও রা নাই। শুধু কুকুরটা মাঝে-মাঝে চঞ্চল হইয়া লেজ নাড়িতেছে ও জিভ বাহির করিয়া ক্ষুধায় হাঁপাইতেছে। দুইটি ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর ভীত নির্ব্বাক দৃষ্টিতে একটি করুণ মিনতি মাখানো।

রৌদ্র রান্নাঘরের চাল ডিঙাইয়া রাখ-র পাতের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছে।

রাখ এইবার মুখ ফুটিয়া কহিল,—ভাত দিবি নে, মা? সেই কখন থেকে বসে' আছি।

দামিনীর তাহাতে হুঁস্ নাই। পঞ্চু চলিয়া গেলে কতক্ষণ বিমর্ষ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, পরে বসিয়া-বসিয়া এঁটো মাজিল, রান্নাঘর সাফ্ করিল ও রাখ-র প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া একখানা শস্তা লাল সাবান লইয়া ঘাটে স্নান করিতে গেল।

মা-কে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া রাখ নির্ভয়ে অথচ নিঃশব্দে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। কুকুরটাও প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া রাখ-র পদানুসরণ করিল।

ভিন্-গাঁয়ের হাট হইতে শশী যখন ফিরিয়া আসিল, বেলা তখন গড়াইয়া পড়িয়াছে। রোজ এম্‌নিই দেরি হয়, বাড়ি ফিরিয়া কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গোটা দুই ডুব দিয়া, ভিজা গা ভালো করিয়া না মুছিয়াই ঢাকা-দেওয়া শুক্‌নো ভাত গিলিতে বসে। দামিনী দাওয়ায় পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমায়।

সেই দিন-ও দামিনী গা ঢাকিয়া দিয়া ঘুমাইয়া লইতেছিল বটে, কিন্তু উঠানের দিকে চক্ষু পড়িতেই শশী একেবারে থামিয়া গেল। উঠানের উত্তর দিকে যে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল তাহার সঙ্গে রাখ-কে কে আঁটিয়া-আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। দড়ি জোটে নাই বলিয়া রাখ-র কোমরের কাপড়টুকু পাকাইয়া লইয়া গলা হইতে সুরু করিয়া গোড়ালি পর্য্যন্ত টানিয়া-টানিয়া একেবারে চ্যাপ্‌টা করিয়া দিয়াছে। রৌদ্রে রাখ-র সমস্ত মুখ একেবারে ভাজা-ভাজা হইয়া উঠিয়াছে, গাছের গোড়া হইতে কতগুলি পিঁপ্‌ড়ে উঠিয়া কাম্‌ড়াইয়া কামড়াইয়া উহার পা দুইটার কিছুই রাখে নাই। তাহাই নয়, কে যেন একটা কঞ্চি দিয়া বাড়ি মারিয়া উহার সমস্ত দেহ ফুলাইয়া দিয়াছে। খালি অসহায় কুকুরটার আর্ত্তনাদের বিরাম নাই, উঠানটা চষিয়া ফিরিতেছে; আর রাখ উহার ধারালো দাঁত দিয়া কাপড়টা টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে।

শশী ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—কে করেছে এ?

রাখ শুধু বলিল,—মা।

—কেন?

—ভাত চেয়েছিলাম, তাই—

শশী নিজে চেষ্টা করিয়া কাপড়ের শক্ত গেরো খুলিতে না পারিয়া একখানি দা আনিয়া রাখ-র বাঁধন কাটিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ এক লাফে দাওয়ায় উঠিয়া দামিনীর চুলগুলি মুঠার মধ্যে লইয়া প্রচণ্ড বেগে টানিয়া উহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া, চেঁচাইয়া উঠিল,—ছেলেটার এ কি করেছিস্ হারামজাদি?

ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে দামিনীর দেরি হইল না। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল,—শুধু কতগুলি কোমল কালো চুল শশীর মুঠোর মধ্যে রহিয়া গেল। মুখঝামটা দিয়া বলিয়া উঠিল,—খবরদার গায়ে হাত তুলো না বলছি,—সোয়ামিগিরি বা'র করে' দেব। ঐ বেজন্মা চাঁড়ালটা কেন কুকুর নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছিল,—বেশ করেছি! ওর মুণ্ডু আমি চিবিয়ে খাব।

বলিয়া দামিনী পার্শ্বস্থিত দা খানা রাখ-র উদ্দেশেই ছুড়িয়া মারিল হয় ত'। রাখ তখন আপনাকে ঢাকিবার চেষ্টায় উবু হইয়া বসিয়া কুকুরটাকে একটু আদর করিতেছে। ধারালো দা কুকুরটার পিঠের উপর আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

একে ভোরবেলা হইতে শশীর মেজাজ তিরিক্ষি হইয়া আছে, তাহার উপর ক্ষুধার জ্বালায় বুদ্ধিও বিশেষ ভালো খেলিতেছিল না, দিশাহারা হইয়া দামিনীর পেটের উপর ধাঁই-ধাঁই করিয়া কতগুলি লাথি বসাইয়া দিল। কহিল,—তুই বড্ড বার বেড়েছিস, মাগী। তুই যাত্রা-দলের সখী হবি, গান শিখ্‌বি—আমি সব শুনেছি লুকিয়ে-লুকিয়ে—

দামিনী হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া চেঁচাইয়া চুল ছিঁড়িয়া মাথা খুঁড়িয়া মুখ-খারাপ করিয়া কেলেঙ্কারির আর কিছুই বাকি রাখিল না। বলিল—হ'ব-ই ত' যাত্রাদলের সখী, তোর কি,—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বেরিয়ে।

—যা না।—শশী আর একটা লাথি দেখাইল।

দামিনী হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙিয়া জিনিসপত্র ছত্রখান্ করিয়া, ঘরের মধ্যে একহাঁটু আবর্জ্জনা জড়ো করিয়া গাল-মন্দ করিতে করিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু ডোবার ওপারে পৃথিবীর বিপুলতা নির্ধারণ করিতে না পারিয়াই ডোবার ধারে বসিয়া পড়িল। ইহার পরে ও যেন পথ আর চিনে না। ভাবিল, ডোবায় ডুবিয়া মরিলেই বা কি ক্ষতি? ধীরে-ধীরে পা দুইখানি নামাইয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিল। কিন্তু ঘোলাটে জলের মধ্যে হঠাৎ নিজের নিটোল পরিপূর্ণ যৌবনের প্রতিবিম্ব দেখিয়া দামিনীর আর মরিতে ইচ্ছা হইল না। পা দুইটি টানিয়া তুলিয়া গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া নিজের মনেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

আবার, অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার মত কালো রাত্রি নিবিড় হইয়া নামিয়াছে। রৌদ্রের প্রখরতায় যে গ্লানি ও অভিমান থাকে, তাহা অন্ধকারে গলিয়া-গলিয়া যেন একটি শান্ত ক্ষমায় শীতল হইয়া উঠে।

দামিনী কোথায় ও কোন্‌দিকে বাহির হইয়া গেল, শশী একবার পিছন

ফিরিয়া দেখিয়া লইবার মত-ও প্রয়োজন বোধ করিল না। রাখ-কে সঙ্গে লইয়া বাজারে আসিয়া মুড়ি ও ফেনি-বাতাসা কিনিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে চিবাইয়া-চিবাইয়া খাইয়া প্রায় এক ঘটি জল গিলিয়া পেট ফুলাইয়া লইল। বাড়ি ফিরিয়া রাখ-কে পাশে লইয়া দামিনীর পরিত্যক্ত মাদুরের উপরেই বেশ সহজেই চিৎ হইয়া নাক ডাকাইতে লাগিল।

যাইবার সময় কুকুরটাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া রাখ-র দুঃখের যেন আর শেষ ছিল না। কুকুরকে খাইতে দিবার মত পয়সা নিশ্চয়ই শশীর নাই, রাখ তাহা বুঝিত। তাই নিজের ভাগ হইতে দুইখানা বাতাসা লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এখন কুকুরটাকে পাশে শোয়াইয়া রাখ সেই বাতাসা দুইখানা উহাকে খাওয়াইয়া দিতেছে ও খাইতে-খাইতে কুকুরটার দাঁতের ফাঁক দিয়া যে-শব্দ হইতেছে তাহাই তৃপ্তহৃদয়ে সম্ভোগ করিতেছে। আর, যেখানটা দা-র বাড়ি খাইয়া কাটিয়া গিয়াছে সেই জায়গায় ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতেছে।

সন্ধ্যাবেলাই শশী শুইয়াছে, অথচ চোখ দুইটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়াও ঘুমকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। খুট্‌ করিয়া একটু শব্দ হইতেই শশী সজাগ হইয়া উঠিল,-- ঘরে দামিনী! দামিনী মাটির উপর অনাবৃত বুকটা পাতিয়া সুগোল বাহুর উপর মাথা রাখিয়া উবু হইয়া পিঠটা উদ্‌লা করিয়া শুইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে শশীর বুকে নিরুদ্ধ কামনা কোটি-কোটি ফণা মেলিয়া দংশন করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, দিনে যাহাকে পদাঘাত করিয়াছে, রাত্রে তাহাকে উপবাসী বুকটার মধ্যে টানিয়া লইয়া নিবিড় নিদারুণ নিপীড়নে নিষ্পেষিত করিয়া একেবারে নিংড়াইয়া লয়। কিন্তু শশীর সাহসে কুলাইল না, অচরিতার্থ বাসনা লইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াও দামিনী আবার অন্ধকারে তাহারই কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, উঠিয়া সহজেই তাহাকে বাহুর মধ্যে টানিয়া লওয়া যায়—ভাবিতে শশীর সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠিল। নিজের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে দামিনীর নিশ্বাসপতনের লঘু শব্দ শুনিতে-শুনিতে তন্ময় হইয়া গেল। সমস্ত গা ঘামে ভিজিয়া উঠিল, অথচ তক্তপোষটা হইতে নীচে নামিবার মত্‌ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিল না।

রাত্রি বোধ হয় তখন বেশ পাকিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ গাঁয়ের পথে কাহার উচাটন গলার উদাস গান শোনা গেল—

শশী কান খাড়া করিয়া রহিল। দেখিল, দামিনী হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া দরজা ঠেলিয়া একেবারে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দামিনী যেন ঠাণ্ডা মাটির উপর বুকটা চাপিয়া ধরিয়া শুধু ঐ গানটুকু শুনিবার জন্যই এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল; কাপড়চোপড় না গুছাইয়া লইয়া ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল, যেন কে উহাকে একেবারে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে!

দামিনী ডাকিল,—পঞ্চু-দা, ও পঞ্চু-দা, শোন একটিবার—

পঞ্চু ফিরিল। প্রায় দুই হাঁড়ি তাড়ি গিলিয়া ঠিক পথ সামলাইয়া চলিতে পারিতেছে না, পিছন হইতে দামিনীর ডাক শুনিয়া নিমেষে নেশা ছুটিয়া গেল। আগাইয়া আসিয়া কহিল,—কে লো,—দামু?

দামিনী কহিল,—এত রাতে কোথায় ছিলে, কোত্থেকে আস্‌ছ? নেশা করেছ বুঝি? চোক দু'টো অমন রাঙা কেন?

পঞ্চু হাসিয়া উঠিয়া গান ধরিল:

ওরে, কালো চোখের মদ খেয়েছি, হয়েছি উন্মন,
আর মদ খেয়েছি আমার বধুর পর্‌থম্ যৌবন।

দামিনী কহিল,—তুমি মুখে-মুখে এত গান কি করে' বাঁধ, পঞ্চু-দা?

পঞ্চু বলিল,—সবই কি আর মুখে বাঁধি, কত গান মুখস্ত থাকে! এই ত' মজুমদার পাড়ায় গেছ্‌লাম, কের্ত্তনের মুজ্‌রো ছিল। তুই এখনো ঘুমুস্ নি যে? শশী কোথায়?

দামিনী মিথ্যা কথা কহিল। কহিল,—সন্ধ্যেবেলা কোথায় যে গেছে, জানি না। ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে।

দামিনী অনেক কিছুই আশা করিয়া এই মিথ্যাকথাটি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এই সুখবর পাইয়াও এই নির্জ্জন রাত্রে পঞ্চুর ঈষৎ চাঞ্চল্য হইল না লক্ষ্য করিয়া দামিনীর সমস্ত শরীর নিমেষে কাঠ হইয়া উঠিল। তবু কহিল,—পান খাবে, পঞ্চু-দা?

পঞ্চু গাহিয়া উঠিল।

শুধু পানে কি হয় যদি না দাও পর

এই লোকটা যেন কি রকম, সময়ে-অসময়ে খালি গান গাওয়া ছাড়া দুনিয়ায় যেন কিছুই করিবার নাই। দামিনী হঠাৎ অস্থির হইয়া উঠিল,—আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল, পঞ্চু-দা।

ঘরের মধ্যে শশী উপরের পাঁটির দাঁত দিয়া নীচের পাঁটিটা চিবাইয়া, বালিশের কোণ্‌টা মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া দম বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পঞ্চু কহিল,—কোথায় যাবি আমার সঙ্গে? যাত্রাদলের সখী হ'বি নাকি?

দামিনী কণ্ঠস্বরে অপার কাকুতি নিয়া কহিল,—তোমার ঘরে একটা লোক নেই যে তোমাকে দু'বেলা দু'টো ফুটিয়ে দেয়,—তোমার চেহারা দিন-কে দিন কি রকম কাহিল, কদাকার হ'য়ে যাচ্ছে। আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল—

ইহাতেও যেন একটুও বিস্মিত হইবার নাই,—পঞ্চু স্বচ্ছন্দে গান ধরিল :

ওলো সখি, আমার সনে কোথায় যাবি শুনি,
খাই শুধু বাসি ভাত, আলু ও আলুনি।

দামিনী পঞ্চুর শির-ওঠা লম্বা হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। আমাকে নিয়ে চল।

পঞ্চু হাত ছাড়াইয়া লইল না, গান ধরিল :

পায়ের গুঞ্জরি হইয়া পায়েতে থাকিব,
সোনার মালিকা হইয়া বুকেতে দুলিব।

দামিনী এইবার একেবারে পঞ্চুর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কহিল,—তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। এখানে থাকলে আমি মরে' যাব। মাইরি মরে' যাব, পঞ্চু দা।

পঞ্চু শুধু কহিল,—আমার আজ মাথার ঠিক নেই, দামিনী। ভারি নেশা করেছি, কাল ভোরে আবার আসব। গান শেখাব। বলিয়াই গান ধরিল :

যৌবন আইল দেহে জোয়ারের জল রে,
আমার চোখের জলে পদ্ম টলমল্ রে—

গান গাহিতে গাহিতে টলিতে টলিতে চলিতে লাগিল।

দামিনী দরজা বন্ধ করিয়া তেমনি মাটির উপর বুক পাতিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। উহার পিপাসিত মন যেন এই অন্ধকারে পঞ্চুর গানের সুরকে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে।

কিছুক্ষণ বাদে বুকের উপর একটা বিষম ভার বোধ করিয়া দামিনী চোখ চাহিয়া দেখিল, শশী তাহার দুইটা চোখা হাঁটু দিয়া উহার বুকটা একেবারে জাঁতিয়া ধরিয়াছে। দামিনীর চীৎকার করিবার সামান্য অবসরটুকু পর্যন্ত মিলিল না। শশী তাহার সমস্ত শক্তি দুইটা হাতের শক্ত মুঠির মধ্যে টানিয়া আনিয়া দামিনীর গলাটা টিপিয়া-টিপিয়া পিষিয়া দিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর গুঁতা দিয়া পাঁজরার উপরে প্রচণ্ড বাড়ি মারিতেছে। দামিনী দুই তিনবার দেহটা মোচড়াইবার চেষ্টা করিয়া বেহুঁস্ হইয়া গেল। পরে শশী দামিনীর কাপড়ের আঁচলটা জড়ো করিয়া মুখের মধ্যে জাঁতিয়া-জাঁতিয়া শেষ নিশ্বাস লইবার পথটুকু পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল।

শশী দামিনীর গায়ে হাত রাখিয়া বুঝিল, বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে,—দাঁতের

মধ্যে জিভ্‌টা আধখানা হইয়া কাটা গিয়াছে, যেন অন্ধকারে উহাকে মুখ ভেঙ্‌চাইতেছে। পরে বুকের উপর কান পাতিয়া দেখিল,—একেবারে নিঝুম। নাড়ী পর্যন্ত নাই।

হঠাৎ কি করিবে শশীর মাথায় আসিল না। কিন্তু পরক্ষণেই দামিনীর কোমর হইতে কাপড়টা সর্‌সর্‌ করিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বেশ করিয়া পাকাইয়া শক্ত করিয়া দামিনীর গলাটা খুব জোরে বাঁধিয়া দিল। নিজে দুই হাত দিয়া ঝুলিয়া একবার বেশ ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—আড়ির লম্বালম্বি বাঁশটা বেশ মজ্‌বুত আছে কি না। পরে কাপড়টা বাঁশটায় বাঁধিয়া দামিনীকে শূন্যে ঝুলাইয়া দিল। পা দিয়া যেন মাটি না ছোঁয়া যায়, হাত তুলিয়াও যেন বাঁশের নাগাল না মেলে,—এমনি অবস্থায় দামিনী লম্বমান হইয়া রহিল।

পৃথিবীর কাছে উহার আর একটি কথাও বলিবার রহিল না।

শশী দাওয়ায় আসিয়া রাখকে ঠেলা মারিয়া কহিল,- শিগ গির ওঠ্‌ রাখ, কাল ভোরে মেলা, চল্‌ আগে-ভাগে বেড়িয়ে পড়ি—

রাখ পরম উৎসাহে চোখের ঘুমটুকু মুছিয়া ফেলিল। কোমরে কাপড় কাছিয়া লইল। কুকুরটা পর্যন্ত ঘুম হইতে উঠিয়া কি একটা অভিনব অভিযানের ইঙ্গিত পাইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

শশীর হাত ধরিয়া রাখ চলিয়াছে; পেছনে কুকুর।

রাখ বলিল,—কখন ভোর হ'বে, বাবা?

শশী কহিল,—হবে 'খন। রাতারাতি বেরিয়ে না পড়্‌লে কিছুই হ'বে না। মেলার সমস্ত ভারই আমার ওপর—

কুকুরটা কিছুতেই রাখর পিছু ছাড়িতে চাহে না। শশী বিরক্ত হইয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিল, তবুও কুকুর পিছাইয়া পড়ে না। শশী বলিল,—ওটাকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দে, রাখ। কোথায় যাবে ও? মার্‌ ত' ঐ ঢিলটা—

রাখ বিরসমুখে ঢিলটা কুড়াইয়া লইয়া কুকুরটাকে মারিল। কুকুরটা গোঙাইতে-গোঙাইতে ফিরিয়া গেল।

তবুও, রাখ চলিতে-চলিতে বারে-বারে পিছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিল কুকুরটা ফের আসিতেছে কি না,— কান পাতিয়া রহিল কুকুরটার অস্ফুটতম কাতর শব্দটিও শোনা যায় কি না।—কিছুই না, আগে পিছে খালি অন্ধকার, চক্ষু মেলিয়া থাকিলে ভয় করে।

যাত্রাদলের নাম রাখিয়াছিল নিকুঞ্জ-যাত্রাপার্টি।

একটু ইতিহাস আছে। কয়েক বৎসর আগের কথা, কিন্তু ঘটনাটি পঞ্চুর বুকের মধ্যে দাগ কাটিয়া বসিয়া গেছে। ভুলিবার হইলে বহু আগেই ভুলিত।—ভুলিবার নয়।

চৈত্রের শেষাশেষি হইতে গাঁয়ে গাজনের ধূম লাগিয়াছে। মুখে দুইটা গুঁজিবার পর্যন্ত পঞ্চুর সময় নাই। ও-পাড়ার বিষ্টু স্যাক্‌রাকে গৌরী সাজাইয়া সমস্ত গাঁয়ে টানা-পোড়েন্ করিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু পয়সা কেমন করিয়াই বা হইবে? গৌরী গাঁজা একটু কম খাইলেই ভালো করিত! ঢ্যাঙা হ' ত' হ', একেবারে হরের মাথা ছাপাইয়া উঠিয়াছে! তবু, বিষ্টুকেই গৌরী হইতে হয়,—আর যাই হোক্, রংটা ফ্যাকাশে হইলেও শাদাটে আছে, আর কোমরও বেশ ঘুরাইতে পারে—

একটা সরু দরজার ফাঁকে এক দঙ্গল মেয়ে জাঁতাজাঁতি করিয়া জড়ো হইয়া মুখে আঁচল গুঁজিয়া হাসি চাপে। যাহারা অল্পবয়সী তাহারা কোমর বাঁকাইয়া হাসিতে-হাসিতে একেবারে লুটাইয়া পড়িতে চায়।

তবু পয়সা হয় না।

পঞ্চু ভাবে—গৌরীর পার্ট আর যদি কেউ নেয়!—সত্যিসত্যিই গৌরী। অম্‌নি খালি হাসিতে পারিলেই হইত বোধ হয়!

তেম্‌নি একদিন গাজনের গান শেষ করিয়া পঞ্চু ফিরিতেছিল, ঘরে ফিরিতে আরো প্রায় মাইল তিনেক চষিতে হইবে। খুব ক্লান্ত বোধ করিতেছিল, কিন্তু জিরাইবার মত সময়টুকুও নাই।

আকাশে খুব মেঘ করিয়াছে। মেঘের ভারে-ভারে আকাশ যেন মাটির বুকের কাছে নামিয়া আসিয়াছে,—পঞ্চু খুব জোরে-জোরে পা ফেলিতেছিল। আর গান গাহিতেছিল:

রাঙা-বৌয়ের গায়ে দেব কামরাঙা শাড়ি,
গাজনে গাঁজা লাগে, যাত্রায় লাগে তাড়ি!

কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠিয়া একটা তুমুল হুলুস্থুল বাধাইয়া তুলিল। ধুলা-বালি উড়াইয়া, নারিকেল সুপারি মাঁদার গাছ উপ্‌ড়াইয়া, টিনের চাল ছিনাইয়া কেলেঙ্কারির আর শেষ রাখিল না। যেন সুখসুপ্ত পৃথিবীকে একেবারে অনাবৃত করিয়া ছাড়িবে। দাঁত দিয়া অন্ধকারকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া বিদ্যুৎ ফাটিয়া পড়িতেছে। বৃষ্টিও নামিল বৈ কি—

দস্যু ঝড়,—যেন আকাশের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুতের বেত মারিতেছে। নদীও কান্নায়-কান্নায় ফুলিয়া উঠিয়াছে,—এখনিই যেন কূল ভাঙিয়া ভাসিয়া পড়িবে।

পথের ঠাহর নাই,—কোন্ দিক যাইতে কোন্ দিকে ছুটিয়াছে পঞ্চু কিছুই বুঝিতে পারে না। মাঝে-মাঝে উড়িয়া আসিয়া মাটির ঢেলা বুকে লাগে, পা পিছ্‌লাইয়া পড়ে,—তবু ছোটে। পথে না আছে একটা লোক, না চলে একখানা গরুর :গাড়ি। ঝড় আসিবে বলিয়া সন্ধ্যাসন্ধিতেই সবাই বাড়ি নিয়াছে,— কিন্তু যাহার বাড়ি নাই—

ঝড় থামে বটে, বৃষ্টি না। ভিজিয়া পঞ্চুর গা একেবারে ভ্যাপ্‌সা হইয়া গেছে, শীতও করিতেছে খুব, তবু দিশাহারা হইয়া চলে। পথ ঘাট ভালো করিয়া চিনিতে পারে না।

না চিনুক্। পঞ্চু গান গায় :

কোমরে ঘুনসি দেব, গলায় হাঁসুলি,
পরিয়ে দেব আপন হাতে বুকের কাঁচুলি।
খোঁপায় গুলঞ্চ দেব, কানেতে রঙ্গন,
পায়েতে মল বেঁধে দেব, গলায় আলিঙ্গন।

নদীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ পাশে থেকে কে ডাকিয়া উঠে,—কে যায়?

ডাক শুনিয়া পঞ্চু ভরসা পায় যেন, সেই দিকে আগাইয়া চলে,—পায়ের সঙ্গে কি-একটা শক্ত জিনিসের ধাক্কা লাগে বুঝি, হাতে তুলিয়া লইয়া দেখে,—মড়ার খুলি একটা। তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পঞ্চু মনে-মনে রাম-রাম করিয়া উঠে।

লোকটা বলে,—এটা বাবা শ্মশানঘাটা, সবাইকে আসতে হ'বে এখানে একদিন। সমস্ত দর্প যাবে এখানে এসে। কোথায় চলেছে বাপু তুমি?

পঞ্চুর শরীর ভয়ে ছম্‌ছম্ করিয়া উঠে, মুখ শুকাইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া আসে। মনে হয় যেন একটা মৃতদেহ জল খাইয়া উঠিয়া বসিয়াছে, এখুনি ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

লোকটা বলিল,—বোস। গাঁজা খাও? দেশ্‌লাই আছে? থাক্‌লেও ভিজে ভ্যাব্‌ডেবে হয়ে গেছে নিশ্চয়। ছাই! বলিয়া দুইটা মড়ার মাথা কুড়াইয়া লইয়া ঠোকাঠুকি দিতে লাগিল।

ফের বলিল,—এখানে একটা ঘর ছিল, ঝড় একেবারে ন্যাংটো করে' ছাড়্‌লে। চিহ্নটি পর্য্যন্ত রইল না। এই যে এখানে কত লোক চিতার কাঠের তলায় মাথা গুঁজ্‌তে এল,—কা'র চিহ্নটি রইল বাপু? ছাই! ওই যে, কি বল্‌ত না বিষ্ণু-পণ্ডিত—জলবৎ তরলম্,—সেই!

বলিয়াই হাসি। মুখ দেখা যায় না, বৃষ্টির মধ্যে হাসিটা একটা বীভৎস হাহাকারের মত শোনায়। পঞ্চু পিছাইয়া পড়ে।

লোকটা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—কোথায় যাও হে ছাই? ভয় পেয়ে গেলে না কি? চেন্ না আমাকে?—আমি নিকুঞ্জ,—বহুরূপী।

পঞ্চু সাহস পাইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল—আমি পঞ্চু, যাত্রাদলের অধিকারী।

নিকুঞ্জ হাত বাড়াইয়া পঞ্চুকে জাপ্‌টাইয়া ধ'রিল। কহিল—তুমি পঞ্চু? বা, তোফা! শ্মশানের সাথী—

কথাটার মানে অন্তরূপ।

দুইজনের পরিচয় ছিল না, শুধু নাম শুনিয়াছে। শ্মশানেই প্রথম বন্ধুত্ব।

পঞ্চু কহিল,—তুমি এই দুর্যোগে শ্মশানে বসে'?

নিকুঞ্জ কহিল,—আর বল কেন? সেই যে কি বলে হে—রাজদ্বারে শ্মশানে চ,—আমার হয়েছে তাই। ঝক্‌মারি! খেত তাঁতি তাঁত বুনে'—

—ব্যাপার কি?

—সেই যে জানকী বোষ্টমি,—কি করে'ই বা তুমি চিনবে? আমাদের মিহিরকান্দি গাঁয়ে কুঁড়ে বেঁধে ছিল—বেশ ধাই-গিরি করে' কামাচ্ছিল দু'পয়সা,—কত পোয়াতি যে খালাস করেছে, অন্ত নেই। কি যে দুর্মতি হ'ল ছাই, নিজেই একদিন খালাস হ'লেন ধুতুরো-বিচি খেয়ে। আর বল কেন, কেলেঙ্কারি,—কেউ মড়া ছোঁবে না। ছিল আবাগের বেটা নিকুঞ্জ, গেল এগিয়ে। একাই কাঁধে ফেলে শ্মশানে নিয়ে এল। গায়ে কি কম জোর ভাই?

পরে গলাটা বোধ করি বৃষ্টির জলেই ভিজাইয়া নিয়া কহিল,—কাঠ-ফাঠ জোগাড় করে' চিতাটা সবে চড়িয়েছি,—ছাই, রাজ্যের বৃষ্টি নেমে এল। জানকী বোষ্টমি মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে'ই রইল। কি করা যায়?—দেশ্‌লাই আছে? গাঁজার দম না দিয়ে যে আর পারা যায় না, পঞ্চু।

পঞ্চু উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিল,—বসে'-বসে' এম্‌নি ভিজ্‌বেই নাকি শুধু?

—আর বল কেন? ওর ত' ব্যবস্থা একটা করতে হ'বে। বৃষ্টি না থামলে ত' ফক্কা—

—কিন্তু জল আজ আর থাম্‌ছে না। তা ছাড়া, আগুনই বা কোথায় পাবে, কাঠ ভিজে একাকার হ'য়ে আছে। এবার বাড়ি যাওয়া যাক্‌।

নিকুঞ্জ তাহার বড়-বড় চুলগুলি হইতে জল চিপিয়া ফেলিতে-ফেলিতে বলিল—ছাই! মর্‌ ত' মর্‌, কালক্ষণ দেখে মর্‌। বাড়িতে বৌটা নিশ্চয়ই গাল ফুলিয়ে বসে' আছে, নিশ্চয়ই ঘুমুতে যায় নি। ঝক্‌মারি।

পঞ্চু তখনিই গান বাঁধিবার লোভ আর সম্বরণ করিতে পারে না। গাহিয়া উঠে:

এলো খোঁপা বেঁধে বধূ গোসা করেছে,
চোখের জলে বুকের, কাঁখের কলস ভরেছে।

নিকুঞ্জ একেবারে খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠে। পঞ্চুর পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলে,—আরেকখানা ধর ভাই,—কি করে' মান ভাঙি বৌ'র ?

পঞ্চু গান বাঁধে :

কি করিয়া ভাঙি বল বঁধুয়ার মান—
চোখের পাতায় দেব চুমা, মুখে সাঁচি পান!

নিকুঞ্জ ঘাড় দুলাইতে-দুলাইতে বলে,— তোফা ভাই! চল এবার উঠি, মাগী থাক্‌ পড়ে' হেথা। আজ আর কিছু হবে না, কাল রোদ্দুর উঠ্‌লে দেখা যাবে। বেটির কপালে ছিলই দুঃখ!

এই বলিয়া নিকুঞ্জ পার্শ্বস্থিত অর্ধনগ্ন বিকটাকৃতি মৃতদেহটার দিকে তাকাইয়া বোধ করি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আস্তে-আস্তে মেয়েটির পরনের ছেঁড়া গেরুয়ারঙের কাপড়ের আঁচলখানি মুখের উপর টানিয়া দিয়া বলিল,—চল পঞ্চু ভাই, আমার বাড়িতেই চল। সেখানেই দু'চারটা দম্‌ দিয়ে ঘুম মারা যাবে। তোফা! ছেলে-মানুষ বৌটা নিশ্চয়ই আর জেগে নেই। সে-সব দিন কি আর আছে ভাই—বৌ সারা রাত জান্‌লায় বসে'ই কাটিয়ে দিল সোয়ামির পথ চেয়ে? সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই।

দুই জন চলিল। বৃষ্টি তখন অনেকটা কমিয়াছে, শুধু তীক্ষ্ণ দম্‌কা হাওয়া হাড়ে-হাড়ে হাহাকার তুলিতেছিল। পঞ্চু গুটিসুটি মারিয়া অতি কষ্টে চলিতেছিল, বলিল,—একখানা কাপড় দিতে হ'বে ভাই, আর একটু আগুন।

নিকুঞ্জ বলিল,—সব দেব তোকে। কিন্তু বৌটা কি কর্‌ছে এখন, তাই ভাবি। পিসির সঙ্গে গল্প কর্‌ছে হয় ত',— পিসি বৌকে খুব ভালোবাসে, ভারি ভয় বৌয়ের, পিসির আঁচল আঁক্‌ড়ে' পড়ে' থাকে।

পরে পেছনে শ্মশানের দিকে একবার চাহিয়া কহিল,— ওকে একলা ফেলে' চলে' এলাম। আবার শেয়ালে না নিলে হয়! বাদ্‌লা রাত,

পঞ্চু কহিল,—কষ্টটা যেন ওরই, আমাদের কিছু নয়।

নিকুঞ্জ কহিল,— তা হ'বে।

শ্মশান হইতে নিকুঞ্জের বাড়ি বেশি দূর নয়, দুই ক্রোশের মধ্যেই। মাঝে একটা বন পার হইতে হয় অন্ধকারে কিছুরই কিনারা মিলে না, একেবারে লেপিয়া গিয়াছে।

শীতে হি-হি করিতে-করিতে দুই জনে বাড়ি পৌঁছিল। উঠানে খাজ্যের গাছ-

গাছড়ার ভাঙা ডালপালা আসিয়া জমিয়াছে, ঘর দুইখানা এখনো মাথা খাড়া করিয়া আছে দেখিয়া নিকুঞ্জের চোখ জুড়াইল।

নিকুঞ্জ বলিল,—দাবায় উঠে এস ভাই। আমি ঘর থেকে কাপড় নিয়ে আসি,—দেখি কি হাল্‌চাল্‌—

নিকুঞ্জ ঘরে ঢুকিয়াই চেনা জায়গায় হাত বাড়াইয়া দেশ্‌লাই পাইল। কুপি জ্বালিয়া দেখিল, বৌ বাদ্‌লা পাইয়া মেঝেতে চাটাই পাতিয়া দিব্যি ঘুমাইতেছে। ফুলো-ফুলো গাল দুইটিতে আলো পড়িয়া ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল।

নিকুঞ্জ কাপড় ছাড়িয়া বৌয়ের একখানি শাড়ি পরিল, নিজের শুক্‌নো কাপড়খানি পঞ্চুকে ধরিয়া দিয়া কহিল,—বৌ মেঝেতে কাৎ হ'য়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে, চলে' এস ভেতরে - তক্তপোষটায় দু'জনে গড়াই। দাঁড়াও, আগে দু' ছিলিম্‌ সেজে নি।

গাঁজার কল্‌কেতে টান শেষ করিয়া তোবড়ানো গালের ফুটো দুইটা পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নিয়া পঞ্চু কহিল,—একটা চাটাই-ফাটাই থাকে ত' এখানেই বিছিয়ে রাতটা কাবার করে' ফেলি. বৌকে বিছানায় তুলে নাও, নিকুঞ্জ। অভিমানী বৌ। বলিয়াই ঘাড় দুলাইয়া গান ধরিল :

> দিয়েছি গাঁজার টান, হয়েছি অসাবধান,
> ও রাই, আর করো না অভিমান।

নিকুঞ্জ পঞ্চুর হাত ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। ঘরের এককোণে একটি কিশোরী মেয়ে হাঁটু দুইটা বুকের কাছে গুটাইয়া লইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে, কতগুলি কোঁক্‌ড়ানো চুল মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মুখখানি যেন মুছিয়া ফেলিয়াছে।

নিকুঞ্জ ফুঁ দিয়া কুপিটা নিবাইয়া দিল। পঞ্চুকে কহিল,—এই বালিশটা নাও, আমার লাগ্‌বে না। অতিথি মানুষ, চাট্টি যে তোমার মুখে দেব তেমন সঙ্গতি আজকার রাতের কম নেই।—ভাঁড়ে মা ভবানী! যাক, মাগ্‌না ঘুমটা ত' পেলে—

পঞ্চু যেন খুসি হইয়াই বলিল,—হ্যাঁ, তাই ঢের। হয় ত' আজ সমস্ত রাতই জলে পচ্‌তে হ'ত। বলিয়া দু'জনে তক্তপোষের উপর চাঁপিয়া শুইল।

কিন্তু পঞ্চুর পোড়া চোখে ঘুম আসে না কেন? চক্ষু দুইটা মেলিয়া অন্ধকারে চাহিয়া থাকে; ভাবে, বৌটিকে আল্‌গোছে তুলিয়া তক্তপোষের উপর নিকুঞ্জের পাশে শোয়াইয়া দিয়া নিজে বাহির হইয়া যায়।

আর, বৌটির কি নিবিড় ঘুম, একটুও আল্‌গা নাই। ঘুম যেন সমস্ত শরীরে একেবারে লেপ্‌টাইয়া রহিয়াছে। যদি চোর আসিয়া সর্বস্ব চুরি করিয়া নেয়, মেয়েটি তাহাও টের পাইবে না। মেয়েমানুষের এত ঘুম ভাল নয়।

আরেক জন-ও ঘুমাইতেছে,—আর জাগিবে না। তাহার নাম জানকী। শ্মশানে এই কনকনে শীতের রাতে একলা শুইয়া আছে। নিকুঞ্জ বলিয়াছিল,—মাসীর খুব-কষ্ট হ'ল! এই বাদ্‌লা, গায়ে একটা কাপড়-নেই।

তাহার কথাও পঞ্চুর মনে পড়ে।

বৌটি এক সময় নিশ্চয়ই জাগিবে, সেই আশায়ই বোধ করি পঞ্চু জাগিয়া ছিল। বৌটি জাগিয়া এলো খোঁপাটা বাঁধিয়া লইল, কুপি জ্বালাইল ও কুপির আলোতে কি একটা দেখিয়া একেবারে দুই পা পিছাইয়া আসিল। নিকুঞ্জ ফিরিয়াছে তাহা সে ঘুমের মধ্যেই বেশ বুঝিয়াছিল, বরং স্বামী আসিয়া আদর করিয়া উহাকে নিজের কাছে তুলিয়া নেয় নাই দেখিয়া অভিমানে দম বন্ধ করিয়া থাকিতে থাকিতে ফের ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অভিমান কতক্ষণ চাপিয়া রাখা যায়?

বৌ ভাবিয়াছিল নিকুঞ্জ বুঝি পিসির সঙ্গেই গল্প করিতেছে।

কিন্তু স্বামীর পাশে শয্যাসহচর ওটি কে? আজ রাত্রে মড়া পোড়াইতে গিয়া জ্যান্ত এটি কে আসিলেন? মুখ পরীক্ষা করিবার জন্যই হয় ত' বৌ ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল। পঞ্চু তখন দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া কি একটা অপ্রত্যাশিতের আশায় একেবারে ঘামিয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত ব্যাপারটার অর্থ করিতে বৌটির এক মুহূর্তও দেরি হইল না। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া পাশের স্বামীকে দুই বাহু দিয়া বিপুল বেগে হেঁচ্‌ড়াইয়া টানিয়া থাক্‌-যাক্‌ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—চোর, চোর!

নিকুঞ্জ বৌ-শুদ্ধ হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল, পাশের আটচালা হইতে পিসি জ্বলন্ত কুপি লইয়া ছুটিয়া আসিলেন, নিকুঞ্জও ঘুমের মধ্যে পড়িয়া গিয়া গোঁ-গোঁ করিতেছে,—সে একটা কাণ্ডই হইয়া গেল যা হোক্।

নিকুঞ্জ চক্ষু কচ্‌লাইয়া নিমেষে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে না লইতেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর ভীত কম্পান্বিত দেহখানিকে বুকের কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল,—দূর বোকা মেয়ে, ও চোর নয়, পঞ্চু। সেই যাত্রায় কেষ্ট সেজেছিল, যার গান শুনে আসা অবধি সারা দিন খালি সুর ভেঁজেছিলে—

বৌয়ের লজ্জার আর কূলকিনারা রহিল না। একেবারে একটা একহাত লম্বা ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া মুখ লুকাইয়া খালি জিভ কাটিতে লাগিল।

পিসি বলিল,—এ কী অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু। দুপুর রাতে কী এ-সব বেলেল্লাপনা! চোর-চোর শুনে বুকের ঢিপ্‌ঢিপানি আমার এখনো থামে নি।

বলিয়াই হাতের কুপিটা মাটির উপর আছ্‌ড়াইয়া বৌয়ের পানে একটা বিষাক্ত কটাক্ষ হানিয়া দুম্‌দুম্ করিয়া নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। পরে বাটি হইতে

খানিকটা সর্ষের তেল দুই পায়ের পাতায় বেশ করিয়া মাখিয়া, তেল-চপ্‌চপে দুইটা আঙুল নাকের দুই গর্তের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া নাক ডাকাইতে লাগিল।

পঞ্চু তখন তক্তপোষ হইতে নামিয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চু বলিল,—আমি চল্‌লাম, নিকুঞ্জ। এমন আরামের রাতটা মিছিমিছি নষ্ট করা উচিত হবে না। বলিয়াই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নির্বাক্‌কুণ্ঠিতা বৌটির পানে একবার চাহিয়া চোরেরই মত টুপ্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দরজাটা খোলাই ছিল। যদি আবার সেই চোর ফিরিয়া আসে! বৌটি ধীরে ধীরে দরজাটা টানিয়া দিল শুধু। ধীরে-ধীরে আসিয়া শুইয়া চোখ মেলিয়া কান পাতিয়া রহিল।

বৌ বলে,—তুমি কেন আমাকে আগে বল্‌লে না যে ঘরে অতিথি এসেছে? কি অপমানটাই করা হ'ল!

নিকুঞ্জ বলে,—সত্যি, ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। যাব?—ডেকে নিয়ে আস্‌ব ধরে?

বৌ নিকুঞ্জের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলে,—না। তুমি ভারি ইয়ে—। এই শুলাম পাশ ফিরে।

নিকুঞ্জ তাহাকে আদর করিয়া বুকের কাছে টানিয়া নেয়। কপালের কাছে চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঘুমাইয়া পড়ে।

বাদলের পরে বাহিরে তখন ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে।

খোলা জান্‌লা দিয়া মেঝের উপর একটুখানি গড়াইয়া পড়ে হয় ত',—সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বৌটির ঘুমাইবার কথা আর মনেই হয় না। অনেক দিন আগে 'বিচিত্র-বিলাস' যাত্রা শুনিতে গিয়া যে-কাকুতি কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে ঝরিয়া পড়িয়াছিল তাহাই মনের মধ্যে যেন ঘুরিয়া গুমরিয়া বেড়াইতে থাকে, কথা দিয়া সেই পলাতক সুরটিকে আটকাইতে পারে না, বিস্মৃতির অন্ধকারে খালি খুঁজিয়া ফেরে। রাত্রির ভিজা হাওয়ায় কে যেন উহাকে ডাক দিয়া যায়।

আঁচলের খুঁটটি গায়ে দিয়া পঞ্চু সেই বাহির হইয়া গেছে। জ্যোৎস্নায় এইবার পথঘাট বেশ ঠাহর হয়। এই গাঁয়ে গণেশ পৈতুণ্ডি কাঠের কারবার করে—তাহাও মনে পড়িয়াছে। গণেশের মেয়ের বিয়েতে পঞ্চু বিনি-পয়সায় লখিন্দরের পালা গাহিয়াছিল। সেই মেয়েটা বিধবা হইয়াছে,—তাহাও ভুলে নাই।

এই গাঁয়ে দুই সাহেব নাকি শহর হইতে একবার বেলে-হাঁস শিকার করিতে

আসিয়াছিল। হাঁস মারিতে গিয়া একটা গুলি নাকি গণেশের জামাইর মাথার খুলির মধ্যে সিধা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। গণেশ খুব তম্বি করিয়াছিল—সাহেবদের বিরুদ্ধে মামলা করিবে ও দুই সাহেবকে ফাঁসিতে লটকাইয়া দিয়া মজা দেখিবে। তাহার এই দুঃসাহসিক সঙ্কল্প শুনিয়া গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা একেবারে থ হইয়া গিয়াছিল, তাহার দুর্বুদ্ধিকে শাসন করিতেও কসুর করে নাই; বরং, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নিয়তিরই হাত—এই অকাট্য উপদেশ দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। গণেশ কাহারও কথায় কর্ণপাত করে নাই, ঘরে দোর দিয়া হত্যাকারীর বিরুদ্ধে অজস্র গালিবর্ষণ করিয়াছে আর চেঁচাইয়াছে।

কেহ বলে,—বড্ড বাড় বেড়েছে গণেশ। যাবে এবার।

আর কেহ বলে,—যাই বল্, বুকের পাটা আছে বটে। সাহেবের সঙ্গে দাদ-ফরিয়াদ কর্‌বি, এ কথা তোরা কেউ মুখে আন্‌তে পার্‌তিস্?

সাহেব আসিয়া চারখানা দশ টাকার নোট্ গণেশের হাতে লুকাইয়া গুঁজিয়া দিল, কহিল,—তোমার মেয়ের টিফিনের জন্যে দিলাম।

মুহূর্তে কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না। যে-আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিয়া একেবারে জল হইয়া গেল। গণেশ একেবারে উবু হইয়া সাহেবের বুট-জুতার গোড়ালি হইতে খানিকটা কাদা খাম্‌চাইয়া লইয়া কপালে জিভে ও বুকে মাখিয়া পরমানন্দে মুখব্যাদান করিয়া রহিল। যেন একবার বলিতে চাহিল: তোমার বন্দুকটা সঙ্গে করে' নিয়ে আস নি? আমার ঘরে আরো দু' একটা নিষ্কর্মা প্রাণী আছে। মাথা পিছু—

ম্যালেরিয়া ভুগিয়া-ভুগিয়া কঙ্কালসার কুৎসিত বদ্‌রাগী স্ত্রীর কথাই মনে পড়িয়াছিল বোধ করি। একটা কয়লার ডিপো,—গেলেই পথটা ফর্সা হইত।

শোনা যায় সেই চল্লিশ টাকাই নাকি গণেশের কাঠের কারবারের মূলধন। তা আর যাই হোক, কারবার ত' বেশ ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে। মেয়েটাও ভাতে-ভাত খাইয়া বেশ একটি ঢোল হইয়াছে, দজ্জাল বজ্জাতি বৌ-ও ঠ্যাঙা খাইয়া-খাইয়া মরিয়া সায়েস্তা হইয়াছে। তবে গাঁয়ের লোকগুলি পাজি বলিয়াই উহাকে বুড়া দেখিয়া আর মেয়ে দেয় নাই।

ভোরের কাছাকাছি,—দাবায় বসিয়া গণেশ হুঁকো খাইতেছিল।

রাস্তা হইতে পঞ্চু হাঁক দিল,—গণেশ-কাকা না? কেমন আছ?

আর একটু কাছে আসিতেই গণেশ চিনিল।—আরে, পঞ্চু যে? বলি—এই রাত্রে, জলে? বোস্ বোস্, মুজ্‌রো পাচ্ছিস কেমন? আছিস্ বেশ?

পঞ্চু দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল,—ঘরে তোমার কাঠ কিছু মজুত আছে? আমাকে কিছু দিতে হ'বে—

—তাতে আর কি? সে ত' ভালো কথা। তোকে আর কে না চেনে, কে না বিশ্বাস করে? তা, দামটা দু' একদিনেই দিয়ে দিলে চল্‌বে।

—আর তোমার টানা হাত-গাড়িটা। কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

—তা বেশ, তা বেশ! ওটার ব্যবহারের জন্য গাঁয়ের লোক ঘণ্টা পিছু দু' পয়সা ক'রে ভাড়া দেয়। তা, তুই না হয় এক আনা ক'রেই দিস্। এক সঙ্গেই দিবি কিন্তু। তা, আজ মঙ্গলবার, লক্ষ্মীবারের মধ্যে চাই। মনে থাকে যেন।

পঞ্চু কাঠ লইয়া গাড়ি ঠেলিতে লাগিল। গাড়ি লইয়া শ্মশানে আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই আকাশে আলোর ছোঁয়াচ্ লাগিয়াছে। ইহার মধ্যেই প্রায় চার-পাঁচটা চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—বৃষ্টি থমিয়া গিয়াছে কি না,—এতক্ষণ মড়া লইয়া কেহ আসিতে পারে নাই।

তিন-চারখানা গ্রামের মধ্যে এই একটি মাত্র শ্মশান। একটি ঘণ্টাও কামাই যায় না।

চিতার-অগ্নিশিখা যেন হাত বাড়াইয়া প্রভাত-সূর্যকে অভ্যর্থনা করে।

কোন্ ক্ষুধার্ত শকুন আসিয়া জানকীর চক্ষু দুইটা উপ্‌ড়াইয়া লইয়াছে। বুকের একটা স্তন কোন্ শেয়াল হয় ত' কাম্‌ড়াইয়া ছিনাইয়া নিয়াছে,—পঞ্চু আর তাকাইতে পারে না। পরম আদরের সঙ্গে ধীরে-ধীরে চিতায় শোয়াইয়া দেয়।

এক পাশ হইতে বেচারাম বলে,—এ কা'র মড়া জানিস্।

পঞ্চু বলে, জানি বৈ কি। হাতে কাজ নেই, তাই—

উদ্ধত প্রতিবাদ উঠে,—তুই ওর মড়া ছুঁলি যে?

পঞ্চু উত্তরে গান গাহিয়া উঠে:

ও যে কল-কলঙ্কিনী,
পায়ে বাঁধা সোনার ঘুঙুর
বাজে মধুর রিনিরিনি।

কেহ বলে,—জাত যাবে, পঞ্চু।

পঞ্চু বলে,—সে ত' অনেক কালই গেছে।

চিতা জ্বলে, আর কূলে-কূলে ভরা নদী ও জলে-ডোবা ধানক্ষেতগুলির দিকে চাহিয়া-চাহিয়া পঞ্চুর চোখ ছলছল করিয়া উঠে।

গান আর মনে পড়ে না।

একদিন যায়, দুইদিন যায়,—আলাপ ক্রমে-ক্রমে জমিয়া উঠিতে থাকে।

ভোরের বেলা পঞ্চুকে আসিতে দেখিয়া নিকুঞ্জের বৌ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া উনান জ্বালায়,—চায়ের জন্ত হাঁড়িতে জল চাপাইতে হইবে। ভোরবেলা গরম চা-টুকু পঞ্চুর এইখানেই খাইয়া যাওয়া চাই।

সেইদিন উঠিতে বৌটির দেরি হইয়া গিয়াছিল বুঝি,—এক গা রোদ হইয়াছে।

দু'টি চোখের কোণে ও ঠোঁটের ফাঁকে লজ্জার একটি অপরূপ লাবণ্য লইয়া বৌটি রান্নাঘরে গিয়া ঢোকে, শুক্‌নো পাতা ধরাইয়া আগুন করে; পঞ্চু চায়ের প্রত্যাশায় দরজায় হেলান দিয়া গুটিস্থটি মারিয়া বসিয়া থাকে।

এই ফাঁকে নিকুঞ্জ বেশ একখানি ধারালো দা নিজের গলার মধ্য দিয়া এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া চালাইয়া দেয়, রক্ত-ও টস্‌টস্‌ করিয়া বুক বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকে। মুখটা হাঁ করিয়া কুঁজো হইয়া রান্নাঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, যেন নিশ্বাস লইবার জন্তই হাঁ করিয়া রহিয়াছে, এখুনিই মুখ থুবড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

অতি কষ্টে বলে,—এই দেখ, কি হয়েছে আমার!

ফিরিয়া চাহিয়াই বৌ একেবারে হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে, চুল এলো করিয়া ঘোম্‌টা খুলিয়া ফেলিয়া আতঙ্কে যেন পাগলিনী হইয়া উঠে।

তাহা দেখিয়া পঞ্চুর হাসি আর বিরাম মানে না। হাসি শুনিয়া বৌটি ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া পঞ্চুর দিকে চাহিয়া থাকে। ইচ্ছা করে গরম জলের হাঁড়িটা উহার মুখের উপর ছুড়িয়া মারিয়া মুখটা পোড়াইয়া দেয়।

পঞ্চু বলে,—অত ভয়ের কিছু নয়, বৌঠান্‌। দা-টা কি সত্যই আর গলায় বসেছে,—ওটা ওর চালাকি। এই না হ'লে লোকে পয়সা দেবে কেন?

বৌটি আশ্বস্ত হইতে না হইতেই রাজ্যের লজ্জা যেন তাহাকে বেড়িয়া ধরে। হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া জিভ কাম্‌ড়াইতে থাকে। এত বোকামিও সে করিতে পারে! ছি!

নিকুঞ্জ বলে,—আরেক দিন রাক্ষস সেজে বেরিয়েছিলাম ভাই। রাত্রিবেলা বাড়ি এসে বল্‌লাম,—আমি মানুষ খাই, বড় বড় বাড়ি খাই, রেলগাড়ি খাই,—আমাকে দেখেই ওর কি কাঁপুনি! যেন অজ্ঞান হ'য়ে যায় আর কি! মুখোস্‌টা খুলে' ফেলে' ফুলোনো ভুঁড়ির তলা থেকে জামা-কাপড়গুলি বা'র করে' যে-কে-সেই হ'লে পরে তবে বেচারির কান্না থামে।

বৌ লজ্জায় মাথাটা একেবারে তাহার পায়ের কাছে নামাইয়া আনে।

নিকুঞ্জ চলিয়া গেলে বৌ বলে,—এ ভারি অন্যায়,—লোককে ভয় দেখিয়ে পয়সা নেওয়া।

পঞ্চু বলে,—আর আমি কি করে' পয়সা আদায় করি, জান? কাঁদিয়ে। বুকের মধ্যে যত কান্না জমে, গানের সুরে তা ঢেলে দিই—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে, - তোমরা কি করে' খাওয়া-পরার জন্য পয়সা আদায় কর, শুন্‌বে?—একজনকে ভালোবেসে, সেবা করে' তার গলায় সেঁউতি-ফুলের মালা হ'য়ে—না?

বৌটি লজ্জায় একটুখানি রাঙা হয়।

পঞ্চু চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুধোয়,—তোমার নাম কি, বৌঠান?

বৌটি মাথা আরো নামাইয়া আনে। খোঁপা হ'তে ঘোমটাটা একটু সরে।

পঞ্চু ফের বলে,—স্বামীর নাম বল্‌তে ত' দোষ, নিজেরটা বল্‌লে কি হয়?

বৌটি বলে,—আমার স্বামীর নামেই আমার নাম।

—তার মানে?

—আমার নামের বাঁ দিকে 'নি' বসালেই আমার স্বামীর নাম—

কথাটা শেষ করিতে ন করিতেই কুঞ্জ দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া হাসিয়া উঠে।

পঞ্চু বলে,—তোমার স্বামী তোমাকে খুব ভালোবাসে?

খোঁপাটা দুই পাশে দুই বার হেলাইয়া কুঞ্জ বলে,—মোটেও না।

—তবে, তোমার চোখের কাজল, কপালের সিঁদুর মুছে' গেছে কেন? চোখের কোলে এখনো ত' ঘুম ঢুল্‌ছে,—কাল রাতে নিকুঞ্জ খুবই দুষ্টুমি করেছে বুঝি?

হঠাৎ গরম জলের হাঁড়িটা কুঞ্জের পায়ের উপর আচম্‌কা গড়াইয়া পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রণায় কুঞ্জের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠে। পঞ্চু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বেড়ায়-গোঁজা নারকেল-তেলের শিশিটা পাড়িয়া আনিয়া দগ্ধ পায়ের উপর ঢালিয়া দেয়, ধীরে-ধীরে পা হইতে রূপার মলগাছি খুলিয়া রাখে। দেখিতে-দেখিতে জায়গায়-জায়গায় ফোস্কা বাহির হইতে থাকে। পা-খানি নিজের বাঁ হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া পঞ্চু ডান হাতে তেলপটি লাগায়।

পরে বলে,—আমার জন্যেই তোমার এই আক্কেল। আমি কাল থেকে চা খেতে আর আস্‌ব না।

কুঞ্জ ক্ষণেকের জন্য তাহার দুইটি কালো চোখ প্রসারিত করিয়া পঞ্চুর পানে চাহিয়া থাকে।

বাঁকা বিষ্টু চাকরির খোঁজে শহরে গিয়াছিল। শহরে তখন গাধাবাহিনী শীতলার আধিপত্য চলিতেছে। দুই দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া-ঘুরিয়াই বিষ্টুর জ্বর হইল। ছেঁড়া চটিজুতাজোড়া শহরের মুখে ছুঁড়িয়া মারিয়া অতিকষ্টে আবার ট্রেনে চাপিয়া বসিল, —হরি-সঙ্কীর্তন করিয়া ভিক্ষা মাগিয়াই দিন গুজরাইবে।

কিন্তু গাঁয়ে আসিতে-আসিতেই টের পাইল, মা শীতলা তাঁহার শীতল হস্তখানি সন্তানের গায়ে সস্নেহে বুলাইয়া দিয়াছেন।

তাহার পর পাঁচ-সাত দিন একটা বড় কলাপাতায় তেল মাখাইয়া তাহার উপর শুইয়া বিষ্টু খালি-গায় ছটফট করিতে লাগিল। গ্রামে এই একটা নতুন ফ্যাসাদ জুটিয়াছে,—গা-টা একটু উষ্ণ হইলেই লোকের দুর্ভাবনার আর অবধি থাকে না, সমস্ত দিন-রাত্রি খালি নিজের নাড়ীই টিপিতে থাকে।

মুখে এক ফোঁটা জল দিবারও কেহ নাই। একমাত্র বৌ ছিল, সেও ভয় পাইয়া বাপের বাড়ির কোন আত্মীয়ের সঙ্গে অন্য গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। অকৃতজ্ঞতার অভিযোগের কোন অর্থ নাই, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে মাত্র। উহাদের জাতে বিধবাদের বিবাহ করিবার রীতি আছে, বৌটি তাহা জানিত বোধ হয়।

নয় দিনের দিন সমস্ত শরীর হইতে পুঁজের পচা গন্ধ ছাড়িতে-ছাড়িতে বিষ্টু নিশ্চিন্ত হইল।

কেহই আগাইতে চায় না। শেষকালে পঞ্চুই হোগ্‌লা লইয়া আসিয়া খুব কষিয়া বিষ্টুকে বাঁধিয়া ফেলিল। পরে লোক ডাকিতে একাই রওনা হইল।

পথে নামিয়াই নিকুঞ্জের সঙ্গে দেখা, তাড়ি খাইয়া টলিতে-টলিতে চলিয়াছে।

নিকুঞ্জ বলিল, গেছ্‌লাম রাখাল দাসের শ্রাদ্ধে, ঠেসে তাড়ি খাইয়ে দিলে। তিন দিন বাড়ির মুখ দেখি নি, বৌটা বেঁচে আছে ত' রে পঞ্চু?

মুহূর্তে পঞ্চুর সমস্ত হৃদয় যেন মর্মান্তিক ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল। সংসারে উহার না-হয় কেহ নাই, তাই ও নেশা করে,—জীবনে উহার নেশাটুকুই সম্বল। কিন্তু নিকুঞ্জ,—যাহার গোলাভরা ধান না হইলেও বুকজোড়া সাত রাজার ধন এক মাণিক আছে, যে ভালোবাসার নেশায় মাতাল হইয়াছে, তাহার এই কদর্য দারিদ্র্য কেন? একমুখ গন্ধ লইয়া সেই ভীরু মৃদুল মেয়েটির মুখের কাছে কি করিয়া মুখ বাড়াইবে? পঞ্চুর ইচ্ছা হইল নিকুঞ্জের মুখের উপর দুইটা লাথি মারিয়া উহার নেশা চটকাইয়া দেয়।

সকাল বেলা চা খাইতে যাইবার সময় পঞ্চু ট্যাঁকে আফিং-এর কৌটাটি গুঁজিয়া নেয় অবশ্য। ছোট্ট একটি দানা পাকাইয়া চায়ের সঙ্গে কখন যে টুপ্ করিয়া

গিলিয়া ফেলে, নিকুঞ্জের বৌ তাহা টেরও পায় না। যদি টের পাইয়া মিনতি করিয়া উহাকে আফিং খাইতে বারণ করিত, তবে জীবনে কখনও আর তাহা ছুঁইত না।

এ কয়দিন যাত্রাগানের মহড়া দিতে গিয়া ও-ও সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। দলের নয়ান্ ঘোষ দয়া করিয়া পাতা ছাঁকিয়া একটুখানি লাল্‌চে জল গুলিয়া দিয়াছে, তাহাই শুধু গিলিয়াছে। সময় করিয়া একবার গেলে পারিত!

পঞ্চু বলিল,—বাঁকা বিষ্টু টেঁসেছে—ওর মড়া কেউ ছুঁতে চায় না, বলে: ম্যালেরিয়ায় ভুগে মর্‌তে জানি, সয়; এ-সব বিতিকিচ্ছি ব্যামো ডেকে আন্‌তে পার্‌ব না। যাবে আমার সঙ্গে শ্মশানে?

নিকুঞ্জ তাহার উরুতে একটা থাপড় মারিয়া বলিল,—যাব, যদি ভাই; দু' হাঁড়ি তাড়ি দাও।

সাম্‌নে একজনকে নেশা করিতে দেখিলে চোখে আপনা হইতেই ঘোর লাগে বুঝি। পঞ্চু কহিল,—দেব।

নিকুঞ্জ তখুনিই পঞ্চুকে জড়াইয়া ধরিয়া উহার তোব্‌ড়ানো গালে একটা চুমাই খাইয়া ফেলিল।

সরু দরজা দিয়া তক্তপোষ-শুদ্ধ মড়া বাহির হয় না,—শুধু মড়াটাকেই হেঁচড়াইতে-হেঁচড়াইতে পথের উপর টানিয়া আনা হইল। কাহার একখানা ভাঙা নড়বড়ে চৌকির উপর বিষ্টুকে শোয়াইয়া চারটা পায়ার ফাঁক দিয়া বাঁশ চালাইয়া কাঁধে তুলিয়া লইল প্রথম পঞ্চু আর নিকুঞ্জ।

তাড়ির লোভে আরো দু' তিনজন লোক জুটিয়া গেল। শুক্‌নো জিভগুলি বাহির করিয়া সবাই বার কতক উপরের ঠোঁটটা অসহিষ্ণু লুব্ধতায় চাটিতে লাগিল, —যেন কতদিন গলাটা ভিজে নাই, বুকের মধ্যে না-জানি কি উৎকট পিপাসা জমিয়া-জমিয়া কাঠ হইয়া গেছে।

গঙ্গারাম ত' এক লাফ দিয়া বিষ্টুর পা ছুঁইয়া বলিয়া ফেলিল,—দিনে পাঁচ বার করে' মর্—তোর কল্যাণেই তাড়ির এই ফিষ্টি আমাদের—

কেহ মরিলে যে এত বড় একটা আনন্দ-উৎসবের সুযোগ হইতে পারে তাহা ইহারা আগে কেহই জানিত না। হাপা বলিল,—মর্‌বার সময় গিন্নির কাছে যদি কিছু রেস্ত রেখে যেতে পারিস্ গঙ্গা, ত' এই শশ্মান-যাত্রীদের নামেই রেখে যাস্ তাড়ি খাবার জন্য।

শ্মশানে আসিয়াই তাড়াতাড়ি চিতা বানানো হইল। চিতায় বিষ্টুকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া হাত পায়ের হাড্ডিগুলি মট্‌মট্ করিয়া ভাঙিয়া মাথায় লাকড়ির এক বাড়ি মারিয়া ঘিলু বাহির করিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

পরে অঞ্জলি পাতিয়া সবাই তীর্থকাকের মত পঞ্চুর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল,—যেন কতকগুলি মাছরাঙা বৃষ্টির জন্য আকাশের পানে গলা বাড়াইয়া চাহিয়া আছে।

পঞ্চু সকলের করপুটে তাড়ি ঢালিয়া দিতে লাগিল। কুকুরের মত জিভ বাহির করিয়া একেবারে চটিয়া-পুঁছিয়া খাইতে লাগিল, যে কয়েক ফোঁটা মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাও শুকাইতে দিল না। নিকুঞ্জ একেবারে একটা মড়ার মাথার কঙ্কাল-করোটি তুলিয়া লইয়া বলিল,—দে, ঢেলে দে, পঞ্চু, একেবারে কাণায়-কাণায় ভর্‌তি করে'—

বাকিটুকু পঞ্চু ঢক্‌ঢক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিল।

নিকুঞ্জ যেন একটা দুর্ভিক্ষের দেশ হইতে উঠিয়া আসিয়াছে, দুই চোখে একটা উগ্র বীভৎস লোলুপতা,—যত খায়, ততই মরিয়া হইয়া উঠে। সেই কখন্ হইতেই যে গিলিতে সুরু করিয়াছে তাহার হিসাব নাই, উহার পিপাসা যেন কিছুতেই নিভিবে না।

চক্ষু দুইটা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, গায়ের জামা-কাপড় নেশার ঝোঁকে দাঁত দিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, বমি করিয়া মুখখিস্তি করিয়া কেলেঙ্কারির আর কূল-কিনারা রাখে নাই।

এখন একেবারে বেচাল্, বেহুঁস্ হইয়া মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। একটা ইঁটের কোণ্ লাগিয়া কপালটা ফাটিয়া গিয়াছিল, রক্ত গড়াইয়া-গড়াইয়া এখন ক্রমশ কালো হইয়া আসিতেছে,—বোধহয় প্রাণ আর নাই!

মধ্যাহ্নের রৌদ্র আকাশ ফাটিয়া গলিয়া পড়িতেছে।

চিতার তলে বেচারা বিষ্টুর কি অবস্থা কেহ তাহার খোঁজ লইবারও দরকার বোধ করিতেছে না, সবাই তাড়ি খাইয়া ধেই-ধেই করিয়া নাচিতেছে, টলিতেছে, যাহাকে খুসি গালিগালাজ করিতেছে,—তবে, কেহই বেসামাল্ হইয়া নিকুঞ্জের মত মাটি লয় নাই।

চিতা বুঝি প্রায় নিভিয়া আসিল, বেলাও গড়াইয়াছে, তবুও নিকুঞ্জ মাথা তুলে না।

জগু ভুমালি নিকুঞ্জের কানের কাছে মুখ নামাইয়া কহিল,—ওরে, আর খাবি?

কিন্তু এ কথার কে উত্তর দিবে?

মুহূর্তমধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, যাহা যেমন করুণ, তেমনি বীভৎস।

জগু একবারমাত্র নিকুঞ্জের বুকের উপর কান পাতিয়া বোধ করি নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুই পরীক্ষা করিয়া লইল, কিন্তু একেবারে একটুও দেরি না করিয়া মাতাল নয়ানের সাহায্যে নিকুঞ্জকে পাঁজাকোলে তুলিয়া লইয়া 'হরি বোল' করিয়া উঠিল। অন্য মাতালগুলি সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল : হরি বোল!

পঞ্চুও তখন মাটি লইয়াছে। ভিতর হইতে কে জিভটা টানিয়া ধরিতেছিল, বলিয়া উঠিল,—দে বেটাকে পুড়িয়ে, ছাতু খাইয়ে,—

কেহ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল না, সেটুকু জ্ঞানও নিশ্চয়ই কাহারও ছিল না,—নিকুঞ্জকে ধরাধরি করিয়া বিষ্টুর জ্বলন্ত চিতার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া সবাই অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

আগুনের আঁচে নিকুঞ্জের অবশ দেহ একবার মোচড় দিয়া উঠিল কি না, কে তাহার খবর রাখে? দুই অক্ষম দুর্বল হাত দিয়া জ্বলন্ত বহ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য কতক্ষণ নিষ্ফল প্রয়াস করিয়াছিল কিনা কেহ তাহা একবার খোঁজও করিল না। সবাই মিলিয়া আরো কতগুলি শুক্‌নো লাক্‌ড়ি গুঁজিয়া দিল মাত্র।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—এখুনিই কালো রাত্রি তাহার দুই ডানা মেলিয়া ধরিবে।

পঞ্চুর যখন জ্ঞান হইল, তখন রাত্রি গভীর। আকাশে মেঘ করিয়াছে। বিদ্যুৎ-বিদারণের মত চট্ করিয়া উহার সমস্ত কথা আগাগোড়া মনে পড়িয়া গেল,— নিকুঞ্জকে উহারা চিতার তলায় জোর করিয়া জাতিয়া জাঁতিয়া পোড়াইয়াছে, নিকুঞ্জ নিঃশব্দে সেই জ্বালা সহ্য করিয়াছে, একটি কথা কহিবারও সময় পায় নাই। ও-ও ত' পথের কিনারে বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়া ছিল, ভাগ্যিস্ উহাকেও কেহ কাঁধে করিয়া লইয়া যায় নাই!

পঞ্চু দৌড়িয়া শ্মশানে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—নিকুঞ্জ! নিকুঞ্জ!

কিন্তু সে-ডাকের উত্তর কোথায়? শ্মশানে তখনও তাড়ির হাঁড়িগুলি গড়াগড়ি যাইতেছিল। পঞ্চুর মনে হইল নিকুঞ্জ যেন উহার ডাক শুনিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিতেছে : আর একটু দিবি ভাই?

মুহূর্তমধ্যে সেই একখানা হাত যেন শত সহস্র হইয়া উঠিল। যেন একলা পাইয়া এখুনিই পঞ্চুর টুটি চাপিয়া ধরিবে। যেন কে বলিতেছে : বড্ড তেষ্টা ভাই, আরো দে, আরো দে—

পঞ্চু শ্মশান হইতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট্ দিল। আকাশে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু

একফোঁটাও জল হইল না। সমস্ত আকাশ যেন নিদারুণ তৃষ্ণায় রুদ্ধ হইয়া আছে।

কতদূর ছুটিয়াছে কিছুই ঠাহর নাই,—যত ছোটে, মনে হইতেছে নিকুঞ্জও যেন লম্বা-লম্ব, পা ফেলিয়া উহাকে অনুসরণ করিতেছে, ও আর-এক ঢোক তাড়ি খাইবার জন্য হাত পাতিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে। মনে হয়, নিকুঞ্জের পিছনে উহার বৌ এলোচুলে পাগলিনীর মত ছুটিতেছে, উহার পায়ের মল খসিয়া গেছে, বেণী বাঁধিয়া লয় নাই, হাতে একটা লণ্ঠন লইয়া আসিতেছে বুঝি। পঞ্চু দাঁড়াইল,—না কেহ নয়। আলেয়ার আলো হয় ত'।

পথের ধারে একটা দোকান দেখা গেল। মাচার উপর বসিয়া কুনো বুড়ি কুলো পাতিয়া এত রাত্রে ডাল বাছিতেছে। পঞ্চু কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, - তোর ঘরে একটু তাড়ি আছে ?

বুড়ি ভাবিল, চোর,— না হয় পাগল,— হাতের কাছের ঠ্যাঙাটা উঁচাইয়া ধরিল।

পঞ্চু ফের কহিল,— একটু জল দে, ভারি তেষ্টা পেয়েছে।

বুড়ি বোধ করি তাহার ছেলেকেই ডাক দিল,— পঞ্চু আর দাঁড়াইল না, ছুট দিল।

যেন এই অন্ধকার পার হইয়া ও কোন প্রভাতের পানে চলিয়াছে !

ভোর হইল। দুই একখানা গরুর গাড়িও চলিতে সুরু করিয়াছে। পথের ধারেই পঞ্চু আবার শুইয়া পড়িয়াছিল বুঝি। ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া যেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছে : যেন কে-একটি করুণ মেয়ে দুইটি কাকুতি-ভরা ভিজা চোখ তুলিয়া পঞ্চুর কাছে উহার সন্তলুপ্ত সিঁথির সিন্দুর ভিক্ষা করিয়াছে, দুইটি রিক্ত হাত দেখাইয়া সোনার কঙ্কণ যাচ্ঞা করিয়াছে,—যেন বলিয়াছে : 'সেই তুমি আমার পায়ের মল খুলিয়া রাখিয়াছিলে, এইবার পরাইয়া দাও।'—বলিয়া চাঁপার কলির মত সুকোমল দু'খানি পা-ও দেখাইয়াছে, তাহাতে আলতার সেই দাগটুকু আর নাই, মুখর মল-ও স্তব্ধ হইয়া গেছে, ধুলায় খসিয়া পড়িয়াছে বুঝি। ঠোঁটের ফাঁকের সেই হাসিটি চুরি গেছে,—শাড়ির পাড়টিও কান্নায় ধুইয়া-ধুইয়া শাদা হইয়া গেল।

পঞ্চু সেই মেয়েটিকে চিনে। তাহার নামের বাঁ দিকে 'নি' বসাইলেই তাহার স্বামীর নাম !

কুঞ্জকে পঞ্চু কি বলিয়া মুখ দেখাইবে ? অভাগিনী হয় ত' এখনো এই খবর পায় নাই। কাল রাতেও দরজায় খিল না লাগাইয়া অভিমানিনী, নিরুদ্দেশ স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে-থাকিতে মাটির উপরই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শিয়রের কুপিটা জ্বলিয়া-জ্বলিয়া নিভিয়া গেছে, তবুও স্বামী ফিরিয়া আসে নাই। কুপির

আলোতে উদ্ভাসিত কুঞ্জর সেই ঘুমন্ত সুকুমার মুখখানা কল্পনা করিয়া পঞ্চু আপন হৃদয়ের মধ্যে একটি অপার বিরহ অনুভব করিল।

সমস্ত গ্রাম ঘুম হইতে গা-মোড়া দিয়া উঠিয়াছে।

বিষ্টুর মরার পরদিনই সতু স্যাক্‌রা উহার ব্যবসাটা বেশ হাত ড়াইয়া লইয়াছে,—শোনা যায়, রাতারাতিই নাকি স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বিষ্টুর বৌ সতুর পিছু-পিছু বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে; ঘর দোর নিকাইয়া জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া নোংরা বিছানাপত্র পোড়াইয়া আবার সব ফিট্‌ফাট্ করিয়া তুলিয়াছে। উহার সিঁদুরটুকু মুছিয়া ফেলিবারও অবসর জোটে নাই।—সতুই উহাকে একজোড়া নতুন শাড়ি কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে, সঙ্গে একটা সিঁদুরের কৌটাও বুঝি।

সকাল বেলা উঠিয়াই সতু বিষ্টুর দাওয়ায় বসিয়া হাতুড়ির খুট্‌খুট্ করিতেছিল। রাস্তায় পঞ্চুকে দেখিয়া বেশ উৎফুল্ল হইয়াই ডাক দিল।

—আরে, নিকুঞ্জ নাকি মরেছে?

পঞ্চু যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে এম্‌নি ভান করিল। বলিল,—মাইরি? কি করে' মর্‌ল?

সতু কহিল,—ছিল পাঁড় মাতাল, তাড়ি খেয়ে-খেয়েই প্রাণটা দিলে। এতদিনে শিক্ষা হ'ল—

পঞ্চু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাড়ি খাইয়াই মরিয়াছে,—জগু নয়ান গ্রামে তাহা হইলে এই গুজবটাই রটাইয়া দিয়াছে। সবাই মিলিয়া যে সংজ্ঞাহীন দুর্বল নিকুঞ্জকে ধরিয়া জ্বলন্ত চিতার চুলার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া পিশাচের মত তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছে, সেই কথাটা চিরকালের মত ঢাকা পড়িয়াই রহিল। তবু, যাক্, পঞ্চুর বুক হইতে প্রকাণ্ড একটা পাথর নামিয়া গেছে,—ও এখন বেশ সহজে নিশ্বাস টানিতে পারিতেছে। হ্যাঁ, নিকুঞ্জের শিক্ষা হইয়াছে বৈ কি।

সতু কি ভাবিয়া হঠাৎ নিজেকে সংশোধন করিয়া লইল। কহিল,—কেন তুই ত' ছিলি শ্মশানে। খুব তাড়ি টেনেছিল বুঝি—

বুকে বল পাইয়া পঞ্চু বলিতে লাগিল,—সে কি একটু-আধটু? হাঁড়ি-হাঁড়ি। কত বারণ কর্‌লাম: অত খাস্ নি, নিকুঞ্জ! আমার কথা কি আর শোনে? মরণদশা যার হয়েছে তার অম্‌নিই বেজাত খিদে হয়। গেল ঠাণ্ডা হ'য়ে,—একবার ঠাণ্ডা হ'লে তার আর কি চিকিৎসা চলে?—যতই কেন না কব্‌রেজ ডাক—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শূন্যে তাকাইয়া পঞ্চু ধীরে কহিল,—ওর বাড়ির সব খবর পেয়েছে?

সতু তাহার দাঁতগুলি বিকশিত করিয়া ধরিল। দাঁতগুলি না বুজাইয়া কহিল,—বাড়িতে ত' এক পিসি,— বাপের পিস্তুত বোন্—

পঞ্চু কহিয়া উঠিল,—কেন, বৌ?

সতু উত্তর দিল না। পিছন হইতে বিষ্টুর ওরফে সতুর বৌ নৎ নাড়িয়া বলিল,—সে ত' তুমিই ভালো করে' জান বাপু, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ।

—তার মানে?

—যেন ন্যাকা! ঘরে গিয়েই খবর দাও গে যে কাঁটা খসেছে। আর কেন?

পঞ্চু বিমূঢ়ের মত বিষ্টুর বৌর দিকে চাহিয়া রহিল, মুখে কোন কথা জোগাইল না।

সতু বলিল,—পর্শু রাতে বৌটা বাড়ির বা'র হ'য়ে গেছে। সবাই বল্‌ছে তুইই ওকে সরিয়েছিস্—

পঞ্চু ধুপ্ করিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল। উহার চোখের সন্মুখে সমস্ত পৃথিবী যেন টল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছে, ভোরের আলো যেন কে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিল।

বিষ্টুর বৌ মুখঝাম্‌টা দিয়া উঠিল,—আর অত নাটুকেপনা না কর্‌লেও চল্‌বে। দিনরাত্রি বৌটার সঙ্গে গুজ্‌গুজ্—আমরা দেখি নি? শুনি নি আমরা? মেয়েটাকে বোকা পেয়ে খুব হাতসাফাই করে' নিলে যা হোক্! ও মা, এ যে একেবারে আস্ত ডাকাত!

সতু বলিল,—সেই দুঃখেই ত' নিকুঞ্জ তাড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করল। কম ভালোবাসত বৌটাকে?

বিষ্টুর বৌ বলিল,—ঢাক্ ঢাক্ গুড়্-গুড়্ কতদিন আর চাপা থাকে,—একদিন বেরিয়ে পড়বেই পড়বে।

পঞ্চু এইবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষু দুইটা পাকাইয়া কহিল,—তোর মুখে পোকা পড়বে, হারামজাদি,—কি সতী রে আমার!

বলিয়াই পঞ্চু বিষ্টুর বৌর অনর্গল গালিগালাজের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া পথ ভাঙিতে স্বরু করিল।

রৌদ্র যতই চড়া হইতে লাগিল পঞ্চুর মনে হইল ব্যাপারটা আগাগোড়া স্বপ্ন! কাল রাতে বেশী নেশা করার জন্য হয় ত' মাথাটা ঠিক নাই। কুঞ্জকে ও ঘরের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে এ ব্যাপারটা যতই মিথ্যা হোক্ না কেন, ইহার মধ্যে কোথায় যেন একটু মোহ রহিয়াছে। সত্যিই যদি কুঞ্জ মাথায় ছোট সেই একটুখানি ঘোম্‌টা লইয়া দু'টি পায়ে অসীম লজ্জার বেড়ি জড়াইয়া উহার ঘরে আসে—

আপন বুকের মধ্যে কাহার দু'গাছি মলের কুণ্ঠিত লাজুক ঝঙ্কার শোনা যায়,—পঞ্চু আবেশে অভিভূত হইয়া গেল।

ব্যাপারটার মধ্যে বিশ্বাস করিবার কিছুই নাই,—তবুও অন্যমনে হাঁটিতে-হাঁটিতে পঞ্চু কখন্ যে নিজের গাঁয়ের ছোট্ট ঘরখানির দাওয়ায় আসিয়া উঠিয়াছে, খেয়ালই ছিল না। কেবলই মনে হইতেছিল কে যেন দু'খানি হাত দিয়া দরজা ধরিয়া উহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহাকে দেখিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া চোখ দু'টি নামাইয়া লইবে!

সেই কথাই ভাবিয়া হয় ত' পঞ্চু এতটা পথ বড়-বড় কদম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। বুকের ঘাম মুছিয়া লইয়া পঞ্চুর ইচ্ছা হইল গলায় মধু ঢালিয়া স্বরটা গানের সুরের মতই মোলায়েম করিয়া একবার 'কুঞ্জ' বলিয়া ডাকিয়া উঠে। তাহা হইলেই যেন সেই গৃহ-পলাতকা বধূটি কণ্ঠস্বরে অনুরূপ মধুরতা নিয়া সাড়া দিয়া কাছে আসিবে।

পঞ্চু কত কথাই ভাবিয়াছিল;—পথের পাশে একটি কনক-চাঁপা গাছ হইতে কয়েকটি ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল, কুঞ্জ-র খোঁপায় গুঁজিয়া দিবে।

উত্তরের ভিটায় ছোট একখানি ঘরে—দক্ষিণে একটা অনাবাদি জমি বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে, তাহারই প্রান্ত ঘেষিয়া নদীটি একটি চারু রজতরেখার মত আঁকা রহিয়াছে। পূবের ভিটায় আর একখানা ঘর আছে, সেই কোন্ এক সালের ঝড়ের বাড়ি খাইয়া সেই যে ত্রিভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল—তাহার চেহেরা আর বদ্লায় নাই। সেই ঘরেই যাত্রাদলের সখা ও সখীরা পার্টের মহড়া দেয়, গাঁজা টেপে, তাড়ি গিলে আর তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওড়ায়,—নেশায় গড়াগড়ি দিতে দিতে সেই ঘরেরই ধুলায়-ধুলায় ধূসর হইয়া উঠে।

উঠানের ধারে কতকগুলি কলাগাছ,—পঞ্চু নিজ হাতেই পুতিয়াছিল। কলার পচা পাতা সমস্তটা উঠানে একেবারে একহাঁটু হইয়া আছে, কবে যে ঝাটা পড়িবে, কেহই বলিতে পারে না। সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে পঞ্চু আপন মনে হঠাৎ অস্ফুটস্বরে ডাকিয়া উঠিল,—কুঞ্জ!

একটা চিল সাম্নের মাঠের উপরে ছায়া ফেলিয়া উড়িয়া গেল।

পঞ্চুর আর ভুইটা ফুটাইয়া লইবার উৎসাহ ছিল না। দাওয়ার উপরেই শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যাসন্ধিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙিয়াই পঞ্চুর মনে হইল ঘরের মধ্যে কে যেন অতি ধীরে-ধীরে চলাফিরা করিতেছে। কাহার বসনের শিথিল আঁচলের একটু খস্খস্ আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে,—পঞ্চু গা ঝাড়িয়া লাফ দিয়া উঠিল। কুঞ্জ আসে নাই ত'?

কিন্তু ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখা গেল না। সেই কবে যে দুটি ভাত খাইয়া গান গাহিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর এটো থালা ও বাটিটা আর মাজা হয় নাই।

কতগুলি উদ্বৃত্ত ভাত ছিল, তাহা এতদিনে শুকাইয়া কর্‌করে, কাঁকরের মত হইয়াছে,—তাহারই লোভে কয়েকটা ইঁদুর সোল্লাসে থালার উপর দিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল।

পঞ্চু ঘর দোর এলো রাখিয়াই বাহির হইয়া গেল। চুরি যাইবার উহার কি-ই বা আছে? কুঞ্জ ত' আর পথ ভুলিয়া উহার ঘরে আসে নাই!

রাস্তা চলিবার সময় পঞ্চুর গান গাওয়াটা বহুকালের অভ্যেস। কিন্তু আজ গলার মধ্যে সমস্ত গান যেন কান্নার মত উথলিয়া উঠিতেছে। কোনো ভাষাই তাহার নাই।

পঞ্চু আসিয়া নিকুঞ্জের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইল। কতগুলি স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া তখন অনুচ্চকণ্ঠে কিসের একটা জটলা পাকাইতেছে।

পঞ্চুকে দেখিবামাত্র পিসি একেবারে রণচণ্ডী হইয়া উঠিলেন। মানুষের কণ্ঠস্বর যতদূর উঠিতে পারে তাহারও এক পর্দা চড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন,—এই এসেছে হারামজাদা! ধর্‌ ব্যাটাকে, ধর্‌—

কেহই ধরিল না বটে, তবে ঘিরিয়া ধরিল।

পঞ্চু বলিল,—কি হয়েছে পিসি?

পিসি বলিলেন,—কি হয়েছে পিসি! আমার সর্বস্ব লুট করে', আমার মুখে, কুলে কালি মাখিয়ে—বেটা বজ্জাত, ছুঁচো, গেঁজেল,—আবার বলা হচ্ছে, কি হয়েছে পিসি! আসুক নিকুঞ্জ, তার রাম-দাটা দিয়ে তোর মুণ্ডটা দু'ফাঁক করবে, তবে আমার নাম! নিজে যেন হওয়া-হওয়ির কিছু জানেন না। দে না তোরা বেটাকে চড়িয়ে থেৎলা করে'—

নিকুঞ্জের মৃত্যুর খবরটা পিসিকে এখনও শোনানো হয় নাই ভাবিয়া পঞ্চু একটু আশ্বস্ত হইল। তবে, সত্যই হয়তো কুঞ্জ ঘরে নাই, তাই পিসি এত মুখ খিঁচাইতেছেন।

পঞ্চু কহিল, শুনলাম কুঞ্জ-বৌঠানকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না,—সত্যি?

পিসি এইবার একটা অশ্রাব্য গালি পাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তুই-ই ত' বৌটাকে হাবাগোবা পেয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে সট্‌কেছিস্‌। বৌ আমার অতি লক্ষ্মী, মুখে রা-টি পর্যন্ত কাড়ে না। দে, আমার বৌকে ফিরিয়ে দে, লক্ষ্মীছাড়া।

বলিয়া পিসি আর কান্না চাপিতে পারিলেন না।

পঞ্চু বলিল,—আমি তাকে নিতে যাব কেন ? দেখে এস না আমার ঘর-দোর, —শূন্য পুরী, আগের মতই খাঁ-খাঁ করছে।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিল,– হ্যাঁ, এখন আর ঘরের মধ্যে আছেন কি না, কোন্ দেশে চালান করে' দিয়েছে কে জানে ?

পঞ্চু ফের কহিল,—তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি গাল্‌ছি পিসি আমার কুঞ্জবৌঠানের চুলটি পর্যন্ত ছুঁই নি ; দেখি নি।

সেই লোকটাই বোধ করি বলিয়া উঠিল, · ছুঁতে হ'বে কেন, হাওয়ায় উড়ে' বিলেত চলে' গেছে।

পিসি পঞ্চুর কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য মনে করিলেন না। হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—দে, আমার সোনার চাঁদ বৌকে ফিরিয়ে দে, পোড়ারমুখো। নিকুঞ্জ ফিরে এলে প্রাণ খোয়াবি অকালে, দে, ভালো চাস ত' এখনো পাঠিয়ে দে।

—আমি নিই নি। যদি নিতাম, যদি নেবার মত মনে কর্‌তাম, ত' আর ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিতাম না। আমার ভাঙা ঘরে, এই গাঁয়ের সব্বাইর চোখের ওপর তাকে নিয়ে বাস কর্‌তাম। তোমাকেও নিয়ে যেতাম, পিসি। সেই সাহস এই পঞ্চুর আছে।

বলিয়া পঞ্চু সমবেত জনতার দিকে একটা ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

পিসি শোকে একেবারে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন,—তুই নিস্ নি ত', কে নিয়েছে হতভাগা ? দিন রাত বৌটার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ ফুটুরফাটুর,— বুড়ি বলে' কি আমার চোখ এড়িয়ে যাবি, হারামজাদা ? নিকুঞ্জটা ভালো লোক ভেবে বড্ড নাই দিয়েছিল। আসুক্ একবার ফিরে, তোর গলাটা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাট্‌লে তবে আমার জ্বালা যাবে।

পঞ্চু কহিল,—কিন্তু তোমার বৌকে ত' তাতে ফিরে পাবে না, পিসি। আর, ধর, যদি আমি তোমার বৌকে ফিরিয়ে এনে দি, তুমি তাকে ফের ঘরে নেবে ?

পিসির হইয়া ভিড়ের মধ্য হইতে কতগুলি কণ্ঠ একসঙ্গে জবাব দিল,—কক্‌খনো না।

—তবে আমি তাকে ফিরিয়ে দেব না। আমি তাকে নিয়ে অনেক দূরে—শহরে চলে' যাব। তোমাদের যা খুসি তা কর। আদালত খোলা আছে।

বলিয়া পঞ্চু হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শেষের কথাগুলি এমন জোর করিয়া বলিয়া গেল যে, কুঞ্জকে ও-ই সরাইয়া নিয়াছে, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কুঞ্জকে চুরি করিয়া নিয়া উহার

লজ্জা বা আতঙ্ক দূরের কথা, বরং আনন্দ ও অহঙ্কারে যেন বুকটা ফুলাইয়া লইয়া গেল।

পিসি বলিলেন,—ধর্ না সবাই ব্যাটাকে চেপে। ব্যাটাকে সবাই মিলে দে না চ্যাপ্টা করে'—

কেহই আগাইল না। একজন বলিল,—ওরে বাবা, ওর পিছনে প্রকাণ্ড দল, গাঁজার কল্‌কে ছুঁড়েই সমস্ত গাঁ খুন করে' দিতে পারে। কে যাবে ওকে ঘাঁট্‌তে? তার চেয়ে আদালত কর, পিসি।

পিসি মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—তোরা এখানে সব দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? একটুখানি এগিয়ে দ্যাখ না আমার নিকু ফিরে আস্‌ছে কি না। সেই যে রাখালদাস হারামজাদার ছেরাদ্দে গেল,—আর ফির্‌বার নামটি নেই। তোরা যা না বাবা ভোঁদা, গোব্‌দা,—আমার নিকুঞ্জকে কোন রকমে একটা খবর দে—

নিকুঞ্জর মৃত্যুর খবরটা বাহির করিয়া দিবার জন্য একজনের জিভের ডগায় বোধ করি সুড়সুড়ি লাগিতেছিল, পাশ থেকে আরেকজন চাপা গলায় বলিয়া উঠিল,—থাক্, বুড়ি দু'দু'টো শোক সাম্‌লাতে পার্‌বে না।

পিসি ডান হাতের মুঠিটা শক্ত করিয়া চাপিয়া মাটির উপরেই এক কিল বসাইয়া কহিলেন,— আসুক্ নিকুঞ্জ! ঐ বাঁদর বস্‌মায়েসটার মড়া মুখ না দেখ্‌লে আমি এই বাড়িতে এক দিনের জন্যও জল ছোঁব না। আমি এই মা-বসুমতীকে ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌ছি।

কিন্তু তবু, নিকুঞ্জ আসিল কই?

নিকুঞ্জ যেন তাহার বৌকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিরকালের পথে বিবাগী হইয়া বাহির হইয়া গেছে।

পঞ্চু ভিড় হইতে খানিকটা দূরে সরিয়া আসিয়া একটা আমগাছের তলায় একটি নারীমূর্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অস্পষ্ট অন্ধকারে তাহাকে ভালো করিয়া চেনা না গেলেও পঞ্চুর মন কি একটা অভাবনীয় প্রতীক্ষায় এতটুকু হইয়া আসিল। কতদিন পঞ্চুকে আগাইয়া দিতে কুঞ্জ এই সিঁদুরে আমগাছটি পর্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে, তাহার পর যতক্ষণ দেখা গিয়াছে ততক্ষণ কুঞ্জ এই গাছের ছায়াটি ত্যাগ করে নাই। আজ আবার কি পঞ্চুর সঙ্গে যাইবার জন্যই কুঞ্জ সেই গাছতলাটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে?

পঞ্চু উৎসুক হইয়া চাহিয়া দেখিল—হারানি। নিশি লায়েক-এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,—পাশের বাড়িতেই থাকে। কতদিন কুঞ্জ ও পঞ্চুর গল্প করিবার ফাঁকে এই

ব্রীড়াবনতমুখী মেয়েটি একটা ঝুড়ি করিয়া একখানি কুমড়ার ফালি, পুঁইলতার কয়েকটি ডগা, কিছু তরি-তরকারি নিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া অল্প একটু হাসিয়া বিদায় নিয়াছে। পঞ্চুকে দেখিয়া মেয়েটি লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িত দেখিয়া কুঞ্জ বলিত,—ইনি আমার ঠাকুর-পো রাণী, তোর দাদা হন্। কেষ্টঠাকুর।

মেয়েটি কেষ্টঠাকুরের নাম শুনিয়াই হয় ত' পঞ্চুর পায়ের খানিকটা দূরে তাড়াতাড়ি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঢিপ্ করিয়া এক পেন্নাম ঠুকিয়া দিয়াছিল।

সেই মেয়েটির কাছে থামিয়া পড়িয়া পঞ্চু হঠাৎ প্রশ্ন করিল,—কোথায় গেল কুঞ্জ?

হারানি মাথায় ঘোম্‌টা না টানিয়া দিয়াই কহিল,—রাত আটটা পর্যন্ত ত' আমার সঙ্গে কত গল্প করে' গেল। নিকুঞ্জ-দার কথা তুলে বললে,—আজ নিশ্চয়ই উনি ফিরে আসবেন, চা'লের মধ্যে সেই যে কাঁচা আতা লুকিয়ে রেখেছিলাম তা পেকেছে,—উনি এলেই ওঁকে খেতে দেব। উনি আস্‌বেন বলে' —এই ছ্যাখ্, পায়ে কেমন টক্‌টকে লাল টাট্‌কা আল্‌তা পরেছি।—এমন খোঁপা বাঁধতে পারিস্, উনুনমুখি? বলে' আমাকে খোঁপাটাও দেখালে। আমি ওকে এইখান পর্যন্ত আলো নিয়ে এগিয়ে দিয়ে গেলাম। তারপর পিসি ত' বল্লে ঘরে গিয়ে শুয়েছে, —কিন্তু ভোরবেলায় উঠেই ওকে আর পাওয়া গেল না। মাঝরাতে উঠে' চলে' গেছে। কেউ হয় ত' বা জোর করে' ডাকাতি করে' নিয়ে গেছে, হাত ধরে' গুটি-গুটি বেরিয়ে পড়্‌বার মত মেয়ে সে নয়। পিসি বলে,—জোর করে' ছিনিয়ে নিয়ে গেলে চেঁচামেচিতে নিশ্চয়ই পিসির ঘুম ভাঙত। ছাই ভাঙত। সর্ষের তেল নাকে ঢেলে কুম্ভকর্ণের মত এমন লম্বা-চওড়া এক ঘুম দেয় যে কানের কাছে সমুদ্র এসে না গর্জালে বুড়ি পাশ ফেরে না। তা ছাড়া হয় ত' বা ডাকাতরা ওকে চেঁচাতেই দেয় নি।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হারানি কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,—সত্যিই,—তুমি কি জান না, পঞ্চু-দা?

পঞ্চু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—যদি বল্‌তাম জানি, তা হ'লে সেটা তোমাদের বেজায় লজ্জার কারণ হ'ত, কিন্তু আমার সুখের আর কূলকিনারা থাক্‌ত না। অত সুখ আমার কপালে নেই, দিদি।

হারানি ভিড় হইতে আলগা হইয়াই সমস্ত ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখিয়া লইতেছিল। এখন ভিড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—মুখে-মুখে কুৎসা-রটনার আর বিরাম নাই। বেহারিই ছিল তাহাদের পাণ্ডা, যেমন ভীরু তেম্‌নি মিথ্যুক।

বলিতেছিল,— পঞ্চুর ঘরটায় একদিন চুপি-চুপি আগুন ধরিয়ে দেওয়া চাই, ভোম্বল। দেখ্‌ব, বেটা চুরি-করা বৌ নিয়ে সবাইর চোখের সাম্‌নে পথের ওপর নেমে আসে কি না।

ঠিক আমগাছ তলাটিতেই হারানি ও পঞ্চুর মাঝখানে কে একজন আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে চক্ষু দুইটা বড় করিয়া মেলিয়া ধরিয়া দেখিল—নিশি লায়েক্ ঠ্যাং দুইটা ছড়াইয়া কট্‌মটাইয়া চাহিয়া আছে।

চক্ষের পলক পড়িবারও বিলম্ব সহিল না,—নিশি হারানির সমস্তগুলি চুল গোছা করিয়া বাঁ হাতের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ধাঁ করিয়া তাহার গালে এক নির্মম চড় কসাইয়া দিল। কহিল,—কা'র সঙ্গে কথা কইছিস্, শালী? কথা কইবার আর লোক জোটেনা তোর?

হারানি কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল,—আমার দাদা হয়।

—তোর ভাতারের শালা হয়। বলিয়া প্রহারের অভিনবত্ব দেখাইবার জন্যই হয় ত' নিশি উহার হাঁটুটাকে দুম্‌ড়াইয়া চোখা করিয়া লইয়া ম্যালেরিয়া-রুগ্ন আসন্নপ্রসবা কঙ্কালসার মেয়েটার পাঁজ্‌রার উপর ঘন-ঘন গুঁতা মারিতে লাগিল। পরে দুই হাত দিয়া হারানির মাথাটা আঁকড়িয়া ধরিয়া গাছটার সঙ্গে ঠুকিয়া দিতে-দিতে কহিল,— ঘরে তোর মন টেকে না কেন? কেন বেরিয়ে এলি রাত্রে?

বলিয়া হারানির পিঠে এমন এক লাথি মারিল যে হারানি আর দাঁড়াইতে পারিল না।

পরে ধীরে-ধীরে উঠিয়া হারানি রাজ্যজোড়া লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা লইয়া ঘরের দিকেই বোধ হয় পা বাড়াইল।

বেহারি মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল,—অমন শাসন না করলে কি মেয়েমানুষ সায়েস্তা হয়? নিকুঞ্জ রেখেছিল বৌটাকে মাথার মণি করে,' বৌটা কালনাগিনী হ'য়ে মাথায়ই ছোবল মারলে।

নিজের চোখের সাম্‌নে এই ব্যাপারটা দেখিয়া পঞ্চুর সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ করিয়া ফুটিতেছিল। কিন্তু এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে উহার প্রতিবাদের অর্থ কোথায়? তবু কিছু একটা না কহিলে উহার কিছুতেই শান্তি হইবে না।

ও বলিয়া ফেলিল,—তোমার সইয়ের জন্য চিন্তা কোরো না, হারু-দিদি। কুঞ্জ আমার কাছেই আছে, আর সুখেই থাক্‌বে। এস না, দাও না বেহারী, ঘরে আগুন লাগিয়ে।

সকলেই চমকিয়া উঠিয়া পঞ্চুর মুখের দিকে তাকাইল। হারানিও একবার পিছন ফিরিল হয় ত'। সেই কণ্ঠস্বরে এতটা দৃঢ়তা ছিল যে অবিশ্বাস করিয়া

তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। কিন্তু এত বড় পাপ করিয়া এত গর্ব যে করিতে পারে, তাহার সঙ্গে কে আঁটিবে?

পঞ্চু আর দাঁড়ায় নাই। ঝোঁকের মাথায় এত বড় কথাটা বলিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার মিথ্যা যে কত বড়, তাহার ব্যর্থতা যে কত অপরিমেয় তাহা ভাবিয়া পঞ্চুর পরিতাপ না হইয়া মর্মান্তিক দুঃখ বোধ হইল। লোকের সমুখে এত বড় মিথ্যার শূন্যতা বহন করিয়া ও বেড়াইবে কেমন করিয়া?

কিন্তু যেখানেই যাক্, কুঞ্জকে ও ফিরাইয়া আনিবেই।

কুঞ্জ উহার, সমস্ত গাঁয়ের লোক তাহা স্বীকার করিয়াছে,—বাছিয়া-বাছিয়া উহাকেই কুঞ্জর পরম-প্রেমিকের সিংহাসনে বসাইয়া মাথায় কলঙ্ক-মুকুট দিয়া উহাকে সবাই রাজা বানাইয়াছে ভাবিতে পঞ্চুর গর্বের আর শেষ ছিল না!

পঞ্চু তাড়াতাড়ি চলিতেছিল। সবাইর সঙ্গে-সঙ্গে উহারও বিশ্বাস করিতে ভারি ইচ্ছা হইল যে হয় ত' কুঞ্জ উহারই গৃহের কোন্ একটি অলক্ষিত কোণে অধোমুখে বসিয়া আছে। ভালো করিয়া খোঁজে নাই বলিয়া দেখা পায় নাই। চট্ করিয়া পঞ্চুর মনে পড়িয়া গেল,—পুবের ভিটায় যে-ঘরটা দিবা-রাত্র তালা দেওয়া থাকে সেইটা খুলিয়া সেখানে কুঞ্জকে খোঁজা হয় নাই।

কিন্তু যে-ঘর তালা-বন্ধই থাকে তাহাতে ঢুকিবে কেমন করিয়া?

তবু—

পঞ্চু বাড়ি আসিয়া প্রথমেই সেই ঘরটা খুলিয়া ফেলিল। কেহই নাই। শুধু হার্মোনিয়ামের বাক্স বেহালা করতাল—ঐ ধারে পোষাক ও চুলের প্যাট্রাটা,—কবে সেই তাড়ি খাওয়া হইয়াছিল, তাহারই একটা ভাঙা হাঁড়ি পড়িয়া আছে। পঞ্চু দরজা বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে আসিল। কই. সেখানে ত' কেহ তাহার জন্য বিছানা পাতিয়া রাখে নাই।

এঁটো বাসনগুলি তেম্‌নিই রহিয়াছে।

পঞ্চু ধীরে-ধীরে তাহার লণ্ঠনটা জ্বালাইয়া লইল। বাঁশের মোটা লাঠিটা ডান হাতে লইয়া নদীর পাড় বাহিয়া চলিতে লাগিল।

কুঞ্জকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই। তাহার সিঁথির সিঁদুরটুকু কখনই মুছিয়া ফেলিতে দিবে না।

আকাশে সন্ধ্যা হইতেই মেঘ জমিতেছিল,—মাথার উপরের উদ্যত বাধায় দৃক্‌পাত না করিয়া পঞ্চু আগাইয়া চলিয়াছে। কত ঝড়-জঙ্গল, কত ধানের ক্ষেত পার হইয়া, কত ডোবার ধার দিয়া ও চলিয়াছে। তাহার পথ যেন আর ফুরাইবার

নহে। কোথাও একটি অস্ফুট অথচ পরিচিত শব্দ শোনা যায় না। সমস্ত পদচিহ্ন ধূলায় ও অন্ধকারে মিশিয়া গেছে।

রাত যত বেশি হয় পঞ্চুর চলার উদ্যম যেন ততই বাড়িতে থাকে। লণ্ঠনটা একবার নাড়িয়া দেখে, সমস্ত রাত্রি জ্বলিবার মত তেল আছে কি না।

ঘরের মধ্য হইতে কোথাও কোন শব্দ শুনিলে পঞ্চু বেড়ায় একটুখানি কান রাখে। পরে ভাবে, কুঞ্জর গলা এর চেয়ে আরো মিষ্টি, এ কুঞ্জ নয়।

হঠাৎ দিগ্বিদিক ধূলায় অন্ধ করিয়া একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। পঞ্চুর লণ্ঠনের শিখাটি নিবিয়া গেল।

পঞ্চু লণ্ঠনটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া অসহায়ের মত মাটিতে বসিয়া পড়িল।

ঝড়ের সর্প তখন আকাশে কোটি-কোটি ফণা তুলিয়া দংশনলোলুপ জিহ্বা মেলিয়া কিলবিল করিতেছে।

সেই হইতেই যাত্রা-দলের নাম নিকুঞ্জ যাত্রা-পার্টি।

যাহাকে একদিন বাঁচিবার অবকাশটুকু না দিয়া ভুল করিয়া চিতায় ঠেলিয়া দিয়াছিল, এমনি করিয়া তাহারই স্মৃতিরক্ষা করিতে চায় বুঝি! যে অবিচার করা হইয়াছে ইহা যেন তাহারই একটা সহজ প্রতিবিধান। যতদিন বাঁচিবে, পঞ্চু নিকুঞ্জকে ভুলিবে না,—আর কাহাকেও ভুলিতে দিবে না।

শুধু কি তাহাই?

তাহার সঙ্গে আরো একখানি মুখ মনে পড়ে,—ফোলা-ফোলা গাল দুইটির চাপে চক্ষু দুইটি ছোট হইয়া বসিয়া গেছে, ছোট একটুখানি কপাল, চিবুকটি চোখা হইয়া মুখের শ্রী বাড়াইতে সহায়তা করে নাই, ঠোঁট দুইখানিও ভারি-ভারি! খোঁপাটা খুব টানিয়া মাথায় উঁচু করিয়া বাঁধিত, ঘাড়ের উপর একটা জড়ুল ছিল,—পঞ্চু সব মনে করিতে পারে।

নিকুঞ্জের নামের মাঝেই তাহার নামটি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

তাই হয় ত' বন্ধুর স্মৃতিতে এত সৌরভ!

দামিনীর কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নদীর কাছাকাছি পাটক্ষেতের পাশে বসিয়া পঞ্চু অন্ধকার রাত্রে এই সব কথাই ভাবিতেছিল।

এত রাত্রেও কে একটা ছেলে নেংটি পরিয়া নদীতে নামিয়া জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। দূরের চরে এতক্ষণ একটা বাতি জ্বলিয়া এখন নিবিয়া গেল। ঘোলাটে একটুখানি মরা জ্যোৎস্না নদীর উপরে পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

উহার তাড়ি-খাওয়া মুখের উপর দামিনী অদম্য আগ্রহভরে তাহার সুকোমল মুখখানি চাপিয়া ধরিয়াছিল—সেই দুর্বিসহ সুখের মাদকতা পঞ্চুর সমস্ত দেহকে যেন একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আজ রাত্রে চোখের ঘুমটুকু যেন দামিনীর চুম্বনের চিহ্নে মুছিয়া গেছে। পঞ্চু বসিয়া-বসিয়া নিজের বুকের মধ্যে কালো রাত্রির অসহ্য নিঃশব্দতা অনুভব করিতেছিল।

একবার ভাবিল, দামিনীকে যদি ও ঘরে লইয়া যায়, তবে ওর ঘর কি সহসা আকুল কলহাস্যে মুখর হইয়া উঠে না?

যে কুঞ্জকে ও একদিন নিজের গৃহকোণে শুচিস্মিতা গৃহলক্ষ্মীর বেশে কামনা করিয়াছিল, সেই কুঞ্জই কি হঠাৎ আজ তাহার নাম বদলাইয়া ফেলিতে পারে না? দামিনীর বিদ্যুদ্দীপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লীলা-বিভ্রমের মাঝে কি সেই লাজুক, ভীরু বধূর সুমধুর বিষণ্ণতাটি ফুটিয়া উঠিবে না? দামিনীর আয়ত কামনাকাতর চোখের দৃষ্টিতে সেই বধূটির চোখের ঔদাস্যটি কি মুছিয়া যাইবে?

যাহাকে পাইবে, তাহার মধ্যে যাহাকে পায় নাই, তাহার স্বপ্নস্মৃতি কি পুনরায় রঙিন হইয়া দেখা দিবে না? যে পলাতকা একদিন পথে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সেই কি এই অবেলায় আশ্রয়ের আশায় তাহার বাড়ির উঠানে পা দিয়াছে?

নদীর পার ঘেঁষিয়া একখানা ডিঙি চলিয়াছে। মাঝি লগির এক-একটা খোঁচা মারিতেছে আর দেশী ভাষায় গান গাহিতেছে:

"কে রে পাঠাইল ভবে তোরে—
যাইতে বইলাছে।
অনুরাগের মাঝি এনে শক্ত করে' দিয়ো পাড়ি,
ওরে আমার মন-বেপারি,
তুফান ছাইড়াছে ভারি (মনা) বিনা বাতাসে।
ভবেতে আসিয়া মনা,
মরণ-কথা স্মরণ হয় না
ধিন্ তা না না, ধিন্ তা না না,
ঢেউ চইলাছে।
ভবে এসে ছিলাম ভাল,
গান গাইয়াই দিন ফুরাইল,
টেলিগেরাপে খবর আইল (মনা)
সন্ধ্যা অইয়াছে।"

হঠাৎ পঞ্চুর চোখ ধাঁধাইয়া গিরির গেরুয়াধারী চেহারাটা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গিরির কণ্ঠস্বরেও সুরের এমনি একটা করুণ তন্ময়তা ছিল। গিরি ছিল গিরিমাটির দেশের উচ্ছল নদীর ভরা জোয়ার!

গিরি পঞ্চুর দাওয়ায় বাঁশের থামটায় ঠেস্ দিয়া বসিত, করতালে তাল ধরিয়া-ধরিয়া গান গাহিত :

সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস,
নয়নে আলেয়া জ্বলে, ঠোঁটে জ্বলে বিষ !

কত গানের টুক্‌রাই ত' পঞ্চু গিরির কাছে শিখিয়াছে। গিরি দুষ্টামি করিয়া চোখ মট্‌কাইয়া গান ধরিত :

গালের উপর চাইলে চুমা,
দিয়ে দিলাম ঠোঁটে,

পঞ্চু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া গানের সুরের মিল দিত :

তবু জানি প্রাণেশ্বরী,
রাগ কর নাই মোটে।

কতদিন গিরিই পঞ্চুকে দুইটা ফুটাইয়া দিয়াছে। বেড়ার গায়ে ভিক্ষার ঝুলিটা লট্‌কাইয়া রাখিয়া গিরি কোমরে কাপড় বাঁধিয়া রান্নায় মাতিয়াছে,—সেই সব দিন পঞ্চুর ট্যাক্‌টা সামনের মাঠের মতই খাঁ-খাঁ করিত বলিয়া তেমন কিছুই জোগাড় করিতে পারে নাই। গিরি কড়াতে কলাই-শাকের ঘণ্টটা নাড়াচাড়া করিতে-করিতে গান ধরিয়াছে :

'কই মাছের ঘণ্ট খেয়ো কলাই শাক দিয়ে।
হ'ল নাক অধিবাস, আজকে বাসি বিয়ে।'

তাহার পর হঠাৎ থামিয়া যায় নাই, এক গা ফাজলামো লইয়া আরো দু'লাইন বাঁধিয়া ফেলিত :

বাসি বিয়ে কালরাত্রি—শুইতে আছে মানা,
মোর দুয়ারে পড়ল না ক' শুভ-রাত্রির হানা।

বলিয়াই পঞ্চুর পুলকিত মুখের পানে চাহিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত। একখানা কলাপাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া নিজের জন্য ভাত বাড়িয়া লইতে গেলে পঞ্চু যখন বারণ করিত, গিরি বলিত,—আমার জাত কি আর আছে ?

পঞ্চু বলিত,—রেঁধে দিলে জাত মারা যায় না, একপাতে খেলেই যায় ? তোর বুদ্ধিকে বলিহারি, গিরি।

বলিয়া গিরির হাতটা নিজের থালার রাশীকৃত ভাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিত।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়াই গিরি বেড়ায়-গোঁজা ভিক্ষার ঝুলি ও করতাল জোড়া লইয়া ঘর ছাড়িয়া পথে নামিয়া আসিত,—উহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পঞ্চুর বুকের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ কথা আঁকুপাঁকু করিতে থাকিলেও একটিও কথা মুখে জুয়াইত

না। গিরি যাইবার সময় একবারও পিছন চাহিত না পর্য্যন্ত,—দূর হইতে উহার চিকণ গলার গান শোনা যাইত :

'কাটিল ডিঙার কাছি উড়াইল পাল,
উজান নদীতে ডিঙা যায় ভাটিয়াল।'

পঞ্চুও আর ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারিত কি ?

তাহার পর গিরির সঙ্গে দেখা হইলেই পঞ্চু নানা রকম ইয়ার্কি করিত। একদিন গিরি ভর্-দুপুরে চাঁড়ালপাড়ার পুকুরে স্নান করিতে নামিয়াছিল। হঠাৎ পার হইতে পঞ্চু গান গাহিয়া উঠিল :

"কে রমণী রসবতী জলে নেমেছ,
মুখখানি পুন্নিমা-চাঁদ—রোদে ঘেমেছ।"

সেইদিন লজ্জায় গিরি অনেকক্ষণ জলের মধ্যে ডুব দিয়া ছিল। বহু পরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া দেখিল, পঞ্চু তখনো দাঁড়াইয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া উহাকে দেখিতেছে আর গাহিতেছে :

চাঁড়ালপাড়ার পচা পুকুর আঁচল ধরে' টানে,
তোমার যৌবন কইছে কথা জলের কানে-কানে।

গিরি ভিজা গা লইয়া উঠিয়া আসিতেই পঞ্চু ফের গাহিল :

মুলতানী মোহরের মত তোমার সোনার তনু,
ভুরুতে রেখেছ এঁকে ছিরামচন্দ্রের ধনু।

গিরি জল হইতে উঠিয়া পড়িয়া পঞ্চুর মুগ্ধ চক্ষু অনুসরণ করিয়া পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিত। কহিত,—আমাকে ভালো দেখে একট একতারা দিতে পারিস্‌ ?

পঞ্চু বলিত :

তোমার মিটিয়ে দেব আশ,
আমার দে শুধু ফরমাস।

সেইদিন রাত্রে হঠাৎ সমারোহ করিয়া রাজাধিরাজের মত ঝড় আসিয়াছিল। বাতি নিবিয়া গেলে পর পঞ্চু আর বাতি জ্বালায় নাই। শুকনো মাটি যেন বৃষ্টির পদশব্দের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া জপ করিতেছে, তেমনিই পঞ্চু চক্ষু বুজিয়া যেন কাহার আকস্মিক আগমনের প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল, না-ই বা থাক তাহার আড়ম্বর, হোকই বা না সে নিরাভরণা !

বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে সেও আসিল বৈ কি।

পঞ্চু ভাবিয়াছিল, গিরি কাছে আসিয়াই বৃষ্টির মুখরতার সঙ্গে ছন্দ রাখিয়া গান গাহিয়া উঠিবে। এমন একটা রাত্রে চির-প্রত্যাশিতার মত গিরি উহার ঘরে

আসিয়া ঠাঁই লইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কত বড় একটা তৃপ্তি আছে তাহা পঞ্চু নূতন করিয়া প্রথম আবিষ্কার করিল।

গিরি কোথায় যে তাহার তালি-দেওয়া ভিক্ষার ঝুলিটি রাখিয়া আসিয়াছে কে জানে? হাতের সঙ্গে দড়ি-জড়ানো সেই করতাল-জোড়াটিও নাই। যেন অনেক দূর হইতে ছুটিয়া-ছুটিয়া শ্রান্ত হইয়াছে,--খালি তাহাই নহে, গিরি আজ তেমন করিয়া হাসি-পরিহাসের ঠাট্টা-মসকরার ঝাল্-মশ্‌লা মিশাইয়া কথা কহিতেছে না।

পঞ্চু বলিল, কি গো বিধুমুখী?

গিরি কথা কহিল না, চক্ষু বুজিয়া থাম্‌টায় ঠেস্ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল। দিগন্ত ব্যাপিয়া তখন কালো আকাশের বেদনা নামিয়াছে।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গিরি কহিল,—আজ খুব ঝড়-জল হবে।

পঞ্চু কহিল,—তা ত' দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

তাহার পর হঠাৎ পা দুইটি গুটাইয়া লইয়া গিরি কহিল,— তোর ত' খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেছে, একটা গল্প শুন্‌বি?

—যদি শোনাও।

ঝুঁটিবাঁধা খোঁপাটা খসিয়া গিয়াছিল, চুলগুলি গিরিবালা আর বাঁধিয়া লইল না। গিরির যে এত চুল ছিল—পঞ্চুর কাছে এই অভিজ্ঞতাও অত্যন্ত আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হইল। জোয়ারের শেষবেলাকার জলটুকুর মত গিরির যৌবন তখনও যাই-যাই করিয়া যাইতে পারিতেছিল না,—মত্ততার মোহটুকু পার হইয়া একটা মধুর মদিরতার অবসাদ সমস্ত দেহে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। যেন আর নিমন্ত্রণ নয়, আহ্বান নয়,—শুধু একটি সস্নেহ সম্বোধন, একটি কৌতূহলহীন জিজ্ঞাসা! যেন সন্ধ্যাবেলার শিশিরমথিত পদ্মের মত!

গিরি বলিতে লাগিল,—চন্দনগঞ্জের জমিদার,—বড় শহরে বাগানবাড়ি ছিল একটা, জানিস্?

নদীর ওপারে চন্দনগঞ্জ।

গিরি বলিয়া যাইতেছিল: পাঁড় মাতাল ছিল,—দেদার পয়সা। দাসদাসী লোকলস্কর গাড়ি-পালকি—কিছুরই অভাব হয় নি কোনোদিন।

পঞ্চু হঠাৎ প্রশ্ন করিল,—নামটা জানি কি?

গিরি নাম বলিতে যাইতেছিল,—হঠাৎ জিভ্ কাটিয়া ফেলিয়া অসংযত রসনাকে যেন শাসন করিয়া লইল। নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল,—চেহারাও ছিল তেম্‌নি ভুষুণ্ডির মত, ইয়া ভুঁড়ি, ঝাঁটার মত গোঁফ, বেঁটে চৌকো চেহারা, প্রায় একটা পিপে। হোঁদলকুৎকুৎ আর কাকে বলে? তবু—

গিরি যে কোথায় গিয়া পৌঁছিবে পঞ্চু তাহার দিশা পাইতেছিল না।

বাহিরে তখন বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটা পড়িতেছে।

গিরি বলে,—সেই জমিদারের হ'ল মরণদশা,—বাত পিত্ত কফ সবগুলো একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। কত কব্‌রেজ ডাক্তার ওঝা হাকিম পিল্‌পিল্‌ কর্‌তে-কর্‌তে এল গেল,—তবু বাবুর বস্তার মত হোঁৎকা ভুঁড়ি শুকিয়ে শুকিয়ে মাটির সরার মত চিম্‌টে হ'য়ে আসে,- বাবু যায়-যায়! সারা চন্দনগঞ্জ নিঝুম,—পাখীটি পর্যন্ত রা কাড়ে না। সমস্ত লোক ফিস্‌ফাস্‌ ক'রে কথা কয়, হাট বসে না, আওয়াজ হ'বে বলে' গরুর গাড়ির চলা বন্ধ। কত পূজা, কত দেব-মানৎ কিছুতেই কিছু না। এই যায় ত' সেই যায়।

—বাবুর মা ছিলেন পরম সতী,—হাতের নোয়া খুইয়েছিলেন বটে শিশুকালে, কিন্তু একদিনের তরেও একাদশীতে ফোঁটাটি জিভে তোলেন নি, মন্ত্র আওড়াতে না পেরেই মাটির শিবঠাকুরটি গড়ে' ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মাথার ওপর কোশা থেকে জল ফেলেছেন,—চোখের থেকেও। শুনেছি, সেই মাকে মদ খেয়ে বাবু এসে লাথি মেরে তিনমাস বিছানায় শুইয়ে রেখেছিলেন। সেই মা, সেই মা কি করেছিলেন জানিস্‌?

পঞ্চু কহিল—পেটের ছেলে মেরে ফেলেনি কেন?

গিরি তাড়াতাড়ি দুই হাত জোড় করিয়া জমিদারের মাতার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিল,—সেই মা নয়, পঞ্চু, সেই মা নয়। ওরা তো শুধু গর্ভধারিণী,—এ ছিলেন একেবারে খাঁটি মা। চন্দনগঞ্জে সাঁকোর ধারে সেই যে মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির আছে, মা সেখানে গিয়ে ছেলের জন্য হত্যা দিয়ে পড়্‌লেন। মাটির ওপর বুক পেতে মা-চণ্ডীকে বললেন: হোক্‌ সে মাতাল, তাকে তোর রাখ্‌তে হ'বে, মা। ওর কচি বৌর ইহকালটা চিবিয়ে খাস্‌ নি, রাক্ষুসি।

গিরিকে থামিতে দেখিয়া পঞ্চু কহিল,—তারপর?

—দিন যায়, রাত যায়,—পড়ে' থেকে-থেকে মা একেবারে আম্‌সি হ'য়ে গেল। ওদিকে ছেলে যমের দক্ষিণ দোরে গিয়ে ধাক্কা মারে-মারে, এম্‌নি সময় চণ্ডী প্রত্যাদেশ কর্‌লেন। স্বপনে বললেন: এখানে কিছুই হ'বে না, হতভাগী। কল্‌কাতার উত্তর সীমানায় পঞ্চবটীতে বুড়ো শিবের যে ভাঙ্গা মন্দির আছে, সেইখানেই বুক দিয়ে পড়ে' থাক্‌ গে।

বুড়ি মা তখুনিই ছুটল কল্‌কাতা। সেই মন্দির খুঁজে তেম্‌নি আবার বুক দিয়ে পড়্‌ল। এদিকে ছেলে চোখ বোজে ত' চোখ বোজে।

—এমন মা কি কোথাও আছে পঞ্চু?

পঞ্চু কহিল,—তারপর? বুড়ো বোকা শিব মুখ গোম্‌রা করে'ই রইল?

গিরি ঘাড় দুলাইয়া কহিল,—বুড়ো শিবের সাধ্যি কি, পঞ্চু? এমন মায়ের চোখের জল খেয়ে বুড়ো শিবের অনেক দিনের তৃষ্ণা মিটে গেল। স্বপ্নে এসে দাঁড়ালেন, জটায় তাঁর সাপের ফণা, কোমরে তাঁর বাঘছাল, হাতে তাঁর ডমরু!

—কি বললেন?

—বললেন: যদি তোর পুত্রবধূ গঙ্গায় একান্নটা ডুব দিয়ে আমার মন্দিরের এক ক্রোশ দূর থেকে রাজপথ দিয়ে দিনের বেলায় 'গণ্ডী' দিতে-দিতে এসে আমার কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চায়, দেব তোর ছেলের জীবন।

পঞ্চু বলিল,—বুড়ো শিবের ভারি আব্দার! দু'ছিলিম কড়া গাঁজা চেয়ে নিলেই ত' পারত! বল্‌লেই পারত: লুকিয়ে-লুকিয়ে চোরা কোকেনের ব্যব্‌সা কর্, কোকেন্ কোনোদিন খাই নি।

গিরি বলিতে লাগিল,—মায়ের সে কী ফুর্তি, পঞ্চু, যেন যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরেছে। ইচ্ছা করে যেন পাখীর মতো উড়াল্ দিয়ে তখুনিই ঘরে ফিরে যায়—

পঞ্চু কহিল,—ঘরে গিয়ে বুঝি দেখ্‌লে যে, ছেলে ইতিমধ্যে দিব্যি পটল তুলেছে?

পাগল! ছেলে তখনো ধুক্‌ধুক্ করছে—বদ্যিরা সব হাঁ। সবাই বলেছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই টেঁসে যাবে, চব্বিশ ঘণ্টা ছেড়ে চব্বিশ দিন—রুগী কিছুতেই লম্বা হয় না। মা বাড়ি এসেই বৌ'র হাত দু'টো জাপ্‌টে ধরে' কেঁদে বললেন: তোর স্বামীকে বাঁচা, পোড়ারমুখি,—যম-হারামজাদাকে তোর হাতের নোয়া খুল্‌তে দিস্ নি।

—বৌ আকুল হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে: কি, কি? কেন মা? কি হয়েছে?

—মা বললেন: কল্‌কাতা চল্, বৌ। আমি লোকজন পাইক-পেয়াদা সব ঠিক করছি।

—বলে' সব কথা খুলে বললেন বৌকে।

পঞ্চু কহিল,—বৌ ঘাড়টা শক্ত করে' রইল?

—হাজার হোক্, জমিদারের মেয়ে, ওর আঠারো বছর ধরে' আকাশে যতবার চাঁদ উঠেছিল, ততবারের সুধা ছেনে ওর রূপ,—রাজি হ'ল না, পঞ্চু। বললে: লক্ষ-লক্ষ লোকের সুমুখ দিয়ে খোলা রাস্তার ওপর দিয়ে উবু হ'য়ে সাষ্টাঙ্গ করতে-করতে আমি যেতে পারব না, মা। সূর্যের পর্যন্ত দেখ্‌তে মানা আমাকে, তারই আলোকে কাতারে-কাতারে লোকের লোভী চোখের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে যেতে বুক আমার ফেটে যাবে। তা কিছুতেই হ'বে না।

— মা বললেন : ওলো, বুক তো তোর এম্‌নিই ফাট্‌বে—

পঞ্চু কহিল—বৌ বুঝি বললে : ফাটুক্‌ ! না ? এমন বৌ বিধবা হয় না ? হয়েছিল ত' ?

গিরির কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, গলা খাঁখ্‌রাইয়া বলিল,—বৌ বললে : এম্‌নিই যদি বিধাতা বিরূপ হ'ন্‌ ত', হ'বেন—আমার কপাল যদি তিনি পোড়ান্‌ ত', পোড়াবেন,—কিন্তু আমি মুখ পোড়াতে পারব না, মা ; কিছুতেই না ! আমাকে দিয়ে এম্‌নি কতকটা কুৎসিত কস্‌রৎ করিয়ে নিলেই বিধাতা খুসি হ'য়ে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেবেন, সেই বিধাতায় আমার বিশ্বাস নেই। বুড়ো শিবকে আমি এত বড় অমানুষিক ঘুস্‌ দিতে পার্‌ব না, মা।

পঞ্চু মুখ খিঁচাইয়া কহিল,—মাগী খিয়েস্তান্‌ বুঝি ? তা, থুব্‌ড়োমুখি এখন আলোচাল আর কাঁচকলা সিদ্ধ গিল্‌ছে ত' ?

—বৌ গেল না ত' গেলই না। মা আবার পাগলিনী হ'য়ে শিবের দরজায় হত্যা দিয়ে পড়লেন। বললেন : ছেলেমানুষ বৌটাকে বাগাতে পার্‌লাম না, বাবা। তুমি আমাকে দিয়েই আমার ছেলের জন্য যা-খুসি করিয়ে নাও। আমার ছেলের প্রাণ রক্ষা কর ভোলানাথ, ভালো হ'লে আমার ছেলের আবার বিয়ে দেব—সতী নারীর সঙ্গে।

পঞ্চু কহিল,—বুড়ো শিব মুখ ভার করে' রইল না ত' ? মুখ ফুটে কথা কইল ?

গিরি কণ্ঠস্বরে অপূর্ব তন্ময়তা নিয়া কহিল,—মায়ের চোখের জলে পাথর শিব আবার জেগে উঠ্‌লেন, পঞ্চু। সেই পঞ্চবটীর জঙ্গলের মধ্যে সেই বুড়ো শিবের মন্দিরের উই-খাওয়া ঝর্ঝরে চৌকাঠ ধরে' কেউ এত চোখের জল ফেলেনি,—বুড়ো শিব কৃতার্থ হ'য়ে গেছেন,—তাঁকে এত গৌরব এর আগে আর কে দিয়েছিল ? বুড়ো শিব আবার মুখ ফুটে কথা কইলেন।

পঞ্চু কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল,—কি বললেন ?—গিরি !

গিরি তখন অকারণে হঠাৎ চুপ করিয়া গিয়াছিল। পঞ্চুর ডাকে হঠাৎ সজাগ হইয়া বলিতে লাগিল,—বললেন : এক কাজ কর্‌, মেয়ে। বৌ যদি গর্‌রাজি, তবে সোনাগাছিতে তোমার ছেলের একটি রক্ষিতা আছে তাকেই ধর্‌ গে যা।—মা ত' অবাক্‌, এমন কথা জান্‌তেন না আগে, শোনেন্‌ নি কখনো। আবার ফির্‌লেন গাঁয়ে। দেওয়ানকে জিগ্‌গেস করে' ঠিকানা জান্‌লেন। আবার সেই রাত্রেই একলা কল্‌কাতায় চলে' এলেন।

গিরি আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল,—সেই রাতটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, পঞ্চু। সেদিনো আকাশ ভেঙে এম্‌নি অকূল কান্নার বন্যা

নেমেছিল,—আমার দোতলার ঘরে মেহগনি কাঠের খাটের উপর বসে' এস্রাজে একটা বৃন্দাবনী সারং বাজাচ্ছিলাম।

পঞ্চু তাহার সাম্‌নে গিরির পা দুইখানি পাইয়াই তাড়াতাড়ি খপ করিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—তুই? তুই গিরি?

গিরি উদাস কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—হ্যাঁ, আমিই। সেই রাতের কথাটা ভাবতে আজো আমার গা শিউরে ওঠে, পঞ্চু। সেই অবিরল জল-ঝড়ের মধ্যে আমার দাসীর সঙ্গে একটি বৃদ্ধা পাগলিনীর মত ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধর্‌লেন। আমি দাসীর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' তাকিয়ে রইলাম। কে, জানিস ত', পঞ্চু?

—জমিদারের মা।

—আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে' বললেন: আমার ছেলেকে বাঁচাও, মা।

পঞ্চু হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া দাঁত কড়্‌মড়াইয়া বলিল,—বল্‌লি না কেন: ওর বৌ কোথায়? আমি ওর কে?

গিরি বলিয়া চলিল,—সেই সন্দেহ কি আমার মনেও ছিল না, পঞ্চু? ছিল। তবু যখন শুন্‌লাম বুড়ো শিব বলেছেন আমার সাষ্টাঙ্গেই তিনি খুসি হ'য়ে জমিদারের প্রাণভিক্ষা দেবেন, তখন মনের মধ্যে খুব বড়-রকমের একটা গর্ব বোধ কর্‌লাম। ভাব্‌লাম,—আমার আবার কি সম্মান, আমার আবার কি খ্যাতি! দেহকে যতই কেন না গয়নায় আর শাড়িতে সাজিয়ে রাখি, যতই কেন না মাজি ঘষি,—আমার দেহ ত' পথের ধুলারই সামিল। আমি ত' পথের লোকের লোভী চাহনিকে ডরাই না,—আমি ত' সেই বৌটির মতই সতী নই, পঞ্চু। মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌লাম: আমি যাব, মা।

পঞ্চু চীৎকার করিয়া উঠিল,—গেলি?

—গেলাম, পঞ্চু। সব গয়নাগাটি খুলে' ফেল্‌লাম। পরের দিন মায়ের হাত ধরে'-ধরে' গঙ্গায় গিয়ে একান্নটা ডুব গুনে'-গুনে' দিয়ে নিলাম, ভাই। জীবনে কত অত্যাচার সয়েছি,—কিন্তু শত অপমান ও যন্ত্রণার বিনিময়ে কোনো বড় সুখ পাইনি। কিন্তু, আমার যোগ্যতা যে কতখানি, সে-দিন হঠাৎ তা টের পেয়ে আমার সুখের আর শেষ ছিল না। মায়ের সঙ্গে সেই আগের রাতটা আমার কত শান্তিতেই যে কেটেছে!

অস্থির হইয়া পঞ্চু কহিল,—সত্যি-সত্যিই রাস্তার খোয়ার ওপর দিয়ে তুই মাইল উবু হ'য়ে-হ'য়ে বুকে হেঁটে গেলি, গিরি?

—গেলাম বই কি, ভাই। তুই এই কথা ভাব্‌তে পারিস্ যে একটি গৃহস্থবধূ যা কর্‌তে পার্‌ত,—আমারো তাই করবার যোগ্যতা আছে!

—তার চেয়ে ঢের বেশি আছে। সেই মাগী ত' এগোল না স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে। তুই ত' গেলি।

— দুই ক্রোশ বুকে হেঁটে-হেঁটে বুড়ো শিবঠাকুরের কাছে জমিদারবাবুর প্রাণ চেয়ে-চেয়ে গেলাম, পঞ্চু। যেতে-যেতে দুপুর গলে' সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। পথে সে কি লোকারণ্য, এ ওর মাথা খায়, এম্‌নি। তখন দেহে যৌবন ছিল, রূপ ছিল,-লোকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত সবই ছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ত' আমার শোভা পেত না। সব চাইতে কী ভালোই লেগেছিল, পঞ্চু, যখন লোকের সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তরে মা বল্‌ছিলেন : এ আমার ছেলের বৌ,—চন্দনগঞ্জের জমিদারের স্ত্রী। বলে' মা সবাইকে এর অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

পঞ্চু বলিল,—জমিদার ভালো হ'য়ে উঠ্‌ল ?

--উঠ্‌ল বৈ কি! বুড়ো শিবের কথা কি না ফলে' পারে ? তা ছাড়া সেই সতী-লক্ষ্মীর সিঁথির সিঁদুর কে মোছে ? যখন বেলাশেষে সেই মন্দিরে এসে দাঁড়ালাম, পঞ্চু,—সে কী ভিড় ! দেখ্‌বি, দেখ্‌বি তুই ?

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিতেই গিরি তাহার বুকের কাপড়টা সরাইয়া ফেলিয়া পঞ্চুকে তাহার অনাবৃত বুকটা দেখাইয়া দিল। অসংখ্য ক্ষতের চিহ্নে সেই বুকখানি একেবারে কলঙ্কিত হইয়া গেছে। কত যে কাল্‌শিরার দাগ আঁকিয়া-বাঁকিয়া বসিয়া গেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঁ দিকের স্তনটা রাস্তার ধারালো ইটের খোঁচায় একেবারে চ্যাপ্‌টা হইয়া বসিয়া মরিয়া গেছে,—সে এক বীভৎস দৃশ্য। ঐটুকু আলোর মধ্যে পঞ্চুর দেখিয়া লইতে একটুও দেরি হইল না। পঞ্চু শিহরিয়া উঠিল।

গিরির দুই চোখের কোণ বাহিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। করুণ স্বরে ফের বলিতে সুরু করিয়াছে : সেই যে বেরিয়ে এলাম, আর ফিরি নি। কোথায় বা সেই মেহগনি কাঠের খাট, কোথায় বা সেই হীরে-জহরৎ! মা চেয়েছিলেন বটে জমি-জমা দিয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ কর্‌তে, কিন্তু যে সত্যিই একবার বেরুতে পার্‌ল পঞ্চু, তুচ্ছ তার কাছে রাজার সিংহাসন! ভেসে পড়্‌লাম।...কিন্তু উপায় নেই, পঞ্চু।—আমার পেটে জমিদারের ছেলে। বলিয়া গিরি দুইটা হাত উঠাইয়া মুখ ঢাকিল।

পঞ্চু মাটির উপর একটা ঘুষি মারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—আমি মায়ের সেই কথা মনে করে' কত আশায় বুক বেঁধে চন্দনগঞ্জ গিয়েছিলাম আজ। শুনলাম জমিদার সেই বৌটিকে ত্যাগ করে' সত্যি-সত্যিই আবার বিয়ে করেছেন,—সেই বৌটির অপরাধ,—সে পথ দিয়ে বুকে হেঁটে কেন

স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করে নি। সেই বিয়ের রাতেই মা'র-ও দম নাকি হাঁপকাশে থেমে গেছে, তবু উৎসব থামে নি।

গিরি বলিয়া চলিল, — বৈঠকখানায় বসে' বাবু তখন গুড় গুড়ির নল মুখে গুজে' ঝিমুচ্ছিলেন, কাছে দাঁড়িয়ে তেমনি মুচকে' হাসবার চেষ্টা করে' বল্লাম: চিনতে পারেন?

বাবু ঝিমুনি থামিয়ে চোখ বড় করে' বললেন: কে, গিরি? এ বেশ হঠাৎ? ব্যবসা ছেড়ে দিলে বুঝি? বৃন্দাবনে যাচ্ছ? রেল ভাড়া চাও?

খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লাম: আমার দিকে এত তাকাচ্ছেন কি? আপনার জিনিস আপনার হাতে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

বুঝেও না বোঝার ভান করে' বাবু বল্লেন: কি জিনিস? সেই পিস্তলটা? যদি চালাতে শিখে থাক ত' নিয়ে যাও।

বল্লাম: চালাতে শিখলে পিস্তলের মুখটা নিজের বুকের মধ্যেই নিয়ে যেতাম। সে কথা থাক, আপনার ছেলে আপনি নিয়ে আমাকে ছুটি দেবেন?

—আমার ছেলে? তার মানে?—বাবু একটা চীৎকার করে' উঠে'ই তখুনি আরেকটা চীৎকার করলেন: এই, কুট্টুস সিং,— নিকালো হারামজাদিকে।

কী আশ্চর্য প্রভুভক্ত জমিদারের এই চাকরগুলো! আমাকে আর একটা কথা কইবারো সময় দিল না ওরা, চুল টেনে লাথি মেরে গালিগালাজ দিয়ে ঘাড়ে রদ্দা মেরে ওরা আমাকে বা'র করে' দিলে। কোথায় গেল ভিক্ষার ঝুলি, কোথায় বা রইল করতাল। দেখলাম দোতলার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাবু আর তা'র নতুন বৌ এই দৃশ্যটি উপভোগ করছেন। ভাবলাম নদীতে ডুবে' সব শেষ করে' দি। কিন্তু ভীরুর মত কেনই বা ডুবব? আমি কি আমার ছেলেকে ভয় করি?

পঞ্চু তাহার ডান হাতটা বার কতক মোচড়াইয়া শক্ত করিয়া লইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে লম্বা বল্লমটা খুঁজিবার জন্যই হয় ত' ঘরে ঢুকিয়াছিল, — যেন সোজাসুজি এখনই গিয়া চোখা বল্লমটা সিধা জমিদারের পেটের মধ্যে সেঁধাইয়া দিবে। কিন্তু বল্লমটা খুঁজিয়া পাইয়া বেশ উঁচু করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া দাওয়ায় আসিয়া দেখিল, গিরি কখন বৃষ্টির মধ্যেই চলিয়া গেছে।

বল্লমটা লইয়া একা-একা চন্দনগঞ্জের গাঁয়ে গিয়া উঠিবার মত উৎসাহ পঞ্চুর এক নিমেষেই উবিয়া গেল।

বজ্রমটা হাতে লইয়াই পঞ্চু বোকার মত সামনের মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নদীর জলের উপর ভোরের আলোটি টল্‌টল্‌ করিয়া উঠিয়াছে। মাছ-ধরা ছেলেটা সমস্ত রাত ধরিয়া মেহনৎ করিয়া কত মাছ পাইয়া কখন যে পাট-ক্ষেতের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কে জানে।

পঞ্চু উঠিয়া পড়িল। পূব-আকাশে শুকতারাটি তখনো জ্বলিতেছে।

পঞ্চু পথ চলিতে চলিতে গাহিয়া উঠিল:

'ষোল বছরের টাট্‌কা মেয়ে সতেরে দিয়েছে পারা,
আঁখির মাঝে রেখেছে বেঁধে পরশ্‌তারা তারা।'

কতদূর আসিয়াই জগু ভূমালির সঙ্গে দেখা। মাথায় কতগুলি বাঁশ লইয়া চলিয়াছে। মেলার মুখেই হয় ত'।

জগু বলিল,—যাবি নে মেলায়? জমিদার একটা যাত্রা গানের বায়না দিতে চায়,—পরশু তক্। 'সুরথ'-এর পালা সেরে দিয়ে আসি, আয়। তোড়জোড়ে বেশি হ্যাঙ্গাম নেই।

পঞ্চু তুড়ি দিয়া, কনুই দুইটা দুইদিকে প্রসারিত করিয়া কহিল,—যাত্রা করে ফাৎরা লে কে,—সব তুই ভার নে জগ,—আমি চল্‌লুম।

—কোথায়?

পঞ্চু চলিতে চলিতে ঘাড়টা বাঁকাইয়া পিছন ঘুরিয়া গিয়া একবার তাকাইল মাত্র। যেন ও এই রাজ্য হইতেই কোথায় উড়িয়া চলিয়াছে।

জগু পারে গিয়া নৌকা ধরিল।

কিসের যাত্রা? পঞ্চু সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া দামিনীকে নিয়া গ্রামান্তরে গিয়া ছোট একখানি বাসা বাঁধিবে। দামিনী হাঁড়িতে ভাত ফুটাইবে, আর পঞ্চু ভাতের টগ্‌বগের সঙ্গে সঙ্গে গানের গিট্‌কিরি দিবে। গান শিখিতে চাহিলে দামিনীকে ঘরের বাহিরে মাঠে আসিয়া পঞ্চুর কোলে মাথা রাখিয়া শুইতে হইবে,—পঞ্চু উহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গান শিখাইতে শিখাইতে মুখটা উহার মুখের উপর তেমনি চাপিয়া ধরিয়া গান গাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে। তাহাতে দামিনীর গান শেখা হোক্, বা না হোক্—দামিনীর ত' ভারি আসিবে যাইবে!

পঞ্চু খুব জোরে পা চালাইতেছিল। পৌঁছিতে পৌঁছিতে রোদ উঠিয়া যাইবে হয় ত'।

যে একজনের জন্য বাঁচিলে বাঁচিবার মানে হয়, সেই একজনকে যেন পঞ্চু নিজের

বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। পঞ্চুর মনের আকাশে খালিগামের পাখী পাখা মেলিতেছিল।

শশীদের বাড়িতে আসিয়া যখন পৌঁছিল, উঠানে তখন রাজ্যের ভিড় লাগিয়াছে। ব্যাপার কি?—পঞ্চু তুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। কে একটা মেয়েমানুষ অনাবৃতদেহে উপুড় হইয়া মাটিতে সটান পড়িয়া আছে,—চন্দনগঞ্জের সেই কাণা দারোগাটা ছোট একটা খাতায় বেঁটে একটা পেন্সিল দিয়া কি সব হিজিবিজি লিখিতেছে আর নয়ান্ জবুথবু হইয়া ঢোঁক গিলিয়া দারোগাকে কি সব বলিয়া যাইতেছে। চারিদিকে চাপা গলায় চেঁচামেচির চেষ্টা চলিয়াছে।

পঞ্চু আসিয়া নয়ানকেই প্রথম প্রশ্ন করিল,—কে ও? কি হয়েছে?

নয়ানের এখন উত্তর দিবার সময় ছিল না, দারোগাকে কি একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়া এখন সেটা এড়াইয়া যাইবার জন্য ফন্দি আঁটিতে ব্যস্ত ছিল। উত্তর না পাইয়া পঞ্চু সাঁই করিয়া নয়ানের গাল বাড়াইয়া একটা চড় বসাইয়া দিল। নয়ানের মতলবটা সেই এক চড়েই ফাঁসিয়া গেল বোধ হয়, সেও উত্তরে হাত তুলিতেছিল, দারোগা বাবু খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চু চট্ করিয়া ভূলুণ্ঠিত মেয়েটার মাথাটা ঘুরাইয়া চিৎ করিয়া দেখিয়া একটা কর্কশ আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

দামিনীর মুখ হইতে গলা পর্যন্ত ফুলিয়া একেবারে একটা ঢাক হইয়া গেছে, ঠোঁট দুইটা ভারি হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বিবর্ণ দাঁতগুলির ফাঁক দিয়া জিভটা খানিক বাহির হইয়া আসিয়া আর পথ পায় নাই। সহজে গা বাহিয়া উঠিবার জন্য কতগুলি পিঁপড়ে সোজা পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

পঞ্চু দামিনীর মুখের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া শুধাইল,—এ কাণ্ড তোর কে করল, দামিনী—

ভিড়ের মধ্য হইতে কে গলাটা শানাইয়া লইয়া উত্তর দিল,—গলায় দড়ি বেঁধে বেটি সার্কাস দেখাচ্ছিলেন।

দারোগা এইবার পঞ্চুকে লইয়া পড়িলেন। পঞ্চু দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল,—মজুমদারপাড়ায় কীর্তন সেরে রাত দু'টোয় বাড়ি ফিরছিলাম,—দেখি দামিনী বাইরে। শশী তার কুড়ানো ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় নাকি গেছে—আমাকে বললে। দু'টো পান খেয়ে টলতে টলতে চলে' গেলাম। ভারি নেশা করেছিলাম কিনা—

পঞ্চু আবার দামিনীর কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—কেন গলায় দড়ি দিতে গেলি হতভাগী, এই ত' আমি এসেছি। রাতটুকু আর সইল না শতেকখোয়ারি?

নয়ানটা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া নয়ানের গালে ফের আর একটা দুর্দান্ত চড় কসাইয়া দামিনীর মৃতদেহের উপর পা ফেলিয়া ডিঙাইয়া গিয়া পঞ্চু একটা ঝড়ো হাওয়ার মত ছুট লাগাইল। দারোগাবাবু বলিয়া উঠিলেন,—ধর্ বেটাকে।

অনেক দূর ছুটিয়া আসিয়া পঞ্চু দাঁড়াইয়া পড়িল। কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। নিজের গায়ের জামাটা টানিয়া পড়্‌পড় করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

একটা রাখাল-ছেলে পথের পাশে বসিয়া গরু চরাইতেছিল। পঞ্চু কাছে আসিয়া কহিল,—মুড়কি খাবি? হাঁ কর্ তবে।

ছেলেটা খুসি হইয়া এত বড় একটা হাঁ করিয়া বসিল যেন আকাশ গিলিয়া খাইবে। পঞ্চু রাস্তা হইতে এক মুঠি ধূলা কুড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ছেলেটার মুখে ঢালিয়া দিল।

ছেলেটা এক মুখ ধূলা লইয়া মুখ ভেঙচাইয়া বলিয়া উঠিল,—গরুর মাংস খা তুই—

পঞ্চু ছুটিতে ছুটিতে আবার নদীর পারেই আসিয়া পড়িয়াছে। যদি দামিনীকে ও কাছে পাইত, তবে উহার এই নিদারুণ বোকামির জন্য লাফ দিয়া লম্বা পা-টা মুখে তুলিয়া জোরে একটা লাথিই বসাইয়া দিত হয় ত'।

এতদিন পঞ্চু বেশ বাঁচিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ আজ দামিনীর আকস্মিক তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে উহার মনে হইল—কাহার জন্য আর বাঁচিবে, কাহাকে পাইবার আশায়?

রাতারাতি উহার পৃথিবীর সবগুলি পথ যেন হারাইয়া গেছে।

নদী হইতে ক্রোশখানেক দূরে চন্দনগঞ্জ,—উত্তর-বরাবর একটা রেল্-লাইন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেছে। আগে কোনদিকে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া হুস্‌হুসাইয়া গাড়ি চলিয়া যাইত,—ইদানিং এখানকার জমিদারকে সেলাম ঠুকিবার জন্য দাঁড়াইয়া একটু জিরাইয়া লয়, সেই সময়টুকুর মধ্যেই যাত্রীদের ভিতরে একটা নিষ্ঠুর হুড়াযুদ্ধি বাধিয়া যায়।

কাজে কাজেই একটি ইষ্টিশান্ আছে। টিনের চাল, ছেঁচা বাঁশের বেড়া, কয়েকটি পাতাবাহারের সারি। ইষ্টিশান্‌টি টিম্‌টাম করিয়া চলে। জমিদারের মোটর আসিলে ও পাকা রাস্তা বসিয়া গেলেই ইষ্টিশান্‌টি উঠিয়া যাইবে।

বেশ বড় গ্রামখানি। ধান হয় প্রচুর,—শ' খানেকের বেশি ঢেঁকি নিয়মিত উঠা-নামা করে।

ধান হয় বটে, কিন্তু বেশির ভাগ চাষীরাই ধার করিয়া বসিয়া আছে। বছরে শতকরা আশি-নব্বুই টাকা সুদেও তাহারা সাদা তমসুকে আর ধার পায় না। তাই গ্রামে বেশ জমি-বন্ধক চলিতেছে। কর্জ করিয়া চাষের জমি হস্তান্তরিত করিয়া ফেলিয়া বেচারা চাষীদের এখন দিন মজুরি করিয়া বা পরের জমি চষিয়া ভাত জোগাইতে হয়।

ঠিক বছরের শেষে ঘরে যখন ফসল আসে,—জমিদার তখন গ্রামে এক মেলা জাঁকাইয়া তোলেন। মেলা মাস গড়াইয়া চলে।

মেলার খাজ্‌না দিতে হয় জমিদারকেই,—কিন্তু তাহাতেও জমিদারের পেট ভরে না বলিয়াই মেলাতে জুয়ারিদের ভিড় করিয়া আসিবার নিমন্ত্রণ হয়। তাহারা যে-টুকু জায়গা জুড়িয়া বসিয়া খেলা চালায় তাহার খাজ্‌না হাজার ছাপাইয়া উঠে।

নানা রকম দোকান,—লাল পুতুল হইতে সুরু করিয়া লাল বোতলের!

মেলার এক কোণে পাশাপাশি কতগুলি কুঁড়ে-ঘর বাঁধা হয়। ইহার মধ্যে যাহারা বিদেশিনী ও একটু সঙ্গতিপন্ন তাহারাই আলাদা তাঁবু গাড়িয়া বসে,—টুল টানিয়া রাস্তার পাশে বসিয়া ঝিকে দিয়া পায়ের পাতায় টাট্‌কা আল্‌তা পরাইয়া নেয়। যেমন কেহ-কেহ চা-এর দোকানে ঢোকে, তেমনি কেহ-কেহ বার-কতক এদিকে-ওদিকে চাহিয়া এই তাঁবু বা কুঁড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দেয়।

ইহাতে জমিদারের পাওনার ঝুলিটা আরো ভারি হইয়া উঠে।

চৈত্রের শেষাশেষি। মেলা বসিয়াছে। আশে-পাশের গ্রামগুলি তাজ্জব ব্যাপার দেখিবার জন্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মৌচাকে কে ঢিল ছুঁড়িয়াছে বুঝি।

সকাল হইতেই দোকানদারদের মধ্যে একটা কানাঘুষা চলিতেছিল। বিদেশ হইতে কতগুলি ভদ্রলোকের ছেলে দল বাঁধিয়া মেলা ভণ্ডুল করিয়া দিবার জন্য লাঠি পাকাইতেছে। জমিদারের লোকেরাও নাকি তলে-তলে ছুরি শানাইতেছে,—সমস্ত আটঘাঁট বাঁধিয়া আনাচে-কানাচে পাহারা বসাইয়াছে!

শহরের ছেলেরা নাকি জমিদারের কাছে আর্জি করিয়াছিল যে, দোকানের ধারের ঐ সার-বাঁধা কুঁড়ে-ঘরগুলিতে এইবার যেন আর বাসিন্দারা আসিয়া ব্যবসা না ফাঁদে। জমিদার তাহাতে কান পাতেন নাই। তাই, শহরের ছেলেরা ঠিক করিয়াছে, আগুন ধরাইয়া ঐ কুঁড়ে ঘরগুলিকে নির্মূল করিয়া দিবে।

মেলা বসিতে না বসিতেই খবরটা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কতগুলি দোকানদার ভয় পাইয়া তল্পিতল্পা গুটাইয়া লইতেছে দেখিয়া জমিদারের খোদ্ দরোয়ান কুট্রুস্ সিং লাঠি ঠুকিয়া ও গোঁফ চুমরাইয়া বিস্তর অভয়দান করিতে গিয়া উপস্থিত সবারই মনে ভীতি সঞ্চার করিতেছিল। স্বপক্ষে নিখরচায় এত বড় একটা পালোয়ান পাইয়াও বেয়াড়া দোকানদাররা সজুত্ হয় না দেখিয়া কুট্রুস্ এক জনের পিলে-ফোলা পেটে একটা লাঠির খোঁচা লাগাইয়া বলিয়া দিল,—যে আজ মেলা ছাড়িয়া পথে পলাইবে লাঠির খোঁচাটা তাহার পেট ছাড়িয়া হঠাৎ তড়াক্ করিয়া ডবল-প্রমোশান্ পাইয়া একেবারে মাথায় উঠিবে। যদি কেহ যুঝিতে আসে. তাহাকে হটাইয়া দিবার ভার সকলের। – দোকানিরা মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বসিয়া পড়িল।

মেয়েগুলির কানেও খবরটা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ভড়কায় নাই মোটেই, বাঁকা-চাহনি ছুঁড়িয়া বলিয়াছিল: আসুক না ছোঁড়ারা!

এমন ভাবে জমিদারের দরোয়ানকে আশ্বাস দিয়াছিল, যেন যে ডাকাত পড়িবে বলিয়া এত ঢেঁড়া দেওয়া হইতেছে তাহারা উহাদেরই সম্মানিত অতিথি! ভয়ের কিছুই নাই, নয়নের তূণে উহাদের অফুরন্ত বাণ আছে। সকাল হইতেই মেয়েদের রণসজ্জা চলিতেছে,—কাজল, আল্‌তা, গিল্‌টির গয়না আর মাটির খুরিতে ধান্যেশ্বরী।

শশীর হাত ধরিয়া রাখ-ও মেলায় আসিয়াছে। সারাটা পথ রাখ খালি সেই সঙ্গীহীন কুকুরটার গোঙানিই শুনিয়াছে। এতক্ষণে পথ চিনিয়া চিনিয়া ও হয় ত' ঘরের দাওয়ার সেই পরিচিত কোণটিতে গিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। কে উহার গায়ে একটু হাত বুলাইয়া দিবে?

রাখ শশীর হাতটা টানিয়া ধরিয়া কহিল, - বাবা, ঐ একটা কোট্ ঝুল্‌ছে; কেন' না,—আমার কুকুরের গায়ে পরিয়ে দেব। ওর গায়ে ভারি পোকা পড়েছে, —রাত্তিরে খালি ছট্‌ফট্ করে।

শশী উদাসীনের মত খালি বলল, পয়সা নেই।

ইহার উপর কথা কহা মানেই যে গালের উপর বাবার গিঁটওয়ালা পাঁচটা আঙুলের বাড়ি খাওয়া তাহা রাখ বিলক্ষণ বুঝিত। তাই রাখ একবার মাত্র ঢোঁক গিলিয়া গলাটা চুলকাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু মনের মধ্যে কেবলই একটা প্রশ্ন ঘুরাফিরা করিতে লাগিল,—এত লোকের মধ্যে শুধু উহাদের দুইজনেরই পয়সা নাই কেন? ঐ যে একটি ছোট্ট মেয়ে একটা বাঁশি কিনিয়া অর্ধেকের বেশি মুখে পুরিয়া গাল দুইটা ফুলাইয়া ফুলাইয়া শব্দ করিতেছে, ও পয়সা পাইল কোথা হইতে?

দোকানির কাছে ভিক্ষা চাহিলেও পাওয়া যাইবে না। রাখ যদি আর একটু

ঢ্যাঙা হইত, তবে দোকানিকে চক্ষুর পলক ফেলিবার সময় পর্যন্ত না দিয়া হাত বাড়াইয়া ঝুলন্ত কোট্‌টাকে ছিনাইয়া লইয়াই চোঁচা ছুট্‌ দিত—

রাখ নিশ্চিন্ত হইয়া মনে মনে ছবি আঁকিতে সুরু করিল।—রঙিন কোট্‌টা কুকুরের গায়ে উঠিয়াছে, কুকুরটা ল্যাজ নাড়িয়া কান দুইটা নামাইয়া দিয়া কাঁই-কুঁই করিয়া কত ভাবে যে আনন্দ জানাইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। হঠাৎ উহার মা যেন রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া একটা চেলাকাঠ লইয়া কুকুরটাকে আক্রমণ করিল,—কুকুরটার জামা টানিয়া কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিতে লাগিল। রাখ-র হাতের ঢিল খাইয়া কুকুরটা যেমন গোঙাইতেছিল, পোষাকি কোট্‌ হারাইয়া এখন যেন তেমনিই ককাইতেছে। কুকুরটা যেন রাখর মতই গরিব,—অবোলা!

ভাবিতে ভাবিতে রাখ কখন্‌ থামিয়া পড়িয়াছিল বুঝি, হঠাৎ শশীর হাতের এক ঝাঁকানি খাইয়া সচেতন হইয়া উঠিল। পেছন ফিরিয়া চক্ষু তুলিয়া আরেকবার সেই রঙিন কোট্‌টা দেখিয়া লইয়া রাখ ফের চলিতে লাগিল। কিন্তু এই পথে লোভের বস্তু অসংখ্য হইলেও লাভের আশা একেবারে শূন্য ভাবিয়া রাখ পা চালাইতে আর জোর পাইতেছিল না। কুকুরটার মতই ঘরে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে।

গত রাত্রে যে তাহার পেলব সর্বাবয়বে এমন একটা উত্তপ্ত মাদকতা লইয়া কাছে আসিয়াছিল, আজ প্রত্যুষেই সে সহসা হিম পাষাণ হইয়া যাইবে, এক নিমেষে তাহার যৌবন-শ্রী খসিয়া বাসি হইয়া পচিয়া উঠিবে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে পঞ্চু অভূতপূর্ব বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। কোথায় যে বেদনা লাগিল, তাহার 'স্বাদ তিক্ত না মধুর,—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর্যন্ত তাহার অবসর মিলিল না। দামিনীর মৃত্যুটা শুধু যে অস্বাভাবিক তাহাই নয়,—আগাগোড়া অসম্ভব। দামিনী যে মরিতে জানে, ও এমন করিয়া মরিতে জানে, উহার ভরা-ভাদ্রের নদীর মত ফেনিল মদির যৌবনও যে সহসা শুকাইয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে,—পঞ্চুর কাছে ইহা একটা পরম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! পঞ্চুর মনে পড়িল, একদিন রায়েদের পুকুরের ঘাট্‌লায় বসিয়া ও সন্ধ্যাকালে বাঁশি বাজাইতেছিল। বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে এত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, কখন পাশের বুনো ঝোপ হইতে একটা গোখ্‌রো সাপ উঠিয়া বাঁশির সুরে মুগ্ধ হইয়া উহার বুক ও গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তাহা মোটেই টের পায় নাই। সাপ ফণা বিস্তৃত করিয়া

উহার ঠোঁটের কাছে যখন আনন্দে ঘন ঘন নাচিতেছিল, পঞ্চু দেখিতে দেখিতে মুহূর্তের মধ্যে একেবারে অসাড় বিবশ হিম হইয়া গিয়াছিল, মনে আছে। সে একটা অভিজ্ঞতা! যতক্ষণ সাপটা জড়াইয়া ছিল, ততক্ষণ পঞ্চু বাহিরের সমস্ত কথা ভুলিয়া বাঁশি বাজাইয়া বাজাইয়া ঠোঁঠ দুইটা ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। ধীরে-ধীরে সাপটা পঞ্চুকে আলিঙ্গনচ্যুত করিয়া ধীরে ধীরে নিরীহের মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল!—কাল সমস্ত রাত্রি জাগিয়া স্বপ্নে পঞ্চু যত সুর সাধিয়াছিল, সেই সুরে আজ প্রভাতে মৃত্যুরই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল নাকি?

পঞ্চু যতই এই কথা ভাবে, বেদনায় বিহ্বল হয়, বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়ে। কেন যে হঠাৎ দামিনী গলায় দড়ি বাঁধিয়া লম্বা হইয়া পড়িল, এই প্রশ্নের কোনো একটা সহজবোধ্য সদুত্তর না পাইয়া পঞ্চু বেশি মাথা ঘামাইতে না পারিয়া অবশেষে ইহাই ভাবিয়া লইল যে, দামিনী পঞ্চুরই জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে। এবং এক সময়ে এই কথাটাই বিশ্বাস করিয়া বসিল। মরিয়া না হয় দামিনী আজ পঞ্চুর বাহুর সমস্ত নাগালের বাহিরে চলিয়া গেছে. কিন্তু সত্যিই যদি অভিমানিনী দামিনী না মরিত. তবে মরীয়া হইয়া পঞ্চু আজ যে কি কাণ্ড করিয়া বসিত. ভাবিতে পঞ্চুর সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল!

অথচ, কাল রাতে মত্ত অবস্থায় কিছু অন্যায় করিয়া বসে সেই ভয়েই ত' পঞ্চু দামিনীর ঘরে গিয়া আশ্রয় নেয় নাই.—উহাকে সিঁথির সিঁদুর লইয়া স্বচ্ছন্দে মরিবার অবকাশ দিয়াছে! দামিনীকে নিয়া ও কোথায়ই বা রাখিত, কি-ই বা খাইতে দিত! তাড়ি ও কোনোদিনই ছাড়িতে পারিবে না. দামিনীকে ত' আর ঘেন্না করিয়া উহার বমি ধুইতে হইল না! পঞ্চু তাহার মহত্ত্ব দিয়া দামিনীর সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু দামিনীকে বোকা বলিতেই হইবে! ও ত' আর শশীর হৃদ্‌গগনের শশী হইয়া বিরাজ করিতে চায় নাই,—বাহু বাড়াইয়া ও ত' রাহুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল-ই। দড়িটা গলায় না বাঁধিয়া চোখে বাঁধিয়া কোনো রকমে বাকি রাতটা কাটাইয়া দিলেই ত' চলিত! দামিনীটা যে এত মিনি-মুখো পঞ্চু জানিত না।

যাক্, দামিনী মরিয়াছে, আপদ গেছে। একটা লোক আসিয়া জুটিলে তক্‌লিফের আর অন্ত থাকিত না, পদে পদে খুঁটিনাটি লইয়া কত যে নটখটি বাধিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাক্, ভালই হইল,—পেট ঢাক করিয়া তাড়ি খাওয়া যাইবে. কেহই নাক সিঁটকাইতে আসিবে না। চারিদিক যেন মুহূর্তে ভারি ফাঁকা, খোলসা হইয়া গেছে। পঞ্চুর বাড়ি নাই. বাক্স নাই. কেহ উহার জন্য ভাত বাড়িয়া বসিয়া নাই. যখন খুসি বাড়ি ফিরিলেই চলিবে, একেবারে না

ফিরিলেও কাহারো কিছু আসিয়া যাইবে না। ভাবিতে পঞ্চু যেন হাঁপ ছাড়িয়া লাফ দিয়া উঠিল। নিজের এই নিঃস্বতা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে একটা খুব বড় স্বাধীনতা আছে তাহার আস্বাদ যেন ও আজ প্রথম অনুভব করিল। যদি চায়, শশীকে ও আবার আর একটি না হয় যোগাড় করিয়া দিবে ;—কাদম্বিনী বা কদম্ব,—উহার কিছুই লাগিবে না। পঞ্চু আছে বেশ।

মেলায় গিয়া তাড়ি কিনিতে হইবে,—দামিনীর গলার দড়িটা যেন উহারও গলায় দাগ কাটিয়া-কাটিয়া একেবারে কাঠ করিয়া ফেলিয়াছে।—একটা গাছের তলায় বসিয়া এতক্ষণ বোধকরি পঞ্চু চোখের জলে গলাটা ভিজাইবার উপক্রম করিতেছিল, হঠাৎ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া চলিতে সুরু করিল। গলা ছাড়িয়া মহানন্দে গান করিল :

কেমনে কাট্‌বে আমার দিন ?
হাঁড়িতে নেই চালের ছিটে,
ডুপিতে নেই কেরোসিন।

গলা আরো চড়াইয়া দিল :

(আমি) রেড়ির তেলে বাগিয়ে টেড়ি,
চালকুমড়ো করব ফেরি,
মুখে মেখে আলকাতরা (আমি) সাজিব সৌখীন।

নদীর কাছাকাছি আসিয়া সুর-ফের্‌তায় ফের গান ধরিল :

তাইরে নাইরে নাইরে না,—
সংসারে মোর নাই দেনা।
নাই কো সুদ, খাই ওষুধ
ভাতের ফ্যান্ আর তাড়ির ফেনা,
তাইরে নাইরে নাইরে না।

একটা ডিঙি লইয়া পঞ্চু নদী পার হইল। জমিদারের যাত্রা-গানের বায়নাটা লইবে কিনা তাহাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিতেছিল,—হঠাৎ মেলার একটু কাছাকাছি আসিতেই কিসের একটা সম্মিলিত কোলাহল শুনিয়া পঞ্চুর পা দুইটা মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়া গেল। কোলাহলটা উৎসবের নয়, তাহার উগ্রতা মনকে উন্মত্ত করিয়া তোলে না, আতঙ্কে কণ্টকিত করিয়া তোলে!

এতক্ষণ আস্তে আস্তে চলিয়া পঞ্চুর দেহে একটা নিরানন্দ শৈথিল্য আসিয়াছিল—হঠাৎ অবসন্ন বিষণ্ন মন চাঙ্গা হইয়া উঠিল। একটা কিছু করিতে পাইয়া

বাঁচিয়া যাইবে ভাবিয়া পঞ্চু মেলার মুখে ছোঁ-মারা চিলের মত ছুট দিল। কিন্তু মেলার কাছে আসিয়াই পঞ্চু দুইটা চোখ বুজিয়া শক্ত করিয়া চাপিয়া মুহূর্তেকের জন্য একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সমস্ত মেলায় আগুন লাগিয়াছে। কে এক পাইকার শহর হইতে এসেন্স্ আনিয়া দেহাতি লোকদের হকচকাইয়া দিবে বলিয়া এক আলিশান্ দোকান ফাঁদিয়াছিল—সেই গলিত দাহ্য পদার্থগুলি পাইয়া আগুন একেবারে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। দরমার বেড়া হইতে সুরু করিয়া খড়ের চাল—কিছুই বাকি রহিল না, নিমেষের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। সমস্ত লোক দুর্বল অসহায়ের মত দূরে সরিয়া আগুনের শিখা কতদূর উঠে তাহাই ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া দেখিতেছে ও আর্ত কোলাহল করিতেছে।

নদী মেলা হইতে বেশ একটু দূরে, জল তুলিয়া আনিবার কিছুমাত্রই সুবিধা নাই। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে মেলা,—আগুন কাহারও ঘরে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই ইহাতেই যেন সবাই নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। মেলার দোকানিরা সবাই বিদেশী, ঠকাইতে আসিয়াছিল. ঠকাইতে আসিলে কাহারো ভালো হয় না, এই সুতীব্র কোলাহলের মধ্যেও এই নীতিবাক্য উচ্চারিত হইতেছিল। আর জমিদারের লোকসান হইলেই ত' ইহাদের আসান্। হাঁ করিয়া দাঁত মেলিয়া চীৎকারের তীক্ষ্ণতা বাড়ানো ছাড়া ইহারা আর কিছুই সাহায্য করিল না, সক্ষমও ছিল না বোধ হয়।

সহস্র লোকের ভীতি-বিহ্বল করুণ চোখের সামনে মেলা অদৃশ্য হইতে লাগিল, —যেন ভোজবাজি! ধূমাবগুণ্ঠনের আড়ালে সূর্য বিবর্ণ বিমলিন হইয়া আছে, বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া গায়ে বিঁধিতেছে।

ইহারই মধ্যে কোথা হইতে জমিদারের খোদ দরোয়ান হঠাৎ লাঠি ও লাঠিয়াল লইয়া মেলার মধ্যে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া দোহাত্তা বাঁশ চালাইতে লাগিল। এই ভয়াবহ সর্বনাশ কে বা কাহারা করিয়াছে, তাহারই এতক্ষণ হদিস্ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া অনন্যোপায় কুট্টুস্ সিং তাহার খোট্টাই ক্রোধের পরিমাণটা যত্র-তত্র জাহির করিবার জন্য যেন একেবারে উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রজ্বলন্ত বহ্নি-কুণ্ড হইতে কোনো অর্ধদগ্ধ দ্রব্য উদ্ধার করা যায় কি না, তাহারই আশায় কয়েকটি গরিব দোকানি তখনো সেইখানে রহিয়া গিয়াছিল, তাহাদেরই একজনের মাথায় একটা লাঠি প্রবল জোরে আসিয়া পড়িল।

আগুনের সঙ্গে রক্তের কোথাও নিশ্চয় একটা মিল আছে,—তাহা ছাড়া সকাল হইতেই পঞ্চুর হাত দুইটা মারাত্মক রকমের কিছু একটা করিয়া বসিবার আগ্রহে

নিস্‌পিস্‌ করিতেছে. আগুন ও তাহার মধ্যে দোকানির মাথায় রক্ত দেখিয়া উহার সমস্ত রক্ত অগ্নিশিখার মতই নাচিয়া উঠিল। কুট্টুস্‌ সিং-এর এক অসাবধান চেলার দুর্বল হাত হইতে সহসা লাঠিটা ছিনাইয়া লইল. এবং চক্ষের পলক পড়িবার পর্যন্ত অবসর না দিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে লাঠি চালাইয়া দিল। কিন্তু সেই পলকের মধ্যেই সেই আহত দোকানিটি অকস্মাৎ স্থানপরিবর্তন করিয়াছে বলিয়াই, পঞ্চু দেখিল,—তাহার লাঠিটাও সেই দোকানির মাথায়ই পড়িয়াছে এবং উহার ঘা-টা আরো বিস্তৃত ও গভীর করিয়া দিয়াছে। উহারই মাথায় আরেকটা বাড়ি মারিয়া উহাকে একেবারে সাবাড় করিয়া পৃথিবীর বা'র করিয়া দিবে কি না পঞ্চু বোধকরি তাহাই ভাবিতেছিল, কিন্তু সেই নির্বাক অজ্ঞান ভূশায়িত দোকানির গায়ের উপরে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড আগুনের ঢেলা পড়িয়া পঞ্চুর সমস্ত চিন্তার মীমাংসা করিয়া দিল। সেই আগুনের তলেই সেই দোকানির চিতা তৈরি হইয়া গেল।

কখন ও কে যে পঞ্চুকে আঘাতে জর্জরিত করিয়াছে যাহার জন্য ও সহসা প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া মানুষের মাথা লক্ষ্য করিয়া লাঠি ছুঁড়িতে লাগিল, তাহার কারণ পঞ্চু নিজেও ভাবিয়া পাইত না। তবুও, হাতে লাঠি ও তাহা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া কেনই বা যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহারও কোন হেতু নাই। কুট্টুস সিং-এর এক চেলার কাঁধে একটা বাড়ি লাগিতেই সে এমন উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল যে তাহার কাপড়টা পেছনে পড়িয়া রহিল কি না তাহা দেখিবার পর্যন্ত তাহার সাহস হইল না। দুর্ঘটনার কারণ কতদূর বিসদৃশ হইতে পারে কতকটা সেই ভয়ে, এবং নিরুপায় চেলাকে বিকটতর অপমান হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় কুট্টুসও খসিয়া পড়িল। পঞ্চু যখন উহাদেরই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বাহিরের মাঠে আসিয়া পড়িল তখন আগুনের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও অদৃশ্য হইয়া গেছে।

হঠাৎ সেই বিরাটকায় ভস্মস্তূপের পানে তাকাইয়া পঞ্চুর মন নিদারুণ দুঃখে হায়-হায় করিয়া উঠিল। সেই দোকানিটার কথা মনে পড়িল। তাহাকে এখন টানিয়া বাহির করা যায় কি না. তাহাও একবার ভাবিয়া লইল। তাহা ভাবিয়া আবার সেই দিকেই পা বাড়াইল. কিন্তু কিছু দূর আসিয়া পা আর চলিতে চাহিল না। দেখিল, সেই রাশীকৃত অঙ্গারের মধ্যে দুইটা নরদেহ যেন বাহির হইয়া আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কোমর হইতে মাথা কিছুই দেখা যাইতেছে না, যেন কি একটা ভারি জিনিস পড়িয়া চাপা গিয়াছে, পা শূন্যে তুলিয়া মুক্তির জন্য ব্যর্থ সংগ্রাম করিতেছে শুধু। পঞ্চু তাড়াতাড়ি হাতের লাঠিটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া একজনের পা ধরিয়া সজোরে টান মারিল,—যে লোকটা বাহির

হইয়া আসিল, সে জগ ; ছাইয়ের গুঁড়ায় সে একেবারে বিবর্ণ. বিকৃত হইয়া গেছে। পঞ্চু সচকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে ? এ কি ?

এক-মুখ কালি লইয়া দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া জগকে হাসিতে দেখিয়াও পঞ্চু আশ্বস্ত হইতে পারিল না, মনে হইল সেই দোকানিটার মত জগও নিশ্চয়ই পুড়িয়া মরিয়াছে,—এ তাহারই প্রেতমূর্তি ! সঙ্গে যে লোকটা ছিল, সেও সাড়া পাইয়া সোজা হইয়া বসিল। ছাই ও কাদায় তাহারও সমস্ত দেহ লিপ্ত হইয়া আছে, কালি-পড়া হাঁড়ির মত মুখ,—তবুও পঞ্চু তাহাকে চিনিতে পারিল,—জগ-র সঙ্গী নয়ান্ ! পঞ্চু মাটি হইতে তাড়াতাড়ি লাঠিটা তুলিয়া হাঁকিল,— কি করছিস্ তোরা এখানে ? বেঁচে আছিস তো ? নইলে, বল, মারি এই লাঠিটা—

জগ ইতিমধ্যে আরেকবার দাঁত বাহির করিতে যাইতেছিল, ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি খাড়া হইয়া উঠিল : দারোগাগিরি কবে থেকে পেলি, পঞ্চু ? লাঠিটা আমার হাতে দে ভাই, এই জঞ্জালের তলায় হাত বাড়িয়ে বাক্সটার নাগাল পাচ্ছি না, লাঠিটা দিয়ে টেনে আনি।

সমস্ত ব্যাপারটা পঞ্চুর কাছে তখনো পরিষ্কার হয় নাই বলিয়াই সে বিস্ময়াবিষ্ট বড় বড় চক্ষু দুইটাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছিল না ; এমন সময় নয়ান তেমনি দাঁত মেলিয়া বলিল,— জানিস-ই ত', কারো সর্বনাশ, কারো পোষ মাস। কারো বাতের প্রলেপ, কারো বা তুলোর লেপ। ছাইয়ের নিচে আমরা ছাতু কুড়োচ্ছি, ভাই। এই ছাখ্—

বলিয়া ট্যাঁক হইতে কতগুলি ঝক্‌ঝকে টাকা বাহির করিয়া পঞ্চুকে দেখাইয়া ফের বেশ ভালো করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইল।

পঞ্চু কহিল,—চুরি কর্‌ছিস ?

জগ বলিল,— এ কা'র জিনিস কি করে' বুঝ্‌ব যে তাকেই ফিরয়ে দিতে হ'বে। কা'র প্রমাণ হ'বে শুনি ?

নয়ান কথাটা সম্পূর্ণ করিয়া দিল : টাকায় কারো নাম লেখা থাকে ?

পঞ্চুর সেই চড় দুইটার ঝাঁঝ এখনো যেন নয়ানের গালে লাগিয়া আছে ; তাই কোনো উপায়ে পঞ্চুর হাতের ঐ উদ্যত অবাধ্য লাঠিটা করায়ত্ত করিতে পারিলেই সম্প্রতি সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়, তাই পঞ্চুকে প্রলুব্ধ করিয়া এই ছাইয়ের গাদার মধ্যে ঢুকাইবার আশায় নয়ান্ বলিল,— তুইও আমাদের মত উবু হ'য়ে পড়্, পঞ্চু,—কতগুলি কর্‌করে টাকা হ'লে তাড়ি কিনে চুচ্চুরে মাতাল হওয়া যাবে।

জগ বলিল,— একে আর চুরি বলে না পঞ্চু, তাড়ি জোগাড়ের কারিকুরি।

পঞ্চু জিভ্ দিয়া শুক্‌নো ঠোঁট দুইটা একবার চাটিয়া লইয়া উহাদের সঙ্গেই

'বোম্ ভোলানাথ' বলিয়া ভিড়িয়া যাইবে কি না তাহাই ভাবিতেছিল বোধকরি, হঠাৎ কে একজন উহার হাঁটু দুইটা জাপ্টাইয়া ধরিয়া ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পঞ্চু চাহিয়া দেখিল,— রাখ! —আতঙ্কে কাঁপিতেছে।

পঞ্চু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই এখানে কোত্থেকে এলি?

রাখ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—বাবার সঙ্গে এসেছিলাম –

—কে তোর বাবা?

হঠাৎ এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়া উহার দুরূহতাটা একবার মাত্র মনে-মনে পরিমাপ করিয়া লইয়া বিমর্ষতার সঙ্গে উদ্বেগ মিশাইয়া পঞ্চু প্রশ্ন পাল্টাইল: কোথায় তোর বাবা?

রাখ হাতের মুঠি দিয়া চোখ কচ্লাইতে-কচ্লাইতে কহিল,—ভিড়ের মধ্যে কখন্ যে বাবা আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে, দেখি নি। কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর আগুন লেগে গেল। দু'টো গরু মরেছে পঞ্চু-কাকা,—ভাগ্যিস্ আমার কুকুরটাকে আনিনি।

পঞ্চু কহিল, চল্, তোর বাবাকে খুঁজে' দেখি গে।

বলিয়া পঞ্চু রাখকে কোলে তুলিয়া লইল। জগ ও নয়ান পঞ্চুর পরিত্যক্ত লাঠিটা লইয়া ফের সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল কি না তাহা দেখিবার জন্যও একবার ঘাড় ফিরাইল না। তখন রৌদ্রের তেজ খুব বাড়িয়া গেছে,- রাখ-র দুইখানি সুকোমল সুকুমার হাত দিয়া পঞ্চু নিজের গলাটা জড়াইয়া লইল, কহিল,— তোর খুব খিদে পেয়েছে, না রে?

রাখ ঘাড় দুলাইয়া কহিল,—মোটেই আমার খিদে পায় নি. পঞ্চু-কাকা। এত বড় ধাড়ি ছেলেকে তুমি কেন কোলে করেছ? আমাকে তুমি নামিয়ে দাও, আমি তোমার সঙ্গে খুব হাঁট্তে পারব।

পঞ্চু তবু রাখকে কোল হইতে নামাইতে চাহিল না, আপনার বিশাল বিস্তৃত বুকটার উপর উহাকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া রহিল। উহার গায়ে ও যেন গিরির সৌরভ পাইতেছে, উহার দুইটি আয়ত চঞ্চল কালো চোখে গিরির সেই গর্ব জ্বলিতেছে বুঝি, উহার কথায় গিরির সেই অপূর্ব মাধুর্য! নদীর পারে সদ্য প্রসূত রাখকে সেইদিন উহাকেই ঘরে লইয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু একফোঁটা শিশুর প্রাণরক্ষা করিতে পারে তেমন সম্বল ত' উহার কিছুই ছিল না, তাই নিস্তারিনীর হাতে উহাকে সঁপিয়া দিয়া নিস্তার পাইয়াছিল। কিন্তু আজ? আজ রাখ ত' বেশ ডাগর হইয়াছে।

পঞ্চু কহিল,—সত্যিই তোর খিদে পায় নি ?

রাখ পঞ্চুর কাঁধের উপর মাথাটা তুইবার নাড়িয়া কহিল,—একটু-একটু পাচ্ছে !

পঞ্চু হাসিয়া কহিল,—আর খানিক বাদেই খুব ভাল করে' পাবে 'খন। চল্ আমার ঘরে। শশা খাবি ? ঐ ডোবাটার ধারেই শশার ক্ষেত। চল, ঢুকে পড়া যাবে। আমি থাকতে তোর ভয় নেই, রাখ।

রাখ কাঁধ হইতে মুখ তুলিয়া কহিল,—আমার ভয় করে এ কথা তোমায় কখনো বলেছি ? দিনের বেলা আবার ভয় কিসের ? কিন্তু, বাবাকে খুঁজবে না ?

পঞ্চু যেন এই অত্যল্পকালের মধ্যে সেই কথাটাই ভুলিয়া গেছে। রাখ-ও যে সংসারে ওরই মত নিরাত্মীয়, এই বুঝি উহার ধারণা ; তাই রাখ-র এই কথায় পঞ্চু যেন চাবুক খাইল। বলিল এই খুঁজছি।

তখন ধীরে-ধীরে ভস্মীভূত মেলা-প্রাঙ্গণে আবার লোক জমিতে সুরু করিয়াছে। কেহ ক্ষতির পরিমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া তুই একটা জিনিস কোঁচড়ে টপ্-টপ করিয়া তুলিয়া লইতেছে। ইহাদের মধ্যে জগ ও নয়ানের সাহসই তারিফ করিবার মত।

শশীকে কিন্তু এ-দিক ও-দিক কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পঞ্চুর মনে হইল এই মেলায় আসিয়া শশী হঠাৎ কাহারো মুখে দামিনীর আত্মহত্যার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ বিবাগী সাজিয়াছে। দামিনী ত' শশীরই সর্বস্ব ছিল,—এ-কথাটা স্বীকার করিতে পঞ্চুর মনে ব্যথা জাগিলেও ইহার চেয়ে সত্য ত' আর কিছু নাই। তাই তাহাকে খোয়াইয়া শশীর আর রহিল কি ? শশী ত' জানে না, দামিনী কাহাকে পাইবার আশায় এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়াছে—তাহা হইলে হয় ত' ও এত স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে পারিত না ; হায়, শশীর ভুলের মধ্যেও কত মধু আছে। সত্যই ত', রাখকে ও কোথায় রাখিবে,—কাহার জন্য রাখিবে ? তাই ভিড়ের মধ্যে নির্মম শশী উহার হাত ছাড়িয়া দিয়া আলগা হইয়া গেছে ! শশী কিছুই দোষ করে নাই।

দামিনী গলায় দড়ি দিয়াছে, ভালই করিয়াছে। যা হোক, শশীর বিশ্বাস ভাঙিয়া যায় নাই ত' ! মানুষের জীবনে সেইটাই কি কম লাভ ? দামিনী কাল রাত্রে গলায় দড়ি না দিয়া আজ যদি পঞ্চুর এই তুইটা বাসনাব্যাকুল বাহুর মালা গলায় তুলাইত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে শশী দাঁড়াইত কোথায় ? দামিনী মরিয়া ভালই করিয়াছে। দামিনীর বিরহে শশী যে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে— দামিনীর আয়ু আর ঘণ্টা-কয়েক টনটনে থাকলেই, সেই বিরহ উগ্র বিষের জ্বালায়

একেবারে কালো হইয়া উঠিত! দামিনী শশীকে ভাল না বাসিলেও শশী ত' উহাকে পঞ্চুর চেয়ে এক তিলও কম ভালবাসিত না! দড়িটা ত' তখন শশীরই গলায় উঠিত! যাক্, শশী বাঁচিয়া গেছে—ও আবার বিয়ে করুক,—তাতে কাহারও কিছু ক্ষতি নাই।

তবু, ইহারই মধ্যে পঞ্চু আর একবার অকস্মাৎ ভাবিয়া লইল,—দামিনী আর কয়েক ঘণ্টা সবুর করিয়া গেল না কেন?

আরো খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করিয়া পঞ্চু বলিল,—শশী এখানে নেই। তোর কিছু ভয় নেই, রাখ। আমার কাছেই থাকবি।

তারপর হঠাৎ স্বরটা আর্দ্র করিয়া কহিল,—তোর মা'র জন্যে মন কেমন করবে, রাখ?

রাখ তেমনি ঘাড় দুলাইয়া কহিল—মোট্টে না। মা-টা খালি আমাকে মারত।

—বাবার জন্যে?

—উহুঁ। আমাকে মারত না, কিন্তু কুকুরটাকে ভারি মারত। কুকুরটার জন্য ভারি মন কেমন করবে। আমি বাড়ি ফিরে না গেলে কলাই-শাকের ক্ষেতে ও আমাকে খুঁজে' বেড়াবে।

চলিতে চলিতে পঞ্চু বলিল,—আমি তোকে একটা কুকুর দেব,—খুব ভালো দেখে। তুলোর মত তুলতুলে নরম, ঠিক মাখনের মত। দাঁড়াতে বললে দু'পা তুলে' দাঁড়াবে, শুতে বললে শোবে, হাঁচতে বললে হাঁচবে।

বিপুল উৎসাহে রাখ পঞ্চুর গলাটা নিবিড়তর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া কহিল · সত্যি দেবে? মাইরি?

—পঞ্চু কহিল—দেব।

রাখ-র উৎসাহ আরো বাড়িয়া গেল। পঞ্চুর মুখটা উহার দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া কহিল—খুব ভালো দেখে দেবে? হাঁচতে বললে হাঁচবে? ঠিক?

—হ্যাঁ, দেখে নিস্।

—যদি বলি, চিৎ হ'য়ে শুয়ে পা নাচা',—নাচাবে?

—হ্যাঁ –

—তাই দিয়ো, পঞ্চু কাকা। দেখো, আমি ঠিক লক্ষ্মী ছেলের মত থাকব। সেই বাড়িতে তেমনি আমার একটা মা আছে? দেখো, আমি কক্‌খনো তার মার খাব না। আমি সারাদিন কুকুর নিয়ে খেলা করব। আমার ঐ আগের কুকুরটা,—জান পঞ্চু কাকা—যেমন বোকা, তেমনি বুড়ো! মাংস চিবোবার দাঁত নেই, তাই মুড়ি খায়। কোন্ বাড়ি থেকে ঘি খেয়ে এসেছিল, গায়ের সব লোম পড়ে' গেছে,—

—যত রাজ্যের পোকা কিলবিল করছে। ভারি ঘেন্না করে আমার। একেবারে হতচ্ছাড়া,—মরুক গে ও!

রাখ মনে মনে সেই অনাগত কুকুরের ছবি আঁকিতে লাগিল। জামা ছিঁড়িয়া উহার গলায় ও-বখলস বাঁধিয়া দিবে।

ডোবার ধারে শশার ক্ষেত,-কেহ ঝাঁকা বাঁধিয়া দেয় নাই বলিয়া মাটির উপরই লতাগুলি কোনো রকমে আঁকিয়া-বাঁকিয়া বাঁচিয়া আছে। রাখকে কোলে লইয়া পঞ্চু সেই দিকেই আগু বাড়াইল। রাখকে কিছু চাবাইতে না-দেওয়া পর্য্যন্ত পঞ্চুর কিছুই ভাল লাগিতেছে না।

কতদূর আগাইয়া আসিয়া পঞ্চু দেখিতে পাইল নিকটবর্ত্তী ডোবার ধারে খেজুর গাছের তলে বসিয়া এক দঙ্গল মেয়ে তারস্বরে জটলা পাকাইতেছে। পঞ্চু শশার ক্ষেত বাঁয়ে রাখিয়া তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া কাছে আসিয়া পড়িল।

প্রথমতঃ চট্ করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিলেও কাছাকাছি আসিয়া পঞ্চুর আর কোনো সন্দেহই রহিল না। কিন্তু মেয়েগুলির কাঙাল হতচ্ছাড়া অবস্থা দেখিয়া পঞ্চুর বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। চুল এলোমেলো, কাহারো কাপড় প্রায় পুড়িয়া গেছে, মুখে গায়ে ছাই মাথানো—উহাদের বীভৎস ও নির্লজ্জ দারিদ্র্য দেখিয়া ও অসহায় আর্তনাদ শুনিয়া পঞ্চুর অনুশোচনার যেন অবধি ছিল না। কুল খোয়াইয়া আসিয়া এই অগ্নিকুণ্ডে সকল ডালি দিয়া ইহারা একেবারে অকূলে পড়িয়াছে! কিছুই বাঁচানো যায় নাই।

ইহারই মধ্যে একটা মেয়ে গলা ছাড়িয়া চেঁচাইতেছিল। আগুনে তাহার সব গিয়াছে,-তাহার ট্রাঙ্কের মধ্যে কত বাবুর কি-কি উপহার ছিল তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়া সে তাহার কান্না ফেনাইতেছিল। তাহার কাপড় পুড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখও পুড়িয়াছে। এখান হইতে যে যাইবে তাহার ট্রেনভাড়া পর্য্যন্ত তাহার নাই। তাহার কি উপায় হইবে? গলায় দড়ি দিবার মত কাপড়টুকু পর্য্যন্ত তাহার কোমরে রহিল না!

কতকগুলি কচি শশা ছিঁড়িয়া আনিয়া আর একটা মেয়ে কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতেছিল। সে হাসিয়া কহিল—মুখ যখন পুড়েছে, তখন আর ভাবনা কি বিধু, বাকি কাপড়টুকু দিয়ে গাছকোমর বেঁধে গাছে ওঠ্ গে—

যে-হাসি লইয়া কথাটা শুরু করিয়াছিল কথা সারা হইলে তাহা একেবারে একটা তুবড়ির মত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মেয়েটি হাসিতে জানে।

কিন্তু এমন করিয়া হাসিতে জানে, পঞ্চু তাহা কোন দিন জানিত না।

তাড়াতাড়ি রাখকে কোল হইতে মাটিতে দুম্ করিয়া নামাইয়া দিয়া দুই বাহু অর্ধোন্মুক্ত করিয়া ডাকিয়া উঠিল,—কুঞ্জ!

কুঞ্জর হাসি তখনো থামে নাই। সে পুরামাত্রায় হাসিয়া তবে পঞ্চুর পানে তাকাইল,—তাহার দু'টি চোখে তখনো হাসি টল্‌টল্ করিতেছে।

পঞ্চু একান্ত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিল,—চিন্‌তে পাচ্ছ?

শশা চিবানো বন্ধ করিয়া কুঞ্জ কহিল,—খুব পাচ্ছি। ভালো? ঐ ছেলেটি কে? তোমার? কবে বিয়ে করলে?

এই এক মুহূর্তের মধ্যেই একান্ত অগোচরে পঞ্চুর মনে একটা মর্মান্তিক বেদনা জমিয়া উঠিতেছিল, সহসা আনন্দ-তরঙ্গের আঘাতে সমস্ত ক্ষোভ যেন নিমেষে অপসৃত হইয়া গেল। বিস্ময়াবিষ্ট দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া নিরাকুল নিরুদ্বিগ্ন উদাসীনের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কুঞ্জ গায়ের উপর কাপড়টা গুটাইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল,—কি আর দেখ্‌ছ? সব গেছে আমাদের,—মাথায় যে ঘোম্‌টা টান্‌ব, তা পর্য্যন্ত কাপড়ে কুলোচ্ছে না। দেখেছ, কেমন ফোস্কা পড়েছে? বেরিয়ে কি আস্‌তে পারি ছাই! দক্ষি-যজ্ঞি!

বলিয়া কুঞ্জ তাহার অনাবৃত বাহু ও পিঠটা পঞ্চুকে দেখাইল।

তবু, পঞ্চুর জিভের ডগায় কোন কথা জুয়াইল না। ও যেন অগ্নিকাণ্ডের মতই একটা পরম বিস্ময়-বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছে। দামিনীর মৃত্যুর মতই যেন এ অসম্ভব!

এ কয় বৎসরে কুঞ্জ-র কত পরিবর্তন হইয়াছে! আরো কত ঢ্যাঙা হইয়াছে, সেই গোল-গোল ফোলা-ফোলা নিরীহ মুখখানির রেখাগুলি যেন বুদ্ধিতে ও ব্যাভিচারে তীক্ষ্ণ হইয়াছে, সেই সদা-শঙ্কিত অপূর্ব কুণ্ঠার রমণীয়তা কাটিয়া গিয়া একটি চটুল প্রগল্‌ভতা দেখা দিয়াছে,—হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া গোপন হাসিটি আর নাই,—উহার হাসি আজ কি চঞ্চল ও অজস্র! তবু কুঞ্জকে পঞ্চুর ভারি সুন্দর লাগিল। ঘাড়ের উপর সেই কালো জড়ুলটি তেমনি অক্ষয় আছে।

সেই কুঞ্জ আর নাই,—নাই থাক্, তবু ত' এ কুঞ্জই। এ কুঞ্জই ত' একদিন সেই কুঞ্জ ছিল! কুঞ্জ বলিয়া ডাকা মাত্রই ত' পঞ্চুর সমস্ত আত্মা সমুদ্রের মত দুলিয়া উঠিয়াছে—কতদিন ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে এই নামটি ও উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল,—হয় ত' ইহজীবনে ঐ একটি শব্দ উহার জীবনের অভিধান হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইত। ও যে কুঞ্জ-র দেখা পাইয়াছে, এই ঢের।

কিন্তু কুঞ্জ-র দুর্দশা দেখিয়া পঞ্চুর চোখ কাটিয়া জল আসিতে লাগিল। উহার

গলার ও গালের হাড় ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে, সেই ছোট চক্ষু দুইটি কোটরে ঢুকিয়া আয়তনে বড় দেখাইতেছে, সেই নধর তনুলতা যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, ভারি কৃশ ও কর্কশ হইয়াছে। তবু, তবু,—সেই কুঞ্জ,— যে অনুরোধ করিলে পঞ্চু তারি পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতে পারিত,—সেই কুঞ্জ, একদিন স্পর্শ করিবার লোভে যাহার পা দুইটি লুকাইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

আজো, কুঞ্জ-র এই অধঃপতনের দিনেও পঞ্চু কেন যে তাহার নিজের ব্যবহারে একটি সৌন্দর্য-মণ্ডিত সঙ্কোচ বোধ করিতেছে, বুঝা কঠিন।

কুঞ্জ কহিল, তোমার দেখা পেয়ে ভালোই হ'ল। এই দেখেছ কাপড়ের ছিরি!—কিছু আর নেই। একেবারে ফতুর হ'য়ে গেছি, ভাই। এসেছিলাম বিবি সেজে, এখন একেবারে বাঁদির বেহদ্দ। ঢালের বদলে ঢোল সওদা করেছি। বলিয়া ফের ঘা-গুলি দেখাইয়া কুঞ্জ খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—ভারি খিদে পেয়েছে, শশা খাচ্ছি। তোর গানটা কি না, বিধু?

কাপড় খসা, চক্ষু বসা,
তাড়াই মশা, খাচ্ছি শশা।

বলিয়াই আর এক চোট হাসি।

কুঞ্জ কোথা হইতে এত কথা শিখিল? এত হাসি লুকাইয়া রাখিয়াছিল কোথায়?

কুঞ্জ আর-একটা শশায় কামড় বসাইয়া কহিল,—তোমার যাত্রা-গান কেমন হচ্ছে? কথা কইছ না কেন গো? আমরা ত' সব বেকার;—যে রকম সব ফোস্কা পড়েছে গায়ে,—প্রায় মাস খানেক লাগবে ঘা শুকোতে। চল, সবাই মিলে তোমার দলে ভিড়ে নেচে নি দিন কয়েক। বিধু খুব ভালো নাচ্‌তে জানে। সেই না কি গান গাইত সেই হোঁৎকা-মতন মাড়োয়ারিটা?

নাচ আমার বিধুবালা,
(আর) নাচে বুড়ো ঝুন্‌ঝুন্‌য়ালা।

হাসি থামাইয়া কুঞ্জ গম্ভীর হইয়া ফের কহিল,—হ্যাঁ ভালো কথা, আমাকে একখানা কাপড় এনে দিতে হবে, ভাই।

পঞ্চুর মুখে কথা ফুটিল: দিচ্ছি।

জামাটা আগেই পথে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; এইবার কাহাকেও দ্বিরুক্তি করিবার অবকাশ পর্যন্ত না দিয়া পঞ্চু কোমরের কাপড়টা খুলিয়া লইয়া মাঝামাঝি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কুঞ্জ-র গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল,—কোনো রকমে এ দিয়ে গা-টা ঢেকে দিয়ে চল আমার সঙ্গে—

কুঞ্জ চোখ মটকাইয়া প্রশ্ন করিল,—কোথায় ?

পঞ্চু কহিল,—আমার বাড়ি।

শুনিয়া কুঞ্জ-র লুটাইয়া-লুটাইয়া হাসি ! বলিল,—শুনেছ মাসী, আমায় বাড়ি নিয়ে যেতে চায় !

মাসীটি প্রৌঢ়া, তিন দিন হইতেই ধেনো গিলিতেছিলেন, না সামলাইতে পারিয়া যখন বমি করিতে যাইবেন, তখন মেলায় আগুন ধরিয়াছে। মেয়ের দল মাসী ও তাহার বগলের নীচে শক্ত-করিয়া-আঁকড়ানো মদের বোতলটা বাঁচাইতে গিয়া নিজেদের কিছুই বাহির করিতে পারে নাই। বমিতে মাখামাখি হইয়া মাসী ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছিল ; জড়িত স্বরে কহিল,—বাড়িতে সতীন আছে, মারবে তিন লাথি। সেই যে কি আছে না লো ছেনালি—

বাড়িতে বৌ পোয়াতি,
সোয়ামি মারলে তিন লাথি।

কুঞ্জ গাল দুইটা ফুলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—তা'লে যাব না, ভাই।

পঞ্চু অধীর হইয়া কহিল,—না, কেউ নেই। তুমি চল, কুঞ্জ। পিঠের ঘা-গুলো খুলে রেখো না, ওঠ। চচ্চড়ে রোদ্‌ —

ঘা-গুলির যন্ত্রণা অসহ্য বলিয়া, না পঞ্চুর আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া কে জানে, কুঞ্জ দাঁড়াইয়া নিজের অর্ধদগ্ধ বসনাঞ্চলে শরীরের নিম্নার্ধ ভালো করিয়া ঢাকিয়া পঞ্চুর দেওয়া ছিন্ন কাপড়টায় পিঠের উপর দিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

পঞ্চু হাত বাড়াইয়া কহিল,—এসো।

মাসী কহিল,—চল্‌লি ছুঁচোমুখি ?

কুঞ্জ হাসিয়া কহিল :

আসি ঘুরে দিন দুই,
খাই দাই ভুঁয়ে শুই।

আর একটা মেয়ে কুঞ্জ-র এই সৌভাগ্যে হিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছিল। এই দূরদেশে দুর্দিনে পড়িয়াও উহার কাঁদিবার সুযোগ মিলিল না ? সমস্ত হারাইয়াও ঠোঁটের হাসিটি হারাইল না ? এত বড় সর্বনাশের দিনেও পাশে দাঁড়াইবার মত উহার বন্ধু আছে ?

কুঞ্জ কহিল,—চল।

পরে বিস্মিত বিধুর দিকে চোখ ফিরাইয়া কহিল,—কি দেখছিস, বিধু—ক্ষেতের থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে শশা খা'। ট্যাং-ট্যাং করে' শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।

পিছন হইতে রাখ চেঁচাইয়া উঠিল—শশা দেবে না, পঞ্চু কাকা ?

পঞ্চু শুধু কহিতে পারিল,—চল, বাড়িতে আছে। এখানকার শশা খেলে অসুখ করবে। পোকা পড়েছে।

চলিতে চলিতে কুঞ্জ কহিল,—নিয়ে যাচ্ছ, কিছু কেলেঙ্কারি হবে না ত' ?

পঞ্চু হাতের মুঠা দুইটা শক্ত করিয়া ব'লল, কোন্ শালার সাধ্য কিছু বলে ? তোমার ঘা-গুলো শুকোলেই তোমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাব. ··যেখানে আমাদের কেউ চেনে না। যাবে ?

কুঞ্জ আস্তে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—যাব। যেখানে তোমার খুসি—

আজ যদি বেহারি বাঁচিয়া থাকিত ও এই পথে এখন দেখা হইয়া যাইত ! উদরি-রোগ ভালো করিতে গিয়া গ্রামের কবিরাজ 'বিষস্য বিষমৌষধম্' আওড়াইয়া উহাকে ধুতুরার গোটার সঙ্গে মাকাল ফল খাওয়াইয়া মারিয়াছে। ও বাঁচিয়া থাকিলে পঞ্চু কুঞ্জকে উহার বাড়ির উঠানের উপর দিয়াই লইয়া যাইত।

চলিতে চলিতে পঞ্চু ডাকিল,—কুঞ্জ !

—কেন ?

—না, এম্‌নিই ডাকছি। ঘায়ে খুব ব্যথা হচ্ছে ?

—বিশেষ না। তুমি বেশ ভালো আছ ?

—হ্যাঁ। তুমি ?

—আমিও।

উহাদের পিছনে পিছনে রাখ আসিতেছিল। পরে উহার মনে হইয়াছিল মাটির উপর কুঞ্জর পরিত্যক্ত কতগুলি শশা তখনো পড়িয়া আছে, কিন্তু এখন দৌড়িয়া গিয়া লইয়া আসিতে আসিতে উহাদের নাগাল পাইবে না ভাবিতে রাখ ভারি বিমর্ষ হইয়া গিয়াছিল। সত্যিই উহার ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে।

পঞ্চু পেছনে ফিরিয়া কহিল,—চল্‌তে পাচ্ছিস না, রাখ ?

রাখ কহিল—পাচ্ছি না ? এই দেখ—বলিয়া দৌড় দিয়া উহাদের দুইজনকে কাটিয়া বাহির হইয়া বহু দূরে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে ও জিরাইতে লাগিল।

উহারা তিনজনে আসিয়া নৌকা ধরিল।

নৌকায় চাপিয়া পঞ্চু কুঞ্জকে কহিল – আমার কাছে যে যাচ্ছ কুঞ্জ, আমার ত' কিছু নেই—

কুঞ্জ কহিল, আর আমার আজ কি-ই বা আছে ? তোমার ছেঁড়া কাপড় খানাই ত' আমার আজকের সম্বল।

পঞ্চু মুগ্ধ হইয়া কুঞ্জকে দেখিতে দেখিতে কহিল তবু আমার ডাকে তুমি এলে ?

কুঞ্জ কহিল, ডাকবার মতো ডাকলে কে না এসে থাকতে পারে, বল ?

ডাকবার মতো ডাকতে কি আমি জানি ? জানতাম না ত'। হঠাৎ কি ভাবিয়া পঞ্চু কহিল, - ওদের কি হ'বে ?

---হাতে গয়না আছে, রেল-ভাড়ার জন্য ভাব্‌তে হ বে না। শহরে একবার গড়িয়ে পড়্‌লেই আর কি !

পঞ্চু প্রশ্ন করিল,—আর তুমি ?

কুঞ্জ কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া তুইটি পরিপূর্ণ উদার দৃষ্টি পঞ্চুর মুখের উপর মেলিয়া ধরিল।

রাথ নদীতে পা তুইটা ডুবাইয়া বসিয়া নদী দেখিতেছিল, কুঞ্জ সহসা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া কহিল, তোমার নাম কি, খোকা ?

কুঞ্জর জন্যই রাথর শশা খাওয়া হয় নাই ভাবিয়া রাথ চটিয়া উত্তর দিল— আমার নাম নেই।

পঞ্চুর এলো ঘর আলো করিয়া কুঞ্জ আসিল।

ঘর খালি রাখিয়া যে-দিকে চোখ যায় উধাও হইয়া যাইবে, এ-কথা খানিক আগে যে কি করিয়া ভাবিতে পারিয়াছিল, ভাবিয়া পঞ্চু ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। কুঞ্জ যে-দিন খোয়া গিয়াছিল সে-দিনও পঞ্চু এতটা অভিভূত হয় নাই।

এখন, পঞ্চু খালি ভাবিতেছিল, ঘরটাকে মেরামত করিতে হইবে, ঘরামি লাগাইয়া দরমার বেড়াগুলিকে টেঁকসই না করিলেই নয়। মাটিতে শুইলে কুঞ্জর নিশ্চয়ই অসুখ করিবে,—মাটিতে মাতুর বিছাইয়া শুইবার অভ্যাসও তাহার আর নাই,—একখানা তক্তপোষ চাই,—বিছানা, বালিশ,– পঞ্চু মনে মনে আরও অনেক দরকারি জিনিসের ফর্দ করিয়া ফেলিল। রাথ-র জন্য একটা কুকুর যোগাড় করিতে হইবে।

কোথা হইতে পয়সা আসিবে সেই প্রশ্ন একবারও পঞ্চুর মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল না, -নিজে যে একেবারে গরিব, তুইদিন যে উহার হাঁড়ি চড়ে নাই, এই সব কথা পঞ্চু নিমেষে ভুলিয়া যাইতে শিখিয়াছে। এত সব অত্যাবশ্যকায় কাজ ফেলিয়া উহার বিবাগী হওয়াটা যে কত বড় বোকামিই হইত,—এই কথা ভাবিয়া পঞ্চু শিহরিয়া উঠিতেছিল। যাহারা বিবাগী হয়, ফিরাইয়া আনিবার মতো তেমন লোককে হারাইয়াছে বলিয়াই হয় ত' তাহারা আর ফিরে না, ভাসিয়া পড়ে।

পঞ্চুর অন্তরে আজ উৎসবের বাঁশি বাজিয়াছে। দামিনীকে হারাইয়া পঞ্চু এই গাছটার তলায়ই একটু বসিয়া জিরাইয়া লইয়াছিল,—সেই গাছের দিকে

চাহিয়া পঞ্চুর মনে হইল প্রত্যেকটি পাতা যেন অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট, ছায়াটি খুব ঠাণ্ডা, গাছের চূড়ায় বাসা বাঁধিয়া বাবুই পাখী দুইটা না জানি কতই সুখে আছে !

মেলা ভণ্ডুল হইয়া গেলেও লোকের মজা দেখা তখনও শেষ হয় নাই। তাই গ্রামের পথে তখনও বেশ ভিড় রহিয়াছে। পাছে লোকের বাজে ও সন্দিগ্ধ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হায়রান্ হইতে হয়. সেই ভয়ে কুঞ্জ ও রাখর প্রায় দশ বার গজ পিছনে পঞ্চু হাঁটিতেছিল, এবং সামনে থাকিতে কুঞ্জর দিকে চাহিতে অপূর্ব কুণ্ঠা ও আনন্দের ভারে চোখ বারে বারে নুইয়া পড়িতেছিল এখন দূরে যাইতেই পঞ্চু দুই চক্ষু তুলিয়া শুধু কুঞ্জকেই নয়, মাঠ, আকাশ,—সমস্ত কিছুই যেন তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু, সমস্ত আকস্মিক চেতনার মধ্যেই লুক্কায়িত একটি আঘাত থাকে বলিয়া হয় ত' পঞ্চু নিজেরও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটি বেদনার সাড়া পাইতেছিল। মনে হইল, কুঞ্জ সুখে নাই,—চটুলতার কৌশলে ও উহার দুঃখকে আড়াল করিতেছে,— উহার সমস্ত চলাটির মধ্যে যেন একটি পরিশ্রান্ত বেদনা মাখা।

বাড়ির কাছে আসিয়া ঘর-দোরের ছিরি দেখিয়া পঞ্চুর সমস্ত গা ছি-ছি করিয়া উঠিল। কি নোংরা আবর্জনার মধ্যে ও কুঞ্জকে লইয়া আসিয়াছে ! পঞ্চু হাসিয়া লজ্জা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,- ঘর-দোর ভারি বেহাল হ'য়ে আছে। দু'মিনিটে সব গুছিয়ে নিচ্ছি।

কুঞ্জ বাধা দিয়া কহিল,—থাক, আমিই পারব।

পঞ্চু আশ্চর্য হইয়া বলিল—তুমি ?

ছিন্ন ছোট্ট কাপড়টুকু দিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া কুঞ্জ কহিল,—হ্যাঁ, আমি। তোমার যদি লাগে দু' মিনিট, আমার এক পলক। বলিয়াই দাওয়ার কোণ হইতে একটা ঝাঁটা তুলিয়া কাজে লাগিয়া গেল।

মুখ চুণ করিয়া পঞ্চু কহিল,—তোমার যে ভারি কষ্ট হ'বে

কুঞ্জ ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল,— কষ্ট না করলে কি আর কেষ্ট মেলে ?

ইহার কিছুক্ষণ পরেই কুঞ্জ ভুরু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পয়সা-টয়সা কিছু আছে ? ভাঁরে ত' মা ভবানী ! নতুন ক'রে উনুন পাততে হ'বে পর্যন্ত।

পঞ্চু কথায় অনাবশ্যক জোর দিয়া কহিল,— না থাকে, জোগাড় করতে কতক্ষণ ?

কুঞ্জ কহিল—তাই জোগাড় কর গে। ছেলেটা গেল কোথায় ? সারাদিন ওর পেটে একটা দানা পড়ে নি।

রাখ তখন সামনের একটা পেয়ারা গাছের মগ ডালে উঠিয়া ডাঁসা-কাঁচা নির্বিশেষে পেয়ারা চিবাইতেছে।

পঞ্চু বাহির হইয়া পড়িল। জগু-নয়ানের মতো বেপরোয়া হইয়া সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে মাথা গলাইয়া দিলেই ভালো হইত, —ইত্যবসরে কুঞ্জ নিশ্চয়ই আর উড়িয়া যাইত না। কিন্তু, কে জানে!

কোনো রকমে টাকার যোগাড় হইল। গণেশ পৈতুণ্ডি দিনে টাকায় দশপয়সা সুদে দশটাকা ধার দিয়া ফেলিল। নোটটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইয়া পঞ্চু ফের চন্দন-গঞ্জের দিকে ছুটিল।

ছুটিল সত্যসত্যই। খালি, মাঝে-মাঝে ট্যাঁকে হাত দিয়া দেখিতেছিল নোট্‌টা বাহাল-তবিয়েত আছে কি না। মাথার উপরে রৌদ্র তখন ফাটিয়া পড়িতেছে, হাওয়ায় গায়ে ছ্যাঁকা লাগিতেছে,—কিন্তু এ-সব দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মতো সময় ত' পঞ্চুর নাই।

ঘুরিয়া-ঘুরিয়া পঞ্চু অনেক বাজার করিল। এই ছোট নোটটা দিস্তা থানেকের মতো হইলেও সমস্ত বাজারটাই মাথায় করিয়া কুঞ্জ-র পায়ের গোড়ায় পৌঁছাইয়া দিত হয় ত'। কিন্তু এই নোটটুকু ছোট হইলেও ঋণের আকারটা ভাবিয়া লইবার মতোও তাহার অবসর মিলিল না।

বাজার হইতে গন্ধমাদন মাথায় করিয়া পঞ্চু যখন বাড়ি ফিরিল, বেলা তখন গড়াইয়া গিয়াছে। রাখ তখন দাওয়ায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে, আর কুঞ্জ বেড়ায় পিঠ দিয়া সম্মুখের মাঠের দিকে স্থির উদাসীন দৃষ্টি মেলিয়া একেবারে প্রতিমার মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু পঞ্চুর চেহারাটা চোখে পড়িতেই নিমেষের মধ্যে কুঞ্জ আগুনের মতো দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল: তুমি কেমনতর লোক শুনি? আমাদের দু'টোকে তুমি অনাহারে মারবে নাকি।

পঞ্চু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল,—ফের চন্দনগঞ্জে যেতে হয়েছিল; সব ত' আর এ-গাঁয়ে পাওয়া যায় না। তোমার এ গাঁ ছাড়ার পর থেকে ত' রাতারাতি আর সব কিছু শস্তা হ'য়ে যায় নি।

—তা জানি। বলিয়া কুঞ্জ দাঁড়াইলল। বলিল,—একটা কাপড় এনেছ ত' আমার জন্যে?

পঞ্চু তাড়াতাড়ি মাথার উপর হইতে চিৎ-করা তক্তপোষটা নামাইল,—তাহারই উপর জিনিসপত্র গাঁদি করা আছে। কুঞ্জ কহিল—হঠাৎ এই তক্তপোষটা কিনলে যে?

—তোমার জন্যে।

কুঞ্জ বিদ্রূপ করিয়া কহিল—কেন আমি কি রাণী ভিক্টোরিয়া নাকি?

—কে বল্লে, নও ?

গম্ভীর কুঞ্জ গম্ভীর হইয়া গেল, কিন্তু বেশিক্ষণ না। কি-একটা দেখিতে পাইয়া আঙুল দেখাইয়া একটু নীচু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল.—কি ওটা ?

— ছোট্ট একটা কুকুর-ছানা। মধুসূদনের কাছ থেকে চেয়ে আন্‌লাম.—রাথ-র জন্যে।

কুঞ্জ তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া কুকুরের বাচ্চাটাকে একেবারে বুকে তুলিয়া লইল। গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল, বাঃ, কি সুন্দর মিট্‌মিট্‌ ক'রে চাইছে—নাকের ডগাটা কি সুন্দর তুলতুলে। সবে হয়েছে, না ?

কুকুরটাকে পাইয়া কুঞ্জ-র চোখে যেন ঘোর লাগিয়াছে।

পঞ্চু একটা পুঁটুলি বাহির করিয়া অপূর্ব স্নেহের সঙ্গে কহিল—তোমার জন্যে এই কাপড়খানা এনেছি—নাও।

একখানা পাছা-পেড়ে ডুরে শাড়ি, চওড়া লাল পাড়, পাটের সুতোয় বুটা তোলা। তাঁতি বাজারে অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেশি টাকা ধার রাখিয়া ও এই শাড়িখানি যোগাড় করিয়াছে—শাড়িখানির প্রতিটি সুতা ও যেন উহার সুশীতল স্নেহরসে সিক্ত করিয়া দিয়াছে, শাড়িখানি উহার অপর্যাপ্ত মমতার মতোই কুঞ্জর সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া থাকিবে।

কিন্তু শাড়ির চেহারা দেখিয়া কুঞ্জ হাসিয়া একেবারে কুটিকুটি হইয়া গেল। সে হাসি যেমন চমকপ্রদ তেমনিই নিষ্ঠুর। এ যেন বিদ্যুতের মতো সমস্ত আকাশ ঝলসাইয়া দিয়াই নিভে না, ছুরির মতো বুকটা এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া দেয়।

একখানা সাদাসিধে কাপড় হইলেই কুঞ্জর চলিত—এ কথা যদি পঞ্চু আজ কোনোমতেই বিশ্বাস না করিতে পারে, তাহা হইলে সত্যিই কি তাহার কিছু অপরাধ আছে ? কুঞ্জর দুটি হাতে ত' সেই আগেকার মোটা চুড়ি নাই ; ডায়মন-কাটা বালা—এমন কি যে চোখ সে আগে সরমের ভারে অর্ধস্ফুট করিয়া রাখিত তাহা এখন পূর্ণচন্দ্রের মতো মদিরায়ত হইয়া উঠিয়াছে—কুঞ্জ যে হাসিয়া হাসিয়া এমন করিয়া হাঁপাইতে পারে, তাহাও কি পঞ্চু আগে জানিত ? উহার কি দোষ ?

তবু সে স্বর মোলায়েম করিয়া কহিল—কিন্তু এ পরলে তোমাকে সত্যিই ভারি মানাবে, কুঞ্জ।

কুঞ্জ তখনো পাঁজরাটা চাপিয়া ধরিয়া হাসিতেছে ; তাহারই এক ফাঁকে দম লইয়া মুখ ঝামটা দিয়া কহিল—দূর ঢ্যামনা !

পঞ্চু অভিমান করিয়া কহিল—তবে দিয়ে দাও আমার শাড়ি। তোমার পরে' কাজ নেই।

হাসি বন্ধ করিয়া কুঞ্জ কহিল—ঢং দেখে আর বাঁচিনে। এই বুড়ো বয়সে এখনো এই তিন পেড়ে কাপড় পরে' বেহায়া সাজ্ঞি! মাগো!

পঞ্চুর ইচ্ছা হইল খুব কড়া-কড়া কথা শুনাইয়া কুঞ্জর হাসির ঝাঁজটা একেবারে বিষের মতো তিক্ত করিয়া দেয়, কিন্তু চট করিয়া মুখে কিছু জুয়াইল না বলিয়াই খালি কহিল—যাক, আমার শাড়ি পরে' তোমার আর কষ্ট করে' বেহায়াপনা করতে হ'বে না। ফিরিয়ে দাও, আমি ফের চন্দনগঞ্জে গিয়ে বদলে আনছি। একখানা আট-পৌরে কস্তাপেড়ে শাড়ি হ'লেই ত' চলবে? শুধু শুধু বেশি দাম দিয়ে তোমার হায়া কমিয়ে ত' কিছু লাভ নেই! দাও। বলিয়া পঞ্চু হাত বাড়াইয়া দিল।

সেই হাতে কাপড়টা না ফেলিয়া কোলের কুকুর-ছানাটাকে ফেলিয়া দিয়া কুঞ্জ কহিল—নাও। আর আদিখ্যেতা করতে হ'বে না। ঢের হয়েছে। ফের উনি চন্দনগঞ্জে যান, আর আমি ঘুমন্ত ছেলেটাকে পাশে নিয়ে মুখ গুঁজে একা-একা বোবার মতো বসে' থাকি! কে বললে তোমাকে? চমৎকার হয়েছে, কেয়াবাৎ হয়েছে, ভেরি গুড্ হয়েছে। বলিয়া শাড়িটা লম্বালম্বি অবস্থায় নিজের কাঁধে ঝুলাইয়া, পরে লম্বালম্বি করিয়া আরবার কোমরেও বাঁধিয়া লইল।

কুঞ্জ আবার কহিল,—আমার হাসি পেলে হাস্‌বো না বুঝি? বা রে! আমি তোমার মতো মুখ ভার করতে জানি না, খই ফোটার মতো বকর্‌-বকর্‌ করতে ভালোবাসি। দেখো, এই শাড়ি পরে' কেমন সাজি, তোমাকে তাক লাগিয়ে দেব, গাঁয়ের যেই দেখ্‌বে হাঁ হ'য়ে থাকবে।

নিমেষের মধ্যে পঞ্চুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্নেহার্দ্র চক্ষু দিয়া শাড়িটিকে আগাগোড়া যেন ধুইয়া দিল।

জিনিসপত্রের মধ্য হইতে একটা ছোট ঠোঙা বাহির করিয়া পঞ্চু কহিল,—তোমার জন্য চা এনেছি; তুমি চা খেতে খুব ভালোবাস,—সে কথা আমি ভুলি নি।

কুঞ্জ নির্লিপ্তের মতো কহিল, চা ত' আমি খাই না। সে কবে ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছ? বল কি?

—হ্যাঁ, ও সব হাঙ্গাম করবার মতো সময় নেই বাপু! কে অতসব যোগাড়-যন্তর করে? তা ছাড়া,—চা-এর রং একেবারে ফ্যাকাসে,—রংটা আরো একটু লাল হ'লে বরং—বলিয়া কুঞ্জ হাসিল।

কিন্তু পঞ্চুর সমস্ত অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল : ছি ছি!

কুঞ্জ কহিল,- বলি, চা'ল ডা'ল কিছু এনেছ, না অষ্টরম্ভা! সেই কখন থেকে উনুন পেতে, জল তুলে, শুকনো পাতা কুড়িয়ে সব ঠিকঠাক করে' বসে' আছি।

—এনেছি বৈ কি সব, যা তোমার চাই।

—ছাই এনেছ। বলিয়া কুঞ্জ রাঁধিবার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র লইয়া দাওয়ায় উনুনের ধারে গিয়া বসিল।

পঞ্চু দেখিল, ইতিমধ্যে কুঞ্জ সবই যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে,—সমস্ত জায়গাটি পরিচ্ছন্ন, একেবারে তকতক করিতেছে। দেখিয়া-দেখিয়া পঞ্চুর চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। কহিল, তুমি অত সব মেহনৎ করতে গেলে কেন? আমিই ত' পারতাম—

—ছাই পারতে। বলিয়া কুঞ্জ হাঁড়ির জলের মধ্যে চা'ল ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

পঞ্চু কুকুরের ছানাটা নিদ্রিত রাখর বুকের কাছে পরম স্নেহে নামাইয়া রাখিয়া, একলাই তক্তপোষটা লইয়া ঘরে ঢুকিল। উত্তরের জানালার ধারে তক্তপোষটা আড় করিয়া পাতিয়া একবার দেখিয়া লইল সমস্ত ঘরটির সঙ্গে ইহা ঠিক মানানসই হইল কিনা। বেশ হইয়াছে. উত্তরের জানালাটা খুলিলেই শ্বেতটগরের গাছটা; একেবারে বেড়ার গা ঘেঁসিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি কাঙাল কাহিল ডাল জানালা দিয়া গলাইয়া যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। দুইটি দুর্বল ফুল ফুটিয়াছে, —ভারি ভীরু! শুইয়া শুইয়া কুঞ্জ ইচ্ছা করিলে দেবদারু গাছের আগায় চাঁদও দেখিতে পারিবে।

সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশে তারারা ফুটি ফুটি করিতেছে। দুইটি হাতে অজস্র আদর ঢালিয়া পঞ্চু কুঞ্জর বিছানা পাতিল,—রাখকেও এইখানেই শুইতে হইবে। পঞ্চু একটি পিদিম্ জালাইয়া দেরখোতে বসাইয়া বিছানার শিয়রের কাছে রাখিয়া দিল। ছেঁড়া ওয়াড়-হীন বালিশটার ধারে দুইটি শ্বেতটগরের কুঁড়িও রাখিতে ভুলিল না।

রাখকে পাঁজাকোলে করিয়া ঘরে নিয়া বিছানাটার একধারে শোয়াইয়া দিবে বলিয়া পঞ্চু দাওয়ায় আসিল। আসিয়াই একেবারে চক্ষু স্থির। কুঞ্জ কখন্ যে রাঁধিবার ফাঁকে তাহার পরনের ছেঁড়া কাপড়টি বদ্‌লাইয়া পঞ্চুর-দেওয়া লাল-পাড় ডুরে শাড়িখানি পরিয়াছে, পঞ্চু মোটেই টের পায় নাই। ইহারই মধ্যে পুরানো কাপড়টার পাড় ছিঁড়িয়া ফিতা করিয়া খোঁপাও বাঁধিয়া লইয়াছে,—কলাপাতায় তেল মাখিয়া আগুনে ধরিয়া কাজল বানাইয়া চোখের ধারে রেখা টানিয়াছে। মরি মরি,—পঞ্চু তাহার চোখের দৃষ্টি সুকোমল করিয়া সুনিবিড় মমতায় চাহিয়া রহিল। কুঞ্জকে যেন উড়াইয়া নিতেছে।

কুঞ্জ পঞ্চুর কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল,—সিঁদুরের কৌটো আছে?

—সিঁদুরের কৌটো?—পঞ্চু আকাশ হইতে পড়িল।

ন্যাকামি করিয়া কুঞ্জ কহিল,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ,—সিঁদুরেই কৌটো! থাকলে দাও না, সিঁথেয় পরি।

ভ্যাবাচাকা হইয়া পঞ্চু বলিল, —সিঁদুর আমি কোথায় পাব? আমি কি সিঁদুরের বেসাতি করি?

মুখ গম্ভীর করিয়া কুঞ্জ বলিল,—তাও ত' বটে, তোমার ঘরে ত' আর লক্ষ্মী নেই আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে এনেছ একটা—

পঞ্চুর চোখের দিকে চাহিয়া কুঞ্জ থামিয়া গেল। বলিল, রোজ এমনি সন্ধেবেলা আমার বিয়ের লগ্ন আসে কি না,—তাই অভ্যেস হ'য়ে গেছে। আজই বা তার নড়চড় হ'বে কেন? বলি,—বিকেলে তোমাদের গাঁয়ে শাঁখ বাজে না?—বলিয়া কুঞ্জ মুখ টিপিয়া হাসিল।

শহরে থাকিয়া-থাকিয়া কুঞ্জ অনেক কথা শিখিয়াছে,—কিন্তু কথাগুলির উচ্চারণের মধ্যে যে কি অপূর্ব মাদকতা আছে পঞ্চু তাহা সমস্ত দেহমন দিয়া উপলব্ধি করিল। প্রথমে কোনো কথাই কহিতে পারিল না,—কিন্তু কথা বলিতে যাইয়াই টের পাইল চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিয়াছে! ঐ অর্ধচন্দ্রাকার সুচারু ললাটে যে সুন্দর সিন্দুরবিন্দুটি শোভা পাইত, তাহা ত' পঞ্চুই মুছিয়া লইয়াছিল।

কুঞ্জ এক গাল হাসিয়া কহিল—যাই বল ভাই. কপালে সিঁদুর নিয়েই ত' বেরিয়ে গেছলাম, আমার এয়োতির চিহ্ন আমি জলাঞ্জলি দেব কেন? থাকুন তিনি সুখে।

বলিতে বলিতে হঠাৎ কুঞ্জর স্বর যেন ভারি হইয়া চক্ষু দুইটি ক্ষণকালের জন্য স্তিমিত হইয়া আসিল।

ফেন উথলাইয়া পড়িতেছিল, হাতা দিয়া ভাতগুলিকে বার কতক ঘাঁটিয়া তেমনি আহ্লাদের সুরে কহিল,—তোমাদের গাঁয়ে এমনি আর আছে?

পঞ্চু কহিল,—এখানে নেই. তবে মিহিরকান্দিতে আছে ঘর কয়েক।

—মিহিরকান্দি? মিহিরকান্দি? দাঁড়াও, আমি চিনি সে-জায়গা। সেখানে যাওয়া যায় পঞ্চু-দা?

পঞ্চু কোন কথা কহিল না। কুঞ্জ আপন মনেই কহিল,—এই পোড়ামুখ আর কাকেই বা দেখাব? যাবার জায়গাই বা কোথায়?

—কিন্তু তোমার থাকবার জায়গার কি সত্যিই অভাব হয়েছে, কুঞ্জ?

—অভাব হয় নি, না? রাঁধতে-রাঁধতে দেখছিলাম গাবগাছের আগায়

কালো-কালো বাতুড় ঝুলছে,—দেখতে খুব ভালো লাগছিল। কত কথাই মনে পড়ছিল যে—

হঠাৎ পঞ্চু প্রশ্ন করিল,—মিহিরকান্দি বুঝি খুব মিষ্টি, না?

কথার সুঁরে কুঞ্জ প্রথমে একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, সামলাইয়া লইয়া কহিল,—ছাই! মিষ্টি না হাতী? মিষ্টি হ'লে বুঝি সেই গাঁ ছেড়ে কেউ শহরে গিয়ে ঘর বাঁধে? বলিহারী বুদ্ধি তোমার! আর এই ঘরটা তেতো বলে'ই ত' সেধে এখানে হাঁড়ি ঠেলছি! বেশ!

—তবে সেখানে যেতে চেয়েছিলে কেন!

—ও হরি! ঘটে তোমার এতটুকু বুদ্ধিও নেই? সেইখানে যে আমার কুস্‌মি থাকে, বাবুর সঙ্গে শহর থেকে গাঁয়ে বেলে-হাঁস শিকার করতে এসেছে—সে যে আমার সই। পৃথিবীর কোন খবর রাখ না,—সাধে কি আর অজ-পাড়াগেঁয়ে বলে? রামকেষ্ট!

পঞ্চু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল,—সেখানে তোমার যাওয়া হ'বে না।

কুঞ্জ-ও মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—কে যেতে চায় সেখানে? বেশ ত',—তোমার হুকুম তালিম করতেই ত' আমি এখানে এসেছি!

কুঞ্জ মুখ ফিরাইয়া রান্নায় মনোনিবেশ করিল।

রাখ ও পঞ্চুকে খাওয়াইয়া নিজে কিছু খাইয়া বা না খাইয়া কুঞ্জ যখন উঠিল রাত তখন অনেকটা। রাখ কুকুর-ছানাটাকে লইয়াই তক্তপোষের উপর একধারে গিয়া শুইয়া পড়িল। নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া রাখ-র কাছে সমস্ত কিছুই খুব আশ্চর্যজনক মনে হইতেছিল। বাড়ি ফিরিয়া যাইবার তাড়া নাই, ঠাণ্ডা মাটির বারান্দায় শুইতে হইল না, কেমন পেট ভরিয়া ভাত খাইল—রাখ-র বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। পরিচিত গৃহকোণের জন্য উহার এতটুকুও বেদনা-বোধ নাই। এই ভাল! এই ছোট একরত্তি কুকুর-ছানাটাকে উহার বড় করিতে হইবে, সমুখের তুই পা তুলিয়া দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়াইবে, ধুলায় গড়াগড়ি দিতে বলিলেও আপত্তি করিবে না। ভাবিতে-ভাবিতে রাখ ঘুমাইয়া পড়িল।

কুঞ্জ দরজায় হাত রাখিয়া কহিল,—ভেজিয়ে দেব নাকি?

পঞ্চু কুঞ্জ-র প্রসারিত বাহু তুইটির পানে তাকাইয়া কহিল,—দাও।

হাসিয়া কুঞ্জ বলিল,—তুমি কোথায় শোবে?

—রোজ রাত্রে সেখানে শুই,—এই দাওয়ায়।

কুঞ্জ খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল,—আর, ঘরের মধ্যে বুঝি ইঁতুর আর আরসুলার ফুলশয্যা? একবার শহরে গিয়ে বুদ্ধিটায় কিছু পালিশ দিয়ে এস গে।

কণ্ঠস্বরে অপূর্ব স্নেহ ঢালিয়া পঞ্চু কহিল, তুমি একদিন এই ঘরে আসবে সেই আশায় আমার ঘরের দরজা খোলা রেখেছিলাম, কুঞ্জ—

—আর সেই দরজাই বুঝি আমি এসে তোমার মুখের ওপর বন্ধ ক'রে দেব? তোমার মাদুরটা নিয়ে ভেতরে চলে' এস শিগ্‌গির। আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে।

পঞ্চু তবু নড়িল না।

কুঞ্জ অভিমান করিয়া কহিল,—আমাকে তোমার এতই ঘেন্না? তবে আমার হাতে ভাত খেলে কেন?

পঞ্চু হাসিয়া কহিল,—ঠিক তার উল্টো, কুঞ্জ। তুমি যাও, শোও গে, ঘুমে তোমার চোখের পাতা ঢুলছে। দেরি কোরো না।

কুঞ্জ দরজা বন্ধ না করিয়াই নিঃশব্দে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

পঞ্চু হাঁকিয়া কহিল,—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও। আমি বুঝি রাত জেগে-জেগে দাওয়ায় বসে' তোমাকে পাহারা দেব? আমার চোখে বুঝি ঘুম নেই?

ভিতর হইতে কুঞ্জ-র কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পঞ্চুর মনে হইল কুঞ্জ নিশ্চয়ই অভিমানে মুখখানি ম্লানতর করিয়া চক্ষু বুজিয়া একান্ত দুঃখীর মত শুইয়া আছে; একবার ইচ্ছা হইল, কুঞ্জ-র কপালের কাছের চুলগুলি একটু আদর করিয়া স্পর্শ করে, আদর ঢালিয়া উহাকে দুইটি কথা কয়। কিন্তু পঞ্চু মাটির দেওয়ালে পিঠ দিয়া তেমনি বসিয়াই রহিল।

পঞ্চু যেন তৃপ্তির রসে একেবারে নাহিয়া উঠিয়াছে। কে ভাবিয়াছিল, পলাতকা কুঞ্জ আবার একদিন ভীরু বনকপোতীর মত তাহারই ভগ্ন নীড়ে ফিরিয়া আসিবে! —পঞ্চুর চক্ষু রাত্রির আকাশের মত কোমল ও আর্দ্র হইয়া উঠিল। অনেক রাতে কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ শীর্ণ চাঁদ দেখা দিল, তাহারই আবছা আলো যেন সস্নেহ সান্ত্বনার মত দাওয়ায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। চাহিয়া-চাহিয়া পঞ্চুর চোখ জুড়াইল। সমস্তটি দাওয়া একেবারে তক্‌তক্ করিতেছে,—কুঞ্জ-র কল্যাণহস্তের সেবায় কোথাও আর এতটুকুও খুঁত নাই; উঠান হইতে শুরু করিয়া সমস্ত কিছুই যেন শ্রীমন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে নারিকেল গাছের পাতাগুলি শির-শির করিয়া কাঁপিতেছিল,—তাহারই দিকে চাহিয়া পঞ্চু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

আজ সমস্ত দিনটা আগাগোড়া কি ভাবে যে কাটিয়া গেল পঞ্চু ভাবিয়া থৈ পাইতেছিল না। দামিনী গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতে না ঝুলিতেই এ কোথা হইতে আসিয়া পেলব বাহুলতা দিয়া উহাকে বেড়িয়া ধরিল। থলি উজাড় করিয়া দিয়া আসিয়া হাটের মাঝে ধুলার নীচে কী মণি মিলিল আজ! জগতে এ কথা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছে? দামিনী যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তবে পঞ্চু ছুটিয়া

গিয়া সবারই আগে উহাকেই এই শুভসংবাদ চেঁচাইয়া শুনাইয়া আসিত। দামিনীকে মনে-মনে গালি দিয়াছিল বলিয়া পঞ্চু ভারি ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল, মনে-মনেই সেই গালিগুলি ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে জখম করিল। কিন্তু দামিনী এত বড় ভুল করিতে গেল কেন? দামিনীকে পঞ্চু চাহিয়াছে বটে, কিন্তু ভালবাসিতে ত' চাহে নাই। দুইটা জলজ্যান্ত চক্ষু থাকিতে মানুষে এমন ভুলও কখনো করে!

হঠাৎ পঞ্চুর মনে হইল কে যেন নারিকেল গাছটার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঠাহর করিয়া দেখিল, দামিনী। যেন উহার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া নিষ্ঠুর উপহাস করিতেছে, যেন আঙুল নাড়িয়া উহাকে কি শাসাইতেছে, যেন ও ইহার মর্মান্তিক প্রতিশোধ নিবে। পঞ্চুর ভারি ভয় করিতে লাগিল। পরক্ষণে চক্ষু দুইটা ভালো করিয়া কচলাইয়া লইয়া দেখিল,—না, কেহ নয়; রাতের বাতাসে ধীরে-ধীরে একটা কলাগাছের পাতা নাড়িতেছে।

কুঞ্জ হয় ত' এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু খোলা দরজাটা দিয়া মুখ বাড়াইয়া একবার দেখিয়া লইবারও উহার সাধ হইল না। উহার মনে আর যেন এতটুকু উদ্বেগ এতটুকু ফেনিলতা নাই। সমুদ্র যেমন দুই তীরের বন্ধনের মধ্যে পরিপূর্ণ ও সুগভীর, তেমনিই পঞ্চুর হৃদয়ের মধ্যে কোথা হইতে যেন একটি প্রশান্তিপূর্ণ সংযম আসিয়াছে। কুঞ্জ-র আবির্ভাবে পঞ্চুর ক্লিষ্ট মন যেন মুহূর্তের মধ্যে একেবারে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে,—উহার দেহে নূতন শক্তি আসিয়াছে, মনে সুকোমল প্রসন্নতা, অপর্যাপ্ত সৌন্দর্য ও আশা,—কিন্তু হৃদয়ের কোন আনাচে এতটুকু লোভও উঁকি মারে নাই। কুঞ্জ-র আসিবার দিন যেন পঞ্চুর মুক্তি-স্নানের দিন।

মনে-মনে পঞ্চু আরো কত কাজ গুছাইয়া লইতে লাগিল,—এখানেই কিছু একটা কাজকর্মের যোগাড় করিয়া লইয়া কিছু পয়সা জমাইয়া ও কুঞ্জকে শহরে লইয়া যাইবে। শহরের কথা ভাবিতে পঞ্চুর গা আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, ও যেন চক্ষু মেলিয়া সম্পূর্ণ করিয়া সমগ্র ছবিটাকে দেখিয়া লইতে পারিতেছে না। শহরে গিয়া ও ছোট একখানি একতলা বাড়ি কম দামে ভাড়া লইবে। এ গ্রাম হইতেই ত' কত লোক কল-কারখানায় গিয়া মাথা গুঁজিয়াছে,—মুখে ভাত গুঁজিবার সঙ্গতির অভাব পঞ্চুর সেখানে কখনই হইবে না। সেই শহরে কম ভাড়ার একতলা বাড়িটির একটি ছবি মনে-মনে আঁকিয়া-আঁকিয়া পঞ্চু মুগ্ধ হইয়া গেল। ঝুল-মাখা রান্নাঘরটিতে ভোরের রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, কুঞ্জ বঁটির উপর বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, পঞ্চু দূরে বসিয়া অল্প-অল্প ঠাট্টা-মস্করা করিতেছে আর হাসিয়া কুঞ্জ কুটিকুটি হইয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। আজ সন্ধ্যায় তরকারি কুটিবার সময়

কুঞ্জকে যে কত সুন্দর দেখাইতেছিল, তাহা পঞ্চু ছাড়া পৃথিবীতে চোখ ভরিয়া আর কে দেখিল!

যাত্রাদলের পোষাকের ট্রাঙ্কটা কাঁধে করিয়া পঞ্চু গাঁয়ে-গাঁয়ে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে না। ও এখন জুড়াইতে চায়। বেদের মত ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ও একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন একটু ঘুমাইতে পারিলে ও বাঁচে। আর কিছু নয়,—কুঞ্জ যদি দূরে দাঁড়াইয়া উহার আঁচল দিয়া একটু হাওয়া করে তাহা হইলেই যথেষ্ট।

পঞ্চু দেয়ালে পিঠ দিয়া তেমনিই বসিয়া রহিল। ও আজ সমস্ত রাত জাগিয়া কুঞ্জকে রক্ষা করিবে। কুঞ্জ ঘরের ভিতর শুইয়া আছে,—এত বড় সৌভাগ্য এর আগে কাহারও ঘটিয়াছে বলিয়া পঞ্চু শোনে নাই।

ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর শুইয়া কুঞ্জ-রও ঘুম আসিতেছিল না। বালিশে চিবুক রাখিয়া উবু হইয়া শুইয়া সেই তখন হইতেই উত্তরের খোলা জানলাটা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। খালি মাঠ আর মাঠ · মলিন জ্যোৎস্নায় ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে,– কোথাও এতটুকু সাড়া নাই। নিজের নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে শুনিতেই উহার নিশ্বাস ভয়ে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে উহার খালি মনে হইতেছিল কে যেন উহার কানের কাছে মুখ আনিয়া উহাকে মৃদুকণ্ঠে ডাকিতেছে! না, কেহ না, পাশে রাথ অঘোরে ঘুমাইয়া! উহার ঘুমন্ত মুখখানা কি সুন্দর! কুঞ্জ আদর করিয়া উহার কপালের চুলগুলি ধীরে ধীরে মাথায় তুলিয়া দিতে লাগিল।

মাঠের মধ্য দিয়া গ্রামের পায়ে-চলা বালির রাস্তা,– আঁকিয়া-বাঁকিয়া কত দূর যে চলিয়া গিয়াছে, কিছুরই ঠিকানা নাই। কুঞ্জ বারে বারে চক্ষু মেলিয়া ব্যাকুল বেণুস্বরের মত সেই উধাও পথটি অনুসরণ করিতে গিয়া বারে বারেই চোখ বুজিল। পথটি যেন পরিশ্রান্ত হইয়া দিগন্তশেষের অন্ধকারে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ঐ পথ দিয়াই হয় ত' মিহিরকান্দি যাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া এখন হাঁটিতে সুরু করিলে হয় ত' ভোর হইবার আগেই সেই পিটালি গাছটার পাশে সেই পরিচিত উঠানটিতে গিয়া ও দাঁড়াইতে পারিবে। এখন না জানি তিনি কি করিতেছেন! নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া আছেন। পাশে তাহার রাঙা শাড়িপরা টুকটুকে বৌ, লজ্জায় বিছানার সঙ্গে যেন একেবারে লেপ্‌টাইয়া রহিয়াছে,– কুঞ্জ নিজে যেমন আগে লজ্জায় হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া হাসি লুকাইত! সেই মেয়েটির ফুলো-ফুলো ট্যাপা ট্যাপা গালে নিকুঞ্জ হয় ত' তেমনি করিয়া চুমু খায়, মেয়েটি তেমনিই হয় ত' একেবারে সরমে মরিয়া যায়! হয় ত' সেই মেয়েটির কোল ঘেঁষিয়া একটি

টুকটুকে ছেলে, কচি কচি দু'টি মুঠি তুলিয়া খেলা করে,—কুঞ্জ আর ভাবিতে পারে না, মাঠের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া রাখ-র মুদ্রিত পদ্মের মত সুন্দর মুখখানার উপর রাখে!

জীবনের বাকি রাতগুলির মধ্যে একটা রাত উহার এমন করিয়া কাটিবে কুঞ্জ তাহা কোনোদিনই ভাবে নাই। সর্বস্ব খোয়াইয়া পঞ্চুর পিছু-পিছু উহাকে সখ করিয়া এই পোড়ারমুখ পাড়াগাঁয়ে আসিয়া রাত কাটাইতে হইবে, শহর ছাড়িবার সময় কুঞ্জ কি তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিল? অথচ সেই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তরের পারে প্রফুল্লমুখে পঞ্চু যখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কী অভাবনীয় আনন্দের সম্ভাবনায় কুঞ্জ-র আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! নিমেষের মধ্যে কুঞ্জ-র মনে হইল, নিকুঞ্জ যেন উহাকে ডাকিয়া নিবার জন্য নিজে সাধিয়া লোক পাঠাইয়া দিয়াছে। তাই পঞ্চু যখন বলিল: চল,—তখন কুঞ্জ এমন ভাবে উহার সঙ্গ লইল যেন এতকাল ও ইহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাড়িউলি ও সহযাত্রিণীদের বিস্ময়ের শেষ ছিল না,—কিন্তু নতুন একটা বাবু পাকড়াইয়াছে - এমনি একটা বিকৃত অর্থ ইঙ্গিতে উহাদের বুঝাইয়া দিয়া অন্তরে কী ব্যগ্রতা নিয়াই পঞ্চুর ডাকে পা বাড়াইয়া দিল! চুপি-চুপি একবার নিকুঞ্জকে দেখিয়া লইতে উহার ভারি সাধ গিয়াছে।

মনে-মনে কুঞ্জ-ও ছবি আঁকিতে পারে। যেন এই ভোর হইল, বৌটি গোবরছড়া দিয়া ভিটে-মাটি লেপিয়া পাতা জ্বালাইয়া নিকুঞ্জের জন্য চা তৈরি করিতে বসিল। নিকুঞ্জ তেমনই মিথ্যামিথ্যি গলার মধ্য দিয়া কাটারি চালাইয়া দিয়া হয় ত' বৌটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; বৌটি এতদিনে ছল ধরিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আর ভয় পাইল না, বাটি করিয়া চা ধরিয়া দিল। সেই কলাইকরা কোণ-ভাঙা বাটিটি কি এখনো বাঁচিয়া আছে? চা খাইয়া বৌটির গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া নিকুঞ্জ এই বাহির হইয়া গেল, - নিকুঞ্জর চলাটিও ও ভোলে নাই। বৌটি যখন চলে তখন উহার কনুই দু'টিতে কুঞ্জর মত তেমনি ছোট-ছোট দু'টি টোল পড়ে কি না কে জানে!—লাউয়ের মাচায় লাউ ঝুলিয়া রহিয়াছে, বড় বড় মোলায়েম পাতাগুলিতে শিশির পড়িয়াছে, ডগাগুলি রোগা আঙুলের মত যেন নড়িয়া-নড়িয়া ডাকিতেছে,—কুঞ্জ সমস্ত মনে করিতে পারে।

শেষ রাত্রে পঞ্চু বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল,—ধড়মড়াইয়া জাগিয়া উঠিতেই দেখিল চারিদিক বেশ ফর্সা হইয়া আসিতেছে। চট্ করিয়া উহার সমস্ত কথা বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই মনে পড়িয়া গেল। কুঞ্জ,—কুঞ্জ,—সমস্ত হৃদয় যেন কথা

কহিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঘরে গিয়া দেখিল, কুঞ্জ নাই,—তক্তপোষের এক পাশে পড়িয়া রাখ তখনো ঘুমাইতেছে শুধু।

মুহূর্তমধ্যে সমস্ত কিছুই যেন ওলোট্‌পালোট হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাহিরের মাঠের কাছে নারিকেলতলায় কুঞ্জকে দেখিতে পাইয়া পঞ্চু আশ্বস্ত হইল। কুঞ্জ চিত্রার্পিতের মত সম্মুখের বিস্তীর্ণ মাঠের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। পঞ্চু ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—কখন তোমার ঘুম ভাঙ্‌ল? আমি ত' একটুও টের পাইনি।

চোখে হাসি ভরিয়া কুঞ্জ বলিল,—ভারি পাহারা দেওয়া হচ্ছিল। যদি চোর এসে দরজা খোলা পেয়ে নিয়ে যেত চুরি করে'? আমি কিন্তু টুঁ শব্দও করতাম না।

পঞ্চু কহিল—নিতে পারলে ত'?

কুঞ্জ তেমনি হাসিয়া উত্তর করিল,—হ্যাঁ, আমি যেন সেই চোরের আশায়ই বসে' থাকি! খাঁচার দরজা খোলা পেলেই পাখী পালায়।

পঞ্চু বলিল,—আমার পাখী ছাড়া পেলেও আবার উড়ে' এসে জুড়ে' বসে।

—ইস্? ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া কুঞ্জ কহিল।

—ইস্ না টিস্! পঞ্চু ঠাট্টা করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল।

হঠাৎ কুঞ্জ উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল,—কি সুন্দর এই ভোরবেলাটা,—ভারি চমৎকার! হাওয়া না পেয়ে শহরে প্রাণ আইঢাই করছিল,—খালি ধোঁয়া আর ধুলো! এখানে এসে বাঁচলাম। খুব সুন্দর, না?

পঞ্চু সর্বান্তঃকরণে বলিল,—সুন্দর!

গ্রামে এত সৌন্দর্য ছিল কোনো দিন পঞ্চুর চোখে পড়ে নাই, কিন্তু কুঞ্জ-র কথায় সায় দিয়া ও সমস্ত দেহ-মন দিয়া যেন এই সৌন্দর্যটি অনুভব করিল।

কুঞ্জ বলিল,—এই পথটা অনেকদূর চলে' গিয়েছে, না? কি সুন্দর সরু রাস্তা; থোকা-থোকা অশোকফুল ফুটেছে বুঝি!

পঞ্চু কহিল,—মিহিরকান্দি ছাড়িয়ে তেলগোলা পেরিয়েই খাল

—মিহিরকান্দি ছাড়িয়ে? বল কি? সে ত' বহুদূর, না?

—না, এমন আর দূর কি! মাইল পাঁচেকের বেশি নয়।

মাইল পাঁচেক! সে না জানি ক' কদম হাঁটিলে তবে পৌছুনো যায়। কুঞ্জ-র একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে,—একবার শুধু তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া আসিবে।

পঞ্চু কহিল,—চল না, এই রাস্তা ধরে' খানিকটা হেঁটে আসি। এখনো কারু ঘুম ভাঙে নি।

কুঞ্জ খুসি হইয়া কহিল,—চল।

পরে রাস্তায় পা দিয়াই বলিয়া উঠিল,—কি সুন্দর রাস্তা!

মিহিরকান্দির রাস্তাটি যেন কুঞ্জ-র চোখে লাগিয়া রহিয়াছে। কাজে-অকাজে সব সময়ই উঠানে নামিয়া আসিয়া পথশেষের দিগন্তরেখা পর্যন্ত চোখ বুলাইয়া লয়, শিশিরসিক্ত প্রভাতবেলাটিরই মত মুখখানি নম্র, কোমল হইয়া আসে।

কুঞ্জ উনুনের কাছে বসিয়া চা বানায়, পঞ্চু ঝাঁকা হইতে কুমড়োফুল ছিঁড়িয়া আনে। হাসিতে-হাসিতে কাছে আসিয়া বসে, বলে, তোমার খোঁপাটা এগিয়ে আন, কুঞ্জ, একটি ফুল গুঁজে' দিই।

কুঞ্জ তেমনি লজ্জার ভান করিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া হাসিতে চেষ্টা করে, সেই ফাঁকে পঞ্চু দড়ি-বাঁধা খোঁপার ফাঁকে ফুল গুঁজিয়া দেয়।

কুঞ্জ বলে,—তুমি ভারি দুষ্টু হ'য়ে উঠেছ—

পঞ্চু বলে,—আর তুমি মিষ্টি –

বলিয়াই ছড়া কাটে :

> চিমটি মিঠা, মিষ্টি চুমা মিষ্টি তোমার চা,
> আর মিষ্টি তোমার হাতের আঙুল, মিষ্টি দু'টি পা।

কুঞ্জ খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই পঞ্চুর বাহুতে একটা চিমটি কাটিয়া দেয়; বলে,—খাও মিষ্টি।

চা খাইতে-খাইতে পঞ্চু ফট্ করিয়া বলিয়া বসে,—আগু-পিছু দুইই হ'ল, মাঝেরটা আর বাকি থাকে কেন?

বাকি থাকে বটে, কিন্তু গরম গ্লাশটার কিনারা ছুঁইবার জন্য কুঞ্জ যখন তার ভীরু ভঙ্গুর ঠোঁট দু'টি প্রায় ছুঁচলো করিয়া আনে, পঞ্চু তাহাই তাকাইয়া দেখে। কুঞ্জ চোখ দু'টি একটু নীচু করিতে করিতে কথা-ভরা আভা লইয়া আচম্বিতে একবার পঞ্চুর দিকে তাকাইয়া ফেলে।

হঠাৎ কাঁচের গ্লাশটা মুখ হইতে নামাইয়া লইয়া কুঞ্জ হাসিয়া উঠে,: ঐ দেখ, রাথ-র কাণ্ড।

রাথ উঠানে তখন সার্কাস দেখাইতেছে,—আশে-পাশের ছেলেমেয়েরা আসিয়া ভিড় পাকাইয়াছে। রাথ-র নবলব্ধ কুকুরটা চিৎ হইয়া শুইয়া, তাহার বুকের উপর পাতলা একটা তক্তা, এবং তাহারই উপরে চারি পা রাখিয়া ও-পাড়ার মিনি বিড়ালটা দাঁড়াইয়া যেন একেবারে ঘাবড়াইয়া গেছে। এই মিনিকে পাকড়াইয়া বশে আনিবার জন্য কাল সমস্ত দিন ধরিয়া রাথকে কম মেহনৎ করিতে হয় নাই।

পিঁড়ি ছুঁড়িয়া উহার পিছনের পা ভাঙিয়া দিয়া পরে গলায় দড়ির গেরো দিয়া তবে উহাকে কাবু করিতে হইয়াছে।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে রাথ-র মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। উহার নিজের না-হয় বন্ধু জুটাইতে বেগ পাইতে হইবে না—ইতিমধ্যে দু' একটি জুটিয়া উহার কনুইয়ের গুঁতার অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছে; কিন্তু টেবি কুকুরটা বন্ধু-বিহনে কি করিয়া দিন কাটাইবে? টেবির সঙ্গে মিনির বন্ধুতাটা কায়েমি করিয়া লইবার জন্যই রাথ এই কসরৎ দেখাইতেছিল।—মিনির গলার দড়িটা রাথ-র হাতে ধরা, রাথ-র মুখে খই ফুটিতেছে,—সে-ভাষায় অনর্গল অজস্রতাই আছে, অর্থ নাই,- সবাই ভাবিতেছে এ নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় মন্ত্র,—নতুবা এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে? রাথ প্রহারের প্রচণ্ডতায় ও আলৌকিক মৌলিকতায় সকলের চোখে বড়ো হইয়া উঠিল। রাথ মিনিকে 'ঠ্যাং তোল্' বলিয়া তাহার ভাঙা পায়ে একটা লাঠির খোঁচা মারে, মিনি পিছনের পা-টায় ফের ঘা খাইয়া তুলিয়াই রাখে যা হোক্। সবাই বিস্ময়ে শব্দ করিয়া উঠে।

ঘরে বসিয়া কুঞ্জ একেবারে গড়াইয়া পড়ে, বলে,—দেখ দেখ রাথ-র ওস্তাদি।

পঞ্চু রাথ-র দিকে না চাহিয়াই অঞ্জলিতে করিয়া কুঞ্জ-র হাসির মুক্তা কুড়াইয়া লয়। অতি সন্তর্পণে ট্যাঁক হইতে একটি কৌটা বাহির করিয়া বলে,—তোমার জন্য সিঁদুর এনেছি, সিঁথিতে পরিয়ে দি এস।

—সিঁদুর? কুঞ্জ-র মুখের হাসি হঠাৎ শুকাইয়া যায়।

—হ্যাঁ, তুমি চেয়েছিলে, সিঁদুর না আঁকলে তোমাকে নাকি আর মানায় না, চেনা-চেনা লাগে না!

একটু হাসিয়া কুঞ্জ কহিল,—দাও আমার হাতে।

পঞ্চু কিছুতেই হাতে দিবে না। বলিল,—না, আমি এঁকে দিই।

কি ভাবিয়া মাথাটা নীচু করিয়া কুঞ্জ পঞ্চুর দিকে আগাইয়া আসিল। পঞ্চু তাহার আঙুলের ডগায় সমস্ত বিশ্বের স্নেহের স্পন্দন লইয়া অতি ধীরে-ধীরে কুঞ্জ-র সীমন্তে ক্ষীণা তড়িল্লতার মত সিন্দুর লেখা আঁকিয়া দিল। আঁকিয়া দিবার সময় বাঁ হাত দিয়া কুঞ্জ-র মুখখানি কতক্ষণ স্পর্শ করিতে হইয়াছে।

কুঞ্জ যখন মুখ তুলিল, পঞ্চু আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। কুঞ্জ-র দুই চোখে কান্নার সমুদ্র দুলিয়া উঠিয়াছে। সহসা দুই হাতে মুখ লুকাইয়া কুঞ্জ ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পঞ্চুর মুখে কথা নাই, সারা শরীর যেন বিস্ময় ও বেদনায় শিথিল হইয়া আসিয়াছে। উহার চোখ কুঞ্জ-র সিঁথির কোলে ঐ সদ্যদীপ্ত সিন্দুর-রেখাটির উপর,—যাহা উহার ভালোবাসার অরুণাভার মত শোভা পাইতেছে।

ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পঞ্চুও হঠাৎ বিমনা হইয়া পড়িল। একদিন কুঞ্জ-র সিঁথি হইতে ঐ সোনার কণাটুকু ও-ই চুরি করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু তাহা ত' কুঞ্জ জানে না! তবে উহার দুই চোখ ছাপাইয়া কান্নার উজান ডাকিল কেন? কুঞ্জকে ভালবাসিয়া উহার বৈধব্যবিধানের প্রায়শ্চিত্ত কি হয় না কখনো? কুঞ্জ ত' দেহের পসারিনী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, পঞ্চুর স্নেহে কি উহার মুক্তিস্নান হয় নাই?

কতক্ষণ পরেই কুঞ্জ আসিয়া হাজির,—ঠোঁটের কোণে সেই তীক্ষ্ণাগ্র চটুলতা, দু'টি ভ্রূরেখায় যেন সেই কৌতুক-কৌতূহল। আসিয়াই বলিল, তুমি এমনি দিন-রাত আমাকেই আগলাবে নাকি? কাজকর্মে বুঝি ইস্তফা দিলে?

কুঞ্জকে সহজ ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া পঞ্চুর মনে ভরসা হইল। রসিকতা করিয়া কহিল,—আমার ত' ফেরাই নেই, এক তুরুফের জোরেই খেলে যেতে পারব। আর কাজ নয়, কুঞ্জ - এবারে এক কাজ করি এস। একটা নৌকোর বন্দোবস্ত নিই,—পাল তুলে ছেড়ে দিই, দু'জনে জলে পা ডুবিয়ে বসে'-বসে' গল্প করি —সকাল সন্ধ্যা দুপুর রাত! নৌকোতে খাই; শুই-ও নৌকোয়। তুমি আর আমি।

—আর রাখ?

পঞ্চু যেন হঠাৎ চাবুক খাইল। তবু সামলাইয়া বলিল,—ও পরের ছেলে, পথেই ভাসবে। ও আমার কেউ নয়।

—আর আমিই যেন তোমার কেউ। আমিও ত' পথের ফিরিউলি, সোতে ভেসে চলেছি, তুমি কুড়িয়ে নিলে বলে' ত' হেথায় আমার এত ঠাট্। কিন্তু আমি রাখ-র চেয়েও রদ্দি।

পঞ্চুর কণ্ঠ পর্যন্ত উত্তপ্ত ভাবাকুলতা উদ্বেল হইয়া উঠে,—প্রকাশ করিলেই তাহা অর্থ হারাইবে।

—যাই বল বাপু, বেটাছেলে মেয়েমানুষের আঁচল ধরে' থাকবে, সে আমার ভালো লাগে না। গা-গতর দিয়ে খেটে চল, দু'টো পয়সা এলে ধারগুলো শোধ দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে। নইলে সকাল-সন্ধ্যা ফষ্টি-নষ্টি আর ভালো লাগে না, ভাই।

পঞ্চু সায় দিল: ঠিক, কুঞ্জ। কিন্তু এখানে নয়। চল, শহরে যাই। একটা ফিটার-মিস্ত্রীর কাজ অন্তত জোগাড় হবে, গাঁইতি নিয়ে রাস্তাও ত' খোঁড়া চলে। ছোট্ট একটি মেটে ঘর,—কত আর ভাড়া?—রাখকে না হয় ইস্কুলে ভর্তি করে' দেব। আমরা বুড়ো হ'লে রাখ আমাদের খাওয়াবে। এ মজা মন্দ নয়, কোথায় ছিলে তুমি, কোথায় আমি, আর কে রাখ

কুঞ্জ সামনের দিকে ঘাড় তুলিয়া কহিল,—শহরে মানে? তোমার যেমন বুদ্ধি! শহরে তোমার মেটে-ঘরের জন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে কি না!

সত্যিই ত'। মেঘলোক হইতে পঞ্চু আবার কঠিন মাটিতে পা নামাইল। কুঞ্জ যেন পঞ্চুর সঙ্গে কষ্ট-সহ্যের তপস্যা করিতে বসিয়াছে আর কি! শহরে তেতলার উপর কুঞ্জর কোঠা ছিল, কুঞ্জই সে-দিন রাত্রি জাগিয়া-জাগিয়া গল্প করিয়াছে—প্রকাণ্ড দেয়ালগিরি, মেহগনি কাঠের খাট,—কত তার গয়না, আস্‌বাব,—এক বাবু তাহাকে ছোট দেখিয়া মোটর-গাড়ি কিনিয়া দিবার জন্য কত সাধিয়াছে। সেই জীবন কুঞ্জ-র আর ভালো লাগে নাই বলিয়াই ত' এখানে থাকিয়া যাইতে চায়। আবার শহরে যদি পায়ের ধুলা দিতেই হয়, তবে শহরের ধুলা গায়ে মাখিতেই বা কতক্ষণ! বাকি দিনগুলি কুঞ্জ পঞ্চুরই হাতের মুঠায় একটি-একটি করিয়া গুণিয়া দিবে—পঞ্চুর আর এই মামার বাড়ির আবদার করিতে হইবে না।

পঞ্চু ভারি দমিয়া গেল। ভালবাসিলেই বুঝি সহজ অধিকারের লিপ্সা আসে, ভাবে, ভালোবাসার মধ্যেই ত' ত্রিভুবনের দাম দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চুর সেই মোহ যেন সহসা টুকরা-টুকরা হইয়া খসিয়া গেল। কোথাকার পঞ্চু,—পরনের কানি জোটে না, তাহারই ঘরে কিনা তাহারই অশ্রুর সমুদ্রে কিনা লক্ষ্মীকে সে কয়েদ করিয়া রাখিবে? কুঞ্জ ত' আর মাটির ঢেলা নয় যে পা দিয়া মাড়াইয়া গেলেই চলে, কুঞ্জ আজ সাপের মাথার মণি,—দংশনে মরিয়া গেলেও মণি মেলে না।

পঞ্চুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে বুদ্ধিমতী কুঞ্জ-র দেরি হইল না। মোলায়েম করিয়া কহিল,—শহর আমার জহর, গাঁ আমার জহরৎ। এইখেনেই আমার বাসা। কে আমাকে নড়ায় এখান থেকে!

দু'টি কথাতেই ফের পঞ্চুর আশা হইল। একবার আশা করিতে সুরু করিলে চট করিয়া রাশ বাগানো যায় না—আশার বুঝি পাখা আছে! বলিল,—তা হ'লে বেকারই বসে' থাকি, গান বাঁধি, তবলা বাজাই, আর তোমার রাঙা ঠোঁটে ঠোঁট ভাঙি!

কুঞ্জ-র রাগ নাই; বলে,—তুমি থাক বেকার, আর আমি করি চাকরি, সে হ'বে না আর। বলি,—গানই বাঁধ না। যাত্রাদলটা জাঁকিয়ে তোল, আমি না হয় ঘুঙুর বেঁধে নেমে যাব।

পঞ্চু মাতিয়া উঠিল: সে ভারি চমৎকার হয়, কুঞ্জ। নামবে তুমি?

—আমি ত' নেমেই আছি।

—তা হ'লে, ওঃ, আমি তা ধারণাই করতে পারি না, কুঞ্জ,—চন্দনগঞ্জ থেকে

মিহিরকান্দি আমি একেবারে ক্ষেপিয়ে দেব। আমি রাজা, তুমি মহারাণী, তুমি নাচ্‌তে জান, কুঞ্জ? সত্যি?

—মহারাণী বুঝি নাচে?

—নাচে নাচে একশো বার নাচে, রাখকেও একটা ছোটখাটো পার্ট দিয়ে ঢুকিয়ে দেব, বেশ করবে, ওর মধ্যে জিনিস আছে। বেশ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, সংসারে যে আমার আরো কিছু করবার আছে তোমাকে পেয়ে ভুলেই গেছ্‌লাম। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি কি না করতে পারি? সাতটা বাঘের রক্ত যেন আমার শিরায়-শিরায় টগ্‌বগ্‌ করে' ওঠে। তোমার জন্য আমি মরে' যেতে পারি, কুঞ্জ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পরে চোখে চঞ্চলতা আনিয়া কুঞ্জ কহিল,—কিন্তু আমাকে নিয়ে যদি সাত-বাঘে কাড়াকাড়ি পড়ে' যায়?

পঞ্চুর মুখ মুহূর্তে আবার ফাটা ফানুসের মত চুপসাইয়া গেল। সত্যই ত',—সেই ভয় ত' পুরামাত্রায়ই আছে, যদি কেহ কুঞ্জকে ফুসলাইয়া ফুঁ দিয়া উড়াইয়া নেয়! পঞ্চু চোখে যেন অন্ধকার দেখিল। ঝড়ে উহার নৌকা যেন টল্‌মল্‌ করিতেছে। ও ত' উহার সহকর্মী সঙ্গীদের চরিত্র জানে,—সেই বীভৎস জঘন্য-জীবন-যাপনের ঘটনাবলীর কথা মনে করিয়া ঘৃণায় পঞ্চুর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। জগ হয় ত' তাড়ি খাইয়া ঘরময় বমি করিয়া চোখ উল্টাইয়াছে, তব্‌লায় চাঁটি মারিয়া চোখের তারা দুইটা তেরছা করিয়া বৃন্দাবন হয় ত' বস্ত্রহরণের পালা জমাইয়াছে,—নয়ান্‌টা এমন বিট্‌কেল, হয় ত' কুঞ্জ-র মুখের সামনেই গাঁজার কল্‌কেটা তুলিয়া ধরিবে। কুঞ্জ যে পাঁকের পোকা. পঞ্চু মনে-মনে এ কথা বিশ্বাসই করিতে পারিল না, কুঞ্জর আতিথ্য যে অতি-অবারিত সে-সম্বন্ধে পঞ্চুর হিংসার অবধি নাই। সেই নরককুণ্ডের কাছে ও কিছুতেই অতসীর চারা পুঁতিতে পারিবে না। পঞ্চু গা ঝাড়িয়া না করিয়া উঠিল।

—তা হ'বে না, কুঞ্জ। যাত্রাদল আমি ফের জাঁকাচ্ছি বটে, কিন্তু তোমাকে ঘরের বা'র হ'তে হ'বে না।

—কেন, আমি কি সিন্দুকের সোনা যে বাইরে বেরুলেই পেতল হ'য়ে যাব? ঘাড়েই রাখ আর ঘরেই রাখ আমি যে-মাকাল সেই মাকাল! তুমি কি কাঁচি দিয়ে আমার ডানা দু'টো কেটে দিয়েছ? উড়্‌তে আমি ভুলে গেছি?

—তুমি সত্যি চলে' যাবে, কুঞ্জ? কিন্তু যাত্রাদল ত' ভদ্রলোকের নয়।

—আর আমি কোন্‌ লাট! যাও, যাও, তোমার মুখভার করতে হ'বে না, তুমি লেগে যাও দেখি। দিনরাত পুরুষমানুষের আল্‌সেমি আর দেখতে পারিনে।

উৎসাহিত হইয়া পঞ্চু বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জ রান্নাঘরটিতে আবার আসিয়া বসিয়াছে। উনুন হইতে হাঁড়ি নামাইয়া দুই হাঁটু জড়ো করিয়া তাহার উপর বাঁ গালটি কাৎ করিয়া রাখিতে-রাখিতে কুঞ্জ কাঁদিয়া ফেলিল। ও যেন দুঃখের ভার বহিতে পারিতেছে না,—আর কত দিন ফাঁকি দিয়া ফাঁক খুঁজিবে? কেন আসিয়াছে এখানে, কাহাকে চায় ও? এই দুরাশা উহার কেন? দেখিতে-দেখিতে ও একেবারে গো-মূর্খ হইয়া গেল নাকি?

তাঁহাকে কুঞ্জ একটিবার শুধু দেখিবে। যদি কাছে আসিতে দেন, তবে দুই পা জড়াইয়া ক্ষমা চাহিবে। ক্ষমা হয় ত' সে পাইবে না, না পাইলেও একবার প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া লইবে। ও সত্যিই এমনি প্রাণ ভরিয়া কিছু চাহিতে চায়,—ও উহার দরিদ্র দুঃখী অতীতকে অতি-আকুল চিত্তে যাচ্ঞা করিতেছে। তাঁহাকে দুঃস্থ দেখিলে কুঞ্জ শহরে গিয়া কিছু টাকা পাঠাইয়া দিবে, তাঁহার নবজাত সন্তানটিকে অপরিতৃপ্ত মাতৃস্নেহে চুম্বন করিবে, দ্বিতীয় বধূটিকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিবে—কল্যাণ-করস্পর্শে সমস্ত সংসার ক্ষণেকের তরেও স্নেহরসসিক্ত করিয়া দিয়া আসিবে। সেই পরিচিত গৃহকোণের অতি-আত্মীয় প্রথমরৌদ্রপাত দেখিয়া ও উহার কদর্য জীবনের পঙ্কিলতা ভুলিতে চায়। তাঁহাকে আরেকবার ভালবাসিতে সাধ হয়, তাঁহার জন্য একটি অনতিব্যক্ত বেদনা বহন করিবার সুযোগ হইতে ও কেন বঞ্চিত হইল?

নিজে ভাবিয়া নিজেই কুঞ্জ আশ্চর্য হইয়া যায়। একটা নিরক্ষর বর্বরপ্রায় চাষার ছেলেকে সে শহুরে হইয়া আজো ভুলিতে পারিল না? তাই কিনা তাহার গ্রামের লোকের দেখা পাইয়া সে ন্যাকামি করিয়া নাকি-সুরে কাঁদিবার জন্য পোড়া পিঠ লইয়া এখানে জমি লইয়াছে? বলিহারি! মাসি শুনিলে রাগ করিয়া গায়ে ফিনাইল্ ঢালিয়া দিবে। নূতন বাবু-শিকারের লোভ দেখাইয়া সে নিজেই কিনা বেচাল হইয়া গেল! 'হাউস-অফ্ লর্ড্স্' ছাড়িয়া কিনা তালপাতার ঘরে আসিয়াছে! লক্ষ্ণৌ ঠুংরি ছাড়িয়া সে চাপকান পরিয়া যাত্রাদলের মোক্তার হইবে! মাসি, একবার দেখিবে এস, কুঞ্জ একেবারে বকিয়া গেছে।

কিন্তু একটিবার তাহাকে না দেখিয়া গেলেই বা কি করিয়া চলে? মনে পড়ে নিকুঞ্জ-র সেই প্রশস্ত স্ফারবক্ষ, তাহার উপর মাথা রাখিয়া কুঞ্জ কত রাত্রি ঘুমাইয়াছে, মদ খাইয়া নেশায় ঝিম্ হইয়াও তাহার আজকাল ঘুমের মত ঘুম নাই, রাত্রি যে নিঝুম সে-কথাও সে ভুলিতে বসিয়াছিল। পাশের ঘরের শৈলরও আগে-আগে বাড়ির জন্য ভারি মন কেমন করিত, সন্ধ্যা হইলেই আয়নার কাছে বসিয়া চুল বাঁধিতে-বাঁধিতে দুঃখিনী বিধবা মা'র জন্য কত কাঁদিয়াছে;—সেদিন অসুখে বেহুঁস্

মেয়ে বাবুর কাছে বায়না ধরিয়াছিল : আমাকে মা'র কাছে পাঠাইয়া দাও, শ্মশানে কিম্বা সেইখানেই আমাকে রাখিয়া এস !...কুঞ্জ-র ঘরে ত' কত লোক আসিয়াছে, লালসালিপ্ত কৃমিকুল,—চোখে উন্মত্ত বুভুক্ষা, দুই হাতে দানের অজস্রতা, কিন্তু কুঞ্জ একটিরো মুখ আলাদা করিয়া মনে করিতে পারে না। অথচ, চোখ বুজিলেই কুঞ্জ খালি তাহাকে দেখে, সেই গলায় দা চালাইয়া হাসিমুখে চা চাহিতে আসিত। কুঞ্জই তাহার গলায় দা বসাইয়াছে !

দিন তিন চারের মধ্যেই পঞ্চু যাত্রাদল জমাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চুর অধুনা-অব্যবহৃত ছোট ঘরটিতে তুমুল তুফান লাগিয়া গেল। সকাল হইতে সুরু করিয় রাত্রি বারোটা পর্যন্ত হল্লা চলে, হার্মোনিয়ামের বেলো ফাটে, চাঁটি খাইয়া তবলা পটল তোলে, হাঁড়ি ছোঁড়াছুড়িতে পটুকাবাজির খেলা হয়। মাথায় দীর্ঘ ঘোম্‌টা টানিয়া কুঞ্জ গৃহান্তরালে লুকাইয়া থাকে।

সবাই পঞ্চুকে পাইয়া বসিয়াছে। বলে,—লুকিয়ে লুকিয়ে আর যা কিছু কর, বিয়ে করলে কেন ? খাওয়াও বাপু, তাড়ি নয়, পোলাউ-উ !

বৃন্দাবন ঠোঁট চাটিয়া বলে,—খুরি করে' চা দিয়ে যেতে বল না, ভাই।

পঞ্চু অপরাধীর মত আসিয়া দাঁড়ায়,—কুঞ্জ-র কাছে ও যেন উহার ব্যক্তিত্ব খোয়াইয়াছে। বলে,—ওদের মাতামাতিতে তুমি বিরক্ত হ'য়ো না, কুঞ্জ। ওরা অম্‌নি ধারা, তাড়ি ছাড়া ওদের উৎসাহ আসে না, চা খেয়ে ওরা খিদে মারে। ওদের তুমি ক্ষমা কর।

কুঞ্জ-র কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হইতে গিয়াই করুণ হইয়া উঠে : আমি ক্ষমা করবার কে ? আমি ত' এর চেয়েও কুৎসিত পঞ্চু-দা। কিন্তু তুমি খাওনি ত' ?

—না, কক্‌খনো না,—তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, কুঞ্জ—

বলিয়া কুঞ্জ-র মলিন পদপদ্মকলি দুটি স্পর্শ করিবার লোভেই পঞ্চু হাত বাড়াইল। বলিল,—তুমি যাতে খুসি হ'বে না, সে কাজে আমার মন ওঠে না। তাড়ির সুখ ত' একটুখানি, বমি বা হজম যাই করি না কেন, ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আমি এমন জিনিস চাই কুঞ্জ, যা ফুরোয় না, যত খাই ততই খিদে পায়। বলিয়া পঞ্চু দুই চক্ষু স্নেহে দ্রব করিয়া কুঞ্জ-র চোখের উপর আনিয়া রাখিল।

ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—তোমাকে একটু কষ্ট করতে হ'বে, কুঞ্জ। এই অসময়ে ওরা চা চাইছে। আজ সারাদিন কেউ বাড়ি যাবে না,—রোদ্দুরে ক্রোশ ভাঙবার তাগদ্ আর কারুর নেই এখন, খানিক বাদে সবাই মাটি নেবে। তুমি ওদের জন্যে যদি একটু চা বানিয়ে দাও,—সবই ত' আছে, আমি কুমোরবাড়ি থেকে খুরি এনে দিচ্ছি।

— বানিয়ে দেব বৈ কি। রাখ কোথায় ?

—মহড়া দিচ্ছিল ত'। দেখো, কি সুন্দর করবে ও কৃষ্ণের পার্ট।

—রাখকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

পঞ্চু গিয়া রাখকে পাঠাইয়া দিল। রাখ আসিতেই কুঞ্জ বকিয়া উঠিল,- তুই ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস্ রে ছোঁড়া ?

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কথা টানিয়া টানিয়া রাখ কহিল —কল্‌সী কল্‌সী গিল্‌ছে, মা ; বিন্দে-দা নাচতে-নাচতে আছাড় খেয়ে পড়্‌ল, হি হি হি ; আর, জগ-খুড়ো এমন খেপে গেছে মা, গা থেকে ছেঁড়া জামাটা খুলে ফেলে লাউ-বিচির মত দাঁতগুলো দিয়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করছে। পঞ্চু কাকাই সব বমি কাচাচ্ছে মা।

কুঞ্জ হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল : ওখানে নিকুঞ্জ বলে' কেউ আছে ?

—নিকুঞ্জ ? দাঁড়াও,—দাঁড়াও আমি জিগগেস্ করে' আসি।

কুঞ্জ তাড়তাড়ি রাখ-র হাত ধরিয়া ফেলিয়া বাধা দিল। কহিল,—তোকে আর ফোঁপরদালালি করতে হ'বে না। নিকুঞ্জ বলে' কাউকে ডাক্‌তে শুনেছিস্ ?

রাখ মাথাটা একেবারে কাঁধের উপর কাৎ করিয়া ফেলিয়া কহিল, শুনেছি বৈ কি! নিকুঞ্জ —নিকুঞ্জ, কত তাকে ডাকা হ'ল। সেই ত' আমাদের যাত্রায় নারদ সাজবে।

কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম চেহারা বল্ ত' ?

—চেহারা ? তা আবার কে না জানে ? তুমি যাকে খুসি জিগ্‌গেস কর না — সবাই ব'লে দেবে। দেখো, যাত্রায় বুড়ো হ'য়ে যখন দাড়ি নাচাবে তখন কেমন মানায় !

—বলি দেখ্‌তে ফর্সা ? লম্বা ?

—দেখ্‌তে ? অত-শত জানি না, হ্যাঁ। লম্বা,—আমি কি হাত দিয়ে মেপেছি ? দেখ্‌তে ঠিক নারদের মত !

কণ্ঠস্বরে ভৎর্সনা নিয়া কুঞ্জ কহিল,—তুই মিথ্যে বল্‌ছিস্, রাখ। কেউ নেই নিকুঞ্জ বলে'।

—নেই ? নিকুঞ্জ ত' কোন্ ছার নিকুঞ্জ-র বাবা আছে। আমি যাচ্ছি হিড়হিড় ক'রে টেনে আন্‌ছি হেতা। বলি গে—মা বল্‌ছে : নিকুঞ্জকে নারদের মত দেখ্‌তে নয়। দেখবে তার দাড়ি ? ভুড়ি ছাড়িয়ে গেছে।

রাখ-র হাত চাপিয়া ধরিয়া কুঞ্জ কহিল,—খুব তাড়ি খাচ্ছে রে, রাখ ?

—শুধু খাচ্ছে, ডিগ্‌বাজি খাচ্ছে। আচ্ছা মা, টেবিকে একটু তাড়ি খাইয়ে দেব ?

—আচ্ছা, তোর পঞ্চু-কাকা খাচ্ছে না?

—এক ফোঁটাও না। সবাই পায়ে ধরে' সাধ্‌ছে, পঞ্চু-কাকার পা একটুও টল্‌ছে না কিন্তু। তাড়ি খেলে পঞ্চুকাকার নাকি বিয়ে হ'বে না, মা। আমিও খাব না তা'লে।

—তুই যা এখন। চান করে' আয়।

রাখ এক গা তেল মাখিয়া ছেঁড়া গামছা লইয়া পুকুরে ঝাঁপাইতে গেল।

রাখ-র কথা হয় ত আগাগোড়াই মিথ্যা, তবুও কুঞ্জ কান খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—যদি এই কদর্য কোলাহলের মধ্যে একটি অতীত-পরিচিত কণ্ঠস্বরের সে নাগাল পায়, যদি একটি অতি-আদৃত হাস্যকলরোল তাহার বুকে আসিয়া ধীরে-ধীরে ভাঙিয়া গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, যদি তাহার গ্রাম্য উচ্চারণের স্বাভাবিক কর্কশতা তাহার হৃৎপিণ্ডকে মন্দিরের ঘণ্টার মত স্পন্দিত করিয়া তোলে! সেই সমবেত চীৎকারের মধ্য হইতে কুঞ্জ স্বরগুলিকে বাছিয়া লইতে পারে না, তবু হাতড়াইয়া-হাতড়াইয়া মনে-মনে শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

কুঞ্জ বসিয়া-বসিয়া চা বানায়, আর চায়ে চিনি ঢালিবার সময় হৃদয়মধু গালিয়া প্রত্যেকটি খুরিতে ঢালিয়া দেয়, যদি ইহার একটিও নিকুঞ্জ-র মুখে ওঠে। কুঞ্জ-র হাতের চা খাইতে সে কত ভালবাসিত! সে কি কুঞ্জ-র হাতের চা পাইয়া আজ একটিবার তাহার হাত দু'খানির কথা মনে করিবে? কুঞ্জকে সে কি ভুলিয়া গেছে? আজ যদি তাহার সাম্‌নে আধ-ঘোম্‌টা টানিয়া মুখে সেই গ্রাম্য মধুরতা মাখিয়া সলজ্জ চোখ দুইটি ঈষৎ আনমিত করিয়া দাঁড়ায়, তবে কি সে তাহাকে চিনিতে পারিবে না? পঞ্চুকে চোর ভাবিয়া যদি সে তেমনি আঁৎকাইয়া উঠিয়া নিকুঞ্জকে কম্পিত বাহুলতা দিয়া জড়াইয়া ধরে, তবে নিকুঞ্জ কি তাহাকে নিশি-পাওয়া দুঃস্বপ্নের মতই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে? ভাবিতে-ভাবিতে টস্‌টস্ করিয়া দু'টি ফোঁটা চোখের জল একটা খুরির মধ্যে ঝরিয়া পড়িল। ভগবান করুন, এই খুরিটিই যেন নিকুঞ্জ-র মুখে উঠে,—এই অশ্রুবিন্দু দুইটিই যেন তাহার চুম্বন লাভ করে! থাক সে তাড়ি,—যাক সে অধঃপাতে।

এক দিন পঞ্চু আসিয়া খবর দিল: মহড়া ত' প্রায় সেরে এনেছি, কুঞ্জ। চন্দনগঞ্জে একটা বায়নাও মিলে' যাবে চট্ করে'। ওরা একদিন নেমন্তন্ন খেতে চাইছিল—ডাকব?

খোঁপা বাঁধিতে-বাঁধিতে কুঞ্জ কহিল,—পয়সা কই?

—সবাই চাঁদা করে' খাবে। তুমি যদি শুধু দয়া করে' চাট্টি রেঁধে দাও। বেচারাদের ভারি পোলাউ খাবার সখ,—বাপের বয়সে অনেকে খায়ও নি।

কুঞ্জ এক কথায় রাজি হইয়া গেল দেখিয়া পঞ্চু যেন তত সুখী হইতে পারিল না। ভাবিয়াছিল ইহার জন্য কত সাধাসাধি করিতে হইবে, চাই কি—অনুরোধের প্রাবল্যহেতু হয় ত' কুঞ্জ-র হাত দুইটি ফস্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াই জিভ্ কাটিয়া বসিবে, খোঁপা ফেলিয়া দিয়া পিঠের উপর কেমন করিয়া চুলের স্তূপটা ভাঙিয়া ছত্রখান হইয়া পড়ে তাহাই দেখিবে, রাগ করিয়া ভাত খাইবে না, জ্যোৎস্না উঠিলে গান শুনাইবে না, হাঁড়ির মত মুখ করিয়া থাকিবে। কুঞ্জ কি না বোকার মত হাঁ করিয়া বসিল!

এই নিমন্ত্রণ করিয়া কিসের সম্বন্ধটা যে পঞ্চু পাকাপাকি করিয়া তুলিতে চাহিতেছে তাহা কুঞ্জ বুঝিয়াছিল। কুঞ্জ মনে-মনে হাসিল, তবু কি জানি কি আশা করিয়া মাথা হেলাইয়া সম্মতি দিয়া বসিল। বলিল, আমার কি, নির্ঝঞ্ঝাটে রেঁধে দেব।

ধামা করিয়া কত জিনিসই আসিয়া গেল,—পঞ্চুর আনন্দে আজ আকাশ ভরিয়া রোদ উঠিয়াছে। চাঁদা অবশ্যি কেহই দেয় নাই, গণেশ পৈতুণ্ডির কাছ থেকেই পঞ্চু আবার দ্বিগুণ সুদে ধার আনিয়াছে। সকলের কাছে পঞ্চু বলিয়া বেড়াইয়াছে,—তাহার অন্তঃপুরে ঐ যে একটি নিঃশব্দচারিণী অবগুণ্ঠনবতী নবযুবতী আছে, তাহাকে সে ভালবাসিয়া অশ্রুজলে অভিষেক করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, সে তাহার জীবন-যামিনীর জ্যোৎস্না-জোয়ার, তাহাকে পাইয়া পঞ্চু মানুষ হইয়া গেল। সমস্ত অবরতা বিসর্জন দিয়া পঞ্চু এখন একেবারে সন্ন্যাসী বনিয়া গিয়াছে।

আগে, বিবাহ করিবে না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা লইয়া ইয়ার বন্ধুরা ঠাট্টা করিলে পঞ্চুর ভারি ভাল লাগে। কুঞ্জ-র দুইখানি অনতিরেখাসঙ্কুল সেবাস্নিগ্ধ করতল মনে করিয়া ও ভগবানকে মনে-মনে ধন্যবাদ দেয়—আবার ত' কুঞ্জ-র দেখা পাইল, আবার ত' সেই দিন গভীর রাত্রে চুপি-চুপি কুঞ্জ-র ঘরে ঢুকিয়া উহার চূর্ণ চুলগুলি আদর করিয়া উহার মুখ হইতে ললাটের উপর তুলিয়া দিয়াছিল! তাই, কুঞ্জ-কে দিয়া রাঁধাইয়া ক্ষুধার্ত গরীব বন্ধুদের খাওয়ানোর মধ্যে যে গৌরব আছে তাহার তুলনা কই? উহার নিজের জীবনে একটি পরম পরিতৃপ্তি আসিয়াছে বলিয়াই ও সবাইকে সেই তৃপ্তির ভাগ বণ্টন করিয়া দিবে; প্রভাতের আনন্দ যেমন আরক্ত আভায় সমস্ত আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনি পঞ্চুর ভালবাসাও আজ উৎসব-উল্লাসের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে। কুঞ্জকে আজ উহার কী যে ভাল লাগিতেছে বলা যায় না। স্বল্পভূষণ দুইখানি হাত একটি কোমল অথচ অনুচ্চারিত

প্রেমবাণীর মত যেন উহার প্রতি উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। ক্ষীণরেখা ভ্রূলতার উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি শুভ্র ললাটটি শরৎকালের আকাশাংশের মত উহার চোখে মধুর লাগিতেছে। ইচ্ছা করে, উহার বিশ্বপ্লাবী প্রেমে কুঞ্জকে স্নান করাইয়া দেয়। বাহুর কাছে কুঞ্চিত শেমিজের প্রান্ত হইতে শাড়ির পাড়টি পর্যন্ত পঙ্কুকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এত দিন কুঞ্জকে ছাড়া ও যে কি করিয়া বাঁচিয়া ছিল ভাবিতে গেলে পঙ্কুর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

সারা দিন ধরিয়া কুঞ্জ কত কি যে রাঁধিল তাহার অন্ত নাই। উহার পরিক্লান্ত মলিন মুখখানির পানে চাহিয়া-চাহিয়া পঙ্কু একটি সুদূরবিস্তৃত সহানুভূতি অনুভব করিয়াছে,—কুঞ্জ যেখানেই পা পাতে, সে-জায়গাটিই পঙ্কুর কাছে পবিত্র তীর্থভূমি হইয়া উঠে,—উহার নবপল্লবপেলব ঠোঁট দুইটি নাড়িয়া-নাড়িয়া যে-কথা কয়টি উচ্চারণ করে তাহাই ইষ্টমন্ত্রের মত পঙ্কু বুকে দাগিয়া রাখিতে চায়। ললাটে বিন্দু-বিন্দু ঘর্মরেণু দেখা দিয়াছে, ইচ্ছা করে চুম্বনে সেই শ্রমমালিন্যটুক মুছিয়া লয়। সেবাপরায়ণা কুঞ্জ-র আজ প্রগল্‌ভতা নাই, দুই চোখে যেন বেদনার বাষ্প জমিয়াছে। পঙ্কু ভাবে,—কুঞ্জ-র এই স্নেহ-সেবার মূল্য সে কোথা হইতে কুড়াইয়া আনিবে?

রন্ধন যেন কুঞ্জ-র তপস্যা,—কুঞ্জ তাহার অবিচল তন্ময়তা লইয়া কাজে লাগিয়াছে। তাহার ঠোঁটের কোণে সেই চটুল স্ফূর্তি নাই, একটি কোমল বেদনা যেন অধরশয়নে ঘুমাইয়া রহিয়াছে; উহার দুই উন্মুখ করতলে যে-সেবা আজ উৎসারিত হইতেছে সে সেবায় নিজেই একটি অকৃত্রিমতার স্বাদ পাইয়া কুঞ্জ স্তব্ধ হইয়া গেছে।

সন্ধ্যাসন্ধিতে পাত পড়িল,—রান্নাঘরের বাহিরের সমস্ত কাজ রাখ তদারক করিতেছে। কোলাহল করিতে-করিতে সকলে খাইতে বসিল। পরিবেষণ করিবার জন্য কুঞ্জ-ই প্রস্তুত হইতেছিল, পঙ্কু আসিয়া বাধা দিল। বলিল,—তা হ'লেই জানা-জানি হ'য়ে যাবে, কুঞ্জ,—কেলেঙ্কারির সীমা থাক্‌বে না। তা ছাড়া ঘরের বৌ কি আর পরের সাম্‌নে বেরোয়?

কুঞ্জ কঠিন হইয়া কহিল,—আমি কি ঘরের বৌ যে আমাকে মানা কর্‌বে?

পঙ্কু তাহাকে আড়ালে নিয়া কহিল, আস্তে। এদের কাছে ত' ঘরের বৌ বলে'ই চলে' যাচ্ছ, নইলে তোমার সতীত্বের দৌড় জেনে সবাই হয় ত' পাতেই হাত মাখ্‌বে না। তা ছাড়া, যদি কেউ তোমাকে চিনে ফেলে?

—কে আর চিন্‌বে বল?

পঙ্কু কি কহিবে এক মুহূর্ত ভাবিয়া লইল, বিবেককে একটা ধমক দিয়া কহিল,—কেন, নিকুঞ্জ?

—কে ?—তিনি এসেছেন ? কুঞ্জ-র কেশাগ্র থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল : এসেছেন তিনি ?

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে পঞ্চু বলিল,—এসেছে বৈ কি ! তাই ত' বলি, দেখে ফেল্‌লে আমাদের নিয়ে কেলেঙ্কারি আর জুলুমের অন্ত থাকবে না।

বাসনটা এইবার পঞ্চুর হাতে তুলিয়া দিতে কুঞ্জ আপত্তি করিল না। বেড়ায় কান পাতিয়া কুঞ্জ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,—কোন কাজে উহার আর স্পৃহা নাই, মায়া নাই। পঞ্চু নিজেই সব দেওয়া-থোয়া থেকে সুরু করিয়া দেখা-শোনা করিতেছে। কুঞ্জ-র এই ঔদাসীন্যের কারণ কি ? কুঞ্জ কহিল, চট্ করে' মাথা ধরে' গেল —

পঞ্চু বলিল,—তা আর আশ্চর্য কি, এতক্ষণ আগুনের কাছে বসে' ছিলে। তা' হ'লে বিছানায় শোও গে। আমি আর রাখ-ই দেখ্‌ব 'খন।

কুঞ্জ কহিল,— না, এই বেশ আছি। বলিয়া বেড়ার গায়ে পিঠ রাখিয়া বসিল।

কুঞ্জ-র যে মাথা ধরিয়াছে এই কথাটিও বন্ধুমহলে জানানো চাই,—কুঞ্জ-র হাসিটি দুপুর-বেলায় চায়ের চেয়েও মিষ্টি, তাহা পর্যন্ত বলিয়া পঞ্চু বন্ধুবৃন্দের রসগ্রাহিতার প্রতিক্ষা করে। একজন বলিল,—রান্না যা হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন স্বর্গসভায় সুধা খাচ্ছি। যাই বল, তোমার চোয়াড় হাত দু'টো না দেখিয়ে, পরিবেষণ করতে সুধাময়ীকে একবার পাঠিয়ে দাও না।

ঘরে বসিয়া কুঞ্জ শিহরিয়া উঠিল—এই হয় ত' নিকুঞ্জর গলা। উহাকে কত দিন সে সুধাময়ী বলিয়াছে।

আরেক জন কহিল,—তোরও যেমন কথা ! তোর বাড়ি গেলে তোর বউকে দিবি ভাত দিতে ?

নিশ্চয়ই, এ নিকুঞ্জর গলা না হইয়াই যায় না। নইলে এত সহানুভূতি লইয়া কে আর কথা কহিবে ? বেড়ায় কান পাতিয়া এই স্বরটি বাছিয়া লইবার জন্য বসিয়া থাকিতে-থাকিতে কুঞ্জ একেবারে ঘামাইয়া উঠিল।

পাতে দই পড়িয়াছে,—এইবার সকলের উঠিবার পালা। হঠাৎ কুঞ্জ একটা বাসন পঞ্চুর হাতে ধরিয়া দিল। কহিল,—ভুলে এই ইলিশ মাছের ডিমভাজাগুলো দেওয়া হয় নি—দিয়ে এস গে।

পঞ্চু কহিল,—এখন ? খাওয়া ত' ওদের ফুরিয়ে গেছে।

—তুমি যাও না নিয়ে।

কুঞ্জ জানে, নিকুঞ্জ এই ইলিশমাছের ডিমভাজা খাইতে কী-ই যে ভালবাসিত ! এই ডিমভাজা খাইবার জন্য নিকুঞ্জর স্থানকালপাত্রের বিচার-বোধ ছিল না। মধ্য রাত্রে উহার ঘুম ভাঙাইয়া কেহ যদি এক টুক্‌রা ডিম-ভাজা মুখের সামনে আনিয়া

ধরিত, নিকুঞ্জ বেমালুম তাহা মুখে পুরিয়া ফের ঘুমাইয়া পড়িত। তাই, আজ কুঞ্জ পঞ্চুকে বিশেষ করিয়া ডিমওলা ইলিশমাছ আনিতে বলিয়াছিল।

কিন্তু ডিম-ভাজা কেহই পাতে লইল না। পঞ্চুর পরিণীতাকে উদ্দেশ করিয়া শুনাইয়া-শুনাইয়া সবাই ঠাট্টা করিতে লাগিল। ঘরে বসিয়া কুঞ্জ-র বিস্ময়ের আর শেষ রহিল না,—তবে কি নিকুঞ্জ আসে নাই? নিকুঞ্জর রুচির কি হঠাৎ এই অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়াছে?

রাত্রির মাঝামাঝিতে সমস্ত পাট চুকিয়া গেলে কুঞ্জ পঞ্চুকে সোজাসুজি প্রশ্ন করিল: সত্যি বল, উনি এসেছিলেন?

পঞ্চু বিরক্ত হইয়া কহিল,—কে উনি? নিকু?

—হ্যাঁ। এসেছিলেন?

- হঠাৎ আজকে তোমার পতিপ্রেম উথ্‌লে উঠল যে? নিকুকে এতদিনে পছন্দ হ'ল বুঝি!

কুঞ্জ-র সর্বশরীর রি-রি করিয়া উঠিল। বলিল,—বল, এসেছিলেন কিনা। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করবার বিশেষ দরকার আছে।

পঞ্চু এবার আর সহিতে পারিল না, অমানুষিক ঈর্ষায় তাহার শিরা-উপশিরাগুলি পর্যন্ত শূলবিদ্ধ সাপের মত মোচড় দিয়া উঠিতে লাগিল: দেখা করবার দরকার, না পিঠে লাথি খাবার দরকার! জান, জীবনে তোমার সঙ্গে ওর যদি কোনোদিন দেখা হয়—ও শাসিয়েছে—দা দিয়ে তোমাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' ফেল্‌বে—দা শানিয়ে রাখতে ও ভোলে নি।

দাঁত দিয়া ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া কুঞ্জ নিজেকে সংযত করিল। কহিল,—পরের ঘরের প্রসাদ খাওয়ার চেয়ে আপনার ঘরের লাথি খাওয়াও ভালো।

পঞ্চু হাসিতে গিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল,—অত পোষাকি সতীপনা এতদিন তোমার কোথায় ছিল, কুঞ্জ? ধোবাবাড়ি ছিল বুঝি? একটা সামান্য বেশ্যা হ'য়ে তুমি যে সীতা-সাবিত্রীর রিহার্সেল দিচ্ছ। তোফা!

—হ্যাঁ, দিচ্ছি বৈ কি। এই বেশ্যাই তোমার মত পঞ্চাশটা কুকুর রেখেছে পা চাট্‌বার জন্যে। তুমি সীতা-সাবিত্রীর কি বুঝবে?

--কুকুরের সংখ্যা হয় ত' একান্নই হ'ল আজ থেকে,—কিন্তু এই কুকুরটির শুধু জিভই নেই কুঞ্জ-সতী, দাঁত আছে। এ-কুকুর কাম্‌ড়াতে জানে। তোমার যত সতীপনা, তার দৌড়ের খেলা এই ঘরের মধ্যেই হ'বে এবার থেকে। বলিয়াই পঞ্চু তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চু যেন রাতারাতি মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে,—কুঞ্জ রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। পঞ্চুর ব্যবহারে দুর্জয় বর্বরতা আসিয়াছে, তাহাকে জয় করিতে হইবে। কুঞ্জ আসন্ন ঝটিকার ভয়ঙ্করতাকে এক নিমেষে আলোকরমণীয় করিয়া তুলিল। কণ্ঠস্বর অভূতপূর্ব স্নিগ্ধ মাদকতা লইয়া কহিল,—তাই ত' বলি পঞ্চু-দা, এই বেড়া টপকে আমার আর যাবার জায়গা ত্রিভুবনে কোথাও নেই। আমি তোমারই ঘরে বন্দিনী হ'য়ে রইলাম।

পঞ্চুর নিষ্ঠুরতা যেন দমিয়া আসিল, তবুও সন্দেহের কুয়াসা যেন একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল না। কহিল,—এখানে তোমাকে নিয়ে আমার আর থাকা চলবে না, আমার সঙ্গে তোমার বেরিয়ে পড়তে হ'বে।

তৎক্ষণাৎই সায় দিয়া কুঞ্জ বলিল,—তা কি আমি আর বুঝতে পারছি না, পঞ্চু-দা? সাধ করে' যখন তোমার বাহুর ফাঁস গলায় জড়িয়েছি তখন সেই ফাঁস জড়িয়েই আমাকে মরতে হ'বে।

—তবে, শুধু-শুধু কেন আমাকে ক্ষেপিয়ে দাও—কেন আমার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে' তোল?

—সেই অন্ধকারে তোমার জন্য আবার ভোরের আলো জ্বালব বলে'ই। কে সে নিকুঞ্জ?—তাই না আমি শহরে ছুটি গয়না আর বিলাসের লোভে—আর, সেই গয়নাও তো গায়ে রইল না, যা রইল কাঁটার মত বিঁধে রইল, তাই না এলাম আমি তোমার কাছে, তোমাকে ভালোবাসতে।

পঞ্চু জল হইয়া গেল। বলিল,—রাত ত' চেঁচিয়ে প্রায় কাবার করে' আনলে, এবার ঘুমোও দেখি। কালই আমরা বেরুব। এ জায়গার জল-বায়ু তোমার সইবে না। বলিয়া পঞ্চু দরজা খুলিয়া দাওয়ায় গিয়া মাদুর বিছাইল।

কুঞ্জ শুইল বটে, কিন্তু চোখের পাতা এক করিতে পারিল না। ঘরের সমস্ত অন্ধকার যেন অটল পাথরের মত উহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিতেই কুঞ্জ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল - আর সময় নাই। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, পশ্চিম কোণে চাঁদ অস্ত যাইতেছে - জ্যোৎস্না উহারই দুঃখের মত ফ্যাকাসে, বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। একটুখানি জ্যোৎস্না রাখ-র গায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে—সে-জায়গাটিতে হাত রাখিয়া কুঞ্জ রাখকে স্পর্শ করিল। এই অপরিচিত ছেলেটির জন্য কুঞ্জ-র মাতৃস্নেহ যেন সহসা বিধুর হইয়া উঠিল, ধীরে-ধীরে রাখ-র কপালে একটি স্বল্পস্ফুট চুম্বন রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বেড়ায় কান

পাতিয়া শুনিল, খুব বড়-বড় নিশ্বাস টানিয়া পঞ্চু তখনো নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছে—হয় ত' কুঞ্জকে লইয়া নিরুদ্দেশ পাড়ি জমাইবার স্বপ্ন দেখিতেছে, তাই মুখে একটি প্রসন্ন প্রশান্তি আসিয়াছে! কুঞ্জ রাখকে আরেকবার দেখিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চু টের পাইল না।

উঠান ছাড়াইয়া কুঞ্জ রাস্তা লইল, পিছে-পিছে কেহ আসিতেছে না ত'? বারে-বারে কুঞ্জ পিছন চায়, আর তাড়াতাড়ি করিয়া পা চালাইবার চেষ্টা করে। উহার কেবলই মনে হয়, কে যেন প্রার্থনাব্যাকুল দৃঢ় নিষ্ঠুর বাহু মেলিয়া উহাকে ডাকিতেছে,—পিছনে ও সমুখে দুই জায়গা হইতেই। পিছনের আহ্বান অবহেলা করিয়া কুঞ্জ উন্মুখ সম্মুখে ঝাঁপ দিবার জন্য চলিল।

এত দিন এখানে রহিল,—এত করিয়াও নিকুঞ্জ-র দেখা মিলিল না। তবে কি নিকুঞ্জ এখানে নাই? এ জায়গা ছাড়িয়া তাহার কোথাই বা যাইবার আছে?—কুঞ্জ পথ ভাঙিয়াই চলিল। এই পথ ধরিয়া বরাবর গেলেই মিহিরকান্দি পৌঁছুনো যায়,—এ-কথা পঞ্চুর কাছ হইতে কতবারই ও জানিয়া লইয়াছিল। এই পথই কুঞ্জ-র শেষ প্রত্যাশা—এ-পথই কুঞ্জ-র পরমমহান কাব্যসৃষ্টি।

ভোর হইতে বেশি বাকি নাই, সলজ্জা গ্রামবধূটি তখনো যেন অবগুণ্ঠন মেলিয়া ধরিতে পারিতেছে না, স্বর্গের সঙ্গে তাহার শুভদৃষ্টি হইবে। রাত্রিটুকু থাকিতে-থাকিতেই কুঞ্জ-র মিহিরকান্দি পৌঁছুনো চাই। মিহিরকান্দি পৌঁছিয়া কি করিয়া নিকুঞ্জকে দেখিয়া লইবে, তাহারই নানারকম ফন্দি আঁটিতে গিয়া বারে-বারেই শিহরিয়া উঠিতেছিল। হাঁটিতে-হাঁটিতে উহার পা ভাঙিয়া পড়িতেছে, তবুও বিরাম মানিতেছে না। যতই চলে, ততই পথ যেন আর ফুরাইতে চায় না, উহার আশার মত পথও যেন অসীম হইয়া উঠে।

রাতের সর্বশেষে অন্ধকারটুকু বোধকরি কুঞ্জ-রই চোখের জলে নাহিয়া লইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিহিরকান্দিতে আসিয়া কুঞ্জ কোথায় কাহারও পাত্তা পাইল না। দিশাহারার মত কুঞ্জ চারিদিকে চাহিতে লাগিল,—যেন উহার চোখের সমুখ হইতে সমস্ত পৃথিবী কর্পূরের মত উবিয়া গেছে, ও যেখানে দাঁড়াইয়া আছে তাহারই নীচে যেন পাতাল হাঁ করিয়া রহিয়াছে। কোথায় বা সেই ঘরদুয়ার, কোথায়ই বা নিকুঞ্জ! সমস্ত মাঠ বিরহী চিত্তের মত খাঁ খাঁ করিতেছে। সেই পরিচিত পথঘাট, সেই পরিচিত পুকুর-মাঠ,—কিন্তু বাড়িঘরের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নাই,—যেন ঝড়ে সব লোপাট হইয়া গেছে—খালি গৃহহীন ভিত্তিগুলি সিন্দুরহীন বিধবাললাটের মত নিঃশব্দে হাহাকার করিতেছে। সেই উন্মীলীয়মান উষালোকে কুঞ্জ-র করুণ কণ্ঠে

চীৎকার করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল—যেন সেই আর্তনাদে সমস্ত জলস্থল নিকুঞ্জ-র কণ্ঠস্বরেই প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিবে !

দক্ষিণের ভিটার কাছে সেই পেঁপে-গাছটি দাঁড়াইয়া আছে—ভারি বিবর্ণ চেহারা,—উঠানে কত যে আগাছা বাড়িয়াছে তাহার অন্ত নাই—কুঞ্জ একটা মাটির ঢিপির উপর বসিয়া পড়িল। একদিন ছোট ভাইটির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কুঞ্জ এই ঢিপির উপর বসিয়া কত কাঁদিয়াছে, নিকুঞ্জ পাশে বসিয়া কত সান্ত্বনা দিয়াছে সেই সব কথা ভাবিয়া কুঞ্জ-র দুই চোখ ছাপাইয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই দিনগুলিকে কি আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না ? কোথায় গেলে নিকুঞ্জকে পাওয়া যাইবে ?—কুঞ্জ-র চোখে নিকুঞ্জ আকাশের সূর্যের মত বড়ো হইয়া দেখা দিল। সেই আবির্ভাবের জ্যোতির্ময় আকস্মিকতা ও যেন আর সহিতে পারিতেছে না।

নদীর পারে কুঞ্জ যখন আসিয়া পৌছিল, তখন একটা নৌকা যাত্রী লইয়া চন্দন-গঞ্জে যাইবার জন্য তৈরি হইয়াছে। কুঞ্জ মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিল।

পরে চন্দনগঞ্জ হইয়া কুঞ্জ শহরে যাইবার জন্য ট্রেন লইল। একটা প্রায়ান্ধকার কুঠরীতে বসিয়া কুঞ্জ আপন মনে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সমস্ত ব্যাপারটা এখন তাহার কাছে একটা বিরাট প্রহসনের মত লাগিতেছে। সে নিজেকে উপহাস করিল, পঞ্চুকে উপহাস করিল। এত দিনে কত টাকা যে লোকসান হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে গিয়া ও মনে-মনে ভাগ্যকে ভৎসনা করিল। শহরে গিয়া বিধু-র সঙ্গে কথা কহিবার সময় সমস্ত ব্যাপারটায় কিরূপ রঙ চড়াইবে তাহাই ভাবিতে-ভাবিতে ও তন্ময় হইয়া গেল।

নিকুঞ্জ-র সঙ্গে দেখা হয় নাই—তাইতেই ত' আজ ও নিজেকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত ও রিক্ত মনে করিতেছে। কিন্তু, নিকুঞ্জ-র সঙ্গে এত দিনেও উহার দেখা হইল না, এত কাছে আসিয়াও,—এই কথাটিও কুঞ্জ ভুলিতে পারিতেছে কই ?

গাড়ি তখন চলিতে সুরু করিয়াছে। কিসের একটা শব্দ হই তই কুঞ্জ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, পঞ্চু চলন্ত গাড়িতে লাফাইয়া উঠিয়া মাটি হইতে রাখকে টানিয়া তুলিতেছে। নিমেষে কুঞ্জ-র মুখ ছাইয়ের মত পাংশু হইয়া গেল।

কুঞ্জ-র মুক্তি নাই।

সারা পথ কেহ কাহারো সঙ্গে কথা কহে নাই,—যেন চেনেই না। প্রায় রাত্রি

এগারোটার সময় গাড়ি যখন কলিকাতার দুয়ারে পৌঁছিল, পঞ্চু নামিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল : এখন কোথায় যাবে ?

কণ্ঠস্বরে অভাবনীয় স্বচ্ছতা নিয়া কুঞ্জ কহিল,—আপাতত আমার ঘরেই চল. রাতটা সেখানে কোনো রকমে কাটিয়ে সকাল বেলা যা-হোক একটা বন্দোবস্ত করা যাবে 'খন।

ইন্দ্রপুরীর কল্পনা করার সাধ্য পঞ্চুর নাই, তাই শহর দেখিয়া পঞ্চুর বিস্মিত না হইবার কিছুই ছিল না, কিন্তু কুঞ্জ-র এই কথায় পঞ্চু যেন সেই ইন্দ্রপুরীর রাজত্ব পাইয়া বসিল। কুঞ্জ এমন ভাবে কথাটা কহিল যেন তাহারা বহু পরামর্শ করিয়া বহু দূর দেশ হইতে দুইটি বিচ্ছিন্ন নদী-রেখার মত প্রবাহিত হইয়া এখানে আসিয়া মিলিয়াছে। প্ল্যাটফর্ম পার হইবার সময় কুঞ্জ বাঁ হাতে রাথকে টানিয়া ধরিয়া ডান হাতে ঘোম্‌টাটা মুখের উপর খানিক নামাইয়া দিয়া পঞ্চুর হাত ধরিবার জন্য বাড়াইয়া দিল—কে বলিবে কুঞ্জ পঞ্চুর স্ত্রী ছাড়া আর কিছু ? এত মমতার সহিত এত আত্মীয়তার সহিত পঞ্চুর হাত আর কে ছুঁইয়াছে ?

আনাড়ী পঞ্চুকে দিয়া কিছু হইবে না,—তাই রাস্তায় পড়িয়া কুঞ্জকেই গাড়ি লইতে হইল। ঠিকানা জানিয়া লইয়া সহিস্ লাগাম টানিয়া দিল।

সারা রাস্তা কুঞ্জ অবিশ্রান্ত বকিয়া চলিয়াছে। পঞ্চুকে এই কথা বুঝাইতে আর বাকি রহিল না যে, পঞ্চুরই জন্য ও পঞ্চুরই হাত ধরিয়া ভরসাহীন ভবিষ্যতের নদীতে সাঁতার কাটিবে। ও যে মোটেই একাকী পলাইয়া আসিতেছিল না, মিহিরকান্দিতে কুস্‌মির খোঁজ করিয়া উহার কলিকাতা যাইবার আগে উহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল মাত্র, এবং উহার পাশে যে প্রগল্‌ভা গ্রাম্য কিশোরীটি বসিয়াছিল সেই যে কুসুম, (যদিও সে কলিকাতার আগেই নামিয়া গিয়াছে) পঞ্চুকে গাড়িতে ঠিক সময়ে উঠিতে দেখিয়া উহার যে আনন্দে আর নামিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না, কলিকাতাতেই যে নূতন সংসার পাতিবে—এই ভাবে সমস্ত ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করিয়া কুঞ্জ পঞ্চুকে একেবারে জল করিয়া দিল। নিজের সৌভাগ্যের কথা বিশ্বাস করিবার মত সুখ বোধ করি মানুষের আর কিছুই নাই,—সেই সৌভাগ্য যতই কেন না অসম্ভব হোক্। মানুষ যত অসহায়, ততই বিশ্বাসপরায়ণ।

সেই বিশ্বাস করিয়াই পঞ্চু কুঞ্জ-র নির্দেশমত একটা সরু গলির মাথায় একটা তেতলা বাড়ির দোর-গোড়ায় নামিয়া পড়িল। কলিকাতার গরিব পাড়ায় তিনটি প্রাণীর বাসোপযোগী একখানা মেটে ঘরের কত ভাড়া হইতে পারে, একটা চাকরি-বাকরি জুটাইয়া লইতে পঞ্চুর যতদিন দেরি হইবে সেই কয় দিন কুঞ্জ-র কয়খানা গয়না বাঁধা পড়িতে পারে, রাথকে ইস্কুলে পড়াইয়া মানুষ করিতে কয় বছর লাগিবে

এবং কতদিনে সেই টাকাটা রাখকে দিয়া উসুল হইবে— কৃষ্ণ গাড়িতে বসিয়া বসিয়া তাহারও হিসাব করিয়াছে। একটি সেবাস্নিগ্ধ-সংসার-নিকেতনের স্বপ্ন দেখিয়া-দেখিয়া পঞ্চুর নিশ্বাস ভারি হইয়া উঠিল।

কুঞ্জর পদানুসরণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া রাখ ও পঞ্চু উপরে উঠিতে লাগিল।··· কলিকাতার একটা ষ্টেজে মফঃস্বল হইতে কতগুলি লোক থিয়েটার করিতে আসিয়াছিল,—কাল তাহাদের থিয়েটার শেষ হইলেও গলাবাজি এখনও শেষ হয় নাই, আজ রাত্রে ছয় সাত জন মিলিয়া বাছিয়া-বাছিয়া বিধু-র ঘরেই স্ফূর্তি করিতে আসিয়াছে। বিধু-র ঘরে ফরাস বিছাইয়াও এত লোক ধরিবে না বলিয়া বিধু-র অনুরোধে বাড়িউলি কুঞ্জর ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়াছিল; চাই কি আজিকার মত রোজগার বিধু-র যদি মাসে সাত দিন হয়, তাহা হইলে এই ঘরই উহার কায়েমি হইয়া যাইবে।···দরজার কাছে হঠাৎ কুঞ্জকে দেখিয়া বিধু ও তাহার সঙ্গীগুলি সমস্বরে উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল, -বিধু চীৎকার দিল আনন্দে, কুঞ্জ-র আকস্মিক আবির্ভাবে; লোকগুলি চেঁচাইল নেশার তাড়সে, আরেকটি সঙ্গিনী পাইবার সলোভ সম্ভাবনায়। কুঞ্জকে পাকড়াও করিয়া ঘরের মধ্যে ছিনাইয়া লইবার জন্য লোকগুলি হঠাৎ দরজার সম্মুখে ভিড় করিয়া আসিল।

একজন বলিয়া উঠিল: চলে' এস সজনি, এক ঢোক এক টাকা করে'। খাবে যত, পাবে তত—

এই সব মাতালের নির্লজ্জ আচরণে কৃষ্ণ একটুও ভড়কাইল না, বরং যাহা করিয়া বসিল তাহার যেন আর তুলনা নাই। বিস্ময়কুণ্ঠিত পশ্চাৎবর্তী পঞ্চুকে দেখাইয়া কুঞ্জ মাতালগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল: আমাকে আপনারা বাঁচান, আমাকে বাঁচা বিধু—বলিতেই-বলিতেই কুঞ্জ কাঁদিয়া ফেলিল আর কি।

—কেন, কেন, কি হয়েছে?

সকলে কুঞ্জকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

কুঞ্জ-র বিপদ যতই গুরুতর হোক না কেন, পঞ্চু আজ আর তাহার রক্ষাকর্তা নয়। তাই পঞ্চুরই চোখের উপর আঙুল উঁচাইয়া কৃষ্ণ আহত কর্কশ কণ্ঠে বলিল,— এই লোকটার খপ্পর থেকে আপনারা আমাকে বাঁচান - এই লোকটা আমার সর্বনাশ করেছে, আমাকে মদের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে চেয়েছিল, আমার জিনিসপত্র গয়নাগাঁটি সব কেড়ে নিয়েছে। তবু ওর খাঁই মেটে না, এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করে' এসেছে—

দৃপ্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কুঞ্জ-র সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মুহূর্ত মধ্যে যে কী হইয়া গেল তাহা আয়ত্ত করিয়া লইবার মত অবসর পর্যন্ত

পঞ্চুর মিলিল না,—একবার মাত্র মনে হইল সমস্ত কলিকাতা-শহরটা যেন সৃষ্টির প্রদোষকালে আসিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা, ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে। মুহূর্ত-মধ্যে লোকগুলি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া পঞ্চুকে আক্রমণ করিয়া বসিল। সেই আক্রমণের হিংস্রতার চেয়ে অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতাই পঞ্চুকে বেশি অভিভূত করিয়া ফেলিল,—এত বড় সর্বনাশের জন্য পঞ্চু মোটেই তৈরি ছিল না, এবং সেই সর্বনাশের চেহারা দেখিয়া স্বয়ং কুঞ্জ-ই আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

ইহারই মধ্যে বিধু শুধু একবার পুলিশ ডাকিয়া তাগার হাতে পঞ্চুকে সমর্পণ করিবার কথা তুলিয়া তাহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু আইন যাহারা নিজের হাতে লইয়াছে তাহারা পরের কাছে নালিশ করিয়া নিজেদের দুর্বলতার প্রমাণ দিতে চাহে না। তাই সোডার বোতল, ডিকাণ্টার, ট্রে, জুতা, চেয়ার—কিছুরই অভাব হইল না; সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মত পঞ্চু একটা ঢিলও কুড়াইয়া পাইল না—অপমানে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে গিয়া কুঞ্জ-র কাছেই করুণ কণ্ঠে ককাইয়া-ককাইয়া সাহায্য চাহিয়া বসিল।

পৃথিবীতে সব কিছুরই শেষ আছে, তাই পঞ্চুর-ও লাঞ্ছনার একটা সমাপ্তি মিলিল। কিন্তু সেই সমাপ্তি আয়ুর সমাপ্তির অত্যন্ত সমীপবর্তী বলিয়াই পঞ্চুর মনে হইল। কতক্ষণ ঝিম্ খাইয়া বসিয়া থাকিয়া দুই হাতে মাথার রক্ত মুছিতে-মুছিতে পঞ্চু অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল, কিন্তু পা চলিতে চাহিবে কেন? পঞ্চু টাল সামলাইতে পারিল না।

এই এক মন্দ ফ্যাসাদ হইল না,—কুঞ্জকেই ফের শুশ্রূষা করিতে হইতেছে। শুধু ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিলেই চলিত। নিজে যত বড়ই বিশ্বাসঘাতকতা করুক না কেন, তাহার মধ্যে পাপের চেয়ে কৌতুকই বোধকরি বেশি ছিল, কিন্তু সেই কৌতুকের সাক্ষী হিসাবে একেবারে মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে, এত বড় নিষ্ঠুরতা বিধাতাকে মানাইলেও নগণ্য কুঞ্জকে মানায় না। অগত্যা, পঞ্চুর রক্তাক্ত মাথাটাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কুঞ্জকেই বরফ লাগাইতে হইল।

হায়, নির্বোধ নিশ্চেতন পঞ্চু তাহা জানিতেও পারিল না। জানিতে পারিলে হয় ত' এমনি ভাবেই শুইয়া থাকিতে-থাকিতে ইহকালের জন্য আর জাগিতে চাহিত না।

বাড়ির আর সব বাসিন্দারা (মায় বাড়িউলি) এই অভাবনীয় ব্যাপারে একেবারে ঘাবড়াইয়া গেছে। তাই পঞ্চুর একটু জ্ঞান হইতে না হইতেই একটা লোক একটা গাড়ি লইয়া আসিল। পাঁজাকোলে করিয়া পঞ্চুকে তাহারই মধ্যে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া

বসাইয়া দিল। গাড়োয়ান ছাড়া সঙ্গে আর লোক রহিল না,—গাড়োয়ানকে ভারি রকমের বকশিস্ দেওয়া আছে।

পঞ্চুর তিরোধানের পর বিধুর স্ফূর্তি আর জমিল না,—মদের সঙ্গে মানুষের রক্ত মিশিয়াছে। কুঞ্জ এক ফাঁকে খোলা বারান্দায় নিজের আঁচল পাতিয়া ভয়ার্ত স্তম্ভিত রাখকে বুকে লইয়া শুইয়া পড়িল। মাতালগুলি স্ফূর্তি জমাইবার আশায় কুঞ্জকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। শেষকালে বারান্দায় এক পার্শ্বে শায়িত নারীমূর্তি দেখিয়া কুঞ্জকে চিনিয়া লইতে উহাদের দেরি হইল না। কুঞ্জ একটি কিশোর বালককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া যীশুখৃষ্টের মা'র মতই যেন ঘুমাইতেছে। সেই অবস্থা হইতেই মাতালগুলি হয় ত' কুঞ্জকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিত, কিন্তু বিধু গিয়া বাধা দিল। শত হইলেও বিধু মা'র মর্যাদা রাখিতে জানে।

এদিকে, পঞ্চুর যখন জ্ঞান হইল, আকাশে চাঁদ অস্ত যাইতেছে। পথে উহাকে কে যে কখন শোয়াইয়া দিয়া গেছে খেয়াল নাই,—নির্জন পথ, একটা গাড়িও চলিতেছে না। পঞ্চুর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হইল; বহু কষ্টে ফুটপাথ হইতে একটু সরিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া নর্দমাটার নাগাল পাইল। জিভ দিয়া কতগুলি দুর্গন্ধ কাদা লেহন করিতে-করিতে হঠাৎ উহার অভ্রভেদী মূর্খতার কথা মনে পড়িয়া গেল,—ইচ্ছা হইল ফুটপাথের পাথরের উপর মাথাটা ঠুকিয়া-ঠুকিয়া শরীরের বাকি রক্তটুকুও বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু শরীরে তাহার ততটুকু শক্তিও আর নাই।

তবুও, কুঞ্জ-র অব্যাহতি কোথায়? রাখ উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

রাখকে লইয়া এ এক নূতন বিপদ হইল। এই বাড়িতে উহাকে লইয়া বাস করা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? কুঞ্জকে কি তাই বলিয়া দোকান গুটাইতে হইবে নাকি? কোথাকার কে রাখ তাহার জন্য না খাইয়া মরার মত সস্তা মাতৃস্নেহ কুঞ্জ-র নাই।

কুঞ্জ আবার নূতন করিয়া দোকান জাঁকাইয়া তোলে—চাকর দিয়া সমস্ত ঘর ফিট্‌ফাট্, দেয়ালে চুণকাম করিয়া লওয়া চাই। সম্ভব হইলে এ-বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়াই ঠিক হইবে—এতদিনের গা-ঢাকার পর এ-বাড়িতে হয় ত' আর পসার জমিবে না!

সে-দিন সন্ধ্যাবেলা কুঞ্জ রাস্তার ধারের জানালার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রাখ কোথায় একটু বেড়াইতে গিয়াছে, কুঞ্জ বারে-বারে উহাকে সাবধান করিয়া

দিয়াছে যেন ভুলক্রমেও ফুটপাথ ছাড়িয়া রাস্তায় না নামে,—যেন নাক-বরাবর খানিকটা গিয়া আবার পেছনে ফিরিয়া সোজা বাড়িতেই চলিয়া আসে—উহার মা উহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিবে।

কে উহার মা? কুঞ্জ কি ছাই তাহা ভাল করিয়া জানে? ও ত' কুঞ্জরই মত গৃহহীন, বৃন্তচ্যুত। একদিন এই আশ্রয়হীনতাই কুঞ্জকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল,—পৃথিবীতে আপনার বলিতে কেহ নাই এই চিন্তার মধ্যে বোধকরি একটা বৈরাগ্যপূর্ণ স্বাধীনতা আছে,—কুঞ্জ এই স্বাধীনতারই উপাসিকা ছিল। কুঞ্জ নিজেকে স্রোতের ফুলের সঙ্গে তুলনা করিত, যেন ও এই সৃষ্টির প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়াছে,—নিরাশ্রয়, বৃন্তহীন, বিগতসৌরভ! নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া কুঞ্জ আর-আর সবাইর মত শিহরিয়া উঠিত না; পিছন হইতে কেহই উহাকে ডাকিবার নাই, সম্মুখেও কেহ উহাকে ইসারায় পথ দেখাইয়া দিবে না, ও স্বচ্ছন্দগামিনী জলধারার মত ভাসিয়া চলিবে। উহার আকাশে উষা নাই, সন্ধ্যাও কবে আসিবে কে জানে,—ও মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে পাখা মেলিয়া দিয়াছে!

জানালা দিয়া প্রকাণ্ড জনপ্রবাহের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কুঞ্জ-র হঠাৎ মনে হইল, যেন অতি নিকটেই রাখ-র মা'র বাসা। রাখ রাস্তায় বাহির হইতেই উহার চিরপ্রতীক্ষমানা বিষাদিতা মা উহাকে চিনিয়া ফেলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ মনে হইতেই কুঞ্জ-র আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, যদি রাখ আর ফিরিয়া না আসে! কুঞ্জ তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাস্তায় চাকর পাঠাইয়া দিল—চাকর রাখকে ভাল করিয়া চেনে না,—তবুও কুঞ্জ-র যে স্বস্তি নাই। সন্তানবিরহব্যথায় কুঞ্জ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

রাখ ফিরিয়া আসিল বৈ কি। কুঞ্জ দুই হাত দিয়া রাখকে একেবারে বুকে চাপিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখ মুখ তুলিয়া লইয়া চক্ষু বড়ো করিয়া বলিতে লাগিল: সেই পয়সাটা দিয়ে নাগরদোলা চড়ে' এলাম মা, তাইতেই ত' দেরি। কত মা গাড়ি, কত মোটর,—ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমারো ছুটতে ইচ্ছা করে। আমার জন্যে এত ভয় কিসের মা, আমি কি কচি খোকা নাকি, আমার নাক টিপলে দুধ পড়ে? তুমি যে মা আমার চেয়েও ছেলেমানুষ! বলিয়া রাখ নিজের ছোট শার্টটা তুলিয়া কুঞ্জ-র চোখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

রাত্রে কুঞ্জ আর রাঁধে নাই,—চাকরকে পাঠাইয়া ময়রার দোকান হইতে খাবার কিনিয়া আনিল—রাখ প্রথম এই লুচি খাইতেছে। রাখকে নিজ হাতে খাওইয়া আঁচাইয়া নিজের কোলের উপর শোয়াইয়া দিল।

পাশের ঘরের বিধু কুঞ্জকে ব্রে খেলিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিল—

তাহাদের একজন খেড়ু কম পড়িয়াছে। কুঞ্জ-র যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু বিধু যখন উহার অস্বাভাবিক স্নেহের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন কুঞ্জ নিজের মনেই হাসিয়া উঠিল। সত্যই ত' ও নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিতেছে,—এই অনাস্বাদিতপূর্ব স্নেহের জন্য ও কোনোকালে প্রস্তুত ছিল না, তাহার জন্য না ছিল সাধনা, না বা ছিল অন্তর্লীন একটি আয়ত্তাতীত আকাঙ্ক্ষা; কুঞ্জ-র অতীত জীবনের সঙ্গে ইহার সঙ্গতি নাই, ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবার মতই ইহা বিস্ময়জনক। তাই কুঞ্জ বিধু-র রসিকতার কোনো পাল্টা জবাব না দিয়াই উহার ঘরে গিয়া তাস কুড়াইয়া লইল।

বিধু ঠাট্টা করিয়া বলিল,—সেই যে আছে না—

ঐ ক্ষেপেছে ঝড়ো হাওয়া,
হাল ছেড়ে দে, থাকুক বাওয়া
পা ছড়িয়ে বাজাই বাঁশি,
জলের তলেই কাশীবাসা!

ওঁর হয়েছে সেই দশা। কোথা থেকে এক ছেলে কুড়িয়ে এনে উনি একেবারে বাল্মীকির তপোবনের সীতা হ'য়ে উঠ্‌লেন। গেল ব্যবসা, গেল ফুর্তি! ফ্যা ফ্যা করে' মর্‌বি কুঞ্জ, এখনই ত' গুছিয়ে নেবার সময়। নইলে দেখ্‌লি ত' চোখের ওপর কাদি-মাসির মরণটা—

সত্যই ত', কুঞ্জর বোকামির আর শেষ নাই, পথের থেকে একটা সোনার শিকল কুড়াইয়া আনিয়া গলায় ফাঁসি দিয়াছে। কুঞ্জ হাসিতে-হাসিতে সাম্‌নের টেবিলের উপর হইতে মদের গ্লাশ তুলিয়া চুমুক দিল।

বিধু বলিল,—যদি বলিস ত' ছোঁড়াটাকে একটা বিড়ির দোকানে ঢুকিয়ে দি। রেহাই পাবি কুঞ্জ, রেহাই পেয়ে হাই তোল্‌—আমরাও আগের মতো দু' এক ফোঁটা পেসাদ পাই।

রাখর মত না হইলেও মদ কুঞ্জ ভালবাসে। কিন্তু আর খাইতে তাহার সাধ হইল না। রাখ বিড়ির দোকানে ঢুকিয়াছে, ঘাড় কামাইয়া চুল ছাঁটিয়া পথের নোংরা ছেলেগুলির সঙ্গে শিস দিতে দিতে পাড়া বেড়াইতেছে, খাবারের পয়সা দিয়া তাড়ি খাইয়া নর্দমায় গড়াগড়ি যাইতেছে—ভাবিতে কুঞ্জ একেবারে ভয়ে দুঃখে ঘামাইয়া উঠিল মদ করিবার জন্য যিনি দ্রাক্ষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সৌন্দর্যস্নানে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইবার জন্যই বুঝি তিনি বারাঙ্গনার বুকে মাতৃস্নেহ দিলেন। কুঞ্জ স্বপ্ন দেখিলেও তাহা অভ্রভেদী হিমালয়কে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিতে পারে না, তাই রাখকে বড় জোর একটি সাধারণ স্বল্পবিত্ত কেরাণী-রূপেই কল্পনা করিয়া তাহার সুখের আর

অন্ত নাই। ছোট সংসারে পরিমিত জীবনযাপন, সুস্থ, সংযত ও সহজ রাথ-র জন্য মনে মনে ও এই ছবিটিই আঁকিয়া রাখিয়াছে। নিষ্কলুষা উষার মত একটি নম্র নতচক্ষু মেয়ে রাথ-র জন্য অনির্বাণ একটি মমতা লইয়া আসিবে, একটি অবিচল নিষ্ঠা, একটি সুকোমল সান্ত্বনা, কুঞ্জ ইহার চেয়ে বেশি আর কী প্রার্থনা করিতে পারে? ও না-হয় কাদি-মাসির মত পচিয়া পচিয়া এক-একটা করিয়া অঙ্গ খসিতে খসিতে মারা যাইবে, রাথ একটি শুচিস্মিতা সতী মেয়ের সুস্নিগ্ধ সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভ করিয়া জীবনে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক,—কুঞ্জ-র মনে হয়, এই দায়িত্ব যেন বিধাতা উহার স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন। কথাটা মনে হইতেই কুঞ্জ হঠাৎ হাতের তাসগুলি চিৎ করিয়া ফেলয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই বারেই বিবি পড়িত, বিধু বিরক্ত হইয়া বলিল,—কি হ'ল আবার—

কুঞ্জ আঁচলটা গুছাইয়া লইয়া কহিল, ছেলেটার মশারি টাঙানো হয়নি, আসচি টাঙিয়ে—

বিধু পা দিয়া সবগুলি তাস ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আর আসতে হ'বে না। তবু যদি নিজে পেটে ধরতিস্, অত হ্যাঙলাপনা করে' বেড়াতে হ'ত না।

কুঞ্জ নিজের ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ও যে কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ও যখন মিহিরকান্দি হইতে পলাইয়া আসিবার সময় উৎফুল্ল হইয়া ট্রেনে চাপিল, তখন উহার করুণাহীন পিপাসার্ত অতীত জীবনটাই ত' উহাকে আবার লুব্ধ করিয়াছিল সেই লোভের মধ্যে মাদকতার ত' এতটুকু অভাব ছিল না। পঞ্চুকে ও ভালবাসে নাই, তাহাকে খেদাইয়া দিয়া ও এতটুকুও খেদ অনুভব করিতেছে না, বরং তৃপ্তিই লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই দুর্বল ভীরু ছেলেটার শিথিল আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া কি এতই কঠিন? কোথা হইতে একটা কাঙাল ভিক্ষুককে উহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া বিধাতা উহার হৃদয়ে অজস্র স্নেহসুধা ঢালিয়া দিলেন; কঞ্জুস্ কুঞ্জ আজ সহসা একেবারে উজার দানশীলতায় ফতুর হইতে চায় কোন্ সাহসে?

ঘুমন্ত রাথ-র গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে কুঞ্জ ভাবিতে লাগিল—জীবনে ও এমনিই একটি ছায়া চাহিয়াছিল, গ্রীষ্মাবসানে একটি বিস্তীর্ণ ও সুশীতল মেঘছায়া। আজ যদি বিস্মৃতির চিতাভস্ম হইতে নিকুঞ্জ আসিয়া উহাকে ফের ডাক দেয়, তবে ও কখনই রাথকে ফেলিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইতে পারিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, ও ত' স্বামীর জন্যই স্বামীকে ভালবাসে নাই, এই সন্তানের জন্যই ভালবাসিয়াছিল; ও, তাই ভালবাসিতে এত ভাল লাগিয়াছিল। তাই সেদিন কুঞ্জ যখন মিহিরকান্দিতে লুকাইয়া গিয়া গৃহহীন শূন্য ভিটাগুলির উপর দাঁড়াইল, তখন

সেখানে রৌদ্রের রিক্ততা বিরাজ করিতেছিল,—কুঞ্জ নূতন মুক্তির আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিয়াছিল আর কি। কিন্তু বিধাতা তাঁহার স্নেহসিক্ত কল্যাণকরস্পর্শের মত রাখ-র বুভুক্ষু হৃদয়টি কুঞ্জ-র কাছে পৌছাইয়া দিয়াছেন, প্রত্যাহার করিবার মত শক্তি কুঞ্জ-র কোথায়? এরূপ কেন হইল—কুঞ্জ কেন কাদি-মাসির মত পচিয়া-পচিয়া মরিবে না?

রাখ-র ললাট চুম্বন করিতে কুঞ্জ নত হইল। কিন্তু এইমাত্র মদ খাইয়া ঠোঁট দুইটা নিশ্চয় কলুষিত হইয়া আছে,—কুঞ্জ আলো জ্বালাইয়া জল লইয়া মুখ ধুইতে বসিল।

বাড়িউলি খেঁকাইয়া ওঠে: ছেলে নিয়ে আদিখ্যেতা করবার জায়গা এ নয় বাপু। সন্নেসিনি হ'তে হয়, শিবমন্দিরের উঠোনে পাকুড়তলায় বসে' গাঁজার কল্‌কে ধর গে,—না-হয় ছেলের হাত ধরে' ভিখ মাগ' গে যাও,—হেতায় এ সব পোষাবে না। দেড় মাসের ওপর হ'য়ে গেল ভাড়া বাকি,—তোমায় বসে'-বসে' জিরোবার জন্য আমি দোর খোলা রাখব চল্‌বে না বাপু, তুমি পথ দেখ। পাশের গলির সুশীলা আস্‌বে বলেছে পঁয়ত্রিশ টাকা দেবে, দিতেও পারবে, তাকেই আমি আনব। তুমি তোমার ছেলে কোলে নিয়ে রাস্তায় নেমে ধেই-ধেই কর গে যাও। সাত দিনের মধ্যে ভাড়া চুকিয়ে যদি না সর, তবে আমাকে পুলিশ ডাকতে হ'বে।

নিশ্চয়ই, ভাড়া দিতে হইবে বৈ কি, কিন্তু কোথা হইতে দিবে? বেচিবার মত গহনাও তেমন তাহার নাই, গলায় যে মটর-মালাটা আছে তাহা বেচিতে বড় কষ্ট হইবে; তবে কি কুঞ্জ রাখকে ঘাড় ধরিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিবে? বিধু-র কাছে ড্রেসিং টেবিলটা বেচিয়া দিলে কেমন হয়? কিন্তু কুঞ্জ-র অসময় বুঝিয়া বিধু কুড়ি টাকার বেশি দিতে চাহিবে না। ও থাক্, বড় হইলে রাখই না-হয় উহা ব্যবহার করিবে—এই প্রকাণ্ড আলমারিটাতে রাখ-র ভাবী বধূটি তাহার জামা-কাপড় রাখিলে তাহা অশুদ্ধ হইবে না। ঘর-ভাড়া শোধ করিয়া দিতে কুঞ্জ-র জিনিসপত্র বেচিয়া ফেলিয়া ছত্রখান করিয়া দিতে হইবে-একেবারে এমন কি হইয়াছে? কিন্তু, উপায়ই বা কোথায়? রাখকে নিয়া ও কোথায় দাঁড়াইবে?

ইহার চেয়ে রাখর মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়াই কি বুদ্ধিমতীর কাজ নয়? প্রথম-প্রথম না-হয় একটু কষ্ট হইবে, তা' সকলেরই হইয়া থাকে, ড্রেসিং টেবিলটাকে বিক্রি করিলেও হইবে—পরে আবার সেই সহজ ও সুপরিচিত, গতানুগতিকতা, কালক্রমে কাদি-মাসির মত তেমনি পচিয়া-পচিয়া মরা! কোথায় বা রাখ, কে বা তাহার মা!

কুঞ্জ হাঁপাইয়া উঠে, কিন্তু বাড়িউলির অনর্গল বকর-বকরের বিরুদ্ধে একটিও কথা তুলে না।

সেদিন রাত্রে কুঞ্জ-র ভেজানো দরজায় কে যেন দুইটা টোকা দিল। টোকা শুনিয়া কুঞ্জ চমকিয়া উঠিল—প্রতিশোধ লইতে পঞ্চু ফিরিয়া আসে নাই ত'? শীত বেশ পড়িয়া গিয়াছে, রাখ বুড়ো মাষ্টারের কাছে একপৃষ্ঠা প্রথম ভাগ পড়িয়া ছেঁড়া কম্বলের নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। (বুড়ো মাষ্টারটি আগে কবিরাজি করিতেন,—এ'ন হইতে বাহির হইয়া রোজ গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ি ফেরেন এবং গুণিয়া-গুণিয়া নামজপের সঙ্গে এক শ' আটটা ডুব দেন। পড়াইবার সময় বাড়ি হইতে কুশাসন নিয়া আসেন এবং যতক্ষণ থাকেন বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠের মূলে পৈতাটি জড়াইয়া রাখেন। কুঞ্জ দিনে একবার করিয়া পা না ছুঁইয়া দূরে গড় হইয়া প্রণাম করে ও প্রত্যহ এক মুঠো চাল ও একটি করিয়া পয়সা দেয়,—মাষ্টারের তাহাই মাহিনা।)

কুঞ্জ দরজার কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল: কে?

- আগে খোলঃ না—

গলার স্বরটা পঞ্চুর নয় নিশ্চয়ই, তবু ঠিক ঠাহর করিতে দেরি হইতেছিল বলিয়া কুঞ্জ ভীষণ বিরক্ত হইয়া ফের শুধাইল: বলি বাপ-মা কিছু নাম রেখেছিল? নাম বল্‌তে বাধে কেন?

উত্তর হইল: নাম আছে বৈ কি, পকেটে দামও আছে। আমি সনৎ গো সনৎ, শোভাবাজারের—

নামটা অত্যন্ত পরিচিত,—কুঞ্জ দরজা খুলিয়া দিল।

যে-লোকটা ঘরে ঢুকিয়াই র‍্যাপারের তলা হইতে দুইটা বড়-বড় মদের বোতল বাহির করিয়া ধরিল তাহাকে ঠিক একটা খাড়া দু-পেয়ে কাঁকলাশের মত দেখিতে। সমস্ত গায়ে একটা বীভৎস বিবর্ণতা, বেশভূষাও নিতান্ত অপরিষ্কার। এই দারিদ্র্যের গর্ব করিয়া বেড়ানোই তাহার কাজ,—দারিদ্র্য-মোচনের প্রতিজ্ঞা নহে। সংসারের কাছে সনৎ নির্দয় অবিচারে লাঞ্ছিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, এই পরাজয়ের কালিমা মুখে মাখিয়া বেড়াইতে সে গভীর আনন্দ পায়। ঘরে স্ত্রী উপবাসে আছে, রাত্রি ভোর হইলে হয় ত' মেয়েটাকে আর জীবন্ত দেখা যাইবে না,—সনতের মত দুঃখী আর পৃথিবীতে কে আছে, অতএব হাতে যা কয়েকটি টাকা আছে তাহা দিয়া চাল ডাল ও মেয়ের জন্য ঔষধ পথ্য না কিনিয়া মদ খাইয়া দুঃখ ভোলাই কি খুব চমৎকার নহে? এই বাড়িতেই ত' কতদিন টাকা দিবার সময় সনৎ ভাণ করিয়া কাকুতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছে: টাকাটা থাকলে মেয়ের একটা জামা হ'ত,—এই শীতে একটি জামা

নেই। কোনো কোনদিন কুঞ্জ-র মন গলিয়াছে, টাকা নেয় নাই। সেই টাকা দিয়াই সনৎ আবার অন্যত্র মাশুল জোগাইয়াছে। এই মেয়েটিই সনতের একমাত্র মূলধন।

মনে মনে সনৎকে কুঞ্জ ঘৃণা করিলেও আজ হঠাৎ একেবারে অনেকগুলি টাকা চাহিয়া বসিল। সনতের আজ ইহাতে আর আপত্তি নাই, দুইটা ভারি পকেট বাজাইয়া এমন শব্দ করিল যাহা কুঞ্জ জীবনে কোনোদিন শোনে নাই। তবু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল : তোমার মেয়ে কেমন আছে?

সনৎ টেবিলের উপর বোতল দুইটা শব্দ করিয়া রাখিয়া দিল। কহিল,—মেয়ে? মেয়ে পটল তুলেছে। তাই ত' তার মৃত্যু-উপলক্ষে এই উৎসব করতে এসেছি।

কুঞ্জ কহিল,—বল কি? স্ত্রী?

—সে বড্ড দেরি করছে; দেরি না করলে বৈধব্যটা আর সইতে হ'ত না—বিধবা হ'লে অবশ্যি খরচ আর কি কম্‌বে!—এখনো ত' তাই। যাক্ গে সে-কথা, চাকরটাকে ডাক।

কুঞ্জ সে-কথা কানে না তুলিয়া কহিল,—কোত্থেকে টাকা পেলে?

আলোয়ানটা কোমড়ে জড়াইয়া লইতে-লইতে সনৎ বলিল,—সে-কথা কাল জিগ্‌গেস কোরো।...হঠাৎ ঘুমন্ত রাখ-র উপর নজর পড়িতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল : ও কে শুয়ে? লোক?

কুঞ্জ ধীরে কহিল,—আমার ছেলে।

কথা শুনিয়া সনৎ এমন বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল যে রাখ ভয় পাইয়া ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পরে তাহার মনে হইল মা নিশ্চয়ই এই অপরিচিত লোকটার হাতে বিপদে পড়িয়াছে, তাই সে ঘুমে-জড়ানো দুই চক্ষে প্রতিশোধের তেজ লইয়া মাকে ধরিয়া দাঁড়াইল। কুঞ্জ কহিল,—যা ঘুমো গে; আমার মাথাটা একটু ধরেছে, পরে আসছি।

রাখ আবার কম্বলের নীচে গিয়া শুইল। শুইয়া-শুইয়া শুনিতে লাগিল কুঞ্জ বলিতেছে : এই ঘর থেকে বেরিয়ে চল, আমার না থাক্, আমার ছেলের আসার পর থেকে এই ঘরের একটা পবিত্রতা হয়েছে—তাকে নষ্ট হ'তে দেব না।

কুঞ্জ-র হঠাৎ যেন কী হইয়া গেল। শীতের রাত্রে মদের বোতল ও পকেট-ভরা টাকা দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া উঠিল—উহার সত্য-সত্যই আর ফিরিবার পথ নাই,—আর, ফিরিয়া গেলেই কোথায় আশ্রয় পাইবে? কাদি-মাসির মত মৃত্যুই ওর ললাটে লেখা আছে,—সবাই তাই মরে; উহাদের পাড়ায় খালি একজন বাবুগিরি করিয়া গলায় দড়ি দিয়াছিল,—আত্মহত্যাটা কাদি-মাসির মৃত্যুর চেয়ে লোভনীয় নয়। রাখ

না-হয় বখিয়াই গেল—তাহাতে কুঞ্জ-র এমন কি যায় আসে! পেটে ধরিয়াও কেহ কুঞ্জ-র মত ছেলে লইয়া এমন ন্যাকামি করে না।

তবুও, কুঞ্জকে বলিতে হইল : একটা ট্যাক্সি নিয়ে এস।

নিশ্চয়ই, উহাকে টাকা রোজগার করিতে হইবে—ও ত' আর তাহার জন্য না খাইয়া প্রাণ দিতে পারে না। কুঞ্জ সত্যই এ কয় দিন ভারি বাড়াবাড়ি করিয়াছে, দোরগোড়া হইতে সকলকে ফিরাইয়া দিয়াছে, রাখকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া নিজের চোখে ঘুম আনে নাই—এমন ছ্যাবলামো কুঞ্জকে নিশ্চয় মানায় না। 'এই ত' গুছিয়ে নেবার সময়',—বিধু ঠিকই বলিয়াছিল। সত্যই ত', রাখ-র জন্য উহার দায়িত্ব কি? গায়ে পড়িয়া এমন আদিখ্যেতার বিরুদ্ধে বাড়িউলি যে মুখ বাঁকাইয়া ওঠে, ঠিকই করে। কুঞ্জ নিশ্চিন্ত হইল, মনে-মনে স্বস্তি অনুভব করিল। পৃথিবীর ধূলিলিপ্ত পথে আর-একটি শিশু-পথিক না হয় বাহির হইয়া পড়িবে—তাহার জন্য কুঞ্জ-র এমন কি মাথা-ব্যথা?

ট্যাক্সির নাম শুনিয়া রাখ ফের কম্বল ছুঁড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—আমারো মাথা ধরে' গেল মা, আমিও বেড়াতে যাব ট্যাক্সি করে'—

ট্যাক্সি চড়ায় যে কি সুখ, রাখ তাহা কল্পনা করিতে পারে মাত্র। রাস্তায় এত যে গাড়ি-মোটর ছুটাছুটি করে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে রাখ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে,—উহাকে যদি চাকার সঙ্গেও বাঁধিয়া নেয়! এই রকম ছোটার মধ্যে যে কী উন্মাদ আনন্দ আছে তাহা রাখ অস্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারে; উহার মাষ্টার-মহাশয় বলিয়াছেন, পৃথিবী হইতে সুরু করিয়া সবাই ছুটিয়া চলিয়াছে—রাখও এমনিই ছুটিতে চায়, এত জোরে ছুটিতে চায়, যাহাতে সকলের মনে হইবে রাখ স্থির হইয়া আছে,—যেমন এই পৃথিবী।

কুঞ্জ বলিল,—এখন ঢের রাত হয়েছে, বেড়াতে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে যে—

এই সব কথায় কি রাখকে নিবারণ করা যায়? রাখ গোঁ ধরিয়া বসিল, রাত্রে হোক্ বা দিনে হোক্, যখন একবার সুবিধা মিলিয়াছে সে কিছুতেই তাহা হাত-ছাড়া করিবে না। রাখ যাইবেই; কান্না জুড়িয়া দিয়াছে।

অবাধ্য ছেলের কি আব্দার! কুঞ্জ রাগিয়া উঠিল : না তুমি যেতে পারবে না। ছেলেমানুষ রাত্রে বেরোয় বুঝি? শুয়ে থাক চুপ করে'—

ইতিমধ্যে সনৎ গাড়ি লইয়া আসিয়াছে। রাখ তাহার কাছে গিয়া মিনতিময় কণ্ঠে বলিল,—আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে ভদ্রলোক?

মেয়ের মৃত্যু-উপলক্ষে উৎসব করিতে আসিয়াছিল বলিয়াই বোধহয় সনতের

মেজাজে আজ ঝাঁঝ আসিয়াছে, সে খেঁকাইয়া উঠিল : যা যাঃ, পড়ে'-পড়ে' ঘুমো গে, তোর জন্যই ত' পথে বেরুতে হ'ল। ষ্টুপিড্।

কিন্তু না, এত সহজে রাথ-র হাল ছাড়িলে চলিবে না। আল্‌মারি হইতে কুঞ্জ নূতন শাড়ি খুলিয়া পরিয়াছে, ট্যাক্সিতে কি-সব জিনিসপত্র উঠিতেছে,—নিশ্চয়ই উহাকে এখানে ফেলিয়া মা কোথায় পলাইয়া যাইবে। রাথ-র ভারি ভয় করিতে লাগিল,—ও কিছুতেই ইহাদের সঙ্গ ছাড়িবে না। রাথ ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

নিজেকে কুঞ্জ আর দমন করিতে পারিল না, মুহূর্তের মধ্যে রাথ-র গালে ঠাস্-ঠাস্ করিয়া কতগুলি চড় বসাইয়া দিল। ব্যথার চেয়ে বিস্ময়ের পরিমাণই বেশি, কিন্তু সেই বিস্ময় অন্তর্হিত হইবার আগেই কুঞ্জ রাথকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া ঘরের মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া দরজায় শিকল লাগাইয়া জুতার ফট্-ফট্ করিতে-করিতে সনতের পিছু-পিছু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

নীচে নামিবার সময় সনৎ গম্ভীর হইয়া বলিতেছিল : ছেলেপিলেদের শাসন না করলে চলে ? ঐ চড়ই ওর ঘুমের ওষুধের কাজ করবে 'খন।

কুঞ্জ কোনো কথা না কহিয়া ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জ যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন রাত অনেক হইয়া গিয়াছে। একে শরীর সুস্থ ছিল না, তাহার উপর শীতে সর্বদেহ জমিয়া যাইতেছে—এখন কোনমতে শয্যায় আশ্রয় লইতে পারিলেই যেন বাঁচে। কিন্তু শিকল নামাইয়া দরজা খুলিয়া কুঞ্জ ঘরের যে-অবস্থা দেখিল তাহাতে কোথায় রহিল তাহার ঘুম কোথায় গেল তাহার নেশা! কুঞ্জ রাগিবে না কাঁদিবে কিছুরই দিশা পাইল না।

রাথ তখন পর্যন্ত ঘুমায় নাই, আলো জ্বালিয়া জানলার কাছে বসিয়া এতক্ষণ হয় ত' কুঞ্জ-রই প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ঘরের শ্রী দেখিয়া তাহা সন্দেহ করিবার কোনো হেতুই রহিল না। এতক্ষণ জাগিয়া-জাগিয়া রাথ কাপড়ের আল্‌মারির কাঁচ হইতে সুরু করিয়া ড্রেসিং টেবিলের আয়না, বাঁধানো ছবির কাঁচ, বোতল, পেয়ালা, গ্লাশ, ঘড়ি—সব টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ভাঙিয়াছে ; আল্‌মারি হইতে কুঞ্জ-র দামি-দামি শাড়ি বাহির করিয়া দেশলাই ধরাইয়া পুড়াইয়াছে, ঘরের কোণে পিতলের বাল্‌তিতে যে জল ছিল তাহা বিছানায় লেপে ঢালিয়া দিয়াছে—এতক্ষণ এই ছোট ঘরটিতে যেন একটা উচ্ছৃঙ্খল তুফান চলিতেছিল! রাথ-র পায়ের তলা কাটিয়া গিয়া গল্-গল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতেছে তবু ক্ষান্তি নাই, বালিশের নীচে যে কয়টা পয়সা ছিল তাহাও রাগ করিয়া (ও নিজের লোভ সম্বরণ করিয়া) রাস্তায় ছুঁড়িয়া দিয়াছে,

কোথা হইতে একটা ছুরি বাহির করিয়া কুঞ্জ-র পরিত্যক্ত চটি জুতা জোড়া পর্যন্ত কুটিকুটি করিতে বাকি রাখিল না।

ঘরের এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া সহসা কুঞ্জ-র সমস্ত বুদ্ধি ঘুলাইয়া উঠিল। রাখ তখনো নিবিষ্ট মনে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়া কুঞ্জ-র মেজেন্টা রঙের দামি গরম জ্যাকেটটা পুড়াইতেছে – কুঞ্জ একেবারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া রাখ-র উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুই শক্ত সুদৃঢ় মুঠিতে রাখ-র মাথার সবগুলি চুল লইয়া এমন ঝাঁকানি দিতে লাগিল যে, এবারো অভিমানে ভয়ে বিস্ময়ে বেদনায় রাখ-র মুখ দিয়া কথা ফুটিল না।

—হতভাগা ছেলে, এ কী করেছিস্ তুই ? - এরি জন্যে আমি দুধ দিয়া কেউটে পুষ্ ছিলাম গো! এমনি করে' আমার সর্বনাশ করলি—পথে ভাসালি ? আমি এই নিয়ে সুখের স্বর্গের স্বপন দেখছিলাম। তোকে আমি পুলিশে দেব—বলিয়াই কুঞ্জ রাখ-র ঘাড় ধরিয়া টানিয়া তুলিল এবং পা তুলিয়া উহার পিঠে এমন এক লাথি মারিল যে, রাখ দরজা দিয়া ছিট্‌কাইয়া বারান্দায় হুমড়ি খাইয়া পড়িল।…অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা গোঁ-গোঁ শব্দ হইয়া অবশেষে থামিয়া গেল আর শোনা গেল না।

কুঞ্জ এই বার নিজের চুলগুলি ধরিয়া দেয়ালে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কান্না জুড়িয়া দিল : আমার সব গেল গো সব গেল,—আমার জন্যে সংসারে একটা খড়-কুটোও রইল না। ছোঁড়া আমাকে সর্বস্বান্ত করলে—আমায় পথে বসালে, অথচ এই ছেলেটার জন্যে ভগবান আমাকে কত কষ্টই সইতে দিলেন। ছি ছি ছি। দেখে যা বিধু, ছেলে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার ফল দেখে যা—

কুঞ্জ দেয়ালে মাথা ঠোকে আর মাঝে-মাঝে বিপর্যস্ত বিশৃঙ্খল ঘরের দুরবস্থা দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠে। একে শরীর অতিশয় ক্লান্ত, তার উপর নিমেষের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল—কুঞ্জ-র শাড়িটা ছাড়িবার পর্যন্ত অবসর মিলিল না; শিয়রে সেই কেরোসিনের কুপি লইয়াই মেঝের উপর গা ঢালিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম যখন ভাঙিল, শেষ রাত্রির অন্ধকার বেশ পাৎলা হইয়া আসিয়াছে। স্বভাবত কুঞ্জ পাশ ফিরিয়া ডাকিল : রাখ! পরে ধীরে-ধীরে ব্যাপারটা অস্পষ্ট হইয়া তাহার মনে পড়িল; মনে পড়িল, কাল রাত্রে পিঠে লাথি মারিয়া রাখকে ও ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছে। রাখ নিশ্চয়ই সারা রাত্রি শীতের মধ্যে ঐ খোলা বারান্দায় পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছে,—কতক্ষণ উহার করুণ কান্না শোনাও গিয়াছিল বুঝি—উহার না জানি কী নিদারুণ চোট-ই লাগিয়াছে! কুঞ্জ কি পাষাণ! একবার ইচ্ছা হইল বারান্দা

হইতে রাখকে ডাকিয়া আনে, আবার দুই বাহু স্নেহসিক্ত করিয়া উহাকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করে, কিন্তু শরীর এখনো অবসন্ন, নিস্তেজ!

দিনের আলো স্পষ্টতর হইতেই কুঞ্জ ধড়্মড়্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অনেক দিন এত বেলা করিয়া ঘুম ভাঙে নাই,—প্রসন্ন প্রভাতের পানে চাহিয়া কালকের কুৎসিত রাত্রির কথা মনে করিয়া কুঞ্জ-র সমস্ত দেহ লজ্জায় ঘৃণায় কাঁটা দিয়া উঠিল। সহসা খেয়াল হইল, সনৎ যে অনেকগুলি টাকা দিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিল তাহার একটি টুকরাও কুঞ্জ-র করতলগত হয় নাই, গলায় অবশিষ্ট যে মটর-মালাটা ছিল তাহাও কখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! আর রাখ-ও বিতাড়িত, পলাতক। কুঞ্জ মরীয়ার মত খোলা দরজা দিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু বারান্দায় তখন কে তাহার জন্য অভিমানে মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিবে? শূন্য বারান্দার দিকে চাহিয়া কুঞ্জ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল,—কোথায় রাখ? সিঁড়ি দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল; সেখানে কম্বল মুড়ি দিয়া দারোয়ানটা ঘুমাইতেছে—রাখ-র কোথাও পাত্তা নাই! দারোয়ানের মাথায় কয়েকটা ঠেলা মারিয়া কুঞ্জ ব্যাকুল স্বরে কহিল,—হ্যাঁ, সিধুয়া, রাখ কোথায় জানিস্?

নিদ্রার অকালমৃত্যুতে সিধুয়া প্রায় রুখিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কুঞ্জকে চিনিতে পারিয়া আমৃতা-আমৃতা করিয়া কহিল,—মাঝ রাতে বেরিয়ে গেছে দিদিমণি!

—বেরিয়ে গেছে? বলিস্ কি রে? তুই যেতে দিলি কেন পাজি? কেন তুই আমাকে খবর দিলি না? কোথায় ওকে বা'র করে' দিলি?

সিধুয়া কহিল,—সবে তুমি তখন মোটরে করে' ফিরেছ। ও আমাকে এসে বললে: দরজা ছেড়ে দাও সিধুয়া, মা'র মদের দরকার হয়েছে, মদ কিনে আনছি।

—আর তুই তাই ওকে ছেড়ে দিলি আহাম্মক কোথাকার? অত রাত্রে বাড়ির বাইরে মদ মেলে?—আর তাই নিয়ে আসবে ঐটুকুন ছেলে? তুই করলি কি গাধা?

যেন সব দোষ সিধুয়ার। সিধুয়া গায়ের উপর ফের কম্বল টানিতে-টানিতে কহিল,—তখন সবে আমার গাঁজার নেশাটা লেগে এসেছে—আমার কি অতশত বোঝবার অবস্থা ছিল?

হতাশ হইয়া কুঞ্জ রাস্তায় নামিয়া আসিল। সেই পথের ঠিকানাই বা কি, শেষই বা কোথায়? এই পথ যেন কুঞ্জ-র চিরবিরহক্লিষ্ট দুঃখময় কঠোর জীবনযাপনের মতই সীমাশূন্য! কুঞ্জ যেন মহাসমুদ্রে পড়িয়াছে—এই প্রকাণ্ড নগরীর কোথায় দুইটি মাত্র হস্ত-পরিমাণ ভূমিখণ্ডের উপর রাখ বিরাজ করিতেছে এখন—কে বলিয়া দিবে? কুঞ্জ দিশাহারার মত অগ্রসর হইল। রাস্তায় তখন প্রথম জল দেওয়া হইতেছে, আলো জ্বালিয়া ডিপো হইতে ট্র্যাম ছাড়িয়াছে, দু' একটা করিয়া দোকান খুলিতেছে—কিন্তু

কুঞ্জ আর কতদূর চলিবে? রাস্তায় যাহারা বাহির হইয়াছে তাহারা কুঞ্জকে দেখিয়া কি ভাবিতেছে সেই বিষয়ে হঠাৎ সচেতন হইয়া কুঞ্জ নিজের দিকে তাকাইল। ছি, ছি, কালকের রাত্রির শাড়িটা এখনো বর্জন করা হয় নাই। এই কথা মনে হইতেই কুঞ্জ আর পা চালাইতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

বিধু তখন বাল্‌তি করিয়া জল লইয়া ঘর ধুইতেছিল, কুঞ্জ তাহার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল—রাখকে খুঁজে পাচ্ছি না, বিধু। রাত্রে ট্যাক্সি করে' বেড়াতে যেতে চেয়েছিল, ঘরে শেকল বন্ধ করে' রেখে গেছলাম—এসে দেখি সমস্ত ঘর তছ্‌নছ্‌ তোলপাড় করে' ছেড়েছে। ওকে তাই মেরেছিলাম বিধু, ও রাগ করে' চলে' গেল। ওকে ভীষণ মেরেছিলাম, হাতের মুঠিতে চুল উঠে এসেছিল, ভাঙা কাঁচে পা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল—তা দেখেও হতভাগী আমি নেশার ঝোঁকে তাকে ধাক্কা মেরে ঘরের বা'র করে' দিলাম ভাই,-তাকে কোথায় খুঁজব বল, কে আমাকে ঠিকানা দেবে?

কুড়ানো বা পাতানো ছেলের ক্ষণিক অন্তর্ধানের জন্য এমন করিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদা-কাটা করার অভ্যাস কোনো কালেই বিধু-র নাই, এই সবের রসগ্রাহিতাও তাহার ধাতে সয় না, তাই সে পরম প্রসন্নতার ভান করিয়া কহিল,—যদি গিয়ে থাকে ভালই ত', পথের কাঁটা খসেছে। কষ্ট করে' শীতের রাতে ট্যাক্সি নিয়ে বেরুতে হ'বে না। জল দিয়ে ঘর দোর সাফ্‌ করে' নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে শরীরটা তাজা করে' নে—তাইতেই তোর হ'বে ভালো।

কুঞ্জ অবুঝের মত কহিতে লাগিল: তুই বলিস্‌ কি বিধু? সেই কন্‌কনে শীতের রাতে আমি ছাড়া আর কেউ এমন করে' শিশু-ছেলেকে ঘরের বা'র করে' দিতে পারত? তবু আমাকে সে মা বলেছিল, তাকে নিয়ে আমি সোনার ভবিষ্যৎ তৈরি করেছিলাম।

বাড়িউলি আসিয়া বলিল,—অত সোহাগীপনা করবার কিছু দরকার নেই, ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করলে আপনিই ফের ফিরে আসবে—যাবে কোথায়? তোর মত ঘরে-ঘরে ত' ওর জন্যে মায়ের দল ভাতের থালা নিয়ে বসে' নেই! কুকুরের মত জিভ মেলে আবার এখানে এসেই ভিড়বে 'খন। সকালবেলায় মরাকান্না কেঁদে বাড়ি-ঘর-দোর অপয়া করে' দিস্‌নে বলছি। ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে' যত খুসি চোখের জল ফেল গে যা—

কিন্তু খাওয়ার সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া চলিল, রাখ-র ফিরিবার নাম নাই। আজ সারাদিনে কি উহার ক্ষুধা পাইবে না? রাখ ফিরিয়া আসিবে ভাবিয়া কুঞ্জ ভাল করিয়া রাঁধিয়া রাখিয়াছে, রাখ নিশ্চয়ই আবার আসনপিঁড়ি হইয়া ছোট্ট থালাটিতে

ভাত লইয়া বসিবে, এত বড় পৃথিবীতে কুঞ্জ-র কোল ছাড়া উহার স্থানই বা কোথায় আর ? বেলা গড়াইয়া আসিল, কুঞ্জ সেই বিশৃঙ্খল ঘরের মেঝের উপর বুক দিয়া পড়িয়া রহিল। রাখ নাই, তাহার অর্থ কুঞ্জ-র সত্যই সতীত্ব নাই, মা'র মহিমাটুকু হইতে পর্যন্ত সে বঞ্চিত, নির্মল স্নেহের স্নানে তাহার চিত্ত শুচি হইতে পারিবে না।

খাইবার সময় গেল, রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় পর্যন্ত আসিল, কুঞ্জ ঘরে আলো জ্বালিল না, বাহিরের জনযাত্রার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এই পৃথিবীতে রাখ বলিয়া যে কেহ ছিল, কাল মধ্যরাত্রে কেহ যে উহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, আজ সমস্ত দিন ধরিয়া যে উহার কোন খাওয়া মিলে নাই —ইহাদের দিকে চাহিয়া এই কথা কে বলিবে ? সেই অন্ধকার ঘরে বসিয়া কুঞ্জ-র এমন করিয়া চোখের জল ফেলার ন্যায্য ব্যাখ্যা কোথায় ? প্রতিবেশিনীরা আসিয়া সান্ত্বনা দেয় : ওর চলে' যাওয়াতে তোর সঙ্গে আমরাও পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি, কুঞ্জ। ছেলে নিয়ে বাবুগিরি কি আমাদের পোষায় ? মেয়ে হ'লে বরঞ্চ দু'টো কানা-কড়ির ভরসা থাকে। ও ছেলে দিয়ে তোর মরণের সময় মুখাগ্নি হ'ত না, বরং যদ্দিন বেঁচে থাকতিস্ তদ্দিন মুখে আগুন দিত। ও গেছে ভালোই হয়েছে—ট্যাক্সি করে' বেড়াতে নিয়ে যাস্‌নি বলে' তোর ঘরের কী হাল করলে দেখলি ত' ? গেছে, আঁচলের গেরো খসেছে—

কি ভাবিয়া কুঞ্জ আলো জ্বালিল। দস্যি ছেলেই ত'—কুঞ্জকে একেবারে রিক্ত, নিঃসম্বল করিয়া ছাড়িয়াছে। রাখ যেন এক রাত্রের মধ্যেই দুর্দান্ত ঝড়ের মত কুঞ্জ-র হৃদয় একেবারে চূর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিয়া গেছে, - এই কলঙ্কিত জীবনের সঙ্গে তাহার আর কোন সম্পর্ক রাখিবারই সুযোগ রাখে নাই। কুঞ্জ খানিকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর হাঁটুর উপর চিবুকটা স্থাপন করিয়া গভীর অভিনিবেশসহকারে কালকের ব্যবহৃত শাড়িটা ধীরে-ধীরে পুড়াইতে বসিল।

•

তাহার বড় ঘরটা সুশীলাকে ছাড়িয়া দিয়া কুঞ্জ একতলায় একটা বদ্ধ কুঠুরীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এই ঘরে আগে কয়লা ও ঘুঁটে রাখা হইত। এই ঘরের একটি অতি ক্ষুদ্র জানালাই কুঞ্জ-র চিরপ্রতীক্ষামগ্ন চক্ষুর মত নির্নিমেষ হইয়া রহিল।

বার্ধক্য সমীপবর্তী হইতেই বাড়িউলি বৈধব্যযাপন সুরু করিয়াছিল, অনেক চাহিয়া-চিন্তিয়া কুঞ্জ তাহার নিকট হইতে একখানি থান্-কাপড় লইয়াছে, সেই ছিন্ন-প্রায় শাদা কাপড়টিই যেন কুঞ্জ-র অশ্রুধৌত বিষাদাচ্ছন্ন মাতৃস্নেহের নির্মল প্রতিচ্ছবি !

প্রায় মাস ছয়েক ফুরাইতে চলিল, কুঞ্জ-র যৌবনও যেন সেই সঙ্গে জুড়াইয়া

আসিয়াছে। উহার চেহারা দেখিলে আজ বোধ হয় পঙ্কুও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া নিত, ঐ দেহটাকে আলিঙ্গনের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া বোকার মত আর আফ্‌শোষ করিত না। কয়লার ঘরে কুঞ্জ-র স্থান হইয়াছে, ঠিকই হইয়াছে,—কে বলিবে এই কুঞ্জ-র জন্যই কেহ আকাশে অট্টালিকা বানাইয়াছিল,—বাউণ্ডুলে হইয়া সংসারী হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল! খাইতে রুচি নাই, স্নান করিবার কথা প্রায়ই মনে থাকে না,—সমস্ত বাড়িতে দীর্ঘরাত্রিব্যাপী যে সুখোৎসব চলে তাহাকে মনে-মনে অভিসম্পাত দেয়। কুঞ্জ নিজে গৃহাবরুদ্ধা হইয়া বাহুর ব্যাকুল কামনাকে দূরে পাঠাইয়া দিয়াছে, সেই শুভকামনাটি পৃথিবীর প্রতি শিশুর ললাট স্পর্শ করিতে থাকে!

মাঝে-মাঝে দোর-গোড়ায় আসিয়াও বসে,– কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দেয় না, বোবার মত বসিয়া থাকে, লোকগুলি গালি পাড়িতে-পাড়িতে ভিড়ের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে। কুঞ্জ-র জীবনে আর যেন কোন উপলক্ষ্য নাই,— আত্মহত্যা করিবার মত কাপড় বা বিষ কিনিবার মত পয়সাও তাহার যথেষ্ট নয়। বাড়ির সকলে উহাকে ঠাট্টা করে,—সবারই উচ্ছিষ্ট করুণার সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্রূপও উহাকে কুড়াইতে হয়।

ইহারই মধ্যে একদিন দুপুর বেলা রাস্তা দিয়া কাহাকে যাইতে দেখিয়া কুঞ্জ উচ্চস্বরে ডাকিয়া উঠিল : সিধুয়া ও সিধুয়া, ঐ যে একটা বাণ্ডিল্ হাতে করে' এক বাবু যাচ্ছেন, তাকে এক ছুটে, ডেকে নিয়ে আয় ত'! এক্ষুনি যা ছুটে, তোকে অনেক বক্‌শিস্ দেব।

অনেক বক্‌শিসের পরিমাণবিচার করিবার পরিশ্রম না করিয়াই সিধুয়া ছুট্ দিল, এবং এক শত গুণিবার মত সময়টুকু না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সেই বাবু কিছুতেই আসবেন না দিদিমণি।

কুঞ্জ মরীয়া হইয়া কহিল,—তুই একটা আস্ত অজবুক, সিধুয়া। এখনো বড় রাস্তার মোড়টা পেরোন নি, যা ছুটে ফের, বল গে—এ-বাড়িতে ভীষণ অসুখ— হিক্কা উঠেছে— এই যায় কি সেই যায়, আপনাকে একটুখানি দেখে যেতে বলছে। যা শিগ্‌গির, সিধুয়া, তোর পায়ে পড়ি।

সিধুয়া তবু দেরি করিতেছে দেখিয়া কুঞ্জ আবার উহাকে একসঙ্গে গালি পাড়িল ও পায়ে পড়িল। সিধুয়া বলিল,—কয়েকটা পয়সা নিয়ে যাচ্ছি দিদিমণি, যদি মোড় পর্যন্ত যেতেই হয় তবে কিছু তামাক নিয়ে আসা যাবে! তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি বাবুর কোটটা চিনে রেখেছি। পাঁচ মাইল এগিয়ে থাকলেও ছুটে আমি ওকে ধরতে

পারি,—কিচ্ছু ভেবো না তুমি, দরকার হ'লে ওর বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে' হিড় হিড় করে' টেনে আনব 'খন।—বলিয়া সিধুয়া পয়সার জন্য দেয়ালে-টাঙানো ফতুয়াটার পকেট হাতড়াইতে লাগিল।

সিধুয়ার সঙ্গে সেই কয়লার ঘরের অতি সন্নিকটে যে আসিয়া দাঁড়াইল তাহাকে দেখিবামাত্র কুঞ্জ-র সর্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সিধুয়া আঙুল দিয়া ঘর দেখাইয়া দিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দরজার কাছে গিয়া অবিনাশ প্রশ্ন করিল : অসুখ কা'র ?

কুঞ্জ দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, ক্ষীণ একটি হাসিতে ঠোঁট দুইটা একটু বিস্তৃত করিয়া কহিল,—আমার। চিনতে পাচ্ছ ?

বিশেষ করিয়া না হইলেও চিনিতে অবিনাশ পারিয়াছে। চটিয়া গিয়া কহিল,—দিনে দুপুরে লোক ধরবার এই সব ফাঁদ খুলেছ নাকি তোমরা ? এই তোমার হিক্কা উঠেছে ? তোমাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি ?

কুঞ্জ তেমনি হাসিয়াই বলিল,—রোদ্দুর থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এসে ঠাহর করতে পারছ না, চেয়ে দেখ দিকি ভাল করে'।

এই বার অবিনাশ চিনিল। অবিনাশ গত বৎসর মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তার হইয়া বাহির হইয়াছে,—সবল স্বাস্থ্য, অগাধ বিত্ত, কান্তিমান দেহাবয়ব। পঠদ্দশায় অবিনাশ পা পিছলাইয়া কুঞ্জ-র ঘরে আসিয়া অতিথি হইয়াছিল। এবং কুঞ্জ-র যত কিছু বিলাসসামগ্রী (যাহা রাখ ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে) সব এই অবিনাশেরই প্রীতি-উপহার! কুঞ্জ ও অবিনাশের সৌহার্দ্য হৃদয়কেও অনুরঞ্জিত করিয়াছিল, এবং কুঞ্জ-র জীবনে এমন দিনও গিয়াছে যখন অবিনাশের দিনে অবিনাশ না আসিলে আজিকার মতই চোখের জল ফেলিতে কার্পণ্য করে নাই। কুঞ্জ-র দেহটা অবিনাশের কাছে ডাক্তারি শাস্ত্রের তথ্যের চেয়েও বড়ো সত্য বলিয়া মনে হইত, এবং সেই জন্যই উহার কোমল দুইটি করতলে চুম্বন করিয়া অবিনাশ করতলের নীচেকার হাড়ের বিভিন্ন সমাবেশের কথা একেবারেই মনে রাখিত না।

অবিনাশের মুখে বিতৃষ্ণার ভাবটা লক্ষ্য না করিয়াই কুঞ্জ ঠোঁটের হাসিটি মিলাইতে না দিয়া স্বর করিয়া কহিল,—চিনতে পাচ্ছ কি ?

কঠিন স্বরে অবিনাশ বলিল,—দৃষ্টি ও স্মরণশক্তি কোনোটাই লোপ পায় নি। কিন্তু কি করে' যে একটা সামান্য মেয়েমানুষ অসুখের মিথ্যা ওজুহাতে রাস্তা থেকে ভদ্রলোক ধরে' আনতে পারে, আপাতত সেই বোধটাই লোপ পাচ্ছে।

কুঞ্জ নড়িল না ; কহিল,—সামান্য মেয়েমানুষ বলে'ই পারে। আর তোমরা ডাক্তার বলে'ই গায়ের চামড়ায় অসুখ লেখা না থাকলে একেবারে হাঁপিয়ে ওঠ

দেখছি। বলি,—তোমার বুক দেখবার সেই যন্ত্রটা পকেটেই আছে ত'? তোমার সেই যন্ত্র দিয়ে কি বুকের কান্না শোনা যায়, ডাক্তারবাবু?

অত-শত বাক্-বিতণ্ডা করিবার অবসর অবিনাশের নাই, তাই বিরক্ত হইয়া কহিল,—অকারণে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফ্যাশানেব্‌ল কথা বলবার সময় আমার আপাতত নেই, অতএব আমি চললাম—

কুঞ্জ বাধা দিয়া কহিল,—যাবেই ত', তবু আমার ঘরে আরো একটু জিরিয়ে নাও না। ডাক্তার হ'য়ে রোদ্দুরে ঘোরার পরামর্শ তুমি দাও কাউকে?

কুঞ্জকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে অবিনাশ বলিল,—এই সব পল্লীতে পদার্পণ করবার ঘৃণা অর্জন করবার মত শিক্ষা আমি লাভ করেছি—

—সে তোমার সৌভাগ্য! কিন্তু আমার ঘরে গিয়ে একটু বসলেই তোমার জাত-ব্রাহ্মণত্বের খোলস খসে' যাবে না নিশ্চয়ই।

—তা হয় ত' যাবে না, কিন্তু তোমার ঘরে গিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে' তোমাকে দক্ষিণা দেবার মতো অবস্থা আপাতত আমার নেই; এবং সেই অপব্যয়কে আমি আর ক্ষমার চক্ষে দেখি না।

কুঞ্জ কি-একটা রূঢ় কথা বলিতে যাইতেছিল, থামিয়া গেল। কোমলস্বরেই কহিল,—অথচ একদিন এই কুঞ্জকে দক্ষিণা দিয়ে-দিয়েও তোমার দক্ষিণহস্ত ক্লান্ত হয় নি। তোমার কাছে আজ আমি দক্ষিণার ভিখারী হ'য়ে হাত পাতি নি, তোমার অপমানই আমি মাথা পেতে নিয়ে খুসি হ'লাম। কিন্তু, বিনা-দক্ষিণায় আমাদের ঘরে স্বয়ং ভগবানও এসে থাকেন শুনেছি—এবং তুমি নিশ্চয়ই তাঁর চেয়ে বেশি পবিত্র নও।

অবিনাশ চঞ্চল হইয়া উঠিল; বলিল,—নিরাকার ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না; আমার অনেক কাজ, আমি চললাম। আর দেখা হ'বে না।

কুঞ্জ আবার বাধা দিল। কহিল,—দেখা না হওয়াটা এমন কিছু আশ্চর্য নয় যে তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হ'বে। তবু, মনে আছে'এই সামান্য মেয়েমানুষটাকে নিয়েই একদিন কী কাণ্ড করেছিলে, তা'কে বিয়ে করে' দৃষ্টান্ত দেখাবে বলে' মাথা উঁচু করেছিলে—

—ছি ছি!

—নিশ্চয়ই ছি ছি! সে-দিন তোমার এ-জ্ঞান পর্যন্ত ছিল না।

অবিনাশ কহিল,—সে-দিন ছিল না বলে'ই আজো আমাকে সে-দিনকার মতই তোমার ঐ ভ্যাপ্‌সা ঘরে বসে' মদের বোতল আর তবলা নিয়ে বসতে হ'বে এ-যুক্তি পোষণ করবার মত আস্পর্দ্ধা আর রেখ না। রত্নাকরকে যদি চিরকাল ডাকাতিই করতে হ'ত তা হ'লে আর রামায়ণ হ'ত না।

—অত বড়-বড় কথা বুঝতে পারব না, কিন্তু জানতে পারি তোমার নতুন রামায়ণটি কি?

অবিনাশ কণ্ঠস্বরে অসীম স্নেহ ঢালিয়া কহিল,—আমার স্ত্রী,—আমি মাসখানেক হ'ল বিয়ে করেছি…খবরদার, কুঞ্জ, ছি, তোমার নামটা মুখে আনব না ভেবেছিলাম—খবরদার, আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই তুমি করতে পারবে না।

জিভ কাটিয়া কুঞ্জ কহিল,—ছি, আমি ততখানি মন্দ নই, অবিনাশবাবু। লক্ষ্মীর আবির্ভাবে তোমার জীবন যদি বৈকুণ্ঠই হ'য়ে থাকে—

কথার মধ্যপথে অবিনাশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল : হ্যাঁ, আমি একেবারে মাটিতে ঠেক্‌তে-ঠেক্‌তে পাহাড়ের সব-চে উঁচু চূড়ায় এসে নিশ্বাসের জন্য প্রচুর বাতাস পাচ্ছি; আমি বেঁচে গেছি, কুঞ্জ। যদি সুযোগ পাও, তুমিও যেন এমনি কোনোদিন বেঁচে ওঠ, এই তোমাকে আশীর্বাদ করি।

কুঞ্জ-র দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। কাপড়ের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া কুঞ্জ কহিল,—ঐ প্যাকেটের মধ্যে কি?

ওঁর জন্য শাড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছি, আর—

—কিন্তু আমার কথা তাঁকে কোনোদিন বলেছ, যার জন্যে তোমার এই ভালো-হওয়ার এই অর্থটা এত উজ্জ্বল বলে' বোধ হচ্ছে? আমাকে একদিন ভালো না বাসলে তোমার স্ত্রীকে কি তুমি এমনি ভালোবাসতে পারতে? বা, তার কোন অর্থ থাকত?

—তোমার কথার কোন অর্থই হয় না, কুঞ্জ। সেই অবিনাশ মরে' ভূত হ'য়ে গেছে আমি তাকে বহু দূরে ফেলে এসেছি। তোমরা তার অর্থ বুঝবে না, সেই জন্যেই তোমাদের সামান্য বলি, মান্য করিনে।

—তুমি যে বড্ড ঘামছ, এক গ্লাশ জল এনে দেব?

—তেষ্টা পেয়েছে বটে খুব, কিন্তু তোমার হাতের জল ত' আমি খাব না।

কুঞ্জ-র আর সহ্য হইতেছিল না; কহিল—আচ্ছা, আর দেরি করে' লাভ কি? বাড়ি গিয়েই তেষ্টা মেটাবে 'খন।

কোন কথা না কহিয়াই অবিনাশ চলিবার উপক্রম করিতেছিল, কুঞ্জ তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া কহিল, আশীর্বাদ করে' গেলে, দাঁড়াও, প্রণাম করি।

স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অবিনাশ বোধকরি হটিয়া যাইতেছিল, কুঞ্জ পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, পা ছুঁয়ে তোমাকে অশুচি করে' দেব না, ভয় নেই। আমি তোমার জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করছি। বলিয়া কুঞ্জ অবিনাশের জুতা হইতে ধুলা লইয়া তাহার ললাটে ও জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়া মাটির উপর প্রণত হইয়া

পড়িল। যখন উঠিল, চোখের জলে তাহার মুখ ভাসিয়া গিয়াছে,—অবিনাশ দাঁড়াইয়া নাই,—কখন চলিয়া গিয়াছে কে জানে।

কে যেন মা বলিয়া ডাকিল।

সন্ধ্যা হইতেই কুঞ্জ-র জ্বর আসিয়াছিল, দুয়ারের কাছে কাহার পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল, বাতি জ্বালিবার পর্যন্ত তর্ সহিল না। দুর্বল কম্পিত হস্তে দুয়ার খুলিয়া কিছুই আর দেখা গেল না, খালি কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ চাঁদ সম্মুখস্থ অট্টালিকার ভিড়ের ফাঁকে ক্লান্ত মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। রোগজীর্ণ দেহ লইয়া কুঞ্জ বাড়ির বাহির হইয়া গলির আনাচ-কানাচ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, হয় ত' রাখ দুষ্টামি করিয়া এখানেই কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহাকে দেখিতে পাইলেই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিবে!

কুঞ্জ চৌকাঠের কাছে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল,- এত বড় নিরাশা সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। রাস্তার ওপারে একটা পাঞ্জাবির মিঠাইর দোকান তখনো খোলা আছে; কুঞ্জ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল এই মাত্র কোন একটি ছেলে এই বাড়ির দরজার কাছে ডাকিয়া গেল কি না। প্রশ্নের কি উত্তর হইতে পারে কুঞ্জ তাহা জানিত, তবু এই নিদারুণ নিঃসহায়তার মুহূর্তে জিজ্ঞাসা না করিয়াও পারিল না। কুঞ্জ আর কতকাল এমনি করিয়া পড়িয়া থাকিবে?

কুঞ্জকে একবার দেখিবে এস। তাহাকে আর চিনিতেই পারিবে না, শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, চুলে জট ধরিয়াছে, কাপড়ে চিমটি কাটিলে হাতের সঙ্গে ময়লা উঠিয়া আসিবে—বাড়িতে সবাই এখন তাহাকে পেত্নী বলিয়া ডাকে! তবু সে আজিও অনন্যমনে রাখ-র প্রতীক্ষা করিয়া আছে, রাখকে আর একবার না দেখিয়া, তাহার ললাটে স্নেহাশ্রুবিন্দু না ঢালিয়া সে কিছুতেই মরিবে না।

•

এই কুৎসিত ব্যাধিক্লিষ্ট চীরবাসা কুঞ্জ-রই জীবনে বোধকরি হঠাৎ একদিন সৌভাগ্যের উদয় হইল! বাড়িউলি আসিয়া ডাক দিল: কোথায় লো কুঞ্জ, কে খুঁজছে দেখ।

ঠাণ্ডা মেঝের উপর জ্বরতপ্ত দেহ পাতিয়া কুঞ্জ একটু ঘুমাইতেছিল বোধকরি, হঠাৎ বাড়িউলির উল্লসিত ডাক শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল · রাখ এতদিনে ফিরিয়া আসিল বুঝি! অন্ধকারে দুই তিনবার দেয়ালে গুঁতা খাইয়া দরজা খুলিয়া দিতেই বাড়িউলির সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া গেল। বাড়িউলি কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল: সন্ধ্যের সময় নবাবজাদির ঘুম হচ্ছে! দেখ্ দরজার গোড়ায় কে এসেছে!

কুঞ্জ ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল,—কে এসেছে ? রাখ ? কোথায় ?

বাড়িউলি মুখ ঘুরাইয়া বলিল,—সে-ছোঁড়া মরতে আসবে কেন ? দেখ্ গে—মস্ত বাবু, হাতে পাঁচটা আঙটি, সিল্কের জামা, হাতির দাঁতের—

কুঞ্জ একেবারে বসিয়া পড়িল, তাহার দুর্বল মন যেন এই প্রচণ্ড ব্যর্থতার ধাক্কায় একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল, তবু কণ্ঠস্বরে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঝাঁঝ নিয়া কহিল,—এ তোমার ভারি জুলুম মাসি ! আমি মরছি ব্যায়রামে—আজ সতেরো আঠারো দিন মুখে ভাতের গরাস তুলছি না, চিতার পোড়াকাঠের মত চেহারা হ'য়ে গেছে—আর তুমি আমার জন্য সখ করে' বাবু পাকড়ে' এনেছ ? কে সেই লোকটা ? দাও বা'র করে'—

বাড়িউলি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ; কহিল,—তাকে বা'র করব না তোকে লো হারামজাদি ? সখ করে' কেন লোক ডাকতে যাব না শুনি ? বলি, এই যে দু'মাস হ'য়ে গেল, রোজগার বন্ধ,—বাড়িভাড়া দিয়েছিস্ পোড়ামুখি ? তিনি বসে'-বসে' হাত পা গুটিয়ে তাঁর সখের ছেলের জন্যে চোখের জল ফেলবেন, আর আমি তাঁকে সেই জন্যে মাগনা ঘর ছেড়ে দেব ! কী আমার আব্দার রে ! যা, যা, তুই আমার ঘর থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যা ! অসুখ করেছে হাসপাতালে গিয়ে মর না।

কে আর একটি মেয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বাড়িউলি কহিতে লাগিল : কে একজন বাবু এসেছে,—কুঞ্জকে ডেকে দিতে বললে। পুরোনো চেনা লোক, নাম বলল নিকুঞ্জ। তাই ওঁকে খোঁজ দিতে এসেছিলুম, তাইতে মাগীর কী তেজ, কী ফোঁস্‌ফোঁস্‌নি ? কেন, পুরোনো লোকের থেকে দুটো টাকা চেয়ে নিয়ে চিকিচ্ছে করা না,—এদিকে আমার ভাড়া চুকিয়ে দেবার ত' নাম নেই, —মরতে বসে' তেজ দেখালে চলে কি ?

নিকুঞ্জ, নিকুঞ্জ আসিয়াছে ! কুঞ্জ-র আপাদমস্তক লজ্জায় ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল ! এত দূর দেশে এতদিন পরে তিনি পথ চিনিয়া কলঙ্কিনী কুঞ্জ-র ঘরে আজ অতিথি হইতে আসিয়াছেন ! এই ঘরে ? এই খানে বসিয়াই কি সে এতদিন তাহার স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিল ? কিন্তু, সত্য কথা বলিতে কি, নিকুঞ্জকে ত' সে আর চাহে না, নিকুঞ্জ না আসিয়া যদি রাখ আজ হাসিমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইত—বিতাড়িত বঞ্চিত রাখ, তবে কি কুঞ্জ-র ঘরের ও হৃদয়ের অন্ধকার একসঙ্গে সুগন্ধ-সিঞ্চিত হইয়া উঠিত না ? তবুও কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই নিরুপায় নিরুৎসাহ কুঞ্জ কঠোর হইয়া কহিল,—ডেকে দাও মাসি, কিন্তু বোলো পঞ্চাশ টাকা দিতে হ'বে—

হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে ! কুঞ্জ-র বাড়ি-ভাড়া চাই—এই বাড়ি ও সহজে ছাড়িতে পারিতেছে না। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে একমাত্র এই সামান্য বাড়িটিই

রাথ-র নিজের বলিয়া চেনা। পথ ভুলিয়া হয় ত' রাথ আবার এই বাড়িতেই ফিরিয়া আসিবে। এই বাড়ি ছাড়া যায় না। ইহার চৌকাঠে কুঞ্জ কামড় দিয়া পড়িয়া থাকিবে।

স্বামী আসিতেছেন, আসুন —কিন্তু পঞ্চাশটাকা গুনিয়া না দিলে কুঞ্জ নড়িতেছে না। সোহাগপনা করিবার সময় আর উহার নাই—ও ব্যবসা করিতে বসিয়াছে। হ্যাঁ, ছেলের জন্যই ত'। কুঞ্জ দুই হাতে নিজের অলক্ষ্যে চুলগুলি তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইল।

অপর মেয়েটি কুঞ্জর চেহারা নিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কি-একটা ব্যঙ্গ করিয়া অদৃশ্য হইতেই একটি লোক কুঞ্জ-র কাছে অন্ধকার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই নিকুঞ্জ, তাহার স্বামী,—যাহার জন্য সে একদিন সীমাশূন্য পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল! সেই দিন তাহার দেখা পাইলে কুঞ্জকে হয় ত' এমন করিয়া মরিতে হইত না; ছি ছি —তাহার স্বামীও এত নীচে নামিয়া আসিয়াছেন! কুঞ্জ নড়িল না, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া একমনে মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

লোকটি কাছে আসিয়া অন্ধকারে কুঞ্জকে ঠাহর করিতে না পারিলেও আন্দাজে কহিল,—আলোটা জ্বাল। ভাল আছ ত' কুঞ্জ?

স্বামী তাহার খোঁজ পাইলেন কি করিয়া? কুঞ্জ গৃহত্যাগিনী হইবার পর হইতে তিনিও কি তাহাকে উদ্ভ্রান্ত হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন নাকি? এত দিন পরে কি এমনি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই তাহাদের দেখা হইবে? কিন্তু স্বামীর পুনঃদর্শনলাভের জন্য সম্প্রতি কুঞ্জ-র মনে ত' বিন্দুমাত্রও ব্যাকুলতা ছিল না,—তাঁহাকে ত' বহু পূর্বেই বিস্মৃতির কূলে সমাধি দেওয়া হইয়াছে—আজ রাথ আসিয়া দাঁড়াইল না কেন? কুঞ্জ-র জীবনে স্বামী-সান্নিধ্যের আর মূল্য বা আনন্দ কোথায়? অধিকন্তু যে-স্বামী পথের পাঁকে পা পাতিয়াছেন! রাথ, রাথ কি কভু পথ চিনিতে পারিবে না? নিকুঞ্জকে সে এই কথা বলিয়া দিবে, তিনি যেন কুঞ্জ-র প্রতি দয়া করিয়া রাথকে খুঁজিয়া এই ঘরের দুয়ারের কাছে পৌঁছাইয়া দেন!

এই কথাটা মনে-মনে নাড়া-চাড়া করিতে-করিতে কুঞ্জ বাতি জ্বালিল। সহসা যেন একটা শ্মশানশায়ী কঙ্কাল দেখিয়াছে, তদধিক আতঙ্কে লোকটি পিছাইয়া আসিল,—তাহার গলা চিরিয়া কথা বাহির হইল: তুমি, তুমি সেই কুঞ্জ—

ওয়াল্-ল্যাম্পটায় চিমনি আর বসানো হইল না, কুঞ্জ-র হাত হইতে মেঝের উপর পড়িয়া চিমনিটা টুকরা হইয়া গেল। কুঞ্জ-রও বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিল,—আর তুমি…

পঞ্চু আর একমুহূর্তও দাঁড়াইল না, যেন উলঙ্গ বীভৎস মৃত্যুকে মুখোমুখি

দেখিয়াছে,—ঊর্ধ্বশ্বাসে চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে-চলিতে যখন সে গঙ্গার নির্জন পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে হাসিবে না হাহাকার করিয়া উঠিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই তাহার মানসপ্রতিমা? ইহারই পিছনে সে কক্ষভ্রষ্ট উল্কার মত কামনার বহ্নিকুণ্ড লইয়া ছুটিয়াছে—তাহার ক্ষণরমণীয়তার সুধাসন্ধানে! ইহারই নাম ভালবাসা, এইটুকু মাত্র তাহার আয়ু, তাহার ভবিষ্যৎ! কুঞ্জ যেন আজ তাহার অপরিচিত অতীতের কঙ্কাল-মূর্তিতে আসিয়া দেখা দিয়াছে, চোখে তাহার সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইসারা কই, দেহসুষমায় প্রৌঢ়ত্বের মলিনতা আসিয়াছে। আজো কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চাঁদ দেখা দিল, মুমূর্ষুর রোগবিকৃত মুখের অন্তিম হাসির মত,—পঞ্চুর দিকে চাহিয়া যেন বিদ্রূপ করিতেছে। পঞ্চু গা হইতে সিল্কের জামাটা খুলিয়া ফেলিল, হাতের আঙটিগুলি স্যাকরার দোকানে বেচিবারো আর সুবিধা হইবে না, ধরা পড়িবে। কুঞ্জ-র দরজার চৌকাঠ মাড়াইতে হইলে অনেক অঙ্গাভরণ আবশ্যক, তাহাই ভাবিয়া পঞ্চু এতদিন জুয়াচুরি করিয়াছে, পকেট কাটিয়াছে, গড়িয়াহাটা রোডে টাকার লোভে কাহাকে খুন-ও করিয়াছিল বুঝি—সবই কুঞ্জ-র জন্য! একটি দীর্ঘ পরিপূর্ণ রাত্রি-ব্যাপী কুঞ্জ-র পরশতপ্ত প্রেম পাইবার জন্য। পর্যাপ্ত টাকা ঢালিলে কুঞ্জ আর কোন্ মুখ ফিরাইয়া থাকিবে,—আর, চুরি ডাকাতি করা ছাড়া পঞ্চুর এত টাকা রোজ-গারেরই বা আর কি পথ ছিল? কিন্তু তাহার এত দিনের গোপন ও গভীর প্রত্যাশার পর, এই সুকঠোর তপস্যার অবসানে কুঞ্জ-র সঙ্গে এই রূপেই মিলন ঘটিবে, বিধাতা যে পঞ্চুর সঙ্গে এত বড় একটা মারাত্মক রসিকতা করিবেন এ কথা কে জানিত? কুৎসিত কুঞ্জ, বিগতযৌবনা কুঞ্জ, ব্যাধিজর্জর কুঞ্জ—কোথায় তাহার সেই যৌবন-লাবণ্য; তাহার সেই মদিরায়ত চক্ষুই বা কোথায়? পঞ্চু কুঞ্জকে ভালবাসিয়াছিল, শরীরী কুঞ্জকে! সেই কুঞ্জ যেন আজ তাহার পরবর্তী নরকজীবনের ছায়ারই মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গায়ে-পায়ে যত সব জামা জুতা চড়াইয়াছিল সব খুলিয়া একত্র করিয়া পঞ্চু গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে, এখানে বেশিক্ষণ থাকিলে পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম করা যাইবে না, অতএব গেঞ্জির উপর কোঁচার খুটটি টানিয়া দিয়া খালি পায়েই চলিতে সুরু করিল। কিন্তু কোথায় যাইবে, তাহার ঠিকানা কি পঞ্চু জানে!

পঞ্চু তবু অন্যমনস্ক ভাবে পা চালাইতে লাগিল। একটা আকাশচারী উল্কা যেন মাটিতে পড়িয়া পাথর হইয়া গেছে। পঞ্চুর কোনদিকে হুঁস্ নাই, না-চলিয়া উপায় নাই বলিয়াই সামনের দিকে নিজের দেহটাকে কোনমতে ঠেলিয়া নিতেছে। দুই-একটা লোকের গায়ে গিয়া পড়িল বুঝি,—একজন গালি দিয়া উঠিল, আর একজন

লাথি তুলিল। পঙ্কুর ভ্রূক্ষেপ নাই—কোনরূপে পথ পার হইতে পারিলেই তাহার চলে। কিন্তু পথের দীর্ঘতাই পথের শেষ নয়!

হঠাৎ মনে হইল যেন ক্ষুধা পাইতেছে। রাস্তার ঐ পারে দোতলায় একটা হোটেল দেখা গেল। সিঁড়ি দিয়া নীচে রাস্তায় নামিতে গিয়া একটি ভদ্রলোক চিৎ হইয়া গড়াইয়া পড়িলেন—পা টলিতেছে। পঙ্কু সেখানে গিয়া ভরা পকেট দুইটা উপুড় করিয়া দিয়া আসিবে। নহিলে এই অবসাদ, এই ব্যর্থতা ও ভুলিবে কি করিয়া?

পঙ্কু রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল। বোধহয় তখন আর একবার কুঞ্জ-র কথাই ভাবিয়া লইতেছিল। উহার চেহারা কী হইয়া গেছে,—কেন এমন হইল—কিসে? বোধহয় খুব অভাবে পড়িয়াছে, অনেকদিন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই হয় ত'। অত্যন্ত রুগ্ন বলিয়া মনে হইল - চিকিৎসা করিয়া সুস্থ হয় না কেন? টাকার দরকার হইলে পঙ্কু ত' সেখানে গিয়াই পকেট দুইটা ঢালিয়া দিয়া আসিতে পারে। ডান পা-টা কোন্ দিকে বাড়াইবে—এই এক মুহূর্তের চিন্তার মধ্যেই একটা দক্ষিণাভিমুখী যাত্রী-বোঝাই মোটর-বাস্ পঙ্কুকে সরিয়া যাইবার পথ না দিয়া একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। সমবেত কোলাহল যা হইল তাহাতে পঙ্কুর শেষ নিশ্বাসপতনের অস্ফুট শব্দটুকু আর শোনা গেল না। চাকার তলায় পড়িয়া পঙ্কু প্রথমে চ্যাপ্টা ও পরে দলা পাকাইয়া গেছে।

নিজে সাধিয়া এত বড় একটা ধনী লোক কুঞ্জ-র ঘরে অতিথি হইতে আসিয়াছিল, তবু তাহাকে কুঞ্জ ধরিয়া রাখিতে পারিল না, বোধ হয় অপমান করিয়াই তাড়াইয়া দিয়াছে—সমস্ত ব্যাপারটায় বাড়িউলি চটিয়া একেবারে আগুন হইয়া গেল। নিজে না হয় কদর্য বলিয়া মনোনীত হইল না, তবু বাড়িতে আরো পাঁচজন ছিল—এই বাড়ির বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই একটা দুর্নাম প্রচলিত হইবে—এই সব যতই ভাবে, বাড়িউলি তত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

ইহার মধ্যে অখ্যাত একটা গলি হইতে একটি শীর্ণকায়া কালো মেয়ে স্থান-পরিবর্তনের আশায় পূর্বনির্দেশমত বাড়িউলির কাছে আসিয়া আশ্রয় চাহিল। বেশি ভাড়া সে দিতে পারিবে না, ছোট একখানা ঘর হইলেই তাহার চলিবে—শুধু এই অভিজাত গলিটাতে আসিলে তাহার বরাত ফিরিতে পারে সেই আশায়ই সে এখানে আসিয়াছে। অতএব ব্যাপারটা কুঞ্জ-র পক্ষে সুখকর হইল না।

কুঞ্জ জ্বরে বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়া ছিল। বাড়িউলি প্রথমে তাহাকে শাসনের সুরে বলিল—ঘর ছেড়ে দে কুঞ্জ, আমি এখেনে ধর্মশালা খুলে বসিনি। ঘরে থাকতে হ'লে পয়সা দিতে হ'বে, উঠে যা।

সাড়া দিবার মত শক্তি কুঞ্জ-র ছিল না; বাড়িউলির আদেশ ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে লাগিল, তবু সে মাটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাগটা বাড়াইয়া নিয়া বাড়িউলি নিজেই কুঞ্জ-র চুল ধরিয়া টানিতে-টানিতে পিঠে একটা লাথি মারিয়াই ঘরের বাহির করিয়া দিল। সেই নবাগত মেয়েটি ঘর ফাঁকা পাইয়া ইত্যবসরে তাহার জিনিসপত্র লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। কুঞ্জ কাঁদিতে-কাঁদিতে বার কতক পথের দুই সীমা দেখিয়া লইল—যদি ইহারও মধ্যে রাখ আসিয়া পড়ে। কিছুই আশ্চর্য না। এইরূপ একটা ব্যাপার ঘটিলে পৃথিবী আর রসাতলে যাইবে না।

অলক্ষ্মী কুঞ্জ এখুনি বাড়ির বাহির না হইলে সিধুয়া তাহাকে ঠেঙাইয়া হাড় গুঁড়া করিয়া দিবে, বাড়িউলির এই হুকুম হইয়াছে। তাই যাইবার আগে কুঞ্জ আরো একবার তাহার পশ্চাতের পথের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য সতৃষ্ণ চোখে চাহিয়া রহিল—মনে হয় পৃথিবীব্যাপী মানবজনতার মধ্য হইতে রাখকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার মত তাহার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নাই কেন?

চলিতে পা চাহে না, তবুও তাহাকে যাইতে হইবে।

নিকুঞ্জ আসে নাই, রাখও আসিবে না, যে আসিবে সে মৃত্যু—তাহারই সন্ধানে কুঞ্জ বিপুল রাজপথে পা বাড়াইল।

একটু যায়, আবার বসিয়া পড়ে,—হাঁপায়; ঘনায়মান প্রদোষান্ধকারে আবার রাখ-র জন্য দুই স্তিমিতজ্যোতি আঁখির প্রদীপ জ্বালিয়া ধরে।

আবার পথ নেয়।

বিবাহের চেয়ে বড়ো

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
করকমলেষু

প্রথম দেখা ট্রেনে।

চক্রধরপুর স্টেশনে গাড়ি থামতে কী আহ্লাদেই আটখানা হয়ে ফাজিল মেয়ের মতো বৃষ্টি নেমে এল। ব্যস্ত পদশব্দ ও আকুল জলধ্বনি ছাপিয়ে কার একটি সলজ্জ ও সহাস্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আর্তনাদের মতো অথচ আনন্দ দিয়ে ভরা। কেন কে জানে প্রভাতের মন বলে উঠল ওরা এই গাড়িতেই উঠবে। মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যেই যেন অন্ধকার আকাশের এই অশ্রুর আয়োজন। আজকের বাও তাই বাউলিনী, ট্রেনের গর্জন নয়, যেন নিপীড়িতা বসুন্ধরার কান্না।

মেয়েটি গাড়িতে উঠে চুল এলো করে দিল, শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথাটা মুছে বুক ঢেকে ফের আগের জায়গায় রাখল। ফের খোঁপা তৈরি করে চুলের কাঁটা গুঁজতে লাগল।

ঠুমকি নাচে বৃষ্টি না ঝরলেই বুঝি ভালো ছিল। কামরায় আরো বেশি লোক উঠত। না ঘুমিয়ে তাকিয়ে থাকবার কারণ ঘটত না।

সঙ্গের ছেলেটি মারি মজাড়ে, আমুদে। যেমন চোকালমুখাল তেমনি জোরালো জোয়ান। গায়ের পোষাক সাহেবী।

অশ্রু গাড়ির চারদিক একবার চেয়ে নিয়ে বিছানো কম্বলটার উপর পা তুলে বসল। কোণের ঐ ছেলেটির দিকে চেয়ে কেমন যেন ওর একটু ভালো লাগল— এমনিই, একেবারে অকারণ। যেমন পথে যেতে যেতে ফুটন্ত বকফুল ওর ভালো লাগে, কুরচি করমচা ভালো লাগে, যেমন ভালো লাগে গঙ্গামাটি, কালো মেঘের ঢেউ। ঐ ছেলেটির শুধু মুখে-চোখে নয়, কৃশ দীর্ঘ দেহ ঘিরে এমন একটি কঠিন ঔদাস্য যে অশ্রু মুগ্ধ হয়ে কয়েক সেকেণ্ড বেশিই তাকিয়ে ফেলল। কে জানে কেন ইচ্ছে করল দুটি কথা কই—সাদাসিধে কথা, কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কবে ফিরবেন, কোন ট্রেনে ফিরবেন?

কী কাজ করেন, কত টাকা মাইনে পান, এ-সব জানতে ইচ্ছে করল না। কিম্বা কোথায় আপনার বাড়ি, বাড়িতে কে কে আছে—তাও না।

অশ্রু চঞ্চল হয়ে বললে—দাদা, খাবারের ঝুড়িটা কোথায়? গাড়িতে উঠেই খিদে পেয়ে গেল। এখুনি না খেলে লুচিগুলি সব সুখতলা হয়ে যাবে। এস, হেল্‌প করো আমাকে।

প্রভাত এই বলেই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল—এরা সব মোমবাতি, এক ফুঁয়ে নিবে যাবার মতো। এদের আছে কেবল ঠাট-ঠমক, এরা ঠোঁটে-কলা। মেজাজ

অত্যন্ত টেড়া, মন দেমাকে ছাপাছাপি। তার চেয়ে তমালশ্যামলা সব্রীড়কটাক্ষা গৃহকোণের সান্ত্বনালক্ষ্মী ঢের ভালো। এরা রংদার, ভেজাল, রোখো—তার চেয়ে গেঁয়ো ছুটুলে বউও ভালো।

হাঁড়ির জলে জীয়ল মাছের মতো প্রভাতের মন আইঢাই করে উঠল।

খাওয়া শেষ করে অশ্রু বলে উঠল—জল! তুমি কী হতভাগা দাদা, জলের কুঁজোটাই ফেলে এসেছ! পরে স্বর নীচু করে বললে,—ওঁর কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নাও না।

খাবার ভাগ দিল না, জলের ভাগ নিতে এসেছে! এমনি একটা কথা যে বলা যায় প্রভাত তা ভাবতেই পারল না। নিজের হাতে জল গড়িয়ে দিলে। গ্লাশটা অশ্রুই নিতে চাইল হাত বাড়িয়ে। তার পাশ কাটিয়ে প্রভাত গ্লাশটা দাদার হাতেই এগিয়ে দিলে।

প্রভাত আবার ভাবতে চেষ্টা করল—এদের খালি বেশভূষার চটক, দুই চোখে ঠেকার ঠিকরে পড়ছে—এর চেয়ে হোক না সে কেলেকুষ্টি, নাই বা জানল কানড়া ছাঁদে খোঁপা বাঁধার আর্ট—নাই বা হলো লেখাপড়ার ফুলঝুরি—তবুও তা ঢের ভালো। পাতাবাহারের চেয়ে ঢের ভালো বনতুলসী।

অশ্রু নীরেনকে বললে—ওর সঙ্গে একটু আলাপ করো না দাদা। তুমি কী রকম, মুখ বুজে বসে থাকতে ভালোও লাগে তোমার!

প্রভাতের সঙ্গে নীরেন মামুলিভাবে কথা পাড়ে, প্রভাত খালি কাটা-কাটা উত্তর দেয়, জের টানে না। তাই আলাপ গড়াতে চায় না। গায়ে পড়ে কত আর কথা পাড়া চলে?

কিন্তু প্রভাত ভাবে, মেয়েটি কথা বলছে না কেন? ওর চোখে কেন এমন ঔদাসীন্য, কেন এমন নীরবতা? দুটি চোখ থেকে যেন অন্ধকারে শিশিরের মতো মমতা ঝরে পড়ছে। ওর তনু গ্রীবা, তনু দুটি পদতল—সব কিছুই যেন অহেতুক ঔৎসুক্যে স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে।' প্রভাত জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিজে অন্ধকার দেখে আর ভাবে—কে জানে, এও বুঝি একরকম কথা বলা।

কিন্তু সে কথোপকথনের পাত্র সে নয়।

থুথুরো কাঁচা ঘর, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তুফান একটা তুড়ি দিলেই সাবাড়। মৃত্যুশয্যায় বাপ, মা'র আয়ুতেও ফুঁ লেগেছে—সব কটি অপোগণ্ড শিশুই রোগা ডিগডিগে, কিন্তু সবাই পেটগজন্দর। এ জীবন একটা অনাবাদি জমি, শুধু কাঁটা-জঙ্গলে বোঝাই। বিয়ে করে চার হাজার টাকা পণ পাবার আশা—তাই বা কতদিন! আর তার খেসারত একটা মেয়ে-ব্যাঙাচি, তারই সঙ্গে নটখটি করে জীবন কাবু ও

কাবার করে দেওয়া। পান্তাভাত আর পাকালমাছ খাবে, দশটা-পাঁচটা করবে—একটা সন্তান চিতায় আরেকটা আঁতুড়ে—এমনি হতে-হতে যে কটা হাতের পাঁচ থাকবে—কী করবে তারা ? কোথায় তাদের ঘর, তাদের ভবিষ্যৎ ?

দম বন্ধ হয়ে আসে—প্রভাত কামরার মধ্যে মুখ টেনে এনে আবার চেয়ে দেখে মেয়েটির মুখখানিতে যেন একটি সুকোমল সহানুভূতি। কল্কা-কাটা খদ্দরের চাদরটা যে গায়ে টেনে দিচ্ছে তাও যেন তাকেই স্নেহ করে—জানলার কাঁচটা তুলে দিচ্ছে, যেন বলছে, গায়ে একটা কাপড় জড়াও আর কিছু না পেলে কাপড় ছাড়া আর উপায় কী—ভারি ঠাণ্ডা আজ, জানলাটা অমন হা-হা করে খুলে রেখো না।

নীরেন ঘুমিয়ে পড়েছে—অশ্রু হেলান দিয়ে আধশুয়ে ট্রেনের আলো দেখছে, দেখছে আলোর পোকা, বাইরের বিশাল অন্ধকার আর থেকে-থেকে ঐ ছেলেটির মুখ—তার দৃঢ় দেহের ভঙ্গি—সে যেন আরেক অন্ধকার। মাঝে মাঝে চোখের উপর চোখ এসে পড়ছে—পুরুষালির সহজ তেজে উচ্চারিত, চাপা ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের ধারালো হাসির আভাস। আশ্চর্য, কথা কইছে না কেন ? কথা কইবার ছল খুঁজছে না কেন ? কত সহজেই তো বলতে পারে, এবার ঘুমোও, জল খাবে, জানলাটা বন্ধ করে দিই ? ছাই, কী বলতে হবে তাও আমিই শিখিয়ে দেব ?

তনুমধ্যা আরূঢ়যৌবনা রহস্যময়ী শ্যামরী · তার দুই চোখ স্নেহে ও বন্ধুতায় করুণায় ও কুশলজিজ্ঞাসায় টইটুম্বুর। আর জিজ্ঞাসার নীচেই তো পিপাসার বাসা—প্রভাত জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আপন মনে বললে, বিধাতা, আর রসিকতা কেন ?

সঙ্গে মালপত্র বলতে ছোট একটা সুটকেস ও বিছানার একটা কঙ্কাল—'ড্রুগ'-এ গাড়ি দাঁড়াতেই প্রভাত লাফিয়ে নেমে গেল। যেন যত তাড়াতাড়ি পালানো যায়, যত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলা যায় মন থেকে।

অরণ্যের মতোই গভীর গহন। যা দুষ্প্রবেশ তার আকর্ষণই বুঝি বেশি দুর্বার।

দুটি মুহূর্তের জন্যে যা স্থায়ী তা দুটি মুহূর্তের পরেই বিদায় দেওয়া ভালো।

কিন্তু বিকেলের পড়ন্ত আলো মেয়েটির চোখের পাতায় পড়ে ঝিকমিক করে উঠবে এ একেবারে কল্পনাতীত। স্থির মাটিতে সেই চলন্ত ট্রেনের চঞ্চল মেয়েটিই তো ! পরনে আটপৌরে শাদা জমির পাতলা শাড়ি, নিবিড় মমতায় সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে রয়েছে—দুখানি পা'র খানিকটা শঙ্খের মতো শাদা বুকের খানিকটা খোলা, তাতে সন্ধ্যার স্নেহচুম্বনের আলো।

অশ্রুর হৃৎপিণ্ড পূজার ঘণ্টার মতো বেজে উঠল।—দাদা, ঐ যে উনি, উনি এখানেই এসেছেন দেখছি। ডাকো না ওঁকে।

ধুলোয় একবার সোনার পিন হারিয়ে ফের সেটাকে পেয়ে অশ্রুর যতখানি

আহলাদ হয়েছিল, ত র একচুল কম নয়। শুধু আনন্দ নয়, দেখা পেয়ে সে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে—এমনি। হৃদয়ের মধ্যে কোন জায়গাটা যেন বেজুত লাগছিল – ঠিক হয়ে গেল।

নীরেন গায়ে পড়ে খুব আলাপ করল এবার, অশ্রুও লজ্জালুলতার মতো মুখ ঝেঁপে রইল না—অশ্রু এবার মৌটুসকি।

সব চেয়ে যে প্রশ্নটা জরুরি সেটাই আগে করল অশ্রু।—কবে ফিরছেন ?

—কাল।

—কাল ? কোন ট্রেনে ?

—এই ট্রেনেরই ডাউনে।

—আমরাও ঐ ট্রেনেই কাল ফিরছি। উলসে উঠল অশ্রু।– চমৎকার হবে, একসঙ্গে সবাই হল্লা করে যাওয়া যাবে। আপনি তো রাস্তায় একবারও চোখের পাতা এক করেন না দেখলাম।

—সবাই যদি ঘুমোয় তবে রাত জেগে দেখবে কে ?

—ট্রেনে রাত জেগে কতই না দেখবার জিনিস !

—কেন, আপনার ঘুমটুকু !

কী দুর্ধর্ষের মতো কথাটা বললে কিন্তু কত না আত্মীয়তা মিশিয়ে! কে জানে ঘুম দেখতে উঠে এসেছিল কিনা, নুয়ে পড়েছিল কিনা স্বপ্নের মতো !

তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়তে হয়।—কেন এসেছেন এখানে ?

ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রভাত তাড়াতাড়ি বললে,—এখানে আমার দিদি থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আপনারা ?

—দাদাটা শিগ্‌গিরই কালাপানি পেরোবে কিনা, তাই যাবার আগে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা করা হচ্ছে। আমি থানাদার হয়ে বেরিয়েছি। কী, ভালো করিনি ? ঝিলকিয়ে হেসে উঠল অশ্রু।

প্রভাতের মন্তব্য করার আগেই নীরেন বললে—বোকা মেয়েটাকে কত বললুম, বি-এ পাশ করলি, চল আমার সঙ্গে। ভয়েই ঘাবড়ে গেছে। বিলেত দেশটা যে মাটির এ মোটা কথাটাই ওকে বোঝাতে পাচ্ছি না।

—মাটির যে তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু আমাদের নিজের দেশটা যে সোনার। তোমরা এক-একটা দিগগজ হও গে, আমরা আমাদের দেশী সংসারে শান্তির নিকেতন গড়ে তুলি। কী বলেন ? প্রভাতের দিকে তাকাল অশ্রু।

প্রভাত কী বলবে ভেবে পেল না। সে কিছু বললে না বলে অশ্রু অভিমানের ভাব করে চুপ করে রইল। প্রভাতের মনে হলো অশ্রুর নীরবতাগুলিও মদের ফোঁটার মতো।

—চলুন, আমাদের মাসীমার বাড়ি চলুন। নীরেন প্রভাতের হাত ধরল।

অশ্রু তার নিজের ইচ্ছাটা প্রবল করতে চাইল।—এখুনি বাড়ি ফিরব কী, চলো ঐ ঘুমন্ত নদীটার পারে বেড়াই।

—নদী—সে অনেক দূর। আপত্তি করল নীরেন।

—তাহলে একটা টাঙ্গা নিই। বলে চলতি একটা টাঙ্গাকে নিজেই ডেকে বসল অশ্রু।

এখন গোলমাল বাধল কে কোথায় বসে! গাড়োয়ানের পাশে একজনের না বসে গত্যন্তর নেই।

—উনি অতিথি মানুষ, উনি গাড়োয়ানের সঙ্গে বসবেন কী। অশ্রু প্রায় শাসন করে উঠল। প্রভাতকে লক্ষ্য করে বললে,—আপনি চলে আসুন পিছনে।

তাহলে বুঝি অশ্রুর পাশেই বসতে হয়। নীরেনের উপস্থিতিতে সেটাও বিসদৃশ।

কিন্তু কী হঠকারী মেয়ে—বলে বসল, তোমরা দুজন পিছনে বোসো, আমিই সামনে যাচ্ছি।

সেটাও অসম্ভব।

তাই নীরেন ভাড়া দিয়ে টাঙ্গাটা বিদায় করে দিল।

তারপর হেঁটেই চলল তিনজন—মাঝখানে অশ্রু, কখন আবার কথার ঝোঁকে, কথারই কারসাজিতে প্রভাতের বাঁ পাশে।

অন্ধকারে পথ হারিয়ে তিনজনে অনেক পরে মাসীমার বাড়ির হদিস পেল। সারা পথ অশ্রুর কথাই পাঁচকাহন—আর অবান্তর কথাই যে শ্রোতার গুণে এমন অনর্গল হতে পারে তা এই নির্জন মাঠ-বন কোনোদিন এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি।

মাসীমা অপরিচিতকে দেখে সরে যাচ্ছিলেন, অশ্রু ঘোষণা করে বসল, ও দাদার বন্ধু, তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই মাসীমা।

তারপর প্রভাতের কাছে সরে এসে বললে—বসুন। পরের মতো ওরকম জবুথবু হয়ে কেন? বেশ করে হাত-পা ছড়িয়ে বসুন—কম তো আর ঘোরা হয়নি। হোঁচট খেয়ে-খেয়ে আমার বুড়ো আঙুল দুটো তো ঘেঁতলে গিয়েছে।

—কই, দেখি। সাহস করে দিব্যি বলতে পারল প্রভাত।

দুহাতের দুটো বুড়ো আঙুল একত্র করে দেখাল অশ্রু।

—সে কী?

—পায়ের বুড়ো আঙুল বুঝি দেখানো যায়?

দুজনেই অবাধে হেসে উঠল।

সকাল বেলা দিদি যেমন যত্নে পাশে বসিয়ে খাইয়েছিল, অশ্রুও যেন ততখানি যত্নে নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে এনেছে।

থালা দেখেই প্রভাত পেছিয়ে গেল।—পারব না।

অশ্রু আরো এগিয়ে এল।—খুব পারবেন। আমি বলছি পারতে হবে।

—অসুখ করবে।

—অসুখ করলে সেবা করবার জন্যে আমি গ্যারিণ্টি রইলাম।

—সত্যি ?

—এক সত্যি নয়, তিন সত্যি।

—আর যদি অসুখ না করে ?

—তাহলে আমার সেবা করবেন।

—আপনার সেবা ! প্রভাত যেন ফাঁপরে পড়ল।—কী করে ?

—আবার খেতে এসে।

অন্ধকারে অশ্রুই খানিকটা পথ এগিয়ে দিল। বললে—কাল খুব সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই চা না খেয়েই চলে আসবেন এখানে। খুব খানিকটা বেড়ানো যাবে। কী, চাকর ডাকিয়ে লণ্ঠন দেব একটা ?

—না, দরকার নেই। অন্ধকারে একা-একা ফিরে যেতেই ভালো লাগবে।

—হোঁচট খেয়ে পড়লে কিন্তু সে সেবার ভার আমার উপর নেই। আচ্ছা, আচ্ছা, তাও নেওয়া যাবে, কিন্তু আলো নিলে ভালো হতো।

—আমার কালোই ভালো। অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল প্রভাত।

—কাল আসবেন কিন্তু মনে করে। কেমন থাকেন আমার জানা চাই।

প্রভাত মনে স্থির করল, কাল কক্‌খনো ওদের বাড়ি যাবে না—খেয়ে দেয়ে এমন গভীর ঘুম দেবে যে ন'টার আগে আর উঠবে না। বিধাতা, আর কেন ?

কিন্তু যতই ভরপেট খাক, ঘুম এল না প্রভাতের।

যাট টাকা মাইনের কেরানী—সে কী করে শিয়রে স্বপ্ন নিয়ে ঘুম যায় ? যাট টাকার মধ্যে বাড়িভাড়া আঠারো, রুগ্ন বাপের কবরেজি চিকিৎসা বাবদ বারো, বাজার খরচ দৈনিক পাঁচ আনা করে ন টাকা ছ আনা—ছোট বোন দুটোর বিয়ের জন্যে কুড়ি টাকা করে জমাতে হবে—আর বাকী দশ আনার উপরই তার প্রভুত্ব—সে বিড়িই খাক আর ট্রামেই চড়ুক।

বিধাতাকে এ পর্যন্ত কম ঘুষ দেওয়া হয়নি। কত বলেছে, আরো গোটা কুড়ি টাকা বাড়িয়ে দাও, অন্ধ ভাইটাকে স্কুলে ঢোকাই, বোন দুটোকে বিয়ের নৌকোয় পার

করি, মা'র সুবিধের জন্যে একটা ঝি রাখি। কত বলেছে। বিধাতা শুনেও শোনেননি, মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

একটা টিউশানির জন্যেও কত হাঁটাহাঁটি করেছে। হবে-হচ্ছে করে লাগছে না শেষ পর্যন্ত।

অগত্যা বাবা তার জন্যে বিয়ে ঠিক করলেন। চার হাজার টাকা বরপণ পাওয়া যাবে, সেইটেই আকর্ষণ। মেয়ের খুঁত আছে বলেই অতগুলো রূপোর চাকতি। একে অমাবস্যা তায় একখানা পা ছোট। তা সে যাই হোক, টাকা পাওয়া নিয়ে কথা। টাকাই ফর্সা, টাকাই কুলীন। টাকারই সমস্ত অবয়ব অনবদ্য।

এ-সব কথা অশ্রুকে বলা যায় না। অন্তত এখুনিই বলা যায় না। আর যখনই বলা তখনই তার ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন।

তবু যতক্ষণ ঘুম না আসে স্বপ্ন জেগে থাক শিয়রে।

দিদিও স্বপ্ন দেখছেন।

থাকেন বাংলার সীমানা পেরিয়ে মধ্যপ্রদেশের এক বুনো গাঁয়ে—তাঁকে বিয়ের নায়রী করে নিয়ে আসতে প্রভাত রওনা হলো। আগের পক্ষের দিদি—চব্বিশ বছর বিয়ে হয়েছে, সেই থেকেই দেশছাড়া। স্বামী সামান্য মাইনে নিয়ে একটা ইস্কুল মাস্টারি করেন। ঐ জংলা বুনো খোট্টা দেশেও সদলে মা-ষষ্ঠীর পথ চিনে আসতে বেগ পেতে হয়নি। বাবা বারণ করেছিলেন—শুধু-শুধু টাকার শ্রাদ্ধ, শ খানেকের উপর এতেই বেরিয়ে যাবে, হাফ-টিকিটই লাগবে হয়তো খান ছয়েক। প্রভাত বলেছিল—দিদি না এলে বিয়ের সমস্ত বাজনা বুজে যাবে।

দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নির্বাসিতা নারী বাঙলার সবুজ সান্ত্বনাসিঞ্চিত নীড়ের জন্যে বাহুর দুই ব্যাকুল ডানা বিস্তার করে দিয়েছে। সবুজ মাঠ কত দিন দেখেনি—নুয়ে-পড়া নীল আকাশ। এখনো নদীতে বকের ডানার মতো শাদা পাল তুলে ঘোমটা-দেওয়া বউয়ের মতো নৌকো নাচে, পানকৌটি ডুব দেয় জলে? মাছরাঙা—গাঙশালিক? ছেলেরা উঠোনে তেমনি কানামাছি খেলে? মেয়েরা মাঘমণ্ডলের ব্রত করে? আর তেমনি কাঠগোলাপ ফোটে—সজনে ফুল? হাওয়ায় তেমনি পাটের খোপা দোলে আর? শালিধানের চিরে পাওয়া যায়? কাউনের চাল?

রুক্ষ তামাটে মাটির নিরানন্দতা সমস্ত দেহে—হঠাৎ যেন বাংলার শ্যামল মাটির স্নেহরসে স্নান করে ওঠে। বলে, আমিই সব নিতকাম করব তোর বিয়ের, যাত্রাকলস আঁকব, পিঁড়িচিত্র করব, উলু দেব, কুলোতে পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে বরণ করব, দোরে মঙ্গলঘট দেব—

স্বপ্ন না দেখে মানুষের উপায় কী। জীবনে সৌভাগ্যের মুখ দেখে না বলেই তো সে স্বপ্ন দেখে! স্বপ্নই তো একমাত্র সৌভাগ্য।

কিন্তু, কী আশ্চর্য, সকাল ন'টার আগেই ঘুম থেকে উঠল প্রভাত। স্বপ্ন শুধু মানুষ ঘুমিয়েই দেখে না, কখনো কখনো দিনের আলোয় খোলা চোখেই দেখে। আজ সকালে ইচ্ছে করলেই সে অশ্রুকে দেখতে পারে এই অনুভবটাও তো একটা স্বপ্নের মতো।

দিদিকে বললে—এখানে এসেই এক বন্ধু জুটে গেল। একটু দেখা করে আসি। শিগ্‌গিরই ফিরছি - তোমরা সব রেডি হয়ে থাক।

অশ্রু দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়—যেন প্রতীক্ষার প্রতিমা।

—এই আপনার ঘুম ভেঙেই আসা?

—আমার ঘুম তো এখনো ভাঙেনি। হাসিভরা বিহ্বল চোখে তাকাল প্রভাত।

—কেন, কী হলো?

—আপনি ছোঁবেন তবে তো ঘুম ভাঙবে।

—কেন, জ্বর হয়েছে নাকি? অশ্রু প্রভাতের কপালে একটু হাত রেখে ব্যাখ্যাটা সরল করতে চাইল।

কিন্তু প্রভাত তাকে তরল হতে দিল না। নিজের হাতের মধ্যে অশ্রুর হাতখানি টেনে নিল। কেন যেন মনে হলো এ হাতের মধ্যে অনেক-অনেক ভবিষ্যৎ।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ - হঠাৎ যেন জ্যোৎস্নার মতো মিঠে লাগে, প্রভাতের মন মদির হয়ে উঠেছে। না, বিয়ে করে তার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার পথ সে বন্ধ করে দেবে না। এখুনি তার ঘরবন্দী হবার সময় আসেনি। না, টাকাই জীবনের সব কিছু নয়। মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না। যদি জীবনে সে একটা প্রেম পায় তা বিবাহের চেয়ে বড়ো।

দিদি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, প্রভাতকে রাস্তায় দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—তোর আক্কেলটা কী রকম শুনি? সেই কখন থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেঁধে-ছেঁদে তৈরি হয়ে আছি, তোর আর দেখা নেই। বন্ধুর বাড়িতে এতক্ষণ না থাকলেই নয়? এখন কখন খাবি, কখন যাবি। মোটেই আর ঘণ্টা-খানেক বাকি গাড়ি ছাড়বার—

—খবর ভালো নয়, দিদি।

—কেন, কী হলো?

—কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে। বিয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।

—দিদি কেঁদে উঠলেন - আমাকে নিয়ে চল।

—না, বিয়ে যখন হচ্ছে না—প্রভাত যেন এখুনি বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে।

—সে কী, দুটি খেয়ে যা।

—খাবার সময় নেই। স্টেশনে যা পাই খেয়ে নেব। তুমি কেঁদো না—বাবা ঠিক ভালো হয়ে যাবেন। তারপর পিছন ফিরে বললে—বিয়ের দিন ঠিক হলে আবার আসব। নিয়ে যাব তোমাকে।

দিদি সুন্দর করে সেজেছেন। অব্যবহৃত পুরোনো ক'খানা গয়না গায়ে দিয়েছেন, কপালের মধ্যিখানে ডগডগে সিঁদুর—কাপড়ের পাড়টা চওড়া লাল।

তাঁর চোখেমুখে সর্বাঙ্গে সোনার বাংলা দেশ দেখার স্বপ্ন।

কে জানে, মিথ্যে দিয়েই সে স্বপ্ন ভরা। তাই আবার মিথ্যে দিয়েই সে স্বপ্ন ভেঙে দিল প্রভাত। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়াও জীবনের আরেক স্বপ্ন।

প্রভাত স্টেশনে পৌঁছে বাবার কাছে তার পাঠাল—বিয়ের দিন পিছিয়ে দিন, আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ।

মধ্যপ্রদেশের উপর মধ্যরাত্রি—কামরায় চতুর্থ লোক ওঠেনি। উঠলেও তারা অস্তিত্বহীন।

সন্ধে হতেই নীরেন শুয়েছে—খানিকক্ষণ বকবকানির পর অশ্রুও ঢুলে পড়েছে। বলেছে, আপনিও আমার মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে উলটো দিকে গা টান করে শুয়ে পড়ুন।

কী অপার অকূল ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা! প্রভাত শিয়রে বসে একবার অশ্রুকে দেখতে লাগল। মৃদু নিশ্বাসের তালে সোনার গাগরী দুটি অতি ধীরে দুলছে। সমস্ত মুখে লাবণ্যময় প্রশান্তি। মুদ্রিত দুটি ঠোঁটে যেন স্তব্ধতার সঙ্গীত—ললাট যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ি, ব্রততীর মতো লীলায়িত দুটি বাহু—কানে এককালে দুল পরবে বলে যে জায়গাটা ফুঁড়েছিল সেটাও অনেকক্ষণ দেখলে। সুতনু, সুমধ্যমা—ওর নবযৌবনের সৌরভে প্রভাতের সমস্ত দেহ উন্মুখ ও উল্লসিত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হলো ওর কপালে কোমল করে ডান হাতটা একটু রাখে।

কিন্তু কে জানে হয়তো ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠবে। জেগে-ওঠাটা এই ঘুমিয়ে-থাকার মতো সুন্দর নাও হতে পারে।

দেখল অশ্রুর পা-দুখানি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বেঞ্চিতে বেশ খানিকটা জায়গা আছে—শীর্ণ হয়ে বসা যায় হয়তো। মনে হতেই প্রভাত মাথার দিকের জায়গা ছেড়ে পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসল। দেখল শাড়ির প্রান্তটা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে গেছে। প্রভাতের বুকের ভিতর একটা ঠাণ্ডা আনন্দ অজানা ভয়ের মতো

শিউরে উঠল। মনে হলো রহস্য-মন্দিরের কটা সিঁড়ি যেন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। প্রভাত সন্তর্পণে হাত বাড়াল—না, অনাবৃত পায়ের উপর রাখল না, শাড়ির প্রান্তের ধারটুকু ধরে আস্তে নীচের দিকে টেনে দিল।

রহস্য উন্মোচনে নয়, রহস্য আবরণে। ভঙ্গুরতা, তোমার নামই রমণী—বলেছিল শেকসপিয়র। প্রভাতের বলতে ইচ্ছে হলো, রমণী, আবৃতিই তোমার নাম। যতক্ষণ আবরণ ততক্ষণই তুমি রহস্যের মন্দির। অনাবরণে তুমি রহস্যের গবেষণাগার।

—এ কী, আপনি পায়ের দিকে বসেছেন? ঝট করে উঠে পড়ল অশ্রু। প্রভাত লজ্জিত হবার ভান করে বললে—কোণের দিকটায় পিঠ রেখে বসে ঘুমোব ভেবেছিলাম।

—দরকার নেই ঘুমিয়ে। আসুন গল্প করি। অশ্রু বেশ খানিকটা কাছাকাছি হয়ে বসল।

—হ্যাঁ, তাই ভালো। কৃতজ্ঞ মুখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল প্রভাত।

কিন্তু চলন্ত ট্রেনে রাত্রির রহস্যপুরীর দরজায় বসে নির্জনে যে কী গল্প করা যায় দুজনে কেউই কিছু ভেবে পেল না। অথচ স্তব্ধ হয়ে থাকাটাও ভয়ঙ্কর লাগছে।

—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। অশ্রু চঞ্চল হয়ে উঠল—আপনি বরং শুয়ে পড়ুন, আমি জেগে থাকি।

—এমন কথা মহাভারতে লেখে না। প্রভাত বললে—বরং আপনি শুয়ে ঘুমোন, আমি বসে ঘুমোই।

—আপনি যে তাহলে কত ঘুমোবেন জানা আছে। অশ্রুর গলায় ছোট একটু দুষ্টুমির টান।

—তাহলে এই বেশ আছি, দুজনেই বসে বসে ঢুলি।

—এটা কোনো কাজের কথা নয়। অশ্রু প্রায় শাসনের সুর আনল।—যখন একজনের লম্বা হবার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে তখন আপনার সেটা সদ্ব্যবহার করা উচিত।

—আমার? প্রভাতের খেয়াল হলো একই কথার আবর্তের মধ্যে ওরা ঘুরছে অথচ এই তুচ্ছ কথা-কাটাকাটি কী সুখকর!

—হ্যাঁ, আপনার। কলকাতা পৌঁছেই তো আপনার আপিস সেই দশটা-পাঁচটা। কি, ঠিক নয়? রাতে ঘুমিয়ে না নিলে আপনি কাজ করবেন কী করে?

অশ্রুর কণ্ঠে কী যেন অকথিত মমতা, প্রভাতও অলক্ষ্যে স্নিগ্ধ হতে স্নিগ্ধতর হলো।
—কিন্তু আপনি?

—আমার কী! আমি তো গড়িয়ে গড়িয়ে সারা দুপুর শোধ তুলব। শব্দ করে হেসে উঠল অশ্রু।

—তা তুলুন। কিন্তু রাত জেগে পরের দিনে আপিস করা, আবার আপিস করে ফের রাত জাগা, এ আমার অভ্যেস হয়ে গেছে—

—এ আপনার কেমনতরো আপিস ? বেশ, অশ্রু হঠাৎ উৎসাহী গলায় বললে— আপনি তবে আপনার আপিসের গল্পই বলুন।

প্রভাত বুঝল অশ্রু এই পথে তার সাংসারিক পরিচয়টা জেনে নিতে চায়। আশ্চর্য, সে কিছু লুকোল না, মিথ্যের ময়ূরপুচ্ছ ধরল না, ঠিক-ঠিক সব কথা উজাড় করে ঢেলে দিল।

ঘুম থেকে উঠে বাজার করতে যাই। বাজার করে আসতে-আসতেই আপিসের বেলা হয়ে যায়। হেঁটেই যেতে হয় কিনা। পাঁচটা পর্যন্ত কলম পিষি। কলম পিষে যখন হেঁটে বাড়ি ফিরি তখন সন্ধে হয়ে যায়—একটা পাথরের বাটিতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে তাতে খানিকক্ষণ বাঁকানো আঙুলগুলো ডুবিয়ে রেখে সোজা, কর্মঠ করি। পরে আবার রাস্তায় বেরুই। টিউশানির সন্ধান করি। গান নেই কবিতা নেই খেলাধুলা নেই সঙ্গী নেই বই নেই—কোনো আমোদ-প্রমোদ নেই—আমোদের মধ্যে রাত জেগে ছারপোকা মারা আর সঙ্গীর মধ্যে চিররুগ্ন অন্ধ ভাইটা, রাত্রে ওর কাছে শুই কিনা। কোনো স্বপ্ন নেই—না, আছে, চাকরিতে একটা লিফ্‌ট পাই কিনা— প্রাইভেটে এম-এ-টা পাশ করে নিতে পারি কিনা। পরে হঠাৎ যখন আপনাকে দেখলাম—

মুহূর্তের মধ্যে প্রভাত যেন কী হয়ে যায়— কে জানে সে নিজেই স্বপ্ন হয়ে উঠল কিনা—অশ্রুর উৎসুক হাতের ওপর তার হাতখানি উপহার দিতে এতটুকুও কুণ্ঠা করে না, বলে চলে—হঠাৎ যখন আপনাকে দেখলাম, আপনি প্রতিবেশী আত্মীয়ের মতো আমার সঙ্গে কথা কইলেন, স্নেহ করে খেতে দিলেন, এই উষ্ণ সান্নিধ্যটুকু দিলেন—ভাবতে অবাক লাগল এর জন্যে আমার কী তপস্যা ছিল? অযোগ্য হতভাগ্য—একটা অক্ষম গরীব কেরানী—

অশ্রুর চোখ অজানা ব্যথায় ছলছল করে উঠেছে। অযোগ্য তো এমন করে টানে কেন ? ওর বাইরের রুক্ষতা কেন অমন দুর্বার রহস্যের ইঙ্গিত দেয় ? মনে হয় যেন সমতল ভুমির উপর হঠাৎ একটা পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে। যোগ্যতার হিসাবে পাহাড়টার আর দাম কী, কিন্তু কী দুর্ধর্ষ আকর্ষণ দিয়ে ভরা !

প্রভাতের হাত আরো একটু শক্ত করে, আপনার করে ধরল অশ্রু। বললে— কিন্তু আপনাকে দেখেই আমার মন যে কী ভীষণ সুস্বাদু হয়ে উঠেছে সে কথা কে বলে? আমি যেন হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করে বসলাম—সে যে কী, কেমন, বোঝানো যায় না। তারপর একটু থেমে চঞ্চল হয়ে বললে—কিন্তু মানুষকে কেন এত

দুঃখ সইতে হবে ? ভালোবাসা না পাওয়ার দুঃখের চেয়ে না খেতে পাওয়ার দুঃখ, রোগে ভুগে পঙ্গু হওয়ার দুঃখ কী প্রচণ্ড ! আপনি কেন এত দুঃখ পাবেন ? না, আপনাকে আমি পেতে দেব না।

প্রভাত একটু হাসল। বললে– আমার কথা কে ভাবে ? কিন্তু যখনই ভাবি অন্ধ ভাইটা একদিনের জন্যেও দিনের আলো– মনুমেণ্ট দেখতে পাবে না —কাঁদে আর বলে, আমাকে মনুমেণ্ট দেখাও, মা। উঃ, আমি যদি অন্ধ হতাম ! তাহলে তোমার মুখও তো দেখতে পেতাম না কোনোদিন—

স্থির চোখে চেয়ে অশ্রু বললে—আর আমি যদি এখন অন্ধ হই !

কথাটার মধ্যে-কি লঘুতার সুর বাজল ? তবে কেন অন্ধ হওয়ার নীরন্ধ্র যন্ত্রণাটা স্বীকার করতে চায় না ? অশ্রু অন্ধ হবে কেন ? তার জীবনে সর্বাঙ্গে উচ্ছ্বসিত সাফল্য-বিলাস, সে কেন দৃষ্টিহীন হতে যাবে ?

প্রভাত হাতটা ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, অশ্রুই অনুমতি দিল না। একটু বুঝি বা কাছে টানল।

তবে অন্ধ হবার কি আর কোনো অর্থ আছে ?

—তোরা এখনো ঘুমোসনি ? নীরেন নড়ে-চড়ে উঠল।

প্রভাত আর অশ্রুও নড়ে-চড়ে বসল। কথাও বন্ধ হলো। হাতের স্পর্শটুকুও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তবুও মনে হলো স্তব্ধতাও বুঝি আরো কত কথা কইতে পারে। আর স্পর্শহীনতাও আনতে পারে কত গভীর সংযোগের আস্বাদ।

ভোরবেলা রূপনারানের ওপর দিয়ে যখন ট্রেন যাচ্ছে তখন ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল—দুজনের মুখেই যেন অপার্থিব আনন্দের আভা, যা পৃথিবীর কান্না দিয়ে তৈরি।

স্টেশনে গাড়ি যখন থামল তখনই অশ্রু বলতে পারল—আপিস সেরেই কিন্তু আমাদের বাড়ি আসবেন। আসবেন অবশ্যি। আমি পাথরের বাটিতে বরফ গলিয়ে রাখব। আপিসের কাজের ভিড়ের মধ্যে পড়ে ভুলে যাবেন না যেন। দেখবেন—

পরে একটু কাছে এসে বললে—আমি না ভুললে কি করেই বা ভুলবেন দেখব। আসা চাই কিন্তু, আমি পথ চেয়ে থাকব। বুঝলেন, পথ চেয়ে থাকব।

হ্যাঁ, পাহাড়ই হেঁটে আসবে।

এখানে ওখানে করে, বন্ধুদের মেসে খেয়ে-শুয়ে, আপিসে কলম পিষে প্রভাত চার দিন কাটিয়ে দিল যা হোক। দুনো উৎসাহে ও খাটে—খেটে এত তৃপ্তি যেন

ও আর কোনোদিন পায়নি— স্বাস্থ্য খারাপ হলে আর কেউ অনুযোগ দেবে এই আশায় নিজের কাহিল দেহটার ওপরেই মায়া পড়ে। আপিসে হিসেব মেলায় আর মনে-মনে কান পেতে শোনে, ট্রেনের চাকার শব্দ, রক্তের গভীরে অনুভব করে সেই হাতের মধ্যে হাত ঢেকে রাখা – সেই—

বাড়ি যখন ফেরে, সমস্ত ইট-কাঠ যেন একসঙ্গে বিদীর্ণ হয়ে যায়—কী হয়েছিল তোর ? ঐ এক টেলিগ্রাম করেই আর কোনো খবর নেই ? তুই কি কসাই ?

—অসুখ করেছিল। অসুখের ওপর কী হাত আছে ? প্রভাত মাকে প্রণাম করে, ছোট ভাইবোনগুলিকে একটু অকারণ আদর করে।

—এখন কেমন আছিস ? মা গায়ে হাত রাখেন।

—এখন ভালোই আছি। ভরা গলায় বলে ওঠে প্রভাত। এত ভালো সে আর কোনোদিন থাকেনি। ভালো-কথাটা বলা যায় এই যেন সে ভুলে ছিল !

রোগশয্যা থেকে বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন - হতভাগাটা যেতে না যেতেই ব্যামোয় পড়ল ! তখনই বলেছিলাম ঐ অজাত দেশে গিয়ে কাজ নেই। আর এমন কী ব্যামো হলো যে একেবারে বিছানা নিতে হলো ! অলক্ষুণে কোথাকার ! এ দিকে এত বড়ো দাঁওটা গেল ফসকে— ওরা অন্য জায়গায় ভিড়েছে। এবারে কলা চোষো—

প্রভাত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অন্ধ ভাইটির রুখু মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কিন্তু সংসার কী করে চলবে ?

বিধাতাই এর বন্দোবস্ত করে দিলেন—একান্ত মামুলিভাবে। আয় না বাড়িয়ে ব্যয় কমালেন।

তিন দিনের আড়াআড়িতে দুটি বোন কলেরাতে মারা গেল - এক থালায় করে একই বাসি খাবার খেয়েছিল দুজনে।

দুটি গ্রাস বাঁচল—কুড়িটাকা করে আর জমাতে হয় না। এ ক'দিনে যা জমেছিল বাবা একদিন রাগ করে তাই তুলিয়ে আনলেন। আজেবাজে খরচ করে দিলেন উড়িয়ে।

আপিস থেকে ফেরবার সময় প্রভাত মাঠে অনেকক্ষণ জিরিয়ে নেয় আজকাল – এক দমকে অনেকগুলি কদম আর ফেলতে পারে না। শোকাচ্ছন্ন প্রদোষে ওর অর্ধভুক্ত অপরিচ্ছন্ন বোন দুটির মুখ মনে পড়ে—সংসারের সমস্ত উৎপীড়ন ও অপমান নির্বিবাদে একান্ত অপরাধীর মতো বহন করত ওরা— একখানা ভালো কাপড় পরেনি কোনোদিন, মুখ ফুটে কোনো আবদার করেনি, মা'র সঙ্গে-সঙ্গে রেঁধেছে, বাসন মেজেছে, কাপড় কেচেছে— আর ওদের বিয়ে দিতে পরিবার সর্বস্বান্ত হবে এই ভয়ে বালিশে মুখ গুঁজে খালি কেঁদেছে। যদি ওরা বাঁচত—প্রভাত ভাবছিল—ওরা শত

কুৎসিত হলেও ওদের হৃদয় কি আর কারু হৃদয় ছুঁয়ে বাজিয়ে ধন্য করে দিতে পারত না ?

কিন্তু শোক নিয়ে বিমর্ষ হয়ে কতক্ষণ থাকবে প্রভাত ? জীবনে শোকের অপর পার থেকে যে ভালোবাসা ডাকছে। শোক চলে যায় কিন্তু ভালোবাসা যে যায় না। সময় তো শোককে অস্পষ্ট করে কিন্তু ভালোবাসাকে উজ্জ্বল করে রাখে।

অশ্রু প্রভাতকে একেবারে ওর তেতলার ঘরে নিয়ে এল, বিছানা পেতে দিল, বললে,—হেঁটেই এসেছ মনে হচ্ছে, শোও, শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি—

প্রভাত বললে—বিছানা দেখে শোবার লোভ হচ্ছে, কিন্তু তার দরকার নেই—

—লোভের জিনিস যদি সহজেই পাওয়া যায় তবে নিয়ে নিতে হয়। দরকারের কথা ভাবারই দরকার করে না।

অশ্রু উজ্জ্বল চোখে সপ্রতিভের মতো বললে। তাকে এখন কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ! চুলগুলি বোষ্টমীদের মতো ঝুঁটি করে বাঁধা, একখানি আটপৌরে পাতলা শাড়ি পরনে —কুচকুচে কালো চওড়া পাড় —গায়ে শুধু একটা শেমিজ—শাদা নয়, গোলাপী।

—বাড়িতে কে আছে, দেখে কী ভাববে। প্রভাত তবু দ্বিধা করে।

—ভর দুপুরবেলা, বাড়িতে এখন তেমন কেউ নেই। অশ্রু বলে অকপটে—থাকলেও আমার ঘরে কেউ উঁকি মারতে আসবে না। আর এলেও দেখবে আমি আমার এক শ্রান্ত বন্ধুকে আমার বিছানায় বিশ্রাম করতে দিয়েছি।

প্রভাত যদি বা বিছানায় বসে, শুয়ে পড়তে সঙ্কোচ করে।

অশ্রু নিজেই আবার নিজের কথার জের টানে—কোত্থেকে কে কী দেখে ফেলে সেই ভয়ে জানলা-দরজা বন্ধ করে রেখে বাঁচা যায় না। তারপর, কী সাহস মেয়েটার —দিব্যি হাসিমুখে বলে—এখন তো আর দরজা বন্ধ করছি না যে লোকে কিছু অনুমান করবে।

এখন করছে না, পরে একদিন করতে পারে !

ফিটফাট নরম বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে প্রভাত। সাহস-ভরা স্বরে জিগগেস করে—তুমি কোথায় ঠাঁই নেবে ?

—আমি তোমার শিয়রে বসব।

প্রভাত যেন এতখানি ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি মদিরার পাত্র এমনি আবার মমতার মধুরে ভরে যাবে।

সত্যিই শিয়র ঘেঁষে বসে অশ্রু। কাঁঠাল চাঁপার কলির মতো কোমল ও শুভ্র

আঙুলগুলি অতি ধীরে ধীরে প্রভাতের কপালে ও চুলে বুলোয়, আদর করে। যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে সমস্তটি হৃদয় জলের মতো ঢেলে-ঢেলে দিতে চায়।

নিস্তব্ধ দুপহর—একটা কাকের পর্যন্ত ডাক নেই।

প্রভাত ওর বোন ছুটির কথা ছাড়া অন্য কথা মনে করতে পারে না। মমতায় এমন দ্রব এখন পরিবেশ। বলে—মা শোকশয্যায় একান্ত শ্রান্ত—এ কদিন প্রভাতকেই দুবেলা রাঁধতে হচ্ছে—কষ্টের চেয়ে মালিন্যই যেন বেশি—কত দীর্ঘ দিনের মেয়াদ কবে ফুরোবে কে বলতে পারে?

প্রভাতের চোখের উপর অশ্রু তার হাত রাখে।

—এ চোখে জল নেই, না, জ্বালাও নেই। প্রভাত বলে—তুমি যে হাত রেখেছ, চোখে এখন শুধু স্বপ্ন—অসম্ভবের স্বপ্ন।

অশ্রুর ইচ্ছে হয় বলতে—আমাকে নিয়ে চলো তোমার বাড়ি, তোমাদের জন্যে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিয়ে আসি। মা'র সেবা করি—একটু বা তোমার।

বলতে পারে না।

প্রভাতের বলতে ইচ্ছে হয়—আমাদের ঘর পচা নোংরা বুড়ো, তবু তুমি সেখানে গিয়ে পা রাখবে? কেনই বা রাখবে? কিন্তু যদি রাখো—লক্ষ্মীর 'পাড়া' পড়বে, তোমার এই কল্যাণদৃষ্টি এই স্নেহস্পর্শ এই অমলিন সান্নিধ্য পেয়ে আমি আমার সমস্ত দারিদ্র্য ভুলতে পারব। কিন্তু তুমি—তোমার সন্তোষ কোথায়?—ছিঃ, আমি একটা কী! অধমাধম কেরানী—এম-এ-টা পর্যন্ত পাশ করতে পারিনি।

পারে না বলতে।

অশ্রু প্রভাতের ঘাড়ের তলা থেকে বালিশটা সরিয়ে ওর মাথাটা নিজের প্রসারিত কোলের উপর টেনে নেয়। প্রভাত তার অস্থিরতাকে প্রাণপণে শান্ত করে রাখে। অশ্রুর কোমল ও উত্তপ্ত বুকের আভাসের ছায়া তার মুখের উপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় তবু সে উদ্বেল হয় না। শক্ত সংযমের মধ্যে সমস্ত আবেগকে ধরে রাখে।

প্রভাতের দীর্ঘ দৃঢ় শরীরের প্রতি মায়ায় অশ্রুর ঘুমন্ত যৌবন ময়ূরের মতো সর্বাঙ্গে পেখম মেলে ধরে।

অশ্রু বলে—একটা বাইক কিনে নিলে তোমার খুব সুবিধে হবে। আমি টাকা দেব, মনোমত দেখে একটা কিনে নিও। কি, মোটর-বাইক কিনবে? সঙ্গে সাইড-কার?

দুই চোখে রহস্যময় ইঙ্গিত—অথচ স্নেহে কী নম্র!

অশ্রু আদরে উচ্ছল হয়ে নিজেই নুয়ে পড়ে বুকটা ওর মুখের উপর চেপে ধরে, বলে—এবার থেকে একদিনও হেঁটে আপিস যেতে পাবে না, যদ্দিন না বাইক হয়।

ট্রামে করে যেতে হবে। বাড়িতে একটা ঠাকুর রাখো সম্প্রতি, সে-ই রাঁধুক —ঝি কি চাকর যা সুবিধে হয়, একটা রাখো। বুঝলে? সব আমি দেব।

প্রভাত চোখ তুলে বলে—তুমি পাগল হয়ে গেছ নাকি? পাগলি!

—পাগলি মানে? আমার বাক্সে যে কতগুলো টাকা পড়ে আছে তা দিয়ে কী হবে শুনি? আর শোনো, এবার থেকে আপিসেই টিফিনের বন্দোবস্ত কোরো—পেট ভরে যেন—শরীর নিয়ে গাফিলতি কোরো না। আমি না হয় পাগলি, কিন্তু তুমি লক্ষীটি হয়ে আমার কথা শুনো—কেমন?

কোলের থেকে ধীরে ধীরে প্রভাতের মুখ তুলে একটু কী ভেবে বালিশের ওপর রেখে অশ্রু উঠে দাঁড়ায়। আলমারি খুলে কতগুলি আনকোরা জামা বের করে বলে—তোমার জন্যে এই দুটো পাঞ্জাবি করেছি· সেদিন ভিজে এসে যে জামাটা ছেড়ে গেছলে সেটার মাপে। আর এই কটা রুমাল। খবরদার, তুমি কিন্তু একটুও আপত্তি করতে পারবে না— ধোপাবাড়ি থেকে কাচিয়ে এনে গায়ে দিয়ে একদিন আসতে হবে কিন্তু—তোমার নেমন্তন্ন রইল।

সমস্তগুলি জামা ও রুমাল পরিপাটি করে ভাঁজ করে একটা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ায়, পরে একটা লাল সুতো দিয়ে বাঁধে, বাড়তি সুতোটা দাঁত দিয়ে কাটে, থুতিয়ে মেঝের উপর ফেলে দেয়।

এগুলি অশ্রু বসে বসে ওর জন্যেই তৈরি করেছে, ওকে স্মরণ করে—মুগ্ধ হয়ে প্রভাত তাই ভাবে—আর কে জানে কেন ওর ছোট বোন দুটির কথা মনে পড়ে যায়।

প্রত্যেকটি জামা ও রুমালের কোণে প্রভাত ও অশ্রুর ইংরিজি আদ্যাক্ষর দুটি একত্রে গাঁথা আছে—প্রভাতের চোখে তা এখনো পড়েনি। তবু মুখ ফুটে বলতে পারে না অশ্রু।

তুমি বলতে পারবে না—ভাষার বদলে বিধাতা মানুষকে এ অভিশাপ দিয়েছেন। বিধাতাও বলতে পারেননি।

অশ্রু স্টোভ ধরায়। নিমকি ভাজে। বলে—আমার পাশে এসে বোসো।

প্রভাত ওর কাছে বসে বলে—ভাবতেই পাচ্ছি না তুমি রাঁধছ আর আমি তোমার কাছটিতে বসে আছি।

— আর কার জন্যেই বা রাঁধছি?

—আমার জন্যে।

অস্ফুট দুটি কথা, কিন্তু সম্পূর্ণ বলা হলো না। জীবনের আসল রান্না কার জন্যে রাঁধবে?

দুজনে একসঙ্গে চা খায়। নিমকি আবার পরস্পরকে খাইয়েও দেয়। আঙুলগুলো

তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে অশ্রু একটু হাসে—নিমকির সঙ্গে আরো কী যেন সে দিয়ে দিচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পেরেছে!

—কী দস্যি, আঙুল কামড়ে দিয়েছে! নিজেই আবার চোখ পাকিয়ে নালিশ জানায়।

—কই দেখি। হাত ধরবার জন্যে প্রভাত হাত বাড়ায়। বলে—দাও, ওষুধ লাগিয়ে দিই।

—বিষের ওষুধ বলে বিষই আবার দেবে তো? শব্দ করে হেসে ওঠে অশ্রু।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

যেমন একসময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয় তেমনি আবার এক সময় বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়।

যাবার সময় অশ্রু বললে দয়া করে এই দশটা টাকা নিয়ে যাও—

প্রভাত দু হাত সরে গিয়ে বললে—তুমি কি বুদ্ধিশুদ্ধি খুইয়ে ফেললে নাকি?

অশ্রু তেমনি সহজ সুরে বললে—মোটেই না। তোমার কষ্টের সময় বন্ধুর থেকে নিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করা উচিত নয়। আমি যে তোমার বন্ধু—সখী।

—আমার যে টাকার কষ্ট তা তুমি কি করে বুঝলে?

—সে বোঝার অন্তর্দৃষ্টি আমার আছে।

—অন্তর্দৃষ্টিতে শুধু এইটুকু বুঝলে? গভীর করে তাকায় প্রভাত।

—হ্যাঁ, অন্তত এটুকু বুঝি যে তোমার অন্তর্দৃষ্টিই অল্প। সুন্দর করে কটাক্ষ করে অশ্রু—নাও, এসো এগিয়ে, পকেটে ফেলে দিচ্ছি। যে ক'দিন যায়। এসো—

—ধার দিচ্ছ? প্রভাত হঠাৎ কী রকম গম্ভীর হয়ে যায়।—ধার তো আমি চাইনি।

—আমি কোনো জিনিসই ধার দিতে শিখিনি। আমার ব্যবসাদারি বুদ্ধি অত ধারালো নয়। অশ্রুকেও কেমন একটু বাঁকা শোনায়।

—তবে ভিক্ষা?

—ছিঃ, কী যে বলো যা-তা। এসো, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, তোমার মাথায় একটা রুমাল বেঁধে দিই। নাও, দুষ্টুমি কোরো না। আপিসে টিফিনের একটা ব্যবস্থা করে ফেলো। পরে আর দু-চার দিনের মধ্যে—এ কি, যাচ্ছ যে?

প্রভাত ফিরে না তাকিয়েই বলে—তোমার কাছে অর্থ ভিক্ষা করতে আসিনি।

অশ্রুর দু চোখ ব্যথায় করুণ হয়ে আসে—তোমাকে অপমান করলাম বুঝি? বা রে, আমি বুঝি তোমার পর? আমার কাছ থেকে বুঝি নেওয়া যায় না?

শেষের কথাটা যেন অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে স্পর্শ করে। প্রভাতের পা চলতে চায় না। কতদূর গিয়েই ফের ফিরে আসে।

অশ্রু সেই বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে আছে, বালিশের ওপর চুলগুলো এলো করে দেওয়া—সেমিজের ধারে খোলা খানিকটা পিঠ—সারা মেঝেয় নোটটা টুকরো করে ছেঁড়া।

খোলা পিঠের উপর হাত রাখে প্রভাত। বলে—ওঠো, এবার যে তুমি দুষ্টুমি করছ। সত্যি সত্যিই, পকেটে একটাও পয়সা নেই—কি করে যাব তবে? হেঁটে? সে যে অনেকদূর। ওঠো।

তারপর অশ্রুর হাত ধরে সস্নেহে আকর্ষণ করতে চায়। আরো কিছু বলতে চায় হয়তো। অশ্রু পাথর হয়ে থাকে। তাকে বুঝি টলানো যায় না।

এতক্ষণ কাঁদেনি—অশ্রু এবার কাঁদে। কেন দু হাত বাড়িয়ে টেনে তুলে নিতে পারে না? সংসারে অর্থই কি একমাত্র শক্তি—পুরুষত্ব শক্তি নয়?

ঐশ্বর্যই সব, মাধুর্য কিছু নয়?

খানিকক্ষণ সেই কান্না দেখে মেঝের থেকে নোটের কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে প্রভাত চলে যায়। পায়ে হেঁটেই।

চোখের জলেই বুঝি তৃপ্তির সমুদ্র।

কিন্তু উপায় কী অশ্রুকে না কাঁদিয়ে? পুরুষত্বের চেয়েও কি মনুষ্যত্ব বড়ো নয়?

অশ্রুর বাবার সঙ্গে প্রভাতের আলাপ সেই প্রথম—যেদিন সবাই নীরেনকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে জড়ো হয়েছিল। তেজী টগবগে ঘোড়ার মতো নীরেন, প্রভাতের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—চললাম ভাই, তোমার চেনাশোনা সবাইকে আমার কথা বোলো—গুরুজনদের প্রণাম দিও, চিঠি লিখলে জবাব দিতে ভুলো না।

একটা গরীব কেরানী, মইয়ের একেবারে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য একটা আপিসে রোখো চাকরি—কিছুই বলবার মতো নয়। প্রভাতকে দেখে অশ্রুর বাবা দস্তুরমতো বিরক্তই হলেন। প্রথম দর্শনে লোকের প্রতি মানুষের ঘৃণাও হয়!

তা দেখতেও যদি ভালো হতো। কালো ঢ্যাঙা রুক্ষ টান-টান চেহারা। কেমন একটা বন্য অনার্যতা। এ কি সুবাদে তাঁর ছেলে-মেয়ের বন্ধু হয়?

গাড়িতে উঠে অশ্রু বলে—আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন না প্রভাতবাবু, আপনাকে একেবারে নামিয়ে দিয়ে যাব।

বাবা গম্ভীর মুখে বলেন—তাহলে আমার দেরি হয়ে যাবে। বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলেন।

অশ্রু নীরবে শুধু একটু হাসে। সেই হাসিটুকু সম্বল করেই একা-একা চলে যায় প্রভাত।

আগুন দুপুরটা সুরে-ভরা মোহময়। কিন্তু বারটা যে রবিবার সেটা বুঝি প্রভাতের খেয়াল নেই।

খাটে বসে অশ্রু খোলা চুলে বই পড়ছে আর মুখোমুখি চেয়ারে বসে প্রভাত তাকে দেখছে বিভোর হয়ে। যেমন অমাবস্যা রাত্রির আকাশ দেখে, নিবিড়শ্যাম অরণ্য দেখে। আর চকোর যেমন মেঘকে বলে সরে যাও, চাঁদের আভাসটুকু অন্তত দেখি, তেমনি ওর দুই চোখ অশ্রুর গায়ের আঁচলকে বলছে, দয়া করে একটু অসতর্ক হয়ে খসে পড়ো।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে যায়।

যিনি দোর ঠেলে সবলে ঢোকেন তিনি অশ্রুর জেঠতুতো বড়দা—পত্নী-বিয়োগের পর থেকে ব্রহ্মচারী আছেন বলে যাঁর গর্ব।

—কী করছিস? কেউটের চোখে তাকিয়ে জিগগেস করেন অশ্রুকে।

—পড়ছি।

অশ্রু যে আসলে পড়ছে না, শুধু ভালো দেখাবার জন্যেই বইটা খুলে রেখেছে তা বুঝে নিতে ব্রহ্মচারীর দেরি হলো না।

—তুই পড়ছিস তো উনি কী করছেন?

—উনি শুনছেন।

—যখন ঘরে ঢুকি তখন তো কই শব্দ করে পড়া শুনিনি।

—তখন একটু থেমে ছিলাম—

-- বেশ, পড়, আমিও শুনি। ব্রহ্মচারী আরেকটা চেয়ারে বসে পড়ে।

অশ্রু খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।—ইচ্ছে হয় তুমি পড়ো।

ব্রহ্মচারী বইটা নেড়েচেড়ে দেখল সেটা একটা বিলিতি উপন্যাস, তখুনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে -বেশ, আমিই পড়ব, আমার ঘর থেকে বাঁধানো গীতাখানি নিয়ে আয়—

অশ্রু বলে—সে বই তো কবে তোমার খোকার দুধ গরম করতে আগুনে বিসর্জন দিয়েছি। বলে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

অশ্রুর বাবা যখন ব্যবসার খাতিরে বাইরে যান তখন এই ব্রহ্মচারী দাদাই শাসনের চাবুকটা তুলে নেন হাতে। বাবা হলে শুধু লাগাম টানেন, ব্রহ্মচারী আবার সেই সঙ্গে চাবুকও হাঁকড়ান।

প্রভাত সেদিন বাড়ি ফিরে এসে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ওর ঘুমন্ত অন্ধ

ভাইটিকে দেখতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো—ওরও চোখ যেন ক্ষয় হয়ে গেছে, ও আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না—যেন পৃথিবী হঠাৎ অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকার মতো ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে গেছে—তার মনিহারি দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেছে, চিচিমের গুহা আর খুলবে না কোনোদিন।

হেঁটেই আপিস যায়, হেঁটেই ফেরে—দু-এক বেলা নিজের হাতে রাঁধেও, বাবার গা-হাত-পা টিপে দেয়, বাজার-দর নিয়ে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে।

মা বলেন—কবে মরণ হবে ?

প্রভাতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—আমার মরণ দেখেই যেন হয়।

এক এক দিন অশ্রুদের গলিটাও মাড়িয়ে আসে—এমনি বেড়াতে-বেড়াতে।

খাঁচার পাখি অশ্রু—বাঙালী গৃহস্থের মেয়ে যেমন হতে হয়। সোনালী লতার মতো বাড়তেই পেয়েছে—এই যা, নইলে না আছে বিদ্রোহ, না আছে ফল-ফলানো। কাঁচের বাসনের মতো ঠুনকো, শুধু একটু উষ্ণ চা খাওয়ার জন্যে। চুপ করে বসে খালি জামা সেলাই করে নানা রঙের ছিটের, তসরের, কত কী, কবে দেবে এবং দেবেই বা কিনা তাই ভাবে, আর বিয়ের যে সম্বন্ধগুলি আসে কে জানে মনে মনে তার সঙ্গে মেলায়।

শোবার আগে ঈশ্বরকে ডাকে—ও যেন ভালো থাকে, ওর সুন্দর শরীর যেন সুন্দর থাকে, ওকে আর কষ্ট দিও না, ওকে একটা ভালো কাজ পাইয়ে দাও। নয় তো যদি পারে আমাকে যেন ভুলে যায়, আমি বড়লোকের মেয়ে বলে আমাকে যেন ঘৃণা করে।

জানলায় বসে দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে—বহুদূর পর্যন্ত ওর অম্লান শুভেচ্ছাটি পাঠিয়ে দেয়। রাতে শুয়ে ভাবে পাশে বুঝি এসে শুয়েছে, সেই দীর্ঘচ্ছন্দ ঋজু দেহ নিয়ে, আপন মনে চঞ্চল-চপল আদর করে, তেমনি বুকের মধ্যে মুখটা চেপে ধরে, কপালের ঘাম আঁচল দিয়ে মুছে দেয়।

হঠাৎ ব্রহ্মচারী বড়দা একদিন বিয়ের জন্যে ক্ষেপে ওঠেন। যেন ক্ষেপে ওঠাই স্বাভাবিক। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে—জোয়ারের উলটো টানে একা আর গুণ টানা হয়ে উঠবে না।

টাট্টু ঘোড়ার মতো বউ, টগবগ করে ফেরে। মঠবাসিনীর বিলিতি সংস্করণ বুঝি !

চিঠি লিখে একটি ছেলেকে দিয়ে অশ্রু প্রভাতের কাছে পাঠাল।

তুমি একটিবার এসো। লক্ষীটি এসো। কতদিন তোমাকে দেখিনি। আমার প্রার্থনায় ভালো আছ নিশ্চয়ই আর আমার প্রার্থনা সত্ত্বেও আশা করি আমাকে একেবারে ভোলোনি। একবারও দেখতে ইচ্ছে করে না, অন্তত দেখা দিতে ? এসো, অনেক কথা আছে। বড়দা তো উদার হয়ে নিজে গিয়েই তোমাকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন। তবে আর ভাবনা কী ? এসো কি ।

ইতি-তে শুধু অশ্রু লেখা নয়— তোমার অশ্রুমতী।

বড়দা যে কেন তাকে নেমন্তন্ন করল কে বলবে। নতুন বিয়ের খুশিতে মনে বুঝি বদান্যতা জেগেছে, কিন্তু কে জানে হয়তো বা অশ্রুর প্ররোচনায়। অশ্রুই বা কেন তাকে আহ্বান করবে ? তার অক্ষমতা তার অপদার্থতা কি প্রমাণের আরো অপেক্ষা রাখে ?

প্রভাত তবু গেল—একটু বেশি রাত করেই। দু-চারজন চেনা লোকের সঙ্গে দু-চারটে মামুলি কথা-টথাও কইল, খেল, বাজে ক'টা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেও কুণ্ঠিত হলো না।

অশ্রু চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে - কত কাজ ওর, সবখানেই ওকে দরকার। কী সুন্দর সেজেছে—বহুদিনকার আগের সেই চেনা দেহলতা আজ যেন নতুন রহস্যে ঢেকে এসেছে। নতুন করে ফের যেন চেনাতে চায়--যতই চিনবে ততই যেন নতুন হবে। ছিঁড়ে কেড়ে উড়িয়ে দিয়ে সব একেবারে শেষ করে দেওয়া যায় না ? লোভ শেষ করে দেয়, ভালোবাসা নতুন করে রাখে। রতির শেষ আছে, আরতি অন্তহীন।

মুখে কেমন সুন্দর ঔদাসীন্যের ভাব—প্রভাতকে দেখেও একটু কৌতূহল নেই, জিজ্ঞাসা নেই—এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ওর চোখে চোখ ফেলবারও যেন সময় নেই। ও যেন কে—ওকে অশ্রু যেন কোনোদিন দেখেছে বলেও মনে করতে পারছে না।

এসো, অনেক কথা আছে। সে কথা কখন কইবে ? জেগে না ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ? কোন সে বিস্ময়ের জাগরণ, কোন সে বিস্মৃতির ঘুম ?

অনেক কথা আছে– তারায় ভরা কালো আকাশটারও যেন সেই কথা।

নীচের তলায় কোণের দিকে একটা নিরিবিলি ঘরে নোয়ানো চেয়ার টেনে প্রভাত গা এলিয়ে বসে পড়ে। না, সে প্রতীক্ষা করে যাবে। এক সময় অশ্রু ঠিক তাকে খুঁজতে আসবে—তাকে না জানিয়ে প্রভাতের চলে যাওয়া অসম্ভব। খুঁজতে এসে ঠিক তাকে এই কোণের ঘরে আবিষ্কার করবে। তারপর এক মুহূর্তে একটি অপরূপ পরিচয় সংঘটিত হবে। দেবতারা দেখবার জন্যে চক্ষু মেলে থাকবেন।

বসে থাকতে থাকতে প্রভাত বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল।

বরবধুর ফুলশয্যা আজ—মুখর উৎসব সমাপ্ত হয়ে গেছে শুধু একটি কক্ষ ছাড়া—সে কক্ষ নিশ্চয়ই এখন আর ব্রহ্মচারীর নয়। সে কক্ষ কবির।

প্রকাণ্ড বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে অশ্রু সেই নীচের ঘরে এল। এসেই মুগ্ধ হয়ে গেল—দুই চোখে জল ডেকে এল। কী সুন্দর ঐ ঘুমটুকু! ইচ্ছে করল এক চুমুকে ঐ ঘুমটুকু ও পান করে ফেলে—এক চুমুকে এবারের এই জীবন।

অশ্রু প্রভাতের কাছে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে মনে হলো সে বুঝি নিজেও আর জেগে নেই। আস্তে প্রভাতের কপালে ডান হাতখানি রাখল, জামার বোতামগুলি খুলে আস্তে বুকের ওপর। রাখতেই তার সমস্ত দেহ সেতারের মতো ঝঙ্কার করে উঠল। মনে হল এই ক্ষণিক একটু স্পর্শেই ও যেন ওর আলাদা অস্তিত্বের কথা ভুলে যেতে বসেছে।

তারপর প্রভাতের একখানি হাত সে নিজেই তুলে নিল, রাখল নিজের গালে, গলার নীচে, বুকের কাছে। তারপর কী জানি কেন, পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসল।

অথচ জাগাতে পারল না।

—যাই একটা বিছানা নিয়ে আসি। অশ্রু বিছানা আনতে চলে গেল উপরে।

ফিরে এসে দেখল, প্রভাত ঘরে নেই, উঠে চলে গেছে।

ঘুম ভাঙাতে পেরেছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু জাগাতে পারেনি।

কিন্তু যে জেগে উঠবে সে তো জানে সে কত বড়ো ছন্নছাড়া। যোগ্যতার বাজারে যুক্তির মাপকাঠিতে তার দাম তো ফুটো পয়সারও কম। তবু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যুক্তি মানে না কেন? কোন নিয়মে প্রাণের আকাঙ্ক্ষাই যোগ্যতার বরাসন অধিকার করে বসে?

শুধু চাই—এই প্রাবল্যেই কি পাওয়া চলে? যদি ওপক্ষও চায় তবে আর বাধা কিসের, কোন সমাজনীতি, কোন অর্থনীতি?

এ তো শুধু চাওয়া নয়, এ যে আবার টিঁকিয়ে রাখা। ভালোবাসাকে ঢেলে দিয়ে বিয়েতে স্থায়ী করা।

হায়, ঢেলে দিলেই বুঝি সেটা আর ভালোবাসা থাকল!

ওপক্ষে যে ওটা ভালোবাসা সেটা তুমি বুঝছ কী করে? হয়তো বা সেটা আলেয়ার আলো—ছলনার শিখা।

যেমন ছলনার শিখা ঐ দোরের পাশে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটি। সুন্দরী না হোক, সেজেছে তো সুন্দর করে। কৃশ দেহলতা ঘিরে সেই সুচারুতা, প্রতীক্ষারত

ভঙ্গিটা বিরহবেদনার তুলি দিয়ে আঁকা। সব চেয়ে আশ্চর্য, তার পাতলা শাড়ির নীচে গোলাপী সেমিজের আভাস।

প্রভাত তার ঘরে চলে আসে। সেই তেমনি বিছানা পাতা। পরিশ্রান্ত জীর্ণ শরীর বিছানায় ঢেলে দিয়ে প্রভাত খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে। মেয়েটি শিয়রে না ব'সে পায়ের কাছে বসে। কতদিন অশ্রুর পা দু'খানি দেখেনি, দেখেনি চোখদুটি, শোনেনি মুখের কথা, পায়নি হাতের ছোঁয়া।

প্রভাত মেয়েটিকে বলে কাছে সরে এসো।

মেয়েটি উৎসাহিত হয়ে কাছে ঘন হয়ে আসে।

তার শুকনো বিবর্ণ হাত প্রভাত টেনে এনে কপালে রাখে, জামার বোতাম খুলে বুকের উপর—কই, এতটুকুও তো আগুন লাগে না।

মেয়েটি একফাঁকে উঠে দেয়ালগিরির আলোটা কমিয়ে দিয়ে এসে ফের বসে। এবার ঘনতর হয়ে। প্রভাতের দেহ ঘৃণায় কিলবিল করে ওঠে। সরে গিয়ে বলে—আলোটা বাড়িয়ে দাও, ঐ আলোই তোমার অবগুণ্ঠন।

মেয়েটির সময়ের দাম আছে, তাই বিরক্ত হয়ে হাত পাতে টাকা চায়।

এখানেও টাকা!

কত কষ্টের টাকা—তাই অকাতরে প্রভাত দিয়ে দেয় মেয়েটাকে।

—এ কি, তুমি চলে যাচ্ছ কেন?

—যাতে আবার আরেকদিন আসতে পারি।

—তা এসো না আরেকদিন। আজ কি দোষ হলো?

—তুমি তো আমার বউ নও, তুমি আমার বন্ধু, আমার সখী—

—তাহলে টাকা দিচ্ছ কেন? টাকা ফেরত নিয়ে যাও। মেয়েটি তার আঁচলের গ্রন্থিটা খুলে ফেলে।

—না, না, তোমার যে বড্ড অভাব—তোমার ল্যাম্পে তেল নেই, পলতেটা দপদপ করছে।

প্রায় ছুটে রাস্তায় নেমে পড়ে প্রভাত। বাড়িতে এসে দেখে—একটি ছেলে তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

—কে?

—আমি তিনু, অশ্রুদির ভাই।

—কী মনে করে?

—আপনার একটা চিঠি আছে।

আলোর সামনে ধরে এক নিশ্বাসে ছোট্ট চিঠিটা পড়ে ফেলে প্রভাত।

—বাইরে তোমাকে খুঁজে না বেরিয়ে নিজের মধ্যে তোমাকে দেখছি। তোমার শরীর ভালো নেই, তুমি খুব কষ্টে আছ, এই কেবল আমার মনে ডাক দিচ্ছে। তিনুর সঙ্গে দুটো লাইন লিখে পাঠিও। আশা করি এত তাড়াতাড়ি আমাকে ভুলে যাওনি। এই সঙ্গে তোমাকে একশোটা টাকা পাঠাচ্ছি—তুমি নিয়ো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—একটুও সঙ্কোচ কোরো না লক্ষ্মীটি। কেন নেবে না? আমি যে তোমার বন্ধু, বন্ধুর চেয়েও বেশি—পরমাত্মীয়। তোমার অভাব যদি কিছু পূরণ করতে না পারি তবে আমার টাকার তো কোনো দামই নেই। নিয়ো—এমনি করেই তো আমাকে নেওয়া। প্রণাম নিয়ো, সেই সঙ্গে অনন্ত ভালোবাসা। ইতি। তোমার অশ্রুমতী।

মুখে যা আসত না কলমে তাই এনেছে। আশায় যা নেই তাই রেখেছে ভালোবাসায়।

বছর পনেরোর ছেলে—তিনু পকেটের থেকে নোটের তাড়া বের করে প্রভাতের হাতে তুলে দিতে চায়।

প্রভাত গুটিয়ে গিয়ে বলে—ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। বোলো, আমি বেশ ভালোই আছি।

—কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে গেলে পথে পকেট কাটা যাবে বলে দিদি ভয় দেখিয়ে দিয়েছে। তিনু সরল চোখে হাসে।

—এত বড়ো পকেটমার থেকে যখন রেহাই পেলে তখন আর ভয় নেই।

—না, আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, যদি ফিরিয়ে আনিস তবে তুই একটা আস্ত বোকা।

—তুমি তো ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েই ভালো করে প্রমাণ করতে পারবে যে তুমি বোকা নও। দু দুবার ট্রামে যাওয়া-আসা করলে তোমার পকেট মার গেল না। কেউ ফিরিয়ে দেবার পর সে টাকা ফেলে দিয়ে গেলে কেউ বুদ্ধিমান বলে না। তুমি অশ্রুকে বোলো আমি বেশ স্বচ্ছন্দেই আছি—

—কিন্তু আপনার শরীর তো খুব খারাপ দেখাচ্ছে। আপনার মা বলছিলেন প্রায়ই জ্বর হয় আপনার।

—ও কিছু নয়। একটু সাবধানে থাকলেই সেরে যাবে।

—কিন্তু—দু চোখে যেন অশ্রুরই করুণা আর স্নেহ নিয়ে তাকায় ছেলেটি।

প্রভাত তিনুকে রাস্তায় অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়—নানান খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে—সমস্ত দিন দিদি কী করে—কলেজ কি এখনো চলছে? না কি বিয়ের তোড়-জোড় হচ্ছে? বাইরে বেরোয় না কখনো?

— আপনি যান না কেন?

- আদার বেপারী কি জাহাজের খোঁজে যেতে পারে? আমি যে যাই তোমাদের বাড়ির লোক পছন্দ করে না।

—কিন্তু দিদি তো করে।

— সে আর কতদিন! আস্তে-আস্তে অন্যরকম হয়ে যাবে।

—আপনি যদি বলেন আমি দিদির সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দিতে পারি।

প্রভাত নিজেকেই অনুকম্পা করে হাসল। শেষকালে কিনা এই একরত্তি ছেলেটার কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে! রাস্তার খানিকদূর এগিয়ে দিতে-দিতে প্রভাত বললে, তুমি টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বোলো, প্রভাতদা তোমাকে ঢের-ঢের ধন্যবাদ জানিয়েছেন - এই টাকাটা যেন রেখে দেন, প্রভাতদা মরে গেলে তা দিয়ে তার চিতায় যেন একটা ছোট্ট স্মৃতিচিহ্ন রাখেন—কিংবা আর কোনো সুযোগ্য বন্ধুকে উপহার দিয়ে দেন। বলতে পারবে? পারবে না?

তিনু উত্তর দেয় - না। ও সব বুঝি কেউ কাউকে বলে?

যে কথাটা বলবার, যেটা মর্মের কথা, তাও তো বলা যায় না। সেটা হচ্ছে এই -- তুমি এমনি করে বারে-বারে আমার অপদার্থতাকে প্রমাণিত কোরো না। তুমি যদি আমার বউ হতে, তবে অপদার্থ স্বামী হয়েও আমি তোমার থেকে সামান্য টাকা-পয়সা কি, ধুলো-বালিও স্বচ্ছন্দে নিতে পারতাম। কিন্তু আমার বন্ধুত্বটাকে ছোট করে দিও না। নিষ্কিঞ্চন হয়েও তো মহামহিমান্বিত বন্ধু হতে পারি। যার টাকা নেই, তার কি আর কিছুই নেই, কিছুই থাকতে পারে না? যার টাকা নেই তার কি থাকতে পারে না ভালোবাসার ভাণ্ডার? কুবেরের ভাণ্ডারের চেয়েও যা বেশি?

তুমি যদি আমার বউ হতে—এমন অসমসাহসিক কথাও ভাবা যায়?

তুমি যদি আমার বন্ধু থাকো — এ বুঝি তারও চেয়ে দুঃসাহসিক। বিয়ে বড়ো জিনিস হতে পারে, কিন্তু বন্ধুতা বুঝি তারও চেয়ে বড়ো।

হ্যাঁ, বন্ধুতা—স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতা – একসঙ্গে সংসার না করেও বন্ধুতা। সজ্ঞান, সক্রিয়, সংযত বন্ধুতা।

বিয়ে করে উদয়াস্ত একসঙ্গে থেকে তো পরস্পরকে ক্ষয় করে ফেলা। অবারিত সান্নিধ্যই তো অনাদরের হেতু। অভ্যাস থেকেই শৈথিল্য, বিমুখতা। রক্তের মধ্যে জরার প্রবেশ। আর এই বন্ধুতায় জরা নেই, বার্ধক্য নেই, নেই ক্ষয়-ভয়। আকাঙ্ক্ষা সব সময়েই অনির্বাণ। পুরুষ সব সময়েই দৃঢ়কায়, স্ত্রী সব সময়েই স্থিরশ্রী। রক্তের মধ্যে যন্ত্রণার চিরন্তন আনন্দ

বন্ধুতা তো সহস্থিতি কই? থেকে-থেকে থেমে-থেমে এক-আধবার দেখা হবে

তো ? যে পলতের মুখে আগুন জ্বলছে সেটাকে মাঝে-মাঝে উসকে না দিলে চলবে কেন ? কী করে আশ্বস্ত হবে যে প্রদীপের মাঝে স্নেহতেল তেমনি সঞ্চিত আছে ?

বছর ঘুরে যায়—দিনের পর রাত পোহায়—আর দেখা নেই, চিঠি নেই, কিছু নেই।

তিমুও একবার আসে না পথ ভুলে।

কিন্তু মন বলে, এ বস্তুর আর বিকল্প নেই। যে ভালোবাসা অন্তরে একবার দেখা দিয়েছে সে আর উৎখাত হবে না। কী তার আশ্চর্য শক্তি, দৃঢ়প্রোথিত হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবে। যতই গাছগাছালি বসাও না কেন, সেই বনস্পতিকে আড়াল করতে পারবে না।

কিন্তু এ কী অভাবনীয় !

অশ্রুর বিয়ের নিমন্ত্রণ-চিঠি এসে হাজির। শুধু ডাকে আসেনি— অশ্রুর সেই ব্রহ্মচারী বড়দা—আর ব্রহ্মচারী নন, এখন কর্মচারী—নিজেই একখানা বয়ে নিয়ে এসেছেন।

—মেয়ে কিছুতেই বিয়ে করবে না—পাঁচ কাহন নিজেই বলতে লাগলেন বড়দা—কিন্তু জিগগেস করি, করবিটা কী ? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস তখন বিয়ে করা ছাড়া তোর আর কী করবার আছে ? মেয়ের কিছুতেই মন ওঠে না, কোনো পাত্রই পছন্দ হয় না। মেয়ে বড় হয়েছে, জোর জবরদস্তি করে তো আর গছিয়ে দেওয়া যায় না। শেষকালে আমরা বললাম, বেশ তো, তোর যদি কোনো লাভার-টাভার থাকে, বল, তার সঙ্গেই লাগিয়ে দি। তখনো মেয়ে চুপ, ঘাড় নেড়ে বললে, নেই তেমন কেউ। কিন্তু কতদিন আর ঘাড় বাঁকা করে থাকবে—বয়সের একটা ধর্ম আছে তো ? তারপর এমন পাত্র !

দুর্বল রেখায় সম্মতির হাসি হাসল প্রভাত।—তা তো ঠিকই !

পাত্রের কথা না শুনেই ঠিকই বলছ কী ! এ তো শুধু বর নয়, বিধাতার বর। বড়দা আবার পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন বি-সি-এস ছেলে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কদিন পরেই মহকুমা, তারপর একেবারে জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিস্তর মাইনে, প্রতাপ-প্রতিপত্তি—আরাম, সুখ, তৃপ্তি। মেয়ে এবার লাফিয়ে উঠল—নেচে নয়, লাফিয়ে উঠল—আর 'না' করবার দুর্বুদ্ধি করল না। এই আসছে রবিবার বিয়ে—তোমার তো ছুটি, যেতে অসুবিধে হবে না। যেয়ো, দেখে এসো—

— কোনো লাভার-টাভার আছে কিনা। বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল প্রভাত।

—ও সব ছেলেমানষি প্রেম জলবসন্তের মতো। কোনোই দাগ রাখে না। যদি

বড়মানষি প্রেমও হয় বড়জোর দিন দুয়েকের দশ্মানি—বিয়ের পর একটা সন্তান জন্ম হওয়ার পরেই ঠাণ্ডা—ব্যস, খতম।

রবিবারের দুপুর বাড়িতে বসেই কাটাচ্ছে প্রভাত। এখন বিকেল হয়ে এল।

ভাবছে যাবে কিনা বিয়েতে। একবার কৃত্রিম সাজে দেখে আসবে কিনা অশ্রুকে। কেমন রঙ মেখেছে, গয়না চড়িয়েছে, শুভদৃষ্টির জন্যে চোখে কেমন এনেছে কৌতুহল। আবার ভাবছে যে আটপৌরে সাজে রয়েছে তার মনশ্চক্ষে, তাই অক্ষয় হয়ে থাক। পুতুল ভেঙে যাচ্ছে তো যাক, প্রতিমাকে নষ্ট করি কেন?

আশ্চর্য, কানাকড়ির সামর্থ্য নেই, পর্বতপ্রমাণ অভিমান আছে। একবেলার ভালোবাসাকেই মনে করছে একজন্মের ভালোবাসা। একটি মৃদু উষ্ণ ঘন স্পর্শকেই মনে করছে নগ্ননিতল সমুদ্রের অবগাহন।

আকাশ ধূসর হয়ে এল প্রভাত উঠি-উঠি করছে—দরজা ঠেলে ভিতরে কে ঢুকল।

—কে? প্রায় ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল প্রভাত।

আগন্তুক ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

—এ কি, তুমি? অশ্রু? মূঢ়স্বরে উচ্চারণ করল প্রভাত।

—হ্যাঁ, ছুঁয়ে দেখ—আমি, ভূত নই। অশ্রু তক্তপোশের ধারে এসে প্রভাতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

—তোমার আজ বিয়ে না?

—বিয়েই তো।

—হয়ে গেছে?

—এখনো তো দিনের আলো ফুরিয়ে যায়নি। দিন থাকতে কখনো বিয়ে হয়?

—তাহলে পরে হবে। প্রভাতের গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠল।

—হবে কি গো, হচ্ছে—এই তো হচ্ছে।

—হচ্ছে? সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল প্রভাত।

প্রভাতের দু কাঁধের উপর দুটি হাত অশ্রু মালার মতো করে রাখল। বললে—এবার তবে মালা বদল করো।

প্রভাত দুর্ধর্ষ দুই বাহুতে অশ্রুকে তার বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে—এই মালা বদল, হৃদয় বদল, এই মুখচন্দ্রিকা—

আলিঙ্গন থেকে ফের বেরিয়ে এল অশ্রু।—আমি এবার চলে যাব।

—চলে যাবে?

তবে কি প্রভাত আশা করছে অশ্রু এই বাড়িতে আস্তানা নেবে? এই ভাঙা

থুখ্‌রো স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে? এই অল্প মাইনের ঘর-বারান্দায়? এই বিবর্ণ পরিবেশে? শরীরের শক্তিই তো আর জীবনের স্বাস্থ্য নয়। এইখানে বসে সে তার উজ্জ্বল অস্তিত্বে মর্চে পড়তে দেবে? আর সেটাই কি হবে প্রভাতের স্বপ্নের অনুবাদ? চলে যাবে না তো কী, নিশ্চয়ই চলে যাবে।

কিন্তু অশ্রু বললে অন্য কথা। বললে - আমি পালিয়ে এসেছি।

—কোথায়? আবার একটা অবাস্তর প্রশ্ন করল প্রভাত। নিশ্চয়ই তার কাছে নয়। তার কাছে এলে প্রভাত তাকে আটকে রাখছে না কেন? কেন যেতে দিচ্ছে? বিয়ে হয়ে যাবার পরেও তার অধিকার খাটাচ্ছে না কেন? না, সেই তো যেতে দিচ্ছে, ছেড়ে দিচ্ছে। সে জানে এই ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেই ভালোবাসা। অনেক কিছু বাকি রাখার মধ্যেই জীবনের সম্ভোগ।

—চলেছি জলপাইগুড়ি। অস্পষ্ট আলো সত্ত্বেও হাতঘড়ির দিকে তাকাল অশ্রু।

—সেখানে কী?

—চাকরি পেয়েছি। টিচারি। আজকের দার্জিলিং মেলেই পালাব। বাড়িতে কেউ জানে না।

— কেউ জানে না। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে কথাটা শুধু আওড়াল প্রভাত।

—শুধু তিনু জানে। তার হাত দিয়েই সুটকেস বেডিংটা পাচার করেছি · সে-ই ট্যাক্সি এনে দিয়েছে।

—ট্যাক্সি?

—হ্যাঁ, ট্যাক্সি নিয়ে সে তো রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছে। তাই বেশিক্ষণ দেরি করবার সময় নেই। বাড়িময় এতক্ষণ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে নিশ্চয়—সবাই হয়তো চারিদিকে বেরিয়ে পড়েছে খুঁজতে—যাই, পালাই—

—চলো তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিই—

খুব বীরত্ব দেখাল যা হোক। প্রভাত নিজেই নিজেকে টিটকিরি দিল। তিনু যা পারল তার ততটুকুও মুরোদ নেই।

অশ্রুই তাকে নিরস্ত করল। বললে—খুঁজতে লোক নিশ্চয়ই তোমার বাড়িতে আসবে, হয়তো এক্ষুনিই এসে পড়বে। তোমাকে তখন বাড়িতে না দেখলে সিদ্ধান্ত করবে তোমার সঙ্গেই পালিয়েছি। ওদেরকে তেমন কিছু আভাস দেওয়া ঠিক হবে না। শেষে স্টেশনে না ধাওয়া করে।

না, প্রভাত বাড়িতেই থাকবে। তার বাড়িতে খোঁজ করতে এসে লোক তাকে দেখে বুঝবে তার সাধ্য নেই যে অশ্রুকে নিয়ে পালাতে পারে। তার অকর্মণ্যতায় সকলে নিশ্চিন্ত হবে।

অশ্রু দরজার দিকে এগুলো।

—এখুনি যাবে ?

এ প্রশ্নটাও কাপুরুষের প্রশ্ন। কিন্তু তাকে যে যেতে দিচ্ছে ছেড়ে দিচ্ছে এটাও তো প্রেমেরই সংযম। নইলে কি ইচ্ছে করছে না অশ্রুর ঐ মুখ ঐ বুক, বসনান্তরালের সমগ্র দেহের প্রতি রোমকূপ অজস্র মদির চুম্বনে পাণ্ডু করে দিতে ?

—হ্যাঁ, যাই, ওদের স্টেশনে খোঁজ করতে আসার আগে অন্তত দার্জিলিং মেলটা বেরিয়ে যাক।

আর অশ্রুরই কি ইচ্ছে হচ্ছে না তার আগে অন্তত একবার রথের চাকার তলায় মাটির ঢেলার মতো নিজের অস্তিত্বটা প্রভাতের বিস্ফারিত বুকের নীচে গুঁড়ো করে ফেলে।

—চলো তোমাকে ট্যাক্সি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

তারো দরকার নেই। দেরি দেখে তিনু নিজেই ট্যাক্সি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

আর কালহরণ করা গেল না। উঠে পড়ল অশ্রু।

কিছু একটা বলতে হয় বলে প্রভাত বললে—ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখো কিন্তু।

ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল। কথাটা কেউ শুনল বলে মনে হলো না।

তিন বছর পরে ফের যবনিকা উঠলো। রঙ্গমঞ্চে একা প্রভাত।

প্রভাতের মাইনে এবার ন-এর কোঠায় পৌঁচেছে যা হোক, তেমনি বছর খানেক আগে বাবাও বাতের ব্যথায় খতম হয়েছেন। সংসারে মা আর প্রভাত; আর সেই দুঃখী অন্ধ ভাইটি,—ছোট হাত তুলে ঘরের দেয়াল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে মনুমেণ্টের স্বপ্ন দেখে। টিম্‌টাম্‌ করে সংসার চলে। প্রভাত সকালবেলা টিউশনি করে বাজার এনে দেয়; মা-ই রাঁধেন, —মা'র সঙ্গে-সঙ্গে প্রভাতও সকালবেলাটা নিরামিষ খায়। আপিস থেকে খেটেখুটে এসে ছোট ছাতে একটু পাইচারি করে, মা'র সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে একটু মনকষাকষি চলে, কোনোদিন বা মাঠে খেলা দেখে আসে। রাতে তোলা-উনুনে মা মাছ ভেজে স্নান করে বিছানায় নাটু-কে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। প্রভাত অনেক রাত করে শোয়—জেগে জেগে ততক্ষণ বই পড়ে; ভাবে, উপন্যাসের দু'এক পৃষ্ঠা লিখতে চেষ্টা করে, কাটাকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এবার একটি টুকটুকে বৌ নিয়ে এলে ভারি মানায় কিন্তু। প্রভাতের ঔদাসীন্যকে আর ক্ষমা করা যায় না।

মা কিছু বলতে এলে প্রভাত হেসে বলে,—দেখ মা, পুরুষমানুষের ল্যাঠা কম। কাছাটা নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হলো। পেগু থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত রাস্তা খোলা।

মা বলেন,—কিন্তু এই শূন্য পুরীতে মন আর টেঁকে না, খাঁ খাঁ করে। হাঁপিয়ে উঠছি।

প্রভাত সরাসরি বলে,—তবে তুমি দিদির কাছে দিন কয়েকের জন্যে জিরোও-গে। নাটু-কে অন্ধ-ইস্কুলে ভর্তি করে দি।

মা একটু রেগে বলেন—কিন্তু বিয়ে তুই করবি না কেন?

—বিয়ে কেন-ই বা যে করবো তারো কোনো ভালো কারণ তুমি দেখাতে পারবে না। যে-সব কথা তোমার জিভের গোড়ায় আসছে তা আমি জানি, মা। বড্ড বাজে ও সেকেলে। বিয়ে করছি এ-ব্যাপারের চেয়ে কাকে বিয়ে করছি এইটেই বড়ো কথা। তাকে পাওয়া যায় না, মা।

মা সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন,—কাকে?

প্রভাত হেসে বলে,—যাকে পাওয়া যায় না, তাকে।—তারপর কথাটাকে সহজ করে দেবার চেষ্টায় বলে বিয়ে আমি একেবারে করবো না এমন আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ নেই। তোমাদের এই বিয়ের প্রথাটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে, তাকে আমি একটু ঝালিয়ে নিতে চাই। দরকার হয়েছে।

মা কি-যেন বলতে চান, প্রভাত বাধা দিয়ে বলে চলে—তেমন পরীক্ষার যদি সুযোগ না জোটে, আমি না-হয় প্রতীক্ষা করেই থাকবো। দেহের সেবাদাসী অনেক জোটে মা, আত্মার ঘরণীরই দেখা মেলে না।

মা বলেন,—আত্মা কি দেহ থেকে আলাদা?

প্রভাত জবাব দেয়: কিন্তু সেবাদাসী আর পূজারিনী এক নয়, মা।

মা বলেন,—কিন্তু সেই স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ যে আরো ভীষণ। পূজারিনী যখন ভুখারিনী হয়ে ওঠেন?

—সেই তো আমার ভয়, মা।

—ভয় না থাকলে ভালোবাসা হয় কি করে?

মা'র মুখে এত সব কথা শুনে প্রভাত বিস্মিত হলো। মা'র বৈধব্যদীপ্ত ললাটে তেজস্বিতা, সমস্ত শরীর থেকে পবিত্রতা বিকীর্ণ হচ্ছে।

প্রভাত মাকে জড়িয়ে ধরে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে—বাংলা দেশের মেয়েদের তো তুমি চেন না মা, তারা স্বামীকে মা'র কোল থেকে কেড়ে রাখে। সংসারের শেষ প্রান্তে মাকে নির্বাসন দিয়ে বৌয়েরা স্বামীর কাঁধে সওয়ার হয়ে রাজত্ব চালায়। তোমার ছেলে হয়ে তোমার এই লাঞ্ছনা সইবো না, মা!

প্রভাতের পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে মা স্নিগ্ধস্বরে বলেন—বাঙলাদেশের মেয়েদের আমি চিনি না, তুই চিনিস? আমি যেন বিলেত থেকে উড়ে এসেছি। বাঙলা দেশের মেয়ের মতো মেয়ে আছে ভূ-ভারতে? দেখিস, তোর বৌ আমাকে মাথায় করে রাখবে।

কথোপকথনকে প্রভাত আরো স্বচ্ছ করে তোলে। বলে—তারপর বৌ এলে তুমি আমাকে ফেলে নাটু-কে তুলে নেবে, ওকেই আঁকড়ে ধরবে তখন। আমি তখন তোমার পর হয়ে গেছি। পরের মেয়েকে ডেকে এনে এত হাঙ্গামায় কাজ কি, মা? এই আমরা আছি বেশ। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

মা বলেন—স্বস্তির চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য। আমার হাতে একটি সম্বন্ধ আছে, লক্ষ্মী মেয়ে, তাকে পেলে আমার সংসারে সোনার ফসল ফলবে। সামনের পূজো পেরোলেই অঘ্রানে আমি উৎসব লাগাবো।

প্রভাত হেসে বলে—তোমার এই ছোট বাড়িতে কুলুলে হয়।

মা বলেন—স্বপ্ন দেখতে ছোট বাড়ি বাধা দেয় না। আয়, মা-কালীর প্রসাদটুকু নে দিকি।

হাত পেতে সন্দেশটুকু নিতে-নিতে প্রভাত বলে—তোমার ঐ কালীর মতো একটি মেয়ে জুটিয়ে দিতে পার তো দেখ। আর লক্ষ্মী নয়, দু'একটা কালী পেলে দেশের হয়তো কালিমা ঘোচে

রঙ্গমঞ্চে একা প্রভাত।

নিজের ছোট ঘরটিতে একা প্রভাত তার ভাঙা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে,—সামনের কেরোসিন-কাঠের নড়বড়ে টেবিলের ওপর ছোট টাইম্‌পিস্ ঘড়িতে দুটো বাজে—প্রভাতের চোখে ঘুম নেই।

জানলাগুলি খোলা, কৃষ্ণপক্ষের ক্যাকাসে জ্যোৎস্না মেঝের এক ধারে এলিয়ে পড়েছে। অস্থির পদে খানিকটা পাইচারি করে প্রভাত আবার এসে চেয়ারে বসলো।

এক-এক করে তিনটি বছর খসেছে; আশ্চর্য, হিসেব করে দেখলো এক-হাজার পঁচানব্বই দিন। দিগ্বধূর ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এতগুলি মুক্তো! প্রভাত তা ধুলায় ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে, কুড়িয়ে রাখেনি। তিনটি বৎসরকে মিনিটে ভাগ করতে প্রভাত হাঁপিয়ে উঠলো,—এতগুলি মুহূর্ত ধরে সে বরাবর নিশ্বাস নিয়েছে, ক্লান্তিতে থেমে পড়েনি। তিন বছর পেরিয়ে এসে আবার ও চেনা আকাশের হাতছানি পেল।

প্রভাত এতদিন বেঁচে ছিল কী করে? এতদিন স্বচ্ছন্দচিত্তে নিশ্বাস গ্রহণ করবার ওর সামর্থ্য ছিল বলে ও একেবারে অবাক হয়ে গেল। আনন্দে আত্মহত্যা করা যায়—এমন কথা অবিশ্যি প্রভাত কোনোদিন শোনেনি, কিন্তু জগতে এমন ব্যাপারও আজ সম্ভব হতে পারে। চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রভাত জানলায় এসে দাঁড়ালো। আকাশের আরো বড়ো হওয়া উচিত ছিল, জীবনকে এত ক্ষণস্থায়ী করে বিধাতার সৃষ্টি-কৌশলের এমন কী মর্যাদা হয়েছে!

প্রভাত ভাবছিলো এমনটি না হয়েই যায় না। দিনের আলোয় আকাশের তারা কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে—অন্ধকারে আবার তারা চোখ চেয়েছে। একমাত্র আশাই আকাশ উত্তীর্ণ হতে পারে—সেই আশা কি ধূলায় লুণ্ঠিত হবে? বিচ্ছেদে প্রভাতের বিশ্বাস নেই, সেই ছেদ শুধু ছন্দেরই রূপান্তর। এ যে ঘটবে প্রভাত জানতো, ভালো করেই জানতো। না ঘটেই যে পারে না! এ ঘটবে বলেই প্রভাত দুই হাতে এতগুলি দিন-রাত্রির উদ্বেল সমুদ্র সাঁতরে এসেছে!

এই নিয়ে বোধ হয় তিরিশবার চিঠি পড়া হল:

জলপাইগুড়ি

হাতের লেখা বদলাতে পারে কিন্তু আমি বলতে যাকে বুঝি তা বদলায়নি। চিনতে পাচ্ছ তো? তোমার সেই অশ্রু।

বহুদিন পরে তোমার মনের মুকুরে আবার আমার ছায়া ফেললাম। নিভৃতে আবার আমাদের শুভদৃষ্টি হোক।

চিঠি লিখো শিগ্‌গির। পরে অনেক কথা আছে, ইতি।

অস্পষ্টরূপে জানতো বটে আবার ডাক পড়বে, কিন্তু আজ কেন যে হঠাৎ ডাক পড়লো সেই সমস্যারই সমাধান হচ্ছে না। প্রভাত ঘেমে উঠলো। ভাবলো, যে-দিনই ডাকতো সেই দিনই এমনি চমকে উঠবার কারণ ঘটতো, আজকের বিশেষ কোনো উত্তরের জন্যে অধীর হওয়া নিতান্ত বোকামি! চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া কতক্ষণ থাকে জ্যোতির্বিদরা তা নিয়ে আঁক কষুক,—চাঁদও ঘুরছে, পৃথিবীও ঘুরছে। প্রভাত তর্ক করবে না, বিশ্বাস করবে।

রাইটিং প্যাড-এর খান দশেক পাতা ছিঁড়ে প্রভাত শুধু এইটুকু লিখতে পারলো:

ভালো করে চিনতে পাচ্ছি না। তুমি আমার সেই অশ্রু? তুমি আমার সেই মনোহংসের সরসী?

ফেরত ডাকেই চিঠি এলো :

তোমার সেই অশ্রু বটে কিন্তু গলানো অশ্রু নয়। একটু কঠিন, জমাট বরফের মতো। অথচ ঠাণ্ডা।

মনে হলো তুমি ভালো আছ। অনেক দিন কোনো খবর পাইনি—তাই চিঠি লিখতে ভারি ভয় হচ্ছিল। আরো মনে হলো আমাকে একেবারে ভুলে যাওনি। আমি লিখিনি বলে তোমাকেও লিখতে হবে না—এ নিয়মটা ভারি সভ্য নিয়ম। আমি অত সভ্যতা পছন্দ করি না। আমার নামে নিশ্চয়ই অনেক গুজব শুনেছ। ইস্কুল-টিচারি করতে এলে অনেক আজগুবি গুজবের পসরা বইতে হয়। আমি আর বইবো না ভাবছি বেরুবো।

বেরুবো,—তোমার সঙ্গে। তুমি আমার এই চিঠি পেয়েই এখানে চলে আসবে। চাকরি করছ নাকি আজকাল ? অত ছোট চিঠি লিখতে তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো শুনি ? যদি চাকরি থেকে ছুটি না পাও কাজে ইস্তফা দিয়ে আসবে। আমি এই তিন বছরে মন্দ টাকা জমাইনি। পুরুষই খালি সংসার বহন করবার গর্ব ভোগ করবে আর স্ত্রী-জাতিকে কৃপাপাত্রী করে রাখবে—এটা একটা বর্বর প্রথা। বন্ধুত্বের বেলায় **divine right of sex** খাটে না, বুঝলে ?

টাকার কথা শুনে এবারো যদি অপমানিত বোধ কর, তাহলে বুঝবো তোমার ছেলেমানষি আজো ঘোচেনি। তুমি এখনো সেন্টিমেন্টাল যুগে বাস করছো। তিন বছরের অদর্শন মনের একটা খুব ভালো স্বাস্থ্যকর টনিক, তুমি কি বল ? আবার আমরা পরস্পরকে নতুন করে দেখবো—জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্লাটফর্মে।

হ্যাঁ, ভালো কথা - এই প্রশ্নটা মন থেকে তাড়াতে পাচ্ছি না, বিয়ে করনি তো ? যদি বিয়ে করে থাক, তবে দিন কয়েকের জন্যে বৌয়ের সঙ্গে ধর্মঘট করে এখানে হাওয়া বদলে যেয়ো। আর যদি ধর্মঘট করার অসুবিধে ঘটে, তোমার ধর্ম যা বলে তাই করো। এসো কিন্তু। কেমন ? ইতি।

পড়ে প্রভাত লাফিয়ে উঠলো। জলপাইগুড়িটা কলকাতা থেকে তিন শো বারো মাইল দূরে কেন ? মুহূর্তে মাইলের পর মাইল উড়ে যাবার জন্য মানুষের আয়ত্তাধীন কোনো যন্ত্র এতদিনে আবিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিলো। সুইচ টিপলেই যেমন অতি-সহজে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে ওঠে, তেমনি মনে করা মাত্রই প্রিয়ার সশরীর আবির্ভাবের কোনো একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন না কেন ? মোট কথা, মানুষের একজোড়া পাখা থাকলে ভালো হতো, সেকেণ্ডে সে-পাখা তিন শো মাইল পার হয়ে যাবে।

সত্যি, অশ্রুকে সে ভালো করে মনেও করতে পারছে না—সব কি-রকম ঝাপসা হয়ে আসে। তিন বছরের আগের অশ্রুকে কল্পনা করে ওর তৃপ্তি হয় না, ও নতুন অশ্রুকে দেখতে চায়, অনাবিষ্কৃত অশ্রুকে। নূতনতর উপলব্ধির আশায় প্রভাত ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

চিঠিটা জামার পকেটে দুমড়ে রেখে তক্ষুনিই মা'র কাছে গেল ছুটে। মা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বঁটি পেতে তরকারি কুটছিলেন। কাছে বসে নাটু আলু নিয়ে লোফবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আপন মনে খিল্‌খিল্ করে হাসছে।

প্রভাত প্রসন্ন মুখে বললে—মা, আমি জলপাইগুড়ি যাচ্ছি।

মা প্রশ্ন করলেন—হঠাৎ?

প্রভাত মেঝের ওপর বসে পড়লো। বললে—একটি বন্ধু ডেকেছে, মা।

মা'র আবার সন্দেহ করবার কারণ ঘটলো। বললেন—কে বন্ধু?

প্রভাত জবাব দিলে: তাকে তুমি চিনবে না মা।

—কলেজের বন্ধু? ছেলেবেলার?

প্রভাত না বলে পারলে না: বহু জন্মের। কথাটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না, মা। মোটকথা, জলপাইগুড়ি আমাকে যেতে হবে। তোমার অনুমতি চাই।

মা বললেন—আমার চেয়ে আপিসের অনুমতির দাম বেশি। ছুটি পাবি এ-সময়? কি রে, কথা বলছিস না কেন?

প্রভাত বলে বসলো: ছুটি যদি না পাই, চাকরিতে সেলাম ঠুকেই আমাকে ছুটতে হবে।

মা এবার রীতিমত ভয় পেলেন। বললেন—এমন তোর কে বন্ধু? বলি, ভালো চাকরি দেবে?

প্রভাত হেসে বললে—চাকরি কেড়ে নিয়ে বাউণ্ডুলে করে ছাড়বে। আর চাকরি পোষাবে না, মা।

মা'র তরকারি কোটা বন্ধ হয়ে গেল। বললেন—হেঁয়ালি রাখ। কি ব্যাপার খুলে বল।

প্রভাত কুণ্ঠা দমন করে অশ্রুর চিঠিটা মা'র হাতে তুলে দিলো! চিঠি পড়ে মা'র মুখ গেল শুকিয়ে। চিঠিটা মুড়তে-মুড়তে বললেন—এ আমি পছন্দ করি না। এর জন্যে চাকরিতে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসার ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে, এটার মধ্যে যে অসংযম আছে তাকে আমি ঘৃণা করি। তোর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুলো কি করে?

প্রভাতের এবার লজ্জা করতে লাগলো। বললে—আচ্ছা, আপিসে একটা

দরখাস্ত করে দিচ্ছি—আজই। যদি ছুটি না মেলে? তবে আমাকে এখেনেই চুপ করে বসে থাকতে হবে? এতটা সংযমই কি ভালো?

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, প্রভাত বাধা দিয়ে বললে,—তোমার উপদেশের উপকারিতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান নই, চাকরি বাঁচিয়ে রেখেই আমি কলকাতা থেকে পা বাড়াবার চেষ্টা করবো, কিন্তু যদি ফসকে যায়, যাবে। জলপাইগুড়ি যাবো মানে, আমার দিন কয়েক অসুখ করবে—ছুটি পাবো বোধ হয়। যদি না-ই পাই, তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো মনে করে চিঠিটা আর লুকোলাম না। জীবনে মানুষ দু'টি নারীর আশ্রয় পায়—এক মা আর প্রিয়া। তুমিও আমার বন্ধু, মা। এ আনন্দ তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি কি করে?

মা ফট্ করে বলে বসলেন – কিন্তু অশ্রু তোকে বিয়ে করবে?

—কথাটাকে পালটে বলো মা, তুই কি অশ্রুকে বিয়ে করবি? সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত আজ তোমাকে জানালে তুমি ভীষণ চমকে উঠবে; সে-সিদ্ধান্তটা আমারো নবলব্ধ। পরে তোমাকে জানাবো, মা; নিশ্চয়। বিয়েটাকেই নরনারীর সম্পর্কের চরম পরিণতি মনে করে আত্মবঞ্চনার দিন চলে গেছে। বিয়ের চেয়ে বন্ধুতাটাই বড়ো জিনিস।

—কিন্তু সে-বন্ধুতা টিকলে হয়!

—যদি না টেঁকে, তবে তাকে রঙীন সুতো দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা যায় না, মা। পেয়ে হারানোর চেয়ে হারিয়ে পাওয়া ঢের ভালো।

মা মুখ ভার করে বললেন—কিন্তু যে-মেয়েটিকে আমি ঘরের বৌ করব বলে ঠিক করে রেখেছি তাকে তুই কিছুতেই ফেলতে পারবি না, প্রভাত। এ-সব হতচ্ছাড়া প্রেমে সুফল হয় না কোনোদিন।

—সুফলের জন্যে তো সেই অঘ্রান-তক বসে থাকতে হবে। তার আগে পূজো। একটা লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে দি। কিছু পাওনাও হয়তো আছে। তিনটি প্রাণীর জন্যে দরকার হলে আর একটা ছোটখাটো চাকরি বাগিয়ে নেওয়া যাবে হয়তো। কিন্তু শুভদিন মানুষের ভাগ্যে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে না, মা। সময়ের চুলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরা চাই। বলে প্রভাত বেরিয়ে গেল।

মা তক্ষুনি মনে মনে ছেলের শুভবুদ্ধির জন্যে মা-কালীর কাছে মানত করলেন।

ঘরে গিয়ে প্রভাত কালি-কলম নিয়ে বসলো। কেবলই অনুভব করতে লাগল অশ্রু নতুন, এখনো নতুন। চিঠিটা হলো এইরূপ:

আপিসে দরখাস্ত করে দিলাম। শনি, রবি নিয়ে সম্প্রতি তিন দিনের ছুটি পাবো

মনে হচ্ছে। তিন বছরের পর তিন দিন যথেষ্ট নয়, জানি। কিন্তু কোনো মেয়ের জন্যে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আসার সেন্টিমেন্টাল যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি। সৌভাগ্যবশতই বলতে হবে। কেন না, বন্ধুতা টেঁসে গেলেও চাকরিটা টিকে থাকবে। অন্নসমস্যার দিনে সেটা কম কথা নয়।

মোটকথা, শুক্রবার ভোরে স'পাঁচটার সময় স্টেশনে থেকো। যদি একান্তই ছুটি না পাওয়া যায়, টেলি করবো। কিন্তু, পারবো কি না গিয়ে? মা সংযম অভ্যাস করতে বলেছেন; তিন বছরের সংযম কি যথেষ্ট নয়? অশ্রু কি বলেন? ইতি।

নাটুর মাথায় হাত বুলিয়ে প্রভাত মা'র পায়ের ধুলো নিলে। বাঁ বগলে ছোট বেডিং ও ডান হাতে সুটকেস নিয়ে প্রভাত তিন-নম্বর বাস ধরতে বেরিয়ে পড়লো।

মা নাটু-কে নিয়ে শুতে এলেন। সারা রাত তাঁর চোখে ঘুম এল না,—দুশ্চিন্তায় মন তাঁর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তবু ভাগ্যিস, তিন দিন ছুটি পাওয়া গেছে। সোমবার সকালেই যে প্রভাতের ফিরে আসা চাই এ-বিষয়ে তিনি মাথার কিরে দিয়ে দিয়েছেন,—প্রভাত তা খেলাপ করবে না। এতদূর অধঃপতন তার হবে না হয়তো,—কিন্তু বলা কি যায়? বালুচরে পা আটকে যেতে কতক্ষণ?

যে-মেয়ে বিয়ের সভা থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে তাকে তিনি পুত্রবধূ-রূপে কল্পনা করে সুখ পান না। তিনি তো আর জানেন না সেই মেয়ে কেন বেরিয়ে এসেছিল। জানলেও হয়তো ক্ষমা করতেন না, কেন না এত বড়ো বিদ্রোহাচরণের মধ্যে সাহসের চেয়ে নির্লজ্জতাই প্রকাশ পেয়েছিলো বেশি। অশ্রুর পরিবার তাই তার মুখের উপর তাদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে—ও আজ পথচারিণী, মাথায় ওর কলঙ্কের কুলো; এই মেয়ের জন্যেই ছেলে তাঁর বেহেড হয়ে ছুটে গেল ভাবতে মা চোখের জলে বালিশ ভেজাতে লাগলেন।

কিন্তু এ-কয় দিনে প্রভাতের চেহারা এত সুন্দর ও সতেজ হয়ে উঠেছে—ওর মুখে দীপ্তি, কাজে-কর্মে উৎসাহ—ছেলেকে এমন প্রসন্ন তিনি আর দেখেননি আগে। মরা শাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে। প্রভাত যেন এ-ক'টা দিন সেতারের তারের মতো বেজেছে—হাতে ওর স্পর্শমণি! বিধাতা মানুষকে খুশি করেন, কিন্তু এমন সর্বস্বান্ত হবার লোভ দেখিয়ে কেন? রিক্ততা না এলে কি পরিপূর্ণ মুক্তি নেই?

মা তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা—এই আঙুল দু'টিকে তুলে ধরে নাটু-কে বললেন—একটা আঙুল ধর্ তো নাটু।

মধ্যমা ধরলেই প্রভাত শুভেলাভে সোমবার ভোরে ফিরে আসবে, নচেৎ—তর্জনী-সম্বন্ধে কিছুই তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধ ছেলে মা'র

হাতখানি অনুভব করে আঙুল ধরবার জন্যে মুঠি মেললো। মা তাঁর নিজেরই অজানতে মধ্যমাটি নাটুর প্রসারিত করতলে ধীরে এনে স্পর্শ করালেন বোধ হয়। নাটু নিবিড় করে মুঠি চেপে ধরলো! স্বস্তিতে মা'র বুক ভরে গেল। এবারে ঘুমোবার জন্যে চোখ বোজা যাবে।

দার্জিলিং মেল তো ছাড়লো। বারাকপুরের পর স্পিড দিয়েছে।

ইণ্টার ক্লাসের টিকিট। প্রভাত ভেবেছিলো কোনো রকমে একটু জায়গা করে সতরঞ্চিটা পেতে লম্বা হয়ে পড়বে। একেবারে পার্বতীপুরে গিয়ে জাগবে—টাইম্-টেবল্ মিলিয়ে দেখলো তখনো বেশ অন্ধকার থাকবে, বাড়িতে হলে ডি. লা. মেয়ারের কবিতা পড়তো; কিন্তু ট্রেনে এর পর আর ও চোখের পাতা এক করতে পারবে না—জানলা দিয়ে সুদূরবিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চেয়ে থাকবে। ওর চোখের সামনে আস্তে-আস্তে অন্ধকারের পর্দা উঠে যাবে, ওর চোখের সামনে আকাশ উদঘাটিত হবে—ভাবতে ওর রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ট্রেনে বসে শেষ রাত্রিটুকু জাগার মতো সুখ নেই।

একে আর ভিড় বলে না,—প্রভাত সতরঞ্চি পাতলো। গাড়ি ছাড়তেই শুয়ে পড়লো। কিন্তু না আছে দার্জিলিং মেল-এর স্পিড, না আসে ঘুম! ঘুম না এলে ও মনে-মনে অনেক আজগুবি ছবি আঁকে; হয়তো পুরীর সমুদ্র সাঁতরে যাচ্ছে; হয়তো মোহনবাগানের হয়ে সতেরো মিনিটে সাতটা গোল স্কোর্ করলে; হয়তো বা বিলেতের কোয়েকার সোসাইটি ওকে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করে প্যাসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে; ও সমুদ্র দিয়ে নয়, ওভারল্যাণ্ড-এ দেশ দেখতে-দেখতে রওনা হলো—বোগ্দাদেই আটকা পড়ে গেল বুঝি, যদি যেতে হয় ট্রেনে নয়, উড়ো জাহাজে যাবে এবার। কিন্তু আজ 'মনের মুকুরে যার ছায়া পড়েছে' কোনো আঁচড় টেনেই তাকে আড়াল করা গেল না। সে একেবারে ঘন হয়ে তপ্ত হয়ে পাশে বসল—কতক্ষণ পরে, কি আশ্চর্য, শুয়ে পড়ল। এত ছোট বেঞ্চিতে দু'জনে যে পাশাপাশি কি করে শোয় ঢাকাঢুকি দিয়ে, ভাবাই যায় না। মুশকিল! ট্রেনের আস্তে চলাটাও কখনো-কখনো হার্টের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অতএব গাড়ির শেকল টেনে দেওয়া উচিত। থামবার জন্যে নয়, চলবার জন্যে।

প্রভাত উঠে বসলো। এক যুগ কাটিয়ে এসে এতক্ষণে কি না রানাঘাট। আকাশে মেঘ করেছে বুঝি। বৃষ্টি হলে মন্দ হয় না, বৃষ্টি থামবার আশায় কান পেতে থেকে কতক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে। বৃষ্টি তো এক সময়ে থামবেই। সঙ্গে

একটা বই বা খবরের কাগজ পর্যন্ত আনেনি যে পড়বে। কী-ই বা পড়তো? একটা ছবির বই আনলে মন্দ হতো না, কিংবা যোগাড় করে কোনো pornography। মনোযোগ আটকে থাকতো হয়তো। আচ্ছা, অশ্রু, কোনোদিন ও-সব বই পড়েছে? যাক গে, পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা যাক্ :

—কদ্দূর যাচ্ছেন?

—রংপুর। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করতে হবে। হাঙ্গামা মশাই। শেষ রাত্রেই ঘুমটা চেগে আসে। পড়ি ঘুমিয়ে, পার্বতীপুর পার হয়ে যাক। টিকিট ছিল সেকেণ্ড ক্লাসের—ভেবেছিলাম গার্ডকে পার্বতীপুরে জাগিয়ে দেবার কথা বলে নবাবি করে একটু ঘুমুব, কিন্তু শালারা একটা বেঞ্চিও খালি রাখেনি। টিকিট বদলাবারো সময় হলো না। একেই বলে ভাগ্য, মশাই। টাকাও গেল, টাকও ঢাকলো না।

—বার্থ আগে রিজার্ভ করেননি কেন?

—এই দুর্ভোগ সইতে। দূর থেকেই ভোগ করছি আর কি! এখন পৌঁছতে পারলে হয়। পেছনে শনি বেশ শানিয়েছে বুঝলাম। ট্রেনে এখন কলিশান না হলে বাঁচি!

প্রভাত চমকে উঠলো। সত্যিই তো, যদি দুর্জয় ধাক্কা লেগে দার্জিলিং মেল খান-খান হয়ে যায়! এতে আশ্চর্য হবার তো কিছুই নেই,—হামেশাই তো হচ্ছে। ঢাকা মেল উল্টোল, গয়া এক্সপ্রেস এক্সা হয়ে গেল। প্রভাত আরেকটু হলে চেঁচিয়ে উঠছিল আর কি! কিন্তু না, দার্জিলিং মেল এত দুর্বল হবে না। কে জানে? টাইটানিকো তলিয়ে গেছে। ও যদি আজ মরে যায়—ওর চোখের সামনে আকাশ যদি আজ আর আত্মপ্রকাশ না করে—কি হয় তাহলে? ও আকাশের ওপারে চলে গিয়ে অশ্রুকে অশ্রু-সমুদ্রের পার থেকে লুট করে নিয়ে যাবে। মৃত্যুর পরেও কি মানুষের সাজগোজ থাকে? অলিভার লজ্-এর ওপর ওর আস্থা আছে। কিন্তু এ প্রশ্নের তো উত্তর নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে আজকের রাতের জীবনটুকুর জন্যে ভিক্ষা চাইলে এমন কি অপমান হবে? ঈশ্বর নাই-বা থাকলেন, তার জন্যে একটু প্রার্থনা করলেই কি গঙ্গার জল শুকিয়ে যাবে? সত্যি কথা বলতে কি, ওর প্রত্যহের ভূগোলে অষ্ট্রেলিয়া বলেও তো কোনো দেশ নেই। তাই বলে মনে-মনে সে দেশ বেরিয়ে এলে ওকে মারে কে শুনি?

বসে, শুয়ে, স্টেশনে খাবার খেয়ে, সিগারেট ফুঁকে, মনে-মনে আঁক কষে, যাত্রীদের চেহারা দেখে-দেখে, তাদের মনের অবস্থা আন্দাজ করে-করে (একটি যাত্রীও প্রেমে পড়েনি) প্রভাত কোনোরকমে রাত প্রায় কাবার করে এনেছে। দার্জিলিং মেল বেসামাল হয়নি যা হোক। আকাশে আলোর ছোঁয়াচ লাগলো

বুঝি। দু'একটা করে পাখি উড়তে শুরু করেছে। ফুরফুরে তাদের পাখা। ঘুমো আকাশের চোখ! বৃষ্টি না হয়ে ভালোই হয়েছে। হয়তো ঠিক সময়ে অশ্রু এসে প্লাটফর্মে পৌঁছতে পারতো না। আকাশের রসিকতা করার একটা সময়-অসময় আছে। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের অযথা কষ্ট হতো।

মাইল-পোস্ট-এর দিকে তাকিয়ে দেখলো জলপাইগুড়ি পৌঁছুতে আর মোটে সাত মাইল বাকি। এবার স্বচ্ছন্দে দার্জিলিং মেল ডিরেইলড হতে পারে,—প্রভাত সাত মাইল পায়েই মেরে দিতে পারবে খুব। গ্রে ষ্ট্রীট-এর মোড় থেকেও হাজরা রোড পর্যন্ত অনেক হেঁটেছে, অনেক। কিন্তু না, দার্জিলিং মেল বেশ ভদ্র। বাধ্য ছেলেটির মতো সুড়সুড় করে এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, আর দুই কদম। এঞ্জিনের ফুঁ-টা আরো জোরে হওয়া উচিত ছিল। জলপাইগুড়িটা যেন কিছুই নয়!

আঃ! ফিলিপ সিড্‌নির হাত থেকে জলের গ্লাশ পেয়ে মুমূর্ষু সৈনিক এর চেয়ে বেশি আরাম পায়নি। প্রভাত তাড়াতাড়ি বিছানাটা গুটিয়ে নিলে। ভগবান নেই এমন কথা যদি এখন কেউ বলতে আসে, প্রভাত তার সঙ্গে আদপেই তর্ক না করে একটা ঘুসি মেরে বসবে হয়তো, কিন্তু তারো কাজ নেই—গোলমাল বাধতে পারে। তার চেয়ে সোজাসুজি নেমে পড়াই ভালো। ট্রেনটা থামুক। চলন্ত ট্রাম থেকে নামবার ওর রীতিমত অভ্যেস আছে। কিন্তু চলন্ত ট্রেন থেকে কায়দা করে নামবার কোনো মানে হয় না,—প্লাটফর্ম পালিয়ে যাচ্ছে না। আরে মশাই, দরজার কাছে মাল-পত্তর নিয়ে এত ভিড় করলে কি চলে? সমস্ত দিন ধরে আপনিই নামবেন নাকি? আচ্ছা ভদ্রলোক তো!

প্লাটফর্ম। তাহলে নামা গেল! দার্জিলিং মেল-এর জন্যে আর ভাবনা নেই। পাতালে যাক। প্রভাত পা বাড়ালো।

কে যেন এগিয়ে আসছে। সেই শাড়ি-ব্লাউজের প্যাকেট। মেয়ে নিশ্চয়ই। প্রভাতের ততটুকু দৃষ্টিশক্তি আছে। নেহাৎই বাঙালী হয়ে জন্মেছে নইলে প্রভাত নিশ্চয় নাম ধরে ডেকে উঠতো। অনর্থক লোকদের হকচকিয়ে দিয়ে লাভ নেই। এখন অন্ধকারো ফুরিয়ে গেছে। কণ্ঠস্বরটা নিশ্চয়ই সঙ্গত হতো না।

হ্যাঁ, অশ্রুই বটে। প্রভাত ঠিক চিনতে পেরেছে, নিশ্চয়ই। চেহারাটা একটু ভালো হয়েছে মনে হচ্ছে, ভালো হয়েছে মানে অল্প একটু মোটা হয়েছে। বিয়ে না হয়ে বাঙালী মেয়ের স্বাস্থ্য ফেরার দৃষ্টান্ত দেখে প্রভাত মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো। মাঝে ওর কানে একটা উড়ো খবর এসেছিল যে অশ্রুর ফুসফুসের ফেঁসে

যাবার সম্ভাবনা হয়েছে,—কথাটায় কান দিলেও প্রাধান্য দেয়নি, কারণ অশ্রুর আহ্বান যে কোনোকালে ফের শ্রুত হবে এ-ধারণা তখন ছিলো না। ফলাফল জানবার জন্যে তাই উৎসুক হয়নি। এই মোটা হওয়াটুকু হয়তো সেই 'অটো ভ্যাক্সিন'-এর—ঠিক ফল নয়, ফুল!

বছরে বেড়েই যদি থেমে পড়ত তাহলে পিপের মতো গড়গড়িয়ে গড়িয়ে দেওয়া যেত হয়তো। কিন্তু না; মাথায়ও অশ্রু বেশ ঢ্যাঙা হয়েছে! গ্লাশের কিনারা বেয়ে উপচে-পড়া উচ্ছ্বসিত সুরার ফেনার মতো অশ্রুর যৌবন,- উষার অঞ্জলি-উৎসারিত আলোর নিবেদনের মতো। কথাটাকে ছোট করে বলা যেতে পারে—একটা কনকচাঁপা, উগ্র, উজ্জ্বল, মদির! এত রূপ যেন আর কোনোদিন দেখেনি—ঝড়ে নয়, সমুদ্রে নয়, মৃত্যুর সুগম্ভীর আবির্ভাবেও নয়। জীবনে যেন জোয়ার ডেকেছে। দুই চোখে এত রূপ যেন কুলিয়ে উঠছে না। প্রভাত যেন তার চোখের সামনে অরোরা-কে দেখছে। ও পা বাড়ালো।

পায়ে গ্রিশিয়ান স্যাণ্ডেল, এবং পায়ের পাতা থেকে শুরু করে আটপৌরে চওড়া -পাড় শাড়িটি দেহবল্লরীকে বল্লভস্নেহের মতোই আবেষ্টন করে উঠে গেছে. মাথায় ছোট একটুখানি ঘোমটা, হেয়ারপিন দিয়ে আঁটা নয়। অতএব এগিয়ে আসতে গিয়ে মাথার কাপড় গেল খসে, এবং সেটা ফের তুলতে গিয়ে খোঁপার ওপর বেকায়দায় হাতটা লাগতেই খোঁপাটা কাঁধ বেয়ে পিঠের ওপর ভেঙে পড়লো। চুলে অশ্রু কি তেল মাখে? এত ঘন পুঞ্জিত হলো কি করে? আচ্ছা শিঙল্‌ড হলে অশ্রুকে কেমন মানাবে? ঠোঁটে তার জন্য লিপস্টিক্ দেওয়া চলবে না? অশ্রুর ঠোঁট দুটি ভারি হয়ে ভালোই হয়েছে। মেয়েদের পাতলা ঠোঁট ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক নয়। নিশ্চয়ই অশ্রুর আজ ঘুম থেকে জাগতে দেরি হয়েছে, তাই শাড়িটা তাড়াতাড়ি বদলে আসতে পারেনি। শাড়ির কুঞ্চনগুলি শোভা হয়ে বিরাজ করছে। মুখের উপর ঘুমের যে মলিনতাটুকু লেগে আছে তা ঘুমেরই মতো সুন্দর।

দু'জনে এগিয়ে আসতে লাগলো। ওদের ডান হাত দুটোতে কখন যে ককটেইল হয়ে গেল কেউই ঠিক ঠাওরাতে পারলো না! দু'টি দেহ যেন নদীর সেতুর দুই পারের স্তম্ভের মতোই অবিচলিত রইলো—বীণার মতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো না যা হোক। কারণ হয়তো এই যে, ওরা যেন এমনি পরস্পরের স্পর্শলাভের অভ্যাসে এখানে এখন অসাড় হয়ে গেছে। সত্যিকারের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় বেশিক্ষণ হাতে হাত ঠেকিয়ে থাকা যায় না। ভীষণ ভিড়, লোকের তত নয়—চোখের।

অশ্রু কথা বলতে পারলো: এই তোমার জিনিস? চলো।

প্রভাত অশ্রুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো—কোথায় ?

—আমার হাতে স্যুটকেসটা দাও। আপাতত একটা ঘোড়ার গাড়িতে তো গিয়ে উঠি,—যাবার জায়গা আছে।

প্রভাত স্যুটকেসটা ছাড়লো না। বললে—এটুকু ভার বইবার আমার ক্ষমতা আছে। চলো।

গাড়িতে ওঠবার আগে পা-দানিতে পা রেখে অশ্রু একটু পিছন ফিরে বললে—স্যুটকেসটা আমার হাতে দিলেই ভালো করতে, কেননা রাজ্যি শুদ্ধু লোক আমার দিকে এমন ভাবে চাইছিল যে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেন কত সন্দেহের! এই সব লোকগুলোর ফাঁসি হয় না কেন ?

প্রভাত দেখলে কথা বলতে ওর রীতিমত অসুবিধে হচ্ছে। স্নায়ুগুলো হঠাৎ যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লো। ট্রেনেই রোজকার মতো মুলার্‌-এর কতকগুলি 'ফিগার' করে এলে পারতো। এত অবসন্ন লাগবার তো কথা নয়! সমস্ত রাত্রি ধরে যে-জিভে ওর কথার সুড়সুড়ির শেষ ছিল না সে-জিভ হঠাৎ মরে শুকিয়ে গেল নাকি ? এত ঢোঁক গেলবার অভ্যেস ওর কোনো কালে ছিলো না বলেই তো মনে হচ্ছে।

প্রভাতের মুখোমুখি বসে অশ্রু বললে পাশে বসলে কথা বলার অসুবিধে হবে। তারপর দুই চোখে একটি কমনীয় কৌতুক নিয়ে শুধালো : তারপর ?

প্রভাত পা দুটো একটু ছড়িয়ে, বুকটা সামান্য একটু ফুলিয়ে স্নায়ুগুলোকে শাসন করলে; বললে—তারপর আর কি ? জলপাইগুড়ি চলে এলাম। এখন জল পাই তবেই হয়।

অশ্রুর দাঁত দেখা গেল। প্রভাত মুক্তো কোনোদিন দেখেনি, তবু তা'বলে সারি সারি মুক্তো অমন হলে তার অমর্যাদা হবে না। বললে,—জল না পাও, জলপাই পাবে। দাঁত যাবে টোকে।

প্রভাত। সে-জল্পনা করেই তো এসেছি।

অশ্রু। দাঁড়াও, দেখি আর হয় কি না। (ভেবে) হয় না, না হোক, (থেমে) তারপর, আছ বেশ ?

প্রভাত। ছিলাম বেশ। এখন কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠছি।

অশ্রু। কেন ?

প্রভাত। তাই যদি জানতাম তো ছুটি না পেয়েও ছুটে আসতাম না।

অশ্রু। ছুটি পাওনি ? কি হবে তবে ?

প্রভাত। কি আবার হবে ? আমার অসুখ করতে পারে না ? (একটু হেসে) আমার অসুখই তো করেছে।

অশ্রু। (চমকিত) অসুখ ?

প্রভাত। (দিব্য কইতে পারছে) অসুখ ছাড়া আর কি ! নইলে সুস্থ থাকলে কেউ এমনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে নাকি ?

অশ্রু। (গম্ভীর) কথাটা ফিরিয়ে নাও, নইলে কথা কইবো না।

প্রভাত। এর ওপর আবার যদি কথা না কও, তাহলে দয়া করে কোচোয়ানকে গাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলো। হাসপাতাল থেকে পরে একেবারে পাতালে।

অশ্রু খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। পরে গম্ভীর হবার ভান করে বললে— কালই তোমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে ?

প্রভাত। কালই। এটা কলি ; তাই তোমার এ কথায় আশ্চর্য হলে শোনে কে ? শুনেছি আজ রাত্রেই ট্রেন আছে। যাবার সময় নিশ্চয়ই এবার ঘুমুতে পাব।

অশ্রু। তোমার সারা রাস্তা একটুও ঘুম হয়নি ? কাল রাতে ভারি গরম ছিলো, না ?

প্রভাত। তাই তোমারো ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে।

অশ্রু। না, তা কি আর হয়েছে ! ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই তো চেহারা ফিরিয়ে দিলাম।

প্রভাত। এবার আমাকেও ঘুমোবার জন্যে ফিরিয়ে দাও।

অশ্রু। আহা ! তোমার সঙ্গে as if আমার কোনো কথা নেই !

প্রভাত। আছে নাকি ? কতটুকু সময় লাগবে ? বলেই ফেল না।

অশ্রু। ঐ ত বললাম : তারপর ?

প্রভাত। 'তারপর'-এর কোনো উত্তর হয় ?

অশ্রু। উত্তর যদি কিছু না-ই হয় চুপ করে থাকো। মাথায় অতগুলো চুল রেখেছ কেন ?

প্রভাত। তুমি রেখেছ কেন ? সত্যি, তোমাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে !

অশ্রু। আর গোঁফ জোড়া নির্মূল করে তুমি যে কী অপরূপ হয়েছ বাঁদরের মতো —

প্রভাত। আমার অপমান বোধ করা উচিত কি না, তুমি বল। তোমাকে চামচিকে বললে তুমি চিম্‌টি কেটে দেবে না ?

অশ্রু। (অন্যমনস্ক) দেব তো, কিন্তু এসে পড়লো যে। তুমি এখানে নামো। এটা ডাক-বাংলো। সঙ্গে টাকা আছে তো ?

গাড়ি থামতেই প্রভাত নেমে পড়লো। ডাক-বাংলোর বেয়ারা এসে জিনিস দুটো ভেতরে নিয়ে গেল। অশ্রু গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো,—বিকেলে

আসবো। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো কিন্তু। আমি আগে থেকেই এখানে সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি—তোমার ভাবতে হবে না।

গাড়োয়ানকে গাড়ি-ভাড়াটা দেওয়া সঙ্গত হবে কি না প্রভাতকে ভাববার অবকাশ না দিয়েই গাড়ির চাকা চারটে ঘুরে গেল।

সেই গাড়ি করেই অশ্রু তার স্কুলের কোয়ার্টারে ফিরে এল। ভাড়া চুকিয়ে ভিতরে বারান্দায় ঢুকেই দেখলে বুলু (আরেকটি শিক্ষয়িত্রী) মুখে টুথ-ব্রাশ ঢুকিয়ে এক-মুখ ফেনা করে ফেলেছে। অশ্রু ছুটে এসে এমন বেগে তার গলা জড়িয়ে ধরলে যে কতগুলি ফেনা বুলুর গিলে ফেলতে হলো। অশ্রু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো: সে এসেছে।

বুলু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললে – ছাড়্ রাক্ষুসি। কে এল?

আলিঙ্গন একটু শিথিল করে অশ্রু কানে-কানে বললে—আমার রাজপুত্র। আমার চোখে যদি দেখিস তবে তুইও তাকে রাজপুত্র বলবি।

—তাহলে বন্দীদশা ঘুচলো? এই তিন বছর মাস্টারি করে এখন বুঝি বিয়ে করে বয়ে যাবার সখ হয়েছে। হবে কবে শুনি?

অশ্রু বুলুর গাল টিপে দিয়ে বললে -- যমের বাড়ি গিয়ে।

বুলু বললে—বি-এ পাশ করে সবাই এম.এ-ই পড়ে শুনেছি। কেউ কেউ দেখছি প্রেমে-ও পড়ে। য়্যাদ্দিন তো কৈ শুনতে পাইনি।

—তোকে শোনাবার জন্যে আমার ঘুম হচ্ছিল না। কাল সারা রাত আমার যে ঘুম হয়নি, তা অবিশ্যি অন্য কারণে।

—কি কারণে?

—সভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে?

—সভয়ে।

—তাহলে বলি, রাত বারোটা পর্যন্ত একজামিনের কাগজ দেখেছি—বারোটার পর থেকেই আমি নির্ভয়, বুলু। তারপর আর ঘুম আসেনি। বই পড়বার জন্য টেবিলে বসতে গিয়ে ভুল করে জানলায় এসে দাঁড়ালাম। জানলা থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায়।

—রাজপুত্রকে কোথায় সিংহাসন দিলি?

—ডাক-বাংলোয়। হৃদয়ে বলতে পারতাম বটে, কিন্তু সেটা তোর প্রশ্নের ঠিক স্বাভাবিক উত্তর হতো না। চা-র জল চাপিয়েছিস? চা খেয়েই ঘুম দেবো লম্বা। জাগাসনি পোড়ারমুখি।

বলেই অশ্রু অন্তর্হিত হলো।

অশ্রুর জীবনের আজকের এই ছোট দিনটুকু নিয়েই একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস লেখা চলে - জেম্‌স্ জয়েস যেমন *Ulysses* লিখেছে। একটি দিন – অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত (ঠিক পুরো একটি দিনো নয়)—তাই নিয়ে সাত শো বত্রিশ পৃষ্ঠার বিচিত্র উপন্যাস ! অশ্রু এত ধীরে ধীরে গত রাত্রি যাপন করেছে যে তার প্রতিটি নিশ্বাস-পতন নিয়ে একেকটা পরিচ্ছেদ হতে পারে। সেই রাত্রি নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে অশ্রুর সামান্য একটা জীবনে ধরবেই না।

অশ্রু *Ulysses*-এর সেই ব্লুম-এর কথা হঠাৎ ভাবতে বসলো। ব্লুম জাতিতে জু, ডাবলিনের একটি সাদাসিধে কেরানী ব্যাঙ্কে কাজ করে বোধ হয়। ব্লুম ঘুম থেকে ওঠে ; শোবার ঘরে বিছানার ওপর তার স্ত্রী মলি-কে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ফেলে রান্নাঘরে ঢোকে, সেখান থেকে বড়ো-হল্‌টায় ; সেখানে বসে একটা পুরানো খবরের কাগজ পড়ে ; এবং প্রাতঃকৃত্য শেষ করতে-করতে নিজের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা কল্পনা চালায়। অদ্ভুত লোক ! তারপর মাংসের দোকানে গিয়ে 'কিড্‌নি' কেনে, একটা ঝি দেখে কামমোহিত হয়। তারপর বাড়ি এসে 'কিড্‌নি'টা নিজেই ভাজে ; ওপরে স্ত্রীর কাছে খাবার নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টায় অনেকটা সময় হেলাফেলা করে—নীচে মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় ফের রান্নাঘরে। এই সব। তারপর ফের রাস্তায় ; স্নানের দোকানে ; শবানুগমন-মিছিলে ; একটা খবরের কাগজের আপিসে ; একটা রেস্টুরেন্টে ; লাইব্রেরিতে ; মদের হোটেলে ; সমুদ্রের পারে ; হাসপাতালে ; বেশ্যালয়ে—(সেখানে ব্লুম থাকে অনেকক্ষণ—ইউলিসিসও Circe-এর গুহায় অনেক দিন ছিল, না ?) সেখানে মদ খেয়ে শ্রান্ত হয়ে সে স্টিফেন্ ডেড্‌লাস-এর সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে।

গল্পের শেষ ভাগের কথা ভাবতে গিয়ে লজ্জায় অশ্রুর গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। ব্যাপারটা কিছু নয়,—অতি সামান্যই ; ব্লুম-এর স্ত্রী মলি স্বামীর কাছে শুতে যাচ্ছে ! ওটা জয়েস্ না লিখলেও পারতো। কিন্তু কেনই বা লিখবে না ?

শুনেছে বইটা নাকি অশ্লীল। হবে-ও বা। অশ্রু অবিশ্যি এক নিশ্বাসে পড়তে পারেনি, কিন্তু ছাড়তেও পারেনি। কোনো বিষয় বিষয়-হিসেবেই যে কী করে অশ্লীল হতে পারে অশ্রু তা কিছুতেই বোঝে না। এ নিয়ে ও কত তর্ক করেছে—প্রাথমিক প্রথাগুলোকে বন্ধুদের মন থেকে ছিঁড়তে পারেনি। যা কিছু দোষ হতে পারে স্টাইলের বা লিখনভঙ্গীর। *Ulysses*-কে সে কারণে নির্বাসিত করলে অশ্রুর দুঃখ হতো না। অন্য যে-কারণে লণ্ডনে ও নিউ ইয়র্কে *Ulysses*-এর লাঞ্ছনা হয়েছে সে-কারণটাকে উপহাস করতে পারলে মানুষের উপকারই হতো। মানুষের হৃদয়

আছে আত্মা আছে বলতে পারো, কিন্তু শরীর আছে বলতে পারে না। খেতে পারবে, ঘুমুতে পারবে, কিন্তু আসঙ্গ-লিপ্সার বেলায় শুধু মুখ বুজলেই চলবে না, দস্তুরমতো জিভ কাটতে হবে। বার্ণার্ড শ-এর মতো জিভ বার করে ভ্যাঙচাবার যো নেই। অন্তত এ দেশে।

মনে-মনে এ-সব নিয়ে অশ্রু অনেক কিছু-ই তর্ক করতে চাইলো, কিন্তু তর্ক করতে চিন্তার পারম্পর্য রাখার জন্যে যে সবল ও অনন্য অভিনিবেশ দরকার এ-রকম উচাটন মন নিয়ে তার সাধনা চলে না। অতএব পাশ-বালিশটা বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলে অশ্রু বিছানার উপর উঠে বসলো। এত রাজ্যির চুল নিয়ে ওর আপদ হয়েছে —একটু নাড়াচাড়া করতে গেলেই ঘাড়ের ওপর দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে এসে পিঠ বেয়ে কোমরের ওপর লুটিয়ে পড়ে বারে-বারে খোঁপা বাঁধার হাঙ্গাম অনেক,—তবু ও পিন আটকাবে না। চুল বাঁধতে বাঁধতে নজরে পড়লো - সেল্‌ফ এর ওপরকার টাইম্‌পিস্‌-এ মোটে দুটো বেজেছে। ইচ্ছে হলো ঘড়িটা মেঝের ওপর আছড়ে মারে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে মনে হয়েছিলো রোদ থিতিয়ে এসেছে বুঝি, এখন ভালো করে ঠাওর করলে আকাশটা তামাটে, থমথমে, ধীরে ধীরে মেঘ জমছে। পরনের শাড়িটাকে পরিপাটি করবার চেষ্টা করতে করতে অশ্রু বিছানা থেকে নেমে পড়লো। খালি পা, জুঁইফুলের মতো শাদা, ধবধবে। মুখখানি যেন রূপোর পিল্‌সুজের ওপর সোনার প্রদীপ!

শাড়িটাকে গুছোতে-গুছোতে হঠাৎ অশ্রুর মনে হলো এই বেশেই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! বিকেল বলে এসেছে বলেই যে কাঁটায় কাঁটায় কথা রাখতে হবে এতটা বিলিতি কায়দা তাকে না মানালে মহাভারত এ ক' ঘণ্টায় অশুদ্ধ হবে না আশা করি। কুঁড়েমি খুব ভালো জিনিস,—অশ্রু কুঁড়েমি খুব পছন্দ করে। মানুষ আরেকটু কুঁড়ে হতে শিখলে আরো খানিকটা সভ্য হতে পারতো। নিশ্চয়ই। তর সয় না বলে ছুটতে গিয়ে অকারণে এত সব কাণ্ড করে বসছে যে কোনো দার্শনিকই তার তারিফ করতে পারছেন না। একটু কুঁড়ে হলে লেখকেরা বই লিখে তক্ষুনি ছাপতে ছুটতো না, - পরে দেখতে পেতো কলম কি রকম কাঁচিয়েছে। কাঁচির দরকার। বৈজ্ঞানিকেরা আরেকটু কুঁড়ে হলে, অকারণ যন্ত্রপাতির উৎপীড়নে পৃথিবীর যন্ত্রণা এত বাড়াতো না। কবিরা যদি আরেকটু কুঁড়ে হতো তবে দেখতে পেতো বিনিয়ে-বিনিয়ে কথায় কাঁদুনি গাওয়া কোনো ভদ্রলোকের পোষায় না,— আরাম-কেদারায় শুয়ে একটু 'রাম' খেলে বরং কাজ দেবে। নেপোলিয়ান খুব বড় বীর বটে, কিন্তু পৃথিবীতে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলে কোনো বই না থাকলে অশ্রু অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিতে পারতো Fabius Cunctator তাঁর চেয়ে মহৎ, তাঁর

চেয়ে বরণীয়। কোনো কাজ তক্ষুনি-তক্ষুনি করে ফেলাটা নিতান্ত সহজ, একেবারেই সাধারণ; কিন্তু তাকে পিছিয়ে রেখে-রেখে তার জটিলতা বাড়িয়ে তবে তাকে সম্পন্ন করার মধ্যে বেশি বীরত্ব। ঠিক সময়ে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপার মধ্যে গৌরব কিছুই নেই, কিন্তু ট্রেন ছাড়বার সময়টুকু বাড়িতে বসে হাই তুলে কাটিয়ে দিয়ে পরে হেঁটে যাবার মধ্যে মূর্খতাই আছে এ-কথা বেনে বা বণিকেরা বলতে পারে—অশ্রুর মত উল্টো। মানুষের সময় কম—ঘড়ির কাঁটা নাকি অহর্নিশি তাই বলছে, ঘড়ির এই গায়ে-পড়া অভিভাবকত্ব বরদাস্ত করবো না; অশ্রু ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে পাঁচের কোঠায় প্রমোশন দিলে। এই ওর বিকেল।

অর্থাৎ কুঁড়েমি করা দূরে থাক্, সময়নিষ্ঠা-পালনের ধৈর্যটুকুও ওর পোষাবে না এখন। সময় দিয়েছে বলে তার আগে যাওয়া যাবে না এমনিই বা যদি কোনো নিয়ম থাকতো তবে আয়ুর অধিকারী হয়ে এসে এই বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে শিশুমৃত্যু ঘটতো না। এমন দৃষ্টান্ত বা কেন? একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলে অশ্রু এর চেয়েও অনেক খেলো নজির দেখাতে পারবে। কিন্তু না, সত্যি সময় নেই—অশ্রুর বলে আসা উচিত ছিল দুপুরেই যাবে। বিকেলের চেয়ে দুপুরটাই বেশি রোমাণ্টিক—অমাবস্যার নিশীথ রাত্রির চেয়েও। প্রেম-বর্ণনায় একমাত্র কালিদাস ছাড়া আর কোনো কবি ঘাম বা মাছির কথা উল্লেখ করেনি বলেই কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারলো না। রইলো পিছিয়ে। অশ্রু এবার কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করবে। লুডোভিচিকে পথে না বসিয়ে ও ছাড়ছে না। কিন্তু এক্ষুনিই কাগজ পেন্সিল নিয়ে না বসলে রাতারাতি নোবেল প্রাইজ হস্তান্তরিত হচ্ছে না এই যা সান্ত্বনা। ততক্ষণে শাড়িটা বদলে নিলে কাজ দেবে। অশ্রু ট্রাঙ্ক খুললো।

মেঘ করে এসেছে বলেই ওকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি পরতে হবে এমন কবিত্ব করবার দিন গেছে। ও সাদাসিধে শাদা শাড়িই পরবে। মেঘ কেটে গিয়ে রাত্রে যে স্তিমিত জ্যোৎস্নাটুকু ফুটবে বা যে ভীরু রজনীগন্ধাটুকু ঠোঁট মেলবে তারই আভাস। ওই ভেবেই যদি শাড়িটা গায়ে জড়ায় কবিত্বটা যে তাতে বেশি সমৃদ্ধ হবে তা নয়, বরং উল্টে আরো জলো ও ফিকে হয়ে যাবে। যাক। অশ্রু আপন মনেই একটু হাসলো। মোট কথা, সম্প্রতি শাড়ির কিছু অভাব হয়েছে। যা একখানা খদ্দর আছে সেটা গায়ে চড়ালে ঢের বেশি ফ্যাশানেবল হয় বলে তাতেও ওর আপত্তি। এই বেশ। এতেই ওকে উড়িয়ে নেবে। বাকল-পরার দিন ফিরে এলে অশ্রু আবার এসে ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করবে'খন—আজকের দিনে – মোহিনী-মিল্-এর এই শাড়ি ওকে আবৃত করুক! মোহিনীর সঙ্গে এতেই ওর মিল হবে।

রূপচর্চায় অশ্রু একজন পুরো আর্টিস্ট এতদিন উদ্দেশ্যহীন হয়েই অঙ্গ-সজ্জা

করেছে—নিজেকে তৃপ্তি দেবার জন্যেই। অবিশ্যি অলঙ্কারের আড়ম্বরে নয়, একমাত্র শাড়ি-পরার সূক্ষ্ম সুচারুতায়। কিন্তু আজকের শাড়ির আঁচলটা কিছুতেই বুকের ওপর দিয়ে ঠিকমতো লতিয়ে উঠছে না। কারণ আজকে ও একটি বিশেষ পুরুষকে মুগ্ধ করতে চায়,—প্রেমিকের অন্তরে স্বাস্থ্য ও সুষমা-সঞ্চার করার পক্ষে নারীসৌন্দর্যের উপকারিতায় ওর অগাধ বিশ্বাস। এ কথা বেশি মনে করেই ওর শাড়ি পরায় দেরি হচ্ছে। তাই বলে বুলুর সাহায্য নেওয়া দরকার নেই। বুলু এ-সব ব্যাপারে অত্যন্ত স্থূল, হয়তো পেছনের দিকে কতগুলি কুচি দিয়ে বসবে! মা গো! এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

শাড়ি পরা তো হলো—ওমা, বৃষ্টি এসে গেল যে! চড় মেরে ঠাট্টা! অশ্রু আরেকটু হলে কেঁদে ফেলেছিলো আর কি! বৃষ্টিতে ভিজে অভিসারে যাওয়ার নিয়ম অবিশ্যি আছে—কিন্তু আশ্চর্য, সেই যুগে কোনো অনুরাগিণীরই প্লুরুসি হয়নি! তখনকার দিনের বেরসিক কবিদের শাপ দিয়ে রসাতলে পাঠিয়ে অশ্রু জানলায় এসে দাঁড়ালো। এত জোরে বৃষ্টি না এলে যেন পৃথিবী আর বাসুকির শিরোধার্য থাকতো না! এই বর্ষায় কত কবির কলমের মর্চেই যেন মুছে যাচ্ছে। বিধাতা যে মঙ্গলময় নয় এর একটা সদ্য প্রমাণ পেয়ে অশ্রু খুশি হলো বলে কাঁদতে চাইলো। সত্যি, এ সময়টা কি করেই বা কাটবে? ঘুমিয়ে? কার সঙ্গে ঘুমিয়ে? বই পড়ে? তেমন কোনো বই পৃথিবীতে লেখা হয়নি। একটু সেলাই করলে কেমন হয়? নিজের কপালটা? একটা চিঠি? কাকে? যমকে?

বিরসমুখে জানলা থেকে ফিরে এসে অশ্রু ঘড়ির কাঁটাকে প্রকৃতিস্থ করলে। যাই বলো, এখন গেলে হয়তো দেখত প্রভাত ডেক্-চেয়ারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দুপুর বেলার পুরুষের ঘুম ভারি বিশ্রী দেখতে, ভারি বিস্বাদ! তাছাড়া বৃষ্টি এসে পড়ায় দুপুরবেলার নিজস্বতাই হারিয়ে গেল—এই নির্জনতার চেয়ে সেই নিস্তব্ধতা ঢের বেশি অর্থজ্ঞাপক, ঢের বেশি সুস্পষ্ট ছিলো। বৃষ্টিতে প্রেমালাপ জমে যা ভীরু, অর্ধস্ফুট, অনতিব্যক্ত—নিজের সামর্থ্যে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে, চতুর্দিকে মেঘের রহস্যাবগুণ্ঠন টেনে কোনোরকমে মুখ বাঁচায়,—ঠুনকো, পল্‌কা, পানসে! রৌদ্রদীপ্ত দুপুরের প্রেম স্পষ্ট, নির্ভীক, প্রখর—প্রতিটি বাক্য তরবারির তড়িৎ-বিকাশের মতো দৃপ্ত, তেজস্বী, ধারালো। সুচতুর ব্যঙ্গ, প্রচণ্ড কলহাস্য! উলঙ্গতা আছে বলেই তার উজ্জ্বলতা। বাইরের আকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে কণ্ঠস্বরে কৃত্রিমতা আসে না, না বা আচরণে জড়তা। দৃষ্টি সেখানে বাষ্পাকুল নয়; কঠিন, ক্ষুধার্ত। দেহে মল্লার বাজে না, বাজে দীপক! দুপুরের প্রেমে সতীবিরহব্যথী শিবের আশীর্বাদ!

এমন দুপুরটা আকাশের অশ্রুতে ভিজে ফ্যাকাসে, ভ্যাপসা হয়ে গেল। অশ্রুর জীবনে এ একটা পরম ক্ষতি। কথার মূল্য রাখতে গিয়ে বিকেলে যখন ও যাবে তখন মাটির সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ও ঠাণ্ডা হয়ে সব একেবারে মাটি করে দেবে। তখন আকাশ আসরে ছড়িয়ে, হৃদয়েরও তখন গোধূলিবেলা। গোধূলির চেয়ে দুপুরের ধূলিই ওর বেশি পছন্দ। হাতের কিছু না পেয়ে অশ্রু গেল বুলুর সঙ্গে আলাপ করে bored হতে। একে দিয়ে এক পেয়ালা চা করিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

বৃষ্টিকে এক সময়ে থামতে হলো। থামতে তাকে হতোই। সমস্ত কিছুরই একটা স্বাভাবিক অবসান আছে—এ একটা বড়োরকমের আশ্বস্তি। নইলে স্বয়ং বিধাতাই উঠতেন হাঁপিয়ে। এ-পৃথিবীটাও একদিন চলতে চলতে থেমে পড়বে যাক গে চুলোয়। আজকের বিকেলেই তো তার ধূমকেতুর সঙ্গে বাহুনিবদ্ধ হবার লগ্ন নয়। অশ্রু বুলুর চুল টেনে দিয়ে উঠে পড়লো।

খাটের নীচে স্যাণ্ডেলটা খুঁজছে, বুলু শুধোলো : সেজে-গুজে কোথায় যাচ্ছিস পোড়ারমুখি ?

ঘাড় নীচু করে রেখেই অশ্রু বললে—এই যদি সাজার উদাহরণ হয় তবে তোর আদিম প্রপিতামহী ইভ-এর লজ্জায় জিভ কাটবার আর দরকার হবে না। বাঁচলাম। কিন্তু জুতো কোথায় লুকিয়েছিস, বল্।

কপালে চোখ তুলে বুলু বললে—আমি কি জানি ?

—অবিশ্যি ইভ বা উর্বশী কারুরই জুতো-পরার অভ্যেস ছিল না,—আমি তো তাদেরই সমবয়সী। সহানুভূতি থাকা ভালো। চাইনে জুতো। তোদের পাঁউরুটির কুচো দেরে। মুক্তহস্তে যা দান করব মুক্তপদে তা ফিরিয়ে নেব দেখিস। বলে অশ্রু চুলের খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর নেড়ে চেড়ে বসিয়ে, মাথার কাপড়টা তার ওপর আলতো করে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সামনের মাঠে—ভিজা নরম সবুজ মাঠে। অমনি জানলা দিয়ে স্যাণ্ডেল জোড়া ছুটে এল। অশ্রু পিছন ফিরেও তাকালো না।

খালি-পায়ে মাঠ মাড়িয়ে যেতে-যেতে অশ্রুর রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ঘাসগুলিকে যেন পায়ের তলায় শিশু-সন্তানের চুমোর মতন নরম লোভনীয় লাগছে। রাস্তায় একটা গাড়ি নেই যে ডাকবে। এ মাঠটুকু পেরিয়ে রাস্তায় পা পাততে হবে ভেবে অশ্রুর মনে আর সুখ ছিলো না। খানিকক্ষণ এখেনেই টহল দেওয়া যাক। সুন্দর আকাশ —ড্রয়িংরুমে ঐ হালকা রঙের একটা কার্পেট হলে ভারি মানায়, ও রঙের কালো পানীয় পেলে অশ্রু তা এক চুমুকে খেয়ে ফেলতে পারে! হাওয়াতে একটু শীত-শীত করছে বুঝি,—নয়ানসুকের পাতলা ব্লাউজের উপর অন্তত একটা খদ্দরের চাদর জড়ানো উচিত ছিলো। আলিঙ্গন বহুকাল স্থায়ী হতে পারে না,—এক ফাঁকে ঠাণ্ডা

লেগে যেতে পারে। সর্দি হলে প্রেম জমানো ভারি কষ্টকর ব্যাপার। বারে বারে হাঁচি এলে কোনো কথারই গাম্ভীর্য থাকে না। হ্যামলেট যখন ওফিলিয়ার ঘরে এসেছিলো, কিংবা ওথেলো যখন নিদ্রিতা ডেস্‌ডেমোনার শয্যাপার্শ্বে, তখন দু'টি মেয়েই যদি হেঁচে উঠতো তাহলে দু' দু'টো খুন বেঁচে যেতো। বেঁচে যেতো বটে, কিন্তু শেক্সপিয়ার বাঁচতো না। অতএব একটা গাড়ি নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে।

রাস্তা। গেল মিনিট পাঁচেক কেটে। আকাশের রং বদলাতে শুরু করেছে—এ রঙ-এর পা-পোষেও অশ্রুর মন উঠবে না। এবারে আবার বৃষ্টি নেমে এলেই অশ্রুকে বাধ্য হয়ে প্রতীক্ষমানা প্রিয়ার চোখের জলের সঙ্গে তার উপমা দিতে হবে। না, বৃষ্টি আসবার আগেই বিধাতা বুদ্ধি করে রাস্তার উপর একখানা ভাঙা গাড়ি এনে দিলেন। বুদ্ধি করে,—দয়া করে নয়। কারণ, অশ্রুকে ভিজতে হলে বিধাতারই হতো মুশকিল, কেননা অশ্রু ডাক-বাংলোয় না গিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যেতো—একটা নূতন প্রেমাভিনয় দেখবার আনন্দ থেকে বিধাতা অকারণে বঞ্চিত হতেন। বাঙলা-দেশের বিধাতার ভাগ্য ভালো। গাড়িটা থামিয়ে অশ্রু পা-দানির কাদা থেকে শাড়িটা বাঁচিয়ে বসে পড়লো। গাড়ি চললো গড়িয়ে—গদাইলস্করি চালে। গাড়োয়ানকে তাড়া দেবে ভাবলে, কিন্তু অশ্বিনীকুমার দু'টিকে সায়েস্তা করা স্বয়ং সায়েস্তাখাঁরো কর্ম নয়। গাধা পিটিয়ে যে ঘোড়া করা যায় অশ্রুর আর সংশয় রইলো না।

ডাক-বাংলোটা তাহলে আছে—উড়ে যায়নি। বিধাতার অমানুষিকতার তালিকায় এ-ব্যাপারটা আজকের বিকেলের জন্য অন্তত অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে অশ্রু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে গিয়ে বাধা পেল। কেননা, নিশ্বাস এত দ্রুত হওয়া উচিত—বারান্দায় প্রভাত, সশরীরে—চীনের দেয়ালের মতো। দৃষ্টি গিয়ে ঠেকলো, রইলো আটকে। অশ্রুকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে প্রভাতই এল ছুটে—দূরে বল দেখতে পেয়ে গোল-কিপার যেমন ছুটে আসে। বললে,—বিকেল মরে বাসি হয়ে গেল,—এতক্ষণে বুঝি ঘুম ভাঙলো তোমার?

অশ্রু বললে,—গাড়োয়ানটাকে পয়সা দিয়ে বিদেয় কর তো আগে—পরে বিকেলের বিকল হওয়ার কাহিনী বলা যাবে।

পকেটে হাত রেখে প্রভাত বললে,—গাড়িটাকে না ছাড়লেই তো ভালো হতো; বেড়াতাম।

অশ্রু একটু হেসে বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি! তোমার পায়ে কি বাত হয়েছে যে গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যায়াম করতে চাও। তাছাড়া এমন সন্ধ্যা ক'জনের ভাগ্যে আসে! এমন সন্ধ্যার জন্যে ঊর্মিলা কত সন্ধ্যায়ই বৃথা বাতি জ্বেলেছে! গাড়ি চড়ে পরে না-হয় শ্বশুরবাড়ি যেয়ো, এখন এসো হাঁটি!

গাড়োয়ান বিদায় নিতে প্রভাত বললে,—তোমার যে খালি পা!

খুকির মতো হাত তুলে অশ্রু বললে,—তবে কাঁধে তুলে নাও। সামনে একটা খাড়ি বা নর্দমা পড়লে আমাকে নিয়ে ডগলাস্ ফ্যায়ারব্যাঙ্কসের মতো না হয় কসরৎ দেখিয়ো। হাঁটতে আমি খুব পারবো; হাঁটতে আমার ভালো লাগে। এসো শিগ্‌গির।

রাস্তা বেশ নির্জন,—বৃষ্টি পড়ে আকাশ তাজমহলের মেঝের মতন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—তাজমহল অশ্রু কোনোদিন দেখেনি, আকাশকেও ছোঁয়া গেল না—কিন্তু উপমা তার জন্যে আর অসার্থক হবে না। চোখ দিয়ে ছোঁয়া, চোখ দিয়ে ছবি আঁকা। এই চোখ দিয়ে মৃত্যুর পরে নতুন তারার নতুন গ্রামের ছবি আঁকতেও ওর ভাবতে হয় না। নিশ্চয়। সেই গ্রামের রঙ এখনকার সাতটা রঙের থেকে আলাদা আরেকটা—সেই জীবনের অনুভূতি আরো বহুবিচিত্র,—মাটির দেহ নিয়ে তার সম্পূর্ণ কল্পনা করা যায় না। সেখানে আলো নেই, খালি অন্ধকার। ধূসর অস্পষ্টতা। অপরিচয়ের গভীর সম্পর্ক। প্রয়োজনের বোঝা Lethe-র পারে ফেলে এসেছে। সেখানে—সেই চিরসূর্যাস্তের দেশে সুচির-স্তব্ধতা। অথচ কী আনন্দঘন উজ্জ্বল জীবন! সেই বচনাতীত অনুভূতিতে অশ্রু উত্তীর্ণ হবে কবে?

বৃষ্টির পর আকাশকে নীল চোখ ভাবলে দিগন্তরেখাকে মনে হবে ঠিক ভুরুর মতো বাঁকা। এক ঝাঁক পাখি বেরিয়ে এসেছে। পাখার অস্ফুট ঝাপটা শোনা গেল। আকাশ যেন শব্দ করে তার আনন্দ জানালো। হাঁটতে হাঁটতে অশ্রু বললো—দুপুরে ঘুমিয়েছিলে?

প্রভাত রেইন-কোটটা ডান কাঁধের ওপর গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললো—তুমি আস-আস করে ঘুমুনো আর হয়ে ওঠেনি। বাদলা-হাওয়া লেগে মন ভিজে যদি সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠে তাহলে তোমার হাঁচি পাবে না আশা করি। কদ্দিন পর দেখা হলো বল তো—অথচ মনে হয় যেন 'সেদিন সকাল'।

অশ্রু নীরব হয়ে রইলো। প্রভাত বলে চললো: যেদিন পিওন তোমার চিঠি দিয়ে গেল সেদিন ক্যালেণ্ডারে কোন তারিখ ছিলো জানি না, কিন্তু মনে হয়েছিলো সেদিনই আমার জন্মদিন। কেন আবার হঠাৎ ডাকলে বল তো?

অশ্রু বললে—এই জন্যেই সন্ধেবেলাটা আমি পছন্দ করি না,—নিজের মনের চেহারার ভালো করে ঠাহর হয় না। সব ঝাপসা হয়ে আসে। দুপুরেই সেইজন্যে আসতে চেয়েছিলাম। বেশ একটা সহজ স্পষ্টতা থাকে। কেন আবার ডাকবো? খুশি!

প্রভাত। তিন বছর পরে আবার মনে করলে—এর কি কোনো কারণ নেই?

অশ্রু। তিন বছর পরে আমার দাঁতে ব্যথা হয়েছে -এরো কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? তোমাকে ভীষণ করে মন চাইলো—দেখি তোমাকে পাওয়া যায় কিনা। দেখলাম তুমি তেমনি অপরূপ।

প্রভাত। চলো, নদীর ধারেই যাই।

অশ্রু। বেশি নির্জনতা আমার পছন্দ হয় না, আমি হাঁপিয়ে উঠি। সেই জন্যেই কলকাতায় যাবো—কালই। তোমার সঙ্গে।

প্রভাত। কলকাতায় কেন?

অশ্রু। সব কেন-র উত্তর দিতে গেলে কোটি কোটি কেনোপনিষদেও কুলুবে না। তোমার নাম প্রভাত কেন?

প্রভাত। কলকাতায় তো একলাই যেতে পারতে, আমাকে এতটা দৌড়িয়ে এনে কী লাভ হলো?

অশ্রু। সব কাজই একলা করতে হবে বিধাতা মেয়েমানুষকে এমন দিব্যি দিয়ে দেননি। কলকাতায় যাবো কারণ জলপাইগুড়িতে আর জল নেই; তোমার সঙ্গে যাবো কারণ তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে ট্র্যাভেল করতে আমার ভালো লাগবে। খুব।

প্রভাত। আমার তো না-ও লাগতে পারে।

অশ্রু। বলো কি, এ আমি বিশ্বাসই করবো না। আমি এখনো বুড়ি হইনি।

প্রভাত। হওনি নাকি?

অশ্রু। যাক, দরকারি কথাগুলি সেরে নি। আপাতত কলকাতায় গিয়ে আমাকে এক হোটেলে উঠতে হবে—বাড়ির দরজা তেমনি বন্ধ। দরজার গোড়ায় বসে ধন্না দেবো আমি তেমন ধার্মিকও নই, দরজা যে ভেদ করবো তেমন ধনুর্ধরও নই। অতএব—

প্রভাত। হোটেলে?

অশ্রু। হ্যাঁ, আকাশ থেকে পড়লে যে! গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠতাম, কিন্তু বেজায় খরচ। দু' একদিন হলে খুব চাল করে থাকা যেতো—কোনো সাহেবের সঙ্গে বন্ধুতা করবার সুযোগো মিলে যেতো হয়তো, কিন্তু প্রায় এক হপ্তার ওপর কলকাতায়ই ফিরোতে হবে। অতএব—হ্যাঁ, অতএব ক্যালকাটা-হোটেলেই ঘর নেবো।

প্রভাত। তোমার স্কিম তো খুব ইনটারেস্টিং। তারপর? আমি থাকবো কোথায়?

অশ্রু। দেখা করতে আসতে পারো দিনের বেলায়—রাত্রে বাইরের লোককে

ম্যানেজার নিশ্চয়ই allow করবেন না। আমারো ঘুমানো চাই তো। বিকেলে আসবে—অনেক জিনিস-পত্র কেনার দরকার—কুকার, হোল্ডঅল—

প্রভাত। সেফ্‌টিপিন ; হেয়ারক্লিপ—

অশ্রু। কেন য়্যাদ্দিন কলকাতায় থাকবো তা আন্দাজ করতে পেরেছো ?

প্রভাত। কি করে পারবো ? সাত দিন থেকে কলকাতাকে কেন সপ্তম স্বর্গ করে তুলবে তা তোমার বিধাতাই জানেন। মিস্ মেয়ো বোধ হয় য়্যাদ্দিনও ছিলো না।

অশ্রু। বোকার মতো যা-তা বোলো না। থাকব মানে থাকতে হবে।

প্রভাত। নিশ্চয় ! বোকার মতো মানে মূর্খের মতো।

অশ্রু। কেননা কলকাতাতে নেমেই তুমি হাওড়া গিয়ে কোনো গাড়িতেই বার্থ রিজার্ভড্ পাবে না। পূজোর আগে কি রকম ভিড় হয়েছে আইডিয়া আছে তোমার ?

প্রভাত। পাঁজির পাতায় কখন পূজো আসে তারই আইডিয়া নেই—

অশ্রু। অতএব—

প্রভাত। অতএব—

অশ্রু। অতএব বার্থ পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সাত দিন আগে টিকিট পাওয়া যাবে—দেখা যাক, অন্তত শেয়ালদা-দিল্লি প্যাসেঞ্জারে পাশাপাশি দুটো বেঞ্চি পাওয়া যায় কি না। একেবারে পাটনায়—

প্রভাত। বলিহারি ! আমি ভাবছিলাম যে-রকম কথার কদম ছুটিয়েছ, বুঝি ফংচু হয়ে কাম্‌স্কাট্‌কা যাচ্ছ ! পাটনা ? আমাদের বস্তিবাটি কি দোষ করলো ?

অশ্রু। তোমার মাথায় যে গোবর তা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। যুক্তিটা শোনো—

প্রভাত। পাটনা যাবার পক্ষে আবার যুক্তি আছে নাকি ?

অশ্রু। প্রতি একশো মাইল অন্তর একদিন করে ব্রেক-জার্নি পাওয়া যায়—সে জ্ঞান তোমার আছে ? আমাদের টিকিট তো লাহোরের - এগারো শ নিরানব্বুই মাইল। ই, আই, আর-এর টাইম্-টেব্‌ল আমার মুখস্থ। প্রথমেই নামবো পাটনায়।

প্রভাত। তবু তোমার পাটোয়ারি বুদ্ধিকে তারিফ করতে পারছি না, অশ্রু। পাটনায় নামবে হাইকোর্ট দেখতে ? এক্কা চড়ে যাবে দেখতে তুমি ?

অশ্রু। পাটনায় নেমে যে নালন্দায় যাওয়া যায় পুরোনো পাটলীপুত্রে—ইতিহাস তো পোকায় কেটেছে। তাছাড়া, সেখানে আমার একটি বন্ধু আছে।

প্রভাত। আশা করি পুরুষ।

অশ্রু। নিশ্চয়। মুখ কালো কোরো না। সমান sex-এ সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয় না।

প্রভাত। বুঝলাম। তারপর ? পাটনা থেকে কোথায় ? বক্সার ?

অশ্রু। সে বুঝি এক শো মাইল পেরিয়ে ?

প্রভাত। আমি তো আর টাইম্‌-টেব্‌ল মুখস্থ করিনি।

অশ্রু। তারপর সটান এলাহাবাদ !

প্রভাত। আঃ, একটা জায়গার নাম করলে বটে।

অশ্রু। তার মানে ? পাটনার থেকে এলাহাবাদে এমন কি বেশি [illegible] একেবারে গদ্‌গদ হয়ে উঠলে যে—

প্রভাত। সেখানে হাইকোর্ট তো আছেই, যমুনাও আছে।

অশ্রু। কেন, পাটনায় বুঝি গঙ্গা নেই ?

প্রভাত। কোথায় গঙ্গা, কোথায় যমুনা ! এসে মিললো এলাহাবাদে। সেখানে গঙ্গাও আছে যমুনাও আছে।

অশ্রু। লোহার শিকলে যমুনা তো সেখানে বন্দী।

প্রভাত। তবু তার সঙ্গে গঙ্গার তুলনা হয় না। যমুনা গঙ্গার মতো দেবী নয়, শিবের জটায় তার জন্ম নয় ; সে নিতান্ত নিরাভরণা, শীর্ণকায়া, বিরহব্যথিতা। ভারি লক্ষ্মী নদীটি। দুঃখিনী। পূর্ববঙ্গে এমনি একটি নদী আছে, তার নাম শীতললক্ষ্যা।

অশ্রু। তুমি যদি যমুনা নিয়ে অমন কবিত্ব করো তাহলে এলাহাবাদ যাওয়া বন্ধ করে দেব।

প্রভাত। কিন্তু আর কোথায় যাবে ? পশ্চিমে যতই এগোও যমুনাকে তুমি ছাড়তে পারবে না। অতীত রাতের একটি বিষণ্ণ স্মৃতির মতো তোমার মনে লেগে থাকবে। বেশ, এলাহাবাদ থেকে ?

অশ্রু। পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন এসো ফেরা যাক।

প্রভাতের হাত নিজের হাতে টেনে নিল অশ্রু।

অন্ধকার হয়ে এসেছে,—মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ মুখ বাড়িয়েছে দেখে দুজনের মুখ খুশি হয়ে উঠলো। অশ্রু বললে – খানিকটা ডান-হাতি গেলেই আমাদের হস্টেল, আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেতে পারবে তো ? দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে।

প্রভাত রেইন-কোটটা অন্য কাঁধের ওপর তুলে নিতে-নিতে বললে—এতদিনে জ্যোৎস্নার উপকারিতার একটা উদাহরণ পাওয়া গেল। নইলে এতদিন জ্যোৎস্নায় বরাবর কবিদের পেট কেঁপেছে।

অশ্রু। বাজে কথা বলো না। যেতে পারবে তো একা ?

প্রভাত। না-হয় একটা গাড়ি ডেকে নেবো।

অশ্রু। হ্যাঁ, তাই নিয়ো। গাড়ি তোমার জন্য গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না!

প্রভাত। কেন, তোমার হস্টেলে একটু জায়গা হয় না ?

অশ্রু। হয়! এই যে একসঙ্গে একটু হাঁটলাম তাতেই বাঙলা দেশে এতক্ষণে হয়তো ভূমিকম্প হচ্ছে। হয়তো দেখতে পাবো কালকেই খান তিনেক ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের দরখাস্ত পড়েছে।

প্রভাত। কারণ ?

অশ্রু। কারণ আমার গায়ে সীতা-সাবিত্রীর পালিশ নেই। সীতা তবু রামায়ণে (বাল্মীকির রামায়ণে) পাতালে প্রবেশ করবার আগে রামকে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়েছিলো, আমার সে-গালাগালি দেবারো অধিকার নেই।

প্রভাত। সীতা আবার রামকে বকলো কখন ?

অশ্রু। শুধু বকা, জন্তুর মতো মা-বাপ তুলে। সংস্কৃত জানো তো মূল বাল্মীকি পড়ে দেখো।

প্রভাত। আমার পড়ে কাজ নেই। বাল্মীকির চেয়ে বাঙালির রামায়ণ ঢের ভালো।

অশ্রু। মিথ্যে বানানো বলে—কিন্তু এর বেশি আর পা বাড়িয়ে কাজ নেই। এর পরেই স্কুল-কম্পাউণ্ড, যদি ওখানে এসে পড় তাহলে ইস্কুল হয়তো উঠে যাবে।

প্রভাত। বলো কি ? সত্যি, আমি কিন্তু এত সহজে স্কুল উঠে যাওয়ার খুব পক্ষপাতী।

অশ্রু। আর পক্ষ পেতে লাভ নেই। আমি চললুম। ছুটো মুখে গুজেই দেব লম্বা ঘুম। ভারি ঠাণ্ডা মিষ্টি রাত।

প্রভাত। বটে! আর আমি এমনি দাঁড়িয়ে থাকবো ?

অশ্রু। দাঁড়িয়ে থাকবে কেন, ডাক-বাংলোয় ফিরে যাবে। একা যাবার অভ্যাস কর। (গম্ভীর) একাই যেতে হবে। আর মায়া বাড়িয়ে কাজ কি। তবে ঐ কথা রইলো, কালই কলকাতা যাচ্ছি। ঠিক থেকো। আমি জিনিসপত্র নিয়ে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়বো কিন্তু।

প্রভাত। তা তো পড়বে, কিন্তু কখনো কথা হয়নি! তোমার একার কথাতে চললে এই ইস্কুলো চলতো।

অশ্রু। (ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে) ইস্কুল না চললেও দার্জিলিঙ্-মেল্ চলবে। এখন যাও, মেয়ে-ইস্কুলের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা ভদ্রতা নয়।

প্রভাত। আর মেয়ে-স্কুলের কম্পাউণ্ডের কাছে ছেড়ে দিয়ে যাওয়াটাই যেন ভদ্রতা! এ-সবো কি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে শেখা নাকি?

অশ্রু। তোমার সঙ্গে বকর-বকর করতে পারি না। কাল—কাল আবার দেখা হবে। বলে অশ্রু ভেতরে ঢুকলো।

কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে পেছন ফিরে তাকাবার সনাতন একটা রীতি আছে অশ্রু তার লোভ সম্বরণ করতে পারবে কেন? ব্যাপারটা ওর ভালো লাগলো না। চেয়ে দেখলো প্রভাত পকেট থেকে রুমাল বার করে নেড়ে-নেড়ে ওকে ডাকছে। এ যে দেখছি ভারি সেকেলে, অশ্রু খাপ্পা হয়ে ফিরে এল।

অশ্রু। এখনো দাঁড়িয়ে আছ যে?

প্রভাত। তোমার যাবার পরমুহূর্তেই যদি চলে যাই তবে ছবিটায় সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে ব্যালেন্স নেই সেখানে সৌন্দর্যও সেই। দৃশ্যটায় কি রকম যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। হতে গল্‌সোয়ার্দি কিংবা ওনিল্‌, বুঝতে সমস্ত দৃশ্যটা কেমন নড়বড়ে বেখাপ্পা, বেজুত, ঠেকছে।

অশ্রু। আমি তো ভাবছিলাম, বাড়ি ফিরে তবে কবিত্ব করবো। তুমি যে একেবারে লোক হাসালে। একেবারে রুমাল তুলে ডাকাডাকি। একবার একটা এঞ্জিন বাঁচাবার জন্যে একটি মেয়ে রেললাইনে দাঁড়িয়ে রুমাল তুলেছিলো জানি। তোমার মতো বিপদ বাড়াতে নয়। যদি কেউ দেখে ফেলতো?

প্রভাত। তবু তোমার 'দেখে-ফেলার' ভয় গেল না। যতই তড়পাও, লোক-নিন্দার হুক্কাহুয়া শুনে তুমিও ল্যাজ গুটোও। দেখতো তো বয়ে যেতো। রুমালে কি আছে, তা তো আর দেখতে পেতো না।

অশ্রু। রুমালে কি আছে? দেখি? সেই জন্যে ডাকলে?

প্রভাত। ডাকবার একটা কারণ দেখাতে হলে রুমালের রহস্য আমি দেখাবো না।

অশ্রু। না, না; দেখি।

প্রভাত। (রুমালটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে) চোখ বোজ।

অশ্রু। বাঃ, চোখ বুজে কখন আবার কে দেখতে পেয়েছে!

প্রভাত। সত্যিকারের সব দেখা চোখ বুজেই ঘটেছে, অশ্রু। চোখ বোজ।

অশ্রু। (চোখ বুজে) আমি বোকার মতো চোখ বুজলাম। দেখাও দেখি—

প্রভাত। আর আমি বুদ্ধিমানের মতো—

অশ্রু হেসে বললে তুমি তো ভীষণ villain। আচ্ছা, যদি কেউ দেখে ফেলতো!

প্রভাত। তুমি তো আর দেখতে পেতে না।

অশ্রু। এবারে তোমার দৃশ্য তার পূর্ণ নাটকীয়তা লাভ করেছে ?

প্রভাত। করেছে, কিন্তু তোমাকে কি রকম ঠকালাম বলো তো! অন্ধকারে চোখ বুজে রুমাল দেখা! চলো হস্টেলে, এই গল্প সবাইকে বলে আসি।

অশ্রু। সবাই থামচে দেবে।

প্রভাত। এ কী রকম হলো জানো? একবার এক মাদ্রাজি ভদ্রলোক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হল্-এ নিবিষ্টমনে ছবি দেখছেন- যতই দেখেন ততই আবিষ্ট হন। এমন সময় পেছন থেকে একটি মারহাটি ভদ্রলোক বললেন : এক চোখ বুজে তাকান, ছবিটা খুলবে। মাদ্রাজি ভদ্রলোক এক চোখ বুজবার কসরৎ করতে গিয়ে ক্ষণকালের জন্যে দু'চোখই বুজে ফেললেন, আর সেই ফাঁকে তাঁর পকেট থেকে মনিব্যাগটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর সর্বস্ব! তেমনি—

অশ্রু! তেমনি কি ? একটাচু মুতেই আমার সর্বস্ব লুট হয়ে যায় না বোকারাম— বলেই ফের পা বাড়ালো।

প্রভাত। (বাধা দিয়ে) যাচ্ছই তো, তোমার একখানা হাত দাও। দেখি তুমি নার্ভাস হয়েছো কি না। যক্ষ্মাক্রান্ত কীট্সের হাত ধরে কোল্‌রিজ নাকি মৃত্যুকে স্পর্শ করতে পেরেছিলো।

অশ্রু। এবার মুখ ফুটে চাইতে পারছো! হাত তো একবার দিয়েছি।

প্রভাত। সে চলবার হাত, বলবার হাত নয়। এবার বলবার হাত দাও। হাত চাওয়া যায়, কিন্তু চুমু চাওয়া যায় না। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায় ? কখনো কখনো ছিনিয়েই নিতে হয়। প্রথম চুমুমাত্রেই ভীরু, সাবানের বুদবুদের মতো। প্রস্ফুটিত হতে না হতেই যায় শুকিয়ে। আমার কি, স্বয়ং রুডল্ফ ভ্যালেন্টিনেরো। প্রথম চুমুতে চোখ চেয়ে থাকলে কেন জানি বাধে যেমন প্রথম কবিতার ছন্দে বাধে।

অশ্রু। এখন তো দেখছি কিছুতেই বাধছে না। তুমি যাবে না ?

প্রভাত। যাচ্ছি। এক কাজ কর - হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি ; তুমি বরং আমার যাবার পথে একদৃষ্টে চেয়ে থাকো।

অশ্রু। (হেসে) তাই সই।

প্রভাত। (পেছন ফিরে) দরকার হলে রুমালের বদলে আঁচল উড়োতে পারো।

অন্ধকার রাস্তায় প্রভাত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। অশ্রু তখনো একটি চিত্রলেখার মতো দাঁড়িয়ে।

ডাক-বাংলোয় ফিরে এসে প্রভাত বেয়ারাকে ডেকে তাড়াতাড়ি রাত্রির খাওয়া সেরে নিলো। একে আর রাত বলে না, — কলকাতায় তো এখন সবে সন্ধ্যা — কিন্তু এরি মধ্যে এদেশের ঘুম এসেছে। প্রভাত বারান্দায় ডেক-চেয়ারটা টেনে আনলো। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হলো না। পাইচারি করে সমস্ত শরীরটাকে চঞ্চল, অস্থির, বেগময় করে রাখতে চায়। আলস্য আজ ওকে তৃপ্তি দেবে না। এই উচ্ছলতা কমে এসে যখন মাত্র উষ্ণতায় পর্যবসিত হবে তখনই কবিতা লেখা সম্ভব। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার এই সংজ্ঞায় সে বিশ্বাস করে। মরুভূমি-সম্বন্ধে সত্যিকারের কবিতা লিখতে হলে ইজি-চেয়ার আর ইলেকট্রিক পাখা চাই। প্রেমিকার অন্তর্ধান না ঘটলে প্রেমের কবিতায় প্রাণ আসে না।

যাক কবিতা, কাব্যের চেয়ে মানুষ বড়ো। লক্ষ এপিকে একটা মানুষের সত্য চরিত্র বর্ণনা চলে না—সে এত বিচিত্র, এত বহুল-প্রকাশময়! কাল প্রভাত ছিল সামান্য কেরানী, পাঁচ আঙুলের একটা আঙুল,— অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, —নেহাৎই সাধারণ! ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন না থাকবার কোনো কারণই কাল ছিল না। বিকেল পাঁচটায় ড্যালহৌসি স্কোয়ারের চার ধারে কেরানীর যে বিপুল ঢল নামে তারই অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিলো,—ওকে সেখান থেকে অপসৃত করে নিলেও সে মিছিলের তাল কাটতো না। ও এত অপ্রয়োজনীয়। ভগবানকে ও এইজন্যেই কোনোদিন ডাকেনি যে, ভগবান বলে কেউ থাকলেও ওর কথা নিশ্চয়ই আর কানে তুলবেন না। এত তুচ্ছ লোকের এত অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা শোনবার জন্যে তাঁকেও কান খাড়া করে রাখতে হবে - ভগবানকে এত ছোট বলে কল্পনা করতে ওর বাধতো। সেই প্রভাত আজ কয়েক ঘণ্টায় যেন খোলস বদলে ফেলেছে। পৃথিবীর মাথার উপরে যে এত বড়ো একটা আকাশ আছে সে-কথা আজকে রাতে হঠাৎ আবিষ্কার করে ওর তৃপ্তির যেন আর শেষ রইলো না। সব চেয়ে আশ্চর্য, সেই আকাশের মুকুরে প্রভাত নিজের মুখের ছায়া দেখছে—এবং ওর মুখ যে কত সুন্দর তা ও এই প্রথম টের পেলো। ওর নার্সিসাস্-এর কথা মনে পড়ে। নার্সিসাস্ ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো—নিজেরই সঙ্গে সে প্রেমে পড়লো, নিজেরই বিরহে কাঁদলো, নিজেকেই পাবে না ভেবে অসীম বেদনায় আত্মহত্যা করলো। সে কী অপূর্ব মৃত্যু! নার্সিসাস্ ফুল হয়ে জেগে উঠলো ঝর্ণার উপর!

প্রভাত ভাবলো আমরা প্রিয়াকে ভালোবাসি না, ভালোবাসি আমরা আপন আত্মাকে—যে-আত্মা নারীকে প্রিয়া করে দেখেছে। তাই সে আমাদের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু, যার মধ্যে নিজেকেই বেশি করে দেখতে পাই। যে-প্রতিভায় আমরা প্রস্তরের বেদীতে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করি তার জন্যে আমাদের অহঙ্কারের অন্ত

কৈ ? প্রেমে আমাদের আনন্দ যতো, অহঙ্কার তার চেয়ে ঢের বেশি। এই অহঙ্কারে বিধাতাও আমাদের সমকক্ষ নন। তাই প্রেম যখন মরে, বেদনার চেয়ে অপমান এই জন্যেই বেশি লাগে যে, অহঙ্কার যায় ধুলিসাৎ হয়ে। অহঙ্কার যাওয়া মানে নিজের কাছে ব্যক্তিত্ব হারানো। নিজের কাছে লজ্জাই সব চেয়ে বড়ো লজ্জা।

নইলে অশ্রু তো এখানে গৌণ, ও যে কেরানী ছাড়া আর কিছু, ওরো যে এত বড়ো বায়ুমণ্ডলে নিশ্বাস ফেলবার অধিকার আছে, আকাশের আস্বাদ নেবার —তা ওকে বোঝালো ওর সদ্যজাগ্রত বুদ্ধি, নব-উন্মেষিত প্রতিভা! যেখানে হৃদয় জাগে, বুদ্ধি থাকে ঘুমিয়ে, সেখানে প্রেমের স্বভাব হয় ছিঁচকাঁদুনে স্যাঁতসেঁতে—আর যেখানে হৃদয় নেই, খালি বুদ্ধি, সেখানে প্রেম অর্থ সকালে উঠে গরম দুধ খাওয়া ও কাণ্ট-এর *Critique of Pure Reason*-পড়া! কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয় মেশাতে হবে! তাহলে দুটো প্রেমপত্র লিখে দু'রাত পাশাপাশি শুয়ে দুটো হাই তুলে পুন্নাম-নরক থেকে রক্ষা পেয়ে কায়ক্লেশে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে যা হোক।

ভাবতে বসলে মন যে বাঁধা সড়ক দিয়ে না চলে অলি-গলিতে গড়িয়ে পড়ে এর জন্যে প্রভাত মনকে শাসন করে মোড় ফেরালো। এমন সময় ও কোনোদিন সংসারের ভাবনা না ভেবে বারান্দায় বসে জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করবে এ-কথা ওর জন্মাবার ছ'দিনের দিন মা'র আঁতুড় ঘরে ঢুকে ওর ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই ওর কপালে লিখে রেখে যাননি। ও যেন ফের নতুন মুখোশ পরে অশ্রুর কাছে আবির্ভূত হলো—তার মানে ও ওর দ্বিতীয় চরিত্রাভিব্যক্তি আবিষ্কার করেছে। ব্রাউনিঙ মনে পড়ে :

> **"God be thanked, the meanest of His creatures**
> **Boasts two soul-sides, one to face the world with,**
> **One to show a woman when he loves her."**

কথাটা সত্যি, কবিতায়ো শোনায় ভালো; কিন্তু যে-মুখ করে আমরা এই নিরাপদ রুক্ষ সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করি, প্রেয়সীর কাছে সে-মুখ তুলে ধরতে পারবো না কেন, লজ্জা কিসের ? প্রেয়সীর কাছে দাঁড়াতে হলেই সে-মুখে মেকি পাউডার ঘষতে হবে—এই কল্পনা-বিলাসের তাৎপর্য কোথায় ? প্রেয়সীও আসবার সময় তাঁর আটপৌরে আধ-ময়লা শাড়িখানি ছেড়ে জরির চুমকি দেওয়া বেনারসি পরে এসে একেবারে নক্ষত্রমণ্ডিত অমাবস্যা-রাত্রির উপমেয়া হয়ে উঠবেন—এরি বা কাব্যগত প্রয়োজনীয়তা কিসে ? প্রভাত কেরানী, ক্ষুদ্রস্বার্থপীড়িত, লোভী, সংকীর্ণচিত্ত—এ-সব পরিচয় একদম লুকিয়ে লেফাফাদুরস্ত হয়ে অশ্রুর কাছে এসে

দেখা দেবে—উদার, মহানুভব, ইত্যাদি— ! কেন? প্রেম করবার বেলায়ো যদি এত লুকোচুরি—যেখানে অজস্র আত্মপ্রকাশের তাগিদ—তবে প্রেম করার চেয়ে দু'ছিলিম তামাক খাওয়ায় বেশি লাভ। এমনি করে পোষাকি কাপড়-চোপড় পরে পরস্পরকে দেখা দিতো বলেই ওথেলো আর ডেস্‌ডেমোনার মধ্যে এমন প্রকাণ্ড ফাঁক রয়ে গেল। ডেস্‌ডেমোনা ভালবেসেছিলো যোদ্ধা ওথেলোকে, ঘরোয়া ওথেলোকে নয়,—ফলে তার বুক পেতে ছুরি খেতে হলো। প্রেয়সীর কাছে মুদ্রাদোষ দেখানো নিষেধ আছে—এই নিয়ে রাশি-রাশি বই লেখা হলো—কেন বাপু, মুদ্রাদোষ নেই অথচ মানুষ—এমন অমানুষ আছে ক'টি ? সব সময়ে নিজের সঙ্গে বঞ্চনা করে একটা কৃত্রিম উজ্জ্বলতার মুখোশ পরে নিজের মহিমা বাড়াতে হবে - এই আত্ম-অপমান প্রত্যেক প্রেমিক কি করে সহ্য করেন ? পাছে ব্যক্তির স্বরূপ জানলে প্রেয়সী নাকের ওপর কাপড় টেনে যান পিছিয়ে ! যেখানে এত ভয় এত সন্দেহ সেখানে প্রেমের ফাঁসি হওয়াই তো উচিত একশোবার। যাকে জানতে চাইবো তাকে জানাবো না— এ অসামঞ্জস্যের কথা প্রেমের বেলায় ওঠে কেন? তাই প্রতিমুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরকে ঠকাচ্ছে। এবং সেই কারণেই "love-marriage" আর টিকছে না, উঠছে হাঁপিয়ে, পদে পদে অমিল,—পোষাকি কাপড়-চোপড় উইয়ে কেটেছে। জীর্ণ বসনের তলা থেকে দারিদ্র্য পড়েছে বেরিয়ে।

প্রভাত কথাগুলো নিয়ে মনের মধ্যে এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছে যেন অশ্রু ওর দেহের কূলে এসে একদিন উত্তীর্ণ হবেই। এমনি একটি বিশ্রী আশা করাও প্রেমের ব্যাপারে স্বাভাবিক; প্রেমও তার একটা নিশ্চিন্ত সহজ পরিণতি খোঁজে, হয় বিরহে বিস্মৃতি, নয় বিবাহে বৈক্লব্য! প্রভাত ক্ষণবন্ধুতার উপযুক্ত দাম দিতে জানে, তাকে আটকে রাখবার জন্যে তার গলায় দড়ি চাপিয়ে তার নিশ্বাস বন্ধ করে দিতে হবে এই বর্বরতা সে পছন্দ করে না। সে Moment Musical-এর ভক্ত।

তার কারণ প্রত্যেক ভালোবাসাই গভীর বন্ধুতায় দৃঢ়ীভূত হয়ে দুই দেহ আর দুই আত্মার ব্যবধান ঘোচাবে—মেয়েদের এমন প্রেমে প্রভাত বিশ্বাসবান নয়। এ-কথা টের পেলে অশ্রু নিশ্চয়ই কোমরে কাপড় বেঁধে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠতো,—এমন সব তর্ক করতো হয়তো যার যথার্থ্য প্রমাণ করতে প্রভাতকে এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রাস করতে হতো। কথাটা ওর তর্কের দিক দিয়ে ওঠেনি, অনুভূতির দিক থেকে উঠেছে—তর্ক অবশ্য ও-ও করতে পারে না এমন নয়। মেয়ে-মানুষের সঙ্গে তর্ক করায় এই অসুবিধে যে, সব কথা বলা যায় না, দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বেরুবার আগে জিভ কাটতে হয়—মেয়েরা সব ঠুন্‌কো পুতুল, গায়ে

আঁচড় লাগবে। পাঞ্জা কষতে হলে সমতল জায়গায় দাঁড়ানো উচিত। সম্ভ্রমের সিংহাসনে বসিয়ে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা চলতে পারে, তর্ক করা নয়। তাঁদের দয়া করে নেমে আসতে হবে।

মেয়েদের প্রেম সন্ততির জন্যে, ব্যক্তির জন্যে নয়। মেয়েরা ভালোবাসে স্বামী-নামক একটা গুণবাচক বিশেষণকে, কোন বস্তু-বিশেষকে নয়। তাই স্বামী যখন মরে তখন স্ত্রী কাঁদে বিধবা হলো বলে, অনেক অসুবিধায় এবারে তাকে পড়তে হবে বলে। মেয়ে হয়েছে প্রতিমা, পুরুষ হয়েছে প্রতীক। এই দুয়ে মিলে আমাদের প্রেম। শিশুকাল থেকে শিব গড়ে স্বামীর পূজো করে যে-ভাবটি মেয়েরা মনে মনে লালন করে যৌবনোদ্গম হতেই সে-ভাবটি যে-কেউর প্রতি আরোপিত করে মেয়ে হয় পতিব্রতা। সে-সৌভাগ্য তোমারো জুটতো, আমারো জুটতো, ও-পাড়ার পঞ্চাননো অযোগ্য হতো না।

বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের দোষ দেওয়ায় বাহাদুরি নেই—বিশেষ অশ্রুর অনুপস্থিতিতে। বায়রন যে বায়রন সেও পর্যন্ত তার *Sardanapalus*-এ মেয়েদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। বায়রনকে ক্ষমা করা যেতে পারে কেননা, ভাব-প্রকাশের বিচিত্রতাই কবি-প্রতিভার বিশেষত্ব। নারীর যা মূল্য তা কী সে সৃষ্টি করে তার মধ্যে নয়, কী সে সহ্য করে তার মধ্যে। সহ্য করাটা ভীরুর ধর্ম। সহ্য তাকেই করতে হয় প্রকৃতি যাকে বেঁধেছে; তাই সেটা তার কৃতিত্ব নয়। খুব তীব্র বেদনা বা আনন্দ অনুভব করবার তার ক্ষমতা নেই এবং সেই জন্যেই সে তেমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেনি যা অমরত্ব লাভ করতে পেরেছে। অমরত্ব লাভ করাটাই অবশ্যি সাহিত্যিক উৎকর্ষের চিহ্ন নয়। তবু অমরত্ব লাভ করা দূরে থাক, দুটো নাম করা যায় তেমন নামও মেয়েদের কোনো বাপ-মা রাখেনি। এবারে অশ্রু নিশ্চয়ই মারতে আসতো। মেয়ে সৃষ্টি করতে পারেনি? কেন? মাদাম কুরি? বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দাও, সাহিত্য। কেন ব্যারেট? উণ্ডসেট? শীলা কেইস্মিথ? চুপ কর অশ্রু, হাসিয়ো না বলছি। তার চেয়ে বলো না কেন অনুরূপা দেবী!

মশার কামড় খেয়ে বাইরে বসে থাকলে পূর্বপুরুষেরা উদ্ধার পাবে না। এবার ঘুমুনো যাক। ঘুমুতে যাবার আগে একটা সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। সিগারেট, সেও খাওয়া; জল, সেও খাওয়া! আর চুমু, সেও খাওয়া! বাঙলা ভাষায় ক্রিয়া নেই,—সে জন্যে জাতটাও অকর্মণ্য। ক্রিয়া নেই বলে আনন্দ নেই; তাই বেড়ে চলেছে ব্যাধি, বেড়ে চলেছে বার্ধক্য। কথা আবার ঘুরে যাচ্ছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ঘুমুতে গেলেই আর ঘুম আসবে না। তার চেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা যাক। টেলিস্কোপ ছাড়া গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে কোনো আবিষ্কার সম্ভব হবে না। খুব

একটা দার্শনিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করছি ভাবলে শিরদাঁড়াটা ডেক-চেয়ারের ওপর আলগোছে নেতিয়ে পড়ে। সব মিথ্যে, বাজে, বিস্বাদ!

একবার নাকি দুই চীনে ভদ্রলোক বার্লিনে গিয়েছিলো থিয়েটার দেখতে। দু'জনেরই সমান বিদ্যে, দু'জনেই সমান রসিক। খানিকক্ষণ বসে থেকে একজন লেগে গেল যন্ত্রপাতি দেখতে; আরেকজন কিন্তু কিছুতেই হার মানবে না। সে তেমনি ঠায় চুপ করে বসে-বসে সেই দুর্বোধ্য ভাষা গিলতে লাগলো। একেই বলে রসগ্রাহিতা। প্রথম জন হচ্ছে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত—সারা সৌরজগৎ ঘুরে বেড়ায়, অথচ না পায় সীমা না পায় থৈ; আরেকজন হচ্ছে দার্শনিক পণ্ডিত—দুজ্ঞের্য় রহস্য হাতড়ে বেড়ায়, অথচ না পায় অর্থ না বা রস! আমি করবো কাব্যসৃষ্টি, আমার পেছনে থাকবে সমালোচক, আমি গাইবো গান, পিছনে আসবে স্বরলিপি। আমি সূর্যের চারধারে গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে ঘুরিয়ে দিলাম—সে ঘোরার তাপ-নির্ণয় করতে ভিড় করে এল অসংখ্য বৈজ্ঞানিক। সমালোচকের আবদারে কবির কলম বেঁকে যায় না—পিথাগোরাস না এলেই পৃথিবী বুঝি হয়ে থাকতো চ্যাপটা, আর সূর্য বেচারা ঘুরে-ঘুরে দম খোয়াতো!

যাই বলো রসগ্রাহিতাই হচ্ছে সভ্যতার পরম পরিচয়। সৃষ্টিটা তত দামী নয়, যতটা তার রহস্য-উদ্ধার। বুনো অসভ্যরাও এমন সৃষ্টি করেছে যার অর্থ ও মর্যাদা তারা বুঝতো না বলেই তারা অসভ্য—কিন্তু তাতে যদি আমাদের তাক্ লাগে তবেই বুঝব আমরা সভ্য হয়েছি। নাঃ, এ ভীষণ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর পিন্ ফুটিয়ে সিগারেট খেয়ে কাজ নেই। ঘুমুনো যাক। কুঁজো থেকে বেয়ারা জল এনে দিলে, প্রভাত তা দিয়ে ঘাড় ধুতে বসলো।

অশ্রুর জিনিস-পত্রের ফিরিস্তি শোন: একটা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক—বুকে হাতি না নিয়ে এ ট্রাঙ্কটা নিলে রামমূর্তির খ্যাতি এক তিল কমতো না. প্রকাণ্ড বেডিং—তাতে বুঝি খাটের গদি থেকে শুরু করে পা-পোষ পর্যন্ত আছে—ছটা ঋতুর ছ প্রকার শয্যার সরঞ্জাম; তাছাড়া ছোট দুটো সুটকেস; একটা খাবারের বাক্স বেতের তৈরি; একটা ফোল্ডিং রকিং চেয়ার—একটি না হলে অশ্রুর না হয় পড়া, না হয় ছুটির দিনে দুপুরে ঘুমুনো; একটা বই-এর বাক্স কেরোসিন-কাঠে প্যাক করা; একটা ছোট বেডিং—পথে গাড়িতে পাতবে বলে; একটা জলের কুঁজো ভারি চমৎকার কাজ করা-এটা ফেলে অসতে পারতো, কিন্তু অমন চমৎকার কাজ করা জিনিস বলেই অশ্রুর মায়া লেগেছে। এই সব পদার্থ প্ল্যাটফর্মে জড়ো করে অশ্রু প্রভাতকে উদার কণ্ঠে বললে—লাগেজ করো।

প্রভাতের মাথায় যেন মালগুলো একসঙ্গে পড়লো ভেঙে—কর্ণের বাণ খেয়ে ঘটোৎকচের মুখের চেহারায়ো এমনি অঘটন ঘটেনি। প্রভাত বললে— আজ পর্যন্ত মনি-অর্ডার করতে শিখিনি,—আমার দ্বারা ওসব হবে না। যদি পারো তুমিই একলা এর ব্যবস্থা করো, নইলে থাক সব পড়ে—পরপারে কিছুই সঙ্গে যাবে না।

এই নিয়ে লেগে গেল তর্ক—তুমুল, উদ্দাম। পুরুষগুলো যে মেয়ে-বিহনে একেবারে অসহায়, অকর্মণ্য—অশ্রু এ-কথা অনেক আগে থেকেই জানে। এগুলোর না আছে বুদ্ধি না আছে বোধ। প্রভাত অসহায়ের মতো মুচকে একটু হেসে বললে —বাহন একটি না হলে আমাদের সত্যিই মানায় না। গণেশের যেমন ইঁদুর। নারদের যেমন ঢেঁকি।

লাগেজ-এর ব্যবস্থা অশ্রু একাই করলো। ডাউন-ট্রেনে ভিড় নেই—জানলার দিকের বার্থ টায় অশ্রু বিছানা পেতে নিলো। বললে—মাঝের খালি গদিটার ওপর পড়ে থাকো, বুঝবে মজা।

প্রভাত হেসে বললে—আমি মাঝের বেঞ্চিটাতে বসছিই নে, তোমার বিছানাতেই আমার একটু জায়গা হবে—বসবার। শোবার সময় না হয় উঠে আসবো।

অশ্রু। শোব না হাতি!

প্রভাত। তুমি শুয়ো।

অশ্রু। আর তুমি?

প্রভাত। জেগে থাকবো। প্রতি নিশ্বাসে তোমাকে দেখব। তোমাকে ঘুমুলে নিশ্চয়ই খুব আঁটসাঁট দেখাবে না।

অশ্রু। এই, আস্তে। বলে অন্যদিকের জানলার ধারের বার্থটায় যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শুয়ে আছেন তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলে।

গাড়ি দিলো ছেড়ে। স্টেশনে বুলুরা আসবে বলেও আসেনি—তাই ওদের লক্ষ্য করে সারা জলপাইগুড়ি শহরটার ওপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টিশেল হেনে অশ্রু তর্কে মন দিলে। প্রভাত বলছিলো : মেয়েরা যে সভ্য হয়নি তার প্রমাণ—চলতে হলে হয় নেবে গুচ্ছের আণ্ডা-বাচ্ছা, নয় রাশি-রাশি মাল। কখনো কখনো দু'প্রস্থই ; ভার কিংবা ভিড়।

অশ্রু প্রতিবাদ করে উঠলো : মেয়েরা না থাকলে খেতে কি? চলত কি করে?

প্রভাত। এক জোড়া জুতো না হলেও আমাদের চলে না,—সকালে উঠে একটা **dentifrice** দরকার। মেয়েরা না থাকলে রেঁধে দেবার অসুবিধে ঘটতো, ভাগ্যিস মেয়েরা আছেন! মইওয়ালা না থাকলে বিকেলে কলকাতার রাস্তার গ্যাস জ্বলতো

না ; রাস্তায় পড়তো না জল, জমাদাররা ধর্মঘট করলে শহরে লাগতো কলেরা। মেয়েদের উপকারিতায় আমি সন্দেহ করি নে।

অশ্রু রীতিমতো খাপ্পা হয়ে উঠলো : তুমি এমনি অপমান করে কথা কইলে আমি গাড়ির শেকল টেনে দেব।

প্রভাত। তা মেয়েরা পারেন।

অশ্রু। মেয়েরা কী যে পারেন তা যদি তুমি জেনেও স্বীকার না করো সে তোমার একচোখোমি। ত্যাগে সংযমে সেবায় আত্মোৎসর্গে এমন গরীয়সী আর কোথায় পাবে ?

প্রভাত। মানি ; বুদ্ধিতে নয় !

অশ্রু। মেয়ে ছাড়া তোমাদের শৈশব অসহায়, যৌবন নিরানন্দ, প্রৌঢ়তা বিরস, মৃত্যু রুক্ষ, তৃষাক্ত।

প্রভাত। পুরুষ ছাড়া তোমাদের জন্ম আকাশকুসুম, যৌবন পঙ্গু, প্রৌঢ়তা দুর্বল, মৃত্যু বিষাক্ত।

অশ্রু। মেয়েদের দুই হাতে অজস্র সেবা, অকৃপণ তিতিক্ষা, অপূর্ব আত্মনিবেদন। দুঃখ-দুর্দিনে মেয়েরা সান্ত্বনার দীপশিখা। মেয়েরা গৃহদীপ্তি, পুরুষের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী।

প্রভাত। কবিত্ব করো, বাধা দেব না। শুনতে আমার ভালোই লাগবে। মেয়েদের নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি করে লেখা রবি-ঠাকুরের কবিতার আমি প্রকাণ্ড ভক্ত। সেগুলো সত্যকথন বলে নয়, সেগুলো নেহাৎই কবিতা বলে। যদি বলো, ভাবুকের আদর্শ উন্নত হতে হতে অবশেষে মেয়ে-মানুষের আকার নেয়, আমি তোমাদের মুখ চেয়ে সেই ভাবুককেও না-হয় ক্ষমা করবো। কিন্তু সত্যি করে বলো দেখি মেয়েরা কোনোদিন কোনো বড়ো বেদনা সয়েছে বা কোনো বড়ো আনন্দের অধিকারী হয়েছে ?

অশ্রু। তুমি বলো কি ? প্রত্যেক মানবজন্মের পেছনে প্রসূতির যে তীব্র ও গভীর বেদনা আছে—তার চেয়ে মহত্তর বেদনার দৃষ্টান্ত তুমি দেখাতে পারো ? মেয়েরা বড়ো বেদনা সয়নি তো কে সয়েছে ? পৃথিবীতে মাত্র দুটি মহান ও মর্মভেদী ক্রন্দন আছে—এক সন্তান যখন হয়, আর সন্তান যখন মরে—দু'টি কান্নাই মায়ের, মেয়ের।

প্রভাত। কথাটাকে তুমি সুন্দর করে বললে বটে, কিন্তু এক ফুঁয়ে এর ভাবের কুয়াসা উড়িয়ে দিচ্ছি। প্রসবের বেদনাটা খুব বড়ো বেদনা নয়—তাহলে appen-dicitis operation করার বেদনাও তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পাল্লা দিতে পারে। ধরো, রোগীকে ব্যথা না দিয়ে আজকাল যেমন সহজে দাঁত তোলা যায়, তেমনি যদি painless delivery-র প্রচলন হয় তখন এ-বেদনার গর্ব যাবে ধূলিসাৎ হয়ে।

শারীরিক কষ্টের কথা যদি বলো, ট্রামগাড়ির তলায় পড়ে যার পা যায় আটকে অথচ যে বেঁচে থাকে—তীব্র বেদনানুভবের ক্ষেত্রে তাহলে সে হিরো। আমি সেই দুঃখের কথা বলছি না। তুমি মেয়ে বলেই নিতান্ত অসহিষ্ণু হয়ে কথাটার গূঢ় অর্থ বোঝনি। বেদনা অর্থ আত্মার বেদনা, আনন্দ অর্থ সৃষ্টির আনন্দ—আত্মপ্রকাশের আনন্দ।

অশ্রু। হয়তো তেমন ঢের আছে; আমি জানি না বলে দৃষ্টান্ত দিতে পারবো না।

প্রভাত। দৃষ্টান্ত নেই বলেই জান না। তেমন ভাবুক হবার সাধনা মেয়েদের নেই। তার জীবন স্বচ্ছ, প্রশান্ত, মন্থর - স্রোতের ফেনিল উচ্ছ্বাসে আবর্তসংকুল নয়, বেগবান নয়, সন্ধানব্যাকুল নয়। তার প্রাণে না আছে তাপ, দেহে না আছে স্বাদ! আমার রেইন্-কোট্‌টার মতো—জল থেকে ত্রাণ করে এই তার উপকারিতা। পুরুষের চেয়ে মেয়ে কত খর্ব, কত সংকীর্ণ! পুরুষ বাস করে একমাত্র বর্তমানে নয়, অতীতের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখেনি, দুই চোখে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন। পুরুষ অতীতকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতের আবিষ্কারে চলেছে। জীবন তার কত বিস্তৃত, কত অগাধ। আর মেয়েদের জগৎ হচ্ছে সামান্য সংকীর্ণ এই ছোট বর্তমানটুকু—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কোনো ভরসা রাখে না, বিস্মৃতির বালিতে অতীতকে সে মুছে দিয়ে এসেছে। তাই মেয়েরা জীবনে অগ্রসর হয় না, আত্মাও খর্ব হয়ে থাকে।

অশ্রু। যে-সমাজ খালিঃপক্ষপাতী পুরুষের সৃষ্টি, সেখানে মেয়েদের খর্বতা —

প্রভাত। তুমি এটা কেন লক্ষ্য করছ না আমি নারী-পুরুষের সামাজিক তারতম্য নিয়ে কথা বলছি না। আমি জানি সমাজ কৃত্রিম, বাইরের একটা খোলস মাত্র। সেখানে পুরুষ যদি অন্যায় করে তোমাদের দাবিয়ে রাখে সেজন্য তোমাদের না হয় ক্ষমা করলাম।

অশ্রু। আমাদের ক্ষমা!

প্রভাত। হ্যাঁ, তোমাদের। কারণ, সেখানেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে শক্তিতে ও বুদ্ধিতে তোমরা ছোট। কেউ কাকে পদানত করে রেখেছে—এ-ব্যাপারটার মধ্যে এক পক্ষের অত্যাচারের যতই কেন-না প্রমাণ পাওয়া যাক, অপর পক্ষের দুর্বলতাকে কি বলে অস্বীকার করবে? রাজাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলে গাল দিয়ে পরাধীন দেশের দাসত্বের না মেলে সান্ত্বনা, না বা সমর্থন। আমি জানি, সমাজ নিয়ে তোমাদের ওপর অনেক জবরদস্তি হয়েছে, আমি সে-দিক দিয়ে যাচ্ছি না, কেননা সমাজ, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, উল্টে যাবে—কিন্তু অঙ্গারকে শতবার ধুলেও তার মলিনতা ঘুচবে না। প্রকৃতি যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন তাকে মারবে কি করে?

অশ্রু। তার মানে?

প্রভাত। তার মানে তোমরা সেই সংকীর্ণই থাকবে, দৃষ্টি তোমাদের বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। ছোট স্বার্থ নিয়ে কলহ করবে, কেননা সৃষ্টি করতে বুদ্ধি ও বেদনাবোধের যে বিকাশ দরকার তোমাদের মস্তিষ্কে তার জায়গা নেই।

অশ্রু। তুমি যতই কেন না বলো—একদিকে পুরুষকে আমরা নিশ্চয়ই হারিয়েছি। সে আমাদের রূপ! কবিরা আমাদের পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

প্রভাত। জানি এ-কথা বলে তুমি অনেকটা আশ্বস্ত হবার ভান করবে। ওটা তোমাদের no-trump-এর বড়ো bid। রূপ তোমাদের আছে—তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র, আত্মবঞ্চনার বর্ম—হাতির যেমন দাঁত, গণ্ডারের যেমন খড়্গ। শক্তি যার নেই তারই অবলম্বন হলো চাতুরী। আর সেই রূপের স্থায়িত্বই বা কতদিনের? একটি দু'টি সন্তান হলেই সে-রূপ আইডিন্-লাগা মরা চামড়ার মতো খসে পড়ে—প্রসব করবার পর পিঁপড়ের যেমন পাখা খসে।

অন্য বার্থে যে ভদ্রলোকটি শুয়েছিলেন তিনি এবার উঠে বসলেন। খাপ থেকে চশমাটি বার করে নাকের মাঝামাঝি বসিয়ে প্রভাতের দিকে একটি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করলেন: মশাইদের কতদূর যাওয়া হচ্ছে?

প্রশ্নটা শুনেই বোঝা গেল এ-সব কথা-বার্তা শুনে ভদ্রলোকের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠেনি; তবু কণ্ঠস্বরকে বিনয়-স্নিগ্ধ করেই প্রভাত জবাব দিলো: কলকাতা। আপনি?

ভদ্রলোক বললেন—আমিও সেইখেনে! কলকাতায় কোথায় থাকা হয় মশাইদের? (অশ্রুকে লক্ষ্য করে) সঙ্গে উনি কে জিগ্‌গেস করতে পারি?

—পারেন না। বলে প্রভাত মুখ ফিরিয়ে পুরোনো কথায় ফিরে গেল: রূপের কথা বলছিলে না? পুরুষের তুলনায় মেয়ের রূপ যেন সূর্যের পাশে জাপানি দেশলাই। পুরুষের তুলনায় খর্ব – মনে ও বাক্যে ত বটেই—কায়মনোবাক্যে। এমন "unaesthetic sex" আর আছে কোথায়? কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত, কি ছবি—বধির, তোমরা বধির। বীঠোফেন্-ও বধির হয়েছিলেন কিন্তু সে বধিরতা তাঁর সৃষ্টি-সাধনাকে আহত করতে পারেনি; মিলটন হয়েছিলেন অন্ধ, কিন্তু সেই চিরসূর্যাস্তের অন্ধকারে যে-স্বর্গ রচনা করেছিলেন তার তুলনা নেই। আচ্ছা, সৃষ্টি-সাধনায় নারীকে তো কেউ বাধা দিতে আসেনি, সে কেন কবি হতে পারলো না, কেন পারলো না ছবি আঁকতে? উত্তর দাও, অশ্রু। প্রতিভার যে অধিকারী হয় অবস্থার বশ্যতা সে স্বীকার করে না। সে গৃহত্যাগ করে, ভাগ্যের সঙ্গে যুঝতে নিরস্ত্র হয়েই পথে বেরয়, অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে প্রতিভাকে সে একটি মহান মর্যাদা দান করে। তোমরা কেন এত

নির্জীব, কেন এত ভীরু, কেন এত পরীক্ষাকুণ্ঠ ? গৃহের দায়িত্বের কথা যদি তোল—তাহলে পুরুষের বেলায় পৃথিবীর দায়িত্বের কথা তুলবো। যদি সে প্রতিভার স্পর্শ পায় গৃহকে সে মানবে কেন, ভেঙে বেরিয়ে পড়বে। প্রতিভাবানও কি তোমার এই সংসারের ready-made তুচ্ছ নিয়ম-কানুন দিয়ে বাঁধা থাকবে ? সে নিজে নিজের নিয়ম তৈরি করবে, নিজের নিয়ম নিজে ভাঙবে। ধরণী দেন শস্য, তোমরা দাও সন্তান। তোমাদের দিয়ে রচনা লিখতে হলে এই বলে উপসংহার করতে হয়। রূপ ? সন্ন্যাসীরা যেমন গায়ে গেরুয়া টেনে ভণ্ডামি লুকিয়ে রাখে, তোমরাও তেমনি ছলাকলার আবরণে অন্তরের অন্তঃসারশূন্যতা ঢেকে রেখেছো। কথা কইছ না কেন ?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিবাণে অশ্রুর সর্বাঙ্গ এমন বিদ্ধ করছিলেন যে সে অসীম বিরক্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি মাঝের বেঞ্চিটায় ভদ্রলোকটির দিকে পিঠ করে একেবারে প্রভাতের গা ঘেঁষে বসে পড়লো। প্রভাত বুঝলো ব্যাপারটা। দু'জনে একসঙ্গে সামনের পরিত্যক্ত বেঞ্চিটায় পা ছড়িয়ে দিল—সামনে খোলা জানলার ওপারে ধাবমান অন্ধকার। আলোটা নিভিয়ে দিলে ভালো হতো। কিন্তু ভদ্রলোকটি অস্পষ্ট একটি হুম বলে ফের তেমনি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা খবরের কাগজ নিয়ে পড়েছেন এবার।

অশ্রু প্রভাতের কাঁধের ওপর মাথাটা প্রায় এলিয়ে দিয়ে বললে-- কিন্তু প্রেমের বেলায় আমাকে যদি তুমি প্রাধান্য না দাও, তাহলে কথা কইবো না।

প্রভাত। তর্কের বেলায় অভিমান খাটে না। নারীর বেলায় প্রেম কখনো পরম নয়; স্নেহটা একটা instinct, সে একটা গরুরো আছে। কিন্তু প্রেমে শুধু emotion নেই intellect-ও আছে,—তোমাদের বেলায় খালি দুধের জলীয় অংশটুকু। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে যে-প্রেম—সে যতই সত্য হোক—অনেকটা সমাজের দাবি, সংসারের সুবিধে। বিয়ের আগে যে প্রেম—সে যতই সত্য হোক—বিয়ের পরে তার আর অস্তিত্ব নেই, সে অস্ত গেছে। বিয়ের পরে খ্যাতি বাঁচাতে একমাত্র মেয়েরাই বলতে পারে : ওঁকে আমি বোনের চোখে দেখেছিলাম, কিংবা ভাগ্নীর। মেয়েরা আত্মিক সাহসে এত অধঃপতিত যে তাদের সামান্য sense of justice পর্যন্ত নেই।

অশ্রু। তুমি মাতৃস্নেহকেও উড়িয়ে দেবে নাকি।

প্রভাত। উড়িয়ে দেব না তবে জুড়েও যে বসতে দেব এমন নয়। মাতৃস্নেহ খুব পবিত্র—ভালো ভালো পয়ার লেখা যেতে পারে ও-বিষয়ে; কিন্তু পিতৃস্নেহের সঙ্গে তার এই জন্যেই সমান আসন হয় না কারণ পিতৃস্নেহে যেখানে অহঙ্কার, আত্ম-

চরিতার্থতা, মাতৃস্নেহে সেখানে মাত্র হৃদয়াবেগ, একটা সামান্য অভ্যেস। পিতৃস্নেহ instinctive নয় intellectual—instinct-এর চেয়ে intellect বড়ো।

অশ্রু। আমি তা মানি না। যতই কেন না বিরূপ তর্ক করো, আমি চটছিনে। বলে অশ্রু আরো একটু ঘেঁষে এসে গুন্‌গুন্ করে একটা সুর ভাঁজতে লাগলো। এবার অশ্রু দস্তুরমতো প্রভাতের কাঁধে মাথা রাখলে। ব্যাপারটা এত সাঙ্ঘাতিক নয় যে ট্রেন উল্টে যাবে। তবু পেছনের বেঞ্চি থেকে ভদ্রলোকের আরেকটি নকল হুঙ্কার শোনা গেল।

প্রভাত বললে—ভালো হয়ে উঠে বোস।

অশ্রু। বাঃ, শরীরকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি তাতে তোমার আপত্তি করবার কারণ কি? পুরুষের শক্তি সম্বন্ধে এত সব লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিয়ে সামান্য একটা মেয়ের খোঁপার ভার বইতে পারবে না এ-কথা শুনলে এতক্ষণের নীরব ও অনুপস্থিত মেয়ের দল টিটকিরি দিয়ে উঠবে।

প্রভাত। কিন্তু ভদ্রলোক কি ভাবছেন বল তো?

অশ্রু। তোমার সাহসের দৌড় এবারে বোঝা গেল। তোমার ভদ্রলোক কি ভাবছেন ভেবে তো গ্রহ-তারায় কলিশান লাগছে। তাঁকে যা খুশি ভাবতে দাও। শরীর যখন আহত হয় রুগ্ন হয়—তখন সেই কষ্ট লোকের দেখতে খুব ভালো লাগে। সেটা বেশ সহজ, স্বাভাবিক কিন্তু শরীরকে আরাম দিতে গেলেই লোকের চোখে তা সয় না, লাগে দৃষ্টিকটু। এর কারণ কি বলতে পারো? আজ যদি আমার খুব জ্বর হয়ে কাঁপুনি হতো ও তোমার কাঁধে মাথা রেখে শুতাম তাহলে দৃশ্যটা মানাতো, ঐ ভদ্রলোকের সহানুভূতিও পেতাম। কিন্তু সুস্থ শরীরটাকে একটুও মোলায়েম আয়েস দিতে গেলেই যত আপত্তি। প্রকাশ্যে ফোড়া কাটো, দাঁত তোলো—বেশ; কেউ কিছু বলতে আসছে না, কেননা শরীর কষ্ট পাচ্ছে; কিন্তু প্রকাশ্যে একটা চুমু দাও দিকি, লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে। নেংটি পরে সন্ন্যাসী সেজে শরীরকে কষ্ট দাও বাহবা দেবে, কিন্তু একটা গরদের আলখাল্লা পরলেই হলো সে বিলাসী, হলো খারাপ। কেন? শরীরটা তো প্রতিনিয়ত কষ্ট পাচ্ছেই, একটু আরাম পেতে দেখলে লোকের হিংসে হয় কেন?

প্রভাত হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, পেছন থেকে ভদ্রলোকটি রুখে উঠলেন: মশাইয়েরা কি সারা রাতই এমনি বকবক করবেন নাকি? চুপ করুন না খানিকটা। একে ভুগছি ব্লাড-প্রেসারে, তায় যত সব—। সঙ্গে থাকতো পাঁচকড়ি—দিতো ঠাণ্ডা করে।

কেউ চটলে তার ওষুধ হচ্ছে তাকে আরো চটিয়ে দেওয়া—মিষ্টি কথা বলে। তাই

প্রভাত পেছন ফিরে অতি-বিনয়ে সন্তব্রাহ্মধর্মদীক্ষিত যুবককে পর্যন্ত হার মানিয়ে বললে—আহা, ভারি কষ্ট হচ্ছে তো আপনার। আপনি শুয়ে পড়ুন; আলোটা নিভিয়ে দিই। বলেই উঠে স্থইচ অফ করে দিলে।

গাড়িতে অন্ধকারের সঙ্গে বাতাসের বন্যা। অশ্রুকে দু'হাতে অনুভব করে নিতে প্রভাতের দেরি হলো না। অন্ধকারের মতো ঘন ও উদ্বেল।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো স্টেশনে। প্রভাত বললে—চলো রেস্টুরাণ্ট কার-এ, বেটাইম হলেও কিছু খাওয়া যাক। লোক থাকলেও এর চেয়ে ভালো company পাবো।

উৎফুল্ল হয়ে অশ্রু বললে—চলো।

রেস্টুরাণ্ট কার-এ ঢুকে জানলার ধারে একটি ছোট টেবিল বেছে ওরা দু'জনে মুখোমুখি বসলো। টেবিলের ওপর দু'টো কনুইয়ের ভর রেখে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে অশ্রু বললো যাই বলো, আমি Eudemonist !

প্রভাত শব্দটার অর্থ জানতো না ; বললে—তার মানে ?

অশ্রু। মানে খুব সোজা, শব্দটাই জাঁকালো। মানে হচ্ছে : যাতেই আমি আনন্দ পাবো তাই আমার ধর্ম। যেখানে আনন্দ সেখানে পাপ নেই।

প্রভাত। যেখানে পাপ আছে সেখানে আনন্দও আছে।

অশ্রু। সত্যিই আনন্দ থাকলে সেটা আর পাপপদবাচ্য রইলো না। যেখানে আনন্দ নেই অথচ কর্তব্য আছে দাসত্ব আছে, সেইটেই পাপ। যেমন ধরো, আজ যদি তোমাকে বিয়ে করি, পরশুই সেটা পাপ হয়ে দাঁড়াবে, কেননা আনন্দ যাবে মরে। তাই করবো না বিয়ে—আনন্দকে জীইয়ে রাখতে চাই। বিয়ে বড়ো না আনন্দ বড়ো ?

ততক্ষণে বয় এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। প্রভাত বললে—তোমার মস্তিষ্ক যে-প্রকার উত্তেজিত হয়েছে তাতে মিছরির জল পেলে স্বাস্থ্যকর হতো ; তা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু মাংসই নেওয়া যাক আপাতত।

ছুরি-কাঁটা সরিয়ে রেখে অশ্রু আঙুলের ডগাগুলি ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা ধরো যদি মরে যাই ?

প্রভাত। ওঃ, তুমি কী morbid !

মাংস-চিবোনো বন্ধ করে অশ্রু বললে— সত্যিই, আনন্দদায়ক মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর পদধ্বনি শুনি। দুঃখের সময় জীবন এসে উপহাস করে, কিন্তু আনন্দের সময় মৃত্যু করে আশীর্বাদ।

প্রভাত। দু'জনে একসঙ্গে রেস্টুরান্ট কার-এ বসে কুক্কুট খাচ্ছি—এটা এমন কি আনন্দদায়ক মুহূর্ত যে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে হবে।

অশ্রু। তার মানেই তোমাদের তীব্র আনন্দানুভূতি নেই!

প্রভাত। এর আগে কোনোদিন বুঝি ফাউল খাওনি? ফাউলেই এত, বিফ-এ বোধহয় দশায় পড়বে। অত জোরে-হেসো না, নামিয়ে দেবে। যদি একান্তই মরি এ-সময়, তবে যেন কপালে একটি জীবনী-লেখক জোটে, এই প্রার্থনা করে মরবো।

অশ্রু। কারণ?

প্রভাত। রেস্টুরান্ট-কার-এ বসে দুটি নরনারী ঝোলমাখা মুখে চুমু খেতে-খেতে একসঙ্গে হার্ট-ফেল করে মরে গেল, এ-খবরটা পেলে অনেক জীবনীলেখকই কলম উঁচিয়ে আসবেন! রয়টারে এ-খবরটা উঁচু দামে বিক্রি হয়ে, সুদূর পৃথিবীতে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। যাদের জীবন যত ব্যর্থ তাদের জীবনী তত জমে। সেই জন্যেই রবিঠাকুরের জীবন-স্মৃতিটা কিছুই হয়নি। জীবনী লিখতে বসে ঘোমটা টানাকে আমি সইতে পারি না। একটা পরিপূর্ণ উদ্ঘাটন চাই।

অশ্রু। তার জন্যে অতি তুচ্ছ ঘটনার বিবৃতি করতে হবে? কখন খেলো কখন আঁচালো।

প্রভাত। না। জীবনের বড়ো বড়ো উপলব্ধির কথা বলতে হবে- বড়ো বড়ো আবিষ্কারের কথা, সেই উপলব্ধির পেছনে হয়তো নিদারুণ স্খলন আছে, মহান অধঃপতন! অথচ তাকে এড়িয়ে ভালোমানুষটি সেজে ধর্মভীরু জনতার বাহবা নেওয়ার মতো কাপুরুষতা আর কি আছে? খালি কবিকে জানবো মানুষকে জানবো না—সে-জানা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। জানো অশ্রু, ব্রাহ্ম-সংস্কার আমাদের এ বিষয়ে দারুণ ক্ষতি করেছে। আমরা বড়ো বেশি রকম prude, মিন্‌মিনে, খুঁৎখুঁতে। প্রকাশব্যাপারে আমরা নিতান্তই দুর্বল, লাজুক, মুখ-চোরা। তাই সাহিত্য আমাদের মেয়েলি থেকে যাচ্ছে—বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

কথাটা অশ্রু এড়িয়ে গেল। দাঁত থেকে আঙুল দিয়ে মাংসের ভুক্তাবশিষ্ট অংশ বের করে বললে—যাই বলো, খুব সুখী জীবন নিয়ে ভালো জীবনী জমে না। সত্যিই, ব্যর্থতাটাই বেশি মজার? রানী এলিজাবেথের চেয়ে জোয়ান্ অফ আর্ককে এই জন্যেই ভালো লাগে যে, বেচারিকে পুড়ে মরতে হয়েছিল। Austerlitz-এ নেপোলিয়ান-এর যুদ্ধের খ্যাতি বহু-কীর্তিত, কিন্তু তোমার কি মনে হয়না St. Helena-তে এসেই তিনি অমর হলেন! বাইবেল পড়েছ?

প্রভাত। না।

অশ্রু। বাইবেলে কথিত আছে Elijah এমন-কি মরেননি পর্যন্ত, রথে করে

স্বর্গে বাহিত হলেন। অমন একটা সাত্মাতিক রকমের গৌরবময় জীবন নিয়ে কোনো বড়ো লেখা হতেই পারে না। মহাভারতে কোন নারী চরিত্র তোমার ভালো লাগে?

প্রভাত। কাদের ভালো লাগে না একধার থেকে নাম বলে যেতে পারি: গান্ধারী, কুন্তী—

অশ্রু। একটি মাত্র মেয়েকে আমার ভালো লাগে,—সে দ্রৌপদী।

প্রভাত। কারণ?

অশ্রু। একজনকে ভালোবেসে পাঁচজনের হয়ে গেল। এমন আর একটা ব্যর্থ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তুমি সমস্ত স্বর্গ খুঁজেও পাবে না।

প্রভাত। কিন্তু সে-ব্যর্থতাবোধ দ্রৌপদীর ছিল না।

অশ্রু। সেটা আরো দুঃখদায়ক।

প্রভাত। বাঃ, যেখানে বোধ নেই, সেখানে দুঃখ কোথায়? তুমি তা একবারো বোধ করছ না যে তাজমহলের নিচে না শুলে ভীষণ দুঃখ, কিন্তু মমতাজকে তুলে আনতে গেলেই দেখবে তাজমহলটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্-এর অধম হয়ে গেছে।

অশ্রু। কিন্তু দৌপদী **polyandry** নিয়ে সে-যুগে এত বড়ো একটা আধুনিক **experiment** করলো, কৃতকার্য হতে পারলো না। যাকে সে অর্জন করেছিল সে-অর্জুনকে সে পাঁচজনের মধ্যে একজন করে দেখতে পারলো না। এটা কম ট্রাজিডি?

খাওয়া ফুরিয়ে গেল, কিন্তু পরের স্টেশনের তখনো দেরি আছে। অগত্যা দুটো স্যাণ্ড্উইচ ও দু' পেয়ালা চা'র অর্ডার দিয়ে প্রভাত তার বুকপকেট থেকে এক কবিতা বার করে বললে—তবে শোনো:

দু'টি হাত জোড় করি প্রথমে প্রণাম,
তার পরে হাত গিয়ে বাসা বাঁধে হাতের কুলায়ে
শীতল নরম,
তার পরে কথা নাই, চুপচাপ, একটু বা ঘাম,
তার পরে ঠোঁট ভাঙে অধরের পাথরের ঘায়ে—
এ-রকমি শুনেছি নিয়ম।
তার পরে? তার পরে আর কি শুনিবে?
মাথার উপর থেকে আকাশ গিয়েছে হয়ে চুরি।
একদম ফাঁকা।
বাতাস ফুরায়ে গেছে এক শ্বাসে, সূর্য গেছে নিবে,
তার পরে কবিতার খোলা খাতা রহে কোল জুড়ি,
তার পরে ভাষা ভুলে থাকা।

ঢোঁক গিলে প্রভাত বললে—মানেটা বুঝতে পারছ তো ?

অশ্রু। তার মানে, কি রকম হয়েছে আমার থেকে একটা মত চাও ?

প্রভাত। তোমার মতকে আমি প্রাধান্য কোনো কালেই দিতে রাজি নই, বিশেষত সাহিত্যালোচনায়,—তবু যখন শোনালামই মত জানতে চাওয়াটা স্বাভাবিক।

অশ্রু। ছাই হয়েছে। প্রেমাস্পদা অন্তর্হিত হলে ও-রকম একটা অসহায় ভাব নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে কবিতার খাতা নিয়ে বসে থাকতে হবে—এ-দুর্বলতা ও অস্বাস্থ্য সইতে পারি না।

প্রভাত। তার মানেই, তুমি কিচ্ছু বোঝনি। কবিতাকে তোমরা হিতোপদেশ ছাড়া অন্য কিছু বলে কবে বুঝবে ? এ শুধু একটা মানস-ভঙ্গির বর্ণনা,—এটা ভালো না মন্দ এ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে বসেছে! খালি কোলাহলই করতে পার, রসগ্রাহিতা তোমাদের নেই। অস্থির হয়ো না, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। থিয়েটারে মেয়েদের মতো কাউকে চেঁচাতে শুনেছ ? সেই জন্যে গ্রীসে থিয়েটারে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো।

অশ্রু। কবিতা-বোঝার সঙ্গে থিয়েটারে ঢোকবার সম্পর্ক কি ?

প্রভাত। সম্পর্ক এই, ললিতকলাচর্চায় তোমাদের দান করবার যদি কিছু থাকে, তা হচ্ছে কোলাহল! তোমাদের বুঝতে হবে বলেই সব-কিছুকে 'কথামালার' স্তরে নামিয়ে আনতে চাও। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি কবিতা লিখিনি,—আমার Muse যদি খুশি হন, তাই ঢের।

অশ্রু। তোমার কবিতা ভালো হয়নি, এ-কথা বলার যদি আমার স্বাধীনতা না থাকে তবে আমাকে তুমি বৃথাই পরিশ্রম করে কবিতা শোনালে! কেন ভালো হয়নি, তার একটা যুক্তি পেলে তুমি খুশি হও বুঝি, কিন্তু কেনই যে ভালো হয়েছে, তাই বা তুমি বোঝাতে পারবে ? যতই কসরৎ কর, রবীন্দ্রনাথের সিংহাসন আর কাড়তে পাচ্ছ না। তিনি বাঙলা সাহিত্যে চিরজীবী।

প্রভাত। হোন চিরজীবী, তাঁর আয়ুর অঙ্ক মহাকাল কষবে। কিন্তু তিনি চিরকাল বিরাট পর্বতের মতো পথ জুড়ে বসে থাকবেন আর আমরা সমস্বরে তাঁর সাহিত্যিক দীর্ঘায়ুতার জন্যে জয়ধ্বনি করবো, আমাদের সময় এত অপর্যাপ্ত নয়। রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার মানেই বাঙলা সাহিত্যটাকে রসাতলে পাঠানো। যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাধা হয়ে আছেন আমাদের বাঁচতে হলে তাঁকে আঘাত করতেই হবে।

অশ্রু। তুমি যে এখুনি কোমর বেঁধে লড়াইয়ে লাগলে দেখছি। যারা যত

বেশি দুর্বল যত শ্লথপ্রাণ তাদেরই আস্ফালন বেশি। চমকের চকমকি ঠুকতে পারলেই তাদের চরম আত্মতৃপ্তি। এক লাফে সিঁড়ি ভাঙতে চায় acrobat-রা, আর্টিস্টরা নয়। রবীন্দ্রনাথকে ডিঙোনো সোজা, সমকক্ষ হওয়াই কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ।

প্রভাত। জানো, কোনো স্বপ্নবিলাসীই সত্যিকারের কবি নয়—অন্তত বিংশ শতাব্দীতে নয়। খালি মলয় হাওয়া আর হ্যানাটোজেনে খাঁটি মাটির সাহিত্য হয় না—

অশ্রু। আকাশের সাহিত্য হোক—তারই বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আমরা চাই। মাটির নাম করে আমরা পাঁকের উপাসক হতে চাই না।

প্রভাত। হাতে যার ধুলো লেগে নেই, ললাটে যার শ্রমের স্বেদবিন্দু শোভা পেল না, গায়ে যার লাগেনি দারিদ্র্যের আঘাত—তেমন কবিকে আমরা মেঘলোকে নির্বাসন দেব। মেঘ-তরঙ্গ, আকাশ-ঝটিকা—ঢের হয়েছে; এখন চাই মাটি, প্রতি দিবসের সংগ্রাম, প্রতি দিবসের পাপ!

অশ্রু। কিন্তু প্রতি দিবসের সেই পরিচয়টাই পৃথিবীর বড়ো পরিচয় নয়। মানুষ যখন মরে তখনো তার চোখ অর্ধ-নিমীলিত থাকে, জীবনকে দেখবার জন্যেও চক্ষু আমাদের অর্ধ-উন্মীলিত রাখতে হবে। চোখ দুটো বড়ো করলেই বড়ো কোরে দেখা হয় না। রবীন্দ্রনাথ খুব প্রকাণ্ড আর্টিস্ট বলেই জীবনকে এমন সত্য—রহস্যাচ্ছন্ন বলেই সত্য—করে উদ্ঘাটিত করেছেন! আর তোমরা অতি-আধুনিকেরা সেই জীবনকে বীভৎস, বিকৃত, বিশ্রী করে দেখাচ্ছ। তোমরা বিংশ শতাব্দীর ব্যাধি।

প্রভাত। তুমিও দেখছি সাধারণ riffraff-এর দলে। গত কাল যা হয়ে গেছে এদের পক্ষে তাই বড়ো নজির। অতীতের লাঠি দিয়ে তারা বর্তমানকে প্রহার করে। তোমাদের রবীন্দ্রনাথকেই ধরো না। 'নষ্টনীড়' রচনা করে তিনি তখনকার বাঙলা-সমাজে যে অনিষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ শোনা গেছল, সেই 'নষ্টনীড়'ই এখন অতি-আধুনিকদের কাছে সংযম শিক্ষার standard হয়েছে। কে জানে দশ বছর বাদে এই অতি আধুনিকদের অসংযমই তুলনামূলক সমালোচনায় পরবর্তী সাহিত্যিকদের কাছে মনে হবে বিরস, মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ নয় বলেই কুৎসিত। তুমি খানিক আগে জোয়ান অফ আর্কের নাম করেছিলে না? তারই দৃষ্টান্ত নাও। ১৪৩১ খৃস্টাব্দে তাকে ঈশ্বরনিন্দার জন্য পুড়িয়ে মারা হলো, পঁচিশ বছর পরে সেই ডাইনি মেয়েকেই ফের গির্জা নবজীবন দান করলে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তার প্রায়শ্চিত্ত হলো, ১৯২০ তে সে হলো canonized! আজ যাকে তুমি ব্যাধি বলছো সে-ই এককালে হবে

বিশল্যকরণী। না-ও হতে পারে। তার জন্যে ভীরুর মতো জীবনকে সম্পূর্ণ জানা ও জানানোর থেকে নিজেকে সঙ্গোপনে বঞ্চিত রাখবো - এ আর্টিস্টের ধর্ম নয়! গ্যয়টের Die Leiden des Jungen Werthers (উচ্চারণ ঠিক হয়নি নিশ্চয়ই) পড়ে অনেক লোক নাকি আত্মহত্যা করেছিল। পরে গ্যয়টকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এতগুলি মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী মনে করে দুঃখ বোধ করছেন কিনা। গ্যয়ট হেসে বললেন : মরতে দাও ওদের জীবনে আরো অনেক কলঙ্ক আছে, আরো অনেক কুশ্রিতা। প্রচুর, প্রচুর ; এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। অতি-আধুনিকের লেখা পড়ে কেউ যদি ভ্রষ্ট হয় তবে উত্তর দেব : হতে দাও, এই উনিশ শতাব্দীর পাপ ও দুঃখের জন্যে অন্তত অতি-আধুনিকরা দায়ী নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে যদি কেউ প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করে তবে তোমাদের রবিঠাকুর কি তাঁর বইগুলি পুড়িয়ে ফেলবেন ? তিনিও কি বলবেন না : মরতে দাও ভীরুদের। কিন্তু আর না, স্টেশন এসে গেছে। এসো প্লাটফর্মে হাঁটি। আজ রাত্রে আর ঘুম হচ্ছে না।

প্লাটফর্মের যেখানটায় চেঁচামেচি একটু কম সে-রকম একটা জায়গা বেছে নিয়ে অশ্রু ও প্রভাত পাইচারি করতে লাগলো। গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে। নতুন করে কথা শুরু করবার মতো আবহাওয়া পেয়েই প্রভাত বলে চললো : অতীতে অভ্যস্ত জনসাধারণ আমাদেরকে যার জন্যে নিন্দে করছে সে-ই আমাদের প্রথম গুণ, আমাদের প্রধান মূলধন! আমরা সেই নিন্দনীয় গুণেরই অনুশীলন করবো - সে-ই আমাদের নিজস্বতা। আমরা নিজস্বতা বর্জন করবো না—আমরা ততটা নির্ভীক। প্রত্যহের পৃথিবী নিয়ে public-এর কারবার, তারা অসাধারণের আবির্ভাবে উদ্ব্যস্ত হতে চায় না,—তারা আরামলোভী, যা কিছু ভূতপূর্ব তারা তাদের ভূত! ওদের কথায় আমরা কান পাতি না—সে-ই আমাদের বড়ো বিজ্ঞাপন। ওরা ঝড়কেও ঢেলা মারে, বন্যার জলেও থুতু ছিটোয়। সত্যি অশ্রু, যে-আর্টিস্ট এই public-এর সঙ্গে চিরকাল মিতালি পাতিয়ে কায়ক্লেশে কলম বাঁচিয়েছে—কলমের খোঁচা মেরে এদের অস্থির, ক্ষতবিক্ষত করে দেয়নি—সে কখনোই বড়ো হতে পারেনি জেনো। যারা মাঝারি তারাই করে মীমাংসা, যারা করে মীমাংসা তারাই জেনো মাঝারি। বরং মূর্খ ভালো, মাঝারিকে সইতে পারবো না। আমাদের সঙ্গে public-এর চিরজন্মের বিরোধ —তাদের আমরা ঘাড় ধরে নবপ্রভাতের দেশে টেনে নিয়ে যাব ; যতই তারা হাত-পা ছুঁড়ুক, যেতে তাদের হবেই। তখন আবার দেখবে তারা আর সেখান থেকে এগোতে চাইছে না। Public থেমে থাকতে চায়, ওরা ভীরু, সন্দিগ্ধ। আমরা এই জনতার শত্রু, জনতার মুক্তিদাতা।

খারাপ হওয়ার কথা বলছো ? সন্ন্যেসিনি দেখেও লোকের কামোদ্রেক হয় বিশ্বাস

করো? কালীর চরণামৃত খেয়ে একজন কলেরা হয়ে অক্কা পেয়েছিলো সে-খবর রাখো? Angleo-র ট্র্যাজিডির কথা জান তো? জানো না? Isabela-র মতো পবিত্র, তাপসী মেয়েকে দেখে তার জীবনে ঘটলো পরম অধঃপতন। চৈত্রসন্ধ্যা এলেই অধরে চুম্বনস্পৃহা জাগে কেন? আমরা কী করে খারাপ না হয়ে পারি? আমাদের চামড়ার নিচে যে রক্তস্রোত বইছে তা-ই আমাদের মাতাল করে রেখেছে। যতদিন একলা ছিলাম, ভালো ছিলাম, চরিত্রবান ছিলাম। তারপর তুমি এলে। চরিত্র আর ঠিক থাকে কি করে?

গাড়িতে উঠে দেখা গেল ভদ্রলোক তাঁর দিকের জানলা তিনটে খুলে দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আলো নেভানো, পাখা চলছে। হাইজিন-এর এটা কি-রকম নিয়ম ঠিক নিরূপণ করবার চেষ্টা না করে অশ্রু আর প্রভাত এবার স্বচ্ছন্দে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে পারলো। ফটো তুলে রঙ চড়ালে রাধা-কৃষ্ণের অসম্মান হতো না। ভাগ্যিস এটা শুক্লপক্ষ নয়; চাঁদ উঠলেই দৃশ্যটা হতো ফিকে, কথা-বার্তা হতো মাজা-ঘসা, পালিশ করা। প্রেমের ব্যাপারে কবিরা চাঁদকে কেন যে এত আস্কারা দিয়েছেন বলা কঠিন। অন্ধকারে কত সুবিধে।

এইখেনে অশ্রু ও প্রভাতের মুখ না এঁকে যদি ওদের দেহভঙ্গি দুটোকে নন্দলাল বসুর সূক্ষ্ম রেখায় এঁকে দেওয়া যেত তো ভালো হতো। অমন pose-এর জন্যে কন্টিনেণ্টের বড়ো-বড়ো আঁকিয়েরা পর্যন্ত বড়ো-বড়ো দাম নিয়ে আসতেন। কথায় সেটা আঁকতে গেলে বেশি-রকম স্থূল হয়ে পড়বে। বেশি কথা বলাও মুশকিল। ভাষায় সব কথা খুলে বলার লোভ এমন প্রচণ্ড হয় যে সুর যায় কেটে। ওরা পাশাপাশি বসে মাঝের বেঞ্চিটাতে প্রভাতের প্রসারিত পা-র ওপর অশ্রু আলগোছে তা'র পা দুটি তুলে দিয়েছে এবং কাজে-কাজেই centre of gravitation-এর স্থান-পরিবর্তন হওয়ার দরুন অশ্রুর মাথা প্রভাতের কাঁধের ওপর পড়েছে এলিয়ে; এবং দু'জনে নেহাৎই কথা কইছে বলে ওদের গালে গাল লাগাতে পারছে না। ওটুকুর ব্যবধান না থাকলেই যেন ওরা ধরা পড়ে যাবে।

প্রভাত বললে আচ্ছা ও-কবিতা তো তোমার ভালো লাগেনি। হস্‌টেলের কমপাউণ্ড থেকে তোমার সেই বিদায় নেওয়া ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা লিখবো ভাবছিলাম; মাত্র চার লাইন হয়েছে। শোনো:

> বক্ষের সম্মুখে আসি যবে তুমি মাগিলে বিদায়,
> ভয়কুণ্ঠ দু'টি স্তন শিহরিল উত্তপ্ত আশ্লেষে:
> পলক পতন মাত্র সহিল না; বুঝিলাম হায়,
> চুম্বনের কালটুকু ফুরায়েছে চুম্বনের শেষে।

অশ্রু বলে উঠলো : অশ্লীল।

বলা-য় লাভ হলো এই অশ্রুর মাথাটা তার লোভনীয় উপাধান হারালো। প্রভাত সোজা হয়ে উঠে বসলো, বললে—কেন অশ্লীল ? চুম্বন আর স্তন আছে বলে ? চা খাওয়া বলতে পারবো, চুমু খাওয়া বলতে পারবো না ? তোমার ফুস্‌ফুস্‌ বলতে পারবো, বুকের পাঁজরা বলতে পারবো, স্তন বলতে পারবো না ? লক্ষ্মণ যে সূর্পণখার স্তন কেটে ফেলেছিলো, কৃষ্ণ যে পুতনার স্তনাগ্র দংশন করে তাকে ঠাণ্ডা করলে সেগুলো অশ্লীল ?

অশ্রু উঠলো হেসে ; বললে—মোটেই তার জন্যে নয় ; একটি মাত্র 'হায়' ঢুকে ব্যাপারটাকে বিশ্রী করে তুলেছে। নইলে চলনসই হয়েছে। ওখানেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত, এর পর অগ্রসর হলে তোমাকে পুলিশে ধরবে।

প্রভাত রীতিমতো খাপ্পা হয়ে উঠলো : পুলিশে ধরবে ? অশ্লীলতার জন্যে ? দুর্নীতির জন্যে ? জানো অশ্রু, heresy-এর ভয়ে মধ্যযুগে কোনো বড়ো সাহিত্য হলো না, বিংশ শতাব্দীতেও কোনো বড়ো সাহিত্য হবে না এই morality-র ভয়ে। কথাটা অবিশ্যি জর্জ ম্যুর-এর।

অশ্রু। যারই হোক, তোমরা অতি-আধুনিকেরা এত সব অশ্লীলতা লিখছ যে রীতিমতো তোমাদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রভাত। কিন্তু বিচার করবে কে ? এ তো আর জমির চৌহদ্দি-বিচার নয় ; এখেনে চাই সূক্ষ্ম রসবোধ, সূক্ষ্মতর কবিমনীষা—তোমাদের দেশের কটা বিচারকের তা আছে ? আমেরিকা তো ভীষণ শিক্ষিত ও সভ্য দেশ, কিন্তু সেখানে *Replenishing Jessica*-র বিচারের সময় জুরিরা যে-বিদ্যার পরিচয় দিয়েছেন তা শুনলে তুমি হাঁ হয়ে যাবে। বারো জনের মধ্যে তিনজন রাতকাণা বলে কোনো-দিন কোনো বই-ই পড়েননি, আটজন সমসাময়িক সাহিত্যের কোনোই খবর রাখেন না, বাকি একজন স্পষ্ট স্বীকার করলেন : বাড়িতে আমার হয়ে আমার স্ত্রী-ই পড়াশোনা করেন! এরাই তো করবে আমাদের বিচার ? পুলিশের হাতে ভারতীর এই বলাৎকার (কথাটা অবিশ্যি অতি-আধুনিক নয়) অসহ্য।

অশ্রু। তোমরা যে-রকম বাড়াবাড়ি করছ তাতে শঙ্কিত হবার কারণ ঘটেছে।

প্রভাত। বেশি দামের আরব্যোপন্যাস বা ব্যাসের মূল মহাভারত না হয় লোকে কিনতে পারবে না, কালিদাসের সমাস ভেঙে ভেঙে সংস্কৃত পড়বার ধৈর্য্য হয়তো অনেকেরই নেই, ভারতচন্দ্র যোগাড় করা অনেকের পক্ষে দুষ্কর,—কিন্তু চার পয়সা দিয়ে খবরের কাগজে যে legal intelligence কিনতে পাওয়া যায় তা তুমি ঠেকাবে কি করে ? দু' পয়সার বাঙলা কাগজগুলোও ধর্ষণ-বৃত্তান্তে ঠাসা।

সেখানে তো উপন্যাস নয় যে উড়িয়ে দেবে, মোটা সত্য কথা – প্রত্যক্ষ ও নিষ্ঠুর। তা পড়ে পাঠকদের নৈতিক অবনতি হয় না? বেছে বেছে ঐ খবরগুলোর প্রাধান্য দেওয়ার কোনই উদ্দেশ্য নেই? তোমার সাহিত্যের বেলায় চরিত্র টলমল করে ওঠে। তা হলে law-reports অশ্লীল, বাড়িতে পারিবারিক চিকিৎসার জন্যে আনা হোমিওপ্যাথিক বই অশ্লীল, দেয়ালে টাঙানো কালীর মূর্তি অশ্লীল, নিরাকার ব্রহ্ম অশ্লীল,—কেননা, প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কোনো অঙ্গই তাঁর নেই।

অশ্রু। Law-reports বা ডাক্তারি বইয়ের মর্ম বুঝতে হলে specialisation দরকার।

প্রভাত। সাহিত্যের বেলায়ই সে specialisation-এর কথা উঠবে না কেন? তুমি পদ্যমালা শেষ করেই পড়তে যাবে ভারতচন্দ্র, *Nursery Rhyme* পড়েই হুইটম্যান, বড্‌লেয়ার, বায়রন? এই আস্পর্দ্ধা তোমার আসে কেন? ছেলের হাতে Rabelais বা Boccaccio পড়তে পারে এ ভয় যতখানি, ছেলে তার দাদার Anatomy-র বই খুলে genital organs-এর ছবি দেখে ফেলতে পারে – এ ভয়ো কম নয়। পরিণত বয়সের চিন্তাকে শিশুর বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করে তুলবো – এ জবরদস্তি সাহিত্যের বিচারেই উঠে থাকে। ছেলেদের তো সিগারেট খাওয়া অপরাধ —সেই জন্য আমি খাবো না সিগারেট? বলে প্রভাত একটা সিগারেট ধরালো: তুমি কবে খেতে শিখবে?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রভাত বলে চলল: তুমি হেন্‌রি ভিজেটেলির নাম শোননি। তিনি ছিলেন এক দুর্দ্ধর্ষ প্রকাশক—তেমন প্রকাশক বাঙলা দেশে ক' শতাব্দী বাদে আসবে বলা যায় না। Zola-র ইংরিজি অনুবাদ তিনি ছাপিয়েছিলেন, তাছাড়া তাঁর প্রিয় গ্রন্থকার ছিল সব অশ্লীল লেখক: Flaubert, Goncourt, Gautier, Murger, Maupassant, Paul Bourget। তাঁকে পুলিশে ধরলে, তাঁর অপরাধ এত জঘন্য বলে বিবেচিত হলো যে তিনি তার পক্ষে একটা উকিল পর্যন্ত পেলেন না। সত্তর বছর বয়সে তাঁর তিন মাস জেল হয়ে গেল। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে অশ্রু, ভিজেটেলি তবু জোলার হুবহু অনুবাদ করাননি,—'an expurgated Zola outraged the sloppy Victorians!' এখন এই জোলা ইংলণ্ডেও বহু-বরেণ্য! তোমার বইয়ের বাক্সে হ্যাভ্‌লক এলিসের *The Psychology of Sex*-এর তু' তিনটে ভল্যুম দেখলাম। এলিস্‌ এখন ঋষিতুল্য বলে বিশ্বকীর্তিত, কিন্তু এই এলিস্‌কেই একদিন রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল—ইংলণ্ডে বই তাঁর ছাপা হলো না। তেমনি দেখো একদিন অতি-আধুনিকদের অশ্লীল বই-ই স্কুলপাঠ্য হবে—সুইন্‌বার্ণ হয়েছে, হুইট্‌ম্যান হয়েছে—অথচ জীবদ্দশায় এঁদের কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি।

অশ্রু। সমাজে যে-রুচি প্রচলিত আছে তাকে নষ্ট করতে এলে নিশ্চয়ই ইষ্ট হয় না। সমাজ ওঠে ক্ষেপে।

প্রভাত। এককালে মেয়েদের সেমিজ-পরাটা সমাজের রুচিতে বাধতো; তখন ব্লাউজের প্রচলন হয়নি বলে উত্তমাঙ্গ সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ আব্রু ছিলো না। সেও একটা রুচি। এখন সে-কথা স্বপ্নে ভাবলে তোমরা স্বপ্নে জিভ কাটবে—গরমের দিনে খালি গায়ে শুয়েও। এককালে সহমরণে যাওয়াটা খুব উচ্চাঙ্গের সতীধর্ম ছিলো; এখন সে-অনুরোধ করলে তোমরা assault-এর চার্জ আনবে। বরং দু'রাত্রি শোক করা সোজা, চিতেয় উঠে চিৎকার করাটা বর্বরতা। রুচির কথা বোলো না। ইংরেজ মেয়েরা দেখায় বুক, বাঙালি মেয়েরা পিঠ, আর হিন্দুস্থানি মেয়েরা পেট। সুচিরকালের জন্যে কোনো রুচিই আটকে থাকে না। সব দেশেই সব সমাজেই রুচি তার চেহারা বদলাচ্ছে জাপানে ও রাশ্যায় মেয়েরা একসঙ্গে উলঙ্গ হয়ে স্নান করে—শুনে তুমি নিশ্চয়ই লজ্জায় নেতিয়ে পড়ছ - আমাদের কাছে এ-ফ্যাশান দস্তুরমতো অশ্লীল—ইংরেজদের কাছেও। এককালে ইংলণ্ডে মেয়েদের স্কার্ট জুতো ছাড়িয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে ধুলো না ঝাঁট দিলে আর রক্ষে ছিলো না, এখন সে-স্কার্ট হাঁটুর ওপর উঠেছে। পায়ের কোন point-এ এসে অশ্লীল বলে থামতে হবে বলতে পারো? তিরিশ বছর আগে ankle দেখে যে চাঞ্চল্য হতো এখন হাঁটু দেখে তা হয় না; ডিফেন্সের সময় যা বুক বলে নিন্দিত হতো এখন তা মাত্র কাঁধ! কিন্তু, আবার শুনছি স্কার্টের নাকি অধঃপতন ঘটছে, অর্থাৎ ফের নিচে নেমে আসছে; এর যুক্তিটাও রুচিবৈষম্যের পরিচয় দেবে। কারণ নাকি এই: অনাবরণ সৌন্দর্যকে বাধা দেয়। সৌন্দর্য আসলে হচ্ছে ইসারা, রূপে নয়, রেখায়; রাসে নয় রসে; রহস্যে অর্থাৎ গোপনতায়। তাই এখন আবার সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলবার জন্যে সবাই ঝুঁকে পড়েছে দেখছি। কখন আবার উলটোটা হবে কেউ বলতে পারে না।

অশ্রু। তোমাদের মাথা খেয়েছে যত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য! আমাদের সাত্ত্বিক দেশে তোমরা যে-সব ভাব আমদানি করছ তাতে হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। য়ুরোপের ছাড়া-কাপড় পরে তোমরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে যে সমস্যার সমাধানে কলম শানাচ্ছ সে-সব সমস্যাই ধোঁয়া, মনগড়া! য়ুরোপে যেটা জীবন মরণের কথা, সেটা তোমাদের কাছে রঙিন ভাববিলাসিতা মাত্র।

প্রভাত। মুশকিল এই, সাত্ত্বিক দেশের শিবের যে-পুজোর প্রথা আছে তা শুনে মিস্ মেয়োর মূর্চ্ছা হয়েছিলো। গৌহাটির কামাখ্যা আমাদের সব চেয়ে বড়ো দেবী। ভারতবর্ষের মন্দিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে এসো দয়া করে। দরজা-জানলা বন্ধ রেখে যে-হাওয়া আমরা বিষিয়ে তুলেছি তাকে আমরা মুক্তি দিয়ে পবিত্র করতে চাই।

আমরা আজ ছোট শহরের ছোট গলির বাসিন্দা নই, বিরাট পৃথিবীতে আমাদের বাসা, সব মানুষের বেদনা আমাদের নিজের বেদনা। আমাদের সমাজে সমস্যা নেই তো কোথায় আছে? পরাধীনতাই বড়ো সমস্যা; তারপরে sex। এই যে দিনের পর দিন নর-নারীর সুচির ব্যবধান চলেছে এটা কি দেশের পক্ষে খুবই শুভ? যে-দেশে নর-নারীর স্বাধীন বন্ধুতার স্থান নেই—সে-দেশ উঠবেই তো বিষিয়ে। পাশ্চাত্যের ভাব আমদানি করছি বলে যে অভিযোগ করছো তারো ভারি মজা আছে। বাঙলায় যেটা অশ্লীল, সংস্কৃতে সেটা নয়, ইংরিজিতে তো নয়-ই। আবার জার্মানিতে যেটা অশ্লীল নয় সেটা ইংরিজিতে জঘন্য। Dreiser-কে যখন তার *Sister Carrie*-র জন্য ধরলো (পড়নি বইটা? আমার কাছে আছে।) তখন সে বললে কি জান: আমার নাম Dreiser না হয়ে যদি Dreisershefsky হতো আর আমি যদি আমেরিকা থেকে না এসে Warsaw থেকে আসতাম তাহলে কপালে এই দুঃখ থাকতো না। কিন্তু তা যখন নয়, বিদায়! গ্রাম্য খাঁটি ভাষায় লিখতে গেলেই মুশকিল, খুব পোষাকি করে লেখ, মানিয়ে যাবে। ইংলণ্ডে বইয়ের দাম কম হলে অশ্লীল, বই মাকে উৎসর্গ করলে আর অশ্লীল নয়।

অশ্রু। তুমি sex-কে আমাদের দেশে খুব বড়ো সমস্যা বলে মনে কর?

প্রভাত। নিশ্চয়ই! হথর্নের মতো তাকে আমি ফুল নাই বললাম, তবে ঐ সমস্যাটার উপযুক্ত সমাধান হয়নি বলেই এত অস্বাস্থ্য, এত চিত্ত-দারিদ্র্য। আমরা হাত বাড়িয়ে প্রতি কাজে নারীর সাহায্য পাই না, তাই কাজ আমাদের কাছে উৎসব হয়ে ওঠেনি। এই আড়াল যদ্দিন না ঘোচে তদ্দিন sex বানান করতে গেলেই আমাদের দাঁত ভাঙবে। তাই আমাদের সাহিত্য মেয়েদের ব্রতকথার সামিল হয়ে উঠতে না পারলেই শিবের জটায় গঙ্গা গেল শুকিয়ে। এমন বই লেখা চাই যা স্বচ্ছন্দে মেয়েদের পড়ার টেবলে পড়ে থাকতে পারবে—যা বাপ-মা-ভাই-বোন মিলে পড়ে কাঁদতে পারবে। কিন্তু জীবনে এমন সব ব্যাপার নিত্যই ঘটছে, অশ্রু, যাতে আমরা বাপ-মাকে নিমন্ত্রণ করলেও তাঁরা আসতে লজ্জা পাবেন। সাহিত্যের বেলায় তাঁদের এই অভিভাবকত্বের অর্থ কোথায়?

অশ্রু। কিন্তু সাহিত্য খালি যে যৌনসম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করবে এ-অস্বাস্থ্যও বা তুমি সমর্থন করছো কি করে? জীবনব্যাপারে ওটাই কি summum bonum?

প্রভাত। যদি বলি, তাই, আমাকে কী ভাববে জানি না। মানুষের যত কিছু বৃহত্তর উপলব্ধি সব এই sex-এর সাহায্যেই ঘটেছে। ধরো প্রেম। প্রেম তো sex ছাড়া কিছুই নয়। তুমি ঐ শব্দটার একটা স্থানিক অর্থ করো না—ও একটা ধর্ম;

বাঙলা ভাষায় ওকে অনুবাদ করতে গেলে বলতে হয় ভালোবাসা। খালি তাই নিয়েই সাহিত্য হবে,—লেখকরা দর্জি বা ছুতোর হ'লে তেমন ফরমায়েস করা যেতো হয়তো ; —কিন্তু যদি কারুর সাহিত্যে সত্যিই sex বড়ো উপাদান হয়ে ওঠে, তাকে যেন কৃত্রিম লজ্জা এসে অভিভূত না করে, সৃষ্টিকে সে যেন বলিষ্ঠ হতে দেয়। যে-লেখা গভীর উপলব্ধিপ্রসূত যে কখনোই অশ্লীল হতে পারে না—, তাই ভল্‌টেয়ার অশ্লীল নয়, হোরেস্‌ অশ্লীল নয়, বায়রন অশ্লীল নয়, শেক্‌স্‌পিয়ার অশ্লীল নয়। কিন্তু এক সময় ইংলণ্ডে শেক্‌সপিয়ারের অশ্লীলতা সংশোধন করতে এক মহাপুরুষের উদয় হয়েছিলো —নাম তাঁর টমাস্‌ বৌড্‌লার ; তিনি শেক্‌স্‌পিয়ারকে কাটতে বসলেন। কিন্তু আবার সেই মজা হলো, অশ্রু।

অশ্রু। কি ?

প্রভাত। **Victorian**-দের কাছে সেই **bowdlerised** শেক্‌স্‌পিয়ারই মনে হলো **'too frank'**।

অশ্রু। আচ্ছা তুমি কি মনে কর না এই যে ঝাঁকে-ঝাঁকে লালসা-লিপ্ত লেখা বেরুচ্ছে মাসিক কাগজে, তাদের বন্ধ করা উচিত ?

প্রভাত। **Gourmont**-এর একটা কথা শোন : **When morality triumphs, nasty things happen.** প্রচার বন্ধ করলেই কলম বন্ধ হয় না। অশ্লীলতার বিচার যারা করবে তাদের বিদ্যে-বুদ্ধির পরিচয় তোমাকে নতুন করে আর দিতে হবে না। কিন্তু কি কারণে বন্ধ করবে শুনি ?

অশ্রু। লেখা পড়ে অপরিণতবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা নষ্ট হবে বলে।

প্রভাত। এটাই মজা অশ্রু, যারা এই অশ্লীলতা **prosecute** করে তাদের নষ্ট হবার ভয় নেই, নষ্ট হবে তাদের স্ত্রী, তাদের ছেলে-মেয়ে। নিজেদের এই প্রকার নিশ্চিন্ত **superiority**-বোধটা অত্যন্ত কৌতুকের কিন্তু। পরের জন্যে তার মাথা-ব্যথা, নিজে সে নির্মুক্ত। আচ্ছা, সিনেমা দেখে ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী খারাপ হয় না, রাস্তায় কুকুর দেখে, চৌরঙ্গিতে মেমদের পা দেখে ? তুমি **shocked** হয়ো না, অশ্রু। শাস্তি দেবে বলে যে অশ্লীল বই তুমি কেড়ে নিলে, তোমার সেই অশ্লীল নামাঙ্কিত করে দেবার দরুনই কি তা হু-হু করে উড়ে যাবে না ? ছেলেরা ইস্কুলের ঠিকানায় ভি-পি করে বই নেবে, স্ত্রীরা দেওরদের দিয়ে বাজার থেকে কিনে আনবে ডবল দাম দিয়ে। এইটেই সব চেয়ে মজার, সাহিত্যের শ্লীলতার বিচার হবে **criminal law** অনুসারে, সাহিত্যিক রসবোধের নিয়মানুসারে নয়। যা সত্যিই কুশ্রী তা আপনিই যাবে শুকিয়ে, আদালতের লাল ফিতে বেঁধে তাকে মর্যাদা দেবার কারণ কি ? ছেলে-মেয়েদের চরিত্র খারাপ হবে ভেবে তোমারো যে মাথা ধরে গেছে। ছেলে-মেয়েদের sex সম্বন্ধে

train কর না কেন? বার্ট্র্যাণ্ড্ রাসেল্-এর মতানুসারে তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদের সামনে ব্যায়াম করবার সময় নগ্ন হয়ে তাদের মিথ্যা রহস্যসন্ধিৎসা নষ্ট করে দিতে পারবে? যেখানে mystery সেখানেই অশ্লীলতা। ছেলে যখন বাপকে শুধোয়: এঞ্জিন কি করে চলে, এরোপ্লেন কি করে ওড়ে, বাপ তাঁর সাধ্যমত উত্তর দিতে কুণ্ঠা করেন না। কিন্তু যখন ছেলে বলে: বাবা, আমি কী করে হলাম, তখনই বাপ আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দেবেন: তুমি চাঁদ থেকে নেমে এসেছ, ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে গেছেন। চাঁদ থেকে যে নেমে আসা যায় না, ঈশ্বরকে যে চোখে দেখা যায় না এবং বাপের ঐ আম্‌তা আম্‌তা করে বলার জন্যেই ছেলের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়ায় রহস্যাচ্ছন্ন, বাপ দাঁড়ান মিথ্যাবাদী। ছেলের কৌতূহল বাড়ে, এবং যদি খারাপ হওয়া বলো সে তখন থেকেই খারাপ হয়। সাহিত্য পড়ে খারাপ হওয়ার ভয়, বাড়িতে গর্ভিণী আত্মীয়া-বর্গকে দেখে ভয় নেই? আস্তে হেসো, ভদ্রলোক জেগে উঠবেন। ঘুমিয়ে আছেন বলেই এতো সব কথা বলা যাচ্ছে।

একবার আমেরিকায় স্কুল-মেয়েদের sex-information-এর আদি-কারণ জানবার জন্যে চেষ্টা হয়েছিল, বেশি মেয়ে যোগ দেয়নি—মোটে ১৫৫ জন। তালিকা যা হয়েছিল তা দেখ।

প্রভাত পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বললে,—এটা আমি টুকে রেখেছি।

অশ্রু পড়তে লাগল:

পড়ে	৭২
কথাবার্তা কয়ে	১৪
মাস্টার, নার্সদের কাছ থেকে	৬
চাকরদের থেকে	১৬
দেখে (পশুপাখি বাপ-মা ছেলেপিলে)	২৬
আত্মীয়-স্বজন	৮
বুড়োবুড়ির থেকে	১৩
	মোট—১৫৫

অশ্রু বললো: তবেই দেখতে পাচ্ছ পড়েই বেশি মেয়ে বকেছে।

প্রভাত হেসে বললো: কি-কি পড়ে বকেছে তারো একটা হিসাব নাও। বলে আরেক টুকরো কাগজ বার করলো।

অশ্রু পড়লো:

বাইবেল

ডিক্সনারি

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া

শেক্‌স্‌পিয়ার

ডিকেন্স

ডাক্তারি বই

স্পেনসারের *Faerie Queene*

থ্যাকারে

জর্জ এলিয়েট

স্কট

মটলির *Rise of the Dutch Republic*

প্রভাত। আমাদের দেশেও যদি হিসেব নেওয়া সম্ভব হতো তো এরি অনুরূপ মজার ব্যাপার ঘটতো নিশ্চয়। রামায়ণ-মহাভারত বাদ পড়ত না।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়াতে অশ্লীলতার কোনো ব্যাখ্যা নেই, তার বিচারের কোনো মানদণ্ড পাবে না। সব মিলে বইয়ের বিচার হবে, না, একটা লাইনে বা একটা মাত্র প্রাদেশিক শব্দে, তা বোঝা কঠিন। তুমি তো স্তন সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলে কিন্তু ফ্রান্সে বদলেয়ার হ্রদের সঙ্গে প্রেয়সীর উদরের বর্ণনা করেছিলো বলে কেলেঙ্কারির আর সীমা রইলো না। প্লেটো তো কবিতাকেই বনবাসে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর Republic-এ, সেখানে "পাখী সব করে রব"-এর মতো নিষ্পাপ কবিতারো স্থান হতো না, তিনি হোমারকে পর্যন্ত সাফ করতে চেয়েছিলেন। সায় দেবে তুমি? দেখ আমরা খুব ভালো দলে আছি– কে নেই আমাদের পক্ষে? ইউরিপিডিস্‌, শেক্‌স্‌পিয়ার, শেলি—

অশ্রু। শেলি?

প্রভাত। হ্যাঁ, শেলি। *Queen Mab*-এ blasphemy-র জন্যে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তুমি নাম শুনে যাও: বায়রণ, মুসে, ওভিড্‌, ভলটেয়ার, রুসো, গ্যয়টে, মলিয়ার, ডস্টয়ভস্কি—এমন কি সেণ্ট অগস্টিন পর্যন্ত।

অশ্রুর খোলা চুলগুলি দু'হাতে মুঠি ভরে ধরে প্রভাত বললো: পৃথিবীর অনিষ্ট করবে মানুষের এই passion? এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো? সমালোচকদের মতো এই বিশ্বাসে আমরা সত্যিই আনন্দ পাই না অশ্রু, যে, মানুষ সব সময়েই অবনত অধঃপতিত হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। আমরা মানুষের মহত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করি। তুমি কি মনে কর শেক্‌স্‌পিয়ার এর *Venus and Adonais* না পড়লেই

নিষ্পাপ ও নির্মল থাকবে? পৃথিবীতে একমাত্র ঋতুসংহারই কি পুণ্যসংহার করতে বদ্ধ-পরিকর? এই পৃথিবীর পাপ ও লোভ, রোগ ও দারিদ্র্যের (সবগুলিই মানুষের অনিষ্টকারী) মাঝে থেকেও যারা দু'চারটে সংস্কৃত শ্লোক পড়তে ভয় পায়, sex-এর নামে যাদের ধনুষ্টঙ্কার হয়—তাদের সঙ্গে কার তুলনা দেব? একবার কোন এক ফাঁসির কয়েদিকে ফাঁসি-কাঠে লটকাবে বলে জেল থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলো। জেল থেকে ফাঁসির জায়গা কতটুকুনই বা পথ! বৃষ্টি এসে গেল হঠাৎ। কয়েদি বললে: ছাতা দাও, ভিজতে পারবো না। ছাতা মাথায় দিয়ে কয়েদি ফাঁসি-কাঠে গলা পাতলে। এরাও সব যেন তাই,—ফাঁসির কয়েদি হয়ে ছাতা খুলেছে! কিন্তু ঢের হয়েছে অশ্রু, আর না।

আর না মানে, আর কথা নয়—এইবার একটু বিশ্রাম করা যাক। ঘুম অবিশ্যি খুব পাচ্ছে না, তবু দেহটাকে একটু প্রসারিত করতে পারলে আয়েস হতো। এই ভেবে প্রভাত মাথাটা একটু হেলিয়ে দিতেই অশ্রুর বুকের কুলায়ে আশ্রয় পেলো। গাড়ি পুরো দমে চলেছে,—অন্ধকার ক্রমেই আবছা হয়ে আসছে। ভদ্রলোক আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরলেন; অশ্রু চঞ্চল হয়ে উঠতে চাইছিলো, কিন্তু বুকের ভার রইলো অটল হয়ে। এমনি উদাসীন হয়ে আধশোয়া অবস্থাটা মন্দ নয়। গেল অনেকক্ষণ কেটে। নৈহাটি ছেড়েছে। প্রভাত উঠে বসলো, কিন্তু বায়রণের কবিতার দুটো লাইন বলবার জন্যে। ঐ লাইন-দুটো বলবার প্রয়োজন হতো না যদি না অশ্রু (বোকার মতো) বলে উঠত: কী গরম!

অতএব প্রভাত ভেবে দেখলো লাইন দুটো বলা দরকার:

**"What men call gallantry and the gods adultery,
Is far more common where the climate's sultry."**

বলে দু'হাত দিয়ে খুব বড়ো একটা গোলাপফুলের মতো অশ্রুর মুখ একেবারে নিজের মুখের কাছে তুলে আনলো। হলিউডে হলে এখানে খুব একটা চমৎকার **close-up** হতো সন্দেহ নেই।

আগে থেকেই চিঠি দেওয়া ছিলো। সব ঠিকঠাক। অশ্রুকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে প্রভাত হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে বাস্ নিলে। বাড়ি এসে গেল পনেরো মিনিটে। ওদের গলিতে পা দিয়ে দেখলো কিছুই বদলায়নি। আশ্চর্য! বাঁকে বসে তেমনি দোকানিটা ফুলুরি ভাজছে, ফিরিওলা তপ্‌সে-মাছ হেঁকে যাচ্ছে, রাস্তার ওপরে কর্পোরেশানের একটা নো-রোড লাগানো, দূরে একটা রোলার দাঁড়িয়ে। এই শুধু পরিচিত পৃথিবী! আশ্চর্য! বাড়ি ঢুকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে মা ছাতে ঘুঁটে দিচ্ছেন,

নাটু গালের ওপরে মাছি তাক করছে। ওর বাড়িটা তেমনি বিবর্ণ বিমর্ষ হয়েই আছে! বাড়িটা মেঘলোকে প্রমোশান পায়নি।

নাটু বারান্দায় বসে মহাশূন্যকে মুখ ভেঙচাচ্ছে; পাছে দাদার পায়ের শব্দ চিনে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে সেই ভয়ে প্রভাত অতি নিঃশব্দে পা ফেলে-ফেলে ঘরে ঢুকলো। সারা রাত্রির অনিদ্রা - শরীর পড়ছে ভেঙে; তবু জুতো-জামা না খুলেই ভাঙা চেয়ারটায় বসে পড়ে পা ছড়িয়ে দিলো। নাটু এখন তার মাথার চুলগুলো টেনে-টেনে দেখছে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা যায় কি না।

এখুনি মা এসে পড়বেন—অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়। মা এসে গেলেই ফুরিয়ে গেল! স্নান করতে যা, পোস্তর বড়া হয়েছে গরম-গরম, চল্ আপিসে, জুতো দুটো বুরুশ করে নে—যা ধুলো জমেছে! মাথার চুলগুলি কবে কাটবি? কেমন লাগল জলপাইগুড়ি? কি বললে অশ্রু? বাপ জায়গা দিয়েছে?

খেয়ে-দেয়ে পেটের বাঁ দিকে একটা বেদনা নিয়ে ছুটে ওর বাস্ ধরতে হবে—দাঁড়িয়েই যেতে হবে, আপিস-টাইমে জায়গা নেই বসবার। আপিসে গিয়ে চেয়ার টেনে বসতেই সামনে ওর সেই নাক-চ্যাপটা ভবানীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—দেশলাইয়ের কাঠি বার করে অনবরত দাঁত খোঁচাচ্ছেন। কে একজন নাকি পিন্ দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে মরে গেছল। আচ্ছা, জাপানে না কি চুমু খাওয়া বারণ হয়ে গেছে, কারণ প্রতি চুমুতে নাকি হাজারে-হাজারে বীজাণু ঠোঁটের খেয়া পারাপার করে। অশ্রুর যদি টি. বি. থাকে? বাঙলা দেশে এত লোক টি. বি. তে মরে অথচ একটা স্যানাটোরিয়াম্ নেই। শেষকালে ন্যুট হাম্‌সুন্ পর্যন্ত টমাস-মান্-এর দেখাদেখি স্যানাটোরিয়াম্ নিয়ে বই লিখলে: *Chapter the Last*। বাঙলা দেশে একটা থাকলে আরো কি গল্প লেখবার খোরাক জুটতো। আচ্ছা, টি. বি.-টা খুব কাব্যির ব্যারাম, তাই সব লেখকই রক্তামাশয় বা বেরিবেরি ছেড়ে টি. বি.-র রক্তরাগে রুমাল রাঙিয়েছেন। প্রেয়সীদের বেরিবেরি হয়ে পা ফুললে আর রক্ষে ছিলো না, কোনো প্রিয়ার গলগণ্ড হয়েছে বলে শোনা যায়নি। পৃথিবীতে কী রোগ নেই? যদি কেউ এসে বলে: একটা লোকের বাঁ কানটা ডান কানের জায়গায় এসে উল্টে বসেছে—প্রভাত তা-ও বিশ্বাস করবে। মানুষের এইটুকুন শরীরে ছ শ' ছাপ্পান্নটা ব্যাধি। তবু তাকে চোখ লাল করে তম্বি করা হলো কি না—ভালো হও। শরীরে রক্ত দিয়ে বললে কি না - সচ্চরিত্র হও; মহুয়ার বন তৈরি করে বলা হলো—ওখান দিয়ে হেঁটো না, গড়িয়ে পড়বে। মহুয়া নামটি বেশ। বধূকে পাবার আগের ডাক-নাম, পেলে পরে তার নাম হওয়া উচিত দ্রাক্ষা। একবার কে এক মাস্টার দ্রাক্ষার মানে করেছিলো কিসমিস। 'বক্ষে দ্রাক্ষা গুচ্ছে গুচ্ছে'—এমন একটা লাইনের টুকরো

এতদিনে বাঙলা কবিতায় পাওয়া গেলো। বাঙলা কবিতা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে—মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেছে। ঘরের দিকে এসে পড়লেন বুঝি ? ও এতক্ষণ অশ্রুকে না ভেবে বেরিয়েরি নিয়ে রিসার্চ করছিলো। সত্যি, অশ্রুকে এত কাছে পেয়ে এসেছে অথচ ওকে ভাবা যাচ্ছে না। আকাশ-ভরা রোদের দিকে চেয়ে জ্যোৎস্নার কথা ভাবা মুশকিল। অশ্রুর চোখ ভাবতে গিয়ে ভুরু মনে পড়ে, ভুরুর দীর্ঘতা অনুসরণ করতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ ঠোঁট দুটি এসে আবদার জানায়। এতো নিবিড় করে অশ্রুকে স্পর্শ করা হলো অথচ ওর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়নি! সিংহের সৌন্দর্য যেমন কেশরে, নারীর সৌন্দর্য তেমন নখাঙ্কুরে ! প্যারিস যে হেলেনকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো তা শুধু হেলেনের আঙুলে প্রলুব্ধ হয়ে। রামের চেয়ে মেনিলিউস কত উদার—সীতাকে অগ্নিপ্রবেশ করতে হয়েছিলো, হেলেন একেবারে স্বামীর বাহুপ্রবেশ করলে। একেই বলে গ্রীক। আচ্ছা, টেলিমেকাস-এর সঙ্গে হেলেনের সেটা কি সত্যি ? টেলিমেকাসটা ভারি ভীরু—আমাদের লক্ষ্মণ-টাইপের। লক্ষ্মণটা চোদ্দ বছর সীতার পা-ই দেখলে —এতো বড় উজবুক বাল্মীকি ছাড়া কেউ কল্পনা করতে পারতো না। আচ্ছা, বাল্মীকি হলে ট্রেনের সেই ভদ্রলোককে সেই ব্যাধের মতো অভিশাপ দিতেন ? সেই ভদ্রলোক কেমন ঠেসে ঘুমুলে ! ভুঁড়িটি কি অটুট ! অশ্রুকে অত সব বক্তৃতা না দিয়ে কোলের ওপর ছোট খুকিটির মতো ঘুম পাড়িয়ে দিলেই তো হতো ভালো। চোখের পাতায় চুমু খাওয়াটা এলিজাবেথান্ যুগে একটা ফ্যাশান ছিলো, ভালোবাসারো ফ্যাশান বদলায়। **Passion**-এর জন্যেই **passion**, যেমন আর্টের জন্যেই আর্ট—এ নিয়ম উঠে গেল কেন ? **Paolo** ও **Francesca**-র ভালোবাসা শুনতে ভালো— নরকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়নি, কিন্তু তেমন ভালোবাসা বিংশ শতাব্দীতে সইবে না— **Paolo, Francesca**-র কি-রকম আত্মীয় ছিলো, বিয়ে হতে পারতো না—তবু তাদের মিলন হলো। আচ্ছা, অর্জুন তো তার মামাতো বোন সুভদ্রাকে পরম আরামে বিয়ে করলে ! মান্দ্রাজে কোনো কোনো জাতে নির্বিবাদে ভাগ্নিকে বিয়ে করা চলে ! বড়ো সব মজার আইন,—মনুর মতে বাপের ও মার দুই দিকেই সাত ঘর বারণ, পৈথিনসির মতে বাপের দিকে পাঁচ ঘর ও মার দিকে তিন। বাঙালি ব্রাহ্মণেরা তাই নিষ্ঠা সহকারে পালন করছেন,—মনু এখানে অমান্য। আবার বেদ কী বলে শোন। বেদের মতে পিসির মেয়ে আর মামার ছেলেতে পরম বন্ধুতার সুযোগ আছে এবং উল্টোউল্টি। মান্দ্রাজিরা চালাক—এই নিয়মটা লুফে নিয়েছে। অন্তঃপুরে **cousin**-দের মধ্যেই যে প্রেম ভালো জমে এ কথা অস্বীকার করা আর বেদকে ভ্রান্ত বলা সমান মিথ্যা। বাইরে আব্রু, ভেতরে মিল—এমন একটা মধুর

সম্পর্কের ক্ষেত্র আছে বলেই বাঙালির অন্তঃপুর বলতে আজো আমাদের মন আনচান করে ওঠে। আচ্ছা, এমন যদি হয় (হলেই হলো) অশ্রু ওর বোন—মামাতো মাসতুতো নয়—একেবারে সহোদরা! ধরা যাক, শিশুকালে অশ্রু যায় মরে—শ্মশানে নিয়ে যায়, খুব বৃষ্টি নামে, শব ফেলে সব শ্মশান-বন্ধুরা আশ্রয় খোঁজে, বৃষ্টি থামলে এসে দেখে শব অন্তর্ধান করেছে! এবং সেই শব যদি আজ (ধরা যাক) কুড়িবছর পরে বোন বলে সার্টিফিকেট দেখায়—তবে? সত্যি, উগ্র ও উন্মুখ অধরোষ্ঠের কাছে অশ্রুর আত্মদানে মহত্ব আছে। অশ্রুর গলা ঠিক শঙ্খের মতো। এবার কাছে পেলে ও ভালো করে অশ্রুকে দেখবে খুঁটিয়ে খুটিয়ে। দেহের মতো সৌধ আর আছে কী? পৃথিবীতে কিছুই সম্পূর্ণ করে দেখা হয় না। মানচিত্রে ওপোর্টো বলে যে-জায়গা আছে এ-জন্মে তার মাটি ও মাড়িয়ে আসতে পারবে না। এই সময়ে লণ্ডনে গ্রীন পার্কে যে মেয়েটি বেড়াচ্ছে (একটি না একটি মেয়ে নিশ্চয়ই সে-পার্কে আছে) তার সঙ্গে আলাপ করা হবে না। সত্যি, কত অল্প আয়ু, কী ভীষণ! এতো আশা অপূর্ণ থেকে যাবে—এতো সব স্পর্শাতীত হয়ে রইলো! হাত বাড়িয়ে আকাশকে পাওয়া যায় না বলেই নাকি আকাশ সুন্দর! পেতে পারে না বলেই মানুষ ছোট। ছোটখাটো জীবন—ছোটখাটো সংসার—মন্দ কি? ছোট একটি বিছানা দুটি করে ছোট ছোট হাত পা—একটি শিশু! যদি শুধোয় কোত্থেকে এলাম—প্রভাত তার ঠিক উত্তর দেবে—অক্ষরে-অক্ষরে। অশ্রুকে লজ্জিত হতে দেবে না।

আচ্ছা, অশ্রুর সঙ্গে সেই ওর বাড়ি থেকে পালাবার রাত্রে প্রভাতের সঙ্গে একটা বিয়ে হয়ে গিয়েছিল না? তবে ওরা কোথাও ঘর নিয়ে একসঙ্গে থাকে না কেন? সর্বনাশ! তা হলেই তো ভুষ্টিনাশ। হাড়ে-হাড়ে চেনার চেয়ে ধারে-ধারে চেনা অনেক ভালো। তাকে নিয়ে ঘরে এনে পর করার জন্যে নয়, বাইরে রেখে পরম করার জন্যে। ধরা না দেওয়া মানেই ভরা হয়ে থাকা, সব সময়েই ভরা হয়ে থাকা।

দুপুরে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। খাওয়ার পর খানিকক্ষণ পাইচারি করা অশ্রুর অভ্যেস। এবং আজকে ইস্কুল নেই বলে, কোনো উপদ্রব নেই বলে, দুপুরে নিশ্চয়ই একটু ঘুমুনো যাবে। বেশ পরিষ্কার তকতকে বিছানা—অচেনা বিছানায় চট করে ঘুম আসবে না বলে অশ্রু একটা দৈনিক কাগজ যোগাড় করেছে। এই শেষ বিজ্ঞাপনটা পড়া হলেই কাগজটা বাতাহত কদলী-পত্রবৎ ভূপতিত হবার আয়োজন করবে এমন সময় দোর গোড়ায় জুতোর শব্দ হলো। অশ্রুর জিহ্বা এমন অসাবধান যে চুলকে

উঠলো : এসেছ ? যেন আপিস পালিয়ে এলেই প্রভাতের চতুর্বর্গ ফললাভ হবে ! কিন্তু এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জুতোর অধিকারীটি নিশ্চয়ই প্রভাত নয়—অশ্রুর সেজকাকা।

অশ্রু বিছানার ওপর উঠে বসে দু'হাত পেছনে তুলে একরাজ্যের চুল নিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো। সেজকাকা সোজা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, সার্চ করতে এসে পুলিসের কর্তার বোধকরি এমনি মনোভাব হয় ; অপারেশান্-এর আগের মুহূর্তের রুগীর মতো অশ্রু নার্ভাস হয়ে পড়লো। তবু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে খাট থেকে নিচু হয়ে সেজকাকাকে প্রণাম করার জন্য হাত বাড়ালো, কোঁচা দিয়ে সেজ-কাকা জুতো ঢাকলেন। বোঝা গেল প্রণাম তিনি নেবেন না।

কিন্তু কথা আরম্ভ হওয়া দরকার। সেজকাকাই গলা খাঁখরে নিলেন, বললেন,—কার সঙ্গে এলি ?

অশ্রু তখন খাটের একেবারে ধারটাতে বসে হাঁটুদুটোকে একটা acute angle-এ বাঁকিয়ে পা-দুটোকে দিয়েছে খাটের তলায় চালিয়ে ! দুই চোখে বুদ্ধি ও প্রতিভা যেন চক্‌চক্ করছে,—ললাটে প্রতিভার দীপ্তি। হাত দু'টি যে টান করে রেখেছে বিছানার ওপর তাতে পর্যন্ত যেন নিঃশঙ্কতার ভাব আছে। হাঁটু দুটো একটু দুলিয়ে ও ওর ক্ষণেকের স্নায়বিক দৌর্বল্যকে ধমক দিলে। বললে—জলপাইগুড়ি থেকে এক ট্রেনে একলা চলে আসার মধ্যে অন্ধেরো বীরত্ব নেই। তবে সৌভাগ্যবশত একলা ছিলাম না, সঙ্গে সাথি ছিলো।

সেজকাকার এত রাগ হলো যে পাঞ্জাবির গলার বোতামটা খুলে ফেলতে হলো। বললেন—কে সে লোক ?

অশ্রু অক্ষরগুলো স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলো : শ্রীপ্রভাতমোহন—

সেজকাকা মুখের যা-একখানা ছাঁচ করলেন স্টাডি-হিসেবে যে-কোনো মিউজিয়মে স্থান পেতে পারে। বললেন,—ঐ হতচ্ছাড়া বিশ্ববয়াটে ছোঁড়াটা – ঐ চরিত্রহীন—

অশ্রু রীতিমত কৌতুক বোধ করলো। প্রভাতের নাম-মাহাত্ম্য এমন প্রবল ভেবে হিংসেও হ'ল একটু। হাসির ভুরভুরি চেপে একটা কিছু বলা দরকার, তাই বললে—চক্ষু না থাকলে তাকে অনায়াসে চক্ষুহীন বলা যায়, কিন্তু চরিত্র বস্তুটি যে কোথায় আছে, বা কোথায় নেই occultist-রা পর্যন্ত সন্ধান পান না।

এর উত্তর কি হতে পারে সেজকাকাকে তা ভাবতে দিয়ে ইতিমধ্যে আমরা তাঁর দেহবর্ণনাটা সেরে নি। এটা অবশ্য খুব জরুরি নয়, তবু সেজকাকাকে আমাদের মনে ধরেছে। সব চেয়ে যেটা প্রখররূপে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক তা হচ্ছে সেজকাকার নুয়ে পড়া নাক, অনেকটা ধনেশ পাখির ঠোঁটের মতো—এবং সেই নাকের ওপর একটি মটর-

দানার মতো ছোট আঁচিল। দেখলেই কড়ে আঙুলের টোকা মেরে ফেলে দেবার প্ররথ করতে ইচ্ছা করে—আঁচিলটা এমনি আলতো হয়ে বসেছে। এটুকুনই যদি সে মুখের বিশেষত্ব হতো—তাহলে বোঝা যেতো সেজকাকা মাত্র পিউরিটান; কিন্তু সেই উদ্যত-খড়্গের মতো নাসিকার তলদেশে একটি স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট গুম্ফ বিরাজ করছে, শুধু বিরাজ করছে না, সম্মার্জনীর মতো একটা মার্জনাহীন রুক্ষতা নিয়ে সর্বদাই মারমুখো হয়ে আছে। গোঁফের প্রত্যন্ত প্রদেশদুটো আগে ঠোঁটের সমান্তরাল করে ছাঁটা ছিল, কিন্তু একদিন অবাধ্য ক্ষুর গল্পের সেই আদর্শ বিচারক বাঁদরের মতো সমান করে গোঁফের চৌহদ্দি ভাগ করতে গিয়ে গুম্ফটিকে একেবারে নাসারন্ধ্রের তলায় ঠেলে এনে তার দারোয়ানি দিয়েছে। এবং তাতেই চেহারার আরেকটি বিশেষণ বেড়েছে : পরনিন্দুক।

অশ্রুর কথার উত্তরে সেজকাকা কিছুই ভাবতে পারলেন না। অতএব প্রশ্ন পালটানো আবশ্যকীয় হয়ে উঠলো। বললেন—বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে উঠেছিস যে?

মিহি করে হেসে অশ্রু বললে—বাড়ির দরজা তো তোমরাই বন্ধ করে দিয়েছ। আমাকে তোমরা যে অপমান করেছো একমাত্র মেয়ে হয়েছি বলেই আমাকে তা পিঠ পেতে সইতে হবে এতো বড় অমানুষ হয়ে তোমাদের বংশে আমি জন্মাইনি, সেজকাকা।

হেসে কথাটা বললে বলে কথাটা সেন্টিমেন্টাল হলো না। সেজকাকা তাঁর গুম্ফ-বিন্দুটি উন্নত করে (ঘৃণার পরিচায়ক) বললেন—তুমি যথেচ্ছাচারী হয়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমরা অভিভাবক হয়ে তাই দেখে নির্লিপ্তের মতো হাই তুলবো আমাদের কি এত বড়ো অমানুষ হতে উপদেশ দাও নাকি?

বোঝা গেল সেজকাকা চটছেন, সম্বোধনের ভাষা তাঁর মধ্যমপুরুষে পদস্থ হয়েছে। অশ্রু বিনীত স্বরেই বললে—ভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগের জন্যে কতগুলো কথার অপপ্রয়োগ ঘটেছে, নইলে যথেচ্ছাচারী কথাটা শুনতে যতো খারাপ তার সত্যি-কারের অর্থটা তত ন্যক্কারজনক নয়। নিজে যা ভাল বলে বুঝবো অকুণ্ঠচিত্তে তাই পালন করবো,—এর মতো চরিত্রগর্ব আর কি আছে? পরেচ্ছাচারজনিত অপমান আর আত্মহত্যা সমান জিনিস।

সেজকাকার এবার দাঁত দেখা গেল, পান-খাওয়া পোকায় কাটা দাঁত, অর্থাৎ—খেলো কথ্য ভাষায় বলতে গেলে—সেজকাকা দাঁত খিঁচোলেন : তাই বিয়ের সভা থেকে পালিয়ে যাওয়াকে তুমি চরিত্রগর্বের নমুনা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করছো?

দাড়ের ওপর খোঁপাটাকে জুৎ করে বসিয়ে অশ্রু শাদা থরথরে গলায় বললে—

সে তিন বছরের কথা। কেন পালিয়ে এসেছিলাম তার অর্থটা এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু মিথ্যা হয়নি। যদি তুমি শুনতে চাও তো বলি!

গুম্ফবিন্দুকে সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ করে সেজকাকা বললেন—শুনি!

অশ্রু ডান হাঁটুর ওপর অতি ধীরে বাঁ calf-টি স্থাপন করলো, বিছানায় আধখানা কাৎ হতে পারলে অতীত দিনের গল্প বলায় যে সহজ একটা সুখ আছে তা সম্পূর্ণ করে সম্ভোগ করা যেতো, কিন্তু সেজকাকা নেহাৎই সেজকাকা। পায়ের ওপর পা-তোলাটি পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। অশ্রু বলল—বিয়েতে সম্মত হওয়াটাই প্রথমত আমার ভুল হয়েছিলো, শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙালি মেয়ের মতো আমিও যাচাই করে দেখলাম না—বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত আছি কিনা। নানান পারিবারিক ঘটনা-আবর্তে পড়ে আমিও একটা খড় ধরতে ছুটেছিলাম। কিন্তু ভুল আমার ভাঙল—ঠিক বিয়ের লগ্ন এসে পৌঁছুতেই। ভুল যদি ভাঙলই, ভাঙুক, তার সময়টা ঠিক পাঁজির সঙ্গে মিল রাখছে কি না সে-দেখবার সময় আর ছিলো না। পালালাম! কেন বিয়ে করছি, কাকে বিয়ে করছি এই প্রশ্নগুলো এমন গোলমাল বাধিয়ে তুললো যে বিয়ের বাদ্যি আমার কানেই ঢুকলো না।

সেজকাকা। বিয়েটা ভুল হচ্ছিল কিসে? এমন সুযোগ্য পাত্র!

অশ্রু। সেখানেই লাগলো খটকা—ঠিক সুযোগ্য কি না। তা ছাড়া পাত্র সুযোগ্য হলেই মিলনটা সুভোগ্য হবে কি না—

সেজকাকা ধমকে উঠলেন; তার মানে?

অশ্রু। ঐ তো মুশকিল, তুমি সেজকাকা হয়ে বসে থাকলে খোলাখুলি কিছুই বলা যাবে না। সম্পর্কের মিথ্যে সৌজন্যের খোলস না খসাতে পারলে পদে-পদে আমার বাধবে। Confession করতে গিয়ে যদি দেখি যে পুরোত ধমকাচ্ছেন তাহলে পুরোতেরো ধর্মচ্যুতি ঘটে! ডাক্তারের কাছে রোগের হিস্ট্রি বলতে রুগীর লজ্জা করলে চলে না, উকিলের কাছে মক্কেল যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে মোকদ্দমা যায় ফেঁসে। তোমার অভিভাবকত্বের সিংহাসন ছেড়ে তুমি যদি আমার সঙ্গে সমতল জায়গায় এসে না দাঁড়াও, তাহলে আমাকে প্রশ্ন করা বৃথা।

চেয়ারে সামান্য স্থান পরিবর্তনপূর্বক দেহভার পুনঃস্থাপন করে সেজকাকা বললেন—আচ্ছা।

অশ্রু বাঁ পায়ের পাতাটি সামান্য একটু দুলিয়ে-দুলিয়ে বলে চললো: শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মেয়ের মতো দূরদর্শিতাহীন অন্ধ আত্মদানের লজ্জা আমার সইলো না, আমি ঐ বাকি একজন! আমি অসাধারণ। বাঁ হাতে ত্যাগ করবার স্বাধীনতা না রেখে দক্ষিণ হস্তে আমি গ্রহণ করতে রাজি নই। আমি বারে বারে

গ্রহণ করবো, বারে বারে আমার যাত্রার প্রতিবন্ধককে উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। সেই পণ করেই সেদিন বেরিয়েছিলাম।

সেজকাকা। তাই আমাদের সবার মুখে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে তুমি এমন একটা অনাচার করলে।

অশ্রু। কণ্ঠের হাড়ে যদি থাইসিসের পোকা পাওয়া যায়, তবে সে-হাড় উপড়েই ফেলা উচিত; কণ্ঠাভরণ শোভা পাবে না ভেবে সেই পচা হাড় পুষে রাখা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তোমাদের কলঙ্কের কালির ভয়ে আমার জঘন্য আত্মবলিটা নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে যতই কীর্তিত হতো না কেন, আমার পক্ষে সেটা হতো পরম অসতীত্ব। (এখানে সেজকাকা একটা মুখভঙ্গি করলেন) একটা ভুল যদি করেই থাকি তা সংশোধন করবার স্বাধীনতা আমার থাকবে না—সমাজের এই জুলুম আমি কিছুতেই মানবো না। একটা গোটা মানুষের চেয়ে তোমাদের দশ জনের আরামের সমাজ নিশ্চয়ই বড়ো নয়। তাছাড়া—

সেজকাকা দু'পাটি দাঁত দৃঢ়বদ্ধ করে কীটকৃত দন্তরন্ধ্র দিয়ে আওয়াজ করলেন: তাছাড়া?

অশ্রু। তাছাড়া আমার এই বিয়ের পেছনে একজনের বেদনা ছিলো। তখন মন ছিলো কাঁচা, আমার মিলনোৎসবে কোনো উপবাসী আত্মা পিপাসার্ত চাতকের মতো চেয়ে আছে এ ভাবতে আমার হৃদয় কেঁদে উঠলো। সে-দিনের কথা বলছি, নইলে সেই মিলন যদি আমার সত্যি হতো তাহলে অন্যের অনাহূত অশ্রুবর্ষণকে আমি গ্রাহ্য করতাম না। সে মিলন শালগ্রাম পাথরের মতোই মিথ্যে বলে আমি বেরুলাম, এবং যেখানে এসে প্রথম বিশ্রাম নিলাম সে হচ্ছে প্রভাতের বাড়ি।

সেজকাকা। যে-ছেলে এমন করে কাঁদলে তাকে বরণ করলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।

অশ্রু। ওর কান্না মোছাতে গিয়ে আমাকে হতো কাঁদতে,—ল্যাঠা চুকতো না। তাছাড়া কাঁদতে পারাটাই ভালোবাসার পরম মূল্য নয়। সে-পরীক্ষাই আমার, সে-অনুসন্ধান। তোমার সঙ্গে এ-সব বিষয় নিয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা করায় অসুবিধা আছে। তুমি যে আমার সেজকাকা এ-কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছো না।

সেজকাকা জোর দিয়ে উঠলেন: নিশ্চয়ই না। ছেলে হলে বেত নিয়ে আসতাম, একান্ত মেয়ে হয়েছিস বলেই—

অশ্রু গম্ভীর হয়ে বললে: তাই শুধু ধমকে অভিভাবকত্বের মাইনে নিতে এসেছ?

ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে সেজকাকা বললেন—তাই পুরুষ দেখে বেড়ানোই তোমার পরমার্থ? এই তোমার পরীক্ষা!

অশ্রু কঠিন হয়ে বললে—**Don't be vulgar.** (হঠাৎ ওর ফের জয়েস-এর কথা মনে পড়লো। সব অশ্লীলতাই স্টাইলে, ব্যবহারে।*Per se* কোনো জিনিসই অশ্লীল নয়। ঐ কথাটাই যদি সেজকাকা এ-রকম করে বলতেন : নব নব জীবনের স্পর্শ ও স্বাদ পাবার জন্যে—তাহলে ভাষাটা রবীন্দ্রনাথেরো অযোগ্য হতো না।)

সেজকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—তাহলে যাচ্ছিস না তুই বাড়ি ?

অশ্রুও উঠে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে খোঁপাও গেল ধুপ করে ভেঙে। এবার অশ্রু আর খোঁপা মেরামত করতে বসলো না। দীর্ঘ, ঘন চুল—ঠিক এমিলিয়া ভিভিয়ানির চুলের মতো ! সর্বাঙ্গে ওর **Greek contour.** (**contour**-এর বাঙলা করা যাক দেহবঙ্কিমা।)

অশ্রু বললে—এর পরেও তুমি যেতে বলো ? তোমাদের কলঙ্কভাজন হয়ে !

সেজকাকা। কিন্তু তোমার নামে চতুর্দিকে তো ঢি-ঢি পড়ে গেছে। জলপাইগুড়িতে তো কম কেলেঙ্কারি করনি।

অশ্রু। জীবনের অভিধানে ও শব্দটার বিভিন্ন অর্থ, সেজকাকা। সে-জন্যে আমি মাথা ঘামাই না, তোমরা না ঘামালে ঘুমুতে পারবে। যে পঞ্চসতীর নাম করে তোমাদের মহাপাতক নাশ হয়, আমিও না-হয় তাদের দলভুক্ত হলাম। ক্ষতি কি ?

ইদানিং বেলাগুলো আচমকা পড়ে আসে ; আকাশকে রোগী ভাবলে ভাবা যেতে পারে ও হার্ট-ফেল করলে। এমনি সময় ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো প্রভাতের আবির্ভাবে—আকস্মিক ও প্রত্যাশিত। সেজকাকা বলে উঠলেন : এই যে।

এবং কালবিলম্ব না করে প্রভাতের একটা হাত ধরে তাকে বাইরে বারান্দায় টেনে আনলেন। ব্যাপারটা বেশ নাটকীয়, নাই-বা হলো ভদ্রতাসঙ্গত—আমাদের বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চে অনায়াসে চলতে পারে। ওরা বেরিয়ে গেলে অশ্রু খোঁপা বাঁধতে বসলো।

বারান্দায় দুটো চেয়ারে দু'জনে বসলো। স্বর নিচু করে নাকের আঁচিলটি একটু চুলকে সেজকাকা বললেন—আপনি তো অশ্রুকে ভালোবাসেন, না ?

প্রভাত ঘাবড়ে গেল ; তার চেয়ে, আকাশে ক'টা তারা আছে জিগ্‌গেস করলে একটা আন্দাজি উত্তর দেওয়া সহজ হতো। উত্তরের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে প্রশ্ন-কর্তারই হতো মুশকিল। এমন একটা প্রশ্ন নিয়ে কোনো বিজ্ঞানই ভয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। যা-ই উত্তর দাও, সম্পূর্ণ হবে না। যদি বলো, হ্যাঁ ; সন্দেহ ঘুচবে না ; যদি বলো, না ; ঘুচবে না ভয়।

প্রভাত বললো—এখনো বুঝতে পারিনি।

সেজকাকা ভাবলেন এই বিনয়ই চরিত্রহীনতা। তবু অসন্তোষ দমন করে বললেন—অশ্রুকে বিয়ে করুন না কেন ! আপদ যায় চুকে।

এর উত্তর হলো কাটখোট্টা। প্রভাত ঠাট্টার সুরে বললো—মোটে মাইনে পাই নব্বুই টাকা, ঐ টাকার মাইনেতে কিছুই চলে না মশাই।

সেজকাকা একেবারে হাওড়া ব্রিজ থেকে গঙ্গায় পড়লেন; কিন্তু ডাঙা পেতে দেরি হলো না। ডাঙা যখন পেলেন চোখ তাঁর রাগে ও অপমানে রাঙা হয়ে উঠেছে। সামনের শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর একটা ভীষণ ঘুষি মেরে বলে উঠলেন: তোমাদের এই নষ্টামি আমি দেখে নেব। বলেই ডান-হাতে কোঁচা ধরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অশ্রু তাড়াতাড়ি চৌকাঠের কাছে এসে হাঁকলে: তিনুকে একদিন পাঠিয়ে দিয়ো কিন্তু।

প্রভাত সেই বারান্দায় চেয়ারে বসে থেকেই হাঁক দিলে: বয়! চা নিয়ে এসো।

ম্যানেজারকে বলে অশ্রু ঘরে একটা ইজি-চেয়ার আনিয়েছে। রাতের খাওয়ায়ো অনেকগুলি কোর্স দেয়; অশ্রু ভোজনব্যাপারে অতিমাত্রায় বর্বর হলেও এত সে গলাধঃকরণ করতে পারে না। ইস্কুলে যখন পড়তো তখন কম খাওয়াই ছিলো লেডি হওয়ার নিশানা,—কিন্তু লেডি হওয়ার সাধনায় ইদানিং ঢিলে দিয়ে অশ্রু বড়ো-বড়ো গ্রাস মুখে পুরে শব্দ করে খায় আর অব্রাহ্ম পোষাক পরে ব্যায়াম করে। শরীর তার এত সেরেছে যে অটো ভ্যাক্সিন্ নিয়েছে বলে ভুল হয়।

ইজি-চেয়ারে চিৎ হওয়া যতটুকুন সম্ভব শরীরটাকে ততটা ঢেলে দিয়ে অশ্রু তন্ময় হয়ে কী সব ভাবতে বসলো। মানুষের ভাবনায় অন্তত কোনো ডিসিপ্লিন খাটে না—তা প্রজাপতির মতো পাতলা পাখা মেলে উড়ে চলে। রাত এখন মন্দ হয়নি, এগারটা বাজে। পাশের ঘরে কে একটি ভদ্রলোক গুন্‌গুন্ করে গান গাইছেন। সামনের দরজাটা খুলে অশ্রু তার ঘরেই চেয়ার পেতে শুয়েছে। শিগ্‌গির ঘুম আসবে না।

ইজি-চেয়ারটা সম্ভব হয়েছে পৃথিবীতে monarchy-র পতন হয়েছে বলে। ডেমোক্রেসির যুগ না এলে এমন হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার কথা ভাবাই যেত না। তখন সব সময়েই শিরদাঁড়া খাড়া করে বুক ফুলিয়ে বসে থাকতে হতো—কখন ওপরওয়ালার হুঙ্কার আসে, এখুনিই হুকুম তামিল করতে হবে, সময় নেই। এখন আর আমরা ওপরওয়ালা বলে কাউকে স্বীকারই করি না—আমাদের হাতে এখন ঢের সময়, একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। যদি কিছু বলবার থাকে, একটা চেয়ার টেনে সামনে বসো, আস্তে-আস্তে শোনা যাবে, আমার হাত পা গুটোনো চলবে না। শরীরকে আরাম দেওয়ার মতো কীর্তি আর কিছুতে হতে পারে না। শরশয্যায় শুয়েও ভীষ্মদেব আরাম করে গঙ্গোদক পান করবার জন্যে অর্জুনকে অনুরোধ

করেছিলেন। আত্মহত্যা করবার জন্যে টেবিলের ওপর থেকে বিষের শিশি আনতে গিয়ে চেয়ারের পায়ায় গুঁতো খেয়ে আত্মঘাতী আহা করে ওঠে, পায়ের ওপর হাত বুলোয়। শরীর দেবতা—**private divinity**। এই শরীর স্পর্শ করেই নোফালিস মন্দির স্পর্শ করতেন। **St. Paul**-টা এমন মূর্খ, শরীর ও তার আচ্ছাদনের পবিত্রতার অর্থই নাকি আত্মার অশুচিতা। তাঁর মতে উকুন হচ্ছে দেবপূজার বড়ো নৈবেদ্য! এই সুস্থ দৃঢ় **pagan** শরীর একটা প্রকাণ্ড সম্পত্তি। একে সহজে কষ্ট দিতে নেই। শ্রান্ত হয়ে দুই বলিষ্ঠ পুরুষ বাহুর উপাধান পাওয়ার মতো শান্তি আর কোথায় আছে। প্রভাত বেশ বলশালী, তবু যেন কোথায় খুঁত আছে। ওকে দেখা আর নন্দনকাননে ইভ-এর সাপ দেখার একই অর্থ। মিলটন পর্যন্ত তাঁর *Paradise Lost*-এ মেয়েদের ওপর চটে গেলেন। য়্যাডাম হলো খালি ঈশ্বরের জন্যে, ইভ হলো য়্যাডামের মাঝে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর জন্যে। ইভ-এর চেয়ে য়্যাডাম হলো বেশি সুন্দর—অশ্রুর চেয়ে প্রভাত। প্রভাতের মুখে ভীরুতাময় নির্মলতা নেই, তাই ভালো লাগে, তবু সব মিলিয়ে কেন আবার ভালো লাগে না। আকাশের ঝড় ভালো লাগে বলে নিদ্রাহীন নিদাঘনিশীথের শ্রান্তিও ভালো লাগবে এটা বাড়াবাড়ি। কত রকম **contradictions**, কাটাকুটি, অসঙ্গতি নিয়ে মানুষের জীবন। ট্রেনের প্রভাতকে মনে হয় **pagan**, কলকাতার প্রভাতকে মনে হয় **philistine**। অশ্রু যেন কায়াহীন নীহারিকা। কভু ম্যাডোনা, কভু মেসালিনা, কভু ব্লু-স্টকিঙ। কভু রাধা, কভু রামী। তরকারির স্বাদ যেমন নূনে, জীবনের স্বাদ তেমনি তার **contradictions**-এ। এক নিয়মকে চিরকাল আঁকড়ে থাকে তারাই যারা বামন, আকাঙ্ক্ষায় যারা বেঁটে। ক্যাস্টর-অয়েল শরীরের পক্ষে মাঝে মাঝে উপকারী বলেই তাকে চিরকালের জন্যে খাদ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া ও চিরকালের জন্যে জীবন-ধারণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া একই কথা। একমাত্র তারাই **consistent** যারা মৃত। যে বাঁচবে, সে বাড়বে, আপনাকে নিয়ে বারে বারে ছাঁটকাট করবে, ফ্লানেলের জামার মতন জীবনো তার বারে বারে খেপে যাবে। নইলে না আঁচিয়ে খালি বসে বসে একঘেয়ে খাওয়ার মধ্যে স্বাস্থ্য নেই। নিজের সঙ্গে বারে বারে সাক্ষাৎকার হওয়া দরকার, নানা আত্মার দর্পণে নিজের নানা প্রতিকৃতি। একই নারী একজনের স্ত্রী হয়ে আরেকজনের মা। **Prism** যেমন আলোর বিভিন্ন রঙ প্রতিফলিত করে, তেমনি মানুষের আত্মা। নির্মলের কাছে সে যা, প্রভাতের কাছে তা নয়। নির্মলটা সত্যিই কী কঠিন, নির্মলো ঠিক স্ফটিকের মতো। আত্মা এবং দেহের পার্থক্য বোঝে না। যাকে আত্মা দেবে তার কাছে আত্মদান করতে না পারলে ওর প্রেমের পরিপূর্ণতা নেই। যার আত্মা ও আবিষ্কার করতে

পারবে না তাকে স্পর্শ করতেও ওর লজ্জা। প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে বিবাহ—ওর কাছে। তাই অশ্রুর উৎসুক অধরকে উপবাসী রেখে ও বললে : যদি আমার সঙ্গে গৃহ নাও, তবেই আমার ইহকালটা তোমার তৃষ্ণার্ত অধরে ক্ষয় করে দিতে পারি, নচেৎ নয়। অশ্রুকে ও প্রত্যাখ্যান করলে। অশ্রু বিয়ে করতে চায় না অথচ প্রেম প্রত্যাশা করে এটা নির্মলের কাছে ব্যভিচার। নির্মল এখনো টেনিসনের প্রতিবেশী। বিয়ে করবার কুৎসিত কৌতূহল অশ্রুর নেই বলে ছুটো চুমু খাওয়ায় যেন সূর্য-চন্দ্র ধর্মঘট করে বসবে। আখ খাবার জন্যে দাঁত উপযুক্ত মজবুত নয় বলে মোহনভোগ খাওয়া যাবে না এটা চরিত্রের একটা বড়ো কৃতিত্ব নয়। তাহলে একজামিন দিতে যাবার আগে লিখে-পড়ে প্রস্তুত হওয়ারো কোন সার্থকতা নেই। স্টেজে নামবার আগে যেন রিহার্সেল দিতে হবে না। সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে একবার ডুব দিয়ে নিলে সেটা ব্যভিচার। নির্মল ওকালতি করলে পয়সা পেত। নির্মল! ওদের ইস্কুলের একটি মেয়ে একবার নির্মল বানান করেছিলো দন্ত্য ন-য় দীর্ঘ ঈ দিয়ে। ঐ বানানটি ভুল হলেও ওর ভালো লাগে। ঐ ভুল বানানে শব্দটার একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। শব্দের বানান ও মানুষের ব্যবহার নিয়ে কোনো কানুন করতে যাওয়াই অন্যায়। বাঙলা ভাষা থেকে তিনটে স, ছুটো ন, ছুটো জ কবে নির্বাসিত হবে। সোজা হতে পারলেই সব সহজ হয়ে যায়। বাঙলা টাইপ-রাইটারে একটা উ লিখতে হলে তিনবার চাবি টিপতে হয়, ততক্ষণে ইংরাজিতে God বা Sex লেখা হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বাঙলা অক্ষরগুলিকে রোমান অক্ষরে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছেন সেটা ভালোই। অশ্রুর নাম ভাগ্যিস নগেন্দ্রবালা হয়নি। নামের মধ্যে সত্যিই একটা চরিত্রাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শেলি বললেই মনে কেমন আবেশ আসে, *Adonais*-এর **frail form**-এর কথা মনে পড়ে। রসেটি ছাড়া ইংরেজ লেখকদের কারুর নামে **vowel-ending** আছে বলে তো মনে হয় না! ফিললজি পড়তে বড়ো ইচ্ছা করে। একবার ওদের ইংরিজি অনার্স ক্লাশের একটি মেয়ে মাস্টারকে বলেছিলো : আমাদের ফাইল-লজি ক্লাশ কখন হবে? মাস্টার বলেছিলেন : আমাদের ফাইলসপি ক্লাশের পরে। আরেকবার কোন একটা ছেলে-কলেজে মাস্টার বোর্ডে নোটিশ দিয়েছিলেন : **Mr. So and So will not take his classes**। একটা ছেলে ছুষ্টুমি করে **classes**-এর c-টি দিলো মুছে। পরদিন মাস্টার এসে ব্যাপারটা দেখলেন এবং গম্ভীর হয়ে l-টিও মুছে দিলেন। ওদের ক্লাসের মেয়েগুলি কী অসম্ভব রকম খারাপ কথা বলতো। কলেজের মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেদের ধারণা ওরা যেন সব **Dresden China**, ঝকঝকে, নির্মল। আবার নির্মল! অশ্রুকে সে হয়তো ভাবতো **Psyche**, নিজে কিন্তু **Pan** হয়ে ওর গুহায় কোনো দিন এল না। কী কঠিন, স্বয়ং **Circe** এলেও হয়তো

কেঁদে কেঁদে আত্মহত্যা করতো। সেই বিশ্রী দঙ্গলের মাঝে একটি মেয়ের সে দেখা পেয়েছিলো—ক্ষণকালের জন্যে—নাম তার ইন্দিরা। রবীন্দ্রনাথকে চুরি করে বলতে হয় মেয়েটি যেন আত্মার শিখা ; আর অতি-আধুনিক ভাষায়—আত্মার ফোয়ারা! শেলির Asiaও এর তুলনায় স্থূল। সমস্তটি দেহ যেন একটি ভঙ্গি, ইশারা। যেন দেবী Diana! বাঙলার সরস্বতীর চেয়ে সুকোমল, উর্মিলার চেয়ে নিঃশব্দচারিণী! গোধূলির শেষ রশ্মি দিয়ে ওকে তৈরি করা হয়েছে। মাটিতে এসে যে কেন ও পা ঠেকালো আকাশের তারারা বলতে পারে। কী চমৎকার গান গাইত! ওর শরীরে যেন স্নায়ু নেই, খালি সুর! এই ধূলির ধরিত্রীতে ও আকাশের বাণী নিয়ে এসেছিলো। কলেজে কারু সঙ্গে মিশতো না, চুপ করে কোণটিতে বসে বই পড়তো। একবার আমাকে শুধু বলেছিলো : প্রেমের চেয়ে আর্ট বড়ো, আমি সেই আর্টের উপাসিকা। সেই ইন্দিরাকে নির্মল বিয়ে করেছে। বিয়ে না করতে পারলে যেন ওর ঘুম হতো না। আনন্দের চেয়ে যেন আরাম বড়ো। প্রেমকে দীর্ঘায়ু করতে ও ভোগকে দীর্ঘ করতে চায়। যেন প্রেমের তীব্রতার চেয়ে সম্ভোগের দীর্ঘতাটাই বেশি কাম্য। যেন কতকগুলি তালি দিলেই জুতো টেঁকে! আমরা খালি বন্ধন দিয়ে টেঁকাবার জন্যেই ব্যস্ত ; গ্রীন-হাউসে কৃত্রিম উত্তাপ দিয়ে যেমন পরদেশী গাছ বা আগাছাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তেমনি বিয়ে করে আমরা প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। কাঁচের ঘরে ঢিল পড়ে, গাছ যায় কুঁকড়ে, মরে ; তার চেয়ে খোলা হাওয়া অনেক ভালো। সন্তানকে বৈধ করতে গিয়েই প্রেমের ঘটছে সর্বনাশ। তবে বিয়ে করায় অনেক সুবিধে—ঝক্কি কম। খাও, দাও, প্রসব কর—ইহকালের ষোলকলা পূর্ণ হলো। জন্ম-শাসন পর্যন্ত নীতিসঙ্গত নয়, কেননা ধর্মের আদিম উপদেশকে অমান্য করা হয়। কলকাতায় কোনো বার্থ কন্‌ট্রোল clinic নেই কেন? ধন্য শহর এই কলকাতা! এ-সব নিয়ে কিছু কলাকৌশলের কথা বলতে গেলেই প্রসিকিউশন! কিন্তু কে জানে পরে হয়তো খোলাখুলি দেখিয়ে-শুনিয়ে শিখিয়ে তুলতে হবে। সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জন শুনে যেমন মন প্রশান্ত হয়, কলকাতাও তেমনি আত্ম-বিস্মৃত করে। ল্যাম্বের মতো শহর খুব ভালো লাগে আমার। কবিত্বশক্তি থাকলে আমি জনতার কবি হতাম। গাঁয়ে যাও, সামান্য একটা মাছির শব্দ তোমাকে উচাটন করে দেবে,- সব আওয়াজ সেখানে আলাদা-আলাদা, বাঁশের পাতায় হাওয়ার শব্দ, ঘরে ফেরা গরুর ডাক, পাপড়ির ওপর শিশির পড়ার শব্দ। বাবাঃ, কান পেতে এত শুনতে হয় বলেই গাঁয়ে মন ওঠে বিষিয়ে, সব কিছু দেখা ও শোনার অর্থ ভীষণতমরূপে স্পষ্ট বলেই গাঁয়ে গিয়ে মনের আর ছুটি থাকে না, সেটা প্রকাণ্ড জুলুম। লাখো লাখো কোলাহলকে পাক করে খেয়ে কলকাতা যেন একটা মত্তমত্তা দানবী-র মতো আর্তনাদ

উগরে দিচ্ছে। কান খাড়া রাখতে হয় না, মন জুড়োয়; ঘুম পায়। বিকেলবেলা যে-মুটেটা মোটরের মাড-গার্ডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো তার কান্না ঐ ফিরিওয়ালার হাঁক থেকে আলাদা করে নেওয়া অসম্ভব,—একটা ঢেউ থেকে আরেকটা ঢেউকে ছিনিয়ে নেয় কার সাধ্য। সমুদ্রে ফেনা, শহরে মানুষ। কেউ কাকে চেনে না। পাশের ঘরে ভদ্রলোকটি যে গুন্‌গুন্ করে গান গাইছেন তিনি এটিকেট বাঁচাতে কক্‌খনো এ-ঘরের চৌকাঠ মাড়াবেন না; আর আমি যদি দরজা ঠেলে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকি গল্প করবার জন্যেই, নির্মলের ভাষায় সেটা হবে ব্যভিচার। ঐ ভদ্রলোক যদি আজ রাত্রে আত্মহত্যা করেন, তবেই ঐ ঘরে ঢোকা আমার সম্ভব হতে পারে; কিংবা এখুনি যদি হোটেলে আগুন লেগে যায়, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা অসতর্ক কোলাকুলি হলেও বেমানান হবে না। শুক্তির মতো আমরা নিজের নিজের খোলার মধ্যে আত্মগোপন করে সংকুচিত হয়ে আছি। 'কাছে থেকেও দূরে'—কথাটায় কবিত্ব আছে; সেটা অর্থবান হয়ে ওঠে প্রতিবেশীর বেলায়। এত কাছে যে মনে হয় **nuisance**, এত দূরে যে গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আমরা প্রভাবিত হলেও কোনো কালে প্রতিবেশী দ্বারা হবো না। এমন মেয়ে নেই যে আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখের চেহারা না দেখেছে এবং না ভেবেছে আমি একজন পরমা সুন্দরী। মানুষের মুখের চেয়ে সত্যিকারের আয়না কী আছে পৃথিবীতে! সেখেনেই আমাদের সত্যিকারের ছায়া পড়ে, সেখেনেই আমরা সৌন্দর্যের পরখ করতে পারি। সৌন্দর্য খালি গুণবত্তায় নয়, আত্মার মাধুর্যে নয়—পোষাকে, খোঁপায়, দাঁড়াবার বা শোবার ভঙ্গীটিতে। বাঙালী মেয়েদের পোষাকে রঙ নেই, বৈচিত্র্য নেই;- এটা জাতীয় শুভলক্ষণ নয়। আজ গ্লোবে গিয়ে যতগুলি মেম দেখলাম সব ক'টার পোষাকের রঙ আলাদা,—দেখলে, রামধনু লজ্জায় মিলিয়ে যাবে। তবু পরিচ্ছদ আমরা ভালোবাসি; ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়ে আমরা পরস্পরের শাড়ি ও খোঁপার তারতম্য বিচার করি। ছেলেরা ফুটবল আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে যেমন সুখ পায়, আমরাও বেঁচে যাই পোষাক বা স্বামীর কথা বলে। সে-থিয়েটারে আমরা যাইনে যেখানে সামাজিক নাটক অভিনীত হয়, কেননা পোষাক নেই। 'সীতা'র পরে 'ষোড়শী' দেখে অনেক মেয়ে ভেবেছিলো ওটা একটা কমিক, কেননা **serious** হলে পোষাক থাকতো। যাই বলো, পোষাকের একটা নৈতিক মূল্য আছে। একটা ভালো ছাঁটের ব্লাউজ গায়ে দিলেই পৃথিবীকে লাগে সুন্দর, আকাশকে মনে হয় লোভনীয়। শাড়িটা যদি লম্বায় মোটে চুয়াল্লিশ ইঞ্চি হয় তবে নিশ্চয়ই সে রাতে ভালো ঘুম হবে না, দুঃস্বপ্ন দেখবো। সিল্ক না পরলে রবীন্দ্রনাথ কক্‌খনো এত বড়ো কবি হতে পারতেন না। সাহেবেরা যে ডিনারের আগে ড্রেস করে তা শুধু ভালো হজম হবে বলে। কিন্তু পোষাক অর্থ কি

তার দৈর্ঘ্য না হ্রস্বতা! পোষাকের বেলায় একটু বাহুল্য থাকা ভালো, নইলে রহস্তবিরহিত হলে মেয়ে আর মোয়া একজাতীয় হয়ে উঠবে। চুল ছেঁটে ফেলায় সুবিধে অনেক, কিন্তু ওটাই বাঙালী মেয়ের বিশেষত্ব, তার নিজস্ব হেডড্রেস। দেশের একটা নিজস্বতা থাকা ভালো; যদিও Bendå-র মতে স্বদেশপ্রেমই হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে অনিষ্টকারী। সেটা ভারতবর্ষের বেলায় খাটে না। কেননা যে-দেশ পরাধীন তার বিশ্বপ্রেমের স্বপ্ন দেখা আর কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়া সমান হাস্যাস্পদ। উৎকট স্বদেশপ্রেমের জন্যে সব দেশ মিলতে পাচ্ছে না—এটা তখনিই ভারতবর্ষের পক্ষে সমস্যা হয়ে উঠবে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন, স্বতন্ত্র। আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে কী করলাম? চুল বাঁধলাম আর প্রেম করলাম। তা-ও একটা মনের মতো করে করতে পারলাম কৈ? কোথাও যেন পূর্ণতা নেই। আচ্ছা, চোখ বুজে বিয়ে করে ফেললে কেমন হয়—একেবারে একটি নিরীহ অচেনা লোককে! সেই বিয়ের সভা থেকে পালিয়ে না এলে এতদিনে আমার কী রকম চেহারা হতো! সেই চেহারায় আমাকে মানাতো না। কতগুলি চেহারা আছে যাদের মরলেই বেশি মানায়· যেমন ধরো ইফিজেনিয়া। বার্ণার্ড শ'-র ছেলেপিলে থাকলে তাঁর লেখার দাম অনেক কমে যেত। আমার সমবয়সী পিসতুতো বোন পুষি যে ছ'টি সন্তান প্রসব করে শরীর ও মনে মীইয়ে পড়েছে তার এক চুল এদিক-ওদিক হলে সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকতো না· পুষিকে ওর স্বামী যে-সব চিঠি লিখতো তার দুয়েকটা পড়েছিলাম—উঃ, কী ভালগার! অথচ ওর স্বামী একজন সংস্কৃতে এম-এ। স্বামীর বিরুদ্ধে ডিফামেশান আনা যায় কি না জানি না; বাঙলা দেশে ডিভোর্স থাকলে ঐ রকম একটা চিঠিই যথেষ্ট। এগুলি ন্যায়সঙ্গত, এতে চরিত্রহানি হবার সম্ভাবনা নেই। স্ত্রী-র সঙ্গে ব্যবহারে ব্যভিচার বলে কোনো শব্দ নেই। দেয়ালে একটা টিক্‌টিকি পোকা ধরবার জন্যে ওৎ পেতেছে। পোকাটা এমন বোকা যে বুঝতে পারছে না; ধরা দিলেই যেন ওর মোক্ষলাভ হবে। আরশোলা, টিক্‌টিকি, ছারপোকা, ইঁদুর, কেঁচো, জোঁক, কচ্ছপ, বিছে, বিধাতার কী অপূর্ব সৃষ্টি। লরেন্স মশা নিয়ে কবিতা লিখেছে—কচ্ছপ নিয়ে। শুধু তাই নয়, চাম্‌চিকে আছে, গুগ্‌লি আছে। যাব কোথা? গো-সাপের কথা নাই বললাম। বিধাতার রুচি ভালো! লিংকন বলতেন: গরিবদের ওপর ভগবানের গভীর মমতা, নইলে ঝাঁকে-ঝাঁকে এত গরিব সৃষ্টি করবেন কেন? ফুলের চেয়ে আগাছাকেই প্রকৃতি বেশি ভালোবাসে, তাই পৃথিবীতে যত ফুল তার চেয়ে ঘাস বেশি। দুয়েকটা মশা কামড়াচ্ছে, ঘুমুতে যেতে বলছে। ঘুমোবার আগে বাথরুমে যেতে হবে—দাঁত মাজতে হবে। দাঁত না মাজলে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখবো। দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরবার লোক নেই পাশে। থাকলে সেটাই একটা

প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন হতো। বিছানায় পাশ-বালিশ আমি পছন্দ করি না। প্রভাতের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে রাখলে মন্দ হতো না, এখন একটু চেষ্টা করা যেত। এমন কোনো dentifrice নেই যে নিকোটিন্-এর কোটিং তুলতে পারে। সিগারেটটা unaesthetic তো বটেই, চুমোর স্বাদ কেঁড়ে নেয়। তবু এখন একটু ধোঁয়া ছাড়তে পারলে কী এমন মন্দ হতো! কোনো ভদ্র মেয়ে কোনো দিন গাঁজা খেয়েছে? খায়নি, অথচ গাঁজার গল্প করতে ওস্তাদ। কেন খায়নি? কৌতূহল হয় না? গাঁজা না খেয়ে মরলে সেই মৃত্যুটা অসার্থক মনে হয় না? বায়স্কোপের সবগুলি গল্প গাঁজাখুরি—মানে, conclusionগুলি। সব filmএর শেষেই জোড়াতালি দিয়ে বিয়ে ঘটাতেই হবে। বিয়ে অমনি হলেই হলো। যেখান থেকে গল্পের শুরু হওয়া উচিত, সেখানেই ওরা যবনিকা ফেলে দেয়। মাতার জঠরে শিশুর বন্দীত্ব নিয়ে কেউ একটা গল্প লেখেনি কেন, কিংবা মৃত্যুর পরে। অভিজ্ঞতাই কাব্যকারক নয়, প্রতিমা বা কল্পনাই কাব্যকারক। সংস্কৃত আলংকারিকরা তা বুঝতেন। বামন কিন্তু রীতি বা স্টাইলকেই বলেছেন কাব্যের প্রাণ; রস নয়। বাঙলা দেশে সবাই বেমালুম আওড়াচ্ছে: সত্য, শিব, সুন্দর। ঐ তিনটে শব্দের কোনো মানে নেই, এমন কি ওদের ধ্বনি-মাধুর্য পর্যন্ত কমে এসেছে। বাথরুমের বাল্‌ব-টার আবার কী হলো? মুশকিল। এখন মুখ ধুই কি করে? যাক্। এতেই হবে—হ্যাঁ, জলের টাম্বলারটা পাওয়া গেছে, জলগুলিতে স্বাদ নেই। আঃ, মোলায়েম! রবিঠাকুর প্রেম-এর সঙ্গে 'এলেম' মিলিয়েছেন, তার চেয়ে 'মোলায়েম' ভালো মিল। মশারি টাঙানো আমার দ্বারা পোষাবে না। যে গরম, ব্লাউজটা খুলে ফেলতে হবে শাড়িটাও নিতে হবে বদলে। নাঃ, মশা আছে—না-ঘুমিয়ে ছটফট করে রাত কাটাবার মতো প্রেমের বয়স চলে গেছে—আমার তো বটেই, পৃথিবীরো। দরজাটায় খিল ভালো করে আঁটতে হবে বৈ কি; কেননা আততায়ী এলে সুটকেস থেকে ছোরা বার করে প্যাঁচ দেখানোর ঝামেলা অনেক। আততায়ীর হাতে নিশ্চয়ই এতটা সময় নেই যে ইজি-চেয়ারে বসে দু'ঘণ্টা তর্ক করবে। শোয়া যাক। আমি তো শুলাম, কিন্তু এ-কথা খুব সহজেই ভাবা যেতে পারে যে এ-রাত্রে এখন কারু কারু ঘুম আসছে না। ধরা যাক্ রুগী, এঞ্জিন-ড্রাইভার, সিগনেলার, নবদম্পতি, বেশ্যা। আমার আবার মস্ত দোষ আছে। শাদা ঘোড়ায় চড়ে টগবগ করে ছুটছি—এই কথা না ভাবতে পারলে আমার ঘুম আসে না। আমার পেছনে তেত্রিশ কোটি সৈন্য,—আমার তুলনা শুধু আমিই। আমার আগে কোনো ইতিহাস হয়নি। বাঁ কাৎ হয়ে পিলের দিকটা চেপে ধরলে আমার সহজে ঘুম আসে—শাদা ঘোড়া কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, টিকটিকি, ক্যাঙ্গারু, ইজিচেয়ার, তোয়ালে, বার্ণার্ড শ'র দাড়ি, চেস্টারটনের ভুঁড়ি, সেজকাকার আঁচিল, টিঙ্চার আইওডিন,

হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং, সেনেট হাউস, স্মেলিং সল্ট, বৈঠকখানা রোড, বাডেনবাডেন, মুসোলিনি, শরৎ চাটুজ্জে, ক্যালেণ্ডার, পাটনা, গোলঘর, গঙ্গা···

প্রভাত বললে˚ তিন দিনের আগে তুমি বার্থ পাচ্ছ না। তাও 13 up-এ শেয়ালদা থেকে যে-ট্রেনটা বেনারস হয়ে দিল্লি যায় সেটায়। 7 up-এ একটা আপার বার্থ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তোমার পক্ষে সেটা সুবিধের হবে না।

অশ্রু বললে—তাও একটা মাত্র।

প্রভাত। আপাতত একটা হলেই চলবে।

অশ্রু। তার মানে? আমি একা যাব নাকি?

প্রভাত। কাজেকাজেই। ছুটি পাওয়া গেল না।

অশ্রু। ছুটি পাওয়া গেল না মানে?

প্রভাত। যদি শুদ্ধ ভাষায় বললে কথাটা তোমার বোধগম্য হয়, তাহলে বলি, অবকাশের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

অশ্রু। এ-চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।

প্রভাত। প্রেমের জন্যে এত বড়ো আত্মত্যাগের কথা শুনলে বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগৎ আমাকে উপহাস করবে! বিরহের চেয়ে ক্ষুধা মারাত্মক। তোমার সঙ্গ—আমার খুব কামনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্যে চাকরি খুইয়ে মা ও নাটু-কে শুকিয়ে মারবো এত বড়ো প্রেমিক তোমাদের সত্যযুগেও মানাতো না। সে-সব যুগে সুবিধে ছিলো এই, বাড়িতে সব সময়েই খাবার থাকতো। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তিটা প্রশংসনীয় হতে পারলো এই জন্যই যে ঊর্মিলাকে উপোস করতে হয়নি। ইস্কুল-মাস্টাররা তো নর-নারীর প্রেমের চেয়ে ভগবদ্ভক্তিকে উঁচু আসন দেবেন—যদিও সত্য কথা বলতে গেলে দু'টোর কোনোটাই ক্ষুধার মতো প্রবল নয়। তবু আজ যদি আমি ধর্মেরো ডাক শুনে মা ও ভাইকে ফেলে গৃহত্যাগ করি, এত বড়ো অধর্ম পরশুরামও ভাবতে পারতো না।

অশ্রু। তাহলে কী হবে?

প্রভাত। সমস্যা মোটেই কঠিন নয়। টিকিট লাহোরেরই কেটে সোজা পাটনায় চলে যাও এখন। সেখানে না তোমার কে বন্ধু আছেন!

অশ্রু। সে এলাহাবাদ-ব্যাঙ্কে বদলি হয়েছে।

প্রভাত। ব্যাঙ্কে বদলি হয়েছে মানে?

অশ্রু। ঐ hybridটায় দুটো অর্থ বোঝা গেল। মানে ব্যাঙ্কে কাজ করে—নিশ্চয়ই ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে—এবং পাটনা থেকে বদলি হয়েছে এলাহাবাদে।

প্রভাত। (হেসে) তাহলে তোমার পাটনা পিট্টান দিলে ?

অশ্রু। তা তো দিলে, কিন্তু তুমি করবে কী।

প্রভাত। কী আর করবো ! আপিস থেকে এসে হাই তুলবো আর তুড়ি দেব। নিত্যকালের মতো কলকাতা আবার কালিয়ে যাবে।

অশ্রু। না, ঠাট্টা নয়, be serious।

প্রভাত। সিরিয়াসই তো হচ্ছি। ছুটি পেলাম না এর চেয়ে গুরুতর বা গম্ভীর কথা আর কী হতে পারে ! আজ বুধবার, চলো শনিবারে তোমাকে তুলে দিয়ে আসি। সোজা এলাহাবাদই যাও।

অশ্রু। হ্যাঁ, ঐ রদ্দি ট্রেনে চড়ে একা-একা ছটফট করতে-করতে আমি মারা যাই আর কী ! ঐ ট্রেনে চড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনে। তার চেয়ে এক কাজ করি, এসো। তোমার পূজোর কদিনো কি ছুটি নেই ?

প্রভাত। আছে। মোটে তিন দিন। সেই তিন দিনে এলাহাবাদে যাওয়া এবং আসা ছাড়া তিনটে কথা বলবারো সময় পাবো না। কিন্তু সেই পূজোর তিন দিনেরো দেরি আছে। তুমি ততদিন কলকাতায় থাকবে নাকি ? এই হোটেলেই ? তাহলে ততদিনে তোমার মনি-ব্যাগটি পটল তুলবেন।

অশ্রু। না, আমি এই ফাঁকে কটা দিন পুষি-দির বাড়ি কাটিয়ে আসি।

প্রভাত। সে কোথায় ?

অশ্রু। দিলদারনগরে,—মোগলসরাইয়ের ডাইনে। মেইন লাইনেই পড়বে। তোমার সাধের 13-up বোধ হয় ওখানে একটু বিশ্রাম নেবেন। দেখি টাইম-টেবলটা ?

টাইম-টেবলটায় চোখ বুলিয়ে অশ্রু বললে—একটা দশ মিনিট। মন্দ নয়। তোমার ছুটির তারিখ আমাকে জানাবে, আমি সেই অনুসারে দিলদারনগর ছাড়বো। দু'জনের সাক্ষাৎকার হবে এলাহাবাদে।

প্রভাত। আমাকে কি তোমার সেই বন্ধু জায়গা দেবেন ?

অশ্রু। কেন, এলাহাবাদে পঁচিশ গণ্ডা হোটেল, তাছাড়া যমুনা আছে।

প্রভাত। তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কেনই বা যেতে হবে

অশ্রু। সেটা বুঝছ না ? এমনি, বেড়াতে—দুটো দিন অন্যরকম আকাশ দেখতে, অন্যরকম আবহাওয়া। অন্যরকম কথাবার্তা। তোমার যদি যেতে ইচ্ছে না করে, সে আলাদা কথা। জোর করে সম্মতি আদায় করবার মতো অসভ্যতা আমার নেই। বেশ, আমি একলাই যাবো।

অশ্রু রীতিমতো অভিমান করেছে। তাড়াতাড়ি কোনো কথা কয়ে এই অভিমানের কুয়াশাটুকু উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই বোকামি। প্রভাত চুপ করে রইলো।

অশ্রু বলে চললো : আমাকে নিয়ে তোমার মনে নানারকম সন্দেহ চলেছে আমি বুঝি। কী যে তুমি আমাকে ভাবছ না, জানি না। এই দীর্ঘ তিন বছর পরে হঠাৎ অজ্ঞাতবাস ছেড়ে কেন আবার তোমার একান্ত কাছে এসে পড়লাম—এই প্রশ্নটার উত্তর আমি দেব। শুনবে?

ট্যাক্সি চৌরঙ্গিতে এসে পড়েছে। এম্পায়ারে ওদের যাত্রার আজ শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অশ্রু ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বারণ করলে। গাড়ি চললো দক্ষিণে।

প্রভাত বললে—যাবে না?

অশ্রু। না। তোমাকে সেই ধাঁধাটা বুঝিয়ে দেব, শুনবে ব্যাখ্যাটা?

প্রভাত। তা যদি বলো, ব্যাখ্যার চেয়ে ধাঁধা অনেক সত্য, অনেক মধুর। ধরে নাও গ্রহতারার ষড়যন্ত্রে আবার আমাদের দেখা হয়েছে।

অশ্রু। না, ষড়যন্ত্র নয়। আমি এতদিন ইচ্ছে করেই নিজেকে লুকিয়ে ছিলাম। এই তিন বছরে আমি তোমার পরীক্ষা নিয়েছি। দাঁড়াও, আমাকেই সবটা বলতে দাও। পরিষ্কার কথাকে আমরা ভয় করি বলেই দেহ-মনে এত অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছি। সামান্য রুমাল নিয়ে ওথেলো যে-কাণ্ডটা করে বসলো, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তা নিয়ে পাঁচ মিনিট ডেস্‌ডোমোনার সঙ্গে কথা কইলে ব্যাপারটা ট্রাজিডি না হয়ে ফাস হতো। তোমার সঙ্গে আমার গভীর হৃদ্যতা হয়েছিলো এবং তারই টানে বিয়ের সভা থেকে আমি উঠে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমাকে বিয়ে করে তোমার পরম সর্বনাশ ঘটাবো, আমি তোমার তেমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নই। তাছাড়া তখন বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, আজো হইনি; কারণ আজো আমি শ্রান্ত নই, নিজেকে নিরাশ্রয় নিরালম্ব ভাববার মতো দৌর্বল্য আমার আসেনি। চলে গেলাম জলপাইগুড়ি সামান্য টিচারি নিয়ে। বাড়ির সদর দরজায় খিল পড়লো, বাবা দুর্ভাষায় দুর্বাসাকে পর্যন্ত অতিক্রম করলেন; আত্মীয়-স্বজনেরা কলঙ্কিনী বলে আখ্যাত করে আমাকে তাঁদের পুত্রী-পৌত্রীদের কাছে নরকের দ্বাররূপে দাঁড় করিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। সে-সব আমি নীরবে সহ্য করেই তীব্র প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু তারপরে জলপাইগুড়িতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

প্রভাত নিবিষ্টমনে সিগারেট টানছে। অশ্রু খোঁপাটা ঘাড়ে ওপর জুৎ করে বসিয়ে বলে চললো : সেই কথাই তরন্ত সেজকাকা বলতে এসেছিলেন। কাণ্ডটা আর কিছু নয়, আরেকজনকে ভালোবাসলাম। তোমাকে তখনো ভুলিনি, তোমার প্রতি আমার মমতা স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহের মতোই অপরিসীম, তবু চিত্ত আবার উন্মুখ

হয়ে উঠলো। নবাবিষ্কারের আশায় অধীর মনকে বাঁধি কি করে? তুমি shocked হচ্ছ?

হাওয়ায় সিগারেটের ছাই উড়িয়ে দিয়ে প্রভাত বললে—না।

—এমন পুরুষ আছে যার জন্যে হৃদয়ে শুভকামনার আর অন্ত থাকে না, রাতে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে তার কথা ভাবতে ইচ্ছে হয়, ভাবলে ভালো লাগে এবং এত ভালো লাগে যে চোখে জল আসে। সে অসুস্থ হলে অজস্র সেবায় তার জন্যে দেহপাত করতে সাধ হয়, সে বিপন্ন হলে তার জন্যে নিজেকে রিক্ত উন্মুক্ত করে দেবার উন্মত্ততা আসে। সে আমার তুমি। কিন্তু এমন পুরুষেরো দেখা পেলাম যাকে জয় করবার জন্যে প্রাণে জাগে প্রচণ্ড লোভ; যার নৃশংস ঔদ্ধত্যকে স্ত্রৈণতায় রূপান্তরিত করবার ইচ্ছা হয়। সে তার অবিচল পবিত্রতার পাহাড় থেকে নেমে এসে আমার পায়ের ধূলায় কলঙ্কিত হবে এত বড়ো প্রলোভন দমন করতে ক্লিওপেট্রা পারতো কিনা জানি না, আমি পারলাম না। আমি গেলাম এগিয়ে, কিন্তু হটে এলাম। সে আমার নির্মল। তুমি শুনছ?

প্রভাত। শুনছি, কিন্তু কথাটা এমন কিছু নয় যে, তোমাকে এত উত্তেজিত হতে হবে!

অশ্রু। নির্মলের কথা বলতে গিয়ে আমি উত্তেজিত না হয়ে পারি না। খুব ধীরে ধীরে একটা যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের বর্ণনা করলে সে-বর্ণনা ব্যর্থ হবে। আমি দু'জনকে ভালোবাসলাম; কিন্তু সত্য কথা বলতে যদি বাধা না দাও তো বলি, আজো আমার ভালোবাসার অন্ত পাইনি।

প্রভাত। যেন না পাও, তাই প্রার্থনা করি। নতুন-নতুন অচরিতার্থতায় প্রেম তোমার মহনীয় হয়ে উঠুক।

অশ্রু। নির্মলকে পারলাম না পরাভূত করতে, আমার প্রেম কিন্তু তবু সংকুচিত হলো না। যে-প্রেমের পরিণতি বিবাহ নয় এবং যে-বিবাহের পরিণতি সন্তানজনন নয় সে-প্রেম ও বিবাহকে নির্মল ঘৃণা করে। আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি হলুম না বলে সে আমার চুম্বন পর্যন্ত সহাস্যমুখে প্রত্যাখ্যান করলে। জলপাইগুড়িতে প্রায় দু'বছর আমার এই ভীষণ পরীক্ষা চলেছে। বাইরে হারলাম বটে, কিন্তু অন্তরে বলবতী হয়ে উঠলাম। সেই পরীক্ষার সাক্ষীরূপে যাকে পেলাম সে আমার ব্যর্থতা।

অশ্রু চেয়ে দেখলে প্রভাত গদিতে ঠেস দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনছে।

—নির্মলকে হারালাম বটে, কিন্তু তোমাকে হারাবো ভাবতে মন কেঁদে উঠলো। এই তিন বছরে তুমি হয়তো অনাত্মীয় হয়ে গেছ, হয়তো অশ্রুর নাম তোমার সেদিনকার অশ্রুর মতোই মুছে গেছে, তবু তোমাকে না ডেকে পারলাম কৈ?

দেখলাম সেই ডাকে তুমি সাড়া দিয়েছো, মনে হলো আমি যদি ভুলক্রমে নির্মলের অন্তঃপুরিকাও হতাম, তুমি এমনি করেই সাড়া দিতে!

প্রভাত। আর আমি যদি এতদিনে একটি অন্তঃপুরিকাকে অন্তরে এনে প্রতিষ্ঠিত করতাম?

অশ্রু। তাহলেও আমার ডাক অনুচ্চারিত থাকতো না। তোমার স্মৃতি আমার জীবনের একটা বিশ্রাম-নীড়। তোমাকে নিয়ে যদি আনন্দার্ত না-ই হতে পারি তবু তোমার প্রতি আমার সুশীতল এই স্নেহটি অমর হয়ে থাকতো। কিন্তু এই দীর্ঘক্লিষ্ট দিন-রাত্রির অত্যাচার তোমাকে বশীভূত করতে পারেনি,—আজো তুমি মুক্ত। তুমি নির্মলের মতো বিয়ে করনি। কেন করনি?

প্রভাত। সে একটা accident! যদি আমাকেও পরিষ্কার করে কথা বলবার অনুমতি দাও তো বলি, তোমাকে ভালোবেসেছি বলেই অন্য কাউকে আমি বিয়ে করবো না, সন্ন্যাসধর্মের এই উচ্চাদর্শ আমার সামনে উপস্থিত নেই। তাছাড়া বিয়ে করার কতকগুলো ব্যাবহারিক সুবিধে আছে; আমার মা বুড়ো হয়েছেন, অবস্থা এত স্বচ্ছল নয় যে রান্নার জন্যে লোক রাখি—মা-ই সব করেন, বৌ এলে মাকে ছুটি দিতে পারতো। তাই বলে বৌকে যে ভালো লাগতো না, তা-ও নয়—বিনাদামের উপহারের প্রতি যেমন মমতা হয় আমার এক তিলো কম হতো না তার তুলনায়। কিন্তু যাই বলো অশ্রু, নির্মলের কথায় সুগভীর একটা সত্য আছে। সেই সত্য তোমার-আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে অস্বীকার করবার সংস্কার যেন আমাদের না হয়।

অশ্রু। প্রত্যহের ছোটখাটো গ্লানিতে সে-প্রেম কি মলিন হয়ে উঠতো না?

প্রভাত। যাতে মলিন না হয় তার চেষ্টা করতে, সে-চেষ্টায় পরাঙ্মুখ বলেই তো আমাদের নর-নারীর সম্পর্কে এতো কুশ্রীতা আত্মপ্রকাশ করছে। স্ত্রীকে যতদিন আমরা সামগ্রী মনে করবো, এবং স্বামীকে যত তোমরা দেহদাস মনে করবে ততদিন আমাদের সংসার অশুচি থাকবে। এবং তারই প্রতিকারকল্পে প্রেমের প্রয়োজনীয়তা আছে। নির্মলের কথা মিথ্যা নয়, অশ্রু। যে-প্রেম জীবনের পরম উপকার সাধন করে সে-প্রেমকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে জীবনে না থাকে স্বাদ, না থাকে তৃপ্তি। আমরা স্ত্রী-পুরুষেরা পরস্পরকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করে ফেলি বলেই আমাদের জীবনের রহস্য যায় মরে, মিলন হয় মলিন। কিন্তু তুমি যে নির্মলের অন্তঃপুরিকা হয়েও আমার প্রতি অন্তঃশীল স্নেহ লালন করবার গর্ব করছ, তা মিথ্যা। দাঁড়াও, আমাকে শেষ করতে দাও। তোমার স্নেহের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আমি না-ই বা করলাম, কিন্তু যে-স্নেহের বাহ্যাভিব্যক্তি নেই আমি তার দাম দিতে বিমুখ থাকবো। আরো কথা আছে। সান্নিধ্য না থাকলে স্নেহের সার্থকতা কোথায়! প্রেম

শুধু চিত্তের প্রসাধন নয়, জীবনের সর্বব্যাধিনাশক মহৌষধি। যে-মন অন্যত্র একবার বিক্ষিপ্ত হয় সে-মনের একনিষ্ঠতা নষ্ট হয় বলেই স্নেহের ঘটে অপমৃত্যু।

অশ্রু। দৈহিক প্রয়োজন-কথাটা যদি ব্যাপকভাবে নাও তো বলি, দৈহিক প্রয়োজনেই যদি বিয়ে করতে হয়, তবে তাই বলে ব্যক্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে, লুপ্ত করে, zero হয়ে বসে থাকতে হবে—সমাজের দেওয়া এই বিধির আমরা বিপদ ঘটাবো। একজনের স্ত্রী হয়েছি বলে আরেকজনের বন্ধু থাকতে পারবো না এত বড়ো একনিষ্ঠতার বড়াই করলে আমার গা জ্বলে। গৃহিণী অর্থ সমস্ত বাহিরকে ঠেলে ফেলে গৃহবন্দিনী হয়ে থাকা নয়। সামান্য সংসারে আমার প্রকাণ্ড ভবিষ্যতকে কুণ্ঠিত, সংকুচিত করে রাখতে পারবো না।

প্রভাত। দোষ সমাজবিধির নয়, অশ্রু, দোষ যদি কারুর থাকে তবে এই মানুষের চিত্তবৃত্তির ভঙ্গুরতার। প্রেম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না বলেই তা মধুর, বিরহের উত্তেজনা সমগ্র জীবনব্যাপী হলে আমরা অথর্ব, পঙ্গু হয়ে থাকতাম। আমরা খুব অল্প দিন বাঁচি বলেই জীবনকে এতো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে চাই। দৈহিক প্রয়োজন কথাটা ব্যবহার করে ভালোই করেছ। কেননা এই দেহই তোমার চিত্তের পরিপন্থী হয়ে উঠতো; উঠতোই। তখন তুমি বহু-সন্তানপরিবৃতা, সংসার-ভারে নুয়ে পড়েছ, মন তোমার তখন বিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে, দায়িত্বের তোমার আর সীমা নেই—অতীত কালের দিকে ফিরে তাকাবার তোমার না আছে অবকাশ, না বা অভিলাষ। যৌবন যে অবিনশ্বর নয় তার জন্যে সমাজকে দায়ী করলে ঘোরতর অন্যায় হবে। এবং যৌবনকালে যদি তুমি কাউকে পুচ্ছটি উচ্চে তুলে নাচাবার পরামর্শ দিয়ে থাক, পরে তুমিই তা কেটে ফেলবার বিধান দেবে। যাক, লেক এসে গেছে। তোমার কাঁধের সেফ্‌টিপিনটা চাদরে আটকে রইলো; দাঁড়াও, ছাড়িয়ে নি।

—এ ছাড়ালেও ছাড়ানো যাবে না।

লেক থেকে ফিরে এসে অশ্রু দেখলে তার ঘরের কাছে চেয়ার টেনে তিনু বসে আছে। 'এই যে দিদি' বলে তিনু লাফিয়ে উঠে অশ্রুকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো। প্রথমটা আনন্দে অভিভূত হতে গিয়ে পরক্ষণেই অশ্রু উঠলো চমকে। তিনুর মুখ তুলে ধরে শুধোল: তোর মাথায় এ কিসের ব্যাণ্ডেজ?

তিনুর মুখ দীপ্ত, দুই চোখে খুশির চাঞ্চল্য, বললে—মোটর য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে, দিদি। তেমন কিছু লাগেনি, ইঞ্চি দুয়েক কেটেছে মাত্র।

অশ্রু ছোট ভাইটির চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বললে: কিছু খাবি?

তিনু বললে: খাওয়ার সময় নেই দিদি আমাকে এখুনি এক বন্ধুর বাড়ি যেতে

হবে। বিকেলে কাল জাহাজ ছাড়বে আমাদের। কলম্বো হয়ে যাচ্ছি দিদি। ভাগ্যিস্‌ তোমার সঙ্গে দেখা হলো। এখন যাই?

বলে তিনু নত হয়ে অশ্রুর পায়ের ধূলো নিতে যাচ্ছিলো, অশ্রু তাকে একেবারে শিশুটির মতো বুকে টেনে নিলো। বললো বাবা জানেন?

তিনু হেসে ফেলল। বললে— বাবা? যে-দিন আমাকে বাড়ির বার করে দিলেন সে-দিনই জানতেন পাতালের দিকে পা বাড়াতে আমার আর দেরি নেই। মন্দ কি, পাতালই আবিষ্কার করে আসি না হয়। কালকে খবরের কাগজে নামটা যদি বেরোয়, বাবার অগোচর থাকবে না। হয়তো মনে-মনে আবার অভিশাপ দেবেন।

তিনুর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অশ্রু বললে— বাবা তোকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন নাকি?

তিনুর মুখ আনন্দে আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো— নিশ্চয়। তুমি যে অন্যায় করেছো তার চেয়ে আমার এই সাগরলঙ্ঘন ঘোরতর পাপ। বাবার আদেশকে মান্য করবার মতো বিবেক পেলাম না দিদি। বাবার চেয়েও বড়ো অভিভাবক আছে, সে আমার সত্যোপলব্ধি, আমার মনুষ্যত্ব। সেই প্রথম আমি বিদ্রোহ শিখলাম। বাবাকে আমি দোষ দিতে পারি না। আর আমার সময় নেই। তোমার জন্যে বসে বসে অনেক সময় আমা॰ চলে গেছে। আরেকটু দেরি করলে হয়তো দেখা হতো না। যোগাড়-যন্ত্র এখনো অনেক বাকি।

অশ্রু বললে— প্যাসেজ জোটালি কী করে?

— সে জুটে যায় দিদি। আমি যে খালাসী সেজেছি। একবার যেতে পারলেই হলো – তারপরে আমাকে পায় কে! সময় নেই দিদি।

অশ্রু নীরবে তিনুর ললাটে চুম্বন করলে, বললে—তোর জন্যে উদ্বেগের আমার অন্ত থাকবে না, তিনু।

আকাশে-রঙের মতো তিনুর মুখে হাসি লেগেই আছে। তিনু দরজার দিকে দু'পা এগিয়েছিল, থামলো। বললে—আমার জন্যে বৃথা উদ্বেগ করে মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে কিছুই লাভ হবে না। যে-পথে আমি চলেছি, বেগে চলেছি, পিছে তাকিয়ে দেখবার সময় নেই। উদ্বেগ না করে আশীর্বাদ করো। বলে তনু অন্তর্হিত হলো।

বুকটা খালি হয়ে গেছে। তিনু! কী আশ্চর্য চক্ষু! ঐ চোখ কার ছিলো মনে করতে পারছি না,—স্বপ্ন আর বিদ্যুৎ—শেলির ছিলো হয়তো। সমুদ্র উত্তীর্ণ হবে বলে এত আনন্দ, যেন একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি! ও-ও গৃহছাড়া! 'বাবার দোষ নেই', মহত্ত্ব,— ও ঘর ছেড়ে আকাশকে পেয়েছে- অগাধ, বিস্তীর্ণ! কোথায় গেলো ছুটে? পথে আবার কোনো দুর্ঘটনা না হয়, স্বচ্ছন্দে যেন সাগরে দুলতে পারে। তিনু

কত সুন্দর হয়েছে— কী বলিষ্ঠ! ওর চোখের মাঝে বসে মা যেন হাসছেন! আশীর্বাদ করবো বই কি তিনু, সত্যোপলব্ধির জন্যে সক্রেটিস থেকে আজ পর্যন্ত যারা মরেছে তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত তোমাকে প্ররোচিত করুক। তুচ্ছ শাসনের কাছে তোমার সত্যকে লজ্জিত করো না,— হোক সে পিতা, হোক সে প্রভু, হোক সে ভগবান! তোমার জন্যে উদ্বেগ করে লাভ নেই— তুমি যদি তোমার সত্যের জন্যে মর-ও, আমি তোমার চিতায় ফুল দিয়ে আসবো। সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যে তুমি সহস্র ভুলের মধ্য দিয়ে যাও, লক্ষ লাঞ্ছনার মধ্যে— সে-গৌরবে তুমি অমর হয়ে থাকবে। তিনু, তিনু, তিনু। তোমার প্রশস্ত উন্নত কপাল, ঘন কুঞ্চিত চুল, বিস্ফারিত বুক, দৃঢ় দীর্ঘ বাহু, ঋজু দেহ যেন ঊর্ধ্বশিখা! চোখে বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন, চিবুকে তেজস্বিতা, দুই হাতে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা! তিনু!

অশ্রু সেকেণ্ড ক্লাশে মেয়েদের কামরাতেই উঠলো। টিকিট শেষ পর্যন্ত লাহোরের না কেটে দিল্লীর কেটেছে। গাড়ি ছাড়বে রাত স'দশটায়। মন্দের ভালো—গায়ের ওপর একটা পাতলা চাদর টেনে দিয়ে ঘুমুনো যাবে, সকালবেলা ঝাঝায় পৌঁছুবার আগে ও হাই তুলছে না। এটার সঙ্গে আবার রেস্টুরাণ্ট কার নেই, থাকলেও একা-একা খাওয়ায় আরাম নেই; ঝাঝা কিংবা কিউল-এ পৌঁছে প্ল্যাটফর্ম থেকে চার-পয়সা-দামে এক পেয়ালা পান্‌সে চা খেলে ওর জাত যাবে না। একটা বই কিনবে এডগার ওয়ালেস্‌-এর? এই স্টলে যে মারি স্টোপ্‌সও পাওয়া যায়। ট্রেনে বসে বই পড়ার মতো ন্যাকামি নেই; তার চেয়ে বাসরঘরে বরের গান গাওয়া বরং সহ্য করা চলে। গাড়িটা ছেড়ে দিলেই একটা নতুন জগতে এসে পড়বে; গীতায় মৃত্যুর যে ব্যাখ্যা আছে তারই একটা লৌকিক উদাহরণ! বাথ-রুমে যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে তো? স্নান করতে না পারলে মরেই যাবে অশ্রু। একটা য়্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে উঠলো। একা যাচ্ছে বুঝি। ওর সঙ্গে আলাপ করা যাবে—বর্ধমানের বেশি নয় কিন্তু! মেয়েটি মোজা পরেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ পরেছে— বাঁচা গেলো। মাঝের বার্থ টা কিন্তু খালি রইলো। রাতে শীত করলে ওটায় না হয় উঠে আসবে—তার জন্যে জানালাগুলো ও কিছুতেই তুলে দিতে পারবে না।

— ঘণ্টা দিয়েছে, উঠে পড় অশ্রু। দিলদারনগরে পৌঁছেই চিঠি দিয়ো কিন্তু। আমার আপিসের মর্জি বুঝে এলাহাবাদ যাবার দিন ঠিক করা যাবে। জানলা দিয়ে মুখ বার করে থেকো না যেন। (স্বল্প হাসি)

—আর তুমি সাবধান হয়ে বাড়ি যেয়ো। বাস-এর জানলা দিয়ে হাত বার করে রেখো না, সেদিন কাগজে পড়লাম কার কনুই গেছে থেঁৎলে। (স্বল্প হাসি)

অশ্রু হাত বাড়িয়ে দিলে ; প্রভাত তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলো।

অশ্রু। কীট্‌সের হাত ধরে কোলরিজ তো মৃত্যুর স্পর্শ পেয়েছিলো। আমার হাত ধরে তুমি কী স্পর্শ করছো? (স্বল্প হাসি)

প্রভাত। মুক্তি। (স্তব্ধতা) ফিরে এসেই আবার ফিরে পাবার মুক্তি।

বিচ্ছেদে গভীর বেদনা আছে,—এমন বেদনা যে, যেন কে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিচ্ছে তবু ট্রেন চলে গেলে ট্রেনের ফাঁকা লাইন দুটোর মতোই মনে জাগে মুক্তি, উপশম! যেন একটা নিদারুণ উদ্বেগ থেকে বাঁচলাম ; উৎকণ্ঠা গেলো ঘুচে। না আছে দ্বৈত না বা দ্বিধা। বেশ একটা নিশ্চিন্ত অবস্থা,—পীড়াবসানে সামান্য একটু দুর্বলতা মাত্র। যাই বলো, পরিচয় জগতে ঔজ্জ্বল্য নাই থাক, অন্ধকারস্নিগ্ধ একটি জাদু আছে —মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। চেনা জায়গায় সহজে হাত-পা নাড়তে পারি, হোঁচট খেতে হয় না,—সে-জায়গার চারপাশে খাদ নেই! প্রেমের পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের চূড়ায়, স্থান সেখানে এত সংকীর্ণ যে দু'জনকে স্পর্শ না করে দাঁড়ানো যায় না। একটু এ-দিক ও-দিক হলেই সেই উঁচু চূড়া থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে ; তারপর সে-চোট সয়ে সুস্থ হয়ে ফের নিজের পুরোনো জায়গাটুকুতে আর ফিরে যাওয়া যায় না, জীবনে দেখা দেয় পক্ষাঘাত ঐ পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তেই পতনের আশঙ্কায় পীড়িত বিপন্ন হয়ে থাকাটা প্রাণের একটা আদর্শ বৃত্তি নয়। তার চেয়ে নিরীহ অনলঙ্কৃত সমতল জায়গাটি বেশি কমনীয়। স্বস্তি ভালো সুখের চেয়ে। আমার চেনা জগতে স্তব্ধতা ; প্রেমের জগৎ প্রগল্‌ভ,—তাই আসে শ্রান্তি। প্রেমের জীবন একটা নিয়মাতিরিক্ত অস্বাভাবিক জীবন। প্রেম ক্ষণস্থায়ী বলেই তার এত প্রশংসা। প্রেম অবিনশ্বর হয়নি বলেই জীবন-ধারণে এত মাধুর্য।

জীবনের প্রেমই অবিনশ্বর।

দিলদারনগর

বন্ধু,

স্টেশনে নেমে দেখলাম স্বয়ং নগেনবাবুই উপস্থিত আছেন। খুব সমারোহ করে অভ্যর্থনা করলেন—এমন বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন যে, কুণ্ঠিত হতে হলো। অথচ লোকটি বেশ! ভদ্রলোক বললে সব মিলিয়ে আমাদের মনে যে একটি সৌম্য শান্ত ও বিনয়স্নিগ্ধ চেহারা মনে পড়ে নগেনবাবু তার এক চুল ফারাক নয়। আমার আসার টেলি পেয়ে তিনি যেন হাতের মুঠোয় চাঁদ পেয়েছেন। উপমাটা সেকেলে বলেই কথার আন্তরিকতা নষ্ট হয়েছে ভেবো না। তাঁদের বাড়িতে আমি পদার্পণ করবো—

এত বড়ো সৌভাগ্যের বর তিনি পরজন্মেও নাকি চাইতে সাহস করতেন না। লোকটি বেশ অমায়িক ; সম্পর্কের সুবিধে পেয়ে আমার সঙ্গে অসংকোচে আলাপ করতে পারছেন। আমার মন্দ লাগেনি।

একাই আমার পছন্দ হলো—দড়ির এক্কা। জিনিসপত্রগুলো আরেকটা এক্কায় বোঝাই হলো। নগেনবাবু যত দূর সম্ভব সংকুচিত হয়ে বসলেন, বললেন : হঠাৎ গরিবদের ঘরে ?

বললাম : আসার মধ্যে আনন্দ নেই বরং ক্লান্তি আছে ; যদি আনন্দ থাকে তবে আকস্মিকতায়। এবং সে-আনন্দ উভয়ত।

নগেনবাবু সসম্ভ্রমে বললেন : কিন্তু এই হতচ্ছাড়া দেশ কি তোমার ভালো লাগবে ? (নগেনবাবু আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করলে ভালো লাগতো না—প্রথমতঃ তিনি বয়সে আমার ঢের বড়ো, দ্বিতীয়তঃ সম্পর্কের মর্যাদা তাঁকে দেওয়া উচিত।)

বললাম : দেশ দেখতে যে অন্তত এখানে আসিনি সেটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। এসেছি আপনাদের দেখতে। পুষি-দির সঙ্গে শেষ দেখা প্রায় ন'বছর আগে—যে-বার ওর প্রথম ছেলে হয়। পুষি-দিকে দেখবার জন্যে মনটা আইঢাই করছে। ওর সঙ্গে ছেলেবেলাটা আমার কী ফুর্তিতেই যে কেটেছে। এক দিনের একটা মজার গল্প শুনে রাখুন। গল্পটা বলব মনে করেই আগে থেকে এক চোট হেসে নিলাম। যারা হাসির গল্প নিজে গম্ভীর থেকে বলতে পারে না তাদের তুলনা হয় ঠিক সেই জাতীয় কবির সঙ্গে, যারা কবিতা লিখবার অবকাশে অন্যকে ছন্দ বা শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। হাসি থামিয়ে গল্পটা ফের বলবার আয়োজন করছি, নগেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে মুখ আমার শুকিয়ে গেলো। স্ত্রীর শৈশবকালের এমন একটা গল্প শোনবার কৌতূহল দমন করে নগেনবাবু তাঁর মুখের চেহারাকে হঠাৎ এমন নিরুৎসাহ করে তুলেছেন দেখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মুখের সামান্য একটি রেখায় আবহাওয়া গেল বদলে। নগেনবাবু কিছু একটা বলবেন-ই, তার প্রত্যাশায় চুপ করে রইলাম।

স্টেশন থেকে গাড়ি অনেকটা পথ এসে গেছে ; কিন্তু ডেরা তখনো দূরে। কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব পাতলা করবার চেষ্টা করে নগেনবাবু বললেন : আমার তৃতীয় ছেলেটি মৃত্যু-শয্যায়—

শুনে পরম ব্যথায় চমকে উঠলাম। খবরটা যেন তেমন কিছু অসাধারণ নয় এমনি ভাবে নগেনবাবু এই বেদনাদায়ক সংবাদটা আমাকে জানালেন, আমার একটুও ভালো লাগলো না। বরং এতক্ষণ এই ভীষণ খবরটা গোপন করে আমার কৃত্রিম সম্বর্ধনার আয়োজনে তিনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বলে আমার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। আমার এই হাসি-খুশি আনন্দকোলাহলের মাঝে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়লে

পাছে আমি বিরক্ত.—হ্যাঁ, বিরক্ত হই—সেই ভয়ে তিনি এমন একটা খবর প্রকাশ করেননি। ছেলেকে মৃত্যু-শয্যায় রেখে আমাকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন!

বললাম: বলেন কি? কী অসুখ? অবস্থা কি খুবই খারাপ?

আমার গলায় সহানুভূতির আমেজ পেয়ে নগেনবাবুর গলা এবার অনায়াসে ভারি হয়ে উঠলো: ডবল নিমুনিয়া। কাল রাত্রেই যাচ্ছিল; আজকের দিনটুকু আর যাবে না হয়তো। গিয়ে দেখি কি না সন্দেহ!

চিন্তিত হবার কারণ ঘটলো। এক সঙ্গে কত চিন্তা যে মনে ভিড় করে এলো তার ইয়ত্তা নেই। আমার চিন্তার সূত্র অনুসরণ করতে না পেরে নগেনবাবু বললেন: বাড়িতে উঠলে তোমার অনেক অসুবিধে হবে। এমন জায়গা, ডাক-বাংলো পর্যন্ত নেই। বক্সারে যেতে পারো; ডাউন ট্রেন কাছাকাছিই আছে। ফিরবে নাকি?

কঠিন হয়ে বললাম: আপনি পাগল হয়েছেন?

দেখ দেখি আমার সম্বন্ধে লোকের কী অন্যায় ভুল ধারণা! আমি ভালো শাড়ি পরি বলে যেন ধুলোর ওপর বসতে পারবো না। এই নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ হতো না; যে-তর্কের মেজর প্রেমিসগুলো প্রমাণসাপেক্ষ নয়, সে-তর্কে আমি সাধারণত চুপ করে থাকতেই ভালোবাসি। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ বড়ো—এটা আমার কাছে উপদেশ মাত্র নয়—এটা আমি কায়মনোবাক্যে মানতে চাই। দেখ, মানুষের অন্তর্দৃষ্টি কত কম, তার সব বিচার নির্ভর করে বাইরে মার্কার ওপর। আমার বাবা পুরুষদের বড়ো চুল রাখা দু'চোখে দেখতে পারেন না। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বাবার দেখা হলে বাবা তাঁকে যে কী বলে সম্বর্ধনা করতেন ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। মানুষের অন্তরের পরিচয় পেতে হলে গুপ্তচরের মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে আত্মার অনুধাবন করতে হয়—কার বা তত সময় ও ধৈর্য আছে বলো! একটা সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি না আসতে পারলে মনের অসাম্য অবস্থাটা আমাদের পীড়া দেয়। তাই তুমি দেখতে পাবে আমাদের দেশের বেশির ভাগ বাঙলা নভেলই এই ভুল-বোঝাকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছে। ওটা নেহাৎ একটা শস্তা চালাকি। যেমন ধরো শরৎ চাটুজ্জে। তাঁর যে বইগুলো উৎরেছে সবগুলিতে এই ভুল-বোঝার ঘোর-প্যাঁচের জটিলতা এত বেশি যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে বলে ভালো লাগে। আমরা পরস্পরকে প্রকাশ্যে সন্দেহ করি, করি অবিশ্বাস ও অবহেলা, কিন্তু নিভৃতে বসে একে-অন্যের কথা ভেবে প্রেমবিগলিত হয়ে কাঁদি আর কপাল কুটি— এই দৃশ্য দেখলে আমি পড়তে পড়তে পর্যন্ত উচ্চহাস্য না করে থাকতে পারি না। ভাবি: লোকগুলি কী ভীষণ বোকা। এই জন্যেই দেশ আমাদের এগোচ্ছে না। সামনা-সামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা কয়ে দু' মিনিটে যার মীমাংসা হয় তাকে এমনি করে অনাবশ্যক ঘোরালো করে তোলায় আমাদের আয়ুক্ষয়

হয় না? ভুল-ও বুঝবো, ভাল-ও বাসবো. এ কী অত্যাচার। তুমি বলবে এটাই স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি। আমি এটা মানি না; তোমার সেই বৃত্তিকে শাসন করতে হবে। স্পষ্টতা থাকবে না কেন, কেন থাকবে না সাহস? যাচাই করবো না অথচ যা চাই তা না পেলে গাল ফোলাবো—এই 'ছিঁচকাঁদুনে নাকে ঘা' স্বভাব আমাদের যাবে কবে? জীবনে যা ঘটে তাই আর্টে ঘটাতে হবে এই সাহিত্যধর্মে যদি তুমি বিশ্বাসবান হওই, তবে তোমাকেও বলি আর্টে এমন অনেক জিনিস real হতে বাধ্য যা জীবন কোনোদিন প্রত্যক্ষই করেনি। যেমন ধরো কথোপকথন। মানো তো?

অতএব, তুমি বুঝতেই পাচ্ছ, এমনি সব আজগুবি চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে বাকি রাস্তাটা নগেনবাবুর সঙ্গে আর কোনো কথা হলো না। আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে যেখানে এসে এক্কাটা দাঁড়ালো, দেখে বিশ্বাস হচ্ছিলো না,—শুনলাম সেটাই নগেনবাবুর বাসা। আস্তাবলে সহিসদের মাচা করে শুতে দেখেছি, কিন্তু নগেনবাবুর বাসায় মাচারো বালাই নেই। সব সমতল। এত অপরিষ্কার তুমি কল্পনা করতে পারবে না। বীভৎস রস বলে একটা রস আছে, ঐ রস নিয়ে আমাদের দেশে কোনো লেখকই চর্চা করেন না দেখে আমার কষ্ট হয়। একমাত্র করুণ রসই বাঙলা দেশে কাটে এটা নরম মাটির দোষ। যদি পরকে কাঁদাবে আশা করে লেখায় নিজে খানিকটা কাঁদতে পারো তো বাঙলা দেশে সেই সাহিত্য তোমার সফল রচনা হলো। গল্পের ফর্ম বা টেকনিকের জন্যে নয়—কান্নার কাদা থাকলেই তার দাম হবে। দেশের চরিত্রগুলো স্যাঁৎসেঁতে, খট্‌খটে নয়। কিন্তু, সত্যি বলছি, যদি কেউ আন্তরিক অনুভব করে পুষি-দির এই বাসা নিয়ে কবিতা লেখে, খাঁটি বীভৎস রস সে নিশ্চয়ই জমাতে পারবে, এবং সেটা রসসৃষ্টি হিসেবে পিছিয়ে থাকবে না।

ছোট্ট বাসা, তিনটে ঘর—টিনের চাল, ভেতরে একটুখানি উঠোন। তিনটি ঘর ভরে কিলবিল করবার জন্যে বিধাতা যেমন পুষিদির কোলে ছ'টি সন্তান দিয়েছেন তেমনি উঠোন ভরে দিয়েছেন আগাছা। যেখানেই পা দেবে পায়ের ধুলো নিতে কোনো অনুগত ভক্তই সেখানে দাঁড়াবে না, ছুটে পালাবে। যে ঘরটাতে এসে আমি প্রথম দাঁড়ালাম সে-ঘরটার অবিকল বর্ণনা দিতে পারলে তোমাদের দলীয় অনেক সাহিত্যিককেই আমার তাঁবেদারি করতে হতো। মেঝেটা মাটির, তার ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে পুষি-দি বসে আছে, কোলে মুমূর্ষু সন্তান,—ছেলেটির বয়স দু' বছর কয়েক মাস হবে; চার পাশে স্তূপীকৃত অপরিচ্ছন্নতা। কতকগুলি ময়লা কাপড়, ময়লা বিছানা (তোলা হয়নি), কতগুলি থালা-বাটি (মাজা হয়নি), কতগুলি অর্ধ-নগ্ন ছেলে-পিলে (তারস্বরে চেঁচাচ্ছে)। পুষি-দির চেহারা কি রকম ধস্‌কে গেছে, (নগেনবাবু কিন্তু যেমন মস্ত, তেমনি মজবুত) ওর দিকে চেয়ে আমার ভারি করুণা

হলো। ওকে নিচু হয়ে প্রমাণ করে ওর পাশে বসে পড়লাম। পুষি-দির দু' চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুরেখা নেমে এসেছে। ওর ছেলের শরীরে একটু হাত বুলিয়ে বললাম : ডাক্তার দেখে কি বলছে ?

পুষি-দি ছেলের মুখের ওপর নির্নিমেষ দৃষ্টি রেখে বললে : আর ডাক্তার ! দেখছিস না কেমন করছে। বাছাকে আর রাখতে পারলাম না !—পুষি-দির বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

নিজেকে যে কী অসহায় লাগতে লাগলো বুঝে নিয়ো। সেই ঘরের চেহারা দেখে কাকে অভিশাপ দেবো ঠিক করতে পারলাম না। রোদের দিকে তাকানো যায় না, অথচ এত বেলা পর্যন্ত ছেলেপিলেগুলির না হয়েছে স্নান, না বা খাওয়া। সকালবেলা যা কটি মুড়ি খেয়েছিলো তারো জায়গাগুলো এখনো ধোয়া হয়নি। নগেনবাবুর ছোট ভাই-এর বৌ এখানেই আছে—সে-ই তদারক করছে, কিন্তু একা মানুষ পেরে উঠছে না। মেয়েটি আনাড়ি ; ভাসুর বর্তমান বলে ব্রীড়াবনতমুখী—মাথার ওপরে ঘোমটা তার সব সময়েই আনমিত। সংসার সামলানো তার কাজ নয়। পুষি-দি ছেলে কোলে করে তিন দিন ধরে বসে আছে, মমতার খুব বড় নিদর্শন হলেও এটা স্বাস্থ্যকরতার বড়ো লক্ষণ বলে মানতে পারলাম না। কিন্তু পুষি-দিকে সে কথা বলতে যাওয়ার মতো ধৃষ্টতা আর কিছু হতে পারে না। দুঃখের এত নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আমি আগে আর কোথাও দেখিনি। মুমূর্ষু ছেলেকে কোলে নিয়ে পুষি-দির শঙ্কাকুল পীড়িত মুখের তুলনা দিতে পারি, আমার হাতে বাঙলা ভাষা আজো তত শক্তিমান হয়ে ওঠেনি। এমন নিদারুণ নিঃসহায়তার ছবি আর নেই।

আমার মতো অপরিচিত আগন্তুককে দেখেই ছেলেমেয়েগুলো কান্না থামিয়ে দম নেবার চেষ্টা করছিল, ওদের চোখে আমার আবির্ভাবটা পরম বিস্ময়কর ; ওদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমি মোটেই খাপ খাচ্ছি না বলে ওরা কান্না থামিয়ে আমাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এমন কাঙাল হতচ্ছাড়া চেহারা দেখে আমার বরাবর ঘৃণাই হয়েছে ; ছেলেবেলায় তিনুর কানে একেবারে পুঁজ হয়েছিল বলে তিনুকে আমি কতদিন ছুঁইনি (ভাবতে পারো—তিনুকে !) ; কিন্তু ওদের প্রতি কখন যে বুকে স্নেহ সঞ্চিত হয়ে উঠেছে—টের পেলাম না। ওদের আত্মীয় করবার জন্যে ওদের দিকে এগোব ভাবছি এমন সময় পূর্বোক্ত বউটি এসে সেই ঘরে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়ালো। এতক্ষণে রান্না তার শেষ হয়েছে বুঝি—এবার ছেলেপিলেগুলোর গাত্রমার্জনা হবে। বৌটি আসতেই নগেনবাবু (তিনি এতক্ষণ একটা চেয়ারে অবসন্ন হয়ে বসেছিলেন) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : ওদের পরে হবেখন। তুমি আগে অশ্রুর স্নানের বন্দোবস্ত করে দাও। রান্না হয়েছে কিছু ? (বৌটি আস্তে মাথাটি একটু নামিয়ে সম্মতিসূচক

সঙ্কেত করলে) তাহলে, গরিবের ঘরে যা হয়েছে তাই চারটি বেড়ে দাও ওকে। কলকাতা থেকে আসছে,—নিশ্চয়ই খুব tired, না অভ্র ?

তোমাদের পুরুষদের এই একটা প্রবল দোষ, মেয়েদের হিতসাধনের বেলায় তোমাদের সীমাজ্ঞান থাকে না। নগেনবাবুর এই অতিশয়োক্তি আমার কাছে এত অন্যায্য মনে হলো যে, দস্তুরমতো অপমানিত বোধ করলাম। এতগুলি অভুক্ত আর্ত শিশুকে ফেলে আমার কাল্পনিক শ্রান্তি-লাঘবের জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তাঁর এই আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত এ-যুগে অচল। অতিথির তৃপ্তির জন্যে কর্ণের যুগে পুত্র-হত্যার পুরস্কার মিলতো, অর্থাৎ মরা ছেলে বেঁচে উঠতো ফের ; কিন্তু এ-যুগে ছেলে একবার মরলে আর বাঁচে না—তাই অনাবশ্যক আতিথ্যের মূল্য দিয়ে ফতুর হবার ভদ্রতা আমাদের পোষায় কৈ। ও-যুগে এমন কতকগুলো সুবিধে ছিলো যে হিংসে হয়। শিবিরাজা নিজের দেহমাংস অতিথির জন্যে অনায়াসে কাটতে লাগলেন, তাতেও ওজনে তার সমান হলো না বলে নিজে তুলাদণ্ডে আরোহণ করতে দ্বিরুক্তি করলেন না—জয় জয়কার পড়ে গেল, এমন আত্মদান আর দেখা যায়নি ; কিন্তু মজা এই যে, অতিথি শুধু-অতিথি নয়, ছদ্মবেশী ইন্দ্র। যখনই এমনি একটা মহৎ অভিনয় হয়েছে—তখুনিই দেখতে পাবে পরীক্ষাকর্তারা আগে থেকেই ছদ্মবেশী হয়ে এসেছেন ; নইলে যেন অমন একটা ত্যাগের মর্যাদা হয় না—তাকে পুরস্কৃত করতেই হবে ভেবে দেবতাদের আগে থেকে পরামর্শ চলছিল। সে-যুগে ত্যাগ বা আতিথেয়তাটাই বড়ো ছিলো না, বড়ো ছিলো তার পুরস্কারের লোভটা। সে জন্যে সে-যুগের ত্যাগের কথা পড়ে হাত-তালি দিতে হাত ওঠে না। বৃষকেতুকে কর্ণ যখন স্বহস্তে বধ করলে —মানলাম সেটা একটা বড়ো রকমের অতিথিপরায়ণতা—কিন্তু পেটুক বামুনটা কেন দেবতা হয়ে দেখা দিলো ? বৃষকেতু ফের বেঁচে উঠলো বলেই কি কর্ণের আতিথেয়তাটা জোলো হয়ে গেল না ? এই জন্যেই তো সন্দেহ হয় যে, কর্ণও আগে থেকে জানত বৃষকেতু তার নিজের মাংসই খেতে বসবে ! আমাদের ত্যাগ ঐ বাজে ঠুনকো ত্যাগের তুলনায় কত মহনীয়—আমরা ঘুণাক্ষরেও আশা করি না যে আমাদের বেলায় নিষ্ঠুর অতিথি প্রেমিক দেবতা হয়ে উঠবেন। যা আমরা হারাই হাসিমুখেই হারাই, ফিরে পাবার লোভ রেখে সে মহান ক্ষতিকে আমরা কলুষিত করি না। এমন কি পরজন্মে এ-ক্ষতির পূরণ হতে পারে এমন একটা সামান্য ইচ্ছাকে পর্যন্ত লালন করতে আমাদের ঘৃণা বোধ হয় ! আমাদের ভাগ্যের পরিধানে কোনো ছদ্মবেশ নেই, সে নগ্ন নৃশংস—আমরা জানি সে ভাগ্য চেহারা বদলে এসে বর দিয়ে আমাদের আত্মদানের অমর্যাদা করবে না। এবং তা জেনেই আমরা আত্মোৎসর্গ করতে অকুণ্ঠিত থাকি।

নগেনবাবুর কথার কোনো প্রতিবাদ না করে আমি পুষি-দির ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়লাম। ওরা প্রথমে কেউ ভয় পেলো, কিন্তু আমার বাক্সে যে একটা বিস্কুটের টিন আছে তা বের করে ওদের বন্ধুতা কিনে নিতে আমার দেরি হলো না। তুমি বললে বিশ্বাস করবে, আঁচলটা বুকের ওপর বিস্তৃত না রেখে দড়ির মতো পাকিয়ে কোমরে বেঁধে নিলাম, খুলে ফেললাম জুতো ; ছেলেমেয়েদের কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে বাক্স থেকে সাবান বার করে স্নান করাতে বসলাম। বউটি নিজে জল তুলে দিতে এসেছিল, বললাম : তুমি ততক্ষণ ঘরগুলো নিকোও, আমি এ সব একাই পারবো। স্নান করতে করতে ছেলেমেয়েদের কলরবের আর বিরাম নেই, কে আগে স্নান করবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগেছে—তাদের কত দিনকার কত ছোটখাটো ইতিহাস—দুঃখের ও সুখের—টুকরো-টুকরো করে আমাকে শুনতে হলো, আমি ওদের রাঙামাসি হয়েও এতদিন বিস্কুটের টিন ও সাবান নিয়ে আসিনি কেন এটা ওদের একটা বড়ো নালিশ। একজনের কথায় বেশিক্ষণ মনোযোগ দিয়ে অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখাবার সাধ্য নেই, বাকি হাতগুলি আমার চিবুক ধরে টেনে তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে আছে। স্নান করিয়ে একটা বড়ো থালার চারধারে ওদের বসিয়ে নিজেই ওদের খাইয়ে দিতে লাগলাম। বৌটিই পরিবেশন করছিলো। আমি যে অন্নবণ্টনব্যাপারে মোটেই সমদর্শী নই—প্রত্যেকের মুখেই এই অভিযোগ। রাত্রে ঠিক আমার পাশটিতে কে শোবে তাই নিয়ে ওরা ঘরোয়া বিবাদ শুরু করে দিলো. ওরা দুষ্টুমি করলেও ওদের মা'র মতো আমি প্রহার করব না এই অভয় পেয়ে ওরা উঠলো লাফিয়ে। খাইয়ে দাইয়ে মিষ্টি করে বললাম : তোমরা এবার চুপটি করে ঘুমোও গে ; কাকিমা ঐ বারান্দায় মাদুর পেতে দিয়েছেন। গোল-মাল চেঁচামেচি করো না, দেখছ না ভাইটির কেমন অসুখ করেছে। নগেনবাবু বললেন, আমি নাকি স্বর্গের জাদু জানি—সবাই সুড়সুড় করে মাদুরে গিয়ে শুলো! শিয়রে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পাখা করলাম, (আমার পাখা-চালানোও নাকি পক্ষ-পাতিত্বহীন নয়) ওদের ঘুমুতে দেরি হলো না। সব চেয়ে ছোট মেয়েটির বয়েস এগারো মাস ; বউটিই তাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে।

পুষি-দিকে গিয়ে বললাম : এবার তুমি ওঠ, তিন দিন তোমার স্নান নেই, খাওয়া নেই। ছেলেকে আমার কোলে দাও, তুমি এই ফাঁকে মাথায় একটু জল দিয়ে মুখে দুটো গুঁজে এস গে।

পুষি-দি এমন আবিষ্ট হয়ে আমার দিকে তাকালো যে বি. এ. পাশ করে ও এত কলঙ্কভাগিনী হয়ে আমার এমন একটা কথা বলবার মতো নয়। নাক সিঁটকে বরং বক্সার ফিরে যাচ্ছি বলে সেজে-গুঁজে এক্কায় গিয়ে উঠলেই আমাকে মানাতো।

তা ছেড়ে, এ কী রূপ! যে-ছালটির শাড়িটা পরেছিলাম কাদায় আর জলে তা সপসপ করছে; মাথার খোঁপাটার আর ইজ্জত নেই। আমার সম্বন্ধে এরা যতো ধারণা করেছিল তার সঙ্গে মিল রাখতে পারছি না বলে ওদের হতাশ করলাম যা হোক।

পুষি-দি কিছুতেই ছেলে ছেড়ে উঠবে না; যেন এমনি করে ধরে রাখলেই ওকে রাখা যাবে। শেষে অনুনয় করে, পায়ে ধরে, শাসিয়ে, ধমকে পুষি-দিকে স্নান করতে পাঠালাম। আর ওর মুমূর্ষু সন্তানটিকে আমিই কোলে নিয়ে বসলাম। এত সন্তর্পণে এত স্নেহে কোনো জিনিস ছুঁয়েছি বলে মনে হলো না। নির্মল করতলটি মমতায় কোমল করে ওর কপালের ওপর রাখলাম—জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। হাত পা ঠাণ্ডা, —নিশ্বাসের জন্যে কসরৎ করে ওর ক্ষীণ কঙ্কাল-কল্প দেহটা বারে বারে সংকুচিত হচ্ছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে পৃথিবীর কোনো সুন্দর দৃশ্যের কথাই মনে করতে পারলাম না। কিন্তু পরে যখন কোনোদিন আবার সুন্দর দৃশ্যের মুখোমুখি হব, তখন পুষি-দির এই ছেলের মৃত্যুর দুঃখটা ভুলেও মনে আনবো না। বাস্তবিক আমাদের জীবনে যদি অতীতকাল বলে কিছু দাঁড়িয়ে থাকতো এবং যা আমরা ফেলে এসেছি তা যদি ভুলতে না পারতাম—অর্থাৎ পৃথিবী গোল না হয়ে চৌকোণ ও সমতল যদি হতো—অর্থাৎ কিছু-কিছু অদৃশ্য না থেকে সবই যদি থাকতো উন্মুক্ত, উদ্‌ঘাটিত তাহলে আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর গতি ছিলো না।

দেখ, আমরা প্রাণী-হিসাবে কত অসহায়! বিজ্ঞান দিয়ে সব জিনিস আমরা বুঝতে গেছি বলেই আমাদের মুশকিল আরো বেড়েছে। মৃত্যু বুঝি, কিন্তু মৃত্যুর সার্থকতা বুঝি না। এখেনে আমাদের কোনো প্রতিকার নেই বলে প্রতিবাদ করতে লজ্জা পাই! এতকাল বুদ্ধিমান থেকে মরবার বেলায় আমাদের অজ্ঞানতা চাড়া দিয়ে ওঠে; তখন প্রলাপ বকতে আমাদের সুখ হয়: ভোগ, ভাগ্য, ভগবান! আমরা এখেনে পশুরো অধম হয়ে গেছি। বুঝতে চাই অথচ বুঝতে পারি না বলে আমাদের শোক তীব্রতর হয়ে ওঠে। সহজ নিশ্চিন্ত হতে পারি না। দু'টি দিনের জন্যে এসে এই শরীর নিয়ে এত টানা-হেঁচড়া, এত উদ্বেগ, এত গ্লানি—দন্তশূল থেকে শুরু করে মৃত্যুশেল—তবু আমাদের কবিতা লিখতে হয়, প্রেম না করলে পৃথিবী পবিত্র হয় না। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, প্রকৃতির রাজ্যে কোনো একটা শৃঙ্খলা নেই, নীতি নেই ইচ্ছে মতো অর্ডিন্যান্স জারি করেই তার রাজত্ব চলেছে! যৌবন কখন আসবে প্রকৃতি তার একটা সময় নির্ধারিত করে দিয়েছে, মৃত্যুর বেলায় তার এই অব্যবস্থা কেন? বিয়ে করে যৌবন প্রমাণিত করবার আগে আমরা কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারের দায়িত্ব ও কলুষ থেকে আত্মরক্ষা করে আনন্দ পাই; তেমনি এমন যদি একটা তারিখ থাকতো যার আগে প্রকৃতি মৃত্যুবাণ হানবে না, তাহলে

আমরা পৃথিবীর চেহারা দু'দিনে বদলে দিতে পারতাম। তুমি হয়তো বলবে আমরা এত স্বল্পায়ু যে, আমরা চিরজীবিনী প্রকৃতির নীতির বিচার কি করে করব? প্রকৃতি কোটি কোটি বৎসর পরেও তাঁর ভুল সংশোধন করলে তাঁর আয়ুর অনুপাতে সেটাকে অতি-বিলম্বিত বলে নিন্দিত করতে পারবো না। আমরা আমাদের মূর্খতার নানারকম হেতুবাদ বার করে ফেলেছি। নইলে টিকতাম কি করে?

আমি গল্প-লিখিয়ে হিসেবে একজন কাঁচা আর্টিস্ট বলে তোমাকে আগেই বুঝতে দিয়েছি যে পুষি-দির ছেলেটি নেই; কিন্তু অত সহজে তোমাকে বুঝতে দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। তুমি অনেক মৃত্যু দেখেছ—তোমার দু'টি বোন একসঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে মারা গেছল—মৃত্যুর খবরে তুমি হয়তো আর চঞ্চল হও না, ওটা তোমার কাছে হয়তো বাজার-দরের মতোই একটা বাজে খবর। কিন্তু এমন প্রত্যক্ষ ও পরিষ্কার করে কোনো মৃত্যু আমি দেখিনি, অনুভবও করিনি। আমার জীবনে একমাত্র মার মৃত্যুর বেদনা আছে; তবে মা যখন মারা যান আমি তখন ময়মনসিংহে বিদ্যাময়ী বোর্ডিং-এ ঘুমুচ্ছি। সে-দিনের কান্নায় আমার তীব্রতা ছিলো, কিন্তু মনে হয় প্রাণ ছিলো না। শিশুর মৃত্যুর চেয়ে করুণ কিছু কল্পনা করা যায় বলে ভাবা আমার দুঃসাধ্য।

ঘড়ি থাকলে দেখতে পেতাম স্নান করে খেয়ে নিতে পুষি-দির দু'মিনিটো লাগে নি। এই সামান্য সময়টুকু দূরে রয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই যমের পেয়াদাগুলো ভিড় করে এসেছে—মাকে দেখেই বোধ হয় সসম্ভ্রমে এবার সরে দাঁড়াবে পুষি-দির কোলে ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে দু'হাতে তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেললাম। নগেনবাবু ও তাঁর ভাই ইতিমধ্যে আহার সেরে যথাক্রমে ডাক্তার ও শ্মশানবন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

বালতি তিনেক জল কোন রকমে মাথায় ঢেলে দু'টি মুখে তুলতে বউটির সঙ্গে এক থালায় বসে পড়লাম। সেই অত্যল্প কালের মধ্যে ভাব হয়ে গেল এবং বি. এ. পাশ করে এসেও ওর বরের বিষয় প্রশ্নাদি করছি দেখে বউটির খুশির আর শেষ রইলো না। বউটির নাম কালিদাসী। ভারি লাজুক, স্নিগ্ধ মেয়েটি। বর ছাড়া আর কোনো কথোপকথনের বিষয় নেই বলে কাজে-কাজেই সেখানেই আমার রসনাকে রসিয়ে নিতে হলো! বর্ণনাটা রূঢ় হলো ক্ষমা করো।

কালিদাসীর বরের নাম খগেন্দ্রনাথ। দেখ, নাম সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটা নতুন নিয়ম করা উচিত। শৈশবাবস্থায় আমাদের মূক অসহায় পেয়ে বাপ-মা যথেচ্ছাচারে আমাদের ওপর নামের এই জুলুম চালাবেন এটা অসহ্য। এবং সেই নামের বোঝা চিরকাল অম্লানমুখে বহন করে আমাদের পিতৃভক্তি সাব্যস্ত করতে

হবে। নামের মধ্যে মনস্তত্ত্ব আছে বলে ফ্রয়েড কিছু লিখেছেন কি না জানি না, তবে খগেনবাবু যে চাকরি-বাকরি না করে বসে বসে দাদার অন্ন ধ্বংস করছেন তার কারণ ওঁর বাপ-মা ওকে খগু বলে আদর করতেন বলে। আমরা যখন বড়ো হয়ে চিন্তা করতে শিখি তখন আমাদের উপযোগিতা পরীক্ষা করবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। গোত্র থেকে না-হয় আমাদের ত্রাণ নেই, কিন্তু জোর করে চাপানো এই নামের দাসত্ব আমাদের চিরকাল করতে হবে—এতেই আমাদের দাস-মনোভাবের প্রথম সূচনা।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও খগেনবাবুর কথাটা সেরে নি। লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেন নি, ভালো লাগতো না নাকি। ছেলেবেলা থেকে দাদার ছায়ায়ই বর্ধিত হয়েছেন। এ-পর্যন্ত এক পয়সাও রোজগার করেননি, তবুও তাঁর বিয়ে করায় যে সমাজের পক্ষ থেকে একটা আপত্তি উঠতে পারে তা শোনবার তাঁর ধৈর্য ছিলো না। নির্মলের সমাজনীতি কিন্তু উল্টো রকমের। বেকার হয়েছে বলে তার বিয়ে করার অধিকার লুপ্ত হবে এবং বেকার হয়েছে বলে তার হাত দুটো কাটা যাবে—এ দুটো নিয়মই ওর কাছে সমান বর্বর। নির্মল বলে : খাওয়া যদি তার পাপ না হয়, ঘুমোনো যদি তার পাপ না হয়, বিয়ে করাও তার পাপ হবে না। উত্তরে বলেছিলাম : এই জন্যেই পাপ হবে যে কতগুলি নির্দোষ ছেলে-পিলে মারা যাবে। এর পরে নির্মল যা বলেছিলো তা একান্ত ছেলেমানুষি। বিষয়বস্তু ছেড়ে তর্ক যদি অবশেষে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তাহলে তাকে বাচালতা ছাড়া আর কি বলবো? বাড়িতে একটা টাইপ-রাইটার আছে, খগেনবাবু রোজ খান চারেক করে আপিসে-আপিসে দরখাস্ত পাঠান, লম্বা হয়ে ঘুমোন, আর গলা ছেড়ে গান ধরেন। কালিদাসীর যে দু'টি ছেলে পেটেই মারা গেছে সে-লজ্জাটিও সে গোপন রাখতে পারলো না! মারা তারা যেতোই; নির্মল হলে বলতো : বড়ো লোকের ছেলেরা বড়ো হয়েও মারা যায়। নির্মলের সঙ্গে এই জন্যে তর্ক করে সুখ হয় না। ঢাল তরোয়াল না নিয়ে যুদ্ধে গিয়ে মুণ্ডটা দিয়ে আসাই ওর মতে প্রকাণ্ড adventure। ছেলেদের না খেতে দিয়ে না চিকিৎসা করিয়ে মরতে দেওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। নির্মলের মতে সন্তান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মরলে আপশোষ থাকতো কেন অ্যালোপ্যাথি করালাম না, অ্যালোপ্যাথিতে গেলে আপশোষ থাকতো গলিতে এত বড়ো জলজ্যান্ত একটা কবরেজ ছিল! ও সব ধোঁকা, ওর মধ্যে সত্যই নেই। না খেতে পেয়ে মরাটা নাকি আমাদের কল্পনার আতিশয্য; খেয়ে পেট ফেঁপেও ঢের লোক মরে। বিয়ে করাটা ওর মতে শুধু সংস্কার নয়—আচরণীয় ধর্ম।

এই খগেনবাবুর সঙ্গে আমার পরে আলাপ হয়েছিলো,—সে-কথা পরে বলা

যাবে! এখন পুষি-দির ঘরে ফের গিয়ে বসি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, ছেলেপিলেগুলো জেগে উঠে কেউ কান্না ও কেউ কলরব করে বাড়ি মাথায় করবার যোগাড় করছিলো; আমি যে যাইনি তা দেখে আশ্বস্ত হয়ে ওরা মুখগুলিকে এমন নম্র ও কমনীয় করে তুললো যে চুমু না খেয়ে পারলাম না। বিকেলে ওদের খাওয়া বলে কোনো হাঙ্গাম নেই, বাড়ির সামনের মাঠে ওদের ছুটোছুটি করতে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের লুকোচুরি খেলায় কতক্ষণের জন্যে আমাকে বুড়ি হতে হলো। তোমাকে এত সব কথা খুঁটিয়ে লিখছি তার কারণ আমি পুষি-দির সংসার দুই হাতে নিবিড় করে স্পর্শ করে অন্তরে একটি পরম তৃপ্তি লাভ করেছি—হোক তা মৃত্যু দিয়ে বিক্ষত, দারিদ্র্য দিয়ে মলিন।

এইটুকুন পড়ে তোমার কি মনে হচ্ছে না আমি যদি পুষি-দির অবস্থায় পড়তাম, তো কী করতাম? হয়তো এই রকম করেই মানিয়ে যেতে হতো। এ-ঘরের বাইরে আমি যখন বেরুতে পাবো তখন এই দিনের স্মৃতিটা কী কুৎসিতই যে লাগবে। তবু আজকে পুষি-দির সংকীর্ণ সংসারের সীমায় ক'টি মুহূর্ত আবদ্ধ থেকে সত্যিই কিন্তু হাঁপিয়ে উঠছি না।

হ্যাঁ, দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। ছেলেটি তখনো ধুক্‌ধুক্ করছে। রুগীর সেই বিভীষিকাময় স্তব্ধতার তুলনা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই; আসন্ন ঘটিকার উপমাটা নেহাৎই অবাস্তব হবে। তারপর এলো কালো রাত্রি। মাঝখানের অনেকটা সময় মুছে দিলাম, কেননা চিঠি তাহলে অত্যন্ত বড়ো হয়ে যাবে। ডাক্তার বলে গিয়েছেন, আজ রাত্রে টিকেও যেতে পারে। পুষি-দিকে বললাম: এবার ওকে আমার কোলে দিয়ে তুমি একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো। পুষি-দির আপত্তি আমি শুনবো কেন? ছেলের গায়ের ওপর একখানি হাত রেখে পুষি-দি আমার কোল ঘেঁষে একটু শুলো, এবং খানিক বাদেই টের পেলাম সে-হাত শিথিল হয়ে বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়েছে; বুঝলাম মৃত্যুকে পারলেও ঘুমকে ঠেকায় পুষি-দির সে-সাধ্য আর এখন নেই। নগেনবাবু বারান্দায় খানিক পাইচারি করে একটা চেয়ারেই বসে বসে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, খগেনবাবু সস্ত্রীক দ্বার রুদ্ধ করে তাঁর ঘরে যথারীতি অধিষ্ঠান করছেন। কোনোদিন গভীর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছি বলে মনে হয় না, কিন্তু মরন্ত ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে-থাকতে আমার সত্যিই ভারি ভয় করতে লাগলো। মনে হলো মৃত্যুর একটা স্পষ্ট মূর্তি আছে, আর সে-মূর্তি মমতাময়ী মা'র মূর্তি নয়। আচ্ছা, বাঙলা সাহিত্যিকেরা মৃত্যুবর্ণনা করতে এত কুণ্ঠিত কেন? সে-তেজ সে-কল্পনা তোমরা কবে লাভ করবে? তোমাদের মধ্যে নাকি একটা প্রবাদ আছে যে গল্পে নায়কের মৃত্যু হলেই সে গল্প

জোলো, ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তোমরা নেহাৎই বাঙালী, ভিক্টর হিউগো-র টুপি ধরবারো তোমাদের যোগ্যতা নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের স্বপক্ষে এমন আরেকটা যুক্তি দেন যে, আমার হাসি পায়। তাঁরা বলেন : সংসারে মৃত্যু তো আছেই, সাহিত্যে তাকে খুঁচিয়ে লাভ কী ? সুখের ছবি এঁকে জীবনটাকে একটু রঙিন করে নেওয়া যাক। এর জবাবে যদি বলি : পৃথিবীতে ঢের লোকই তো বেশ স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে, তাদের নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করলেই বা কোন মোক্ষলাভ ঘটবে, তাহলে আমার এ-যুক্তিটা একই জাতের হবে নিশ্চয়। যা ঘটেছে তা বলতে আমরা সর্বদা লুকিয়ে বেড়াই কেন ? ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে কেন আমাদের এত ভয় ? আজ নগেনবাবু যদি মরতেন, তবে পুষি-দির সংসারে এই মৃত্যুটা কি একটা মহাকাব্যের কথাবস্তু হতে পারতো না ? তোমাদের হাতে এমন বিষয়বস্তু পড়লে তোমরা নিশ্চয়ই আগ্রহ দেখাতে না। একটা প্রেমের প্লট পেলেই তোমাদের কলমে সুড়সুড়ি ধরে।

খোকাকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হলো—এ আমারই ছেলে, আমারই জঠরে ওর জন্ম, আজ আমিই ওকে হারাতে বসেছি। ভাবতেই শরীরের সবগুলি শিরা-উপশিরা টনটন করে উঠলো। না না না—প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর কি—আমি সন্তান চাইনে, অকারণ মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমি এই দম্ভ প্রচার করতে চাই। যৌবনোচ্ছ্বাস হতেই মেয়েরা শুনেছি নাকি মাতৃত্বের অভিলাষিণী হয়ে ওঠে—ওটা যদি সত্যি হয়, তবে ওটাকে যৌবনাবস্থার অন্যান্য কু-অভ্যাসের মতই শাসন ও চিকিৎসা করা উচিত। তুমি মনে করো না (করছ না অবশ্যি) যে, আমি আমার মতগুলিকে অন্যের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাই, আমি তত বড়ো অন্ধ অত্যাচারী নই। হ্যাঁ, আমি নিজের কথাই বলছি, নিজের কথা বলতেই আমি ভালোবাসি। যে-দুঃখ নিজে পাবো সেই দুঃখে ভাগ বসাবার জন্যে আরো কতগুলি অনাথ ও আতুর শিশুদের আমন্ত্রণ করব আমি ততটা বদান্য নই। ধরো আজ যদি আমি একটি গরিব কেরানিকে বিয়ে করি (মোটে ষাট টাকা মাইনে) ও সন্তানধারণ করবার তাগিদে আমার যদি ইস্কুলের চাকরি না থাকে, তবে সেই সন্তান কি আমার পক্ষে পাপ—হ্যাঁ, পাপ হবে না ? আমি উত্তর দিচ্ছি : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাপ হবে ; কেননা ষাট টাকায় আমার সন্তানের উপযুক্ত ভরণপোষণ হবে না। অতএব সে-ক্ষেত্রে আগন্তুক সন্তানকে প্রতারিত করাই হবে সমীচীন। বিয়েই বা কেন করতে যাওয়া ? সন্তানকে বৈধ করবার জন্যেই তো বিয়ে। সংসারকে সংকীর্ণ করে দেবার জন্যে যেখানে সন্তানের অনধিকার প্রবেশের সুবিধে নেই, সেখানে আর বাধা কিসের ? আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হলে বরং সে-বিষয়ে ভাবা

যেতে পারে। সন্তানকে ভরণ-পোষণ করবার সঙ্গতি নেই বলে গরিব কেরানিটির সঙ্গে বিয়ের আগে প্রেম করা যাবে না এটা একটা বর্বর প্রথা। বড্ডো বাজে বকছি, না ?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খোকা যাই-যাই করে উঠেছে। এবারে যাবে। ঘরে যে-লণ্ঠনটি জ্বলছে সেটা নিতান্তই অক্ষম মনে হলো। ঐ টুকুন আলোতে মৃত্যুকে নির্ণয় করা যাবে না। ডাকলাম : পুষি-দি ! কে তার উত্তর দেবে ? পুষি-দি ঘুমে গা ঢেলে দিয়েছে। আবার ডাকলাম, হাত ধরে নেড়ে দিলাম, চিৎকার করে উঠলাম— পুষি-দি আরেকটু ভালো হয়ে পা মেলে শুলো। এত দিন-রাত প্রতীক্ষা করে ও এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবে না ? এবার এমন চেঁচিয়ে উঠলাম যে বিধাতারো কানে তালা লাগলো হয়তো। (তুমি তখন কী করছিলে ?) নগেনবাবু লাফ দিয়ে উঠলেন। বললাম : খোকা কেমন করছে, বোধ হয় নেই। দীনতা ও সাংসারিক ত্রুটি ঢাকবার জন্যে যে-নগেনবাবু নিজের ছেলের আসন্ন মৃত্যুর খবর দিতে আমার কাছে প্রথম সংকোচ দেখিয়েছিলেন, তিনি এখন সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করে এমন একটি আর্তনাদ করে উঠলেন যে পুষি-দির কথা ছেড়ে দাও, মনে হলো মরা খোকাও বোধ হয় নড়ে উঠেছে। পুষি-দি এবার জাগলো।

আমি এখেনেই থামি, কি বল ? আর বেশি লিখবো না, পরের ব্যাপারটা তোমাকে ভেবে নিতে দিলাম। সবিস্তারে বলে তোমার কল্পনাকে খণ্ডিত করতে চাইনে। পারো যদি, তোমার ভবিষ্যৎ কোনো উপন্যাসে একটা শিশু-মৃত্যুর হুবহু বর্ণনা দিয়ো। আমি লিখে ফেললে তুমি **plagiarise** করতে পারো।

সে-ঘরে তিষ্ঠোয় কার সাধ্য ? বাইরে বেরিয়ে এলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবো সে-কথাও ভুলে যেতে হলো। এখন ধীরে-ধীরে বেশ লিখতে পারছি বটে, কিন্তু তখন নিজের নিশ্বাসপতন সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলাম ; সত্যি। আয়ুর ভিখারি এই শিশুটির মৃত্যুতে কার উপকার হলো জানি না, আমি কিন্তু একটা পরম শিক্ষা পেয়ে গেলাম, বন্ধু। আমাদের আয়ু এত স্বল্প বলেই জীবনকে আমরা এমন ভীরুর মতো আঁকড়ে ধরতে চাই। ভীরু বলেই আমাদের ভালোবাসায় মাধুর্য আছে। (এই কথাটা একান্তরূপে নীরস ও বিস্বাদ হলেও আমার বারে বারে আওড়াতে ভালো লাগে) 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—কবিতা লেখবার কোনো বয়সেই আমি এই ভীষণ লাইনটা লিখতাম না। না মরলে এ জীবন আমাদের কাছে একটা মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে থাকতো। তখন শোপেনহাওয়ারের মতো আমরা আত্মহত্যার গুণকীর্তন করতাম। হারাবো বলেই ভালোবাসায় বল

পাই, তেমনি মরব বলেই জীবনের শত কৃত্রিমতার মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার জন্যে আমরা মত্ত হয়ে উঠি। ক্রিকেট খেলোয়াড় এক সময়ে আউট হবে বলেই সে-খেলায় সে রস পায়; একেবারেই আউট হবার কথা যদি তার না থাকতো তবে সে ব্যাট দিয়ে স্ট্যাম্পগুলোকে চুরমার করে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতো নিশ্চয়ই।

আমি কাল এলাহাবাদ যাচ্ছি। তুমি এসো। শরীর বেশ ভালো আছে। ইতি।

পুনশ্চ: খগেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথাটা বলা হলো না—কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি না এ আমার একটা দুর্বলতা। ওটা শোনবার জন্যে তুমি কৌতূহলী না হলেই ভালো করবে।

এলাহাবাদে নির্মলকে টেলি করা হয়েছিলো, তবু স্টেশনে তাকে না থাকতে দেখে অশ্রুর দস্তুরমতো রাগ হলো। ভাবলো, দূর ছাই, একটা হোটেলে গিয়ে ওঠা যাক—পেছনে গাইডরা কার্ড নিয়ে ফিরি করতে শুরু করেছে। একটা হোটেল নিয়ে দরাদরি করছে এমন সময় একটি প্রিয়দর্শন ছেলে কাছে এসে স্মিতমুখে শুধালো: আপনিই শ্রীমতী অশ্রু দেবী?

ছেলেটির বয়স অশ্রুর চেয়ে ছোট, এবং অধিক মাত্রায় শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করবার তাগিদে সে শ্রীমতীটিও উহ্য রাখলো না। অশ্রু হেসে বললে—হ্যাঁ, আর তুমি?

—আমি নির্মল গুপ্তের ভাই, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ঠাকুরপো। আসুন আমার সঙ্গে, গাড়ি তৈরি আছে। এই বলে বিমল (ছেলেটির নাম;—ভাই-দের নাম মিলিয়ে রাখার প্রথাটা এতদিনে উঠে যাওয়া উচিত) হোটেলের গাইডটাকে এক কড়া ধমক দিয়ে অশ্রুকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে এলো।

গাড়িতে উঠেই অশ্রু বললে—তোমার দাদা এখানে আছেন?

বিমল ড্রাইভারের পাশে বসে ছিলো; ঘাড় ফিরিয়ে বললে—না।

—কোথায় গেছেন?

—এলাহাবাদটা তাঁকে স্যুট করছে না। ছুটি নিয়ে বেরিয়েছেন। কোথায় গেছেন ঠিক বলতে পারি না। বৌদিও জানেন বলে মনে হচ্ছে না। স্বল্প একটু হেসে বিমল ফের বললে—এখানে কদিন আছেন তো?

অশ্রু বিমনা হয়ে পড়েছিলো। বললে—কেন বল দেখি?

বিমল একটু লজ্জিত হয়ে বললে—এমনি। অবশ্যি এখানে থাকবার বিশেষ

কোনো আকর্ষণ নেই। খসরুবাগ বা ভরদ্বাজ আশ্রম দেখার চেয়ে দুটো পাছ দেখায় বিস্ময় বেশি। তবে—

অশ্রু। থামলে কেন?

বিমল। তবে যমুনার ওপর নৌকা নিয়ে বেড়ানোর মতো সুখ স্বর্গে গিয়েও কল্পনা করতে পারবো না। অবিশ্যি একা-একা নয়।

কথা শুনে অশ্রু বিমলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হলো। বিমলের বয়েস বড় জোর সতেরো হবে, মুখে টাটকা ফুলের একটা সজীবতা আছে, ঠোঁটের ওপর থেকে চিবুক পর্যন্ত ভারি সুন্দর, একটি তিল থেকে আরো খুলেছে। মুখ নাকি মনের মুকুর—অশ্রু বিমলের মুখে তার মনের লেখা যেন এক নিমিষে পড়ে নিলে। বললে—বেশ, আমাকে বেড়িয়ে এনো একদিন।

বিমল নেহাৎ ছেলেমানুষ, আনন্দের আতিশয্যে গাড়ির মধ্যেই লাফিয়ে উঠলো। বললো—সে অত্যন্ত চমৎকার হবে। পরশু কলকাতা থেকে বীণারাও এসেছে; আপনি যদি যান তবে বীণাকেও নেওয়া যাবে, নিশ্চয়ই। আজই চলুন, কেমন? প্রয়াগ পর্যন্ত গিয়ে আমাদের দরকার নেই, আমরা তো জল ছুঁয়ে তরে যেতে চাই না, কি বলুন? আমরা এখনো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মাংস খাই। আমি লক্ষ্য করেছি অশ্রুদি, যে, ক'দিন থেকে আজকাল চাঁদ উঠছে। এমন একটা gala night আজ কাটবে যে—

অশ্রু কথাটাকে একটু বাঁকা করে বললে—কে এই বীণা?

এবারে বিমল আর ঘাড় ফেরালো না। যেন কলেজের বিষয় গল্প করছে (বিমল ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে) এমনি শুকনো গলায় সে এইটুকুন মাত্র বললে—ও আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবুর ভাইঝি, ছুটিতে এসেছে এখানে।

আর কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মোটরটা বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়ালো। অশ্রু গাড়ি থেকে নেমেই সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। পর্দা সরিয়ে বিমল ততক্ষণে সোফার-এর সাহায্যে মোট-ঘাটগুলি নামাচ্ছে।

পর্দা সরাতেই দেখা গেল—ইন্দিরা। এই ইন্দিরা? অশ্রু ঠোঁট দুটো ইঞ্চি দেড়েক ফাঁক করে রইলো! ইন্দিরা, না নির্মলের ধর্মপত্নী!

এইখেনে আবার ছবি আঁকা দরকার। এইবারে গগন ঠাকুরের ডাক পড়বে—কেননা নির্মলের ধর্মপত্নী অন্তঃসত্ত্বা। একটা ব্যঙ্গচিত্র না হলে আর মানাবে না। হ্যাঁ, ব্যঙ্গচিত্রই। প্রতিটি রেখায় শ্লেষ, প্রতিটি টানে কৌতুক। যে-দেহ ছিলো ভাণ্ড, এখন তা হয়েছে ভাঁড়,—অমৃতলতা হয়েছে বৃক্ষকাণ্ড। ইন্দিরার এই শারীরিক ও মানসিক অধঃপতনের জন্যে অশ্রু তৈরি ছিলো না। ইন্দিরা যে এত শিগ্‌গিরই বাজে

হয়ে যাবে তা জানলে ও যমুনার সবগুলো নৌকোকে ডুবতে অভিশাপ দিয়ে ফের চুপি-চুপি আরেকটা মেয়ে-ইস্কুলে গিয়ে টিচারি নিতো। এ-দাসত্বের ছবি দেখে ওর মন হাঁপিয়ে উঠছে,—মেয়েদের এই বন্দীদশা ঘোচাবার জন্য কবে আবার নতুন করে এলিজাবেথ ফ্রাই-র আবির্ভাব হবে ?

ইন্দিরা এগিয়ে এসে অশ্রুর একখানি হাত ধরে কাছে টেনে আনলো। অতি কাতর স্বরে বললে—ভারি কুৎসিত হয়ে গেছি।

ইন্দিরার ডায়রি থেকে :

ইন্দিরা ডায়রিতে তারিখ দেয় না, সামান্য দুয়েকটি বানান ভুল করে। খুব সরু নিব-এ বেশ ধরে ধরে লেখে ; মনে হয় যা লিখেছে তার চেয়ে চিন্তা করেছে বেশি। কেননা ভাষায় ওর না আছে বেগ, না বা ফেনা। হাতের লেখাটি সরু বলে মনে হয় ওর মনটি কোমল ও করুণ। চিন্তা ও করতে পারে বটে, কিন্তু তার ফলে ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারেনি। মানে, ব্যক্তিত্বের অর্থ ওর কাছে আত্ম-প্রকাশ নয়। চিন্তায় ওর স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশে আছে কুণ্ঠা ; আলস্য বললে আরো ঠিক হবে।

অঙ্কপাত করে ও ওর নিজের মনের ইতিহাস নিয়েছে এই ডায়রিতে ; চুপ করে বসে বসে ভাবলে চিন্তা হতো অসংলগ্ন,বিষয় হতো অবান্তর – মনের চেহারার রেখাটিও চোখে পড়তো না। নিভৃত মুহূর্তে ও ওর গৃহকোণটিতে বসে মনের সঙ্গে মুখচন্দ্রিকা করেছে, সে-স্বপ্নকে ভাষায় মূর্তি না দিয়ে ওর স্বস্তি ছিলো না। এমনি করে কত সময় যে অপব্যয় করেছে তার হিসেব নেই—দুটো উল বুনলে তার চেয়ে বেশি কাজ দিতো—অন্তত এই ছিলো ওর বাড়ির লোকের মত। রূপকথায় সোনার কাঠির কথা শুনেছিলো – সে বোধ হয় মানুষের হাতের কলম—যে-কলম মনের মৌনভঙ্গ করে। ডায়রি লেখাটা ইন্দিরার কাছে ন্যাকামি মনে হতো না (যদিও আসলে ওটা ন্যাকামি) —মনে হতো অন্তর্যামীর সঙ্গে একটি গোপন সাক্ষাৎকার ; তার মধ্যে মুক্তির স্বাদ আছে। মুহূর্তটি ছোট, কিন্তু মুক্তি আকাশ-বিস্তীর্ণ।

ডায়রিতে কেন তারিখ দেয় না, জিগ্‌গেস করলে ইন্দিরা হয়তো বলতো : আমি তো জীবনের ঘটনাগুলি কুড়িয়ে-কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখছি না যে তার পারম্পর্য না রাখলে ইতিহাস তার বন্ধনী হারাবে, আমি লিখছি আমার আত্মার রূপকথা ; ছাপালে তা জনসাধারণের উপকারে আসবে না। কেননা এ আমার একান্ত

নিজের, যেমন আমার চুল বাঁধবার রীতিটা অন্যের অনমুকরণীয়। ডায়রি লেখাটা আমার মনের একটা বিশেষ ও পৃথক প্রতিষ্ঠা ; ওটা একটা সাবেক ও মামুলি ইয়ার-বুক নয়।

ইন্দিরার কথা এ-পর্যন্ত অনুধাবন করে আমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি প্রশ্ন করে : তা তো বুঝলাম ; কিন্তু এত সব চোখা-চোখা মত পোষণ করেও তুমি তা পালন করতে পারলে না, এর কারণ কি ? এর উত্তরে ইন্দিরা কী বলবে আমরা আন্দাজ করতে পারছি না ; তবে সায়ন্তন দিগন্তরেখার মতো ওর চোখ নিশ্চয়ই বাষ্পাকুল হয়ে উঠবে, এবং আমরা তাকে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করতে পারবো। শুধু ক্ষমা করতে পারবো না, ইন্দিরা আমাদের মনে একটু দোলা দেবে। কখনো-কখনো মনে হবে ভীরু হয়ে ইন্দিরা ভালোই করেছে, কেননা মনের গলি-ঘুঁজিতে বেড়োবার যার ছাড়পত্র আছে সে শুধু বিবেক, পাড়ার পাঁচ জন নয়। বাইরে সে-মন উদ্ঘাটিত হলেই পাড়ার পাঁচজনের পাচন-বড়ি-প্রয়োগের প্রয়োজন হতো। এই প্রকাশকুণ্ঠতাটিই ইন্দিরার গুণ হয়েও বড়ো দোষ। অন্তত অশ্রু তাই ভাবলে। ওর মতে ওজস্বিনী ভাষার চেয়ে একটা উলঙ্গ ভাব অনেক শক্তিশালী। পালিত হওয়ার চেয়ে প্রচারিত হওয়াতেই তার সার্থকতা।

মোটামুটি ইন্দিরার ডায়রির সমালোচনা এইটুকু। বানান ভুল নিয়ে ঠাট্টা করা আর ওর মুখরুচির প্রশংসা করা সমান নিরর্থক। আমরা কটু কথা বলতে পারি না এমন নয়, তবে সমালোচনাকে নৈর্ব্যক্তিক করার পক্ষপাতী আমরা নই— অন্তত ইন্দিরার সম্বন্ধে। কেন না—সে-কথা পরেই হবে'খন।

মা বকেন গৃহকর্মে আমার মন নেই ; মাসিকসওদার হিসেব রাখতে গিয়ে সামান্য যোগ করতে ভুল করেছি— আমার উপায় কী হবে ? কলেজে মেয়েরা রাজনীতি করছে, তাদের কোলাহলে গলা সেধে মেলাতে পারি না ; সবাই বলে : ভুয়ো ! কিছু হবে না আমাকে দিয়ে। বাবা একটা খুব ভালো বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজে এনেছেন, কিন্তু আমি এমন বেরসিক মেয়ে, সে খবরটা পেয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের মুখও দেখলুম না একটিবার। সত্যিই, আমি এত নিস্পৃহ কেন হলুম ? জীবনে এমন কোনো ঘা খাইনি যে জীবনকে ঘানি বলে সস্তা দুঃখবাদ করব। মোটমাট, কেন জানি না ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। কারণটা খুঁজতে হবে।

মনকে স্পষ্ট জিগ্‌গেস করলুম : কী চাই ? মন অনবরত চোখ ঠারে, জবাব দেয় না। কিন্তু জবাব আমার পেতেই হবে। আমার বয়সী মেয়েরা চায় কী ? প্রেমিক

স্বামী, সুশৃঙ্খল সংসার, নীরোগ সন্তান ? আমার মনে হয় বিস্বাদ, অ-শ্লীল [টীকা : শব্দটা প্রচলিতার্থে নয়] ; আহত কেঁচোর মতো শরীরটা সংকুচিত হয়ে আসে। কর্ম চাই ? কী কাজ করবো ? মেয়েদের অবরোধমুক্ত, দৃপ্ত, স্বাতন্ত্র্যশালিনী করবার জন্যে মশাল হাতে নিয়ে সমুদ্রাম্বরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবো ? না ভাই, পারবো না ! যে পারো সৌন্দর্যের চিত্রদীপ জ্বালিয়ো, আমি প্রশংসা করবো। জীবনে আদর্শপূজা করতে আমার ভয় করে, যজ্ঞ পণ্ড হবে বলে নয়, সমিধ-ই আমি সংগ্রহ করতে পারবো না ; ক্লান্ত হয়ে পড়বো। প্রেম চাই ? পাওয়া যাবে না এমন প্রেম ? কী হবে তা দিয়ে ? মিছিমিছি তবে স্নায়ুগুলোকে খাটিয়ে ক্লিষ্ট করে লাভ কী ? বেশ পাওয়া যাবে এমন প্রেম ! তবে প্রেম আর রইলো কোথায় ?

যা আমার কাছে আছে তাই নিয়ে আমি বেশ আছি। [টীকা : কয়েক লাইন আগেই লেখা হয়েছে : 'ভালো লাগে না।' এই থেকে আমরা ইন্দিরার অস্থির-চিত্ততা অনুমান করতে পারি। ওর যে ভালো লাগে না সেই হয়তো ওর বেশ থাকা।] কী আমার আছে জিগ্‌গেস করবে ? গভীর করে উত্তর দেব : আমার কর্মহীন নীরব নিঃসঙ্গতা ! সেই আমার জীবনের উদার শান্তি ! আমি পৃথিবীর কোনো কাজে আসবো না, সামান্য একটা ওয়াড় সেলাই করলুম না কোনো-দিন -- এই প্রশংসাপত্র দিয়ে বিধাতা কেন আমাকে এত অপ্রাকৃতিক করলেন আমার এ-প্রশ্নেরো কোনো জবাবদিহি নেই। সুপ্রচুর অবকাশ পেয়েছি--চৈত্রমধ্যাহ্নের আকাশের মতো অবারিত। কিন্তু সুখ এই যে, হাতে কোনো কাজ নেই। বাবার গরম জামা-কাপড়গুলো রৌদ্রে দেবার কথা ছিলো, প্রতিনিধিরূপে কালিন্দীকে প্রেরণ করলুম। [টীকা : ছন্দ দেখে অনুমান হচ্ছে কালিন্দী ইন্দিরার ছোট বোন।] কালিন্দী বেশ বাধ্য মেয়ে, কোমরে আঁচলটাকে রাশীকৃত করে ঘর-দোর নিয়ে ঘেমে উঠেছে ; আটপৌরে ডুবে শাড়িটিতে ওকে কী যে মানিয়েছে বললে ওর আত্মতৃপ্তির আর সীমা থাকছে না। কালিন্দী আমার নয়নরঞ্জিকা ! [টীকা : কালিন্দী সম্বন্ধে ওর বাগবাহুল্যের অর্থ এই যে, ও ছিলো বলেই ইন্দিরা বেঁচে গেছে, নইলে এই নীরব নিঃসঙ্গতা ওকে আর ভোগ করতে হতো না। আপিসের জামা-কাপড় রৌদ্রে না দিয়ে রাখলে ওর মা যে ওকে আদর করে পিঠে খেতে দিতেন অতো বড়ো দুরাশা না করাই ভালো।]

আমি এই কর্মহীন নীরব নিঃসঙ্গতার উপাসিকা -- এই আমার গৌরব। সংসারের সেবায় আমার স্থান নেই, পরোপকার আমার ব্রত নয় -- এই আমার অসাধারণত্ব। গাল দিতে চাও দিয়ো, কিন্তু যদি বলি এই নিঃসঙ্গতাটিই আমার আধ্যাত্মিকতা, বলবে : তোমার মুখে কথাটা মানায় না, ইন্দিরা ! না মানাক, ক্ষতি নেই, কিন্তু এই

নিঃসঙ্গতা নিয়ে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী ঘিরে আমি মনে মনে যে একটি নীড় নির্মাণ করেছি তার কথা বলেও তোমাদের লাভ নেই। [টীকা : কেননা সে-নীড়ে আর কারু নিমন্ত্রণ হবে না।] প্রকৃতির সঙ্গে এমন একটা হৃদয়যোগকে তোমরা নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করবে, বলবে : অলস বিলাসিতা মাত্র। আমি তা গ্রাহ্য করি না। সূর্যোদয়ের আগে চোখ চেয়ে যে-জগৎকে আমি আবিষ্কার করে মুগ্ধ হই, ঘুমেও সেই জগতের বহুবর্ণতা আমার হৃদয়ে লেগে থাকে। যাই তোমরা বলো, আমার চিত্তের আরতি এই প্রকৃতিকে নিয়ে। আমার অনুভূতি অত্যন্ত গভীর বলেই আমি কবি হতে পারলুম না।

আমি যে কত সুন্দর তা তোমরা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। কালিদাসের কাব্যে ত্রিদশবধূর রূপবর্ণনায় যারা মুগ্ধ হয়েছে তাদের আমি প্রথমেই বাতিল করে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে তরলিকা সুরশৈবালিনীর লাবণ্য—এ কথা কে না জানে? সে-বিশেষণটাকে আমি গ্রাহ্যই করিনে! কবিরা আমার সঙ্গে অরণ্যচন্দ্রিকার তুলনা দেবেন—ভঙ্গুর উপমা। জানো, আমি এই বিশ্বপ্রকৃতি ; মানবীর মূর্তিতে বিধাতার অন্তরছায়া! পায়ের নিচে মাটি আমার কঠিন, বায়ু ঘন, নিঃশ্বাসগ্রহণ একটা কঠোর শাস্তি মাত্র। শারীর বিজ্ঞানের অধীন আছি বলে আমার কখনো-কখনো নিজের ওপর অবজ্ঞা আসে, আমাকে মৃত্যুর অনুযাত্রিণী হতে হবে ভেবে আমার হাসি পায়, সৌরজগতে আবার একদিন পথ হারিয়ে ফেলব বলে একটা আনন্দময় আতঙ্ক উপভোগ করি। সে কবে? [টীকা : উল্লিখিত কথাগুলি থেকে ইন্দিরার চরিত্রের আরেকটু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, ইন্দিরা নিজের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজ্ঞান, বলা যেতে পারে স্বার্থপর।]

কর্মবাহুল্যে মানুষ কত কুশ্রী হয়ে পড়েছে,—পৃথিবী-ব্যাপী এবার ধর্মঘট হোক। আজ সমস্ত বিকেল ধরে কী সুকোমল ধারাঙ্কুর ঝরছে। খোলা বারান্দায় বসে চুল-গুলো ছড়িয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা গান গাইলুম ; আকাশ কান পেতে শুনলো, মুগ্ধ হয়ে গেলো। গানটি যেন আমাকে অমর্তলোকের পারে নিয়ে এসেছে। এই জন্যেই তো রবীন্দ্রনাথকে আমি কবিশ্রেষ্ঠ বলে সম্বর্ধিত করি। [টীকা : সাহিত্যকে সুমধুর করতে হলে জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে আনতে হবে—এই কৌশল রবীন্দ্রনাথের জানা আছে বলেই তিনি শিল্পীশ্রেষ্ঠ। ইন্দিরা রুশ সাহিত্য পড়েছে বলে মনে হয় না, তাহলে গোগল-এর হতাশা বা ডস্টয়ভস্কির অবিশ্বাসকে ক্ষমা করতে পারতো না।]

প্রেমের চেয়ে যে-আর্ট বড়ো আমি সেই আর্টের উপাসিকা। বাহ্যিক প্রকাশ থেকে নিষ্কর্ষিত করে আর্টের যে একটি অবাস্তব রূপ আছে আমি তাকে কায়মনে

তাকে ভালোবেসেছি। বাহ্যাড়ম্বরের আতিশয্যে মানুষ এই সহজ আনন্দবোধটি হারিয়ে ফেলেছে – তোমাদের চিত্তদারিদ্র্য আর সওয়া যায় না। আমি এই বিরল, দুর্লভ গুণটির অনুশীলন করব। সকলের মতো সীমা-লাঞ্ছিত সংসারের পঙ্কিল আবর্তে তার সমাধি দেব না! এই আমার জীবনের সংজ্ঞা ও সার্থকতা।

আমি বাজে, বিলাসী, ভাবুক। [টীকা : কথাগুলি সমার্থসূচক।] আমাকে করুণা করবে, তোমাদের অসীম দয়া—কিন্তু আমার এই ভাববিদ্যুৎ দিয়ে সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত করে রাখবো, কেউ না কেউ প্রভাবিত হবেই। তোমরা বলশালী হও, আমি হব সুন্দর। [টীকা : ইন্দিরার মতটা আধুনিক নয় মনে হচ্ছে। বলের মধ্যে যে-সৌন্দর্য আছে সেটা প্রখর ও বর্বর ; ওর মতে শিল্প-সৌন্দর্য হচ্ছে দুর্বল, নিরীহ, ভঙ্গপ্রবণ—এবং সেইটেই হচ্ছে জীবনের রূপময়তা।]

কালিন্দীর পেটের মধ্যে ফোড়া হয়েছে,—দাঁতের ত্রুটির জন্যে। সাহেব ডাক্তার এসেছিলো, বললে, অজ্ঞান করে কেটে ফেলতে হবে। বাবা দারুণ ভড়কে গেছেন ; সহজে সারানো যায় কি না, সেই ভেবে হোমিয়োপ্যাথির শরণাপন্ন হয়েছেন—কালিন্দীর যন্ত্রণার দিনগুলি বেড়ে গেছে।

মাঝরাতে ঘুম ছেড়ে ধড়ফড় করে জেগে উঠলুম – পাশের ঘরে কালিন্দী চিৎকার করছে। ভয়ে বেদনায় শরীর কেঁপে উঠতে লাগলো। মনে হলো মিথ্যা এই প্রকৃতির শুভময় সৌন্দর্যপ্রেরণা—এর অন্তরের কুশ্রীতা আমি ধরে ফেলেছি। প্রলয়পয়োধির তরঙ্গ-আঘাতে যে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, ফুলের পাপড়িতে শিশির-পড়ার শব্দ শুনে সে আর মুগ্ধ হয় না! মৃত্যুকে তবু ক্ষমা করা যায়, কেননা সেটা একটা পরমরমণীয় মোহময় বিস্মৃতি মাত্র – ভারি রোমান্টিক,—কিন্তু এই খণ্ডিত লাঞ্ছিত বিপর্যস্ত জীবনের মতো জঘন্যতা আর কোথায় আছে? এই সৃষ্টিটা বিধাতার বীভৎস রসের পরাকাষ্ঠা। [টীকা : ইন্দিরাকে অনুধাবন করা কঠিন মনে হচ্ছে, ওর ভাবের সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে কি?]

কিন্তু এই জীবনে মর্ত্যাতীত সৌন্দর্যের সাধনা করবো সমস্ত অন্তর দিয়ে এই উপলব্ধিটি আমি লাভ করেছিলুম ; কালিন্দীর চিৎকারে আমার সে-ধ্যান ভেঙে যেতে বসেছে। ভাবলুম এই স্থূল ইন্দ্রিয়সর্বস্ব দেহটাই হচ্ছে সৌন্দর্য-সাধনার বাধা, —আমি যদি সহসা একদিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হই, অথচ আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা না হয়! যদি একটা অনিবার্য দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ, আকার-ভ্রষ্টা হয়ে পড়ি! এই মাংসল মৃন্ময় শরীর নিয়ে আমরা কি করে সুন্দর হবার স্বপ্ন দেখতে পারি! এমন একটা গ্লানি নিরন্তর আমাদের সইতে হচ্ছে বলে আমার লজ্জার আর সীমা থাকে না।

শারীরিক প্রক্রিয়াগুলো কী নিদারুণ রূপে স্থূল, এর সামান্য ব্যতিক্রমের শাস্তি জঘন্য-রূপে সুপ্রত্যক্ষ। [টীকা : সন্তানধারণযোগ্যা রমণী না হয়ে এই অনুভূতি নিয়ে একটা দীর্ঘায়ু ফুল হলেই বোধ হয় ইন্দিরাকে মানাতো ভালো। তবু দেহ সম্বন্ধে ওর এই লোকাতীত ধারণাটা আধুনিক কালে শুধু যে অপক্ব তাই নয়, দস্তুরমতো অভব্য। কেননা এই দেহগঠন যদি উপযুক্ত সাধনার বলে ভাস্কর্যের সীমায় উপনীত হয়, তবে তার চেয়ে অধিকতর সৌন্দর্য কল্পনা করা দুরূহ, এমন কি দেহের এই বৈধ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোও অভিজাত। স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য সমপদবাচ্য ; রোগ যেমন আছে তেমন তার চিকিৎসাও আছে। ইন্দিরা এ-যুগে পেছিয়ে পড়েছে ; ওকে সক্রেটিসের ভগ্নীরূপে পেলে আমরা খুশি হতাম।]

কালিন্দীর শিয়রে বসে ওর কপালে হাত রাখলুম। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে [টীকা : ইন্দিরা দেখছি রিয়ালিস্টিক হবার চেষ্টা করছে।] বললে : দিদি, আর পারি না। পরে একটা বেদনাহীন মুহূর্তে ফের বললে : বিজ্ঞান এখনো যথেষ্ট উন্নত হয়নি। আমরা আরো দু'শতাব্দী পরে এসে কেন জন্মালুম না? দু'শতাব্দী পরে ক্রমবিবর্তনে এই পৃথিবী আরো সহজ হয়ে উঠবে, না? তোমার কী মনে হয়? [টীকা : এ ধরনের কথা শুনে আমরা স্বচ্ছন্দে আন্দাজ করতে পারছি কালিন্দী সাবালিকা হয়ে উঠেছে আইনের অর্থে তো বটেই, বুদ্ধির অর্থে। অর্থাৎ, মনে হচ্ছে, সে হার্বার্ট স্পেনসার পড়েছে, যদিও স্পেনসারের মত উলটো—ক্রম-বিবর্তনের ফল যে নিছক জটিলতা এ-ই তিনি বিশ্বাস করেন।] হঠাৎ ব্যথার আরেকটা চাড় উঠলো, কালিন্দীর মুখ নীল বিবর্ণ, হাত-পা শিথিল হিম হয়ে এল। চিৎকারটা যেখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠলো, শুনতে পেলুম করুণস্বরে আমার কাছে এক গ্লাশ বিষ চাইছে। মরলে পরে নরক আছে কি না জানি না, কিন্তু ক্যানসার নেই। [টীকা : পেটে ফোড়া আর ক্যানসার হওয়া এক নয়।]

আমার চোখের সামনে বিলীয়মান অন্ধকার,— কালিন্দী একটু ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো, চুপ করে আছে। বাইরে বেরিয়ে এলুম, সৃষ্টির সেই অস্পষ্টতার মধ্যে আমার সামান্য অস্তিত্বটুকু যে কী ভালো লাগলো কেমন করে বোঝাই। মনে হলো মৃত্যু মিথ্যা—এই যে নিশ্বাস নিতে পারছি সুস্থ সুন্দর দেহে—এর চেয়ে বিলাস আর কী আছে! বেশি দিন না-ই বা বাঁচলুম, কিন্তু যত দিন আছি তত দিন যেন অত্যন্ত-মাত্রায় বেঁচে যেতে পারি, এই প্রার্থনা।

কালিন্দী আবার চিৎকার করে উঠেছে। ওর আর্তনাদ শোনবার জন্যে আর দাঁড়ালুম না, ধীরে ধীরে বাগানে চলে এলুম। [টীকা : এই ভোরে ওর বাগানে চলে আসাটি আমাদের ভালোই লাগলো ; ওকে আমরা স্বার্থপর বা

স্নেহবিমুখ বলে নিন্দা করলে সেটা ন্যায়ানুগত হবে না। ওর সৌন্দর্যবোধটি আমাদের মনোজ্ঞ হয়েছে।]

টের পেলুম রমাপতি আমার আত্মীয় হয়! কিন্তু এ-বিষয়ে সজ্ঞান হওয়ার আর অর্থ নেই। কেননা রমাপতি যেদিন এসেছিলো কপালে তথাকথিত আত্মীয়তার নিদর্শন এঁকে আসেনি, এসেছিলো একান্তরূপে পুরুষ হয়ে—যদি উপমা দিতে হয় বলি, একটা নৈর্ব্যক্তিক জ্যোতিষ্মান আবির্ভাবের মতো। এখন, ফিরে যাও, বললেই মন শোনে কৈ? [টীকা: রমাপতি ইন্দিরার কি রকম আত্মীয় হয়, ডায়রিতে তা লুকিয়ে রাখাটাকে নিশ্চয়ই ভীরুতা বলবো। রমাপতি মামা না কাকা, দাদা না আর-কিছু জানা উচিত ছিলো। 'তথাকথিত' কথাটি প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ কৃত্রিম সম্পর্কটার স্বভাবসিদ্ধ এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে তার সৃষ্ট ব্যবধানগুলিকে রক্ষা করে চলে; তাই রমাপতি আত্মীয় হয়েও ইন্দিরার এমন স্নেহ বা হৃদ্যতার অধিকারী হয়েছে যা সম্পর্কের অতিরিক্ত, তার সীমার বহির্ভূত। শিশুকাল থেকে যে-সাহচর্য নরনারীর হয়ে থাকে সেটায় রহস্য-বিলোপ ঘটে বলেই আত্মীয়তাটা টিকে থাকে, তাই পৃথিবীতে সহোদর ভায়ে-বোনে প্রেম বড়ো একটা দেখা যায় না, যদিও *Sanine* সে-সংস্কারো ভেঙেছে। রমাপতি যদি ছেলেবেলায় ইন্দিরার সঙ্গে খুব মেলামেশা করতো তাহলে হয়তো রমাপতিকে দাদা বা মামা বা কাকা বা আর কিছু ডেকে-ডেকে ইন্দিরার মন ও রসনা অভ্যস্ত হয়ে পড়তো; আত্মীয়তার প্রাচীর ভাঙতো না বোধ হয়। কিন্তু রমাপতিকে এখন কাকা বা মামা বা দাদা বা আর-কিছু বলে রসনা ডাকবে কেন, মনই বা কি করে সায় দেবে?]

রমাপতির প্রতি আমার এই অনুভূতিটির কি সংজ্ঞা দেব ভেবে উঠতে পারি না। বাঙলা ভাষায় শব্দসম্পদ এতো কম যে ঠিক atmosphere-যুক্ত একটা প্রতিশব্দ পাবে না। প্রেম কথাটার না আছে অর্থ, না বা ইঙ্গিত; তার চেয়ে স্নেহ কথাটায় সংকেতময়তা বেশি আছে। কিন্তু ঐটুকু কথায় কুলোবে না কিছুতেই। বন্ধুতা, মিথুনাসক্তি? কথাগুলি অত্যন্ত রূঢ় বলেই যে বরখাস্ত করছি তা নয়, কথাগুলির অর্থ সত্যিই অসম্পূর্ণ; আমার এই অনুভূতিটি সত্যিই অনিরূপণীয়! [টীকা: অনুভূতিটির না পেলেও atmosphere কথাটার বাঙলা প্রতিশব্দ পাওয়া দুষ্কর হতো না।]

কেন রমাপতিকে ভালবাসি [টীকা: এইখানে ভালবাসি কথাটা ক্রিয়া, অনুভূতি বা বিশেষ্য নয়, তাই গ্রাহ্য।] এই প্রশ্ন করে সদুত্তর পাচ্ছি না। রমাপতির রূপ নেই, বিত্ত নেই,—মুখশ্রী নেহাৎ সাধারণ, স্বাস্থ্যগৌরবেও কুলীন নয়—সায়াম্স কলেজ থেকে রিসার্চ করবার জন্যে সামান্য একটা বৃত্তি পায় মাত্র।

[টীকা : বোঝা যাচ্ছে সেই সূত্রেই রমাপতি কলকাতায় এসেছে পড়াশুনা করতে। বিজ্ঞান-বিষয়ে গভীর গবেষণা করতে গিয়ে যে একটি চারুবর্ধনা আত্মীয়ার প্রতি অলস দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না এমন আত্মসংযমের প্রমাণ দিতে স্বয়ং সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরো লজ্জিত হতেন।] কিন্তু ওর একটি ভীষণ গুণ আছে,—তা হচ্ছে ওর অনন্যনিষ্ঠ পাঠাসক্তি। ওর ছোট ঘরটিতে বসে সমস্ত দিন (কলেজের সময়টুকু ছাড়া) যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে কি-এক অভূতপূর্ব আবিষ্কারের আশায় কলকজ্জার ওপর ঝুঁকে থাকে। এই অখণ্ড মনোযোগ বা অন্যান্য জিনিসের [টীকা : ইন্দিরা স্বয়ং ?] প্রতি ওর এই ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখে রাগ হয়, কিন্তু রাগতে পারি না। [টীকা : কি করেই বা পারবে ? রমাপতিকে যে ওর ভালো লাগবে এতে আর সন্দেহ কি ? ও অলস কর্মবিমুখ—রমাপতির একনিষ্ঠ কর্মপরায়ণতা। ইন্দিরা মৃদুস্বভাব অবাঙ্মুখী, আর রমাপতির দেহে যেমন দৃঢ়তা, বচনে তেমনি সুস্পষ্ট তেজ। প্রীতির মূলেই বৈষম্য,—যত গভীর, প্রীতিও তদনুপাতে প্রগাঢ়। রমাপতি যদি তার ল্যাবরটরিতে দিন-রাত মাথা গুঁজে পড়ে না থাকতো, মাঠে বসে যদি বাঁশি বাজাতো বা ইজি-চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসে বিড়ি ফুঁকতো তাহলে ইন্দিরার পক্ষে তার সংজ্ঞানির্ণয় করতে বেগ পেতে হতো না—অর্থাৎ শুদ্ধভাষায় তাকে বলতো ন্যাকামি।]

রমাপতি আমার আত্মীয়, ওর সঙ্গে সামান্য কথা-অনুরাগ সম্ভোগ করতেও আমার বাধা আছে এ-কথা আজ বললেই বা শুনি কি করে ? টের পেলুম, ইদানি আমাদের দু'জনের ওপর সংসারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির ছায়া পড়েছে। [টীকা : ইদানি কথাটি লক্ষ্য করবার। মনে হচ্ছে, প্রথমত এদের পরস্পরের সান্নিধ্য নিবিড়তর হয়ে উঠেছিলো এই আত্মীয়তারই ছাড়পত্রে। নর-নারীর একটা শারীরিক নৈকট্য ঘটারও যেখানে সুবিধে নেই সেখানে, - হোক না কৃত্রিম, হোক না মূল্যহীন—এই আত্মীয়তার ওজুহাতকে নিন্দা করাটা ঠিক হবে না। সেই কৃত্রিম আত্মীয়তাটা ইদানি সত্য ও সুগভীর হয়ে উঠতে চাইছে বলে সংসার বা তথা সমাজের সহ্য হচ্ছে না।] মন বিমুখ হয়ে রইলো ; যেটা অন্যায় বলে বুঝছি—সেটাকে শাসন করবার জন্যে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবো মনের মধ্যে সেই শক্তি খুঁজে পেলুম না কেন ? বুঝলুম, রমাপতির কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এমন কোনো অন্তরায়কে আমি কখনো কল্যাণকর বলে স্বীকার করবো না, কিন্তু এ নিয়ে যে সহানুভূতিহীন সংসারের সঙ্গে একটা ক্ষমাহীন সংগ্রাম করবো সেটাও আমার কাছে অবিনয় মনে হলো। অন্য মেয়ে হলে কি করতো জানি না, আমি আমার ঘরে

ফিরে এসে নির্জনে কাঁদতে বসলুম। [টীকা : গোঁয়ার ওথেলো (স্ত্রীর বুকে) ছুরি বসিয়ে অদৃশ্য হলে ঝি এসে মুমূর্ষু ডেসডেমোনাকে জিগ্‌গেস করলে, কে এই সর্বনাশ করেছে ? শ্রীমতী ডেসডেমোনা মরলো বলেই গলে গিয়ে তার মিথ্যা কথাকে বললাম —'স্বর্গীয় মিথ্যাবাদ।' এই মিথ্যাবাদিনী ভীরু ডেসডেমোনাই গোঁয়ার ওথেলোকে বিয়ে করবার জন্যে বাপের সঙ্গে বাক্যের লড়াই করতে কসুর করেনি। এইখানটাতে বাঙালী মেয়ের সঙ্গে তার কুটুম্বিতা নেই। ইন্দিরা ঘরে গিয়ে যে কাণ্ডটা করে বসলো সেটা প্রাক্-গান্ধি-যুগের বাঙালী মেয়ের প্রকৃষ্ট চরিত্র-নমুনা।]

রমাপতিকে আমি বিয়ে করবো এমন একটা স্থূল নীচ অশ্লীল ইচ্ছা পোষণ করতে আমার শরীর-মন কণ্টকিত হয়ে উঠলো। [টীকা : ইচ্ছাটা নীচ মনে হবার কারণ এই নয় যে, রমাপতির সঙ্গে ওর ক্ষীণ রক্তসম্পর্ক আছে ; কারণ, ও বিয়ে-ব্যাপারটাকেই ঐ সব বিশেষণে আখ্যাত করে থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চটবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তা ও ধারণার স্বাধীনতার আমরা পক্ষপাতী।] অথচ রমাপতিকে আমার চিরকালের জন্য ছেড়ে থাকতে হবে সমাজের এই অনুশাসন মেনে নিলেই যে, একটা কীর্তি করা হবে এ-কথাও মানতে পারিনে। রমাপতির সঙ্গে [টীকা : ইন্দিরা রমাপতির পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করতে চায় না, ঐ নামটি বারে বারে লিখতে ওর ভালো লাগে বোধ হয়।] এ-বিষয় নিয়ে একটা পরিষ্কার কথা বলা চলে না ? মা গো, কি লজ্জা ! নিজেকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে দিতে আমি মরে গেলেও পারবো না ; কাঙালপনাকে আমি ঘৃণা করি।

কিন্তু আমি তো যাজ্ঞা করতে চাই না, আমি চাই ওর সঙ্গে এমন একটা আলোচনা করতে যেটা বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত করা যাবে এবং যেটার সাহায্যে বর্তমান সমস্যার সমাধান হবে। যেন এত সহজেই এ সমস্যার মীমাংসা হয় ; অসীম সময় এ সন্ধিকে টিকতে দেবে কেন ? তবু রমাপতির ঘরের দিকে অগ্রসর হলুম। দরজা ভেজানো ছিলো, ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়েও ওর ধ্যান ভাঙতে পারলুম না। দোরের দিকে পিঠ করে বসে আছে—সামনে টেবিলের উপর মাথাটা আনমিত। টেবিলের এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছে এই রমাপতির চুল ধরল বলে—রমাপতির ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর নোয়ানো ঘাড়টা স্পর্শ করতে ভারি ইচ্ছে হলো, কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমন করলুম। দৈহিক সংস্পর্শের আবিলতা দিয়ে আত্মাকে কুণ্ঠিত করতে চাইনে। খুব কাছে এসে দাঁড়ালুম ; তবু রমাপতির মুখ তুলে চাইবার নাম নেই। [টীকা : রমাপতি যে বিশ্বামিত্রের চেয়ে বড়ো সাধক এ-সত্যটা সহজেই প্রতিপাদিত হলো।]

এক ঝলক হাওয়ায় দুর্বল দীপশিখাটা নিবে গেলো এবং দেশলাই খুঁজতে গিয়ে রমাপতি হঠাৎ আমার ডান হাতটা ধরে ফেললে। অন্ধকারে রমাপতির মুখ দেখা গেল না বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ওর সমস্ত অস্তিত্বটুকু যেন সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছে। [টীকা : ইন্দিরার রচনার অপরাপর ত্রুটির মধ্যে একটা বড়ো ত্রুটি এই যে, ও মোটেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে না। এইখানে রমাপতি ওকে দেখে কি-কি কথা বললে, জানলে আমরা খুশি হতাম।] ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিলুম, হাতের স্পর্শ অবশেষে হয়তো অধরের স্পৃহা হয়ে উঠবে, এবং অধর থেকে নধরের, তা ছাড়া এই অন্ধকারটি উপন্যাসের মতো মধুর বটে, কিন্তু মোমবাতিটা ফের না জ্বাললে অন্ধকারেই এই এঁদো কুৎসিত সংসারটা মুখ ভেঙচাবে। দেয়ালের প্রত্যেকখানি ইট সহস্রচক্ষু ইন্দ্রের মতো পাপীয়ান।

আলো জ্বালানো হলো, সান্নিধ্যটিও নিভৃত হয়ে উঠেছে, কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারলুম না। যেন রাত করে এতো সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালে এ-রাত আর পোহাত না। হঠাৎ বারান্দায় একটা শব্দ হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে হেসে বললুম : চলি এবার, বাইরে গুপ্তচররা পদচারণ করছে। রমাপতি কিছু বললে না, একটু তাকিয়ে হেসে মুখ নীচু করে কাজে মন দিলে।

কেলেঙ্কারির আর সীমা রইলো না। আমাকে নিয়ে রমাপতির দুর্নাম এতো বেড়ে উঠেছে যে, রমাপতি বাবার মুখের ওপরেই সটান বলে বসলো : ইন্দিরাকে আমি বিয়ে করবো ; এবং রমাপতির প্রার্থনাটা যে অযৌক্তিক নয় তার পক্ষে আইন-স্বীকৃত নানা প্রথার নজির দেখাতে লাগলো। লাভ হলো এই, বাবাও রমাপতির মুখের ওপর স্বচ্ছন্দে বলে বসলেন : আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। রমাপতি তার ট্রাঙ্ক গুছোতে বসলো।

রমাপতি সোজা আমার ঘরে এসে হাজির ; বললে, আমাকে তার অনুসরণ করতে হবে। বললে : এ-সব নিয়মের দাসত্ব যদি আমাদেরো করতে হয়, তবে আমাদের নিগ্রো হয়ে জন্মানোই উচিত ছিলো। বিয়েতে অনুষ্ঠানটাই বড়ো নয় ইন্দিরা, বড়ো হচ্ছে তার মনস্তত্ত্ব। আমি আর তুমি cousin-কি নই সেটা আমাদের অন্তরের দিক থেকে একেবারেই সমস্যা নয়। তুমি এসো আমার সঙ্গে চলে। তুমি যে আমাকে ভালোবাসো এতে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু নিষ্প্রাণ জড়পদার্থের মতো বসে বসে অন্যায় অত্যাচার সইতে হবে এ আমি সইতে পারি না। এসো তুমি। যদি তোমাকে কেউ রক্ষিতা বলে, সে ভাষার অপপ্রয়োগ করবে মাত্র। [টীকা : রমাপতির কথায় ওদের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাসটুকু পাওয়া গেল। এবারো আমরা চটে উঠতে পারতাম, কিন্তু রোগ সারানোর চেয়ে রোগ যাতে না হয়

তারই জন্য সতর্ক থাকা ভালো বটে, কিন্তু রোগ যদি একবার হয়ই, তবে রোগীকে সেই উপদেশ দেওয়ার চেয়ে চিকিৎসা করাই সদ্বিবেচনার কাজ হবে।]

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। রমাপতি হঠাৎ এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো কেন? নিরাকুল কণ্ঠে বললুম : বিয়েটাকেই তুমি প্রীতির একটা চরম পরিণতি বলে বিশ্বাস কর কেন? ওর সমগ্র রূপটি যখন চোখের সামনে তুলে ধরি তখন ঘৃণায় আমার আত্মা অশুচি হয়ে ওঠে। তোমাকে আমি সেই গ্লানির মাঝে দেখতে চাইনে, রমাপতি। [টীকা : রমাপতির নামটা উচ্চারণ করে ইন্দিরা সাহসের পরিচয় দিয়েছে।] তুটো শরীরকে একত্র রেখে যে নূতন একটা ব্যাধি-সৃষ্টি হয়, তাকে তুমি যতই সম্মান দাও না কেন, আমি তার অমর্যাদা করি। তোমাকে অভয় দিলুম রমাপতি, এ-দেহ আমার নিজের—অতৃপ্ত আত্মা তোমার। [টীকা : লিখতে বসে কথাগুলিকে ইন্দিরা নাটকীয় করে তুলেছে—কেননা সাধারণতঃ অভিধান সামনে রেখে সে কথা কয় না; তাই সন্দেহ হচ্ছে রমাপতিকে দাদা না বলার জন্যে যে খানিক আগে ওকে তারিফ করেছিলাম সেটা ভুলও হতে পারে। ওটা বোধ হয় নেপথ্যের সাহস—প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চের নয়।]

এততেও রমাপতি সম্পূর্ণ সুখী হলো না; বললে : তোমার দেহের ওপর যে আমার খুব লোভ আছে তা মনে কোরো না, ইন্দিরা। আমি কখনোই এতো বড়ো অমানুষ হবো না যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাবি খাটাতে যাবো। তুমি সংসারে সন্ন্যাসিনী থেকো—আমার আপত্তি নেই; কিন্তু মনে রেখো, আমার সংসারে। তবু তুমি আমার সঙ্গে এসো ইন্দিরা। বেশ, এই এক্‌স্‌পোরমেন্টটাই করা যাবে—তা ছাড়া এই একটা বর্বর রীতিকে সংশোধন করা চাই। বিজ্ঞান আমাদের সহায়।

বললুম : আমাকে ভাববার সময় দাও, রাত্রে এসো।

রমাপতি ধীরে বললে : তোমাকে আমার চাই, আমার কর্মের অনুপ্রেরণা রূপে—তোমাকে কাছে না পেলে আমার তপস্যা নিস্তেজ হয়ে পড়বে, ইন্দিরা। [টীকা : মেয়েমানুষ যে কখনো পুরুষের সাধনার সহায়ক হতে পারে এই প্রথম শুনলাম। এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা নতুন বটে।]

সময় চাইলুম বটে, কিন্তু ভেবে নিতে আমার এক মিনিটেরো বেশি লাগলো না। রমাপতির সঙ্গে আমি যাবো না; না। তার কারণ খুব সহজ; প্রথমত বিবাহের স্থূলতা আমার সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করবে; তা ছাড়া দিবারাত্র রমাপতির সান্নিধ্যে থেকে আমি যে তপস্বিনী থাকতে পারবো নমনীয় স্নায়ুগুলোর ওপর আমার তত বিশ্বাস নেই। আর বিজ্ঞানের জারিজুরি কতক্ষণ টিকবে কে বলতে পারে? প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে বিজ্ঞান পারবে? ব্যাপারটাকে

তাই আমি সর্বান্তঃকরণে উপেক্ষা করলুম। কিন্তু এর চেয়েও যে-কারণটা সত্য সেটা আমি প্রকাশ করছি। সেটা হচ্ছে এই—[টীকা : এই পর্যন্ত লিখে হঠাৎ ইন্দিরা থেমে গেছে। কর্মান্তরে যেতে হয়েছিলো হয়তো।]

কথ্য বাঙলা ভাষা যে কী জোরালো বাবার মুখের গাল খেয়ে হৃদয়ঙ্গম করলুম। কী যে আমাকে না বললেন ভেবে পাইনে ; কান দুটো অত গরম না করে যদি কান পেতে শুনতুম তো আমার শব্দসংগ্রহের তালিকাটা বেড়ে যেতো। মজা এই, একটি কথারো আমি প্রতিবাদ করলুম না ; প্রতিবাদ যে করা যায় না তা নয়—করলুম না কারণ কোলাহলকে আমি বরদাস্ত করতে পারি নে, তা মনকে যে শুধু বিক্ষিপ্ত করে তা নয়, কলুষিত করে। অধোবদনে চুপ করে সবগুলি গালই হজম করলুম,— জানলা দিয়ে যতগুলি শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-আত্মীয়া একটা রোমহর্ষণ লড়াই দেখবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদেরকে বঞ্চিত করতে হলো।

আমি পারিবারিক শান্তি নষ্ট করতে চাইনে। আমার ভেতরে এমন উদ্বৃত্ত শক্তি নেই যে সমস্ত অশান্তি-অত্যাচার অতিক্রম করে তৃপ্তির স্বাদ পেতে পারি। তা ছাড়া, পরিবার-পরিজনকে ক্ষুণ্ণ করলে তার যে একটা নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া হবে রমাপতির সাহায্য না নিয়েও এ সামান্য তথ্যটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। নিজের সুখের জন্যে আর সবাইকে বিমুখ করে তুলব এতো বড়ো দুঃসাহস আমার নেই। আমি সত্যিই আত্মবঞ্চনা করছি না, আমার ভীরুতাকে সমর্থন করতে যাওয়ায় আমার দরকার কি ? আমি যে ভীরু, পরনির্ভরশীল সে-কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। আমি রমাপতিকে ভালোবাসি, রমাপতির জন্যে শকুন্তলার মতো তপস্যা আমাকে খুব মানাবে—তার জন্যে আমি শুভকামনার দীপ জেলে প্রতীক্ষা করে থাকবো, এ-জন্মে না হয়, অমৃততীর্থে। [টীকা : পরজন্মে বিশ্বাস করাটা ভাব-প্রবণ বাঙালী-মেয়ের বিশেষত্ব। তবু ইন্দিরাকে একটু স্বতন্ত্র বলতে হবে, কেননা পরজন্মে সে আবার এই পৃথিবীতেই আসতে চায়নি।] সংসারের আর সবাই যেটাকে একান্ত অপ্রার্থিত বলে ছুঁড়ে ফেলতে চায়, ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে সেই বস্তুটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলেই খুব বড়ো একটা কিছু লাভ করতে পারবো বলে তো আমার মনে হয় না। তার চেয়ে এই নির্জনে গভীর বিচ্ছেদবেদনায় এই আমার বিপুলতর মহত্তর উপলব্ধি, রমাপতি। সহজ হবার সাধনাই বড়ো সাধনা, সামঞ্জস্যই আমার বড়ো কাম্য। [টীকা : অলিখিত অংশটুকুর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যা হোক।]

জানলার ধারে চেয়ার টেনে বসে ছিলুম, জানলার পরপারে বারান্দায় রমাপতির আবির্ভাব হলো ; একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলুম বোধ হয়, রমাপতির স্বর

শুনে শিউরে উঠলুম। রমাপতি বললে : চলে এসো ইন্দিরা, রাস্তায় নামলেই ট্যাক্সি পাবো। বেশি দেরি কোরো না। আমার চোখের সামনে দিয়ে অলক্ষিত বিরাট পৃথিবী যেন বায়স্কোপের ছবির ফিতের মতো ঘুরে যেতে লাগলো, আকাশ দুলে উঠেছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করে বললুম : না। রমাপতি কি যেন ফের বললে, শুনতে পেলুম না, কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। এবার জানলাটাকে আরো ঘেঁষে রমাপতি কাতরকণ্ঠে কি যেন আবার বলছে, কঠিন হয়ে জানলা ধীরে বন্ধ করে দিলুম। [টীকা : রমাপতির কাতর কণ্ঠে বলবার জন্যেই নিশ্চয়। সে যদি খুব পরুষ-বচন প্রয়োগ করতে পারতো, তবে এই কৃত্রিম অবরোধ আর বেশিক্ষণ রক্ষা করা ইন্দিরার সাধ্য ছিলো না, কেননা তার চোখে আকাশ দুলে উঠেছিলো, পৃথিবীও উঠেছিল টলে। রমাপতি তার জীবনের পরমতম মুহূর্তটি এমন অবহেলায় হারিয়ে ফেললো সামান্য accent ভুল করে! রমাপতি তার নাম বদলে নিক —রমাপদ!]

মা গো, কী মুক্তিই আমি ভোগ করছি! রমাপতি চলে গেছে অপমানিত হয়ে, যেন বেঁচে গেছি! এই পারিবারিক শান্তিতেই আমার পরমার্থ! বাক্যযন্ত্রণা যে কী যন্ত্রণা যে না সয়েছে তার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। বাবা-মা'র ধারালো জিভ দুটো একটু জুড়িয়েছে,– কাকিমাদের অভদ্র ইঙ্গিত করা এবার বুঝি ক্ষান্ত হলো। খুব ঠেসে পড়ছি—ইংরেজি সাহিত্য নয়, ইকনমিক্‌স্; ইকনমিক্‌স্ যদিও আমার সাবজেক্ট নয়। পড়ছি মনকে বাধ্য করতে, কঠোর নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত করতে। সকলের কাছ থেকে সরে গিয়ে কোণটিতে বসে আমার ঘরের মধ্যে আকাশকে অনেক ছোট করে এনেছি। গিয়ে অবধি রমাপতি একখানিও চিঠি লেখেনি। [টীকা : ডায়রিটি ছোট; মনে হচ্ছে ইন্দিরা এখনো তার বিচ্ছেদের অশ্রু-সমুদ্র পেরিয়ে আসেনি।]

বেশ ছিলুম, চুপচাপ, প্রায় আত্মসর্বস্ব হয়ে। ইকনমিক্‌স্‌টা অঙ্কের মতোই শুকনো, তাই এখন পলিটিক্স-এ [টীকা : পলিটিক্স-পাঠে] মন দিয়েছি। রমাপতি এখন প্রায় একটা সুস্বপ্নের সুখকর স্মৃতির মতো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে! ওর ঠিকানা জানিনে বলে মনে উদ্বেগের বদলে শান্তিই বিরাজ করছে! বেশ ছিলুম, ভেবেছিলুম, একটা আয়ত্তাতীত দুর্লভ আদর্শের মতো রমাপতি চিরকাল আমার নাগালের বাইরে অধিষ্ঠান করবে [টীকা : এক কথা পুনঃ পুনঃ বলাটা ভাষাসৌষ্ঠবের পরিচয় নয়! 'আয়ত্তাতীত', 'দুর্লভ', 'নাগালের বাইরে' এই বিশেষণাধিক্যের প্রয়োজন ছিলো না।] আর আমি একদিন কালিন্দীর মতোই অপার ব্যর্থতায় ডুবে যাব। [টীকা : বোঝা গেল কালিন্দী আর নেই। কিসে মারা গেল ও? ব্রবিউল খেয়ে, না, অস্ত্র করাতে গিয়ে? 'অপার ব্যর্থতা' কিন্তু কালিন্দীর বেলায় ভিন্নার্থ-সূচক।

অকাল মৃত্যুই কালিন্দীর ব্যর্থতা। প্রসঙ্গক্রমে ইন্দিরার মতটা এখানে একটু আধুনিক হয়েছে।]

সংসারের আবিল আবর্ত থেকে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছিলুম, হঠাৎ আবার কোলাহল উঠলো। বাবা এততেও আমার জন্যে নিশ্চিন্ত হননি ; কোথা থেকে একটি পাত্র জুটিয়ে এনেছেন, সে আমাকে পছন্দ করতে শিগ্‌গিরই একদিন সশরীরে আবির্ভূত হবে ; যদি আমি তার সংসার-সুখবিধায়িনী বলে মনোনীত হই তবে আসন্ন শ্রাবণেই আমাকে দাসী হতে হবে। নির্ভুল বিধান! কিন্তু জিহ্বাকে এবার আর শাসন করতে পারলুম না ; বিদ্যুদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলুম : না। এ-সব ক্ষেত্রে যুক্তিবহুল দীর্ঘ বক্তৃতা করায় আমি অভ্যস্ত নই—ঐ একটি শব্দই স্থিরলক্ষ্য মৃত্যুবাণের মতো বাবা-মা'র কল্পনার প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ করে দিলো। [টীকা : না বলার সঙ্গে ইন্দিরার গ্রীবা-ভঙ্গিও অর্থটাকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছে। কেননা প্রত্যেকটি বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে কম-বেশি যে-সব অঙ্গ-সঞ্চালন হয়, সেই ভঙ্গিগুলিই অর্থের সম্পূর্ণতা দান করে।] মুহূর্তমধ্যে আমার মাথার ওপর ঝড় ভেঙে পড়লো—সেই কোলাহলে কান পাতে কার সাধ্য। অকারণে বাবা আবার বেচারা রমাপতিকে লক্ষ্য করে গর্জাতে লেগে গেছেন, মা'র বিষোদ্গার বিরাম মানছে না, কাকিমাদের অভদ্র ইঙ্গিত শুরু হয়েছে। কাকাদের একটা বন্দুক ছিলো, রতু কাকা [টীকা : নাম বোধহয় রতন কিংবা রতিপ্রসন্ন !] সেইটে নিয়ে রমাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করতে [টীকা : বন্দুকে মুণ্ডচ্ছেদ হয় না।] এখুনিই বেরিয়ে পড়লো বুঝি। প্রতি মুহূর্তে জীবন দুর্বহ হয়ে উঠতে লাগলো। অপ্রকাশ্যে যে অপবাদ চলেছে তার জ্বালা আমাকে দগ্ধ করে দিচ্ছে। [টীকা : রমাপতির সঙ্গে 'তথাকথিত' আত্মীয়তাটার জন্যেই এমন একটা পৈশাচিক গোলমাল হচ্ছে।]

হাঁপিয়ে উঠলুম, কিন্তু কিছু যে একটা করবো তার পথ পেলুম না। যদি বাইরে বেরিয়ে যাই, কতদূর গিয়েই হয়তো হঠকারিতার জন্যে অনুতাপ করবো। অনুতাপ আমি করতে পারবো না, [টীকা : যেন ইন্দিরা ততখানি ভীরু নয়।] মরে গেলেও নয় ; যা আমি করবো তার ফলভোগ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকবো। তাই আবার সংসারে শান্তি আনবার জন্যে রাজি হয়ে গেলুম। আমার আত্মবলি ইফিজেনিয়ার চেয়ে কম কিসে ?

সকালবেলা ভাবী বর এসেছিলেন আমাকে দেখতে ; ভালো করে দেখাবার জন্যে কাকিমাদের নির্দেশ মতো রঙিন শাড়ি পরলুম, আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখে ঠেসে স্নো ঘষতেও ছাড়লুম না। আমার দেহটা যে এত প্রখররূপে অভিব্যক্ত আজ টের পেয়ে আমার লজ্জার আর সীমা রইলো না। অনাবৃত হাতের তালু দুটোকে পর্যন্ত

কুৎসিত মনে হতে লাগলো। মনে হলো একটা হিংস্র মাংসলোলুপ পশুর সামনে অগ্রসর হচ্ছি।

ভদ্রলোকটি প্রথমেই সাফাই গাইলেন ছোটকাকাকে লক্ষ্য করে: আমাদের দেশে মেয়ে-দেখার এই প্রথাটা সাজ্যাতিক রকম বর্বর; কিন্তু এ ছাড়া উপায়ো নেই কিছু, কেননা স্বাধীনভাবে মেলা-মেশাটা এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। অগত্যা এই পথেরই শরণ নিতে হচ্ছে। তা ছাড়া মিশতে পারলেই যে মিলতে পারা যাবে তার মানে নেই, কেননা হৃদ্যতা ও বিয়ে সমান স্তরের জিনিস নয়। কাকারা ঘাড় নেড়ে সায় দিতে লাগলেন।

ভদ্রলোক সামান্য দু'য়েকটি যা প্রশ্ন করলেন সোফায় বসে ঘাড় হেঁট করে ঠিক-ঠিক জবাব দিলুম, একটা গান শুনিয়ে দিলুম পর্যন্ত। বলা বাহুল্য আমার চেহারাটা তাঁর মনে ধরেছে।

এখন কী করবো বলতে পারো, রমাপতি? আমি এখন আগাগোড়া একটা মাটির ঢেলা, একটা কামময় মাংসপিণ্ড। আমার মন কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে, দেহ ভরে আমাকে কলুষ বহন করতে হবে। সৌন্দর্যের অমরাবতী থেকে আমি নির্বাসিত হলুম। দূরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার এ পঙ্কিল অপমৃত্যু দেখো না।

শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্রে পা দিয়েছি, রমাপতি। তুমি কোথায়?

কী লোভী এই পুরুষ! প্রণয়োপাসনা করে চিত্তজয় করবার প্রতীক্ষাটুকু পর্যন্ত তার সয় না, কর্কশ বাহু বিস্তার করে দেয়। অমানুষিক ঘৃণায় সরে গিয়ে নিজের নারীত্ব রক্ষা করি, অম্লান রাখি।

স্বামীর সন্দিগ্ধ হবার কারণ ঘটলো। আমার প্রাগ্‌-বিবাহযুগের কি-একটা শ্রুতিমধুর কলঙ্ক-কথা তাঁরো কর্ণগোচর হয়েছিলো, তিনি মনে-মনে সেটাকে অতি-রঞ্জিত করতে বসলেন। আমার এই ঔদাসীন্য এই অন্যমনস্কতা সবই যে রমাপতির বিচ্ছেদব্যথার পরিণাম এমন একটা নিষ্ঠুর কথা আমার সামনে বলতে স্বামী সংকোচ করলেন না। [টীকা: ইন্দিরা বেশ রীতি-মাফিক হয়ে উঠেছে, স্বামীর নাম লেখনীর মুখে আনছে না পর্যন্ত।] স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে-মুখ ঘৃণায় কুটিল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। সংগ্রামে আবার হলাহল উঠলো।

খবরটা ও-সংসারেও ছড়িয়ে পড়লো, স্বামীর বন্ধুমহলেও। বাবা ফের তর্জন-গর্জন শুরু করলেন, মা কান্নাকাটি, কাকাদের মর্চে-পড়া বন্দুক আবার তেল মেখে ঝকঝকে করে উঠলো। প্রবাসী রমাপতির লাঞ্ছনার কথা ভেবে আমার দুঃখের আর শেষ রইলো না।

বিক্রীত মনে রমাপতিকে ডেকে এনে তাকে অপমান করবো আমি রমাপতিকে

অত ছোট মন নিয়ে ভালোবাসিনি। আমার পৃথিবীতে আর তার পদরেখা পড়বে না, বিস্মরণের কূলে তার চিতা রচনা করেছি। আমার এই ঔদাসীন্যের মূলে রমাপতির বিচ্ছেদ নয়, এই নিরর্থক দেহসর্বস্ব বিবাহ। অথচ এই যোয়ালই আমাকে বইতে হবে, মুক্তি আমি পাব না, পেতেও চাই নে। একটা উদ্যত কুশ্রীতা থেকে আত্মরক্ষা করছি মাত্র। কিন্তু ঝড়ের ফণা লেলিহান হয়ে উঠেছে।

আমি যে আমার স্বামীকে খুব ভালোবাসি তার একটা লৌকিক প্রমাণ না দেখাতে পারলে রমাপতির লাঞ্ছনা ও অপমান সমাপ্ত হবে না। অতএব উৎসুক স্বামীর কাছে অপ্রতিরোধে আত্মদান করলুম। সে-গভীর পরাজয় সে-অনপনেয় দাসত্বের লজ্জা আমাকে মুখ বুজে সইতে হচ্ছে। আমার দেহ রাহুস্পৃষ্ট চন্দ্রের মতো অপবিত্র হয়ে উঠলো; সে-রাতে কত যে কাঁদলুম বলতে পারি নে।

স্বামী প্রসন্ন হয়ে উঠছেন; আমি ভাল করে ককেট্রি আরম্ভ করেছি। এ লজ্জা আমার ঘুচবে কবে? রমাপতি, এই মর্যাদাহীন আত্মবিক্রয়ের গ্লানি আমি সইতে পারছি না।

কয়েক মাস যেতেই টের পেলুম আমার শরীরটা অসমঞ্জস হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে দেরি হলো না। ছি ছি. পরাজয়ের শেষ কলঙ্ক-কালিমায় আমার সর্বাঙ্গ লিপ্ত হয়ে গেল। এখন মরতেই শুধু বাকি আছে। ছি ছি ছি —ঘৃণাটা তবু সম্যক প্রকাশ করতে পারছি না। এই অবাঞ্ছিত সন্তান-ধারণে গর্ব কোথায়, কিসের আনন্দ? যে-মিলনের পারস্পরিক সমন্বয় ছিলো না, সেটা তো দৌরাত্ম্যেরই নামান্তর বলতে হবে। তবু স্বামী খুশি হয়েছেন, পঞ্চামৃতের দিন ঠিক করে শাশুড়ি পাঁচ ঝাঁক উলু দিয়ে উঠলেন, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলুম। দৌহিত্রের জন্মসম্ভাবনার সংবাদ পেয়ে এক লেফাফায় মা-বাবা আনন্দ-অভিনন্দন পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে কাকিমারাও খেলো রসিকতা করে পাঠিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া যে কী গর্হিত কী বীভৎস ভাবতে পারিনে। সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করলুম, অথচ স্বামীর কাছ থেকে সতীত্ব রক্ষা করতে পারলুম না।

আমার সেই সোনার দেহ! নরদুর্লভ সৌন্দর্যের উপাসনা করবো এই ছিলো আমার অভিলাষ, নিজের আত্মাকে পবিত্র, দেহকে পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিকে জ্যোতিষ্মান করবো এই পণ করে ভালোবেসেছিলুম; কিন্তু আমার যে কী অধঃস্খলন ঘটেছে তা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? আমার আত্মা কুণ্ঠিত, দেহ কলুষিত, দৃষ্টি কামাচ্ছন্ন! আমি এখন একটা যন্ত্র মাত্র। [টীকা: ইন্দিরাকে মোটামুটি আমরা ক্ষমা করলাম। সে রমাপতিকে বিয়ে করে অসামাজিক অন্যায়াচরণ করেনি,

দস্তুরমতো গোত্রান্তরিতা হয়ে বিয়ে করেছে, এবং আদর্শ স্ত্রীর মতো এক বৎসর না পেরতেই সন্তানের জননী হতে চলেছে। সমাজ ও আইন মনের অপ্রকাশ্য তত্ত্বাদি নিয়ে মাথা ঘামায় না, বাইরের ক্রিয়া নিয়েই তাদের কারবার। তাই সমাজ ও আইনের বিচারে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বেকসুর খালাস পেলেন।]

ডায়রি-পড়া সাঙ্গ করে অশ্রু হাই তুললো। ইন্দিরা ঘরের কাজে মন দিয়েছে। অশ্রু একবার চোখ ভরে ইন্দিরাকে দেখে নিলো। চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে সত্যি করে দেখা হয় না; চোখের দৃষ্টি অনন্যলক্ষ্য হয়ে ওঠে বলে দেখাটা হয় সংকীর্ণ। কিন্তু যাকে দেখা যায় সে যদি চোখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক, উদাসীন থাকে, তবেই তাকে সম্পূর্ণ ও অসীম করে দেখা হয়। মানুষের আত্মার পরিচয় চোখের তারায় বা মুখ-মুকুরে– এ-মতটা বিকল্পেও সত্যি নয়। মানুষের আত্মার পরিচয় একমাত্র তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে-- গ্রীবা-সঞ্চালনে, কখনো-কখনো বা ডান হাতটি বাড়িয়ে দেওয়ায়। তাই ইন্দিরা যে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটা ময়লা নেকড়া দিয়ে আলমারির কাঁচ সাফ করছে—শুধু ঐ পেছন-ফিরে-দাঁড়িয়ে থাকাটুকুর মধ্যেই তার অসীম বেদনার ছায়া পড়লো। নেহাৎ যে আনাড়ি সে ও ইন্দিরার এই আলস্যমন্থর অবস্থান-ভঙ্গিটি দেখে ঠিক ঠাহর করে নিতে পারবে যে, সে এত শ্রান্ত যে, স্থূল বৃন্তবন্ধন ছেড়ে একটি ক্ষীণ বিলীয়মান সুগন্ধ হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারলেই বুঝি সে বাঁচে, সে এত ব্যর্থ যে চাঁদ অস্ত গেলে নিশীথ-রাত্রির নদীর যা অবস্থা, তারো ঠিক তাই। অশ্রু তাড়াতাড়ি খাতাটা মুড়ে রেখে ইন্দিরার খোঁপার ওপর ধীরে হাত রাখলো।

ব্যথা অশ্রু বোধ করতে পারে বটে, কিন্তু ঘেঁটে ঘেঁটে তাকে ফেনাতে তার লজ্জা হয়। তাই সোজা মুখের ওপর সে বলে বসলো: তোমার স্টাইলটি চমৎকার, ইন্দু। স্টাইলই নাকি ব্যক্তি—তারো চেয়ে বড়ো সত্য—হাতের লেখাটাই ব্যক্তিত্বের বড়ো সার্টিফিকেট। বার্নার্ড শ'র লেখা পড়েই মনে হবে যে তাঁর হাতের লেখা বিচ্ছিরি; তোমার হাতের লেখা দেখে নিশ্চয়ই মনে হবে যে, তোমার অনুভূতিগুলি মানুষের রক্তের চেয়েও গাঢ়, সমাহিত দুঃখের চেয়েও গভীর। তোমার কথারই আমি পুনরুক্তি করছি: তুমি অত বেশি গভীর হয়েছ বলেই কবি হতে পারলে না। তবু তুমি বেঁচে গেছ। তুমি লেখ।

কথাটায় অশ্রু এতো জোর দিয়ে বসলো যে ইন্দিরা উঠলো চমকে।

—হ্যাঁ, তুমি লেখ। সেই তোমার বিশীর্ণ জীবনের বসন্ত হয়ে উঠুক; শকুন্তলার-

তপস্যা যেমন প্রেমের. তোমার তপস্যা হোক তেমনি গভীর আত্মবিবৃতির। নিজেকে উদঘাটিত করা চাই - উলঙ্গ উজ্জ্বল উদার! কারু প্রকাশ কর্মে, কারু বা কর্মহীন আত্মোপলব্ধিতে। কেউ হাতে নেয় লাঙল, কেউ বা অস্ত্র, কেউ বা কলম। তুমি কলম নাও ইন্দিরা।

ইন্দিরা হাসলো। বললো—পাগল আর কাকে বলে? বিধাতা আমাদের হাতে আঙুল দিয়েছেন কলম বা তুলি ধরতে নয়. আলমারির কাঁচ সাফ করতে। আজ যদি কলম ধরে আঙুলের অপব্যবহার করি, তাহলে লক্ষ্মীর শাপে ঘরের কলসীর জল আমার শুকিয়ে যাবে। কতো আমার কাজ এখনো পড়ে আছে, জানো? যে আসছে তার জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হবে, ঝিনুক ধরে দুধ খাওয়াবার অভ্যাস করতে হবে, তার অসুখ করলে ডাক্তারের জন্যে জ্বরের তালিকা তৈরি করে রাখতে হবে। তা ছাড়া আমার আর কিছুই লেখবার নেই, অশ্রু। এককালে লিখেছিলুম, কারণ রমাপতির কাছে জবাবদিহি না দিয়ে আমি পার পেতুম না। রমাপতি কাছে ছিলো না বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে ছিলো। এখন আমি বন্দিনী. শুধু সংসারে নয় অশ্রু, আমার দেহের কারাগারে।

অশ্রু জিগ্গেস না করে পারলো না : রমাপতি কোথায় এখন?

ইন্দিরার মুখের ভাবের একটুও পরিবর্তন হলো না। তেমনি বললো—জানি না। তার খোঁজ করতে আমার স্পৃহাও নেই। আমার এত উদ্বৃত্ত শক্তি নেই অশ্রু যে, রমাপতিকে মনে-মনে চিরস্মরণীয় রেখে দু' বেলার দৈহিক কর্তব্যগুলোকে সুসম্পন্ন করতে পারবো। সঙ্ঘর্ষ বাধিয়ে তা সহ্য করবার মতো আমার মেরুদণ্ড বলশালী নয়। তাই রমাপতিকে আমি হারিয়ে যেতে দিয়েছি। ছেলেবেলার মা'র কোলে শুয়ে গাছের পাতার ফাঁকে যে-আকাশ দেখা যায় সে-আকাশকেও পরে মনে হয় ধুলো দিয়ে তৈরি। আমি রমাপতিকে ভুলতে পেরেছি বলেই তাকে ভালোবেসেছিলুম বলে আর অনুতাপ করি না।

এ-উত্তরে অশ্রু খুশি হবে কেন? তাই ফের জিগ্গেস করলো : কিন্তু যা তুমি দেহে-মনে একান্তরূপে বিশ্বাস করেছিলে তার থেকে এতো সহজে তুমি ভ্রষ্ট হলে কেন? আমি হলে – রমাপতির সঙ্গে না হোক, নিজে একা বেরিয়ে পড়তাম।

ইন্দিরার মুখে আবার সেই ম্লান হাসি। বললো—আর আমি একটিও কথা না কয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে নীচু হয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে ঘাতকের খড়্গ আহ্বান করলুম, অশ্রু। আমি না বলতে পারি কথা, না পারি করতে প্রতিকার। আজ মৃত্যু যদি আসে, আমি এমন দুর্বল যে, একেবারো বলবো না হয়তো : না, আমি মরতে চাই না। আমি ধীরে দু'বাহু প্রসারিত করে দেব! কিন্তু বলো, কেরোসিন ঢেলে

দেশলাইয়ের কাঠি ধরাও, ভয়ে আমার আগে থেকেই বাথ-রুমে ঢুকে দু'ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হবে। মরবো ভাবলে আমার ভারি তৃপ্তি লাগে, কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় আমাকে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকতে হবে ভাবলে আমার না পায় খিদে, না থাকে ঘুম।

ইন্দিরার কতকগুলি রুক্ষ চুল হাতে নিয়ে অশ্রু বললো—কিন্তু চেহারার এ কী ছিরি করে রেখেছো? মরবে কি করে? এ-রূপ দেখে যে যমেরো রুচি হবে না।

ইন্দিরার স্বর শুকনো, কঠিন হয়ে উঠলো: যে-যমের রুচিতে আমার দেহ এ-রূপ ধরেছে তার থেকে ত্রাণ পেলেও যে আমি বাঁচি। কিন্তু অত কথায় কাজ নেই অশ্রু, খানিক আগে বিমল এসে খবর দিয়ে গেল রাত্রের গাড়িতে কর্তা আসছেন।

অশ্রু উৎফুল্ল হবার ভান করলো: তাই নাকি? তাহলে তৈরি হতে হয়।

—তৈরি! কেন?

—বাঃ, একটা বাক্‌যুদ্ধ হবে না?

—বাক্‌যুদ্ধ কেন?

—তোমার এই দুরবস্থা কেন করলো? তার কি অধিকার ছিলো?

ইন্দিরা এবার হেসে ফেললে। বললো: দুরবস্থা তুমি কাকে বলছ? এই আমার ইহজীবনের লক্ষ্য, নারীজীবনের পরমার্থ যে! আমার স্বামী আমাকে আদর্শ গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রতি আমার এত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাঁর প্রতি একটিও নির্দয় উক্তি আমি সইবো না।

অশ্রু হেসে বললো: শুনে খুশি হলাম। কিন্তু প্রভাতের কোনো খবর আসছে না কেন বুঝতে পারছি না। ও এলে দিব্যি লাক্ষ্ণৌর দিকে ভেসে পড়তাম।

—আমার স্বামীর সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ না করেই?

—তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার নিজের লাভের জন্যে লড়াই করার আর কোনোই তো দরকার নেই। তোমার মতো আমি এমন সর্বস্ব দিয়ে লাভ করতে চাইনি বলেই ত তাকে আমি ছেড়েছি। তুমি তোমার স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে থাকো, আমি এমন মারাত্মক সুখ চাইনে, ইন্দিরা।

অশ্রু সরে যাচ্ছিলো, ইন্দিরা তার আঁচলটা ধরে ফেললো। বললো—তুমি এখানে আছ জানলে আমার স্বামী নিশ্চয়ই এক বিঘৎ হাঁ করে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠবেন। জান তো, তোমার প্রতি তিনি তত ভক্তিমান নন যে, গ্রীকদের মতো কোনো সংবাদ জিজ্ঞাসা না করেই পাদ্য-অর্ঘ নিয়ে অতিথিকে সম্বর্ধনা করবেন! সত্যিই, তৈরি থাকো, অশ্রু।

অশ্রু খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললো—এ তুমি নিশ্চয়ই স্বামীর প্রতি

নির্দয় ভাষা প্রয়োগ করছ। তুমি আজো তত বড় সতী হয়ে উঠতে পারোনি। দাঁড়াও, প্রভাতকে একটা চিঠি লিখে আসছি ফের। আরো কথা আছে।

ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে এলো। আটটা বাজতেই নির্মলের ট্রেন এলাহাবাদ পৌঁছুবে। বাড়িতে আসতে কতটুকুই বা পথ! ধরা যাক পাঁচ মিনিট—সঙ্গে মাল-পত্র থাকবে না বলে হেঁটে আসবারই সম্ভাবনা। আরো ঘণ্টা তিনেক বাকি আছে দেখছি। অশ্রু এতো সময় করবে কী? হঠাৎ মনে পড়লো বীণা ও বিমলের সঙ্গে তার আজ যমুনায় বেড়াতে যাবার কথা আছে। ফিরতে যদি রাত বেশি হয়ে যায়? তার চেয়ে প্রভাতকে একটা লম্বা চিঠি লেখা যাক। কেন যে এতদিন ও চুপ করে থেকে চিন্তিত করছে—

দরজায় টোকা পড়লো। বিমল বললো—তৈরি, অশ্রু-দি? বীণা এসেছে।

দরজা খুলে অশ্রু বেরিয়ে এলো। শুক্‌নো মুখে বললো—বিচ্ছিরি মাথা ধরেছে, তোমরা দু'টিতেই বেড়িয়ে এসো। আমাকে আরেক দিন নিয়ে যেয়ো।

অশ্রু-দির সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনায় দারুণ খুশি হয়ে বিমল আর বাগবিস্তার না করে চলে গেল। দাদা আসছেন, তাই ঘর-দোর ফিটফাট করে রাখতে বৌদি তো ব্যস্তই থাকবেন। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে বৌদির নৌকোয় বেড়াবার সখ নেই। বৌদি যে অশ্রু-দির সমবয়সী, এ-কথা কেউ শপথ করে বললেও বিমল বিশ্বাস করতো না; কেননা বিয়ে করলেই লোকে বুড়ো হয় কি না ঠিক নেই, তবে লোকে বুড়ো হলেই বুঝি বিয়ে করে। তবু, বৌদিও সঙ্গে যাবেন বলে বীণার অভিভাবকদের মত নেওয়া হয়েছে বলে, তাঁকেও একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। বীণা জানুক, নেহাৎ ভগবান সদয় বলেই বৌদিও মুখ ফেরাবেন।

যমুনায় বেড়াতে যাবে বৌদি? ফোর্ট থেকে ব্রিজ।

—দূর পাগলা!—বৌদি ঝামটা দিয়ে উঠলেন।

বিমল বীণার মুখের দিকে চেয়ে এমন একটু হাসলো যে, সেই আনন্দের রঙ বীণারো সারা দেহে বিকীর্ণ হয়ে পড়লো।

অশ্রু জানলা দিয়ে দেখতে পেলো বীণা আর বিমল টাঙায় গিয়ে উঠলো—কোচোয়ানের পেছনে—পাশাপাশি। দু'জনেই নীরব, স্পর্শ-বিরহিত। বসবার জায়গায় বীণা নিজের শাড়িটাকে পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেয়নি, নিজের চতুর্দিকে সংকুচিত করে রেখেছে—পাছে তার সামান্য একটু ছোঁয়া লেগে এই নির্বচন গভীরতার তপোভঙ্গ হয়। বিমল উদাসীন, যেন নিষ্ক্রিয় অসহযোগ আন্দোলনের নেতা! বীণা যে তার কাছে আছে, ঘিরে আছে নির্নিরীক্ষ্য বায়ুমণ্ডলীর মতো—এ-টুকু সে না দেখে ও না ছুঁয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেছে। কথা বলাটা অবান্তর,

ছোঁয়াটা ছন্দপতন। বিমলের এই সেই বয়েস যখন মাধুরীকে ভালোবেসে গল্পে মাধুরীর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনচ্ছলে মাধু বলে ডাকতে সাধ হয়। এই সেই বয়েস যখন বীণা যমুনার জলের ওপর নৌকোয় উঠে হঠাৎ ঠিক ঠাহর করতে পারবে না—কোন্‌টা বেশি সুন্দর, ইলিশ-মাছের আশের মতো চিকচিকে জ্যোৎস্না-ধোয়া জল, এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা, না, বিমলের মুখ। ব্যস্ততা নেই, প্রকাশ-প্রাচুর্য নেই, প্রশ্ন নেই, উত্তর নেই, লক্ষ্যাভিমুখী সন্ধান নেই শুধু নিজের অনুভূতিতে নিজেই নির্বাসিত। এই সেই বয়েস! টাঙা যতোক্ষণ না অদৃশ্য হলো অশ্রু জানলা ছেড়ে উঠলো না। খানিকক্ষণ এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে অশ্রু অবশেষে বাথ-রুমে গিয়ে ঢুকলো গাত্রমার্জনা করতে। বিকেলে স্নান করাটা তার একটা দৈনন্দিন বিলাসিতা। ইন্দিরার মতো শরীর নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে বসেনি। যে যৌবন বাইরের খোলস মাত্র তা খসে গেলে ওর দুঃখ নেই, কিন্তু যৌবনকে অতিক্রম করেও তার স্বাস্থ্য যেন এমনি দৃপ্ত থাকে। ও শুধু হৃদয়ানুভূতি দিয়ে নয়, দেহের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে আকাশ ও জীবনের আনন্দ পান করতে চায়। ওর এই দেহ মনকে আঘাত থেকে রক্ষা করবে, ম্লান হতে দেবে না—প্রাণকে বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে নিত্যকাল উন্মুখ, ধাবমান রাখবে—ওর এই স্বাস্থ্যই দেহকে কলুষিত হতে দেবে না। অশ্রু স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে কাপড় ছাড়তে লাগলো। বাথ-রুমের উঁচু জানলা দিয়ে পড়ন্ত রৌদ্রের সোনার একটা টুকরো গামলার ওপরে পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে। অশ্রু Donneএর ভক্ত—তাঁর অনেক লাইন তার মুখে-মুখে। এখন সে এই তিনটি লাইন আবৃত্তি করছে :

Full nakedness : All joys are due to thee ·
As souls unbodied, bodies unclothed must be
To taste whole joys.

রাত বেশি হয়নি। কিন্তু নিঝুম ঘুমন্ত পাড়াটার দিকে তাকালে মনে হয় ভোর হতে বুঝি আর দেরি নেই। অশ্রু সাদাসিধে একখানি শাড়ি পরলো; বিকেলের বাঁধা চুলগুলি খুলে ফেলে পিঠের থেকে দু'ভাগ করে বুকের ওপর মেলে রাখলো। রূপোর একটা ঝুমকো ফুল খোঁপায় গুঁজলে তাকে মানায় বটে, কিন্তু তাতে নেহাৎই চপলমতি কলেজের মেয়ে বলে মনে হয়। তাই সে ইন্দিরার বাগান থেকে একটি রজনীগন্ধার কলি ছিঁড়ে এনে খোলা চুলের মধ্যে আলগোছে আটকে নিয়েছে।

ইন্দিরা তোলা-উনুনে লুচি ভাজছে—স্বামীর-সেবায় তার বেশ হাত খোলে। স্বামীর আহার যোগাতে সে কার্পণ্য করবে এতটা অনুদার সে নয়। তাই রাতের জন্যে সেজে থাকতেও সে ভোলেনি! সতীত্বের একজিবিশানে ইন্দিরাকে গোল্ড

মেডেল দেওয়া উচিত। ক্যাপিট্যালিস্ট স্বামীর সুবিধের জন্যে সে নিজেকে সতী বানিয়ে বসেছে।

সোনার অবসর! অশ্রু তাড়াতাড়ি নয়—খুব আস্তে, সংস্কৃত করে বললে -- মন্থর পদক্ষেপে নির্মলের ঘরে এসে প্রবেশ করলো। নির্মলের ঘরটা একটু বাইরের দিকে একটা বারান্দা না পেরোলে সে-ঘরের নাগাল পাওয়া যায় না। সেই বারান্দাতেই ইন্দিরা একটা কাঠের টুলে আয়েস করে বসে স্বামী-আপ্যায়নের যোগাড় করেছিলো। অশ্রুকে সে দেখে ফেললো। জানতো বটে নির্মলের সঙ্গে অশ্রুর আজ রাতেই দেখা-করার জোর তাগিদ পড়েছে; খবরটা ইন্দিরার কাছে তার সন্তানধারণের চেতনার মতো মারাত্মক নয়। অশ্রু যেমন মেয়ে—এবং তার সঙ্গে ওর যতটা ঘনিষ্ঠতা, তাতে তার গায়ে-পড়ে আলাপ করার ব্যাখ্যায় সে নির্লজ্জ বলে অভিহিত হতো না। তবু অশ্রুকে আজ যেন ওর কেমনতরো লাগলো। অশ্রুর মধ্যে আজ সবচেয়ে অত্যুগ্ররূপে প্রখর হচ্ছে এই—ও মোটেই আজ সাজ করেনি, নিতান্তই খেলো একটি শাড়ি, মোটা একটা শাদা ব্লাউজ—এবং চুলের আড়ালে সুশুভ্র একটি রজনীগন্ধার কোরক—রমাপতির প্রতি ওর কিশোরকালের প্রথম প্রেমের সলজ্জ অনুভূতির মতো। রজনীগন্ধা দেখে হঠাৎ রমাপতিকে মনে পড়লো বলে ইন্দিরার কাছে অশ্রুর এই নিরলঙ্কার চেহারা সন্দেহের কুয়াশায় কেমন-যেন ঝাপসা হয়ে উঠলো। ইচ্ছা হলো অশ্রুর আবির্ভাবের আগেই সে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করে।

বিয়ের আগে নির্মলের সঙ্গে অশ্রুর যে একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছিলো সেটা ইন্দিরা আগে অস্পষ্ট করে জানলেও অশ্রু এমন মুখচোরা বা লাজুক নয় যে, শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙালী মেয়ের মতো মূঢ় আত্ম-সমর্থনের চেষ্টায় তা ফিকে বা ফাঁকা করে তুলবে। বরং সে এমন স্পষ্ট ও প্রখর যে, রঙ ছড়িয়ে ব্যাপারটাকে বিচিত্র করে বর্ণনা করে সে নিজের চরিত্রকে শ্লাঘ্য বলেই সপ্রমাণ করতে চেষ্টা পেয়েছে। অন্যের কাছে যেটা হতো জঘন্য সেটা অশ্রুর কাছে নিতান্তই নগণ্য, বরং উল্টো করে স্কুলপাঠ্য রচনার ভাষায় সেটা তার আত্মোপলব্ধির সোপানস্বরূপ! নির্মল যে তাকে দুই হাতে ঘৃণায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো সেকথা গম্ভীর হয়ে বলতে সে মনে বেশ জোর পায়, এবং যে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো তারই দুয়ারে অবতীর্ণ হয়ে সে নতুন করে বন্ধুতা প্রার্থনা করে! ব্যাপারটার মধ্যে স্বাভাবিকতা কিছুই নেই—প্রস্তাব শুনে ইন্দিরা হেসেছিলো মাত্র, কিন্তু বাস্তবে অশ্রুর এই উদ্যোগ দেখে তাকে আশীর্বাদ করতে ওর হাত উঠলো না। বরং যে লোক একদিন একটি মেয়ের এত সব অসদাচার ও অবরতার বিরুদ্ধে নিজের পুরুষত্বকে দুর্দাম রেখেছিলো সেই তার স্বামী, একথা জেনে

ইন্দিরার গৌরবের আর সীমা রইলো না। স্বামীর কাছে সে সশরীরে নিজেকে বলি দিয়েছে মাত্র—এই চেতনাটাকেই সে হঠাৎ আজ রূপান্তরিত করে নিল : স্বামীর চরিতার্থতার জন্য সে সাধ্বী ও পতিব্রতার মতো নিজেকে স্বেচ্ছায় ও সপ্রেমে উৎসর্গ করেছে। দেহের যতো সব বাঁধা-বিধান আছে তার থেকে একচুলও তার বিচ্যুতি ঘটেনি ;—মন একটা বাজে বিলাসিতা, তাকে বেশি দিন পুষিয়ে রাখার খরচ পোষায় না। অতএব—

মৃত রমাপতি, তুমি মৃত। তোমার ছায়া আমরা দেখেছিলাম ইন্দিরার মন-মুকুরে - সে-আয়না চৌচির হলো। তোমার মূর্তিও তাই বিখণ্ডিত—এই অবমাননা তুমি সয়ো না। তোমাকে আমরা সময়ের নদীতে বিসর্জন দিলাম। তুমি এখন কোথায় আছ, সামান্য কোনো ইস্কুল-মাস্টারি করবার অবকাশে ইন্দিরার মতোই অপ্রয়োজনে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছো কি না - সেই সব অবান্তর বিষয়ের খোঁজ করে তোমার লৌকিক অস্তিত্ব প্রমাণ করা একেবারেই বৃথা, রমাপতি। আমাদের রমাপতি আজ মরলো - সেই রমাপতি সূর্যের আলোতে বেশি কাল স্বপ্রকাশ থাকে না, সেই রমাপতি অনবধানে নারীর জীবনে একবার মাত্র পদার্পণ করে।

ইন্দিরার আজ বিধবা-বেশ। দেখবে এস। সীমন্তে সিন্দুর - শৃঙ্গারভূষণ ; পায়ে আল্‌তা, দু'হাত-ভরে তার আভরণ। পরনে মারহাঠি গরদের শাড়ি, ব্লাউজ-পিস্‌টা দিব্যি খাপ খেয়েছে বাহু দুটি লীলা-বলয়িত ; দুই চোখে ভাবী মাতৃত্বের মধুরতা! তুমি তার এ বিধবা-বেশ দেখো না। তোমার কাছে সে গণতোষিণী।

ইন্দিরার এতক্ষণে ঠাহর হলো অশ্রুর এই আকস্মিক আবির্ভাবের পেছনে একটা গূঢ় অর্থ আছে। সহসা কলেজের বন্ধুর প্রতি তার এই অনুরাগের কোনই মানে হয় না, এর সঙ্গে আরেকটি উত্তেজনা ছিলো। সেটা যে কার প্রতি, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা একটু কামড়ে ইন্দিরা ঠিক ধরতে পেরেছে। অবশ্যি অশ্রুও সেটা সোজাসুজি খুলে বলেছিলো —কোথাও তার বাধেনি। সে নাকি দেশভ্রমণে বেরিয়েছে ; মাঝ-পথে থেমে সে তার অন্যতম শিকারের জন্যে কয়েকদিন ওৎ পেতে থাকবে—তারপর দু'জনে একসঙ্গে লাহোরের দিকে ভেসে পড়বার আগে সে ইতিমধ্যে একা নির্মলের সঙ্গে মরা প্রেমটাকে একটু ঝালিয়ে নেবে মাত্র। দেহসুখ-কাঙাল স্বামীর প্রতি ইন্দিরার স্নেহ জ্যাম্‌-এর মতন ঘন ছিলো না বলে অশ্রুর প্রোগ্রামটা তার কাছে গোড়াতে মনঃপূত হয়নি, এমন বলা যায় না। মেয়ে যেমন বেহায়া—ইন্দিরা এখন রীতিমত বর্বর ভাষায় ভাবতে পারছে—তার পক্ষে এই দুর্নীতিটা অশোভন নয়। কিন্তু সে যখন স্বভাবের ব্যতিক্রমে একেবারে তপস্বিনীর বেশ পরে নিঃশব্দে অতিমন্থর পা ফেলে-

ফেলে স্বামীর ঘরের দরজার পর্দাটা সরালো, তখন নিমেষে ইন্দিরার চোখে সমস্ত ঘর-বাড়ি যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো। এটা কেন যে তার সইলো না বলা কঠিন। শুধু যে সে অশ্রুর আচরণ মার্জনা করলো না তাই নয়, স্বামীর প্রতি তার প্রতিদিন এই অবহেলাকেও সে ক্ষমা করতে পারলো না। সামান্য লুচি ভাজতে ভাজতে হঠাৎ কোথা থেকে তার এত মমতা উথলে উঠলো যে শুধু স্বামী নয়, অনিচ্ছাধৃত ভাবী সন্তানকে পর্যন্ত তার রমণীয় লাগছে। কি জানি কি ভেবে ইন্দিরা চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়লো, নিজের দিকে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিলো—সত্যিই সে সুন্দরী, এবং সে-সৌন্দর্য সে মা হবে বলে।

এটা সত্যিই ভারি আশ্চর্য। কিন্তু মেয়েমানুষের পক্ষে আশ্চর্য আর কী আছে! তারা রঙ-বদ্‌লানো সন্ধ্যাকাশ। তাদের মনের ঘড়ির কাঁটা চলতে বন্ধ হলে দম দেবার জন্য তাদের আর ব্যস্ততা থাকে না। একটা ধরা-বাঁধা সীমার মধ্যে নিজেকে কোনো-রকমে খাপ খাওয়াতে পারলেই তারা বাঁচে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এমনি থামতে না পারে ততদিন তাদের যত-সব ফ্যাশান : কেউ বলে ভালোবাসি, কেউ বলে বিয়ে না করে পি-এইচ. ডি. হবে।

বস্তুত ইন্দিরার এই মনোভাবের ব্যাখ্যাও একটা নিশ্চয় আছে। পুরুষ নারীকে যেমন করে চায় তাকেও ঠিক তেমনি ভাবেই ধরা দিতে হয়। যেখানে মেয়েরা নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব দেখাতে গিয়েছে সেখানেই তার এমন একটা রোগ হয়েছে যেটাকে শুদ্ধ করে বললে বলতে হয় হিস্টিরিয়া। তাই কোনো কোনো পুরুষের কাছে নারী দেবী—কল্পনা-কায়া, যেমন নারীতৃপ্ত সন্তান-পরিবৃত দান্তের কাছে বিয়াত্রিচে ছিলো! কারু কাছে সে পিশাচী নারীর তখন পিশাচী না হয়ে উপায় ছিলো না, পুরুষ তাকে তেমনি করে চেয়েছে। কেউ চায় মেয়ের মাঝে একটা হাবা-গোবা ছেলেমানুষি ভাব, মেয়ে তাই অবিকল নকল করে সংসারের চোখে সাফল্যের সার্টিফিকেট নেয়; কারু কাছে নারী শুধু একজোড়া জঘন, কারু কাছে বা মূর্তিমতী অস্পৃশ্যতা। একটা প্যাটার্ন না পেলে তার মুক্তি নেই,—যে-রকমেই হোক একটা প্যাটার্ন-মাফিক জীবন না পেলে সে হয় অকারণে পিকেটিং করবে, নয় ধুয়ো ধরবে বিয়ে করবো না। তরল জল রাখবার জন্যে পাত্র চাই। জলের কি রঙ আছে? পাত্রের রঙ তার রঙ। মেয়ের কি নাম আছে? একমাত্র নমুনা-ই তার নাম।

ইন্দিরা একবার ভাবলো পর্দা সরিয়ে ও-ও ঢুকে পড়বে কি না। স্বামী বাড়ি পৌঁচেছেন প্রায় আধঘণ্টা হলো, কিন্তু এরি মধ্যে অশ্রু কেমন তৈরি হয়ে নিয়েছে। আর ও না গেল ছুটে কুশল প্রশ্ন করতে, না করলো একটা প্রণাম। নরকেও ওর জায়গা হবে না।

অশ্রু পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো নির্মল চাকরের হাতের ওপর ডান পা-টা তুলে দিয়ে জুতোর ফিতে খোলাচ্ছে। ঘরে আলো যথেষ্ট ছিলো না। এমনি স্তিমিত ফিকে আলোর সঙ্গে একটি ম্লানমুখী মেয়ের বোধ করি একটা নিকট সাদৃশ্য আছে— নির্মল তো প্রথমটা থমকে গেল। তবু মুখখানিকে যেন ভারি চেনা-চেনা লাগছে, ভুরুর হাল্‌কা টানটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা, লঘু গতিতে সামান্য দ্রুত চলার অনায়াস ভঙ্গিটি যেন নিজের নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে ছন্দ-মেলানো। চাকরের হাত থেকে পা-টা সরিয়ে নিয়ে নির্মল লাফিয়ে উঠলো : তুমি, অশ্রু? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? তুমি এখানে? এলে কবে?

অশ্রু ধীরে বললো—তোমার কাছে আজ এলাম। এইমাত্র। কী জানি, বোধ হয় স্বপ্ন হয়েই।

নির্মলের এখন এ-সব অবান্তর কথায় কান দেবার সময় নেই। সে চাপা খুশিতে মুখটা লাল করে বললে—হঠাৎ তুমি এত কাছে? আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

আঁচলের তলা থেকে শুভ্র হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে অশ্রু বললো—আমাকে ছুঁয়ে দেখ, আমি শরীরী, বেশ স্থূল. নিরাকারা কল্পনা নই।

নির্মল হেঁচকা-টানে শু-দুটো টেনে ফেলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লো : এই মাত্র আসছি, জামাকাপড়গুলো এখনো ছাড়া হয়নি। একটু দাঁড়াও।

—বসি। বলে অশ্রু একটা চেয়ারে বসলো। বললে—আরো একটু দেরি করে আসতে পারতাম বটে, কিন্তু দেরি করার মতো ধৈর্য আমার শেখা হলো না। তুমি আজ আসবে বলে বিকেলে স্নান করলাম, চুলগুলি পিঠের ওপর প্রসারিত করে রাখলাম। বাগান থেকে এই পরিচ্ছন্ন ফুলটি তুলে এনেছি। অশ্রু চুলগুলির গ্রন্থি থেকে রজনীগন্ধার ছোট্ট কুঁড়িটি আলগা করে আনলো : যেন বঞ্চিত তাপসী ফুলটি! নির্বাককুন্ঠিত। আমার মতো প্রগল্‌ভতা ওর নয়। কিন্তু যাই বলো, ওরই মতো মনটা এমন লঘু ও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কী বলব? তুমি কেমন আছ?

—আমাদের আবার থাকাথাকি! দাঁড়াও, বাথ-রুম থেকে চট করে মুখ হাত-পা ধুয়ে আসি। তুমি যে এসেছ ইন্দিরা জানে তো?

—মানে, আমি আজ এসেছি নাকি? ইন্দিরা জেনে বুড়ো হয়েছে।

—বেশ, ভালো কথা। তুমি এসেছ, আমার কী যে ভালো লাগছে। আমি একটুও আশা করিনি কিন্তু। আচ্ছা। এই বলে নির্মল পর্দা ঠেলে পাশের স্নানের ঘরে চলে গেল।

অশ্রু একা। সমস্ত ঘরে ধূসর সন্ধ্যাছায়া। মিলনশেষের প্রথম ক্লান্তির মতো ঘন। এটি বুঝি নির্মলের বসবার ঘর। ভারি ফিটফাট, বাহুল্যবর্জিত। ছত্রিশ ইঞ্চির ছোট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবল, পিঠের আধখানা পর্যন্ত তোলা ছোট একটি ঘোরা-চেয়ার, টেবলের ওপরে দু' তিনখানা মোটা-মোটা অঙ্কের বই, অঙ্কের কাগজ-পত্র। দেয়ালের তাকে ব্রঞ্জের একটা বড়ো মূর্তি—মুণ্ডহীন। অন্ধকারে ঝাপসা। মূর্তিটা প্রশস্ত, দুর্দ্ধর্ষ। আবছায়ায় এইটুকু তার আভাস। এতো বড়ো ঘরে নির্মল নিজের জন্যে এইটুকু স্থান মাত্র অধিকার করে আছে—চারিপাশের শূন্যতাটা যেন কর্ম দিয়ে ঠাসা; সেই শূন্যতাটা আলস্যাবকাশের প্রকাশ নয়। ঘর থেকে অধিবাসী সম্বন্ধে ধারণা হয়, যেমন সংসর্গ থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা চরিত্র বিচার করে। এক পলকে এ ঘর দেখে কে না বলবে যে নির্মলের মনে ভাবাকুলতার কণামাত্র কুয়াশা নেই, তার মন ফাল্গুনের রৌদ্রের মতো খটখটে, ছুরির ফলার মতো প্রখর। তেজস্বী ঋজু উজ্জ্বল! সারা ঘরের আবহাওয়ায় একটা নিবিড় তেজোময়তা আছে। সেটা অশ্রু যেন স্পর্শ করতে পারে। একটা দুর্নমনীয় কাঠিন্যের তেজ, কিন্তু সে-নিষ্ঠুরতার মাঝে কোথায় যেন একটি অন্তর্লীন মাধুর্য!

বড়ো একটা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে মাথার চুলগুলি মুছতে মুছতে নির্মল ঘরে ফিরে এলো। আঁচলের খুঁটে সমস্ত বুক ঢাকা পড়েনি, স্ফীত স্ফার বক্ষ—প্রেয়সীর যোগ্য উপাধান। পা দুটি নগ্ন, সিক্ত অঙ্গ থেকে সদ্যস্নানের শান্ত গন্ধ আসছে। স্নান করবার পর পুরুষকে যে এমন জ্যোতিঃস্নিগ্ধ ও সুন্দর লাগে এটা অশ্রুর জানা ছিলো না। সে চেয়ারটাতে স্থির হয়ে বসে রইলো।

খানিকটা লাইম্-জুস্ চুলের মধ্যে রগ্ড়ে নিয়ে নির্মল হেসে বললো—প্রসাধনটা তোমার সামনেই সেরে ফেলি। কি বল? আমার এই বর্বর বেশ দেখে তুমি আহত হয়ো না। বলে লুঙ্গির মতো খাটো করে পরা কাপড়টার প্রতি সে ইঙ্গিত করলো।

অশ্রু প্রশ্ন করে বসলো: আমি আসবো এমন আশা একটুও করনি কেন?

প্রশ্নটা শুনে নির্মল থামলো; জিজ্ঞাসায় একটু যেন অনুযোগের অনুনয় আছে। হেসে বললে—আমি পৃথিবীতে আশাই কিছু কম করি, অশ্রু। তা পূর্ণ হবে না বলে নয়, আশা করবার মধ্যে চিত্তের ক্ষণিক অব্যবস্থা ঘটে। অযথা অতখানি শক্তি ব্যয় করতে ইচ্ছে হয় না।

অশ্রু চোখ নামিয়ে বললে—কিন্তু চোখের জানলা দিয়ে মন যদি বারে-বারে উঁকি মারতে থাকে তখন চোখ বুজলেই অবাধ্য মনকে শাসন করা হয় না। তোমার মনে আমার আসন নেই বলেই তোমার আশাও নেই।

ততক্ষণে নির্মল জামাটা গায়ে দিয়েছে। অতিরিক্ত চেয়ারটিতে বসে সে স্বচ্ছ

হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে তুললো : যাকে বর্জন করেছি তাকে আহ্বান করবার ভাষা থাকে না। যদি বলো, আশাও ছিলো না। কিন্তু আমার কাছে ফের ফিরে আসবার তোমার কি কোনো প্রয়োজন ঘটেছে ?

সন্ধ্যায় স্নায়ুগুলো অত্যন্ত স্নিগ্ধ হয়েছে বলেই অশ্রুর কথায় তীক্ষ্ণতা নেই। সে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর পা দুটো একটু ঘসে বললে– তোমার যেমন আকাঙ্ক্ষা নেই, আমারো তেমনি প্রয়োজন ঘটে না। ইচ্ছাই আমার বাহন—সরস্বতীর যেমন হাঁস।

—লক্ষ্মীর যেমন প্যাঁচা। নির্মল একটা সহজ রসিকতা সংবরণ করতে পারলে না : তোমার ইচ্ছাটা পেচক জাতীয়-ই।

অশ্রু চোখ তুলে বললে-- তুমি আমাকে আজো অপমান করবে নাকি ?

নির্মল অস্থির হয়ে উঠলো : ছি ছি, না না, সে কী কথা, সে কথা নয়। আমার কথাগুলোই অমনি বুনো। তুমি আজ আমার অতিথি—তোমাকে অপমান করব কী ? ছি! ওটা একটা ছেলেমানুষি করলাম মাত্র। এত বুদ্ধি রেখে এ-কথাটি বোঝ না ?

বোঝে, কিন্তু তবু কথার সুরে কোথায় যেন বিদ্রূপের খোঁচা আছে। অশ্রু বললে —বর্জন আমিও তোমাকে করেছি ; সে-গৌরবের ভার তুমি একা নিলে চলবে কেন ? কিন্তু বর্জন করেছি বলেই তোমাকে বিস্মৃতিতে বিসর্জন দিতে হবে আমার বন্ধুতা এতটা অনুদার নয়। বুঝলে ?

নির্মল নড়ে বসলো ; টিনের ছোট বাক্স খুলে একটা ইজিপশিয়ান সিগারেট ধরালো। বললো,—তাহলে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু আজো যদি জমাট নিরেট অশ্রু নির্ঝরবন্যার মতো উদ্বেল হয়ে উঠতো, তাহলে আমার আর পার ছিলো না ; আশার চেয়ে সে-ভয়ই আমার বেশি ছিলো। যাক, আমিও এখন মুক্তকণ্ঠে একটু কবিত্ব করি। জানো, অশ্রু, জীবনে দু'টি জিনিস ফিরে আসে না : এক, মৃত শৈশব, আর প্রথমা প্রিয়া।

কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করে অশ্রু শুধোল : আমি কি তোমার প্রথমা প্রিয়া ?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে নির্মল বললে– তুমি অমন সোজা করে প্রশ্ন কর কেন ? এ তোমার মারাত্মক দোষ। আমি এখন এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেব ? একটা সিগারেট খাবে তো খাও।

—না, এখন খাবো না। অশ্রুর স্বর ভারি ঘোলাটে !

নির্মল বললে—চুল সিঙ্গল্ড করনি ? বড়ো চুল রাখাটা তো সেকেলে, কালিদাসি আমলের।

অশ্রুর উত্তরো নির্মম : পুরুষের মনোহরণ করতে দীর্ঘ চুল আমাদের দেশে এখনো

প্রশস্ত। ইউরোপে যদি কোনো দিন যাই এবং কোনো প্যারিসিয়ান যদি আমার গায়ের এই শ্যামল রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাকে প্রার্থনা করে, আমি তাকে খুশি করতে তখন না-হয় চুল ও পোষাক খর্ব করে ফেলবো। আমার সময় আছে।

—হ্যাঁ, আছে। কিন্তু একবার চুল ঘাড়ের তলায় এনে ছেঁটে ফেললে দেশে ফিরে তাকে ফের গজিয়ে আবার কোনো বেচারা বাঙালী যুবককে মুগ্ধ করতেই যা সময় লাগবে। তা, বেশ! প্রভাতকে ছেড়ে প্যারিসে যাবার মতলব আছে নাকি?

—আছে বৈ কি। প্রভাতো সঙ্গে যেতে পারে।

—প্রভাত যাবে? প্যাসেজ জোটাবে কোত্থেকে? অল্প টাকার কেরানির এত মুরোদ! অবশ্যি, প্রভাত যদি যথেষ্ট পণ নিয়ে কোনো বাঙালী মেয়ের কুলরক্ষা করে! তখন তার বউ তাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবে কেন?

অশ্রু খিট্‌খিট্‌ করে উঠলো: সে-ভাবনা তোমার না করলেও চলবে। কিন্তু আমি যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও। তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোবেসেছিলে?

নির্মলের মুখে সেই ক্ষণস্থায়ী হাসি—যে-হাসি মুখকে প্রসন্ন করে না, অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে একটা কঠিন দৃঢ়তা রেখে যায়: এ-প্রশ্নের একটা উচ্চারিত উত্তর আছে নাকি? তুমি কিছুই অনুভব করতে পারো নি?

অশ্রু স্পষ্ট করে বললো—আমি অনুভবে বিশ্বাস করি না, আমি উচ্চারণ চাই।

—এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমার মিললো না। তুমি কর্মে প্রবল, প্রতিজ্ঞায় প্রখর হতে পার, প্রকাশে তোমার একটা অপরিমিত উদ্বেগ থাকতে পারে, কিন্তু যখন ভাবি অনুভব তোমার ফিকে, তরল—তখন তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি না, অশ্রু। এই আমার স্পষ্ট উত্তর।

অশ্রু খানিকক্ষণের জন্য কোনো কথা কইলো না। নির্মল ফের বললে আচ্ছা, সত্যি করে তুমি কাউকে ভালোবেসেছ? তুমি প্রভাতকে কি এত ভালোবাস যে তার প্রেম না পেলে তুমি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে একেবারে একাকিনী হয়ে যাবে? তোমার অন্তরে বৈধব্যের সেই বৈরাগ্যবোধ আছে? তোমার হয়ে আমিই উত্তর দিচ্ছি: নেই। যে-প্রেমে একপ্রবণতা আছে, যার অনুভবে মানুষ বিরহের অন্ধকার থেকে বিশাল আকাশের সৃষ্টি করে—সেই প্রেম তোমার আছে? কতগুলি ফাঁকা কথার মূলধনে এ জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে বসো না।

অশ্রু হেসে বললে—বেশ কবিতা করছিলে, কিন্তু শেষ দিকে ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো ঐ নীতিবচনটুকু না আওড়ালেই আমি হাততালি দিয়ে উঠতাম। কিন্তু আমার কথা আমিই বলবো। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি আমাকে তোমার জীবনের অসতর্ক কোনো মুহূর্তে একটুও ভালোবাসনি?

নির্মল বললে—ঐ চার অক্ষরের শব্দটা আমার কাছে আগাগোড়া গ্রীক। ওটার সংজ্ঞা নেই।

—কেন, উচ্চারিত উত্তর নাই-বা দিলে, গাঢ় করে অনুভবও করোনি কোনোদিন?

—বোধ হয়, না। আমি ভালোবাসা বুঝি না, ওটা যৌবনের একটা রঙিন বিকার মাত্র। তাই সে-বিকারকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করবার জন্যেই আমি বিবাহের পক্ষপাতী। দৈহিক কামনাকে সুন্দর ও সংযত করতে পারলেই তা প্রেম এবং সে-প্রেমে সংসার ব্যবস্থিত হয় বলেই তা সমাজের নামান্তর। সমাজকে আঘাত করতে গেলেই যে-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, নেহাৎ সহজ অঙ্কের নিয়মানুসারে সেই আঘাত নিজের ওপর ফিরে আসে - প্রেমের শান্তি তাতে ব্যাহত হয়। তাই সমাজকে লঙ্ঘন করতে গেলে প্রেমেরো স্খলন ঘটে; তখন সেটা মনে হয় উৎপাত—প্রণিপাত নয়। তখন তার নিপাত হলেই বাঁচা যায়। নিউটন গতি সম্বন্ধে যে-থিওরি করেছিলেন, গোড়ায় তাঁর hypothesis ছিলো হয়তো নরনারীর অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতির দৃষ্টান্তটা। কিন্তু বড়ো বড়ো জিনিস নিয়ে তর্ক করতে গেলে খিদে আমার আরো বেড়ে যাবে। ইন্দিরাকে ডাকি।

অশ্রু বাধা দিলো: ডাকবেখ'ন। কিন্তু অসামাজিক প্রেমে যে প্রেমের আয়ুক্ষয় হয় এমন একটা মত স্থির করলে তো আমাকে দেখে, আমার সংস্পর্শে এসে, তাই না?

—হয়তো হবে। বিবাহের অতিরিক্ত কোনো প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই। প্রেমকে বিবাহের সীমার মধ্যে বিস্তারিত না করলে সেটাকে আমার কাছে ব্যভিচারের মতোই দৃষ্টিকটু লাগে।

অশ্রু ডান হাতটা তুলে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু আমার প্রেমটা তো তোমার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে একটা পরীক্ষা ছিল? আমার সঙ্গে দু'দিন না মিশলে তো আর তুমি এমন ভুঁইফোঁড় পাত্রি হতে পারতে না?

—না।

অশ্রু এতক্ষণে একটা কথা পেলো: আমারো তাই সে-পরীক্ষা; আমিও তাই জীবনে লাখো লাখো বার পরীক্ষা করছি; হয়তো প্রত্যেক বারই হারবো, কিন্তু তাতে আমার শক্তিক্ষয় হবে না, বরং সংকল্পের সঙ্গে সকল শঙ্কা দূর হয়ে যাবে। আমি কাকে প্রেম দিয়ে কৃতার্থ হব সে-বিচার পাড়ার পাঁচজনকে করতে দিলে আমার অস্তিত্বের মর্যাদা থাকে কোথায়? সে-বিচার আমিই করবো—বহুতর পরীক্ষার মধ্যে, বহুতর অকৃতকার্যতার মধ্যে। বুঝেছ?

—বুঝলুম। কিন্তু তোমার অন্ধ বিচারেই যে পরিপূর্ণতম সুফল হবে তার কোনো গ্যারান্টি আছে ?

অশ্রু বললে—তবু সে-বিচার আমার বিচার। মিল্‌টন্‌কে তুমি অন্ধ বলবে কিন্তু অন্ধ চোখেই তিনি হারানো প্যারাডাইজ খুঁজে পেয়েছিলেন।

—তোমার উৎপ্রেক্ষাকে আমি উপেক্ষা করি। প্রেম একটা কায়াহীন মাদকতা মাত্র—

কথা কেড়ে নিয়ে অশ্রু বললে—তাই প্রেমকে লোকে বলে অতীন্দ্রিয়। আমি অবিশ্যি বলি শরীরী সুর।

—কিন্তু প্রেম যেখানে পরীক্ষাসাপেক্ষ সেখানেই সে লোভী, সেখানেই তার অন্তহীন কদর্যতা। আমি অত কথা বুঝি না অশ্রু, একটা উল্কার জীবন কামনীয় নয়।

—কিন্তু উল্লাসের : তার সর্বনাশটা দেখবার মতো।

—কিন্তু সেই সর্বনাশ জীবনে স্বীকার করে নেবার মতো তোমার ধৈর্যশীল বৈরাগ্য আছে ?

—সেটা আর বৈরাগ্য নয় বন্ধু, সেটা অবসান।

এমনি সময় ইন্দিরা প্রবেশ করলো খাবার নিয়ে। ডিস্‌টা টেব্‌লের ওপর রেখে সে নির্মলের পা ঘেঁষে মেঝের ওপর বসে পড়লো। এই যাচিত সান্নিধ্যের নতুন একটা অর্থ নির্মলের কাছে হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অশ্রুর একবার বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো : আচ্ছা তুমিই তোমার স্ত্রী-র পূর্ব ইতিহাস জানো ? কিন্তু মনের চিন্তাটা জিভের ডগায় এসে মুখর হবার আগেই নির্মল বললে—এই দেখ ইন্দুকে। বিয়ের আগে এক অসামাজিক প্রেমের নেশায় মাতোয়ারা হয়েছিলো। সেটা নেহাৎই মিথ্যা, অবাস্তব। এমন অবাস্তব রঙিন স্বপ্ন হয়তো প্রত্যেক যুবক-যুবতীরই দেখতে হয়। না, ইন্দু ? নির্মল হো-হো করে হেসে উঠলো।

অশ্রুর দু'কান রাঙা হয়ে উঠলো। বললে—শিগ্‌গির এর প্রতিবাদ কর, ইন্দিরা। রমাপতির প্রতি তোমার প্রেম মিথ্যা, অবাস্তব ? এ অবমাননা তুমি সইবে ?

উঠে সুইচটা টেনে আলো জ্বেলে নির্মল বললে, এ-ঘরে ইন্দিরার স্বামী উপস্থিত আছেন এ-কথা তুমি ভুলে যেও না, অশ্রু। ইন্দিরা তাঁর পাতিব্রত্যের অবমাননা করবেন না।

ইন্দিরাকে চুপ করে থাকতে দেখে অশ্রু মুহূর্তে ঘেমে উঠলো। বললে—তুমি ইন্দিরাকে তার অটল প্রেমের সিংহাসন থেকে ভ্রষ্ট করে তাকে একটা মহান রাজ্য থেকে বিচ্যুত করেছ। তুমি তার কী ক্ষতি করেছ তার পরিমাণ স্বার্থান্ধ পুরুষ হয়ে তুমি বুঝবে না।

নির্মল ফের চেয়ারে বসে স্নিগ্ধস্বরে বললে—তুমি যদি ইন্দিরার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু না হতে, আর আমার সঙ্গেও যদি তোমার কোনো ব্যাপার না ঘটতো, তাহলে আমি সোজা বলে বসতাম : তোমার সঙ্গে আমি আমার স্ত্রীর ক্ষতি-বিচার করতে চাইনে, অশ্রু। কিন্তু এর উত্তর ইন্দিরাই দেবেন। তোমার আমি কি ক্ষতি করেছি, ইন্দু?

ইন্দিরা স্বামীর পায়ের আরো কাছে ঘেঁষে এসে বললে—আমার আবার কী ক্ষতি করবে?

—কী ক্ষতি করবে! অশ্রু দীপ্ত হয়ে উঠলো : ইন্দিরা নেহাৎই ভীরু ও দুর্বল বলে বাক্যে বা ব্যবহারে অস্ফুটতম প্রতিবাদও করতে পারলো না। স্বচ্ছন্দে সমাজের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিলো। তুমি তার যে-অপমৃত্যু ঘটিয়েছ, তার যে-মহান ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট করেছ– সমাজ যদি তার বিচারের ভার নিত—

—তাহলে আমার ফাঁসি হতো। এই বলতে চাও, অশ্রু? কিন্তু আমার তিরোধানে তুমি সত্যিই কি সুখী হতে, ইন্দু?

ইন্দু নিরীহ ইঁদুরের মতো চোখ লুকোল।

অশ্রু বললে এর তুলনায় ঢের বেশি সুখী হতো। তার সৌন্দর্য তার শিল্পানুরাগ তার কবিস্বপ্ন তোমার বিবাহের কয়েদখানায় দীর্ঘদিনের উপবাসে শুকিয়ে গেছে। তোমার এই তুচ্ছ প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে সে স্বর্গ খোয়াতো না, বরং অমরত্ব লাভ করতো। পড়নি তার ডায়েরি?

নির্মল আশ্চর্য হলো : ডায়েরি? আমি মানুষের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় চাইনে। নেপথ্যের ইন্দিরার প্রতি আমার চোরাদৃষ্টি নেই, অশ্রু। কিন্তু (ইন্দিরার প্রতি) এ-সব কী বলছে?

ইন্দিরা হেসে বললে—ও একটা পাগলি। যা মুখে আসে তাই বলে।

অশ্রু থামবে না : ও এই নিরানন্দ বিবাহজীবন চায়নি, সন্তান চায়নি, তোমাকে চায়নি।

—পাগলি! নির্মল আবার হো হো করে হেসে উঠলো : চায়নি? ইন্দিরার শরীরের প্রতিটি রক্তকণা চায়। নারীর প্রেমে যদি কোনদিন কোনো মাহাত্ম্য থাকে তবে সে মা হবে বলে, পুরুষের মনোহারিণী হবে বলে নয়।

ইন্দিরা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার সর্বাঙ্গে কোথা থেকে সৌন্দর্যের ঢল নেমেছে। সে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে—তোমার এই সব কী হচ্ছে, অশ্রু? ভদ্র সমাজের সৌজন্যের সীমা মেনে চলবে না, নাকি?

অশ্রু পরিষ্কার গলায় বললে—আর বেশি ভদ্র হয়ে কাজ নেই, ইন্দিরা। ঢের

হয়েছে। অন্তরে যাকে সত্য ও সর্বস্ব বলে স্বীকার করেছ সামান্য শরীরের ভয়ে তাকে অমর্যাদা করো না। শরীর তো তোমার কাছে ছু'মুঠো ছাই—এইবার জীবনে পরম স্বযোগ এসেছে—যা তুমি চাও না, তা তুমি নেবে না, না, কক্‌খনো নয়।

নির্মল হঠাৎ ইন্দিরাকে নিজের কাছে ধীরে টেনে আনলো, তার ঈষন্নমিত পিঠটি নির্মলের কাঁধের কাছে এসে নির্ভর পেলো। ইন্দিরার আলুলিত চুলের ওপর ধীরে একখানি হাত রেখে নির্মল বললে—কী তুমি চাও না, ইন্দু? আমাকে?—তারপর ম্লান একটু হেসে অশ্রুর দিকে সঘৃণ দৃষ্টি ফেলে বললে—কী যে কে চায় না, বুঝে ওঠা বড় মুশকিল। চাই না বলে হাত সরিয়ে নিতে-নিতে যে-টুকু পেয়ে বসি সেও আমাদের সকল চাওয়ার অতীত হয়ে দেখা দেয়। হয়তো ইন্দু আমাকে কোনোদিন চায়নি, কিন্তু আজ? ও-কথা মুখেও এনো না, অশ্রু। কে কখন কী চায় কেউ বলতে পারে না।

স্বামীর এ-উত্তরটা বড্ড মোলায়েম হলো, ইন্দিরার তা মনঃপূত হলো না। তার ইচ্ছা হচ্ছিল লৌকিক বিনয়ের সীমা লঙ্ঘন করেই তিনি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে অশ্রুকে ক্ষতবিক্ষত করে দেন। তাই সে ক্ষতিপূরণ করলে: তোমার মতো সবার আর মৃগী-রোগ হয়নি, অশ্রু। উচ্ছৃঙ্খলতাই জীবন নয়, সে একটা নিদারুণ কালিমা! এক কথায় সেই অসতীত্ব।

অশ্রু বললে—প্রেমহীন দেহদানের চেয়ে সে মহৎ। আমাদের এমনি অন্ধ দৃষ্টি যে জীবনচাঞ্চল্যকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে আমরা তৃপ্তি পাই। প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারবো, কিন্তু পরীক্ষা করতে গেলেই যত গোল বাধে। ভুল করলে ইন্দিরা, আজকের এই ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যাকালটাই তোমার জীবনের শেষ সত্য নয়। এই অলস কর্মবিমুখ স্বামীসম্ভোগকাতর জীবনই তোমার স্বর্গ ছিলো না, এর চেয়েও বিস্তৃত স্বর্গের তপস্যা করবে বলে বিধাতা তোমাকে দেহ ভরে রূপ দিয়েছিলেন, বুক ভরে অতৃপ্তি।

—আর পেট ভরে ক্ষুধা। নির্মল হেসে উঠলো: এ অবান্তর বিষয় নিয়ে তর্ক আর আমাকে পোষাবে না, অশ্রু। আমার দারুণ খিদে পেয়েছে। তুমিও একটু সাহায্য কর না? আশা করি এখনো এত প্রাচীন হওনি যে পুরুষের সামনে খাবার জন্যে দাঁত বের করতে কুণ্ঠিত হবে।

—প্রাচীন?

—নিশ্চয়ই। নইলে বিয়ে করে সুস্থ সংযত পরিমিত জীবন-যাপনের আদর্শটাই তো অতি-আধুনিক। তোমার ও-মতটা তো এ-শতাব্দীর প্রথম দশকের। কুড়ি বছর আগেকার।

—আমি ঐ পেঁপেটা খাবো বটে, কিন্তু সেটা তোমার মতে সায় দিচ্ছি বলে নয় কিন্তু। তুমিও একটু নাও, ইন্দিরা।

খাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঘরের আবহাওয়াটা তরল হয়ে উঠলো।

বলা নেই কওয়া নেই নির্মল হঠাৎ এক টুকরো নাসপাতি ইন্দিরার মুখের কাছে তুলে ধরলো। জিনিসটা ইন্দিরার কাছে নতুন, একেবারে অপ্রত্যাশিত! এতগুলি দিন-রাত্রির স্মৃতিপটে স্বামীর এমন একটি ভঙ্গির রেখাপাত হয়নি কখনো। আরেকটু হলে ঐ আঙুল দু'টি অধর দিয়ে ছুঁয়ে ইন্দিরা প্রথমস্পৃষ্টা কুমারীর মতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো হয়তো। স্বামী যেন তাঁর ঐ দু'টি আঙুলে করে স্বর্গের সমস্ত ক্ষুধা তুলে ধরেছেন!

নাসপাতির টুকরোটি ইন্দিরা শব্দ করে চিবোতে লাগলো। নির্মল বললে-তোমার পরীক্ষার জটিলতা প্রণিধান করতে পারি তেমন অণুবীক্ষণ আমার নেই। সে আমার ত্রুটি হয়তো, মানলুম। কিন্তু কোনো পরীক্ষারই পরিণাম নেই, কোনো প্রেমই সংসারে প্রামাণ্য নয়। মাঝের থেকে কপালে ঘটে অশেষ দুর্গতি, নিত্য পদস্খলনের দুঃসহ কলঙ্ক।

অশ্রু মুখ গোমরা করে বললে,—মানুষের অভিধানে শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে, নির্মলবাবু। পরিণামের চেয়ে পরীক্ষা বড়ো, যেমন প্রাপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি, সমাধানের চেয়ে অনুধাবন।

ইন্দিরাকে নির্মল আরো কাছে টেনে আনলো। তার স্বর গদ্‌গদ্ হয়ে উঠেছে: সন্ধান বুঝি না, অশ্রু, বুঝি সন্ধি; শ্রান্ত পরীক্ষার চেয়ে প্রতীক্ষাহীন শান্তিই আমাদের বেশি কামনীয়। এই পরিপূর্ণ প্রগাঢ় বিশ্রামের মধ্যে কী যে প্রয়াসহীন বিরতির মাদকতা রয়েছে তা তুমি বুঝবে না। আমি বুঝেছি বলেই কথাটা খুলে বলতে গিয়ে আরো ঘোরালো করে তুললুম। নিয়ত সন্ধানের নিষ্ফল অধৈর্যে স্নায়ুমণ্ডলীকে অকারণে উত্তেজিত করতে হয় না, অতৃপ্তির বিষবাষ্পে চিত্ত কলুষিত হয় না, নির্জল মেঘের মতো মন লঘু হয়ে উড়তে থাকে। দম্পতির সংকীর্ণ শয্যার দু' প্রান্ত থেকে দু'টি বিপুল জগতের জন্ম হতে থাকে—এক ধরিত্রী, অন্য স্বর্গ। মধ্যে মাত্র আকাশের ব্যবধান। ধরিত্রী হচ্ছে পুরুষ—স্বর্গ নারী; আর আকাশ হচ্ছে দুয়ের মধ্যেকার বিস্তীর্ণ প্রেম!

ঠোঁট দুটো কুঁচকে অশ্রু বললো—হাতি!

বলেই আচম্বিত ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

ঘরের সমস্ত শূন্যতা নিমেষের মধ্যে ইন্দিরাকে গ্রাস করলে। সে-নিস্তব্ধতা যেন কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি। এর পর স্বামীর সঙ্গে যে সে কী ব্যবহার করবে, কী করলে

যে এমন চমৎকার সন্ধ্যাটার সঙ্গে একটা সুরসঙ্গতি থাকে সে প্রথমে বুঝে উঠতে পারলো না। এতোখানি অবকাশ পেয়ে সে যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো। স্বামীর মুখের দিকে সে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে একবার তাকালো—কিন্তু সে-মুখ নিরেট স্থূল, উদাসীন। খানিক আগে যে-মুখে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ছিলো, সহসা তা যেন দুপুরের রোদের মতো রুক্ষ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তিনি যে কেন ইন্দিরার সান্নিধ্য বিস্মৃত হয়ে টেবলের উপরকার একটা মোটা বই নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বোঝা কঠিন। পেটের মধ্যে নাসপাতির টুকরোটা এখনো হজম হয়নি।

মাথা তুলে নির্মল বললো—জানলাটা বন্ধ করে দাও দিকিন, ঠাণ্ডা আসছে।

ভয়ে ভয়ে ইন্দিরা বললে—হাসনুহানার ঝাড় থেকে কেমন গন্ধ আসছিলো।

একটু বিরক্ত হয়ে নির্মল বললে—গন্ধ শুঁকতে হলে বন্ধুকে বাইরে নিয়ে বেড়াও গে।

এর পর হয়তো ইন্দিরা আর দাঁড়াতো না; কিন্তু নির্মল আবার ডাকলে: দেখছ না ব্র্যাকেট থেকে আমার টাই-শুদ্ধু কলারটা পড়ে গিয়েছে; চোখে দেখতে পাও না? তুলে রাখ।

ইন্দিরা তুলে রাখলো।

নির্মল ফের বললে—রাত্রে আমার স্যুপটা তৈরি করে রেখো। আর শোন, রামসেবককে বলে কিছু চুরুট আনিয়ে দাও তো। সিগারেট আর খাবো না। দোকানটা যেন চিনে যায়। আর—হ্যাঁ, তোমার এই বন্ধুটি কবে এসেছে কেন এসেছে, কবে যাবে?

ইন্দিরা তিক্তস্বরে বললে—বন্ধু তো সে তোমারো। জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।

—পারতুম হয়তো। কিন্তু তোমাকে কিছু বলে নি? একটা সাধারণ ব্যাখ্যাও তার নেই?

—না।

ইন্দিরা চলে যাচ্ছিলো।

—আচ্ছা, তুমি তো ডায়েরি লেখ। আমাকে কিছু বলনি কেন?

ইন্দিরা বললে—সাহিত্যে সব জিনিস যেমন লিখতে হয় না, তেমনি স্বামীকেও সব কথা বলতে নেই!

কিন্তু ইঙ্গিতেই হচ্ছে আর্টের নিশানা। আমি সে ইঙ্গিত আজ পেলুম, ইন্দু।

আবার ইন্দু! ইন্দিরা কুণ্ঠিত হয়ে শুধোল: কিসের?

—তুমি আমাকে চাও না, ভালোবাস না।

চোখ, মুখভাব, দেহের সমস্ত অটল ভঙ্গি দিয়ে ইন্দিরা স্থির কণ্ঠে বললে—মিথ্যা কথা।

অভিমানের স্বরে নির্মল বললে - আর এখন ডায়েরি লেখার প্রয়োজন নেই কি না, তাই ঠিক আজকের দিনটিতেই যে আমাদের বিবাহিত জীবনের একটি বৎসর পূর্ণ হলো তা তুমি স্বচ্ছন্দে ভুলে আছ। অথচ, আজকের দিনটি যাতে না হারাই তারি জন্যে আমি লাক্ষ্ণৌ থেকে সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।

—তাই নাকি? ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে দেখলো—সত্যিই তো। আজকের তারিখ। ইন্দিরা এতোক্ষণ এই কথাটিই ভুলে ছিল কি করে? সে হয়তো তক্ষুণি স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সজ্ঞানে চুম্বনভিক্ষা করতো, কিন্তু নির্মলের মুখ আবার নিরেট স্থূল হয়ে উঠেছে। ইন্দিরা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কী করবে ভেবে পেল না।

ইন্দিরা তবু আশা হারায়নি। আজ যে তাদের বিবাহের বার্ষিকী, এ-সংবাদটি স্বামী মনে রেখে ইন্দিরাকে আকাশে তুলে দিয়েছেন। অথচ এই স্বামীর প্রতিই বিমুখ ও বিদ্রোহী হবার জন্যে অশ্রুর দিক থেকে তার ওপর এমন জোর তাগিদ এসেছিলো। ইন্দিরা যে তার তর্জনীটা উদ্ধত করেনি সে তার স্ত্রী-জীবনের পরম সৌভাগ্য। সে এতোদিনে বাঁচলো বোধ হয়।

ইন্দু! নামকে সংক্ষিপ্ত ও হ্রস্ব-উকারান্ত করার মধুর আর্টটা বাঙালী রচনা করেছে ভালোবাসতে গিয়ে। যেন ঐ হ্রস্বতার আড়ালটুকুতে একটা অসীম ইশারা—যেন সবটুকু বলা হলো না বলেই যা বলবার তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝিয়ে দিলে; ঠিক কবিতার অর্থের মতো। শব্দে নেই, ছন্দে নেই, ভাববিন্যাসে নেই, ভাষা-প্রসাধনে নেই—কোথায় যে আছে ধরা কঠিন, কিন্তু আছে যে, সেটা জলের মতো সোজা। যার নাম সত্যি-সত্যিই ইন্দিরা—কাকারা যাকে ইনদ্রি বলতেন—তাকে ইন্দু বলে ডাকার মাধুর্য যে অক্ষরসন্নিবেশে নয়, উচ্চারণভঙ্গিতে নয়, তা বেশ বোঝা যায়; কিন্তু ঐ ছোট ডাকটিতে ভীরু বুক যে রসরোমাঞ্চে শীতল হয়ে আসে তারো মতো সত্য আর নেই কিছু।

বিয়ের পর এক বছর পূর্ণ হলো বটে—কিন্তু স্বামী তাকে সম্বোধনে কৃপণতা করতে গিয়ে কোনোদিন এমন অজস্র হয়ে ওঠেন নি। এ যদি জনসাধারণের নেপথ্যে কামকেলির নিভৃত রঙ্গমঞ্চে উচ্চারিত হতো তাহলে ইন্দিরা তাকে আমোল দিতো না; কিন্তু এ আর উচ্চারণ নয়, ঘোষণা। নির্জন নিরালায় নয়—তৃতীয় ব্যক্তির সমুখে—এই তৃতীয় ব্যক্তিটিই প্রেমিক-প্রেমিকার নিকষ-পাথর। এ তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায়ই এর

বিচার, এর মূল্যধারণ—এ তৃতীয় ব্যক্তিই সমাজ, সংস্কার, মনস্তত্ব। এ আর কেউ নয় —স্বয়ং :অশ্রু, যার কাছে বিবাহ অর্থ শুধু বি-পূর্বক বহ্-ধাতু ঘঞ্; সমাজ অর্থ জীবনীশক্তির শ্মশান-ভস্ম। ভালোই হলো—অশ্রুরই মুখের উপর সে বলে আসতে পেরেছে—স্বামীই তার জীবন-সঞ্জীবনী; সে যে আজো বিধবা নয় এই তার ত্রিলোক-পতিত্বের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। আজ ঐ সামান্য একটি সম্বোধনের বাতায়ন দিয়ে বহুবিস্তৃত আকাশের মুক্তি তাকে ঘিরেছে। সে স্বামীর জন্যেই দেহধারণ করেছিলো, এ জ্ঞান তার নশ্বর দেহটাকে উষার হাতের স্বর্ণ-বীণা করে তুললো। স্বামীর পূজায় এ-দেহকে সে ধূপের মতো দগ্ধ করবে—এর চেয়ে সার্থকতাময় আত্মসমর্পণের গরিমা মেয়ে হয়ে সে ভাবতে পারে না। স্বামীই তার দেহ, তার দেশ, তার দেবতা।

তুমি বিদ্রূপ করছ, রমাপতি। কিন্তু যে-প্রেমে বন্ধন নেই, সন্তান-জননের প্রয়োজন নেই, নব জীবনের মাঝে নিজেকে সম্প্রসারণ নেই, সে-প্রেম মদ খাবার কাচের বাসন মাত্র। মদ ফুরোলে বাসন যায় ভেঙে। ক্ষুধার্ত সময়ের একটি মাত্র সুদীর্ঘ চুমুকে তোমার সে-মদ ফুরিয়ে গেছে। মদে আছে মত্ততা, সুধায় আছে স্বাদ! মদে আছে রোগ, সুধায় আছে রুচি। তোমার সে-আদর্শ হাটে বিকোত না বলেই মর্চে পড়ে অব্যবহৃত অবস্থায় ক্ষয় হয়ে যেত রমাপতি, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে তুমি হতে অসুস্থ, আমি হতুম কুৎসিত। সে আর তপস্যা না হয়ে হতো খালি তাপ —আলোক থাকতো না বলে তৃপ্তিও থাকতো না। সুর কেটে গেলে রেশ থাকতো না; শ্বাস ফেলতুম বটে, কিন্তু আশ্বাস কই!

তার চেয়ে ইন্দিরা এখন স্বামীর জন্যে সযত্নে বিছানা পাতুক। অশ্রু পোড়ার-মুখিটা বেজায় বেড়েছে - নিতান্ত বেহায়া বলেই না তার স্বামীর কাছে এমন একটা খেলো নাটুকেপনা করতে সাহস পেলো। ওর কপালে আছে গভীর দুঃখ। ব্যবসা করতে বসে যে ছিনিমিনি খেলে তাকে হতেই হবে দেউলে। ধারে মাল বিকোয় না। মূলধন উড়িয়ে যে জুয়া খেলতে বসে তার মূল্যও সে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু একদিন ও ঘা খাবে, একদিন ও শান্ত হবে, একদিন ওর সোনার স্বপ্ন প্রথম প্রেমের মোহের মতোই বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাবে দেখো। সেই দিনটি পর্যন্ত ইন্দিরা যেন বাঁচে!

দু'মিনিটে ইন্দিরা স্বামীর বিছানা ও নিজের মন গুছিয়ে নিলো। প্রথম জীবনে ভালোবাসার সে যে-স্বাদ পেয়েছিলো সে শুধু স্বামী-প্রেম চাখবার একটা আপাত-পরীক্ষা মাত্র। আজ মনে হলো রমাপতি গৌণ, নির্মল গৌণ বড় তার স্বামী; যে তাকে বিধি অনুসারে সন্তানের জননী হতে দেবে যার অন্নপ্রাশনে পাড়ার পাঁচজনকে ডাকলে তাঁরা পাত পাড়তে কুণ্ঠিত হবেন না। দর্পণে ইন্দিরা আবার নিজের ছায়া দেখলো—প্রথম যৌবনে রমাপতির সংসর্গে এসেও সে এতো বড়ো সম্ভাবনার স্বপ্ন

দেখেনি। সে ভাবী মা, পরাধীন ভারতবর্ষের আসন্ন স্বাধীনতা, ঋষিকণ্ঠের আদিম সূক্তি! তার পীবর বুক, স্থূল উদর, ভাবাকুল চোখ, ভার-মন্থর দেহ—সব কিছুই তার চোখে নবীনতর আবির্ভাব!

চাকরকে ডেকে অশ্রুর খাবার তার ঘরে পৌঁছে দিতে বলে ইন্দিরা বই নিয়ে পড়তে বসলো। বইয়ে মন দেয় কার সাধ্য। কিন্তু আজ আর বাইরে পাইচারি করবার মানে হয় না। সে আজকের রাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সমস্তগুলি মুহূর্তের তলানি পর্যন্ত পান করবে। রমাপতির যে-দিন বাইরে থেকে এসে ইন্দিরার বন্ধ জানলায় টোকা দেবার কথা, সে-দিনো সে এমন স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করেনি। আজ না আছে সংশয়, না বা সমস্যা। আজকের প্রতীক্ষার ফলটা অবশ্যম্ভাবী জানা সত্ত্বেও কেন জানি রহস্যময়। প্রথম রাত্রির বধূর মতো একটি রোমাঞ্চময় আশঙ্কানুভূতি, একটি সুখসুনিবিড় তন্দ্রাচ্ছন্নতা। অথচ কতো সহজ। নিশ্বাস ফেলবার মতো অনায়াস।

স্বামী হাত-মুখ ধুচ্ছেন - এইবার শুতে আসবেন। স্বামীর এই শুতে আসাটা ইন্দিরার মনে হতো একটা নির্মম দস্যুতা, পরস্বাপহরণের ছদ্মবেশ। কিন্তু আজ মনে হলো মালিনীর কুঞ্জে মালাকার আসছে - বরবেশে চোর। শয্যা যূপকাষ্ঠ নয়, সুখতীর্থ! ইন্দিরার দেহ বলি নয়, নৈবেদ্য।

ইন্দিরা বুঝেছে—কেন তার এই স্বাভাবিকতা, এই দৃঢ় সংযত সুস্থতা। তার স্বামীর তুলনায় সে কত ছোট, কত নীচে পড়ে। সেই বরং এতদিন নিজের ইচ্ছাকে দমন করে রেখে নিজেকে মিথ্যে করে উপক্রন্তা ভেবেছে; স্বামীর কর্তব্যে সে তার নিজের কামনা-মাধুর্যকে সঞ্চারিত করেনি বলে অপরাধী সে নিজেই। তার ইচ্ছা এতো দিন সীতার মতো নির্বাসিত ছিলো—রমাপতির আদেশে। অনুরোধ নয়, আদেশে। তার জন্যে তার স্বামী দায়ী নয়। ওষুধ রোচক না হলেই রেচক নয় প্রমাণিত হয় না। সে মূর্খ, হীন, একচক্ষু—সম্পূর্ণ অন্ধ হওয়ার চাইতেও তা immoral। তার স্বামী বীর, তপস্বী—দুর্বোধন তাঁর উপযুক্ত বিশেষণ।

সত্যি কথা বলতে কি, নির্মল যে অশ্রু-তে গলে পড়েনি, আজো তাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিলো—স্বামী-পূজার প্রথম পাঠ পেলো সে এই উদাহরণে। স্বামী তাকে নিয়ে দীর্ঘ ত্রিপদীতে কাব্য না করুন, স্ত্রীর প্রতি অমর্যাদার ঘৃণায়ই যে তিনি পরনারীর প্রেমকে সদর্পে লাঞ্ছিত করেছেন এ-গর্ব ইন্দ্রাণীরো ছিলো না। শুধু প্রত্যাখ্যান বা লাঞ্ছনাই নয়, উল্টে স্ত্রীর প্রতি সহজ কর্তব্যবোধ তার সম্পর্ককে এমন বড়ো বলে স্বীকার করা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতোই মহিমাব্যঞ্জক অথচ তার মতো ভাবপ্রবণ নয়। স্থির বুদ্ধি দিয়ে প্রণোদিত, সহজ

আত্মীয়তার দায়িত্বে দৃঢ়ীভূত সে-বিশ্বাস। অশ্রুর মুখ কালো হয়ে গেছে—নির্মল তার তারা। হোক দূর তবু অবিচল, হোক ক্ষীণপ্রভ তবু চিরস্থায়ী। নির্মল ভোগী কালিদাসের প্রবাসী নায়ক—যে বিরহ বোধ করে অন্তঃপুরচারিণী প্রিয়তমা স্ত্রী-র জন্য, যে তার পরিণীতা, প্র-ণীতা নয়।

নির্মল ঘরে ঢুকলো। অবাক—সমস্ত ঘরটি পরিপাটি ফিটফাট। তার দৃষ্টি সচরাচর এতো সূক্ষ্ম নয়—তবু ঘরটিকে ঘিরে যে একটি শুচি-স্মিতি রয়েছে তা তাকে আকৃষ্ট করলো। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে অযথা বাক্যব্যয় করা তার অভ্যাস নয়। দীর্ঘদিনের শান্তির পর যে এখন ঘুমুবে। ইন্দিরা রাত্রে খায়নি—আশা করেছিলো স্বামী একবার জিজ্ঞাসা করবেন : খেয়েছ? ও বলবে, না। তারপর উনি কি বলেন তাই শোনবার জন্যে ও কান পেতে থাকবে।

কিন্তু কান পেতে ইন্দিরা শুনতে পেলো স্বামী ইতিমধ্যেই ঠোঁট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করে গাঢ়স্বরে নাক ডাকাচ্ছেন। স্বামী যে শুতে এসে নাক ডাকান এ মর্মান্তিক সত্য কথাটাই সে এতক্ষণ ভুলে ছিলো। সংক্ষিপ্ত করে ইন্দু বলে ডাকার রস এই শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দের ঘায়ে মিলিয়ে যায়-যায়। কিন্তু,—এ কী ছেলে-মানষি। ইন্দিরা নিজের মনেই হাসলো।

কিন্তু আজকের রাতটি যদি সে এমনি করে হারিয়ে যেতে দেয়, তাহলে তার দাবী থাকে কী? এমন রাত কি যখন তখন আসে! এতোগুলি দিনরাত্রি নিষ্ফল প্রেমের পসরা বয়ে তবে এমন একটি সুখসমৃদ্ধ শান্তিময় রাত্রির সন্ধান মেলে। মরুভূমিতে কতো চোখের জল ফেলে তবে এমন মরূদ্যান চোখে পড়ে। লাভটাই তো বড়ো নয়, বড়ো হচ্ছে উপলব্ধি। তাই ইন্দিরা আজ স্বেচ্ছায় স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হবে।

ইন্দিরা বইটা মুড়ে রেখে ধীরে স্বামীর বিছানার ধারে এসে বসলো। আকাশে বুঝি সামান্য মেঘ করেছে—হাস্নুহানার ঝাড়টা গন্ধে গদ্‌গদ। সমস্ত পৃথিবীময় একটি বচনহীন স্তব্ধ নিরাকুলতা। ইন্দিরা ধীরে নির্মলের চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো।

নির্মলের পাতলা ঘুম—জেগে উঠলো। অস্বাভাবিক হয়তো, বা শ্রী-হীন! বললে—ঘুমুতে যাওনি যে।

ইন্দিরা বললে,—এমনি। ঘুম আসে না। তুমি ঘুমোও, আমি চুপ করে এমনি বসে থাকি।

নির্মলের স্বর কটু : না। পাশে বসে থাকলে আমার ঘুম হয় না। সমস্তটা দিন ট্রেনের ধকলে যারপরনাই নাকাল হতে হয়েছে।

ইন্দিরা তবু ওঠে না; পা দুটি দুমড়ে বিছানার ওপর উঠে বসে।

নির্মল বিরক্ত হয়ে বললে : এ কি ? তোমার খাটে গিয়ে শোও গে। বেশি রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে যে।

ইন্দিরা আরো একটু সরে এসে বললে—হবে না।

—হবে না মানে ? না, যাও। ঘুম না আসে, টেবলে বসে ডায়রি লেখ গে যাও। আমার থেকে তোমার যতো-কিছু ক্ষতি হয়েছে সে-সব দুঃখ তোমার রমাপতির কাছে নিবেদন কর গে। বলে নির্মল পাশ ফিরলো।

ইন্দিরা আবার ভুল করলে। উচিত ছিলো অভিনয় করা, কেননা তাকে গভীর করে অনুভব করে তার সত্যাবিষ্কার করবে ইন্দিরার পক্ষে এতটা ইতিহাস নির্মলের সংসারে জমে ওঠেনি। তাই তার উচিত ছিলো উচ্ছ্বাসের বশবর্তিনী হয়ে স্বামীকে জাহ্ন করা; প্রণামে চুম্বনে মিনতিতে শপথে মিথ্যাবাদিতায় প্রতিবাদে একেবারে একটা মেলোড্রামার মহলা দেওয়া। সে তা না করে বরং স্বামীর গা ঘেঁষে আরো একটু সরে এলো মাত্র। কিন্তু নির্মল সহসা স্ত্রীর স্পর্শ থেকে সংকুচিত হয়ে বললে—যাও, যাও, এখানে নয়—

নির্মল উঠে বসলো। রাগে ইন্দিরার নিচের ঠোঁটটি বৃষ্টি-লাগা ফুলের পাপড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠছে। তবু বললে—তুমি অশ্রুর কথা সব বিশ্বাস কর নাকি ?

নির্মল রুখে উঠলো : আমি কারু কথায় কিছু বিশ্বাস করে কাজ করি না। যেমন অশ্রু তেমনি তার বন্ধু। দু'টিই এক-গোয়ালের। যাও, আমাকে আর বিরক্ত করো না।

ইন্দিরা তবু ওঠে না। মৃদুস্বরে বললে—যখন কিছু শুনলে-ই তখন সবটাই শোনো। পথের বিচার না করে প্রাপ্তির বিচার করলে তোমাকে বুদ্ধিমান বলবো।

—তোমার কাছ থেকে বুদ্ধিমত্তার সার্টিফিকেট নেবার জন্যে আমি রাত জাগতে চাই না। দয়া করে তোমার স্পর্শ থেকে আমাকে মুক্তি দাও, রক্ষা কর।

ইন্দিরা এক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইলো। তবু বলতে হলো : আমার স্পর্শ কি এতই অশুচি ?

—নিশ্চয়। তুমি বিবাহিত হয়েও অন্যাকাঙ্ক্ষিনী। সামাজিক সামঞ্জস্যে তুমি একটা উৎপাত।

—মিথ্যা কথা। ইন্দিরা খাট ছেড়ে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো।

—তবে নিয়ে এস তোমার ডায়রি। যে-নারী দেহ ও মন ভাগাভাগি করে ব্যবসা

করে, তাকেও ব্যভিচারিণী বলেই আমি ঘৃণা করি। যাকে মন দিলে তাকেই যখন দেহ দাওনি, তখন যাকে দেহ দিলে তাকেও মন দিলে না কেন?'

ইন্দিরা বললে তুমি আমার মন চেয়েছিলে?

—মন আমি চাইনি, কেননা ওটা আমার পাওনা; দেহের মতোই আমার ক্রীত সম্পত্তি।

—মিথ্যা কথা।

—হোক মিথ্যা কথা। দয়া করে এখন আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়। আমাকে ঘুমুতে দাও, কালকে আবার আমার বেরুতে হবে।

—কিন্তু ডায়রিটা পড়-ই না। পূর্ব ইতিহাস খালি আমারই নয়, তোমারো ছিলো। তুমি যেমন তাকে অতিক্রম করেছ, আমিও তেমনি তাকে পথ চলতে খুইয়ে এসেছি। অতীতের প্রতি যেটুকু আমার অস্পষ্ট মোহ আছে সেটা শুধু আমার কাব্যানুভূতির প্রবলতা মাত্র। তোমার মন পাইনি বলেই অতীতকে নূতনতর করে সৃষ্টি করে আমার মনের ক্ষুধা মেটাতে হয়েছে—

—রক্ষা কর, মনস্তত্ত্বের আমানুষিক বিদ্যে আমার নেই। কিন্তু তুমি আমাকে সত্যিই স্বীকার কর?

—স্বীকার না করে উপায় কি? সেই স্বীকারের চিহ্ন আমার সর্বাঙ্গে।

—স্বীকারই কর, ভালো তো আর বাসো না?

—তুমি বাসো?

নির্মল স্পষ্টস্বরে বললে—না। আমাদের যাত্রাটা সমানতালে শুরু হয়নি। আমি বিয়ে করেছি বিয়েকেই বড়ো করে প্রতিষ্ঠিত করতে, তুমি বিয়ে করেছ সংসার-সংগ্রামে হেরে গিয়ে। আমার কাছে বিয়ে সংস্কার, তোমার কাছে সংহার। এ-যাত্রায় আবার ত্র্যহস্পর্শ আছে—সন্তান। এখেনে খালি স্বীকার-শপথেরই কথা ওঠে—ভালোবাসা বলে একটা ভূতও এখানে ছায়া ফেলে না।

ইন্দিরার স্বর গাঢ়: তবে?

—তবে! মীমাংসা, একটা সোজা সিদ্ধান্ত চাই। আমরা পরস্পরের প্রয়োজন-সাধক—দেহপ্রসাধন। সেই পরিচয়েই আমাদের সত্যিকারের আত্মীয়তা। কই, তোমার ডায়রি দেখি? বলে নির্মল উঠে আলমারি খুলে একটা মোটা খাতা বার করে সুধোল: এটা?

কয়েক পৃষ্ঠা উলটে যেতেই বুঝতে তার আর দেরি হলো না। দু'হাত দিয়ে খাতাটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

ইন্দিরাকে যেন কে চাবুক মারলে। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো: এ-কী!

—নির্লজ্জতারো একটা সীমা থাকতে হয়। বলে খাতার ছেঁড়া টুকরোগুলো নির্মল জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো।

ইন্দিরা আর টুঁ-টি করলো না। ধীরে নিজের খাটে গিয়ে বসলো। তবু একবার বলতে ইচ্ছা হলো হয়তো : খাতা ছিঁড়ে ফেললেই মনটাকে মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু বলে লাভ নাই। স্বামীর সঙ্গে মীমাংসা একটা করতেই হবে। সেইটেই তার সাধনা। লাগুক দীর্ঘ দিন, সে প্রতীক্ষা করে থাকবে।

নির্মল বললো—অশ্রুকে বলো সে যেন শিগ্‌গিরই এখান থেকে সরে পড়ে। তার সংসর্গ অন্তঃপুরের শুচিতার পক্ষে অনুকূল নয়।

ইন্দিরা বললো—বলবো।

—আর রমাপতিকে বলো সে মরেছে।

ইন্দিরা অল্প একটু হেসে বললো—বহুকাল। সে এমন মরেছে যে, তার একটি কণাও সমস্ত পৃথিবীর ধুলো ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নির্মল সরে এসে বললো—মনে রেখো তুমি আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের জননী, আমার অধিকৃতা, বশম্বদা।

ইন্দিরা দীর্ঘাকুল চক্ষু মেলে বললে—সেই সত্যই আমি লাভ করেছিলুম আজ। সেই সত্যই আমার সীমন্তের সিন্দুরের মতো আমার জীবনে উজ্জ্বল হোক। বলে ইন্দিরা দু-হাতে নির্মলের ডান হাতটা চেপে ধরলো

পালা হলো সাঙ্গ। প্রদীপও নিভলো। আবার নির্মলের নাকডাকা শুরু হয়েছে। ইন্দিরাও শুলো। খানিকক্ষণ ঘুম এলো না বটে। অল্প অল্প করে মেঘ ডাকছে। দূরে কোন গাছের পাতায় পাতলা একটু হাওয়ার কান্না। জানলার বাইরে জমাট অন্ধকার। গলা পর্যন্ত চাদরটা টেনে নিয়ে ইন্দিরা বাঁ-কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার মন হালকা হয়ে গেছে—আজকের এই রাতটা পুইয়ে গেলেই সে বাঁচে। ডায়রিটা নেই, অশ্রুকে কাল সে চলে যেতে বলবে—হ্যাঁ বলবেই তো—তারপর সে, তার স্বামী—আর তার সোনার ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, সে বাঁচবে বৈ কি

এক ঘুম পরে অশ্রু জেগে দেখলো বৃষ্টি হচ্ছে। দেশলাইটা জেলে শিয়রে টাইম্‌-পিস্‌-এ দেখলো পাঁচটা বাজে—বৃষ্টি বলে আলো ফুটছে না। আর ঘুমোয় না। জানলাগুলো মেলে দিয়ে সে চেয়ারে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে দিলো। তার মাথায় কি-যেন একটা ভাবনা ঢুকেছে। কিন্তু কোনো ভাবনাই অশ্রু তলিয়ে দেখতে শেখেনি। তবু মনে কে যেন তাকে একটা নাড়া দিয়েছে। সে কি প্রভাতকে

সত্যিই এত ভালোবাসে যে তাকে না পেলে ভাঙ-খোর শিবের মতো সমস্ত ভুবন চষে ফিরবে? সত্যি কথা বলতে কি, এ পাওয়া-শব্দটা নিয়েই অশ্রুর যতো তর্ক, যতো গরমিল। নিয়ম-কানুন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে যে-পাওয়া সে তো একটা শিকারীর পাওয়া—যেমন চিড়িয়াখানায় বাঘ, কয়েদখানায় কয়েদি। পাওয়ার বেলায় যদি দায়ের কথা ওঠে, তবে বিদায়, বন্ধু, বিদায়! পাওয়ার মধ্যে চাই মুক্তি, ফিরে-পাওয়ার সম্ভাবনা। সে-অর্থে নির্মলকেও অশ্রু হারায়নি। দেহ দিয়ে পাওয়াটাই যদি বড়ো, তবে গরম জলে এঁটো মুখ কুলকুচো করে খেয়ে ফেলাও স্বাস্থ্য। এই পাওয়াটাকে কায়েমি করতে গিয়েই বিয়ে হয়েছে ব্যাধি, আইন নিয়ে আয়ান ঘোষই ফুঁসতে থাকেন, রাই আর কানাই গেছে নিধুবনে। দেহ দিয়ে পাওয়ার কথাই যদি ধরো, তবে দেহের স্বাস্থ্যটাও বিচার কোরো। রাত কতটা জাগলে বদহজম হবে, ক'সিঁড়ি ভাঙলে হার্টে ধরবে কাঁপুনি, হিমে কতক্ষণ খোলা গায়ে থাকলে হবে প্লুরিসি, আয়ের দিক থেকে ক'টি সন্তান হবে কামনীয়। প্রভাত বে-হাত হলেই ভেউ-ভেউ করে কেঁদে-ককিয়ে কোনো স্বর্গ লাভ হবে নাকি? বৈধব্যটাই নারী-জীবনের কৌস্তভমণি! বিধবা হয়েছে বলে শারীরিক প্রক্রিয়া তার কিছুই বাদ পড়ে না, অর্থাৎ যেগুলো তার স্বয়ং-সাধ্য। সন্তানের সুস্থ ও স্বাভাবিক কামনাটাই তার পক্ষে কলুষ। এমন দিনো ছিলো যখন মেয়ের বিয়ে না দাও, সমাজ উঠবে নাক সিঁটকে; বিধবা বানাও, সমাজের মুখ বন্ধ। অশ্রুর আশ্রয় খালি প্রভাতের বাড়ির রোয়াকটুকুতেই নয়, সেটুকু কেন্দ্র করে সমস্ত বসুন্ধরা। সে-আশ্রয় থেকে সে যদি বঞ্চিত হয়, তবে, তাই বলে নিজেকেও সে বঞ্চিত করবে না। তার মন তখনো পিয়াসী, দেহ উন্মুখ। সে স্বস্তি চায় বটে, কিন্তু স্বপ্ন চায় না।

গভীরতাই হৃদয়ের সব কথা নয়; তার চাই বিস্তৃতি, তার চাই ব্যাপকতা। সমুদ্র গভীর বলেই সুন্দর নয়, প্রসারিত বলে। আকাশ মহনীয় তার নিরুত্তর রহস্যময়তায় নয়, তার অনন্ত অবকাশে! মরুভূমি তো প্রকৃতির নিরানন্দ বৈরাগ্যের ছবি, কিন্তু একটি শস্যঋদ্ধ ভূমিখণ্ড তার চেয়ে বেশি সুন্দর। সৌন্দর্যের অর্থ যদি কিছু থাকে তবে তার প্রয়োজনেই। কবির কাছে তা গ্রাহ্য না হোক, কিন্তু ভালোবেসে সংসারি করা আর কবিত্ব করা এক কথা নয়।

প্রেমের মূল্য বিরহে নয় বিহারে, বৈরাগ্যে নয় রাগের দু'রকম অর্থে—রঙ আর প্রীতি। তবে খালি প্রেমে খালি-পেট ভরে না বলেই একটু হিসেব চাই—সেইটেকেই যদি বড়ো করে বলি, নীতিশাস্ত্রে তার অতিস্তুতি চলবে। সেইটেই সংযম। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে নয়, দেহতত্ত্বের দিক থেকেই তার কীর্তন হওয়া উচিত।

কেননা সংযমেই থাকে সম্ভোগের স্বাদ, জীবনের ছন্দোবদ্ধতা। দেহ যাদের কাছে অশ্লীল, প্রেম ও পরমায়ুও তাদের কাছে মূল্যহীন। কিন্তু অশ্রুর কাছে দেহ হচ্ছে তীর্থ, গিরিস্খলিতা তটিনীর মতো তার চঞ্চল রূপপ্রবাহ—তাই তার চাই অপরিমেয় প্রেম, চাই তার অনবসায়ী আয়ু। এবং এর জন্যেই সংযম শুধু সৌখিন বিলাস নয়, ব্যায়াম—তাতে ক্ষুধায় আসে ধার, দেহে আসে আভা।

দু'মিনিটে অশ্রু মন ঠিক করে নিলো। নির্মলের সঙ্গে দেখা করে তার লাভ হলো এই, লাহোরের দিকে আর এগোনো গেল না। তাকে আবার ফিরতে হবে। কলকাতায়ই, ফিরতি-মেল্-এ। প্রভাতের কিছু একটা হয়েছে। আজকে যদি তার কোনো চিঠি বা টেলি না আসে, তবে বুঝতে হবে বেরোবার আগে তার পাঁজি দেখা উচিত ছিলো। আর এখেনে বসে-বসে জিরোবারই বা কী আছে আর? ইন্দিরাকে তো সে এক ধাক্কা মেরে সীতা-সাবিত্রীর বেঞ্চিতে তুলে দিয়েছে! এ তার একটা কীর্তি নয়। সে না হলে ইন্দিরা একা মই বেয়ে স্বর্গে উঠতে পারতো না; যাতে পড়ে না যায় সেই জন্যে তলায় থেকে তার ভার রক্ষা করতো কে?

'স্বামী তার কোনো ক্ষতিই করে নি।' অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে নিষ্ঠা ভেঙেছে, সন্তানকে অদূরবর্তী রেখে কাব্যানুরাগের মুখে দিয়েছে ছাই, দেহবীণাকে করেছে ভাঙা কুলো। নিজের ক্ষত ভুললো বলেই হয়তো সে ক্ষতি ভুলেছে। ইন্দিরা বাঁচলো। জীবনের বাকি ক'টা দিন ছেলের জন্যে কাঁথা সেলাই করে ও ধোবার হিসেব ঠিক মতো রেখে যেতে পারলেই সে উৎরে গেল। তার মরার পর নির্মল যদি একটা ইন্দিরা-নারী-মঙ্গল-সমিতি খাড়া করে চাঁদার খাতা নিয়ে বার হয় তখন ইন্দিরার জীবনী নিয়ে স্তুতিবচনের আর অন্ত থাকবে না, নির্মলের কীর্তিটাও হবে তাজমহলের সঙ্গে তুলনীয়!

চা নিয়ে চাকর এলো না, এলো ইন্দিরা নিজে।

কথা পাড়া মুশকিল। তবু বলতে হলো অশ্রুর: তোমার চাকরকে একবার পোস্টাফিসে পাঠাবো, একটা তার করবে। প্রভাতের খবর না পেয়ে ভারি চিন্তা হচ্ছে। যতদিন লোকটা আছে হাতের পাঁচও তারই প্রাপ্য। কি বল?

ইন্দিরা বললে— ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু আটটার আগে ডাক-ঘর খোলে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে অশ্রু বললে—তারপর? চোখে তার দুষ্টু হাসি: রাত্রে বেশ ঘুম হলো?

ইন্দিরাও হেসে বললে—আমার অনিদ্রা বলে কোনো উপদ্রব নেই। আমি না কবি না বা প্রেমিনী।

—কিন্তু প্রেতিনীদের রাত্রে ঘুম আসে না, যেমন আমি।

চট করে আর কি বলা যায় তাই ভাবছিলো। হঠাৎ যেন দু'য়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান নেমেছে। ইন্দিরার বিশ্বাস অশ্রুই ওকে আরেকটু হলে পথে বসিয়েছিলো, অশ্রুর বিশ্বাস তার অতটুকুন এগোতেই ইন্দিরা এ-জন্মের মতো পেলো স্নেহাই। ভূমিকম্পে বাড়ি যখন পড়লো না, তখন দেয়ালে যে-টুকু সামান্য চিড় ধরেছে তা মেরামত করে নিতে সময় লাগবে না। এ-বাড়িতে ইন্দিরার কুলুবে ঠিক।

টোস্ট চিবোতে চিবোতে অশ্রু একটা বইয়ে হঠাৎ মনোনিবেশ করলে।

ইন্দিরা বললে—যাই। তুমি পড়। উনি সকালে আবার কোথায় বেরোবেন, ওর জন্যে খাবার তৈরি করি গে।

শেষের কথাটা ইন্দিরা অমন জোর করে না বলে গেলেও পারতো। কারু জন্যে সকালে উঠে খাবার তৈরি করাটা বেবিলন-এর শূন্যোদ্যানের মতো তেমন কিছু নয়। ঘটা করে বলতে হয় বলো, স্বামীকে না ভালোবেসেও পূজো করলাম। পুষি-দিদিও তার স্বামীর জন্যে এমন-সব তপশ্চারণ করে যে, সতীত্বের গুণগ্রাম তাতে বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে দশটা ইন্দিরা কুড়ি হাতে পেরে উঠবে না। কিন্তু পুষি-দি পুষি-দি, ইন্দিরা ইন্দিরা। এইটুকুনই তফাৎ। পুষি-দির মনে স্বামীত্বের সমস্যা নেই, তাই তার কাছে ওর আত্মদান আত্মহত্যা নয়। ইন্দিরা তার ঢের পেছনে। আঁচলে আগুন চাপা দিয়ে সে তার মোমের ঘর সামলে চলেছে। তাতেই বা কম কৃতিত্ব কিসে? সে যে অসহায়। তাই বলো, অসহায়—যেমন ডেস্‌ডেমোনা; তাই তার মিথ্যা কথাটাও ঐশ্বরিক!

চাকরকে আর পোস্টাপিসে পাঠাতে হলো না। তার আগেই এলো সকাল-বেলাকার ডাক। অশ্রুর নামে একটা খাম আছে। প্রভাতের লেখা। অশ্রু খুলে ফেললো:

অশ্রু,

ছুটি পাওয়া গেল না। মার অসুখ সত্ত্বেও না। বৌয়ের অসুখ শুনলে ছুটি মিলতো হয়তো, কিন্তু বৌ কৈ? তাই এ-যাত্রায় আমি রইলাম পিছে। তুমি এখন কী করবে? যাবে না ফিরবে? না থামবে? আমাকে জানিয়ো।

কলকাতার রূপ দেখবে এসো—পূজোর কলকাতা! একটি প্রখরভাষিণী রক্তশ্রী নগরী। আমি অগত্যা তার প্রেমে পড়লাম। প্রভাত

ভালোই হলো। অশ্রু যেন এমনি একটা খবরের জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলো। তক্ষুণি টাইম্‌-টেবল্ খুলে দেখলো বিকেলের আগে ফিরতি-ট্রেনের সুবিধা নেই। চাকরকে সে নিজেই ডাকলো। এলো ইন্দিরা। অশ্রু বললে—চাকরটাকে ডাক তো। তার একটা করতেই হচ্ছে।

—কোথায় ? কেন ?

—প্রভাতকে স্টেশনে থাকতে।

—তুমি আজই যাচ্ছ নাকি ?

—আজই।

—লাহোর কি হলো ?

—মানচিত্র থেকে সরে পড়েছে।

—কলকাতায় যাবার এত তাড়া ?

হেসে অশ্রু বললে—আমার বিয়েটা পাকাপাকি করতে।

ইন্দিরার মুখ গম্ভীর : পাকাপাকির আর বাকি কি ?

—একটু বাকি আছে বৈকি। তোমার মতন যদিও শিগ্‌গির পাকছি না। যাক, জিনিস-পত্র গুছিয়ে ফেলতে হয়। বলে, অশ্রু চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত পা ছড়িয়ে একটা হাই তুললো।

ইন্দিরা বলল—একেবারে আজই যেতে হবে ?

—তোমার সাধ খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার সময় নেই। যা হোক, মনে খুব সুখ নিয়ে যাচ্ছি ইন্দিরা, তুমি স্বামী পেয়ে এতদিনে সুখী হয়েছ। মানে, হচ্ছ। মানুষ বদলাবে না, এটা বাড়াবাড়ি—বদলানো মানেই বৃদ্ধি। রমাপতি চিরকাল ভূত হয়ে কাঁধ জুড়ে থাকবে—ভবিষ্যৎকে এমন সংকীর্ণ করে রাখার পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। তুমি তোমার খ্যাতি ও ঐশ্বর্য নিয়ে মহত্তর হও। ভাষায় বেশ মুন্সিয়ানা হচ্ছে, না ? বলে, অশ্রু তার ব্যাগ গুছোতে বসলো। মুখে তার গুন্‌গুনানো চলেছে। এটা নাড়ে ওটা ফেলে এটা খোলে ওটা গুটোয়।

ইন্দিরা বললে—সত্যি তাই, অশ্রু। যে-পরিবর্তন জীবনে স্বীকার করলাম তাকে যেন কায়মনে অভিনন্দিত করতে পারি। সত্যি তাই।

অশ্রুও পুনরুক্তি করলো : সত্যি তাই। যেখানে শেষ সেইখানেই শুরু। জীবনের চাকা খালি ঘুরে চলেছে। সাধু ইন্দিরা, সাধু।

নির্মলকে সকালের ট্রেনে নাইনি যেতে হয়েছিলো। ফিরলো সন্ধ্যার একটু আগে। বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে আসতে সে অশ্রুর ঘরের দিকে চোখ না ফেলে থাকতে পারলো না। দরজাটা বন্ধ। বাইরে থেকে শেকল।

ইন্দিরা কালকের মতোই জলচৌকিতে বসে স্টোভে লুচি ভাজছে। নির্মল কাছে এসে শুধোল : অশ্রু ?

—বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল।

—গেল ?

নির্মলের প্রশ্নের স্বরে বিস্ময় আর হতাশা! কেন গেল—প্রশ্নটা যেন সমীচীন হতো না। টাই-পিনটা নাড়তে নাড়তে পরদা সরিয়ে সে ঘরে ঢুকলো।

ঘরটা যেন কেমন স্যাঁতসেঁতে। কেমন যেন খালি-খালি। ঐ চেয়ারটায় যেন কি ছিলো! যেন বড়ো বেশি স্তব্ধ। দেয়ালগুলো অতিমাত্রায় স্থির। টেব্‌লের ওপরকার বইগুলো বোবা। বাগানে রজনীগন্ধার একটি কলিয়ো ঘুম ভাঙেনি।

বাথ-রুম থেকে স্নান সেরে ঘরে এসে দেখলো সামনে ইন্দিরা—টেব্‌লের ওপর খাবারের ডিস্‌, চায়ের কাপ গুছিয়ে রাখছে; চুল আঁচড়ালো, জামাটা গায়ে দিলো, সিগারেট ধরালো। এখুনিই তাকে খাবার খেতে হবে। খাবার খেয়ে বই-খাতা-ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে বসতে হবে। সবই ঠিকঠাক। চুপচাপ তেমনি।

না।

দু' পা হেঁটে ফিরে সে ইন্দিরার দিকে তাকালো। ইন্দিরা আজ দারুণ সেজেছে—তবু বোকার মতো যে খোলা-চুলে গিঁট বেঁধে রজনীগন্ধার কলি আটকায়নি, নির্মলের সৌভাগ্য। ইন্দিরা যেন মূর্তিমতী শান্তি, কিন্তু শান্তির মাঝে কি শ্রান্তি থাকে না? ইন্দিরা মূর্তিমতী দিৎসা, কিন্তু দানের অকৃপণ ইচ্ছার মাঝে কি দারিদ্র্য নেই?

চেয়ারে বসে নির্মল শুধোল: হঠাৎ চলে গেল? তুমি বুঝি কিছু বলেছিলে?

—আমি আবার কী বলতে যাবো?

—তবু এত সাত-তাড়াতাড়ি পাড়ি মারলো?

—সকালের ডাকে কি-এক চিঠি এলো, অমনিই দে-ছুট।

—যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেল না?

একটু স্তব্ধতা! নির্মল রাশীকৃত খাবার ফেলে ছোট একটি আপেলের টুকরো দাঁতে কাটলো।

—কেন চলে যাচ্ছে কিছু বলে গেল না? ওদের তো একত্র হয়ে আরো আপ-এ যাবার কথা শুনেছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

—আমার এমন কী গরজ পড়েছে?

নির্মল বিরক্ত হলো: বা, তোমার বন্ধু, তোমার বাড়িতে অতিথি। কেন হঠাৎ চলে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করতে হয় না?

নিচের ঠোঁটটা উল্‌টে ইন্দিরা বললে—ছাই বন্ধু। অমন মেয়ের সংস্পর্শ থেকে সরে থাকা উচিত।

কিন্তু এমন কথায়ো স্বামী আশ্বস্ত হলেন না: সরে থাকা উচিত মানে? এমন

একটি মেয়ে তুমি আর কোথাও দেখেছ ? বিংশ শতাব্দীর মৈত্রেয়ী। যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ ?

কথার সুরটা বিদ্রূপের হয়তো, কে জানে, প্রত্যুত্তরে ইন্দিরা জোরে হেসে উঠলো। হাসিটা কৃত্রিম, কর্কশ।

চায়ে চুমুক দিয়ে নির্মল বললে—রাস্তার জন্যে খাবার তৈরি করে দিয়েছ তো ?

—রাস্তায় খাবার খাওয়াটা তো বর্বর প্রথা।

—হোক, দিতে চেয়েছিলে ?

—না।

—স্টেশনে তুলে দেবার জন্যে সঙ্গে বিমলকে পাঠিয়েছিলে ?

—বিমল কোথায় ! গেছে খেলতে।

—কিন্তু রামসেবক তো ছিলো।

—ঘরে তখন কতো কাজ।

—কাজ মানে ?

—কাজ মানে কাজ। এবার ইন্দিরার চটবার পালা : এতো যখন দরদ তখন নিজে এসে ব্যাগটা গাড়িতে তুলে দিলেই তো পারতে। এইটুকু পথ তো স্টেশন। হেঁটেই চলে গেল।

—হেঁটেই চলে গেল ? একটা টাঙা পর্যন্ত ডাকিয়ে দাওনি ? খাবারের ডিস্‌টা ঠেলে দিয়ে নির্মল দস্তুরমতো গালাগাল করলে : বর্বর আর কাকে বলে ? এতটুকু সৌজন্য তোমার নেই ?

কটু স্বর হয়তো ইন্দিরার মুখ দিয়েও বেরোত, কিন্তু সে সংযম অভ্যাস করছে। এখানে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার পা টলবে—তাড়াতাড়ি সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ নির্মলের মর্মমূল ধরে কে নাড়া দিল—অশ্রু তবে কেন এসেছিল—কেন ? সে নিজে অবশ্যি তার স্বামিত্বের আসনে অটল থেকে অশ্রুকে হটিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে বাহাদুরি কী, কিন্তু অশ্রু যে এসেছিল, আসতে পেরেছিল—তার মধ্যেই বাহাদুরি। সে তো ভয় পেয়ে ধার্মিক সেজেছিল, কিন্তু অশ্রু তো ভয় পায়নি, ধার্মিক সাজেনি—তবে ওর ভালোবাসা কি আজো বেঁচে আছে ? জানলার বাইরে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল নির্মল। তার বিবাহের বাইরে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কি আর বেঁচে নেই ?

ইন্দিরা ঢুকলো এসে শোবার ঘরে। ধপাস করে দরজা বন্ধ করলে। ছি ছি, সে আবার ঘটা করে তার পাতিব্রত্যের বিজ্ঞাপন দিতে বেরিয়েছিলো! ইন্দিরা এক ঝট্‌কায় তার শাড়ির আঁচলটা বিস্রস্ত করলে, খোলা চুলগুলো উস্কখুস্ক করে দিলে। এ-অবস্থায় কাঁদলে বুঝি ইন্দিরাকে মানাতো। কিন্তু সে তার খাটের ওপর শুয়ে পড়ে শূন্য চোখে সিলিঙ দেখতে লাগলো।

কিন্তু হাল যখন সে একবার ধরেছে তখন সহজে তার মুঠি সে আলগা করবে না, শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবে। নৌকো যদি ডোবে ডুববে, কিন্তু চরম দুর্ঘটনার দিনে সে বলে যেতে পারবে যে, সমানে সে হাল ধরে ছিলো। না, তার অভিমান করবার মানে হয় না। অভিমান করে কী-ই বা সে করবে? বেরিয়ে পড়বে? কার সঙ্গে! হঠাৎ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অন্নদাদিদির কথা মনে করে সে একটু হাসলো। শরৎচন্দ্র ভারি চালাক -- সাহসও দেখাবেন, সমাজকেও চটাবেন না -- এই তাঁর সাহিত্য-রচনার শস্তা কৌশল। অন্নদাদিদি ঘর ছাড়লেন, কিন্তু যার সঙ্গে পথে নামলেন সে মুসলমান সাপুড়ে নয়, সে তাঁর স্বামী! জীবানন্দ নারী-মাংসের লোভে চণ্ডীগড়ের ভৈরবীকে ঘরে পুরলে, কিন্তু সেই হলো তার অলকা—লোকের খুঁৎখুঁৎ করবার কারণ ঘুচলো। অচলা সুরেশের সঙ্গে ঘর ছাড়লো, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়—সুরেশ তাকে একটা কায়দা করে লুফে নিলো ট্রেনের কামরায়। শরৎচন্দ্র ব্যক্তিত্বের দিকে না তাকিয়ে সমাজের মুখ চেয়েছেন খালি। শুধু এক কিরণময়ী। সে স্বেচ্ছায় উপেনের হাতে নিজেকে উপহার দিতে চেয়েছিলো, প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার ছোট ভাইকে নিয়ে রেঙ্গুনের জাহাজের বন্ধ কামরায় ঝড় তুললে। কিন্তু অনুদার সমাজতান্ত্রিক শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে সে হলো পাগল, সে হলো ব্যাধি-বিজ্ঞানের একটা খেলো নিদর্শন মাত্র।

বেরুবার পথ ইন্দিরার বন্ধ—একটি ঘুলঘুলিও কোথাও নেই! পেটে তার ছেলে। ইব্‌সেনের নোরা ছেলে-মেয়ে, পুতুল পূজা—সব-কিছু ফেলেই পথে পা দিলো কিন্তু। দিক, নরোয়ে আর বাঙলা দেশ এক নয়—যেমন কাছাকাছি নয় ইব্‌সেন ও শরৎচন্দ্র। এমন কেউ নেই যে যার সঙ্গে বেরুলে দৈনিক খবরের কাগজগুলো খেঁকাবে না। যদি ধরা যেতো রমাপতিই তার স্বামী, নির্মলের কাছে সে বন্দিনী—রাবণের কাননে সীতার মতো—সে এই পাপপুরী ত্যাগ করে স্বামী-অভিসারিণী হলো, তাহলে হয়তো সমাজ খুশি হয়, শরৎচন্দ্র খুশি হন। কিন্তু রমাপতিই যে তার স্বামী এ-কথা সমাজকে বোঝাবে কে? অতএব তা থাক। সমাজের সঙ্গে বিরোধ ঘটাতে ইন্দিরা বসেনি, তার সে উদ্ধৃত্ত সামর্থ্য নেই, নেই বা সে তেজ। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যেই সে নিজেকে ছেঁটে কেটে খাটো করে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আত্মহত্যা! আবার সেই বাধা। পেটে তার ছেলে। তা ছাড়া আত্মহত্যা করলেই কি জ্বালা জুড়োয় নাকি?

মৃত্যু সম্বন্ধে এমন একটা মিথ্যা কল্পনায় কত লোক সেখানে গিয়ে দেউলে হলো কে তার হিসেব রাখে? তা ছাড়া নিজের হাতে নিজেকে মারবার মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড বীভৎসতা আছে তার কুশ্রীতা দুর্বিবহ। সে-কথা ভাবলেও তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র কুঁকড়ে আসে। আত্মহত্যাই যদি সে করতে পেতো তাহলে এ-অভিনয়ের এত সাজ-সরঞ্জাম করতে গিয়েছিলো সে কি ভেবে? সে সংসারস্রোতে গা ভাসাবে। এখনো আশায় সে ফতুর হয়নি।

অতএব এখন তার খাটের ওপর শুয়ে-শুয়ে অলস চিত্তবিনোদনের অবসর নেই। শাশুড়ি সেই যে কাশীতে গেছেন কবে ফিরবেন কেউ জানে না। সংসার এখন ওর হাতের তালুতে, উপুড় করলেই উলটে পড়ে। ঠাকুরটাকে রান্না দেখিয়ে দিতে হবে। কালকের পুনর্জীবন-লাভকে উৎসব-রমণীয় করবার জন্যে সে আজকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলো। এ-উৎসব অশ্রুকে বাদ দিয়েই। উৎসব সমাধা না করবার কোনো মানে নেই। পাড়ার কয়েকটি মহিলাকে সে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। তারা এখুনি এসে পড়বে। মিলি আনবে তার এস্রাজ, বীণার বৌদি অংশুমালা বাজাবেন অর্গ্যান। ইন্দিরা অর্গ্যানটা কত দিন ছোঁয়নি। এখন ওঠা যাক, ন্যাকামো ঢের হয়েছে। যার প্রতিকার নেই তার প্রতিবাদ করবার লজ্জাটা আরো অমানুষিক। এখন না উঠলে নিমন্ত্রিতাদের উপযুক্ত বরণ করা হবে না।

আলো জালিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা চুল আর আঁচল ঠিক করতে বসলো। অশ্রু নির্মলের চোখে কুজ্ঝটিকার জাল বুনে গেছে। কিন্তু রমাপতি যেন তার শ্মশানশয্যা থেকে উঠে না আসে। রমাপতিই অনাহূত, অবাঞ্ছনীয়—অশ্রুর জন্য খোলা দুয়ার, মুক্ত আতিথেয়তা।

বড়ো দুঃখে ইন্দিরার মনে পড়লো পাগল হয়ে নীট্‌শে পাগল ষ্ট্রিণ্ডবার্গকে কি চিঠি লিখেছিলেন :

আমি একটি দিন ঠিক করেছি। সে-দিন ইউরোপের সমস্ত রাজা উপস্থিত হবেন। আমি তাঁদের মারতে আদেশ দেব।

বিদায়। আবার আমাদের দেখা হবে।

কিন্তু এক শর্ত। আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ করতে হবে।

নীট্‌শে সীজার্

পাগল ষ্ট্রিণ্ডবার্গ উত্তর দিলেন :

ইতিমধ্যে এস উন্মত্ত আনন্দ করে নি। বিদায়।

তোমার ষ্ট্রিণ্ডবার্গ

সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ বিধাতা

নীটশের উত্তর :

যথেষ্ট। চাই শুধু বিবাহচ্ছেদ।

'The Crucified'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে বারোটা।

নির্মলের সঙ্গে ইন্দিরার নিভৃতে দেখা হলো বারান্দাতেই। নির্মল শোবার ঘরে না ঢুকে বসবার ঘরের দিকে মুখ করেছে। ইন্দিরা বললে—রাত অনেক হলো।

নির্মল বললে—জানি।

—শুতে যাবে না ?

—যাবো। এখনো আরো কয়েকটা কাজ সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু আজকে হঠাৎ এত ঘটা কিসের ?

—এসো শোবার ঘরে, বলছি।

—এখেনে বললে রাতের অন্ধকার ঘনতর হয়ে উঠবে না।

ইন্দিরা জীবনে আরেকটি সুযোগ হারালো। নির্মল যদি ঘরে আসতো, তাহলে দৃষ্টিকোণ ছোট হয়ে উঠতো বলে তার অভিনয়োচ্ছ্বাস বেমানান হতো না। পতিভক্তি নাটকের পঞ্চাঙ্কের অবশ্যম্ভাবী শেষদৃশ্যটির সে এতক্ষণ মহলা দিয়েছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ ও আকাশের তারা দেখা যায় সেখানে এত বড়ো একটা ব্যঙ্গ-ভূয়িষ্ঠ নাটক করতে হাত-পা তার একটুও নড়তে চাইলো না। তবু এখানে দাঁড়িয়েই তাকে বলতে হলো : কাল তোমাকে পরিপূর্ণ করে গ্রহণ করেছি, নিজেকে দানও করেছি মনের মতো করে পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদে। এই জন্যেই আজকের এই উৎসব। ভেবেছিলুম ঘরে এলে তোমাকে আরো ভালো করে বুঝিয়ে বলবো। কথা দিয়ে সব জিনিস প্রাঞ্জল করা যায় না।

নির্মল এ-কথার ধার দিয়েও গেল না। বললে—এমন একটা উৎসব করবে অথচ বিকেল বেলায়ই অশ্রুকে বিদায় করলে ? অন্তত আজকের রাতটার জন্যে তাকে তুমি ধরে রাখতে পারলে না ?

ইন্দিরার হৃৎপিণ্ডে কে যেন হাতুড়ি চালালো : আমি তাকে ধরে রাখবো কি করে ? সে যেমন জেদি মেয়ে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য !

—তুমি নিশ্চয়ই তাকে কটু কথা বলেছ।

—আমি বলতে যাবো কোন্ লজ্জায় ? কাল রাত্রে অপমান তুমি তার কম করেছ নাকি ?

—আমি করেছি অপমান ? তুমি বললেই হলো ?

—হ্যাঁ, আমি বললেই হলো। বিবাহিত ভদ্রলোকের লুকোনো মনোবৃত্তি টের পেয়ে সে লজ্জায় মুখ ঢেকে সম্ভ্রম বাঁচিয়েছে।

—কি বললে ?

ইন্দিরার সকল প্রতিজ্ঞা গেল ভেসে : ঠিকই বললুম। তোমার চরিত্রগর্ব আত্মম্ভরিতার ভান মাত্র। এ-লজ্জা খালি আমার নয়, অশ্রুর মতো মেয়েরো। বলে, ইন্দিরা তাড়াতাড়ি তার নিজের ঘরে এসে দুয়ার বন্ধ করে দিলো।

এবার স্টেশন-প্লাটফর্মে প্রভাত। এলাহাবাদে গিয়ে মিলিত হওয়ার চেয়ে অশ্রুর ফিরে আসার মধ্যে চমৎকারিত্ব বেশি আছে, কেননা শেষেরটা অপ্রত্যাশিত। যা কিছু চাওয়ার বাইরে তার পাওয়ার মধ্যে একটু চমক থাকে—কবিতায় আনকোরা ও অব্যবহিত-পূর্ব মিল পেলে মানেটা আরো ধারালো হয়ে ওঠে। বায়রনের Don Juan-এর চমকপ্রদকতা কতকটা সেই কারণে। বিষয়বস্তুটা খেলো, খোলসটাতেই তার জৌলুস। মানুষের সভ্যতাটাও তাই। লৌকিক ব্যবহারে সে বিলাস চায়, জীবনে নয়। কাজের মানুষ তারাই যারা আর্টিস্ট-হিসেবে নিতান্ত খাটো; তারা আত্মপ্রকাশ করে সৃষ্টিতে নয়, পরাধিকারে অকারণ হস্তক্ষেপ করে। প্রেম বা বন্ধুতা নিয়ে তাদের তৃপ্তি নেই, না বা More-এর Utopia-য়, তাদের চাই শক্তি-প্রসার, তারা চায় পরের চরকায় নিজেরা তেল যোগাবে। তারা রাজ্য গড়ে, শান্তি ভাঙে—সত্য না চেয়ে চায় নিরাপত্তি। পুলিশকে কে সভ্য বলবে ? তবু তারাই হলো সভ্যতার বাহন। একনিয়মের বশবর্তিতার অর্থই সভ্যতা। তুমি তোমার শিরদাঁড়া খাড়া করে উঁচু হয়ে দাঁড়াও, লিলিপুটের দেশের লোকেরা মই বেয়ে তোমার ঘাড়ে চেপে কান মলতে চাইবে। বলবে : সভ্য হতে চাও তো পিঠ কুঁজো করে আমাদের সঙ্গে মাথা মেলাও। তুমি যেখানে সৃষ্টি করবে সেইখানেই তুমি সভ্য নও, তুমি যখন সে-সৃষ্টির গুণ গ্রহণ করবে তখনই তুমি সভ্য। সত্যের নবাবির্ভাবের দিনে যদি আহত হয়ে আঁৎকে ওঠ, বুঝতে হবে তোমার বিচার-বুদ্ধিতে মর্চে ধরেছে। 'সীতা' শুনে কান্না পায় বলেই শিশির ভাদুরি বড় অভিনেতা, এ-উক্তিটা সভ্যতার পরিচয় নয়, বা সীতা-সম্বন্ধে 'ঘরে বাইরে'তে সন্দীপের উক্তিটা মোলায়েম নয় বলেই তাকে গালি পাড়াটাও বর্বরতা। পরকে মেনে নেবার sense of humour-টাই হলো সভ্যতার মাপকাঠি। 'চরিত্রহীনে'র উপেন চরিত্রগর্বে এত হীন ও কাপুরুষ যে সতীশের ঘরে সামান্য একটা শাড়ি শুকোচ্ছে দেখেই সে পিটটান দিলো। এমন একটা মেরুদণ্ডহীন মূর্খকেই কি না শরৎচন্দ্র সতীশের foil বলে দাঁড় করিয়েছেন। নিজের নিজের

মানসিক ও বুদ্ধিগত অকর্মণ্যতাকেই নিরীহ মানুষ বড়ো করে তার নাম রাখে নীতি, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার। বালক ভিজরেইলির জু হয়ে কম লাঞ্ছনা হয়নি—রাস্তায় বেড়ুলো সে হলদে পায়জামার লাল কুর্তা এঁটে। অতএব সে ইতর। শবদেহ সমাজে ব্যাধির সৃষ্টি করে, কিন্তু শবদেহ কেটে-কুটে ছিঁড়ে-ফেড়ে তার সদ্গতি না করলে ব্যাধি-নির্ণয়ই চলতো না। সাপ আমাদের দংশন করে বলেই তা কুৎসিত, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে ওর চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই—তা ছাড়া ওর বিষে নাকি পচা ঘায়ের ওষুধ হয়।

আমি আছি—এর চেয়ে বড়ো জ্ঞানাবিষ্কার মানুষের আর কী হতে পারে? শুধু জীবনে নয়—জীবনের অনুকৃতি যে সাহিত্য—তার মাঝেও মানুষের কায়দা-কানুনের বাঁধা গৎ আছে। সেই গৎ-এ সুর মিলিয়ে ভাষাযোজনা করতে হবে। উপন্যাস লিখতে বসেও সেই এক নিয়ম; চাই একটা সুসম্পূর্ণ প্লট, কথোপকথনের প্যাঁচ, একটা অতি-প্রত্যাশিত আকস্মিকতা। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর 'গোরা'য় বিনয়ের বাড়ির সামনে পরেশবাবুর গাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে প্রথম আলাপের সূত্রপাত করলেন,—লাবণ্য ও অমিতের মোটরে একটা সংঘর্ষ লাগছিল আরেকটু হলে। এগুলি অত্যন্ত মামুলি প্রথা, আমাদের অত্যন্ত পাঠকের তা মুখস্থ হয়ে আছে। ছাঁচে ফেলে চরিত্রকে একটা নমুনায় রূপান্তরিত করতে হবে, স্বপ্রধান ও সীমাবদ্ধ একটা ব্যক্তি করতে নয়। গল্প হলেই চাই তার ঘটনা, চাই তার সমাপ্তি, কবিতা হলেই চাই তার একটা বোধ্যতা। দূরের তারাকে আমার চোখে যদি হলদে লাগে, অন্ধকারকে লাগে যদি নীল, তবুও আমাকে লিখতে হবে শাদা তারা, কালো আঁধার। যদি বলো লুভার্-এ Phedias-দেবীদের মুণ্ডহীন মূর্তিগুলির সৌন্দর্য তাদের গঠনগৌরবে বা ভঙ্গি-সুষমায় নয়, তাদের মুণ্ডহীনতায়, তবে সমসাময়িক সমালোচনাও হবে চামুণ্ডা। লোকের মুখ চেয়ে সত্য আমার কাছে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে না, এ সত্য কথা বোঝাই কাকে? বস্তুতান্ত্রিকতা এককালে সাহিত্যরচনার ফ্যাশান ছিলো—যেমন ধরো জোলা, আরো আগে যেমন ধরো জেইন অস্টিন। কিন্তু হুবহু বলতে গিয়ে বহু বর্ণনাতেই ব্যক্তির সত্য পরিচয় ধরা পড়ে না, তাহলে 'পথের পাঁচালি'ও একটা উঁচু-দরের নভেল হতো। আগে নিয়ম ছিলো: বিষয় ও ব্যক্তি নির্বাচন করো; এখন নিয়ম হোক: কিছুই অনির্বাচিত রেখো না। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম থিয়োরেম নিয়েও কবিতা হয়, গ্রাম্য গৃহস্থবধূর বর্ণচ্ছটাহীন সোজা সাধারণ জীবন নিয়েও বারো খণ্ডে উপন্যাস হতে পারে। মানুষের সত্যিকার জীবন তার জীবনের ব্যবহারে নয়, জীবনের অন্তঃশীল অবচেতনায়। তুমি চাঁদ দেখে কি ভাব সেইটেই তোমার জীবনে সত্য, তুমি চাঁদ দেখে হাত বাড়িয়ে তাকে ডাক

কি না সেইটে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। শেহভ এ-কথা বুঝেছিলেন ; তাই তাঁর নাটকে চিন্তাই হচ্ছে ক্রিয়া, দ্যোতনাই হচ্ছে সম্পাদিত ক্রিয়ার চেয়ে বড়ো সত্য।

উপন্যাসকে আমরা ব্যবহারিক জীবনের একটা প্রতিফলন করে তাতে রঙ্ চড়াতে চাই ; নায়ককে করতে চাই বীর, অনন্ত মহনীয়—হয় তার ভয়াবহ সচ্চরিত্রতায়, নয় দুর্দম বলিষ্ঠতায়, নয় বা তার জঘন্য হীনবৃত্তিতে, যাতে সে লোকের ঘৃণা কুড়োবে, নয় বা সহানুভূতি। হয় প্রতাপ, নয় গোরা—বা কিরণময়ী বা দেবদাস : এমন লোক খুঁজি না যে মুদির দোকানে দু'বেলা হিসেব রাখে, তামাক খায় আর তাস খেলে। এমন লোক খুঁজি না যার জীবনে দুর্ঘটনা নেই, সম্ভাবনা নেই। একঘেয়েমিই যে জীবনের প্রতিপাদ্য সত্য, সাহিত্য তা বিস্মৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিকদের বিশ্বাস করে নেপোলিয়নকে আমরা চিরকাল বলদৃপ্ত বীরপুরুষ বলেই পূজো করে সুখ পেতুম, কিন্তু লুড্‌উইগের কাছে নেপোলিয়নের জীবনের কবিত্বটাই বড়ো বলে দেখা দেয়নি। নেপোলিয়ন যে খালি যুদ্ধ জয় করেনি, ভালোও বেসেছে, এ সত্য কথাটা আমাদের কাছে এত দিন লুকোনো ছিলো। আঁদ্রে মরোয়া শেলিকে দেখলেন প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড বলে নয় : ফ্রান্সে ওয়ার্ডসোয়ার্থের নাকি একটি জারজ শিশু ছিলো। গান্ধি যে এককালে চামড়ার মানুষ ছিলেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যত বংশধরেরা হয়তো তা ভুলে যাবে। মুসোলিনি যে এককালে ভিক্ষা করতো একথা ক'টা লোক মনে রেখেছে ?

তুমি যা তুমি তাই—তুমি ঘুরে-ঘুরে বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে না পার, সোজাই চলে যেয়ো, পরের হাত ধরে নিরাপদ হবার জন্যে তবু বেঁকো না। তুমি যা তুমি তাই। তুমি তোমার নিজের নায়ক হও। কি তোমার করা উচিত—তার চেয়ে কি তুমি কর, তাতেই আমাদের বেশি অনুরাগ, বেশি কৌতূহল। পরের জুতোয় পা ঢুকিয়ে তুমি চলবার বেগ হারিয়ো না, পরের আদর্শ তোমার পক্ষে আত্মঘাতী। তুমি নিজে যা তুমি তাই : জীবন যেমনি ভাবে আসে তেমনি করে নিলেই তুমি অবিনশ্বর।

ট্রেন লেট হয়নি প্রভাতই আগে এসেছে। ভাগ্যিস আজ রবিবার, রোদ উঠে গেলেও কেরানিরা এখনো ওঠেনি—আজ সকালে তাদের নিদ্রোৎসব চলেছে। আপিস যেতে হবে না—এটার স্বাদ অশ্রুর আসার চেয়েও মিষ্টি। এঞ্জিনটা প্লাটফর্মে এত জোরে প্রবেশ করলে, যেন তার যে এখানে থামতে হবে তা তার মনেই নেই একেবারে। অশ্রু নেমে এলো, মাথার চুল রুক্ষ, চোখ দুটি ঘুমো-ঘুমো, এঞ্জিনের কয়লায় জামা-কাপড়গুলি অপরিচ্ছন্ন। সজ্জা সম্বন্ধে অশ্রুর এ-অমনোযোগটি প্রভাতকে স্পর্শ করলো—অন্তত মুখটাও সে ধোয়নি। চেহারাটির মধ্যে মধুর একটি মালিন্য আছে। প্রভাতকে দেখতে পেয়েই অশ্রু একটু হাসলো—হাসিটিও তীক্ষ্ণ নয়, কেমন-

যেন একটু চাপা, ফ্যাকাসে। যেন আর চটুলতা নয়, অন্তরময়তার সূক্ষ্ম একটি ইশারা। প্রভাত গেল এগিয়ে।

ট্যাক্সিতে উঠে বাঁচা গেল। অশ্রু বললে—ভালোই হলো ফিরে এসে। বলে তার একখানি হাত প্রভাতের কোলের ওপর রাখলো।

প্রভাত হাতের উপর হাত রেখে বললে—কোথায় যাবে এখন?

অশ্রু অবাক: বা রে, কোথায় আবার যাবো? বাড়ি!

বিস্ময় প্রভাতেরো কম নয়: বাড়ি! সেখানে তো তোমার দুয়ার বন্ধ।

—সে-বাড়ির কথা কে বলেছে? তোমার বাড়ি কি ঝড়ে উড়ে গেছে নাকি?

—আমার বাড়ি!

অশ্রু অভিমান করতে জানে: ও! জানতাম না যে, আমি তোমার পর, আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে রাখতে চাও।

অশ্রুর এ কি অভাবনীয় পরিবর্তন! চোখ দু'টিতে গভীর মৌন, মুখচ্ছায়ায় একটি অস্পষ্ট কাকুতি! প্রভাত তাকে নিজের আরো কাছে ঘন করে আকর্ষণ করলে। ক্ষণেকের জন্যে যেন হিসেবে সবগুলি অঙ্ক মিলিয়ে গেল, সকল লজিক্‌কে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেখা দিলো ম্যাজিক। বললে—নিশ্চয়ই যাবে, আমার মা তোমারও মা।

ক্ষণতরে ঘনতার বিস্ফোরণ ঘটল একটি পরিপূর্ণ চুম্বনে।

প্রভাতের পশ্চাদ্বর্তিনী একটি অপরিচিতা মেয়ে দেখে মা প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেন। বুঝে নিতে দেরি হলো না এই-ই অশ্রু, যার জগদ্ব্যাপিনী খ্যাতি—সম্প্রতি যিনি তাঁর ছেলের পশ্চাদ্ধাবন করছেন। তাঁর ছেলেকে এ-মেয়ের যে কেন পছন্দ হলো বলা কঠিন—উল্টো প্রশ্নটা তাঁর মনে ঘেঁষতেই পারলো না, কেননা, প্রথম দেখাতেই তিনি ঠিক ধরে নিতে পেরেছেন যে, বয়সে অশ্রু তাঁর ছেলেকে ছাপিয়ে গেছে। যদিও অশ্রুর বয়স তেইশ, মার কাছে মনে হচ্ছিলো তেত্রিশ। বেশ ঢ্যাঙা, স্বাস্থ্যবতী। বাহু দু'টি সুডৌল, আঙুল ক'টি সুঁচলো। চোখ দু'টি গভীর। মুখে নানান রকম খুঁত, কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন ঢলঢলে।

কিন্তু কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই অশ্রু মায়ের পায়ের কাছে উবু হয়ে প্রণাম করলো—সভক্তি প্রণাম। মা ওর খোঁপার ওপর হাত রেখে আশীর্বাদ না করে

পারলেন না। দুই চোখে স্নিগ্ধ নম্রতা নিয়ে সে বললে—আমাকে তুমি চিনতে পাচ্ছ না, মা? আমি অশ্রু।

—খুব চিনেছি, মা। এসো ভেতরে। ট্রেনে খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি?

হেসে অশ্রু বললে—কষ্ট আমার কিছুতেই তেমন হয় না। আমি তেমন-ধরেন মেয়ে নই মা, যে, আত্মকর্তৃত্বে চলা-ফেরা করবো অথচ বাসে কিংবা ট্রামে উঠে কোনো পুরুষের জায়গা ছেড়ে দেবার আশায় কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো। সে যদি জায়গা ছেড়ে দেয়-ও আমি তাতে বসি না। আমি সেধে অপমানিত হতে চাই নে। দিলদারনগরে এমনি কাণ্ড ঘটেছিল, মা। গাড়িটা একদম ঠাসা। মেয়েছেলে দেখে একটি ছোকরা ভদ্রলোক জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কী আপ্যায়িতই না করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাঁর ঐ অকৃপণ বদান্যতা নিই কি করে? আমি বড্ড বেশি বাজে বকি, না? আমাকে তুমি যে কী ভাবছ কে জানে! তোমার সমস্ত কাজ যে এখনো পড়ে আছে। তরকারি কুটছিলে? ও কি, বিছানা এখনো তোল নি? অশ্রু বিছানাটা তুলতে ব্যস্ত হলো।

মা বাধা দিয়ে বললেন—তুমি এসব করছ কি? এখন একটু জিরোও। চান করবে? না, এখন না-হয় মুখহাত ধুয়ে একটু বোস, আমি তোমাকে চা করে দিচ্ছি।

অশ্রু একেবারে আকাশ থেকে পড়লো: তুমি চা করে দেবে কি মা? আমি কি তোমার তেমন মেয়ে নাকি? আমি এখনো এত শিক্ষিত হইনি মা, যে চা বানানো, ঘর ঝাঁট দেয়া, তরকারি কোটা বা বাসন-মাজায় একেবারে ফেল্ করে যাবো। তুমি যদি আমার জন্যে অকারণে ব্যস্ত হও, তাহলে বুঝবো তুমি আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ দাওনি। আগে চানটাই আমি সেরেনি। (প্রভাতকে) তুমি ততক্ষণ একটু দাঁড়াও, এসে আমি চা করছি।

অশ্রুর প্রতি মা'র মন বরাবরই বিমুখ ছিলো। কিন্তু নদী এখন উজোন! তিনি ভাবতেন আজকালকার পড়িয়ে মেয়ে, নয়কে হয় করাই ওদের ব্যবসা। সরু লিকলিকে চেহারা, রঙ্ ফ্যাকাসে, পিঠ কুঁজো, মেজাজ টেড়া. কথাবার্তা চিবোনো-চিবোনো—এমনি ধরনের একটা আজব চেহারা তাঁর মনে চিরকাল ধরা ছিলো। কিন্তু অশ্রু শ্রীমতী, দেহ ভরে তার স্থির স্বাস্থ্য, শাড়ি পরার ভঙ্গিটি সাধারণ বলেই সুষমান্বিত, দুই হাতে অজস্র শুশ্রূষা, কথায় সৌজন্য। মেয়েটি বেশ। এর নামে অনেক কলঙ্ক-কথনই দিগ্বিদিকে প্রচলিত ছিলো, বাপের বাড়ির দরজা তার বন্ধ হয়েছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কী তেজ থাকলে চক্ষুর দৃষ্টি এমন গভীর ও স্নেহার্দ্র হতে পারে মা যেন তা এক নিমেষে বুঝে ফেললেন। হয়তো অবাধ্য, কিন্তু এমন মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে বাপ তাঁর মুখে ভাত তুলছেন কিসের ক্ষুধায়? সব কথা তাঁর জানতে হবে।

মা'র ঘরের কাজে অশ্রু তার হাত বাড়ালো। তরকারি কুটলো, ঘর ঝাঁট দিলো, কাপড় কুঁচোলো, দেয়ালের ঝুল সাফ করলো। এ যেন তার নিজের বাড়ি। মেথরানি উঠোন সাফ করতে এলে নিজ হাতে জল ঢাললো, বালতি-ভরা জলে চায়ের বাসন ডুবিয়ে নিজে ধুতে বসলো, নীচেকার পেরেক-অভাবে দেওয়ালে যে দেবদেবীর ফটো-গুলির ফাঁসি হচ্ছিল, সেগুলিকে প্রকৃতিস্থ করলো। বললো—আমি আজ রাঁধবো, মা। নতুন যুগের ধুয়ো উঠেছে যে মিউনিসিপ্যালিটি রেঁধে বাড়ি-বাড়ি ভাত-তরকারি বিলি করে বেড়াবে—বাঙলা দেশে আমার-তোমার মতো মেয়ে থাকতে তা আমরা হতে দেব না। আমরা পাঁচ আঙুলে পঞ্চ ব্যঞ্জন তৈরি করে পাঁচজনকে তৃপ্ত করবো বলেই মেয়ে-মানুষের জন্ম নিয়েছি, মা। বলে অশ্রু হাসলো।

মা বললেন আমিই পারবো মা, তুমি যে অতিথি।

—মা'র ঘরে মেয়ে অতিথি হয়ে আসে না, মা। পাঁজির যে-তিথিতেই আসুক, সে মেয়ে। উনুন ধরানো আছে, আমি ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিই। প্রভাত ততক্ষণ বাজার করে ফিরুন। তুমি আমিষ ঘেঁটে চান করে আবার গিয়ে নিজের উনুন ধরাবে, সে হবে না—আজকে থেকে তোমার ছুটি।

—রোজই তো আমার সেই পালা।

—এবার থেকে রোজই তুমি মাছের রান্নাঘর থেকে পালাবে।

—কিন্তু আগে তুমি কিছু খেয়ে নাও।

—খেয়ে নেবো বৈ কি। খাওয়া-সম্পর্কেও আমি লেডি হতে পারলাম না। তবে চায়ের কেতলিটাই আগে চাপাই। ততক্ষণে প্রভাত নিশ্চয়ই ফিরবেন। কি বলো?

—এই তো বাজার। দু' মিনিটে এসে যাবে।

দশ মিনিটে প্রভাত ফিরলো। প্রতিদিনকার মতো প্রভাত নিজ হাতে বাজার করে নয়, মুটের মাথায় করে। বাজারের বহর দেখে অশ্রুর চক্ষু স্থির : তুমি এ করেছো কী? মাংস? মুড়ো? এক হাঁড়ি রসগোল্লা? ছি ছি! করেছো কী? তুমি যে দেখছি বড্ড সেকেলে। ভেবেছিলাম আজ শুধু খাবো শুকতো, শাকভাজা। ভিটামিন।

মাকে অশ্রু ঘেঁষতেই দেবে না : এ-ঘরের এলাকা থেকে তোমার নির্বাসন। নুন আর ঝালের একটু এদিক-ওদিক হলে দ্রৌপদী আর আত্মহত্যা করবেন না। সব আমি নিজের হাতে করবো। মাছের মুণ্ডচ্ছেদ করবো, ছাগশিশুকে টুকরো-টুকরো। ওদের পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তপ্তকটাহে ওদের ভর্জন করবো।

প্রভাত বললো : আর আমি?

—তোমাকে বয়কট।

অশ্রু তার করতলে এই ক্ষুদ্রায়তন সংসারটিকে কেড়ে নিয়েছে। সে এমন একটা চঞ্চললাবণ্যনির্ঝর। পদে পদে তার ব্যস্ততা, কথায় কথায় কোলাহল। ভিজে খোঁপাটাও এঁটে থাকে না, আঁচলটাও অবাধ্য।

হলুদ বার করে দাওনি তো মা? ফোড়ন কৈ? মাছ কিছু সাঁৎলে রাখবো নাকি? নাটু মাংস খায় না? আর আমিই এমন কী violent! প্রসাদং কণিকামাত্রং। আতিথ্যও তাই শাকান্নে। কতদিনে যে দেশ সভ্য হবে। মাগো, খাওয়াটা কি নোংরা! এর চেয়ে ইউলিসিস-এর লোটাসল্যাণ্ড-এ গিয়ে ঘুমুলে হতো ভালো। পোষাক আর খাওয়া নিয়ে এ দেশের রীতিনীতিগুলো এত স্থূল কেন? চরিত্র সম্বন্ধে যেমন বাঁধা গৎ, এদের সম্বন্ধেও তাই। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক-একটা আলাদা জলবায়ু। এই যাঃ! কিছু হয়নি মা, মাংসের ঢাকাটা পড়ে গেল। না না, হাত-পা পোড়াবো কি? প্রেমও সেই জলবায়ু। বসন্তের পরেই বর্ষা—বর্ষার পরেই আবার সেই জলহারা মেঘ। ঘি কোথায় মা? ছোট এলাচ?

ছোট উঠোন, কলতলার আঙিনাটি ছোট, একটা পাথরের ঢিবি খুঁড়ে ছোট একটি গহ্বরে তুলসীর অঙ্কুর। নোনা-ধরা দেয়ালে দুধয়ালার খড়ি-কাটা হিসেব, একধারে মা'র হাতে ঘুঁটে দেয়া। গলির মধ্যে বাড়ি—তবু আশ্রমোপবন। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরে তাকাও—সংকীর্ণ এক টুকরো আকাশ, চোখে অত অল্প বলেই কল্পনায় সত্যি করে অসীম। 'চোখ বড়ো করলেই আর বড়ো করে দেখা হয় না।'

—তোমার হলো মা? আমার তো প্রায় সারা। আর শুধু এই চাটনিটা। এবার স্নান করতে যেতে পার হে পেটুকরাম। নাটু, স্নান করেছ?

—করেছি, বৌদি।

—বৌদি কি রে? অশ্রু খিলখিল করে হেসে উঠলো।

হঠাৎ এক সময় অন্তরালে প্রভাতকে অশ্রু জিগ্গেস করলে—তুমি বুঝি নাটুকে শিখিয়ে দিয়েছ?

প্রভাত অবাক: কি? কখন?

—আমাকে বৌদি বলে ডাকতে?

—না তো। মা বলেছেন হয়তো।

—মা?

অশ্রু রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে চাটনি ঘন করতে বসলো।

প্রভাত বললো: জিনিসপত্রগুলি এখানে গুছিয়ে রাখো আগে। পরে তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে যাও। তুলবো আর খাবো।

মা-ও সায় দিলেন: বারোটা বেজে গেছে। তুমিও বসে পড় অশ্রু।

অশ্রুর তাতে আপত্তি আছে : দু' ভাইকে আগে খাওয়াই। পরে আমার পালা। আবার যখন তোমার মতো দায়িত্ব হবে মা, তখন সব্বাইর শেষে।

এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে প্রভাত বললে—অতিশয়োক্তি ধরো না, অশ্রু। সত্যিই বলছি, সুপার্ব।

অশ্রু বললে—আমাকে তুমি তেমনি বোকা মেয়ে ঠাওরেছ নাকি যে, পরের মুখের ঝাল খেয়ে আমি রসাস্বাদ করবো? আগে নিজে না গিললে কোনো গালই গ্রাহ্য করবো না। আরো একটু দেব নাকি?

—ভালো হয়েছে বলেই বেশি খেতে হবে নাকি? খালি গুণ করলেই গুণবৃদ্ধি হয় না। পরিমাণ একটা প্রমাণই নয়।

—তাই নাকি? তবে আমিও এই সঙ্গে বসে যাচ্ছি, মা।

দেয়ালে পিঠ রেখে মা তৃপ্ত চোখে এদের খাওয়া দেখতে লাগলেন।

কী সুন্দর ঘন চুল! খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়ে কাঁধ বেয়ে বাহুর কাছে নেমে এসেছে। বাহু দু'টিও নিটোল, লীলাবলম্বিত! বসবার ভঙ্গিটিতে রুক্ষতা নেই। খাবার গ্রাসগুলি পরিমিত, হাতের আঙুলগুলি কৃশাগ্র, পায়ের পাতা দু'টি পদ্মপাতা। এর চোখে মুখে আসনে ভাষণে হাস্যে লাস্যে কোথাও এতটুকু বেসুরো লাগে না। যেন ঝর্ণার জল, সমীরমর্মর! এর প্রতি মা নিরাসক্ত থাকেন কি করে?

নিন্দুকের মুখে ছাই পড়ুক, এর হাতে মা সোনার শাঁখা দেবেন। প্রভাত যদি একে পেয়ে কৃতার্থ হয় তবে কী হবে তাঁর অর্থে, কী হবে তাঁর কুলগরিমায়? প্রভাতের সুখের বিনিময়ে মা'র কাছে কোনো কবির কোনো স্বর্গই বিকোবে না। অবিশ্যি পুত্রবধূরূপে যে-রকম মেয়ের চেহারা ও গুণপনা নিয়ে তিনি কল্পনা-বিলাস করতেন তার সঙ্গে অশ্রুর নখাগ্র পর্যন্ত অমিল : সে-মেয়ে হবে রূপে আলোকলতা, গুণে লজ্জাবতী। রূপে পৌর্ণমাসী, স্বভাবে ভোরবেলাকার নদী-কিনারের জলটুকুর মতো টলটলে। তার মাঝে শ্যামল গ্রাম্যতা, প্রখর প্রগল্‌ভতা নয়। গিলটি নয়, সোনা। কিন্তু সোনারই বা যাচাই হয় কিসে? আগুনে পুড়ে খাদ বেরুতে কতক্ষণ? তার চেয়ে এই ভালো, ছেলে তাঁর কল্পনার আয়তনের সঙ্গে প্রাপ্তির সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলেই সোনায় সোহাগা।

তবু কোথায় যেন বাধে। বয়সে হয়তো। এক নৈকট্যটাই মা'র চোখে কটু লাগে। কেমন-যেন তার মাঝে একটা লালসার অসহিষ্ণুতা আছে, যেন একটা বিসদৃশ

বিলাস। ছ'টো বয়সের মধ্যেই প্রতীক্ষার আর অবসর নেই, একটা প্রখর উন্মুখতা। সেইটেই যেন বড়ো বেশি স্পষ্ট; এবং এত বেশি স্পষ্ট বলে যেন সে-ব্যাকুলতায় সৌরভ নেই, আছে একটা রূঢ় স্বাদ—আনন্দ নয়, আহ্লাদ। কিন্তু এ কি মা'র গোঁড়ামি নয়? মা'র সংজ্ঞানুযায়ী প্রভাতের যোগ্য বধূ করতে চেয়ে বিধাতা তো অনায়াসেই অশ্রুকে তিন চার বৎসর পিছিয়ে রাখতে পারতেন—বয়স বেশী হওয়া তো অশ্রুর একটা স্বেচ্ছাকৃত ফ্যাশান নয়। যদি বলো, সে একটা দুরতিক্রম্য দুর্ঘটনা মাত্র। কিশোরী অশ্রুকেই তো এককালে বয়স্থা হতে হয়েছে। তাই বিবাহের অনতিকাল পরেই যদি অশ্রু সন্তানবতী হয় তার মধ্যে রূঢ়তা কোথায়? এটুকু উদার না হলে চলবে কেন?

মেয়েটি যা হোক পছন্দের। কাজ-কর্মে চতুর, কথায়-বার্তায় চটুল—কিন্তু এ-চটুলতায় বিভ্রম নেই, বেশ সহজ সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত। আধুনিক মেয়ের কৃত্রিমতাই তার কুশ্রীতা। হাড়ের তলায় কোথায় যে তার হৃদয়, সার্জারি করে তার সন্ধান মেলে না। এক বাণ্ডিল হাড় আর এক প্যাকেট মুর্শিদাবাদ সিল্ক এই তো আধুনিক শিক্ষিত মেয়ের রূপ। অশ্রুকে কাছে পেয়ে তিনি চশমার কাঁচ বদলাবেন। হয়তো তা নয়। কেটি মিস্ত্রিরের নিকেল-করা গালের ওপর দিয়েও হয়তো চোখের জলের ধারা নামে। হয়তো পুঁথি-কেতাব মুখস্থ করবার ফাঁকে-ফাঁকে কদাচিৎ তারা নিজের মনটাকে বইয়ের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে না রেখে আপনার কাছেই অজ্ঞাতে গভীর ও আন্তরিক হয়ে ওঠে। ভণ্ডামির খোলস খসে গিয়ে হয়তো কখনো কখনো তারা নিজের দারিদ্র্য ধরে ফেলে। সেই দারিদ্র্যই তাদের পূর্ণতা, সেই আত্মোৎসর্গ তাদেরই আত্মার স্বর্গ।

না, অশ্রু তাঁর ভুল ভাঙলো। সেবায় গৃহসজ্জায় কর্মনৈপুণ্যে বিনয়-বাক্যে নম্র শ্রীতে সে মা'র চোখে একটা অপরূপ বিস্ময়! বয়েস তার বেশি, আচরণে সে বিদ্রোহিণী, স্বাধীনকর্ত্রী, গৃহসংসারের বন্ধনচ্যুতা—এ-সব নিতান্তই খুঁটিনাটি ত্রুটি। বড়ো পরিচয় প্রভাতকে সে ভালোবাসে, গরীব জেনেও ভালোবাসে। মা হয়ে তিনি যদি তা না বোঝেন তবে আকাশের সূর্য অস্তাচলে যাক। বচনে তার প্রকাশ হয় না, না বা ব্যবহারে—কথার নেপথ্যে যেটুকু স্তব্ধতা, ব্যবহারের অন্তরালে যেটুকু রুদ্ধ ব্যাকুলতা সেইটুকুতেই তার পরিচয়। কোথা দিয়ে কি কথা উঠবে মা তাতে কান দেবেন না। সংসারে সমাজে কোথাও যদি কিছু সংঘর্ষ ঘটে, তবে তার দায়িত্ব তাদেরই, যাদের সংস্পর্শে এই সংঘর্ষের শুরু হলো। মিলন যদি তাদের, মীমাংসাও তাদেরই। প্রেম যদি এটুকু পরীক্ষা না সয়, তবে তার আগুন খালি দগ্ধই করবে, শুচি করবে না। না, মা'র এই খুঁৎখুঁতে স্বভাবের জন্যে দায়ী তাঁর চিরাচরিত প্রথা,

বাঁধা-ধরা সংস্কার। যা সংস্কৃত হবে না তা আবার সংস্কার কি করে? যা সহ্য করে না তার মধ্যে সত্য কই?

অশ্রুর ব্যবহারে ও স্বভাবে একটা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আছে। কথায় এমন একটা দৃঢ়োপলব্ধির তেজ আছে যে, তার কাছে সমস্ত প্রতিবাদ যেন একটা খেলো বিবাদের মতো শোনায়। সমস্ত বিশ্বাসের মূল নড়ে ওঠে। অথচ এমন সহজ, এমন নিষ্ঠুর। এই নির্দয়তাই তার সততা। এমন ঔজ্জ্বল্য যার চরিত্রে, তাকে মন্দ বলতে নিজেরই মা'র সন্দেহ হয়।

ঘর-দোর দেয়াল-মেঝে ছাদ-উঠোন সমস্ত অশ্রু ফিটফাট করে ফেললো। বারণ করো, মানবে না; অথচ তার এ অতি-অন্তরঙ্গতায় কোথায়ো যেন সামান্য কৃত্রিমতা নেই। এখন বিকেল হয়ে আসছে; ছাদের ওপর নাটুকে নিয়ে অশ্রু কথার খেলা করছে। ধামার ভেতর ঘুঁটে গুনে রাখতে রাখতে মা তাই শুনছেন:

—মাথার ওপরে আকাশ, তাতে তারা ফুটছে। তারা কি রকম বলো না?

অশ্রু নাটুর আঙুল তুলে নিজের চোখ স্পর্শ করালো: এই রকম।

নাটু বললো: আমি প্রায় দেখতে পাচ্ছি। চাঁদ উঠবে না আজ?

—আরেকটু রাত হলে উঠবে।

—চাঁদ? কি রকম বলো না?

অশ্রু অধর স্পর্শ করালো: এমনি তুকতুকে, বাঁকা, হাসি-হাসি। তুমি একবার হাসো, সেই তো আকাশের চাঁদ।

নাটু হাসতেই অশ্রু তাকে জড়িয়ে ধরলো: মেঘ দেখবে নাটু?

নাটু দু'হাতে অশ্রুর কতগুলি চুল তুলে বললে—ঠিক বুঝতে পারছি, বৌদি। এমনি ঘন, এমনি নরম, না?

—এমনি ঘন, এমনি নরম—আকাশময় ছড়িয়ে থাকে। তারপর বৃষ্টি।

—হ্যাঁ, মা যেমন শিয়রে বসে আমার কপালের ওপর চোখের জল ফেলেন, না? আচ্ছা বৌদি—

অশ্রু বাধা দিলো: বৌদি নয়, নাটু। খালি দিদি।

—না, না, বৌদি। মা বললেন, তুমি আমার বৌদি এসেছ। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ্, তারার মতো চোখ চিকচিক করছে, মেঘের মতো নরম চুল। আমি তোমাকে পেয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। চাঁপা ফুল, তারা, মেঘ, তাজমহল, ইডেন্‌গার্ডেন, মনুমেণ্ট, চৌরঙ্গি—সমস্ত। তুমি আমার বৌদি না হয়েই পারো না। দিদি আমার একজন আছেন, তিনি থাকেন সি. পি.-তে, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন না।

—আমি তোমার দিদি হয়েই থেকে যাবো, নাটু।

—বা, তা কি হয়? তোমার সঙ্গে দাদার বিয়ে হবে, সানাই বাজবে, চাটনি মেখে পাঁপর খাবো, নতুন জামা পরবো—আমাকে তোমার বিয়েতে কি দেবে শুনি? বাঃ, আমাকে আবার কি দেবে? আমিই তো তোমাকে দেব। আচ্ছা, আমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা,—তার চেয়ে লুকিয়ে তোমাকে দাদার সেই ওয়াটারপ্রুফটা এনে দেবো, বৌদি, বুঝলে?

—আর দিদি হলে বুঝি কিছু দেবে না?

—তাহলে কম দেবো,—জমানো ডাক-টিকিটগুলো শুধু। ভুল হয়নি একটুও—হল্যাণ্ডের পর্যন্ত টিকিট আছে। দাদা সব বেছে দিয়েছেন। ভুল হলে দাদাই কান-মলা খাবেন। আমার কি, আমি তো দেখতেই পাই না।

—তবে তোমার ডাক-টিকিটগুলিই নেবো, নাটু।

—তার মধ্যে গোটা তিরিশ ও-বাড়ির বিশুটা চুরি করে নিয়েছে। তুমি যদি পারো ওর থেকে আদায় করে নিয়ো, বৌদি।

অশ্রু হেসে বললে—বা, আমি যে তোমার দিদি হয়ে গেলাম।

—ছাই, ডাক-টিকিটগুলো ছাই। তার চেয়ে দাদার ওয়াটার-প্রুফটা ঢের বেশি টেঁকসই। আমি কতো দিন বৃষ্টির সময় সেটা গায়ে দিয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সে যে কী মজা, তুমি তা ভাবতেই পারো না। বুঝলে, বাইরেটা সব ভিজে যাচ্ছে, ভেতরের জামা কাপড় যেমনি ঠিক তেমনি। তুমি দেখনি? তোমার নেই তো? তুমি কাউকে কিছু বোল না, আমি ঠিক তোমাকে এনে দেবো দেখো। ঘর-দোর সব আমার মুখস্থ। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি নামে, তুমি ওটা পরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ো, —সে যে কী মজা—দেখো, দাদাকে যেন বলে দিয়ো না।

—কিন্তু ডাক-টিকিটই যে ভালো ছিল—কতো রাজার কতো রকম মুখের ছাপ। কেউ হাঁদা, কেউ উটের মতো, কেউ বা একটা বন-বেড়াল।

মুখ ম্লান করে নিচের ঠোঁট উলটিয়ে নাটু বললে—সে-সব আমি কবে ছিঁড়ে ফেলেছি। বেশ, মাকে গিয়ে জিগ্‌গেস করো না। আমার বাক্সে তো আর চাবি নেই, বেশ নিজেই দেখে এসো না। উটও চিনি না, প্যাঁচাও চিনি না।

মা বললেন—নিচে এসো অশ্রু, চুল বেঁধে দি।

তবু কথাটা মা সোজাসুজি পাড়তে পারলেন না। বললেন—বাপের বাড়ি যাবে না একবার?

স্পষ্ট করে অশ্রু উত্তর দিলো: না।

—সে কি মা? তিনি তোমার বাবা—

—হোন। যিনি আমাকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছেন, পা স্পর্শ করে তাঁকে অপমানিত করতে চাইনে।

—কিন্তু তুমিই তো সেদিন নিজে ইচ্ছে করে বেরিয়ে এসেছিলে।

—ভাগ্যিস বেরিয়ে এসেছিলাম, মা। নইলে এতদিনে হয়তো সমস্ত প্রেরণার সঙ্গে আত্মপ্রসাদের প্রেরণাও খুইয়ে ফেলতাম। আমার সে গভীর সত্যসন্ধানের চেষ্টাকে বাবা-কাকারা মর্যাদা দেবেন আশা করিনি, কিন্তু তাঁদের নীতিসংহিতা অনুসারে অন্যায় যদি একবার করেইছিলাম তবে, এক কণা ক্ষমাও আমি পাবো না —অতটা হীন আমি নই. মা।

মা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—শুনেছি তোমার পরের আচরণগুলিও তাঁদের মনঃপূত হয়নি, চিরকালই তুমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছ।

হেসে স্বচ্ছ স্বরে অভ্র বললে—বিরুদ্ধাচরণ সব-সময়েই প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু করতে হয়। বাবার কথা শুনতাম, বিবেকের বিদ্রোহী হতে হতো। সব জিনিসই সব মানুষের সয় না, মা। বিকেলে স্নান করলে অনেকের হয় সর্দি, কারুর কারুর দাঁড়ায় নিমোনিয়া। কিন্তু বিকেলে স্নান না করলে আমার হয় না হজম। আমাদের বিলু রোজ একটা পর্যন্ত রাত জাগে স্ট্রিকনিন না খেয়ে, ঘড়িতে দশটা বাজলেই আমাকে যেন কে মরফিয়া খাওয়ায়। মাদ্রাজি মেয়েরা দেয় কাছা, ছেলেরা পরে লুঙ্গি।। যার যেমন ধাত, তেমনি তার ধৃতি।

—কিন্তু বাবার বাড়ি তুমি যাবেই না?

—সে-বড়াই দেবী-আদি-দেবী পার্বতীরো শোভা পায় না। যেতে আমি যে-মুহূর্তে পারি, তবে সসম্মানে; হাঁটু আমি দোমড়াতে পারবো না। যাকে সত্য বলে করায়ত্ত করেছি, করজোড় করতে গেলেই তা সংকুচিত হয়ে আসবে। বাড়িতে আমার দু'টি আকর্ষণ ছিলো—মা আর তিনু। আমার মৃতবৎসা মায়ের আমরাই দু'টি সন্তান সশরীরে আঁতুড়-ঘর ছেড়ে গৃহবাসের যোগ্য হয়েছিলাম—আর সবার আট-কড়ায়েই দম আটকেছে। সন্তানের ঋণ শোধ করতে মা ফতুর হলেন—দল বেঁধে এলো কাকিমারা। তোমাদের গ্রাম্যগৃহস্থকন্যার আদর্শরূপিণীরা। তিনু গেল জলের ওপরে, আর আমি জলে। বাবার বাড়ি কি করতেই বা যাবো? শুনছি বাবা নাকি কোন সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে দেশ পর্যটন করছেন। কাকারা এক-একটি কাক। রক্ষে করো, মা।

মা বিনুনিতে ফাঁস দিতে দিতে শুধোলেন: তুমি তাহলে এখন কি করবে?

—যা করছিলাম। মাস্টারি। কাজের মধ্যে দুই—হাই-তোলা আর পরীক্ষার

কাগজ-দেখা। তবে মাস্টারিতেও কায়েমি কাহিল হতে চলেছে। কি করবো, কিছু কি ঠিক বলা যায়, মা? তুমিই বলো না, কি করা যায়?

এইবার অনায়াসে কথাটা মা পাড়তে পারতেন, কিন্তু প্রভাত বেরোবার পোষাক পরে এসে বললে—তোমার যে এখন চুল বাঁধাই হয়নি। যাই বলো, মেয়েরা যতোই কেননা দম্ভ করুক, বেশবিন্যাস-ব্যাপারে তারা চিরটা কাল পুরুষের থেকে পিছিয়ে থাকবে। তবু মেয়েদের কতো কম ঝক্কি। একটা পেটিকোট, আর দুটো-তিনটে সেফটিপিন-এর তো ব্যাপার। পুরুষের কত মাল-মশলা। হাতে ঘড়ি বাঁধা, মনিব্যাগে পয়সা-নেওয়া, রুমালটা সাফ আছে কি না, দেশলাইটা কোথায় ফেললো—কতো তার হিসেব, কতো তার ফ্যাসাদ। বলি, বেরোবে না?

অশ্রু হেসে বললো—পাগল! এমন মাকে ছেড়ে কোথায় বেরোব?

প্রভাত একাই বেড়াতে বেরোল। অশ্রু বলল— আমি যদি এখানে কয়েক দিন থাকি, আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো মা? আমাকে সবাই যতো খারাপ ভাবে আমি ততো খারাপ সত্যিই হয়তো নই। দেবে না মা থাকতে?

—নিশ্চয়, এখানেই থাকবে বৈ কি। এখানে যদি তোমার আশ্রয় না হয় তাহলে সে যে তোমার বড় দুর্যোগ, মা। কয়েক দিন কেন—আমরণ, অশ্রু।

ইঙ্গিতটা এর চেয়ে আর কি স্পষ্ট হবে। অশ্রু উঠলো শিউরে। কিন্তু মুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি কোনো কথা এলো না। চুল বাঁধা সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়াতেই তার মনে হলো এ-সংসারের সমস্ত মাধুর্য যেন নিঃশেষে শুষে গেছে। এখন বেরিয়ে পড়লেই তো চুকে যায়। কিন্তু বেড়িয়ে পড়ার মধ্যেই বীরত্ব নেই। ছাদের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে অশ্রু মোটর গাড়ির নম্বর দেখতে লাগলো। কিন্তু দৃশ্যজগতের বাইরে মন আবার কখন অন্ধকারে ডুব মারে, সেখানে অপরিচয়ের পরিধিহীন সমুদ্র তাকে ডাক পাঠিয়েছে! কোথায় এবার সে যাবে, জীবনে আবার তার ফেরবার আশ্রয় কোথায়? সে কি শুধু মৃত্যু? এই প্রাণ-স্বাদের অভিযানে কি কোনো গভীরতম তৃপ্তিতে তার কামনার সমাধি হবে না?

সন্ধ্যা হতেই প্রভাত ফিরেছে। দুপুরেই তার ঘর অশ্রু গুছিয়ে রেখেছিল। দরজা খুলতেই চোখে লাগলো ধাঁধা। আলো জ্বালা হয়নি—তার বিছানার ওপর অশ্রু শুয়ে। প্রভাতকে ঢুকতে দেখেও অশ্রু উঠে বসলো না, মলিন মেঘজ্যোতির মতো বিছানার সঙ্গেই মিশে রইলো। প্রভাত ক্যাণ্ডালটা জ্বালালো। বললো: শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

অশ্রু শুয়ে শুয়েই বললো: মা কিছুতেই রাত্রে রাঁধতে দিলেন না। হাতে আর

কোনো কাজ নেই—তুমি কখন ফেরো, তাই শুয়ে আছি। তোমার নতুন উপন্যাসের কিছুটা পড়ে শোনাও, তাই খানিক শুনি না-হয়।

কথার সুরে কেমন-যেন একটা করুণ ক্লান্তির আভাস। প্রভাত বিস্মিত হলো। তাড়াতাড়ি তার গা ঘেঁষে বসে বললো : নিশ্চয়ই তোমার মন ভালো নেই. কি হয়েছে আমায় বলো।

অশ্রু উঠে বসে বললো : তুমি পাগল হয়েছ। মন আমার কাছে ব্যাধি নয় যে তার দ্বারা আক্রান্ত হব। আছি আমি ভালোই, কিন্তু এর পর কি করা যায় তাই ভাবছি।

প্রভাত জিজ্ঞেস করলো : কিসের পর ?

—এলাহাবাদ থেকে কলকাতা আসার পর।

—এলাহাবাদের জন্যে কষ্ট হচ্ছে ?

—একটু একটু—নির্মলের জন্যে।

প্রভাত বললো : তা আর আশ্চর্য কি।

—আশ্চর্য নিশ্চয়ই। মানুষ যে-আদর্শ ই ধরুক তার অপ্রাপ্তি ঘটে বলেই তার ট্রাজিডি নয়। সে-আদর্শকে সে আঁকড়েই থাকবে এইটেই তার অধঃপতন। আদর্শকে বড়ো রাখতে গিয়ে নিজেকে ছোট করার মতো অবনতি আর কি হতে পারে ?

প্রভাত বিছানার ওপর সরে বসলো : কথাটা খোলসা করে বলো।

—নির্মল বিবাহকে জীবন-যৌবনের পরমৈশ্বর্য বলে ধরে নিয়েছিলো ; ইন্দিরাকে আন্তরিকতা দিলো, কিন্তু অন্তর দিতে পারলো না। সেইটেই তার খর্বতা। আদর্শকে ছোট রেখে নিজেকে মহীয়ান করা ভালো, নিজেকে কালো করে আদর্শকে অদৃপ্ত রাখাটা বাহবার নয়। ইন্দিরাকে সে বিয়ে করেছে - এইখানেই তার কর্তব্যের শেষ ; পরিশিষ্ট যেটুকু তার আছে তা নিতান্ত স্থূল। প্রেমহীন দেহভোগ আর গণিকাবৃত্তিতে তফাৎ কোথায় ? তাই আগাগোড়া মনে হয় এমন সতীত্ব একটা সস্তা জলুস মাত্র ; মন সায় দেয় না।

—কিন্তু ইন্দিরা ?

—তার কথা সবিস্তারে বলে তোমার নারীজাতির প্রতি ফ্যাশানেবল বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেবো না। ইন্দিরাকে আমি ক্ষমা করি, তাকে বিচার করবার সহজ মানদণ্ড পাই। সে ব্যক্তিত্বের চেয়ে সমাজকে বড়ো করে দেখে, বেগের উচ্ছৃঙ্খলতার চেয়ে জড়তার অবসাদ,—বিস্তারের চেয়ে সংকীর্ণতা, চাঞ্চল্যের চেয়ে সামঞ্জস্য ! তাকে অনায়াসে বোঝা যায়, শ্রদ্ধাও করা যায়। রমাপতির প্রতি—

প্রভাত বাধা দিয়ে বললে—তোমার এ-সমস্ত স্বগতোক্তির কোনো মানেই আমি

বুঝতে পারবো না, যতক্ষণ না তুমি বুঝিয়ে বলো ইন্দিরার সঙ্গে রমাপতির সম্পর্কটার মধ্যে শব্দগত কোনো অর্থানুকূল্য আছে কি না।

একটু হেসে সংক্ষেপে অশ্রু কুশীলববর্ণনা সেরে নিলো।

—রমাপতির প্রতি ইন্দিরার প্রেমের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য না হোক, প্রবলতা আছে। এবং এই প্রবলতাই তাকে হয়তো একদিন পবিত্র করে তুলতো! কিন্তু নির্মলের ঔদাসীন্য ও নিস্তেজতাই এর বাধা। তবু তার চেষ্টার সীমা নেই। প্রেম পাওয়াটা দেব-দুর্লভ, কিন্তু পেয়ে গেলে অতি সস্তা অতি বাজে—তার পাওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই মহত্ত্ব। নির্মল যদি নিরুত্তর না থাকতো, যদি তার কামনায় থাকতো কবিত্ব, প্রয়োজনসাধনে থাকতো প্রযোজনার প্রসাধন, তাহলে ইন্দিরার জীবন শকুন্তলারই মতো হয়তো সার্থক হতো। কিন্তু এ-বিষয়ে নির্মলের নির্মমতার মার্জনা নেই। আমাদের দেশের বিয়েতে এ-বিষয়ে বরবধুর একটা অত্যুগ্র অসহিষ্ণুতা থাকে। স্বভাবে মেয়েরা নিষ্ক্রিয় বলে দোষটা বেশির ভাগ পুরুষেরই। পাওয়াটাকেই প্রাধান্য দিয়ে চাওয়াটাকে আর ধন্য করবার জন্য দেরি করে না। নির্মল সেই ভুলই করেছিল, ভেবেছিল সেই ভুলই তার সংসার-সমুদ্রের ভেলা। ইন্দিরাকে সে হয়তো চাইতোও, কিন্তু ইন্দিরা অন্যার্থে রমা, ও তার দক্ষিণ দিকে একটি পতি থেকেই তাকে পতিত করেছে। সেই ট্র্যাজিডিটা ইন্দিরার যতো না ততো নির্মলের। এর যে কোথায় গিয়ে সমাধান হবে সে-চিন্তা আমাকে দোলা দিয়েছে। তা ছাড়া নির্মলের মাঝে সহনশীলতাই আছে, উদারতা নেই। যে-যুগে আঠারো বছর আগে মেয়ের বিয়ে হয় না, তার জীবনে সামান্যতম দুর্ঘটনাটিও ঘটবে না, মাটির নিচে পচে পচে সে খালি স্বামীর ভোগেই ওল্ড ওয়াইন হবে—এমন একটা ক্ষমাহীন মনোভাব অসহ্য। ইন্দিরাকে মুক্তি না দিক, শ্রদ্ধা দেওয়া উচিত ছিলো। যৌবনকে সে স্পন্দিত রেখেছে, কল্পনাকে সৃষ্টিশীল। চিরাচরণ যে একটা মহত্ত্বই নয় এ-কথা আমরা বুঝবো কবে? সাময়িকতা, সংযম আর স্বাস্থ্যই হচ্ছে জীবনের মূল্যধারক। সংযমটা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেই মহৎ, সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেই সুন্দর। কিন্তু ও সব কথা যাক ; কি নিয়ে বইটা লিখছ ?

অশ্রুকে প্রভাত ধীরে স্পর্শ করলো, ঠিক বাহুর কাছটিতে : ও-কথাও থাক।

—না, তবু বলো! শুনতে আমার বেশ লাগবে। তুমি যে খালি কেরানি এ কথা ভাবলে আমার হাঁপ ধরে, তুমি সাহিত্যিক—আমি তাতে মুক্তি পাই, প্রভাত। মানুষের পরিচয় কি করে তাতে নয়, কি সে হয়। এবং হওয়ার মূলেই তার সৃষ্টিপ্রয়াস। যে নিজেকে সৃষ্টি করে না তাকে আমি মানুষ বলি না। সে-হিসেবে কেরানিও কবি হতে পারে বৈ কি।

—আমাদের দেশে কেরানির গুণ-নির্দেশ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু কোনো বড়ো বিষয় নিয়েই তোমার সঙ্গে আজ আর তর্কালোচনা করতে সাধ হচ্ছে না। আমরা দু'জনে মিলে এই যে মুহূর্ত ক'টি রচনা করেছি তার তুলনায় কোনো উপন্যাসই বাস্তব নয়, অশ্রু।

অশ্রুর কোনো সাড়া মিললো না দেখে প্রভাতকে সেই কথাই পাড়তে হলো : উপন্যাসটা পলিটিক্যাল। কোনো cult নিয়ে নয়, আমাদের এত বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস। যৌবনারম্ভ থেকে বার্ধক্যোত্তীর্ণ নায়কের একটা ধারাবাহিক ভাববিবর্তন। মোটামুটি সেইটেই থীম। যা লেখা হয়েছে তাতে চাখবার মতো হয়নি। কিন্তু ভাবছি কথাগুলোকে অত্যন্ত পারস্পরিক ও ব্যক্তিগত করে তুলি। কি বলো ?

ঘন হয়ে সরে এসে অশ্রু বললে—বলো।

প্রভাত প্রশ্ন করলো : ফিরতে তোমাকে এক দিন হতোই—আমারই ঘরে, আমারই শয্যায়, নয় কি ?

অল্প একটু হেসে অশ্রু বললে—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তো তাই মনে হবে। তুমি আমার কত বড়ো বন্ধু তা আমার হৃদয় যেমন জানে দেহকে তত জানতে দিতে চাইনে। ভয় করে। তবু মা আমার এখানে থাকবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছেন, নাটু আমাকে তোমার ওয়াটার-প্রুফ উপহার দিতে চাইছে, দিদি হলে খালি ডাক-টিকিটগুলি—তাও নাকি সব নেই, বিশুই সাবড়েছে। তোমাদের ঠিকে-ঝি পর্যন্ত বললো : এ বৌ আনলে মা, কপালে সিঁদুর দাওনি ? আমি তো হেসেই খুন। মা বললেন : শিগ্‌গিরই হবে, লক্ষ্মী যখন এলেন তখন তাঁকে আমরা বেঁধে রাখলাম। নেপথ্য থেকে শুনে আমি হাসি।

প্রভাত বললে—সম্পর্ককে সহজ করে না দেখালে সমাজের সায় মেলে না, ঐ ঠিকে ঝিটি পর্যন্ত সমাজের প্রতিনিধি।

—তাই তো দায়। ছুটির ক'টা দিন তো আমার এখানেই কাটাতে হবে। হোটেলে বেশি দিন থাকলে আমার মনি-ব্যাগটি পটল তুলবেন। তোমার সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে আমার ভারি ভালো লাগবে—ঊষা থেকে সন্ধ্যা, আবার পরিপূর্ণ রাত্রি। রাত্রিটা অবিশ্যি মা'র বিছানায়।

—কিন্তু ছুটির ক'টা দিন মাত্র ?

—ও হরি ! তুমিও আমাকে কায়েমি করতে চাও নাকি ?

প্রভাত অশ্রুর হাতের ওপর হাত বুলুতে বুলুতে বললো—যদি অমন হালকা করে না বলো, তো বলি, চাই অশ্রু।

খানিকক্ষণের জন্য অশ্রু স্তব্ধ হয়ে রইলো, বোধ হয় চোখের পাতাটিও নড়লো না। ধীরে গদ্‌গদগাম্ভীর্যে বললে—আমি একদিন বিবাহের সভা থেকে পালিয়ে এসে তোমারই দুয়ারে কড়া নেড়েছিলাম। তোমার দুই চোখ অশ্রুমথিত, দেহ অবসন্ন। সেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম হঠকারী বিদ্রোহিণীর বেশে, আজ এসেছি স্থিতধী তপস্বিনীর বেশে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে! সেদিন যে বেরিয়ে এসেছিলাম আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে মাত্র, তোমাকেই বিবাহ করতে নয়।

প্রভাত স্নিগ্ধ স্বরে বললো - সে আমি জানতাম। কিন্তু সেদিনের বন্ধুতা কি নিভৃত নৈকট্যের জন্য তৃষিত হয়ে ওঠেনি?

—হয়তো উঠেছে, কিন্তু স্থায়িত্বই কি প্রেমের বড়ো পরিচয়, তার প্রচুরতা কি কিছু নয়? তুমি কি মনে কর দুটো দেহ একসঙ্গে বেঁধে দিলেই কি প্রাণ একত্র হলো? আনন্দ হলো সহজ?

—কিন্তু প্রাণ যখন একত্র হয়, তখন দেহের আর পার্থক্য কোথায়? দেহ সম্বন্ধে তোমার এত ভয় কিসের? পৃথিবীতে দেহের মতো ঐশ্বর্য আর কোথায় আছে—বিধাতার আদিম কীর্তিস্তম্ভ।

অশ্রু প্রভাতের কাঁধের ওপর দেহ প্রায় হেলালো। বললে—কবিতায় দেহ মন্দির, মানি; কিন্তু বিজ্ঞানে দেহ মিউজিয়ম। দেহ সম্বন্ধে আমি নিদারুণ পৌত্তলিক। কিন্তু প্রয়োজনের নিয়মে একে বাঁধতে গেলেই এক রাতে সে এঁটো-কাঁটা ফেলবার সামান্য একটা উঠোন; শ্যামলতাই যদি পৃথিবী হতো তাহলে মানুষ আর ভূমিকম্পের ভয়ে কম্পমান থাকতো না। রঙ বা লাবণ্যটাই দেহের সব নয়—ওটা পৃথিবীর শ্যামলতার সামিল। অন্তরালে এর কতো স্নায়ু কতো শিরা কতো প্রক্রিয়া কতো কারুকার্য। বিশ্বাসঘাতক দেহকে আমি ভীষণ ভয় করি। যখন সে বিশ্বাসঘাতক, তখনই সে ছন্দোহীন, কদর্য।

প্রভাত অশ্রুর হাত দিয়ে নিজের কণ্ঠ জড়ালো: সবই আমি বুঝি, অশ্রু। কিন্তু এমন অন্তরঙ্গতা এমন প্রেমকে কি আমরা উপবাসী করে রাখবো? তাইতেই কি জীবনের শ্রী ফিরবে?

অশ্রু বললে—উপবাসটা শক্তির পক্ষে মাদকদ্রব্য। তোমাকে Donne-এর কথাই একটু বলি তাহলে। সেদিন কি-একটা বইয়ে তাঁর জীবনের একটা টুকরো চোখে পড়েছিল। বাপের অমতে ভালোবেসে জেনে-শুনে তিনি বিয়ে করলেন। কাকার আপিসে কাজ করতেন, এ বিদ্রোহাচরণের ফলে তাঁর চাকরিটি গেল। শোনা গেল বিয়েটা আইনে বাধে, তাই তাঁর হলো জেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দু'বছর রইলেন এক দূরসম্পর্কীয় ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে। দু'বচ্ছরে

দু'টি সন্তান হলো। পরের বছরে আরেকটির সম্ভাবনা। স্ত্রী যখন প্রসববেদনায় মুহ্যমান, Donne তখন ঘরে বসে কবিতা লিখছেন : যদি এখন মরি, তোমার কাছে এই প্রার্থনাই জানাই ভগবান, জন্মজন্মান্তরে যেন স্ত্রীর সঙ্গে আর দেখা না হয়। একটার পর একটা ছেলে হয়, আর মরে—Donne-এর কবর দেবার পর্যন্ত পয়সা নেই। তাঁর Biathanatos পড়েছ ? তাতে তিনি আত্মহত্যার গুণগান করেছেন,—এই দেহ তাঁর বন্দীশালা, দরজার চাবি তো তাঁরই হাতে। কিন্তু কবিতাই তাঁকে রক্ষা করেছিল। বারোটি সন্তান প্রসব করে Donne-এর স্ত্রী প্রসবযন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পেলেন ; সাতটি সন্তান বেঁচে ছিল, তাদের Donne প্রতিজ্ঞা করালেন কখনো যেন তারা বিয়ে না করে। ইতিহাসে অবিশ্যি তাদের কথা কিছু লেখা নেই। এখনো শেষ হয়নি সবটা। স্ত্রী মৃত্যুর পর Donne-এর জীবনে আরেকটি নারীর অভ্যুদয় হলো—Anne More। স্ত্রী হয়ে এলো না বলেই বাকি কয়েকটা দিন Donne কবিতা লিখতে পেরেছিলেন।

প্রভাত বললে—সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের একটা নিদারুণ উদাহরণ খাড়া করে আমাদের কেউ শাসাতে এলে আমরা ব্যঙ্গ করবো। আমাদের ছন্দজ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আমাদের হাতের মুঠোয়।

—জানি, কিন্তু মূল ইঙ্গিতটা দু' শ' বছর পরেও ম্লান হয়নি। তাহলে তখন তুমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেরানিই হয়ে থাকবে, কবির আকাশ তখন উবে গেছে। আর তোমার এতো বছরের ভারত-মুক্তি-সাধনার ইতিহাস মুদির দোকানের হিসেব হয়ে উঠেছে। উদর তখন একটি বড়ো সমস্যা। তুমি মাইনে পাও নব্বুই, আমি এক শ' পঞ্চাশ—তাও জলপাইগুড়িতে। কলকাতায় এলে আমার পঞ্চাশ টাকা জুটিয়ে নিতেও প্রাণান্ত হবে। যা সামান্ত জমিয়েছিলাম তা ফুরিয়ে যাবে দু' নিশ্বাসে। টাকার সংস্থান না করে কোনো ব্যবসাই উৎরোয় না, বিয়েটা তো পুরোপুরি একটা ব্যবসাই।

—কিন্তু খালি আরাম পেতে হবে এ তোমার একচোখোমি, অশ্রু।

—আরাম না পেলে অভিরাম থাকা যায় না, বন্ধু। দুঃখে-দুর্দিনে সমবেদনার গান বাজারে কাটে বটে, কিন্তু এদিকে সংসারে যে মাথা কাটা যায় ; তা লুকোবে কি করে ? আরাম চাই বৈ-কি। ও বিবাহ-hygienics-এর একটা মূল নীতি। তার চেয়ে আমি থাকি জলপাইগুড়িতে, তুমি থাকো কলকাতায় ছোট সংসার নিয়ে—মা আর নাটু। আমার কাছে তোমার অবারিত নিমন্ত্রণ, তোমার কাছে আমার। মাঝখানে সমস্ত পথ উন্মুক্ত, সমস্ত আকাশ আশীর্বাদময়। তুমি যদি এতে মুখ ভার করো, তবে বুঝবো তুমি খালি আমাকেই চেয়েছিলে, অশ্রুকে চাওনি। যদি স্থায়িত্বের

কথা তোল, বলি, আমিই এক দিন ফুরোব, অশ্রু অবিনাশী। তুমি চুপ করে থেকো না, আমার খারাপ লাগে তাতে।

অশ্রুর মুখখানি প্রভাত নিজের মুখের কাছে সরিয়ে আনলো। পরিপূর্ণ ওষ্ঠপুটে নিবিড় চুম্বন করতে করতে সে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলো : "**I cannot show my love except through carnal things.**"

কাটলো দু' মিনিট। অশ্রু নিজেকে সম্বৃত করে বললো—বিয়ে করায় অনেক সদ্‌গুণ ও সুবিধে হয়তো আছে, কিন্তু আমার-তোমার বেলায় তা আবর্জনা। আমাদের জীবনে তার মার্জনা নেই। তোমাকে পেয়ে আমি একদিন নবাবিষ্কারের সমস্ত প্রেরণা খুইয়ে বসবো. আমার হাতে সে-অপমৃত্যু তুমি সয়ো না। কখন আবার আমাকে তোমার সুসমাপ্ত, নিঃশেষসুধা মনে হবে সে-দিনের অপমান সইতে আমি তিলে-তিলে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবো না। কখন আমাদের সকল ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। এই বেশ, এই ভালো। তুমি আর আমি। আমরা আছি, আমরা আছি—এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আমাদের নেই।

অশ্রু প্রভাতের চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো। হঠাৎ জামার তলা দিয়ে প্রভাতের গলার নীচে হাত ঘন করে রেখে বললে—তোমার মনে আরো বুঝি সন্দেহ আছে?

অশ্রুর চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে প্রভাত বললে—কিসের সন্দেহ? তোমার **constancy**-এর, একচারিতার? আসা যাওয়ার জন্যে দুয়ার যদি খুলেই না রাখি অশ্রু, তাহলে আমাদের প্রেমের আর গর্ব কি নিয়ে। যদি একদিন এলে, তেমনি যদি যেতে চাও একদিন যাবে। দায়হীন বিদায়ের দিনে আবার তোমাকে নিমন্ত্রণ করে রাখবো। স্বাধীনতায় যদি প্রেম স্থায়ী না হয়, তবে শ্মশানে বসে তার কঙ্কাল পুজোর অন্ধতাকে আমরা ক্ষমা করবো কি করে? সে-সন্দেহ আমার নেই, অশ্রু। তোমাকে যদি পাবার গর্ব করে থাকি, হারাবার গর্বও আমারই।

আবেশে অশ্রু প্রভাতের কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। জানলা দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলোকটি রোয়াক ডিঙিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে, আজকের রাতের সেই আলোটি চাঁদের আলোকেও হার মানায়।

মশারির ধার গুঁজতে গুঁজতে মা বললেন—তোমার বাবাকে জানানো দরকার, না, অশ্রু?

অশ্রু শুয়ে পড়েছে। পাশ ফিরে বললে—কিসের জন্য, মা?

কথাটা মা সরাসরি পাড়লেন না : যাই বলো, সমাজের চোখে তিনিই তো তোমার ন্যায্য অভিভাবক। তাঁকে ডিঙিয়ে চলাটা কি তোমার ঠিক হবে ?

উদ্বিগ্ন হয়ে অশ্রু বললে—কথাটা পরিষ্কার করে খুলে বললে উত্তর দেওয়া সহজ হতো, মা।

মা লণ্ঠনটা নিবোলেন। বললেন—ধরো, তোমার বিয়ের খবরটা কি তাঁকে দেওয়া উচিত নয় ?

কথা শুনে অশ্রুর ঘাবড়াবার কথা। মা এবার খোলা সড়কে নেমে এসেছেন, গলি-ঘুঁজিতে লুকোচুরি তাঁর আর সইবে না। তবু অশ্রু কণ্ঠস্বর গম্ভীর না করেই বললে—তাঁকে খবর দেওয়াটা একেবারে বাজে খরচ। তাঁর হয়তো ধারণা আমি এত দিনে একেবারে মরে গেছি। তাঁকে বিরক্ত করে লাভ নেই, মা।

—তবু, তুমি তো তাঁরই মেয়ে। তিনি যখন বর্তমান, তখন তাঁকে একবার জিগ্‌গেস করা উচিত বৈ কি।

—উচিত নয়, মা। আমি যদি বিয়ে করি দময়ন্তীর মতো প্রকাশ্য সভায় মাল্যদান করেই বিয়ে করবো। আর বিয়ে যদি কোনোদিন ভাঙে, তখন সে-সমস্যা আমাকেই মানিয়ে নিতে হবে। সে-দুর্দিনে, যাকে ত্যাগ করেছি তার থেকে খোরপোশের জন্যে আদালতের তাগাদা আমি স্বীকার করবো না, বাবার অন্নও সে-দিন অরুচিকর। ভাগ্যের বিধান মেনে নিতেও যদি আমি একা মা, সেই ভাগ্যকে নির্মাণ করতেও আমি একাই পারবো। কিন্তু হঠাৎ আমার বিয়ের ভাবনায় এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন বলো দিকি ?

অশ্রুর একখানি হাত মা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বললেন—আসছে অগ্রহায়ণে প্রভাতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো, মা।

অশ্রু ঢোঁক গিললো। পর মুহূর্তেই পরিষ্কার গলায় বললে—অগ্রহায়ণ ? সে অনেক দেরি, মা। ততক্ষণ আমরা ঘুমুই।

—তবু তোমার বাবা-কাকাদের মত না পেলে মন যে ভারি খুঁৎখুঁৎ করে।

—তার চেয়ে, আমার মত আছে কি না সেইটেই বড়ো জিজ্ঞাস্য। আমার মত থাকে, তাহলেই সমস্ত উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব থেমে যাবে, মা। আমি তো আর বিপণির পণ্য নই যে বাবা-কাকারা দর হাঁকবেন ? কিন্তু আমি সে কথা বলছি না—বলছি—

কথা কেড়ে নিয়ে মা বললেন—তোমার মত ? মায়ের চোখের সামনে কিছুই আর লুকিয়ে থাকে না। আমার প্রভাতের ওপর তোমার কী যে মায়া সে আমি স্বচক্ষে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না।

—তা হয়তো করতে না, কিন্তু বিয়ে আমাকে করতেই হবে এমন একটা মারাত্মক সর্বনাশের কথাও কি মা'র চোখে পড়লো না? পাছে তোমার প্রভাতের ওপর মায়া মরে যায় মা, সেই ভয়েই আমি পিছিয়ে রইলাম।

অশ্রুর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ কম্পালেশহীন দৃঢ়তার আভাস পেয়ে মা বিস্মিত হলেন; সে কি কথা, অশ্রু?

অশ্রু স্নিগ্ধস্বরে বললে—বিয়েটা সান্নিধ্যের একটা কদর্য আতিশয্য, মা; এত সব ছন্দের কারুকার্য বজায় রাখতে হয় যে প্রাণবস্তুটিই বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। সে-ভাবহীন কবিতা নিয়ে কোনো কল্পনাস্বর্গেই আর ছাড়পত্র পাওয়া যায় না, প্রাচীরাবদ্ধ সংসারের সংকীর্ণ উঠোনটুকুর মধ্যেই তার ইতি। লাভ করাটাই বড়ো কথা মা, লোভ করা নয়।

মা বললেন—তুমি তাহলে বিয়ে করতে চাও না?

—সম্প্রতি আমি প্রস্তুত নই বলেই যে কোনোদিনই বিয়ে করতে চাইবো না, জীবন-ভবিষ্যতের ওপর আমার তেমনি অনাস্থা নেই। তবে এ-কথাটা আমাকে বলতে দাও যে, বিয়েটাই মেয়েমানুষের সব-কিছু নয়, মা। মৃত্যুর মতোই সে একটা অবশ্যম্ভাবী শারীরাবস্থা নয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নির্দেশানুসারে বিয়েটা এককালে বহুকীর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু বিজ্ঞান এখন অনেক পুরোনো তথ্যই বাতিল করে দিয়েছে। প্রয়োজনের দিক থেকে বিয়েটা তো অকিঞ্চিৎকরই, ধর্মের দিক থেকেও তুচ্ছ। পরত্র নিয়ে আমাদের আর ভাবনা নেই মা, যত ভাবি ইহের জন্যে। সেই আমাদের বড়ো ধর্ম, সেইখানে আমাদের অর্থ হলেই মোক্ষলাভ। কথাটা তোমাকে খুলে বললাম, মা।

খুলে বললে কি হবে, মা সেই যে মুখ ফেরালেন একটিও আর কথা কইলেন না। মুহূর্তে তাঁর মন আবার বিষিয়ে উঠতে লাগলো। পর দিন ভোরবেলা প্রভাতের ঘরে ঢুকে মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘুম থেকে উঠে প্রভাত ব্যায়াম সেরে তখন বোধহয় খাতা-কলম নিয়ে বসছিল, মা'র অনিদ্রাতপ্ত চোখ-মুখের রুক্ষতা দেখে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই মা শুধোলেন: তোরা বিয়ে করবি না?

প্রভাত এখনো নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি। ঢোঁক গিলে বললে—এই সন্দেহটা এমন কি ঘোরালো যে, এত উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছ? অশ্রু কিছু বলেছে বুঝি?

মা একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন: সাধে কি অমন মেয়ের বাপের বাড়িতে স্থান হয় না? অনাসৃষ্টির চূড়ান্ত। বিয়ে হবে না, অথচ এই আপনা-আপনি, এই মাখা-মাখির মানে কি?

প্রভাত বললে—কথাটা শুনতেই হয়তো খারাপ মা, কিন্তু মানেটা তো তুমিই জানো। অশ্রু তেমন মেয়ে নয়, যাকে নিয়ে সংসারের সুবিধে বাড়ে। কিন্তু বন্ধুতার বেলায় ও অপরাজেয়। নর-নারীর সমস্ত বন্ধুতাকেই বিয়েতে পর্যবসিত করতে হবে এমন নিয়ম চালাতে গেলে তোমাদের জাতিভেদ আর বাঁচে না। বিয়েটা দাবার চালের মতো স্থির মস্তিষ্কে ভাববার কথা, মা। রুগ্ন যে, সে বিয়ে করে সেবা পেতে, সংসারে মন যার উড়ু-উড়ু সে চায় খাঁচা, দোজবরে চায় অভ্যাস-রক্ষা। কিন্তু যেখানে এমন কিছু লজ্জা ঢাকবার হাঙ্গামা নেই, সেখানে বিয়ে না করাটাই স্বাস্থ্য, মা।

মা চটে বললেন—আমি অত-শত বুঝি না প্রভাত, অগ্রহায়ণেই আমি তোর বিয়ে দেবো কৃষ্ণদয়ালবাবুর মেয়ের সঙ্গে। অশ্রু যাবে কবে বাড়ি ছেড়ে?

প্রভাত বললে—থাক না, আমার বিয়ের নেমন্তন্নটাই খেয়ে যাবে না-হয়।

রাতের পর রাত কাটে। এ-সংসারের সকাল-সন্ধ্যার রূপ যেন বদলে গেছে; রৌদ্রে ঝরছে সোনার কণা, জ্যোৎস্নায় মুক্তোর কুচো। যে-বয়সে লক্ষ্মী ছিলো চঞ্চলা, মনোরথপ্রিয়তমা, সেই যেন এ-সংসারে এসে বাসা নিয়েছে, কিন্তু বাঁধন তার বড়ো আলগা। মা'র দুই হাত অলস—অশ্রুই দিনে-রাত্রে দু' হাতে ছোট সংসারটাকে নিয়ে সাজাচ্ছে, তার সাজ খুলছে। এই আচরণটাই তার সুশ্রী হতো যদি তার মাঝে থাকতো সহজাধিকারের সম্পর্ক; তা নয় বলেই মা'র কাছে তা অমিতাচার। আইনের ওপর যে-দাবি প্রতিষ্ঠিত নয় তার বাদী না হয়ে মা পারবেন কেন? তিনি দস্তুরমতো ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করলেন।

অশ্রুর দেখাদেখি প্রভাতো আজকাল পাঁচটায় শয্যা ছাড়ে; সদ্য-জল-দেওয়া রাস্তার ওপর দিয়ে দু'জনে বেড়াতে বেরোয়। সারা রাস্তা অসাড়, আকাশের শুকতারাটি তখনো নির্নিমেষ। দূরের রাস্তায় গ্যাস দু'একটা করে নিবছে, বাস একটা দেখা যায়। কোনোদিন যায় মাঠে, কোনোদিন অলি-গলিতে। জ্যোতির্জগৎ থেকে শুরু করে জন্মনিরোধ পর্যন্ত কোনো বাক্যালাপই ওদের মধ্যে নিষিদ্ধ নয়। ব্যাস ও বাৎসায়ন দু'জনকেই ওরা কম-বেশি প্রাধান্য দেয়। রোদ উঠতে না উঠতেই ফিরে আসে। প্রভাত তার মোটা খাতা নিয়ে বসে কলমের কালি ঝাড়ে, অশ্রু নিজের ঘরে গিয়ে বই পড়ে, রাশি-রাশি চিঠি লেখে, তারপর সংসার নিয়ে মেতে ওঠে: ঝাঁটপাট, বাসনমাজা-তক। সংসারকে ও কবিতার মতো সৃষ্টি করতে চায়—মিল চাই, ছন্দ চাই, এমন কি যতি-চিহ্নও বাদ দেবে না। দুপুরটা ফাঁকা, প্রভাত

চলে যায় আপিসে ; অশ্রু না-ঘুমিয়ে, চরকা না-ঘুরিয়ে ছবি আঁকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখে ওরো ছবি আঁকতে শখ গেছে। সেই জন্য cubism সম্বন্ধে বই কেনে। কোনোদিন মাকে জানিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ে, নারী-মঙ্গল-সমিতিতে নয়, বা আর কোনো মহৎ প্রতিষ্ঠানে নয়—বেরিয়ে পড়ে টহল দিতে, কখনো কখনো পরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত মেয়ে-মহলে গিয়ে আড্ডা দিতে। পাশের বাড়ির একটা বউয়ের নাগাল পেয়ে ও গলির এ-প্রান্ত থেকে শুরু করে পাড়ার অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। হাতের তাস কেড়ে রেখে মেয়ে-মহলে ও বাক্যের তুফান চালায়, বই পড়তে দেয়, গান গায়, ছবি দেখায়। ওর মিত্রের সংখ্যা মাত্রা হারালো। এক দিন কি অদম্য কৌতূহলে ও দুপুরবেলায় একটা গণিকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু সে-কথা থাক।

—কেন থাকবে ? বল না ! প্রভাত আপত্তি করলে।

—রাস্তাটার যে জাত নেই জানতাম না, কিন্তু সেদিন ভাল করে জেনেছি বলেই মনে হচ্ছে ওর ভোল ফেরাতে হবে। মেয়েটির নাম সুরভি। কথায়-কথায় জানলাম লেখাপড়া শিখতে বড় আগ্রহ। যদি এখানে কিছুদিন থেকে যাই, ওকে ঠিক আমি মানুষ করবো। মূক পর্যন্ত পড়তে পারলো, কিন্তু মুক্তি-কথাটা মুখ দিয়ে আর বেরুলো না। দেখি, কি করা যায়। একটা প্ল্যান ঠিক করে ফেলতে হবে।

বিকেলে দু'জনে আবার বেরোয়। বেরোবার আগে অশ্রু ব্যায়াম করে। অবশ্যি রাষ্ট্রানুমোদিত পোষাকে। এবার যায় বেশির ভাগ টকিতে, কখনো-কখনো হাসপাতাল দেখতে, কখনো বা চীনে হোটেলে। রাত্রে ফিরে এসে ঘণ্টা তিনেক প্রভাতের ঘরে নানারকম তর্ক চালায়। স্বর সপ্তগ্রামে উত্তীর্ণ হয়। উদ্বেল দুধের ফেনায় ফুঁয়ের মতো এক পক্ষের একটি অতর্কিত চুম্বনে তর্কের ঝাঁজ নিমিষে জুড়িয়ে আসে। সেই সাধারণত অধর এনে যুক্ত করে যার যুক্তি ফুরোয়। রাত্রে অশ্রু প্রায়ই উপোস করে। মাঝরাতে প্রভাতকে শুইয়ে কপালে চুমু খেয়ে হাতের পাতায় খানিকক্ষণের জন্যে হাত রেখে ক্ষীণায়মান দিবাবসানের মতো অশ্রু ধীরে অপসৃত হয়। মার কাছে শুতে আসে। ইদানি মা আর হাঁ-হুঁ কিছুই করেন না। এর পর কি হবে ভাবতে ভাবতে অশ্রু ঘুম যায়।

মা'র আর সইলো না। অবশ্যি একটা রাগারাগি মাতামাতি করলে কোনোই সুরাহা হবে না, বরং তাল কাটবে। বেশি মোচড় দিতে গেলে ঘড়ির স্প্রিংই যাবে আলগা হয়ে। কাশীর অন্নপূর্ণা পুজোয় ওঁর চলনদার জুটেছে। পোঁটলাপুঁটলি বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে মা নাটুর হাত ধরে বললেন—যাই।

প্রভাত হাঁ-না করেনি, খবরটা তার কাছে পুরোনো। মা'র ধর্ম লিপ্সাই যে

তাঁকে টেনেছে শাদা বুদ্ধিতে সে তাই বুঝেছে, কিন্তু অশ্রুর লাগলো খটকা। সে বললে—আমাদের একলা ফেলে যাচ্ছ কি, মা?

মা বললেন তোমরা একাই তো থাকতে চাও।

অশ্রু প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে মেঝের দিকে তাকালো। দায়া না হয়েই সে মাতা-পুত্র বিদীর্ণ করলো নাকি? কিন্তু এই অবারিত উন্মুক্ততার মধ্যে সে তার বন্ধুতাকে কতো কাল জিইয়ে রাখবে? সে বললে—তার চেয়ে আমিই চলে যাই না কেন, মা?

মা বুঝলেন অশ্রুর কোথায় বেজেছে। তাড়াতাড়ি তার মাথায় হাত রেখে বললেন—ছি মা, তুমি যাবে কি? এই ঘর-সংসার তোমার হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। যদি সময় পাও, একদিন বুঝবে মা, এর ভাণ্ডারে রসের আর থৈ নেই! সে-দিনটি যেন তোমার জীবনে আসে। তোমাকে এর চেয়ে বড়ো আর কী আশীর্বাদ করবো?

চলনদার ব্যস্ত হয়ে হাঁক পাড়লো।

মা বললেন—যাই। এমন একটা সুযোগ খোয়ালে ধর্মের কাছে আমার মুখ থাকবে না। একদিন আবার এই সংসার ছেড়ে ধর্মের জন্যে আকুল হয়ে উঠতে হবে অশ্রু। আমি কিছুরই বিশ্বাস হারাইনি। সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে তোমার যে শিক্ষা হবে তাতেই হয়তো তোমার ভবিষ্যৎ তুমি দেখে নিতে পারবে। আমি মেয়েমানুষকে চিনি, মা।

অশ্রু নীরবে একটু হাসলো। নাটুর চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো। নাটু বললো—তুমি আমাদের সঙ্গেই চল না, বৌদি।

অশ্রু তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো—মা যেতে দিলেন কৈ? আমি চলে গেলে সংসার কে দেখবে?

অন্তরাল গেল ঘুচে। সকাল হতে নিশীথ। যেখানে অবসর সেখানেও অবকাশ নেই। শারীরিক নৈকট্যের যেখানে অভাব সেখানেও শারীর-চেতনাই প্রখর। অশ্রু হাঁপিয়ে উঠলো।

আপিস থেকে ফিরে এসে প্রভাত আজকাল আর অশ্রুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় না। দু'জনে মিলে রাধে, গল্প করে, ঠাট্টা খুনসুড়ি, খুঁটিনাটি ঝগড়া, দু'য়েকটি চিমটি, কয়েকটি চুমু। রাত আসে ঘনিয়ে। তখন তারা পরস্পরের কাছে অসহায়, নীরবে পরস্পরের কাছে অভয় প্রার্থনা করে। দু'জনেই বোঝে একটু সরে

বসতে হবে। অগত্যা রাজনীতি নিয়ে কথা চালাতে হয়। মুশকিল এই, দু' জনেরই মতে গরমিল নেই। তারপর অন্য কথা পাড়া দরকার। অশ্রু এ হিসাবে খুব মৌলিক। ও ব্যবসা করবে; তারই প্ল্যান ফাঁদে। ইস্কুল-মাস্টারি ঘৃণ্য কাজ। প্রভাতো তার এই হাড়-ঝরানো চাকরিটায় ইস্তাফা দিক। অন্যান্য সব বাস্তব সমস্যা। পয়সা না হলে বিয়েটাই অপয়া। যাকে বিয়ে করো তাকে ভালোবেসো, কিন্তু যাকে ভালোবাসো তাকে বিয়ে করো না। কর্তব্যে সে আবিল, দায়িত্বে সে বাধাগ্রস্ত। জুনোর চোখ তখন অন্ধ, সাইথেরার নিশ্বাসে তখন দুর্গন্ধ।

পরস্পরের মাঝে এতটা ব্যবধান রেখে ওরা এখন বসে যাতে হাত বাড়িয়ে হাতের নাগাল পাওয়া যায় মাত্র; এই স্পর্শ টুকু দিয়েই ওরা পরস্পরের দেহের প্রতি প্রণতি জানায়। একটুখানি দূরে সরে গিয়ে ওরা এখন যেন গভীর হয়ে উঠছে, অজস্র চাঞ্চল্যের ওপর নেমেছে ভাবের গাঢ় মন্থরতা, ব্যাকুল প্রকাশকে বাধা দিচ্ছে অনুভূতির অবিচল তন্ময়তা! অশ্রুর সজ্জা-প্রসাধনে এখন আর কৃত্রিম প্রয়াস নেই, মুখখানা সামান্য একটু মলিন দেখায় বলেই লাবণ্যের আর অবধি মেলে না। প্রভাত এখন প্রশান্ত সমুদ্র, তার ওপরকার সৌম অনন্ত-বিস্তীর্ণ আকাশ হচ্ছে অশ্রু। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, আকাশ তামসী!

প্রভাত বলে: কিন্তু সীতার প্রতি রাবণের প্রেম রামায়ণে তুচ্ছ হলেও পৃথিবীতে তুচ্ছ হয়নি। প্রেম অর্থ যদি দুঃখের তপস্যা হয়, passion-ই তাহলে প্রেম। হেলেনের প্রতি প্যারিসের কিংবা ফ্রান্‌সেস্‌কার প্রতি প্যাওলোর প্রেম আমার-তোমার ঈর্ষার জিনিস, অশ্রু। তোমার Donne-এর কথাই নাও না:

> Love's mysteries in souls do grow,
> But yet the body is his book.

শরীর একটা ঐশ্বর্য, যদি বলো তাজমহলের চেয়েও কীর্তিময়। প্রাকৃত ভাষায় যাকে বলো এর অশ্লীলতা, তাই তার সম্পদ, তার উজ্জ্বলতা। সম্ভোগহীন সংযম ও কামনাহীন তপস্যা দুটোরই কোনো অর্থ নেই।

অশ্রু হেসে বলে: দেহের স্তবগান করতে আমি আরো বাস্তব ভাষা প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু প্রেমকে শরীরের সহজ সুবিধায় রূপান্তরিত করবার সময় তার পরমায়ুর সম্বন্ধে চিন্তা হয়। সে সুবিধা টিকিয়ে রাখবার জন্যেই টাকা চাই। যতো দিন তা না হয় তত দিন আমিও হেরিক-এর একটা stanza আওড়াই:

> A sister (in the stead
> Of wife) about I'll lead ;
> Which I will keep embraced,
> And kiss, and yet be chaste.

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে। রাস্তার গোলমাল ক্রমে-ক্রমে মিলিয়ে এলো। দু'জনের মুখের কথা ফুরোয়। যখন পরস্পরের গাঢ় নিশ্বাস শোনা যায় তখনই সে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। সাবধান! অশ্রু উঠে পড়ে। বলে: শুতে যাই।

প্রভাত বলে: আমারো ঘুম পাচ্ছে।

আলাদা দুই ঘরে শুয়ে কারুরই ঘুম আসে না। খানিকক্ষণ ধরে এই ঘুম-না-আসাটুকু স্নায়ুতে একটা মাদক শিহরণ তোলে। আবার কখন এক সময় যে তারা ঘুমিয়ে পড়ে খেয়ালই থাকে না। ভোরবেলা জেগে উঠে ওরা ভাবে: একটি অসহিষ্ণু রাত্রি আমরা জয় করেছি। হয়তো এও আবার ভাবে: পূর্ণাঙ্গ পরিতৃপ্তির যূপে এই কামনাকে বলি দিতে না পারলে প্রেমের তপস্যার সিদ্ধি কোথায়? কে জানে শুধু তপস্যাই হয়তো তপস্যার সিদ্ধি।

শুধু আকাঙ্ক্ষাই আকাঙ্ক্ষার ফল।

রবিবারের দুপুর। দশটা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কলকাতার দুপুর বেলাকার বৃষ্টিতে একটি অনতিগাঢ় তন্দ্রাচ্ছন্ন মাদকতা আছে। গলিটা জনহীন, ইলেকট্রিক পোস্টের দাঁড়ের ওপর বসে কাক পাখা ঝাড়ছে। ঘরের দুটো জানলা বন্ধ, পুব দিকেরটা অর্ধেক খোলা। জলের ছাঁট আসছে বটে, কিন্তু বিছানা পর্যন্ত না। দেয়ালে পাশাপাশি দুটো বালিশ রেখে তাতে পিঠ দিয়ে অশ্রু আর প্রভাত কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বসে আছে। পা চারটে সম্মুখে প্রসারিত, হাঁটু অবধি গায়ের কাপড় দিয়ে ঢাকা। দু'জনে চুপ করে একটা বই পড়ছে— একটা নিষিদ্ধ বই। মনোযোগ অশ্রুরই বেশি। প্রভাত তখন অর্ধ-জাগরণে প্রায় নিস্পন্দ। চিত্রকর মুরিলো যেমন সর্বদা এক কুমারীর স্বপ্নে বিভোর থাকতেন তেমনি বিভোর প্রভাত হঠাৎ অশ্রুকে নিজের কাছে আকর্ষণ করলো; অশ্রু বাধা দিলো না। বইটা শেষ হতে আর দশ মিনিট। তারপর আবার আরেকটা নতুন কিছু ভাবতে হবে। হাতের কাছে যদি কিছু না জোটে তবে বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়বার বায়না ধরে নিতান্ত অবাধ্যপনা করবে সংকল্প করেই অশ্রু প্রভাতকে চুমু খেতে দিলে। রোয়াকের ওপর হঠাৎ ডাক-পিওনের আবির্ভাব না হলে চুমু বোধ হয় কর্কশ হয়ে উঠতো। দু'টোর ডাক এলো। পিওন জানলার ফাঁক দিয়ে খামে-মোড়া একটা ভারি চিঠি মেঝের ওপর ফেলে দিলো। অশ্রু তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে আনলো কুড়িয়ে। কা'র এ চিঠি? ইন্দিরার!

প্রভাত বললো: পড়ো তো চিঠিটা! আমার উপন্যাসের উপাদান হতে পারে।

অশ্রু ঘুরে বসে পড়তে লাগলো :

অশ্রু,

তুমি আমাকে—

বলেই একটু থামলে। বললে—ইন্দিরা কোনোকালে চিঠি লেখে না, তাই শঙ্কিত হচ্ছি, প্রভাত। তা ছাড়া চিঠির আয়তনটাও শীর্ণ হয়। হস্তাক্ষরটাও দুর'কম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে পুরুষের।—তোমার উপন্যাসটা কি ডিটেক্‌টিভ নাকি?

আবার আরম্ভ হলো :

অশ্রু,

তুমি আমাকে যে আশীর্বাদ করে এসেছিলে তা আর ফললো না। [টীকা : আমি তো অতো বড়ো সতী নই।] আমি স্বামী-পুত্র নিয়ে পরমার্থ খুঁজে পেলুম না। কিন্তু নারীর পরমার্থ যে সেখানেই লুকোনো ছিলো এ সত্য-প্রতীতি আমার হয়েও হলো না। কায়মনে আমি স্বামীর প্রেমহীন ব্যভিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলুম, কিন্তু অতৃপ্তির মরুভূমি পেরিয়ে যেখানে এসে বুঝলুম সে আমার পলাতকা মরীচিকা, তখন মরতে আমার আর বাকি নেই। খুলেই বলতে হবে, অশ্রু! আজ জ্বর একটু কম বলেই লেখবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সর্বদেহ বিষাক্ত হয়ে গেছে—কবির ভাষায় নয়, ডাক্তারি কথায়। বাঁচবো আর না।

তবু জীবনে আমি মরতে চাইনি। রমাপতিকে ভুলতে পারবো না, নারী হয়ে এমন অসম্ভব কল্পনা-প্রবণতা আমার ছিলো না। তাকে আমি স্বচ্ছন্দে ভুলোছলুম। সে-ভোলার মধ্যে আমার আনন্দ ছিলো। তাকে আমি হৃদয় দিয়ে শুরু করেছিলুম, হৃদয় আমার ক্ষয় হয়ে গেছে। [টীকা : আমাদের হৃদয় কিন্তু এতো সহজে ক্ষয় হয় না। আমাদের হৃদয় সিন্ধুর মতো বিস্ফারিত, বিস্তারিত। একজন বালতি করে জল নিয়ে গেলেই সমুদ্র ডোবা হয়ে যায় না] স্বামী আমার দেহের দুয়ারে এসে দৈন্য জানালেন। আমি অন্নপূর্ণা। শিবকে সন্ন্যাসী হতে দিলুম না। হৃদয় থেকে দেহ—পূর্বরাগে এই হচ্ছে পূর্বাপর সম্বন্ধ; বিবাহে হচ্ছে দেহ থেকে হৃদয়। সে-প্রতীক্ষার ধৈর্য আমার ছিলো বলেই আত্মহত্যা করিনি। আমি ভীরু যতোখানি সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য আমি সহিষ্ণু। নইলে এই কদর্য দিনরাত্রিযাপনের বীভৎসতা থেকে মৃত্যু আমার কাছে অধিকতর বিসদৃশ ছিলো না, অশ্রু।

মনে হয়, স্বামীকে আমি ভালোবাসতে পারতুম। ভালোবেসেও ছিলুম হয়তো। স্বামী সংজ্ঞাটার ওপর সত্যিই আমার মোহ জন্মেছিল। যেদিন প্রসব বেদনা শুরু হলো, উনি [টীকা : অতিপ্রণয়ে সর্বনাম।] শিয়রে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সেইদিনই দেহে মনে এই কথাই বিশ্বাস করেছিলুম অশ্রু, এর চেয়ে বড়ো

সাফল্য বড়ো কৃতিত্ব নারীর স্বর্গে-মর্তে কোথাও কিছু আর নেই। আমি নাথবতী এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আমি সন্তানবতী। সন্তানেই আমার স্বামীর পরিচয়। মনে হলো ব্যক্তিবিশেষ গৌণ, সন্তানই আমার সন্ধান ছিলো। এর জন্যে দেহপাত করে সুখ আছে। আকাশের কোলে সূর্যোদয়ের চেয়ে জ্যোতির্ময়, যুগান্ধকারের পরে নব প্রতিভার নবীন প্রদীপ্তি। আমি মূর্খ ছিলুম বলেই এত দিন দেহের এই উৎসবকে সম্মান করিনি, কিন্তু সেদিনের সম্ভাবনার স্বপ্নে আমি মেরির চেয়েও গৌরবগর্বিতা ছিলুম।

ছেলেবেলায় সেই যে বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর কথা পড়েছিলুম সে আমার মনে কোথায় যেন দাগ ফেলেছিলো। ভগবতী দেবীই আমার কাছে মা'র আদর্শ ছিলেন। আমি মনে-মনে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলুম। কিন্তু ঈশ্বর আমার সদয় হলেন না।

তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত পুত্র প্রসব করলুম, অশ্রু। আমার জীবনে এত বড়ো ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার সমস্ত আকাশ শূন্য হয়ে গেল। খালি ধূলো আর আবর্জনা। কর্দমের সমস্ত আবিলতা ঘেঁটে যে-পথ উদ্ধার করতে চেয়েছিলুম তার কাঁটাই আমাকে বিঁধে রইলো। মনে হলো আমি কতো কুৎসিত, স্বামী কতো রূঢ়! মনে হলো আমরা দুটো যন্ত্র, কর্কশ, স্থূল, সুষমাহীন। যা ছিলো "pulse of the machine" তাই গেল হারিয়ে। ভাবলুম বাঁচবার আর মানে কী?

ডাক্তার ভয় দেখালো। নিজেও বুঝি এ আমার অন্যায় আবদার—বাঁচা আমার হবে না। তবু আমার দুঃখ নেই। আত্মহত্যা যদি একটা experiment হয়, জীবন তারো চেয়ে বড়ো পরখ, অশ্রু। আমি আরেকবার পরখ করবো। আবার কাদা ঘাঁটবো, কাঁটা দলবো, মরু ডিঙোবো। মরীচিকা নয় জল চাই; সেই জলই আমার কাছে নামান্তরে জীবন। সন্তান আমার চাই। সেই আমার আসন, আমার আশ্রয়, আমার মহিমা। এর চেয়ে দেহের আর কী বড়ো কবিতা হতে পারে ভাবতে পারি না। বিবাহকীর্তনে ভলটেয়ারের সঙ্গে না মিলি ক্ষতি নেই, কিন্তু এ-সম্পদ অর্জনে পরাঙ্মুখ থাকবার মধ্যে অহংকার দেখতে পাইনে। আমি যাতে বাঁচি, দিন-রাত্রে ভগবানের কাছে এই-ই খালি প্রার্থনা করছি। তুমিও অশ্রু, প্রার্থনা করো।

না না, এর পরে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বেখাপ হবে। অশ্রু পৃষ্ঠা উল্টোল:
বৌদির ও-চিঠিটা আর ডাকে দেওয়া হয়নি। টেবিল গুছোতে গিয়ে চিঠিটা

আজ নজরে পড়লো। বৌদির লেখা সযত্নে গুছিয়ে রাখবার ইচ্ছা ছিলো বলে ওটা পড়তে হলো, দেখলুম চিঠি—অশ্রুদিকে লেখা। ভাবলুম, আর একটা লাইন জুড়ে না দিলে চিঠিটা অসম্পূর্ণ থাকবে।

কাল সন্ধ্যায় বৌদি মারা গেছেন। ইতি। বিমল

আজকে অশ্রুর শেষ রাত্রি। মানে, কাল সে কলকাতা ছাড়বে। এ-সত্য অবশ্যি সে দিনের বেলায় জানতে পায়নি। পাবে—রাত আরেকটু গভীর হোক।

এ-অঞ্চলটায় মশা কম বলেই তো মনে হয়—মার মতো অশ্রু মশারি খাটায় না। জানলা খোলা থাকে, দোরটা ভেজানো। আলো নিবেছে। অশ্রু ঘুমিয়ে।

ঘুম অশ্রুর পাতলা নয়। তাই কে একজন যে তার শিয়রে বসে কপাল ও কানের কাছের চুলগুলিতে আঙুল বুলুচ্ছে সে তা টের পায়নি। কিন্তু সেই হাত যখন গ্রীবা উত্তীর্ণ হয়ে বুকের সমীপবর্তী হ'য়েছে তখন সে চোখ খুললো। বুঝলো, প্রভাত।

বুঝতে অশ্রুর দেরি হলো না। সান্নিধ্যের অপচয় হয়েছে। নিভৃতির সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে প্রভাত। কিন্তু প্রেম অর্থ যেমন আত্মদান তেমনি আবার শাসন। প্রতীক্ষাটা হচ্ছে প্রস্তুত হওয়া। প্রস্তুত আজো কেউ হয়নি। অশ্রু এক মুহূর্ত কি ভেবে মাথাটা প্রভাতের কোলের ওপর ধীরে তুলে দিলো। সকল উগ্রতা উপশান্ত হলো বুঝি। প্রভাত তার চোখে চুমু খেলো।

অশ্রু বললে—এসে অবধি আমার এস্রাজটা থলের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে—তাও তক্তপোষের তলায়। তাই আজ একটু বাজাই। বার করো না।

ইঙ্গিতটা ব্যক্ত। তবু প্রভাত বললে—গান তুমি কাল গেয়ো।

অশ্রু উঠে বসলো; হেসে বললে: গান তাহলে আমি কালই গাইব। কাল আমি জলপাইগুড়ি চলে যাব, প্রভাত। আমার বিচ্ছেদেই হবে তোমার গান। বলে উঠে বসে এবার সে প্রভাতের মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে আনলো। তার মুখে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে—পৃথিবীতে আজো এমন কবিতা লেখা হয়নি বন্ধু, যে আবৃত্তি করে তোমার চোখে স্বপ্ন এনে দি।

প্রভাত বললো: কাল সত্যিই চলে যাবে?

—তোমার কষ্ট হবে খুব?

—হবে; তবু—

—কি তবু?

—তবু তুমি থাকো এ কথা জোর করে বলি কি করে? আমার এ হতকুচ্ছিত বাড়ি-ঘর, এ হতকুচ্ছিত চাকরি—

—তবু এ নিয়েও, এ সত্ত্বেও তোমায় দুর্ধর্ষ শক্তি- সে তুমি তোমার শরীরে-মনে সর্বক্ষণ অনুভব কর না? অশ্রু আদরে আরো একটু উদার হলো।

—সে তো ভালবাসার শক্তি মাথা তুলে উঠে বসল প্রভাত।

—হ্যাঁ, সেই শক্তিতে তুমি এই নির্জনতাকে পর্যন্ত পরাভূত করলে। মা কি রকম বিপন্ন করে ফেলে গিয়েছিলেন আমাদের! ভেবেছিলেন এর থেকেই বুঝি আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ে আর সকলের জন্যে হোক, আমাদের জন্যে নয়। আমরা বিবাহের চেয়ে বড়ো!

—সে শুধু তোমার কৌশলে, তোমার কারুকলায়। নইলে আমি তো ছন্দ পতন করে ফেলেছিলাম!

—না, সমস্তই সেই শক্তির গুণ। তারি জন্যে তুমি অন্ধ হতে পারনি, হিংস্র হতে পারনি—

—হ্যাঁ, সেই শক্তিতেই তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।

—ছেড়ে দেবে কি গো, শুধু দূরে রাখবে।

—হ্যাঁ, শুধু দূরে রাখা। নিকটই ভয়ের। দূরই আশার। নিকট দুর্বল করে, দূর অক্ষয় করে রাখে। তুমি দূরেই তোমার কাজে চলে যাও।

—আর তুমি?

—আমি ততদিন আমার উপন্যাসটা শেষ করে ফেলি। কিন্তু, প্রভাত উদ্বেল হয়ে উঠল: তাই বলে তুমি কি আর ফিরে আসবে না?

তাকে ধীরে সরিয়ে শান্তস্বরে অশ্রু বললে, —এ উপন্যাস তো শেষ হবার নয়, যখনই ডাকবে তখনই ফিরে আসব। উপন্যাস কেবলই বেড়ে যাবে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, পর্বের পর পর্ব।

দার্জিলিঙ মেল ছাড়লো রাত্রে। প্রভাত প্ল্যাটফর্মে—অশ্রু একটা সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরার জানলা ধরে বাইরের দিকে চেয়ে।

কারু মুখে কোনো কথা নেই।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে। প্রভাত তাড়াতাড়ি জানলার কাছে সরে এসে বললে—আবার কবে ফিরবে?

অশ্রু হাত বাড়িয়ে প্রভাতের হাত স্পর্শ করলো: বলেছি তো, যখনই ডাকবে তখনই ফিরব। একবার আমি ডেকেছিলাম, এবার তুমি ডেকো।

টুটা-ফুটা

প্রথম সাহিত্যিক সাথী

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

করকমলেষু

এই গল্প ক'টি লেখা তেরোশ তিরিশ থেকে চৌত্রিশ সালের মধ্যে'। কল্লোল, উত্তরা ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বইখানি প্রকাশিত করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি শিল্পী-বন্ধু শ্রীঅজিতকুমার সেন-এর কাছ থেকে। প্রচ্ছদপটের চিত্রটি শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ-এর আঁকা।

পৌষ,

১৩৩৫

টুটা-ফুটা

চিঠিটা যে এমন কাজ করবে, ভাবিনি। ভাবিনি মানে ভাবতে শিখিনি। আমার ছাব্বিশ বছরের পৃথিবী উল্টো কথাই ব'লে এসেছে—বরাবর।

বন্ধু জবাব দিয়েছে—তোমার বিপদে হাত বাড়িয়ে দেবে এমন জন তোমার আছে—জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত।

ও কথাটা বড্ড বেশিদূর টানে।—ওটা ওর স্বভাব।

আরো লিখেছে—জীবনের উপর গোসা ক'রো না। এই বসুন্ধরা ত' বিধাতার আনন্দের একবিন্দু অশ্রুজল। ইত্যাদি।

তারপর ওদের পাড়ার খোয়া-ওঠা নাঙ্গা রাস্তায় ছ্যাকড়া গাড়ীর আওয়াজে কী অনির্বচনীয় আনন্দের গৎ বাজে—তার বর্ণনা। কবে একটা চড়ুই আর বোল্‌তা একসঙ্গে খোলা খিড়কি পেয়ে ওর ঘরে ঢুকে বাসা বেঁধেছিল কড়িকাঠের তলায়, আর পড়ো দেয়ালের ঘুপসি অন্ধকার কোণে;—কবে বাব্‌লার একটা শুকনো মরা ডাল দুব্‌লা রোগা মা-হারা খোকার মতো ওর দিকে চেয়েছিল করুণ চোখে—কবে কোন্ গাঁয়ে খোঁড়া একটা ভিখিরি মেয়ে ছায়া-মেলা অশথের তলে ব'সে একটা ছাগল-ছানাকে কাঁটাল পাতা খাইয়ে দিয়েছিল—তারই কাব্য—ভুয়ো, ভ্যাপসা। এবং শেষ লাইনে সমস্ত কিছুর চুম্বক—এ জীবন প্রিয়ার প্রথম চুম্বনের মতো—তারপর অনেকগুলি বিশেষণ।

চিঠিটার সঙ্গে মনি-অর্ডারে একশোটা টাকা। চেয়েছিলাম কিন্তু গোটা তিরিশ। বিপদও আর কিছু নয়, মাস চারি মাইনে দিতে না পেরে আইন-ক্লাশ থেকে নাম কেটে দিয়েছে।

কিন্তু আমার টাকা চেয়ে পাঠানোর মধ্যে বিশেষ একটা কায়দা ছিল—তার প্যাঁচেই ও জখম হয়েছে। ওর মনটা যেখানে কাদার মতো প্যাচ্‌পেচে সেখানেই থাব্‌লা মেরেছিলাম। কিন্তু একেবারেই একশো টাকা উঠে আসবে, ভাবিনি।

হঠাৎ দেখা বন্ধুর সঙ্গে।—আরে রাজা যে, কলকাতায়? ওর মেজেণ্টা রঙের চুপ্‌সো র‍্যাপার থেকে শির-ওঠা হাত বের করে আমার হাত ধ'রে বললে—তোর কাছেই আসছি। কি হয়েছে তোর? ভাগ্য বুঝি চিমটি কাটছেন!

গম্ভীর হয়ে বললাম—সে অনেক কথা।

—চল্ ঐ কেবিনটায়, কিছু খাওয়াও যাক—আর আমাদের দুঃখের পাতাগুলিও উল্টোনো যাবে।

কেবিনটা দম-বন্ধ-করা একটা পচা শুকনির মতো ধুপ ক'রে প'ড়ে আছে যেন। যত গাড়োয়ান আর ঝাড়ুদারের আড্ডা। খেনো মদের সঙ্গে মুড়মুড়ে ক'রে ভাজা কাঁকড়ার ঠ্যাং।

ঢুকতে ঢুকতে রাজা বললে—ওরা সমাজের ডোবার সব-নীচেকার ঘোলাটে পাঁক, আর ঐ যাঁরা দেশোদ্ধারের জন্ম কোমর কাছতে কাছা খুলছেন ওঁরা ওপরকার টলটলে জল। ওদের সঙ্গে সমান পংক্তিতে ব'সে জানিয়ে দিতে হবে ওরা আমাদের সগোত্র।

বললাম—কিন্তু ভাই ঐ চিংড়ি মাছের ছিবড়েগুলো নয়। হ'লই বা কলাই-করা পাঁজর-বের-করা কাপ, তাই দু' পেয়ালা চা নে।

এক কোণে বসলাম।

বন্ধু বললে—ওদের সমস্তটা জীবন হাপর। এক কোণে ব'সে সমাজ নামে কামার লোহা পিটুছে—ওদের সমস্ত আশা বা বাসনা সব তাই চ্যাপ্টা, থেঁৎলানো, ধারালো নয়।

আবার বললে—ঐ দেখ্, ছোট্ট ছেলে অন্ধ ভিখিরি বাপের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে।—বুড়োটার কি গোগ্রাস, গিলছে না ত' অভিশাপ দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটি ভাই—অনিন্দ্য! ওকে এক্ষুণি দুটো টাকা দেব।

তারপর বললে—কি হ'ল তোর? তারপর?

শুধু বললাম—বাড়ী ছেড়ে দেব—

ওর পাঁচটা লম্বাটে আঙুলের চাপড় খেয়ে থুখ্‌রো বুড়ো বেঞ্চিটার পা-গুলো বিদ্রোহ ক'রে উঠল!

—তাই। আমরা সব ঘরছাড়া, মুশাফির। বুদ্ধ থেকে গান্ধী। যুগ যুগ ধ'রে সত্য আমাদের আহ্বান করছেন—আমরা চলেছি!

এক চুমুক কালো চা গিলে ফের বললে—কেন বাড়ী ছাড়বি?—প্রেম?

মেঝের ওপর এক গাদা থুতু ফেলে বললাম—ছোঃ!

—তবে?

—বাড়ীটা ভূতে-পাওয়া। দেয়াল গেঁথে গেঁথে সব জানলা কবাট বুজিয়ে দিলে, ভাই। খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসেছি।

দু'টো হাতে ঝাঁকড়া মাথাটা চেপে ধ'রে রাজা বললে—তাই আয়। বন্ধ দেয়ালে আর ক'টা জানলাই বা ফোটানো যাবে? তার চেয়ে আমার এই ফাঁকা আকাশ ঢের ভালো—থাক্ না তাতে বজ্র। কিন্তু ভাই, প্রেমকে অবজ্ঞা করিসনে।

ওর মুখ ব্লটিং কাগজের মতো শোষা—শাদা হয়ে এল। ভাবলাম, ভুল জায়গায় কল টিপেছি। কথায় চাকাটা অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিতে হবে।

ও বললে—আমি প্রেমের জন্য ঘর ছেড়েছি, ভাই। সমস্ত সৃষ্টিই ত' বৈরাগিনী। সন্ধ্যাতারা থেকে চৈত্রের রজনীগন্ধা।

স্যাঁতসেতে কাব্য। তবু শুনতে হবে।

ঠোঁট কামড়ে বললাম - নিশ্চয়ই।

ও মন ভরসা পেল। বলতে লাগল—অনেক কথাই। মেয়েটি বি. এ. পরীক্ষা দেবে, তার ভালোবাসার মধ্যে মা'র নির্মলতা ও বন্ধুর শোভনহৃদয়তা মাখামাখি। সমাজের বুনো জঞ্জালের জাল ওদের আটকে রেখে দিতে চায়, ওরা তা ছিঁড়বে। লাঞ্ছনার সঙ্গে লাঞ্ছনার বিয়ে।

—আর যদি ঘা দিতে গিয়ে হাত ছিঁড়ে যায়, বাঁধন ছেঁড়ে না – তবে এই চরাচরব্যাপী অপূর্ব অকৃতার্থতা - মধু মধু এ বিরহ! বিয়ে নিঃসঙ্গতার সঙ্গে নিঃসঙ্গতায়।

চা খাওয়া অনেকক্ষণই ফুরিয়ে গেছল, তবু একশোটা টাকার সম্মান রাখতে যে একঘণ্টা কেটে যাচ্ছিল, যেন মনটা করাত দিয়ে কেটে-কেটে।

রাজার সে প্রকাণ্ড ইতিহাস। গোড়া আছে আগা নেই—খালিই বেড়েই চলে। আর এক কাপ চা-ও তেতো হয়ে উঠল।

এক চড়ে গালের ওপর প্রকাণ্ড একটা মশা মারতেই ও ব'লে উঠল—আহা! —তুই অনিলকে চিনিস, অনিল মিত্তির?

—না। কে সে?

--কবি।

কথাটা এত ধীরে উচ্চারণ করল যেন চেঁচিয়ে বললেই কথাটার পবিত্রতা থাকবে না।

বললে—খালি প্রকাশ দিয়েই মূল্য নিরূপণ ভুল, ভাই। অন্ধকারও ত' অপ্রকাশ। নাই বা হ'ল রবি।

—কে হ'তে বলছে? বেশ ত'—কি করেছে সে?

—প্লেতো থেকে ওয়েলস্ পর্য্যন্ত যে স্বপ্ন দেখা চলেছে যে স্বপ্ন ও-ও দেখছে ভাই।—এই পারেরই স্বপ্ন। মানুষ কান্নার সমুদ্র পেরিয়ে গেছে, রুষিয়ার রুটি মিলে গেছে, ভারতের মুক্তি। ও তারই জয়গান গাইছে।

—চল্, এবার উঠি।

—ও কি বলে জানিস? বলে—অশ্রুজলে ধুলো ধুয়ে ভিজিয়ে দিয়ে যাই, বুক পেতে পেতে কাঁটা গেঁথে নিই—তারপরে নব তৃণ চোখ মেলুক—অশোক বুদ্ধ নিমাই।

জোর ক'রে উঠে পড়লাম।

রাস্তায় নেমে ও বললে—যেদিনই পেলি, সেদিনই ফুরিয়ে ফেললি। এইখেনে অনিল ব্রাউনিঙের মতো।

কবিতা আওড়াতে চায় হয়ত, নাক সিঁটকে বাধা দিই।

ফিরে এসে বললে—শোন, আমি কলকাতাতেই থাকব এখন। একদিন যাস্, কবির সঙ্গে আলাপ হবে।

ঠিকানা ব'লে দিল।

তবু ওর নাম রাজা। ও যেন একটা দাঁড়ি ;—থেমে আছে। যেমন ঢ্যাঙা, তেমনি বেঢপ—হাড়গিলে—কাপড়ের পাড় হাঁটু পর্যন্ত এসে আর নাবে ন। ধুলোটে চটি জুতো হাঁ ক'রেই থাকে—র‍্যাপারের তলায় ছেঁদাওয়ালা একটা গেঞ্জি মাত্র। বহুদিনের চেনা বন্ধু যেন।

ও যেন বিধাতার একটা ঠাট্টা।

কুয়াসায় মোড়া ফ্যাকাসে আকাশ পা গুটিয়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে—প্রভাত-রৌদ্রের আলোয়ানটা গায়ে টেনে নিতে পর্যন্ত আলস্য।

আমাদের পাড়ার পিছনকার মেটে গলিটা সাপের মতো এঁকে-বেঁকে যেখানটায় ঢুকে আর ফিরে আসতে পথ পায়নি—সেটা একটা বেওয়ারিশ বস্তি। বাসিন্দাগুলি সব ধাঁধা—কেউ ভিক্ষুক, দিন-মজুর, ফিটার-মিস্ত্রী, জুতো-সেলাই, ফিরি-উলি, বেশ্যা ; প্রকাণ্ড একটা মশারির গায়ে যেন নানা রঙের ছিটের তালি দেওয়া।

আমাকে বিস্মিত হ'তে সময়ই দিলে না ও। হাত ধ'রে ফেলে বললে—কাল রাতে ঘুমুতে পারিস্‌নি নিশ্চয় ? ভোর না হ'তেই শফর সুরু হয়েছে ?

আমি যে কুস্তি সেরে গঙ্গাস্নান ক'রে রোজই এত ভোরে বাড়ী ফিরি—নাই বা বললাম। বললাম, ওর মতন ক'রে—চোখের জলে ঘুম সব মুছে গেছে। রাতের একটি তারাও ঘুমায় না !

ও আমার হাতটা ফের চেপে ধ'রে বললে—আয় আমার সঙ্গে।

—এই বস্তিতে ? কেন ?

—আয়ই না। জীবনের দেউড়ির দরজা বন্ধ ক'রে মাঝে মাঝে এই সব খিড়কির দরজা খুলে দিই। সদর রাস্তা ছেড়ে এই সুড়ঙের মধ্যেই তার দেখা পাই —গলিঘুঁজির মধ্যে।

গা ঘিনঘিন করছিল। কিন্তু হাত পাতলে একশো টাকার সংখ্যাটার পাশে আরেকটা শূন্য বসতে পারে, এ ভরসা যে আছে!

রাজা ওর ট্যাঁক থেকে কতকগুলো রেস্ত বের ক'রে সার-বাঁধা মাটির ঘরের রুদ্ধ জানালার ধারে ধারে রেখে রেখে এগিয়ে চলল।

—এ কি রাজা?

—আজ এই পাড়াটা। রোজ এমনি ভোরে ওদের ঘুম ভাঙার আগে পাড়ায় পাড়ায় পয়সা বিলোই।

—তার মানে?

—মানে কিছুই নেই। ওরা ওদের ভোরবেলাকার জানলা খুলে অন্ততঃ ভুল ক'রেও একটিবার ভাববে—ভগবান আছেন। ওদের আনন্দে ভোরের আকাশ লাল হয়ে উঠবে।

বললাম—ওদের মদ-ভাং-এর পয়সা জুটল।

—জুটুক! সমস্ত দিনের হাড়-গোড়-ভাঙা খাটনির পর এক গ্লাশ জুটুকই না। কারু কারু হয়ত ওষুধ, দু'বেলার চা'ল, মরন্ত ছেলের জন্য এক ফোঁটা দুধ। কিছু ভাবিনা তা'। খুসি হবে ত' ওরা?

একটা জানলার খোপে একেবারে একটা টাকা প'ড়ল।

বললাম—এত ভাগ্য কা'র?

—একটি ভিখিরি-খুকীর। রাস্তার মোড়ে ওর নুলো মাকে বসিয়ে রেখে ও দূরে আরেকটা মোড়ে কাঁদতে বসে। ওদের কী নিদারুণ দারিদ্র্য তা ও নিজেই জানে না। ভালো ক'রে তৈরী ক'রে কাঁদতে পারে না—কেউ শিখিয়ে দুরস্ত ক'রে দেবারও নেই হয়ত। ওর ঐ সরল ভানটি ভারি সুন্দর লাগে।

পরে বললে—ওর মা'র বসন্ত হয়েছে। মা-হারা হ'লে ওকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব—আকন্দের সঙ্গে বিয়ে দেব ওর।

—কে আকন্দ?

হেসে বললে—আমার ছেলে।

বাইরে এসে বললাম—কাকের কাছে ভাত-ছিটোনোর মতো এমনি ক'রে দোহাত্তা পয়সা ছড়ালে ফতুর হ'তে আর কতদিন?

ও আমার কাঁধে হাত রেখে বললে—আকাশের সমস্ত আলো ঢেলে দেবার আনন্দে ফতুর হয়ে গেছে, ভাই। জীবনে যে ভালোবাসতে পেল না সেই ত' ফকির, ফতুর।

ঢোক গিলে বললে—পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার আমাকে কে

দিয়েছে—এদের সবাইকে বঞ্চিত ক'রে ? আমার বাবার ছিল প্রকাণ্ড সুদের কারবার—প্রতিটি টাকায় এদের রক্তের দাগ লেগে আছে।

—তবু তোর চটিটার হাঁ বুজল ন ?

—যারা চটিজুতোর মতো অত ফ্যাল্‌না নয়, তাদেরই হাঁ বুজুক !

একটা লোক- বোতামহীন হাঁ-করা কোটটার দুটো পাশ উদলা বুকের ওপর জোরে আঁকড়ে ধ'রে ডান হাত মেলে বললে—দেশলাই আছে মশাই ?

ওর খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলি একটি একটি ক'রে গোণা যায় ; –ঠোঁটের ওপর একটা ঘা হওয়াতে ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে—মাছিরা লুব্ধ হয়ে উঠেছে তাই। বাঁকারির মতো বাঁকানো দেহ যেন জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো—বিধাতার জিজ্ঞাসা।

বললাম—তোমার ঠোঁটে ও কিসের ঘা ?

—বিড়ি ধরাতে আগুন লেগে গেছল। আরশোলারা চেটে চেটে ঘা বাড়িয়েছে।

রাজা বললে—দেশলাই ত' নেই। ঐ মোড়ের দোকান থেকে কিনে নাও গে।

দেশলাই সঙ্গে না থাকাটা যেন ওর অপরাধ—এমনি ভাবেই লোকটার হাতে ও পয়সা দিল।

মোড়ের দোকানটা নিশ্চয়ই বস্তির মধ্যে নয়। রাজাকে তাই বললাম।

ও বললে—দোকান এখনো খোলেনি বুঝি। ঘুরে এসে কিনে নিয়ে যাবে।

বললাম—এটা ওর ফাউ হ'ল।—জানলার কাছে যা পেল তার উপরি-পাওনা। ও এই বস্তিতেই থাকে।

এও রাজা ক্ষমা করে। বলে—ঠকিয়ে নেয়নি কক্ষণো, ওর পাওনাই নিয়ে গেছে ;—শুধু জোর ক'রে নিজের দাবী জাহির ক'রে বলতে পারেনি—এই যা। আমরা ওদের থেকে বিধাতার আলো-বাতাস কেড়ে নিয়েছি চুরি ক'রে, আজ ওদের সব কড়ায়-ক্রান্তিতে চুকিয়ে দেবার তাগিদ এসেছে।

চলতে চলতে পা দিয়ে হঠাৎ ওর জুতোটা চেপে ধরলাম। টান লেগে জুতোটা একেবারে ভির্মি খেয়ে পড়ল—চিৎপাত হয়ে।

ও ব'লে উঠল—আহা ! যেন পথের মাঝে ওর পায়ের কাছে নীড় থেকে একটা বাণ-বেঁধা মরা শালিকের বাচ্চা মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর চোখে যেন সেই দরদ !

বললাম—ফিরতি-মুখে এক জোড়া জুতো কিনে নিয়ে যাস্—না হয় নিরিমিষ-জুতোই কিনিস।

ও শুধু বললে—আমার মাথায় প্রেমের রাজমুকুট, কে আমার পায়ের দিকে চাইবে ?

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রে বিধাতা যেন ওকে একটা ফাউ পাঠিয়েছিলেন—বেহুদা।

রাজার প্রাসাদ খুঁজে বের করা বিষম দায়। টিক্‌টিকির মতো গলিটার দু'ধারে ঘুঁটে-দেওয়া কাদার দেয়ালে জাঁতা - টিমটিমে বাড়ীটা গঙ্গাযাত্রী বুড়ীর হৃৎপিণ্ডের মতো এখনো মিটমিট করছে।

রাজমিস্ত্রিরা দেয়াল ফুটিয়ে ফোকর করছিল।

রাজা বললে—পায়রা থাকবে। আর যদি কোনো চড়ুই খড়কুটো নিয়ে ঘর পাততে আসে!

সমস্তটা ঘর বালিতে গিজগিজ করছে। দেয়ালের এককোণে একটা ফোটো —ঝাপসা হয়ে এসেছে।

বললাম—কার?

জবাব হ'ল—ওর।

আমার হাতে এক তাড়া চিঠি দিয়ে বললে—পড়। যে আলো ফুল ফোটায়, পাখীর ঘুম ভাঙে যাতে।

তারপর আর একতাড়া লেখা এনে বললে—এগুলো আমার চিঠির ড্রাফ্‌ট। মিলিয়ে মিলিয়ে পড় —নম্বর দেওয়া আছে।

মেয়েটি পাঠায় শুধু এক চামচে গরম চা, ও পাঠায় পুরো এক গ্লাশ বরফ-জল —দাঁতে জাম ধরে। বাইশ অক্ষরও হয় না—এমন চিঠির উত্তরে বাহান্ন পাতা।

রাজা বললে—নাই বা থাক এর মধ্যে প্যাশান, রঙের আড়ম্বর—কিন্তু একটি অতলস্পর্শ গভীরতা আছে। মনে হয়, অনন্ত কালের বিচিত্র শোভাযাত্রা থেকে আমি কয়েকটি নির্মল প্রভাত ও স্নিগ্ধ সন্ধ্যা ছিনিয়ে রেখে দিয়েছি অক্ষয় ক'রে। আর কয়েকটি নিশীথরাত্রিও—ঘুমহারা।

একটা চিঠি বেশ লাগল।—কুড়োনো ছেলের নাম তোমাদের কবি আকন্দ রেখেছেন জেনে খুসী হলাম। ঐ পায়ে-ঠেলা পথিকের পায়ে-চলা পথের পাশে আরো যে অনেক আগাছা জন্মে আছে—তাদের দিকেও যেন ওর চোখ পড়ে, তোমার থেকে ও তাই শিখুক।

নইলে আর সব চিঠি -ধোবার হিসেবের মতোই বাজে। শুধু প্রেমিকের কাছে ব'লেই হয়ত লেফাফায় মুড়ে দিয়েছে;--নইলে ত' 'শ্রীচরণেষু—ইতি স্নেহের দু।' —আর 'কেমন আছ? ভালো আছি।'

দু'কাঁধে দু'টো কুকুরছানা নিয়ে একটা নোংরা কেলে ছেলে এসে হাজির— আকন্দই। মনে হয়, ওকে বানানো শেষ ক'রে বিধাতা ওর মুখে একটা থাব্‌ড়া লেন;—সমস্তটা মুখ একেবারে ল্যাপাপোঁছা। দু'টো চোখের চাউনি মিউনো

—থুৎনিটা যেন থেঁৎলে রয়েছে। মনে হয়, দু'হাত দিয়ে ওর মাথাটা দু' দিক থেকে চেপে ধরলে হয়ত সমস্ত মুখটা চোখা ধারালো হয়ে উঠবে।

একটা কুত্তি—পেট্‌টা পড়া—রাজার পা চাটতে বসল। একটা পায়রা ওর কাঁধের ওপর এসে ব'সে গলা ফুলোতে লাগল। আকন্দ ওর কদাকার কাদা-মাখা হাত দু'টো দিয়ে রাজার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে—দুটো পয়সা দাও না। এক পয়সার লাট্টু, আরেক পয়সার লেবেনচুষ!—ব'লে জিভ বের ক'রে ঠোঁট দু'টো চেটে হাঁ ক'রে রইল।

বললাম—কবি কোথায়?

—পাশের ঘরে—চল্।

কবি ত' নয়, তালপাতার বাঁট একটা। একটা মাদুরের ওপর বুকটা পেতে উপুড় হয়ে কবিতা লিখছে।

রাজা বললে—ওহে কবি, প্রসাদ বিলোও—

কবি উঠল—কুঁজো, দেহটি কাঁকলাশের মতো—রাজার পাশে কোটাল। কিন্তু গর্তের চোখ দু'টো চাকুর মতো—শুধু কাটেনা বেঁধেও।

গাল দু'টো পানে ঠাসা। দেয়ালের গায়ে পিচ্‌ ক'রে এক গাদা পানের পিক ফেলে খাতাটি বাড়িয়ে বললে—ও কিছু না।

পরে একটা হোমিওপ্যাথির শিশি থেকে সবটা নস্যি নাকে গুঁজে বললে—কবিতা ত' নয়, এক একটা পশ্‌লি।

হাঁড়ির ভিতরকার আওয়াজ যেন।

শুধু ঝরা কাঠগোলাপ, খসা তারা, মরা নদীর গান। নেবা বাতির, ছেঁড়া তারের, ভাঙা পেয়ালার--

আঙুল দিয়ে মাড়ির থেকে পানের ছিব্‌ড়েগুলো মুখের মধ্যে এনে কবি বললে—ওটা এখনো শেষ হয়নি।—কারখানায় একটা কুলির কোমর পর্যন্ত পিষে গেল, তাকে খারিজ ক'রে দিলে—তার কবিতা।

মা'র স্তন শুকিয়ে গেছে, প্রিয়ার অধরে কপটতা, বন্ধুর জামার নীচে ছোরা—

রাজা বললে—কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে ভবিষ্য একটি ইঙ্গিত। দেখছিস? ডোবা নৌকা কূল পেল, মরা গাছে বর্ষা লেগে কচি কিশলয় গজালো কখন—বাঁজা মাটির বুকে নদীর স্নেহধারা। 'আকন্দটা' প'ড়ে শোনাও না কবি।

—মা তার ছেলে ডাস্টবিনে ফেলে গেছে—সেই ডাস্টবিন আর নেই; সেখানে একটি আকন্দ গাছ, তাতে দুর্বল ভীরু মৃদু একটি কুসুমকণা—

রাজা চেঁচিয়ে বললে এই কবিকে আমি জগতের সভায় দাঁড় করিয়ে দেব। তোমার একটা বই কালই প্রেসে দেব, বুঝলে ?

বললাম—কবিকে যদি ভিড়ের মধ্যে পুশ করিস তাহলে তার হাড়-গোড়ই ভাঙবে, রাজা। তাকে ফুটতে দে।

কবি আর এক শিশি থেকে আর এক টিপ নস্যি নিয়ে বিপুল বেগে হেঁচে বললে —দাঁড়ান, এক কাপ কোকো খেয়ে যান—

রাস্তায় এসে রাজা বললে—এর প্রতিটি ঘরে না খেতে পেয়ে ভগবান কাঁদছেন, মরছেন—

বললাম—মরুন। আবার বানভাসি খড়কুটোর মতো গজাচ্ছেনও। ভগবানের টুঁটি ব'লে কোনো জিনিষ আছে বলতে পারিস ?

ও বলতেই লাগল—চাষা আসবে লাঙল নিয়ে, মিস্ত্রি বাঁটালি-তুরপুন নিয়ে, মজুর গাঁইতি-কুড়ুল নিয়ে—এল ব'লে। দলে দলে—জলোচ্ছ্বাসের মতো। বিদ্রোহীর দল।

— ওদের দুঃখ যতই ফাঁপিয়ে দেখবি—

—নিশ্চয়ই। নইলে প্রিয়া আমার কি, কতটুকু ? জানিস্ ঐ পথে-পড়া ভিখিরিনীতেও আমার প্রিয়া কাঁদছে, রুষিয়ার ক্ষুধায়, ভারতের বন্ধনে—

সর্বনাশ। ওর প্রেমে সর্দি লেগেছে বুঝি !

ট্র্যাম থেকে নেবেই কবির সঙ্গে দেখা—ফুটপাতে ঢুঁড়ছে।

বললাম—এবার রাজপথের কবিতা নাকি ?—খেলতে খেলতে কোন্ শিশু মোটরের তলায় ছিটকে পড়ল—মা'র কোল ছেড়ে ?

পানের পিক ফেলে ও শুধু বললে, ওর ধারালো চোখ দু'টো চাল্‌শে হয়ে এসেছে—একটা চাকরি খুঁজছি।

—চাকরি ? কেন ?

ছেঁড়া শার্টের বুক-পকেট থেকে একটা ছেঁড়া চিঠি বের ক'রে বললে—দাদা তিনদিন হ'ল মারা গেছেন, ছোট ভাইটারও কলেরা হয়েছে।

গলার রগগুলো চিরে যেন কথা বেরুল।

বললাম—চাকরির জন্য আজ টো-টো করলেই কি ছোট ভাইর ব্যামো সারবে ?

—কিন্তু গোটা সংসারের ভূতটা এবার একেবারে আমার কাঁধ জুড়ে বসল যে। —কাল রাতেই চিঠি পেয়ে রাজা একশোটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই—

বললাম—আপনার ত' রাজাই আছে—

—দাদার নয়টি অপোগণ্ড শিশুও আছে। বিধবা বোন—তারো গোটা পাঁচেক বোধ হয়। আর মা। পেছনে একটা ছোট ভাই ছিল ; সেও আশু বাড়াল।

পরে পানের ছিব্ড়েগুলো থুতিয়ে ফেলতে ফেলতে বললে—রাজার কাছে কত আর হাত পাতব? অনেক লোকই ওর থলিতে নিজের জন্য একটা একটা ফুটো ক'রে রেখেছে। আমার জন্য ওর তাহলে থলেটা একেবারে উপুড় ক'রেই ফেলতে হয়।

—কিন্তু এত টাকার চাকরি কি মিলবে?

—কক্ষণো না।

—তবে?

—তবে আর কি। বেঁচে থাকব তবু। জীবনের শুকনো ডাঙায় একটা ভাঙা ডিঙি ঠেকে থাকবে।

হেসে বললাম—আজ রাত্রে ঘরে ফিরে একটা কবিতা লিখুন গে। মুচি সারাদিন ব'সে থেকে সেলাই করবার জুতো পেলনা, রিক্সওয়ালা পেলনা কিরায়া, জেলে জাল ফেলে পেলনা একটা চুনো পুটিও। উকিল পেলনা মক্কেল, আর কবি পেলনা চাকরি।

ঠুনকো একটু হাসিতে ওর চোখদুটো খানিক ঘুলিয়ে উঠল মাত্র।

যে বেচারা গলিটা দিয়ে রাজা বেরিয়ে এল—ওকে এমন জায়গায় দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি—সেটা বেজাত।

—এখানে?

কালশিরার মতো মাড়িগুলি বের ক'রে বললে—আমার জন্যে সকল দরজাই খোলা। আমি যে রাজা।

—এদেরও পয়সা বিলোস নাকি? কত ক'রে?

এক শীতের রাতে কোন জংলি এক ইষ্টিশানে একটি মেয়ে নাকি রাজার পায়ে ধ'রে কয়েকটা টাকা ভিক্ষে চেয়েছিল। স্বামী মেয়েটিকে গ্রহণ করেনি, মেরে খেদিয়ে দিয়েছে। ও কলকাতায় মাসীর বাড়ী যাবে।

রাজা বললে—যে স্বামীর হাত অত্যাচারীকে ঠেকাতে পারেনা, সে পারে অবলা স্ত্রীকে ঠেলে ফেলতে।

বললাম—মাসীর বাড়ীর নাম ক'রে মেয়েটা বরাবর এ পাড়াতেই উঠে এল বুঝি।

—শোনই না—

—থাক, আমার ঢের কাজ আছে এখন। তুই হঠাৎ—

—ওর অবস্থা খুব খারাপ, নিমুনিয়া—বোধ হয় বাঁচবে না। দেখতে গেছলাম। ডাক্তার-পথ্যের জন্ম টাকা দিয়ে এসেছি।

পরে খুব ধীরে ধীরে বললে—এমনি প্রতি ঘরে আমার বিরহিণী প্রিয়া রুগ্ন মৃণ্য শয্যায়—

বাধা দিয়ে বললাম—ও-ও তোকে ভালোবাসে বুঝি?

ও কিছু বলেনা, রাস্তার লোক-চলাচলের দিকে চেয়ে থাকে—উদাস, নাখুস।

আবার বললাম ওদের মধ্যেও এ ফ্যাসান ঢুকেছে তাহলে?

ও শুধু বললে—প্রিয়া, প্রিয়া—

বললাম—ওর নয়, তোর প্রেমের নিমুনিয়া এবার।

কবির সঙ্গে ফের দেখা—ওর হাতে একটা চৌকো খাতা।

বললাম—কিসের কবিতা? সাহারার?—না পচা ইঁদুরের?

ও খাতাটা আমার হাতে তুলে দিল। মিলফোর্ড কোম্পানির ডেবিট-ক্রেডিটের চোথা খাতা একটা।

কবি নয়—কেরাণী।

পরণের কাপড়টা পুঁজ্‌রা, গায়ে যেখানেই চুলকোয়, সেখানেই ছেঁড়ে। হাঁটুর কাছে একটা প্রকাণ্ড ফাঁক করে বললে—এবারেই সত্যিকারের কবিতা লিখব জীবনের।

গলাটা ভিজা—ভারী।

ফের বললে—কোমর-থেঁৎলানো সেই কুলিটা এবার সত্যি সত্যিই আমার মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠবে। আমার খাতার পাতা শাদাই থেকে যাবে—তা থাক্।

গাল বেয়ে পানের কষ পড়ে, জামার হাতা দিয়ে তা' মোছে।

পরে একটা লালখাম বের ক'রে বললে—নিন্, আঁপনার নেমন্তন্ন। আমি বিয়ে করছি।

—সে কি কথা? ক'টাকাই বা মাইনে?

—হোকনা আটাশ টাকাই। কেন করবনা শুনি?

—নিজে কেন এসেছেন তাই জানেন না, শুধু শুধু আর কতগুলো –

—কে বললে জানিনা?—ভেঙে যেতে এসেছি, মচকে, থেৎলে যেতে। আস্থক ওরা দল বেঁধে ভাঙার মরার ছিঁড়ে-পড়বার খেলায়। বিধাতার হাতুড়ির তলায় সবাই বুক পেতে দিয়েছি—বাপ ছেলে নাতি; বিধাতার হামানদিস্তে!

—কিন্তু ওরা যে নিরপরাধ—

—কে বলে? আর আমাদেরই বা কি অপরাধ ছিল? আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে কি ক'রে তাহলে? আমাদের রোগ, জীর্ণ সংস্কার, লালসা—কাদের কাছে গচ্ছিত রেখে যাব?

ব'লে খুক্‌খুক্ ক'রে কেশে পথের ধারে কফ ফেললে — রক্তের ছিটে।

বললাম—কক্ষণো আপনাকে বিয়ে করতে দেবনা। মেয়ের বাপকে জানাব।

হেসে কবি বললে—ওরা তা জানে। বলে—ও কিচ্ছু না, সেরে যাবে। তেরো বছরের মেয়ে নিয়ে বাপের ভীষণ ফাঁপর—সেধে পায়ে ধ'রে দিতে চায় বিলিয়ে। শুধু তাই নয়—নগদ হাজারটি টাকা পর্য্যন্ত। একটা বেড়ালছানা অমনি চুরি গেলে মন পোড়ে। আপনি যদি 'না' বলতে যান, ত' ঠেঙাবে।

হাসতে পারেনা, কাশি ওঠে।

—আপনি বরপণ নেবেন?

—নিশ্চয়ই। হাজারটি টাকা ব'লেই ত'—

—ঐ তেরো বছরের মেয়ের উপায় কি হবে?

—বিধবা হবে। যক্ষ্মা হয়ে ম'রেও যেতে পারে।

—আপনি কবি হয়ে এই নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেন?

—আর কবি ব'লেই ত'। এই পৃথিবী যে সৃষ্টি করেছে, সেও ত' প্রকাণ্ড কবি—কেরাণী নয়। আমার দাদাকে যে মারলে, আমার ফুসফুসে যে পোকা ঢোকালে—আমার ভাবী বধূর এয়োতি যে চুরি ক'রে নেবে—

—কিন্তু ঈশ্বর ব'লে ত' কেউ নেই।

নেই?—ও যেন পার থেকে হঠাৎ মাঝ দরিয়ায় পড়ল। না, আছে। দেখছেন না, কবরের মাটি ফুঁড়ে ঘাস গজায়—নববধূর রঞ্জিত লজ্জাটুকুর আশায় যক্ষ্মারোগী পর্যন্ত দিন গোণে।

প্রচণ্ড কাশির বেগ এল। ওর বুকটা যেন চিড় খেয়ে ফানুস-ফাটা হয়ে যাবে।

রাজার মুখ ভারি ব্যাজার।—ব্যাপার কি?

শুনলাম, আগাছা ছেলেটা নাকি পালিয়েছে। খালি হাতে অবিশ্যি নয়, রাজার তোষকের তলা থেকে খান তিরিশ দশ টাকার নোট নিয়ে।

—পুলিশে খবর দিয়েছিস ত'! পাজি, বেইমান ছোঁড়া—

ও শুধু বললে—টাকাটা ফুরিয়ে গেলেই ফের আসবে। আমার পায়রাগুলি কতবার আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি, আবার নিজের নিজের কোটরে ফিরে এসেছে।

সেদিন কুত্তিটাকে কী পেটাই পিটলাম, আবার সন্ধ্যাবেলায় এসে পা চাটতে বসল। ও-ও আবার ফিরে আসবে।

পরে বললে—সেই ভিখিরি-মেয়েটাকে খুঁজতে এসেছিলাম। দিন তিনেক হ'ল হঠাৎ নাকি মারা পড়েছে। অথচ ওর মা'র বসন্তের ঘাগুলি সব শুকিয়ে গেছে দেখলাম।

বললাম—কবিও ত' আর তোর কাছে নেই—তুই ত' ভারি একা তাহলে।

—একা? কষ্টে একটু হেসে বললে—প্রিয়ার প্রেমে সমস্ত প্রাণ ভ'রে আছে। কাল একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে—আমরা আমাদের মিলিত ভালোবাসায় পৃথিবীর সকল কান্না মুছে দেব, সেই দিনটির জন্য চেয়ে আছি।

চিঠিটা পড়তে দিল। শেষে আছে—বি এ-টা শেষ হ'লেই ছাড়া পাব। আমাকে কে আর বাঁধে তখন? তুমি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেও।

রাজা চিঠিটা যত্নে বুক-পকেটে রেখে বললে—একদিন নিশ্চয়ই আসবে—যেদিন পৃথিবীতে এত অকারণ দুঃখ থাকবে না।

বলতে গেলাম—দুঃখ কোন দিনই অকারণ নয় কর্মফলে।

আমার কথায় কোনো কান না পেতেই বললে—কবিকে কেরানী হয়ে ধুঁকতে হবে না, পয়সার দামে প্রিয়া দেহ বিকিয়ে দেবে না—আবার সব জুড়ে যাবে, ভরাট হয়ে উঠবে।

পরে মলিন মুখে বললে—অনিলকে টাকা দিতে চেয়েছিলাম, নিলে না। ও এখন যে পাড়ায় আছে—বীভৎস। বাড়ী থেকে সব এখানে এসেছে—একপাল। ও এমনি ক'রেই আত্মহত্যা করতে চায়। ওকে কি বাঁচানো যায়ই না?

—না।

রাজা ভিক্ষুকের মতো আমার দিকে চাইল। বললে—ওর পরিবার-প্রতিপালনের ভারটা আমরা দু'জনে নিই আয় না। জানিস, অনিলের মধ্যে বন্দী ভারতী কাঁদছে! ওকে এরকম ভাবে পিষে যেতে দিলে আমাদের দেশের জাতির ভয়ঙ্কর ক্ষতি;—লুকোনো প্রতিভা খুঁজে বের ক'রে ফুটতে দেবার সাহায্য করাও দেশ-সেবা।

—কিন্তু সম্প্রতি আমারো যে পরিবার-পালনের ঝোঁক হয়েছে বড্ড বেশী। আমাদের পোড়াকপালে প্রিয়ার চন্দনবিন্দু ত' পড়বে না, মাগ-এর পোড়া কাঠেরই দাগ পড়বে! পড়ুক।

ব'লে চ'লে গেলাম।

ও দাঁড়িয়ে রয়েছে—ভাঙা একটা নিশানের মতো।

নাম জানলাম সুষমা। বি. এ. পাশ করেছে এ বছর।

মা বললেন—তুই দেখে আয় বাপু, শুধু বি. এ. পাশই কি যথেষ্ট?

বৌদি বললে—বি. এ. পাশটা তো শুধু চাটনি। চেহারা ত' আমার চেয়েও কালো।

—হোকগে। তাই সই।

বিয়ের রাতে মেয়ে-মহলে আমি ব'সে আছি মীরমজ্‌লিস-এর মতো। হঠাৎ ভিড় সরিয়ে রাজা এসে হাজির। আঙুল নেড়ে আমাকে ডাকলে।

গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। বললাম—যা বলবার, এখেনে এসেই ব'লে যা।

ওর মুখ সীসের মতো; চোখ দু'টো চালশে। এসে কানে কানে বললে—সু-কে বলিস না-পাওয়ার মধ্যেই—

কথা শেষ করতে পারে না—গলা আটকে আসে।

বললাম—বলব।

সু বোধ হয় ঘোমটার তলা থেকে একটু হাসল।

রাজা ত' নয়, পালক-ছেঁড়া ঝড়ো কাক একটা। ও চ'লে গেলে মেয়ের দল ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। কেউ বলে—চিংড়ি মাছ। কেউ—শুঁয়োপোকা।

সু খালি মুচকে মুচকে হাসেই।

আবার আর একটা লাল খাম—রাজার বিয়ে। আমাকে সু-কে দু'জনকেই নেমন্তন্ন।

সু-কে তখন টমাস হুড-এর একটা কবিতার শব্দার্থ বুঝোচ্ছিলাম। মিসেস হেমান্স-এরও।

বললাম—যাবে নাকি?

—দূর্।

একাই গেলাম।

রাস্তার নামটা ফের পড়লাম—এই ত' বটে। তবে কি?—কেমন খটকা লাগল।

নম্বর চিনে চিনে যে বাড়ীটায় উঠলাম—রাজা আমাকে ঠাট্টা করেনি ত'?

তবু সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম।

এক কোণে একটা তক্তপোষের ওপর একটি মেয়ে শোয়া—মরণাপন্ন, হিক্কা উঠছে। শিয়রে রাজা—মেয়েটার মুখে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল ঢালছে—গঙ্গা-জলই হয়ত।

আলো জ্বালা হয়নি, সমুখের বাড়ীর এক টুকরো আলো এসে দেয়ালে পড়েছে।

বললাম তোর নাকি আজ বিয়ে?

কুৎসিত মেয়েটার কুঁচকানো মুখের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—হাঁ। দেখছিস না আয়োজন?

দরজার কাছে দড়ির একটা খাট—মরামানুষের সিংহাসন।

মেয়েটার মুখ পর্য্যন্ত কাঁথাটা টেনে দিয়ে বললে—তোর সিল্কের পাঞ্জাবিটা খুলে ফেল ভাই, ছড়িটা ঐ কোণে রাখ। তোকেই কাঁধ দিতে হবে—আর কেউ নেই।

সামনে একটা মাটির ভাঁড় ছিল, লাথিয়ে ওটাকে ভেঙে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম।

রাজাটা যে এত বড় অমানুষ, ভাবিনি।

বাড়ী ফিরবার মুখে গঙ্গাস্নান ক'রেই ফিরতে হবে—

চোখের চাতক

পাতা ঝরার সময়। রিক্তপত্র শাখে শাখে তখন মৃত্যু-মর্মর উঠছে।

ও-মেয়েটির একটি নাম দেব ক'দিন থেকে ভাবছি। আজো মেয়েটি জানলায় এসে বসেছে। মনে মনে ভাবি—মেয়েটির নাম রাত্রি। দলিত কাজলের মতো কালো আয়ত বিষণ্ণ দুটি চোখ এই শীতের সন্ধ্যার মতো সজল ম্লান, ওর মুখখানি ঘিরে পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের মতো ঘন চুলগুলি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে আছে। এই মেয়েটির নাম আমি রাত্রি রাখলাম, এই নামটি নিয়ে শুয়ে শুয়ে খেলা করতে ভারি ভালো লাগে।

কাল রাতে ও-বাড়ী থেকে একটা কাতর খিন্ন আর্তনাদ অন্ধকার চিরে-চিরে আমার বুকে এসে লাগছিল। হয়ত ঐ মেয়েটিই কাল চেঁচিয়ে কেঁদেছে, ওর স্বামী হয়ত ওকে মেরেছে কাল। জানি না, কিন্তু ওকে দেখে আজ এই কথাটাই কেন জানি বারে বারে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন তিমিররাত্রির দুর্য্যোগ-অভিসারে মেয়েটি একটি পাখী।

ওকে দেখে আবার আশা হচ্ছে, পৃথিবীকে ভালো লাগছে, নীল আকাশের কোল ভ'রে হাওয়ায় যেন মিঠা মাটির গন্ধ ভাসছে, মনে হচ্ছে কাকে যেন ভালোবাসতে শিখলাম।

অসুখ হ'লে মাথা বাস্তবিকই বিগড়ে যায়। মনে হচ্ছে কে যেন পাশে এসে বসল। ওর কালো চুলগুলি মুঠি ক'রে একবার স্পর্শ করলাম, ওর আঁচলের খানিকটা হাওয়ায় বুকের ওপর এসে পড়ল। কত কথা বলতে চাইলাম, পারলাম না, শুধু একটি ক্ষীণ উচ্চারণ কেঁপে কেঁপে ঝ'রে গেল, রাত্রি।

ভাবছি, ঐ যে চিলটা দুই ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে, কত দূরে কোন্ গাছের চূড়ায় ওর নীড়? —

মেয়েটি তেমনি ব'সে আছে আর আমাকে দেখছে। আমি ওর সঙ্গে কথা কইতে চাই, কিন্তু কথা আসে না, চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে আমিও দেখি। দেখায় খেলা করি, চেয়ে চেয়ে কথা কই। আমি মেয়েটির সমস্ত কথা বুঝতে পারছি।

মেয়েটি বলে তুমি এমনি ক'রে দিন-রাত শুয়ে থাক কেন? কি তোমার অসুখ?

বলি—কি অসুখ তা ত' জানি না। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করলে, বুঝতে পারলে না।

মেয়েটি বলে—তোমার এত অসুখ, কই, কাউকেও ত' তোমাকে সেবা করতে দেখি না।

বলি—আমার কে আছে যে সেবা করবে?

মেয়েটি কান্না-ছলছল চোখে তাকায়, বলে—কেউ নেই?

তেমনি তাকিয়ে বলি না, নেই কেউ।

মেয়েটির দু'টি চোখে একটি আকাঙ্ক্ষা শিশিরের মতো টলমল ক'রে ওঠে, বলে —তুমি ভারী দুঃখী, না? আমার ভারি সেবা করতে ইচ্ছা হয় তোমাকে, যাব?

আর তাকাতে পারি না। চোখ বুজে আসে। সত্যি মনে হয় ও যেন এসেছে। ওর চুলের ঘ্রাণ পাই। কপালে আলগোছে হাত বুলিয়ে দেয়। চুড়ির গান শুনি। ছড়ানো চুলগুলির ওপর ওর হাতটি এলিয়ে থাকে। এই পা দু'টি গুটিয়ে নিয়ে কাঁধের কাছে আরো একটু ঘেঁষে বসল, কপাল থেকে এই আমার চুলগুলি সরিয়ে দিচ্ছে। এই মুখটি মুখের কাছে এনে শুধোচ্ছে—কেমন আছ?

আবার তাকালাম। মেয়েটি তেমনি ব'সে আছে।

বলি—অমন চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন? তোমার ঘরের কাজ শেষ হয়ে গেছে?

মেয়েটি বলে—ভালো লাগে না।

—কি দেখছ ব'সে?

—তোমাকে দেখছি।

—কিন্তু আমাকে দেখবার মতো ত' কিছু নেই।

—আছে, তুমি জান না। তুমি রাগ করছ? তাহলে উঠি।

কাকুতি পূরে চেয়ে বলি—না, উঠো না। কিন্তু আমি যে তোমাকে দেখছি।

হঠাৎ পেছনে কা'র তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। একটি লোক জানলার সামনে এসে মেয়েটির হাতখানা ধ'রে টেনে ওকে সামনে ধাক্কা মেরে কর্কশ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে, পথের সামনে জানলায় বাড়ীর বৌর এমন ভাবে ব'সে থাকা নিতান্ত গর্হিত দুষ্কর্ম, বিশেষতঃ—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যখন সামনেই একটা ছেলে চোখে ওৎ পেতে চেয়ে আছে—

জানলাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

ঝাপ্‌সা আকাশে সন্ধ্যাতারাটি জ্বলছে, মনে হচ্ছে যেন রাত্রির চোখ। আমি চিনতে পেরেছি। চেয়ে থাকতে থাকতে কান্নায় চোখ ভ'রে এল। আমার জানলাটাও বন্ধ ক'রে দিতে চাইলাম। শীর্ণ জীর্ণ হাত দু'টো বাড়িয়ে নাগাল পেলাম না।

সকালবেলায় একটি কুষ্ঠব্যাধি-জর্জর রমণী গ্যাসপোস্টের তলায় ব'সে হাত পেতে ভিক্ষা করে। আজ দেখেছি, একটি ভদ্রলোক এ-পথ দিয়ে হেঁটে যেতে ভিখারিনী একটু এগিয়ে এসে ককিয়ে তার প্রার্থনা নিবেদন করলে ভদ্রলোকটি ঘৃণায় ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাঁর হাতের লাঠিটা দিয়ে মেয়েটির গায়ে এক ভীষণ ঘা মারলেন, রমণী মা-গো ব'লে মাটিতে প'ড়ে কাৎরাতে লাগল। আমি শুয়ে শুয়ে এই দৃশ্যটি দেখেছি। কত দেখলাম এই পথের চলাচল!—ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া শ্রান্ত হ'য়ে মাটিতে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেছে, মুনিব তাকে রেহাই দেয়নি, তাকে ফের চলবার জন্য চাবুকের পর চাবুক চালিয়েছে। বড়লোকের মোটরগাড়ী পথের ঘুমন্ত কুকুরকে মাড়িয়ে দ'লে পিষে চ'লে গেছে, কুকুরটা কাতর মর্মভেদী স্বরে গোঙাতে গোঙাতে চুপ করেছে। কত দেখলাম। আজকে আবার দেখলাম নিঃসহায়া ব্যথিতা নারীর চোখে সুগভীর অতল বেদনার ছায়া! জীবনে কত পাপ কত দারিদ্র্য কত অত্যাচার কত রোগ, তারপর আবার এই দুঃখিনী নারীর চোখে রহস্যনিতল নিবিড় ব্যথার স্বপ্ন!

সে রাতেও ঘুম এল না।

জানি, বেশী দিন আর বাঁচবো না। জীবনদেবতা জন্মের থেকেই রোগকে আমার চিরসাথী ক'রে দিয়েছেন, মুক্ত অনিন্দ-ছন্দিত প্রাণের পরিচয় পেলাম কই? মনে হচ্ছে, জীবনে আজ যেন কিসের সৌরভ উঠছে! এই জীবনে কি যেন পেলাম! মনে হচ্ছে, কে যেন আমাকে ভালোবাসে।

মাঝ-রাতে চেয়ে দেখি, ওদের বাড়ীর জানলা খোলা! হাওয়ায় একসঙ্গে

শাড়ীর আঁচল ও চুল উড়ছে। অন্ধকারে কালো চোখের তারা যেন মিশে আছে। অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে কথা কই।

তাকিয়ে বললাম—এত রাতে যে?

মেয়েটি তেমনি জবাব দিলে—ঘুম আসছে না।

অতি কষ্টে ধীরে ধীরে মাটির প্রদীপ জ্বালালাম। বললাম—তোমাকে বরণ করতে এ দীপ উজ্জ্বল করলাম, রাত্রি।

মেয়েটি ধীরে ধীরে জানলা দু'টো বন্ধ ক'রে চ'লে গেল। স্বামীর পাশে গিয়ে ধীরে ধীরে শুল হয়ত!

হাওয়াতে বাতিটা নিভে গেল। অন্ধকারে কে যেন এল। চিনলাম। বললে—আলোটা নিবিয়ে দিলাম। এসো, ঘুমোও, আর রাত জেগো না।

বললাম—না না, আলোটা জ্বালাই, তোমাকে ভালো ক'রে একটু দেখি, তোমার সঙ্গে কথা কই।

ও বললে—তাহলে তোমার শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে। এই আমি আমার হাত মেলে রেখেছি, এর ওপরে মাথা রেখে শোও লক্ষ্মীটি, আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দেব।

শীতের হাওয়া শাখায় শাখায় হা হা করছে।

কতদিন ওকে দেখি না। মনে হয় বিরহের ছন্দে যেন ক্লান্ত দিনের রাগিনী বাজছে। জানলা দু'টো আর খোলে না। আমার খোলা জানলা হাতছানি দিয়ে ঐ জানলাকে ডাকে—জবাব মেলে না। বসন্ত পৌঁছুবার আগেই হয়ত চললাম।

একদিন ওদের জানলা খুলে গেল। একটি ভদ্রলোক—তাঁর পকেটে বিশেষ কোনো যন্ত্রের মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার ভঙ্গী দেখে বুঝলাম, ইনি ডাক্তার—ব'লে বোঝালেন যে, রোগীর ঘরে জানলাগুলো খোলা থাকলে রোদ আর বাতাস যথেষ্ট আসতে পারে, ওদের বন্ধ ক'রে রাখলে রোগীর অপকার হ'তে পারে।

ওকে আবার দেখলাম। চেহারাটি শীতের পাতার মতো রঙহারা শুক্‌নো, বড় বড় দু'টি চোখে দুই অগাধ কান্নার সমুদ্র। চেয়ে বললে—কেমন আছ? তোমায় অনেক দিন দেখি নি।

বললাম—তোমাকে এত রোগা ম্লান দেখাচ্ছে কেন?

ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখলাম, খাটের উপর সেই স্থূলতনু লোকটি বেজায় শীর্ণ হয়ে বিছানায় লুটিয়ে রোগ-যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। মেয়েটি তার পাশে গিয়ে বসল, গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

—ভালো লাগছে হাত বুলিয়ে দিতে ?

—হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে। বুকের উপর তোমার হাতখানি খুব জোরে চেপে ধর। কি নরম ঠাণ্ডা তোমার হাত।

—রেখেছি।

—আমি হয়ত বেশীদিন আর বাঁচব না।

— ছিঃ, এ কথা বলতে তোমার একটুও কষ্ট হয় না ?

— না না, আমি ভালো হব বৈ-কি। কেমন সুন্দর এই আকাশ, এই শীতের মধ্যাহ্ন !

—তুমি চুপ ক'রে থাক লক্ষ্মীটি।

—বালিশটা থেকে আমার মাথাটা তোমার কোলের ওপর তুলে নাও। আচ্ছা, তুমি নাইতে খেতে যাবে না ? আমি কি স্বার্থপর ! আমার জন্যে তোমাকে খালি খাটিয়ে নিচ্ছি।

— তুমি একটু ঘুমোও, আমি স্নান ক'রে খেয়ে আবার তোমার পাশে এসে বসব।

মেয়েটি স্বামীর শয্যাপার্শ্ব থেকে ধীরে ধীরে চ'লে গেল। তার যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলাম।

কি মর্মভেদী আকুল কান্না উঠছে মেয়েটির বুক থেকে। সেই বিকৃতাকৃতি স্বামীর বুকটা দুই শুভ্র সুগঠিত বাহু দিয়ে বেষ্টন ক'রে রাত্রি চীৎকার ক'রে কাঁদছে।

—এ কি, এই ত' আমি, তুমি কাঁদছ কেন ? এই ত' তোমাকে ধ'রে আছি— তোমার হাত, তোমার চুল, তোমার পিঠ। আমি ত' যাইনি কোথাও।

—তুমি কোথায় গেলে, তোমায় ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাকব—

—বাঃ, তুমি কি পাগল হ'লে ? এই যে আমি সব দেখছি, ঐ আলনায় তোমার শাড়ী, আমার ওভারকোট, ঐ রাঙাধুলোর গলি, ঐ স্তিমিত আকাশ ! ওঠ ওঠ, আমি ত' যাই নি, শুধু শুধু কেন কাঁদছ ?—

—না না, চ'লে গেছি, আমি চ'লে গেছি, দূরে, বহুদূরে গ্রহতারা আকাশ পৃথিবী সমস্ত কিছু পেরিয়ে আমি চ'লে গেছি।

অনেক কষ্টে এবার আমার ঘরের জানলা দু'টো বন্ধ ক'রে দিলাম।

ছোটার সে কী কদম—মুখ থুবড়ে পড়ে আর কি!

হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলে এসে বললে—সেই ঝাঁকড়ার মাঠ চিনতিস মা?—সেই ভেলুর হাটে চ্যাঙারি ক'রে মাছ বেচতে নিয়ে যাবার বেলায় পথে পড়ত?—সেই যে রে অশথ পোতার—

মুমূর্ষু মা শুধু বললে—হ্যাঁ—

আর বলতে পারে না, দাঁতের ফাঁকে কথা বুজে আসে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে থুতু গড়ায়।

ছেলে বললে কোথা থেকে সব সাহেব-সুবো এসেছে মা—সব ফিতে ফেলে ফেলে মাঠ মাপছে। আর সঙ্গে বিস্তর কুলি-ধাঙর—প্রায় দু'তিন শ'। গাঁইতি নিয়ে সব মাটি খুঁড়তে লেগেছে।

মা চিবুকটা তুলে জিজ্ঞাসু চোখে শুধু তাকায় মাত্র।

—রাস্তা কাটছে রে—সড়ক। হাটে যেতে আর হোঁচট খেতে হবে না মনে আছে, সেই যে রে গাছের শেকড়ে পা থেঁৎলে ধুম্ ক'রে প'ড়ে গেছলি -জ্যান্ত কৈ মাছগুলি ধামা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেছল—?

ব'লেই ছেলের খিল-খিল ক'রে হাসি।

—আমাদের নব্‌নে হেবোও কোদাল নিয়ে কোপাতে লেগে গেছে। ছিদাম পর্য্যন্ত;—কোপাতে ত' পারে না, শুধু মাথায় ধামা ক'রে মাটি তুলে নিয়ে ওপারে এনে ডুর করছে।

দুব্‌লা মা ছেলের ক্ষুদে হাতখানি নিজের খসখসে বিবর্ণ হাতের উপর টেনে এনে বোজা গলায় বললে -বাজারে গেছলি?

—না মা। কাল রাতে ত' মোটে একটা মাত্র শোল মাছ আটকা পড়ল। তাই নিয়ে দুপুর দু'টো পর্য্যন্ত ত' ব'সে থাকতাম—বিকৃত না। আর—কত-তেই বা বিকৃত?—বড় জোর তিন পয়সা। বাজারেই যাচ্ছিলাম, ওদের মাটি কোপাতে দেখে ফিরে এসেছি মাঝ পথ থেকে। আমিও মাটি কোপাব, মা।

মা কথা কয় না, ছেলের হাতের রোগা আঙুলগুলি নিজের শিথিল মুঠির মধ্যে একটু জোরে চাপ দিতে চেষ্টা করে।

—নব্‌নে বললে, যে পয়সা মিলবে, তোর মাছ বেচার চেয়ে ঢের বেশি। ছিদামের কী ফুর্তি!—বলে কিনা, পয়সা পেলে বাবুদের মতো রোমাল কিনবে—

মাথায় বাঁধবে। আর একটা খেলনা হাতঘড়িও নাকি। আমি কিন্তু তোর জন্যে ওষুধ কিনব মা—কব্‌রেজের ঠেঙে। ব্যাটা আবার পয়সা না:হ'লে ওষুধ দেয় না।

মা'র হাড় বের-করা ভাঙা গালের ওপর একটু হাত বুলিয়ে পরে বললে—যাই মা আমি ?

মা'র করুণ নীরব দুই চোখে সম্মতি ভেসে ওঠে হয়ত—ছেলে ছুট্টে বেরিয়ে যায়।

আবার তক্ষুনিই ঘরে ঢুকে বললে তাড়াতাড়ি—ভুলার মধ্যে শোল মাছটা রইল, মা। কুসি-মাসী এলে ওকে রাঁধতে বলিস। ওটা আজ আমিই খাব—আর মাসী যদি কিছু ভাগ রাখতে চায় বেঁকির জন্য, ত' যেন রাখে। তুইও একটু খাস্‌—কী হবে খেলে ?

আবার ছুটে যায়।

উঠোনের ও-পাশ থেকে বেঁকি বলে—কোথা যাচ্ছিস রে ভোম্‌রা ?

ভোম্‌রা কানও পাতে না। দৌড়ে চলে। যেন হাওয়ায় কে একটি পালক উড়িয়ে দিয়েছে। পাতলা পালক—ফুরফুরে পালক।

যেন একশোটা ভেলুর হাটের সোর।

দু' কিনারে দু'টো নারকেলের দড়ি টান ক'রে ফেলে মাঝে একের পেছনে এক—এক দঙ্গল কুলি মাটি কোপাতে লেগেছে সার বেঁধে।

কাছাকাছি গাঁয়ের বৌ-মেয়েরা পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে ঘর থেকে আলগা হয়ে মাঠে বেরিয়েছে কাণ্ড দেখতে। এত লোক এক সঙ্গে দেখাও নাকি পুণ্যি !

নব্‌নে বললে - ড্যানার শিরগুলো কেমন ফুলে উঠছে দেখছিস—নীল !

কার্ত্তিক বললে—মাটি কুপিয়ে সুখ আছে, ভাই। বুকের ছাতি নাচে তালে তালে। ঐ যে সব গরুর গাড়ী এসে পড়ল। ইঁট সুরকি বুঝি ? পাতলা ক'রে কোপাস কিন্তু রে।

ছিদাম ধামায় ক'রে গুঁড়ো মাটি তুলে মাথায় নেয়—আধা পথে এসে ধামাটা ভোম্‌রার মাথায় বদলি করে। খানিকটা এগিয়ে মাটিগুলি থুব ক'রে থুয়ে ভোম্‌রা ফের ফিরে আসে ডালাটা ফের মাথায় নিতে—ওর বুকটা ফোলা, কপালটা জলজলে।

ফের মুখোমুখি হ'তেই ভোম্‌রা বললে—কত পাওয়া যাবে রে ছিদাম ?

ছিদাম মাটি-মাখা দু'হাতে বুকের ঘাম মুছে বললে—যাই যাক।—বাজারে বিকির জন্য পিত্যেশ ক'রে বসে থাকার চেয়ে ঢের ভালো !

ছিদাম খড়কে বেচে—পাটখড়ি, সলতে, চরকার সুতো। কত আর বিকোয় এ সব ?

আবার দেখা হ'তেই ছিদাম বললে—কোপাতে পারলেই বেশি পয়সা। দেখছিস না দড়ির খাট ছেড়ে বুড়োরাও পর্য্যন্ত কোদাল নিয়েছে। আমাদের এই বেশ —দেওয়া আর নেওয়া।

—আমরা বন্ধু।

সারা শৈশবের মারামারির কথা ভুলে যায়—পুকুরে পরস্পরকে চুব দেবার কথা। দু'জনে দু'জনের ঘেমো বুক দু'টোর দিকে চেয়ে হাসে। আকাশের রোদ দু'জনেরই ভিজা গায়ে পিছলে পড়েছে একই মা'র স্নেহের মতো!

এক একটা কোদাল মারে, আর বুড়ো পেসাদের পাঁজরার হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে। লিকলিকে হাঁটু দু'টো দুমড়ে ভেঙে পড়তে চায়, মাজাটা যেন কে মোচড়ায়, চিবোয়। তবু কোদাল মারে—মাটির নীচেই মজুরি।

বেশিক্ষণ পারে না, হাঁপায়। কল্‌কেটা ধরিয়ে বুড়ো আঙুলের ফাঁকে নিয়ে পাশে ব'সে টান দিতে লাগল, গর্ত থেকে চোখের ড্যালা দু'টো যেন বেরিয়ে আসবে ঠিকরে। পেসাদ যেন উত্তরে শ্মশানে যাবার পথে মাঝে অশথ্‌পোতায় একটুখানি জিরিয়ে যেতে বসেছে।

ঠিকাদার ট্যাস সাহেব সিগারেটের ছাইটা বুড়োর মাথার ওপর ঝেড়ে ফেলে পালিশ-করা বুটটার চোখা ডগাটা বুড়োর মেরুদণ্ডের ওপর ঠেকাল—সচেতন ক'রে দিতে হয়ত, গাফিলির জন্য শাসন করতে।

তাইতেই—

ফেরবার সময় আর দুলকি তালে নয়, ঢিমিয়ে চলে—জিরিয়ে জিরিয়ে।

—মাগো, ছটা পয়সা পেনু—পুরো দিন গুজরালে দুনো।

মা'র চোখের কালো কোলে খুসির একটু ছোপ পড়ে। হাতখানি বাড়িয়ে দেয় শুধু।

—একটা করকরে একানি আর দুটো পয়সা। নব্‌নে বললে, আনিটা এ বছরের, একেবারে আনকোরা। ঐটে রেখে দেব মা, খরচ করবনা।

পরে বিছানার ধারে ব'সে ব্যাজার মুখে ভোমরা বললে—জানিস মা, বুড়ো পেসাদটা ম'রে গেছে!

বিমার মা হঠাৎ ঝাঁঝালো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—কি বলছিস?

—নব্‌নে ওরা ত' বললে ওর পিঠের হাড়ে অনেকদিন থেকেই নাকি ঘুম ধরেছিল—জ্বর হ'ত! মাটি কোপাতে গিয়েই বুকের ফেঁপরা নাকি ফেটে গেছে। তা নয় মা, সাহেব-বাঁদরটা ওকে লাথি মেরেছিল।

কুসি-মাসী তেড়ে এসে বললে রুখে—মারবেনা ? একশো বার মারবে, সাহেবদের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে গেছল কেন ? কেন ?—কাজে গলতি হ'লে মারবে বৈকি।

ভোম্‌রা বললে—সেই মাঠ থেকেই ওকে শ্মশানে নিয়ে গেল। তুনিয়ায় ওর কেউই নেই কিনা ;—তুইও একটি বার দেখতে পেলি না। হোগলা জড়িয়ে পাটের রসি দিয়ে ওকে বাঁধলে ওরা—নব্‌নেটার যেন বেজায় ফুর্তি। এক একটা হেঁচকা টানে গেরো মারে, আর হাসে। একটুও দয়া মায়া নেই—বলে, চিতায় চড়িয়ে মট মট ক'রে হাড্ডিগুলো সব ভেঙে দেব বুড়োর।

চোখের জল মোছেনা, মা'র বুকের ওপর হাত রেখে বলে—মা, সাহেব-শূয়ারটার মুখে থাবড়া বসিয়ে কেউ দিলে না ? আমার ইচ্ছে করছিল, মারি পেসাদের কুড়োলটাই বেটার মাথায়। লুকিয়ে এক গাদা থুতু বেটার কোটের উপর ছিটিয়ে দিয়েছি—বাড়ী গেলে টের পাবে।

মা'র মুখের কাছে মুখ এনে বললে তারপর—তুই এত কাঁদছিস কেন মা ? পেসাদ ত' বুড়ো—একদিন ত' যাবেই। আমি গেলে বরং—

ছেলেও মা'র পাতলা চিমটে বুকটার মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপতে লাগল।

মা মারা গেল, পেসাদের পিছু পিছু—তু'দিন বাদেই।

নব্‌নে এল হোগলা আর রসি নিয়ে, কুসি-মাসী একটা শালুর কাপড় গায়ে চড়িয়ে দিলে। যে হরির নাম সারা জন্মে কেউ নেয়না ভুল ক'রেও—সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে আজ—হরিবোল। ডাকটা আকাশ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় যেন। —প্রার্থনা নয়, প্রতিবাদ।

বেড়ায় গোঁজা গাবের আঠায় কালো করা একটিমাত্র খেপলা জাল—বাঁকি জালও নয়। তাও পুঁজ্‌রা-পচা। আর মুলি-বাঁশের মাচার তলায় গর্ত ক'রে একটা ভাঁড় পোঁতা-তাতে, গুণে দেখা গেল সাড়ে এগারো আনা পয়সা। আর ট্যাঁকের সেই নতুন বছরের করকরে আনিটা—এতদিন ধ'রে ট্যাঁকেই আছে।—

সমস্ত জীবনের এই মূলধন।

পায়ের তলে রুক্ষ বৈরাগী পথ—আর ওপরের ফাঁকা ফতুর বাউল আকাশটা।

তেমনি বৈকি শুধোয়-কোথা যাচ্ছিস রে ভোম্‌রা ?

এবারে কান পাতে, কিন্তু জবাব দেয়না। চলে-ছুটে নয়, উদাসের মতো—নাখুস। পিঠের উপর তু'টি হাত জোড় করা। মাঝে মাঝে অকারণে পথের আগাছা-

গুলো টেনে টেনে ছেঁড়ে—আকাশের দিকে উঁচুয় ছুঁড়ে মারে, হাওয়ায় উড়ে ফের মাটিতে পড়ে। লাথির পর লাথি মেরে গোঁয়ারের মতো শুকনো মাটির ঢেলাগুলোকে ভাঙে, গুঁড়োয়। ডালের পাখীগুলোকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়ায়, কারো পাথায় লাগলে হাততালি দিয়ে ওঠে।

পা চালাতে চালাতে শ্মশানের কাছে এসে পড়েছে—একধারে দু'টো সজনে গাছ পাতা-ঝরা হ্যাংলা ডাল মেলে। যেখানে পেসাদকে পোড়ানো হয়েছিল সে জায়গাটায় একটা গাঁদালের ঝাড়—সেখান থেকে মা'র চিতাটা ফারাক।—তাতে একটা নাবালক তুলসীগাছ, একরত্তি।

ভোম্‌রা থক থক ক'রে একগাদা থুতু ছিটিয়ে লাথি মারতে মারতে বললে—নরকের উনুনে চেলাকাঠের বদলে তোর মুণ্ডুটা যেন ঢুকিয়ে দেয়, তুই মর।—তুই মরলি ব'লেই ত' মা মরল।

বিগত আত্মার উদ্দেশে তর্পণ নয়, তড়পানি - ফুল নয়, থুতু।

—তুই শালা আর কেন দু'দিন সবুর ক'রে গেলি না? আর দু'দিন পরেই ত' একটা টাকা হ'লে কব্‌রেজের ঠেঙে পাঁচন আনতে পারতাম। নিজে তো মা'কে একটি আধলাও দিসনি, অথচ মা তোকে রোজ ভেটকি মাছের ঝোল রেঁধে লুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে—আমিই দিয়ে এসেছি।

বলে, আর গাঁদালের ঝোপ লক্ষ্য ক'রে ঢিল মারে।

আবার তেমনি ব্যাজার মুখে চলে—এ-পাশ ও-পাশ, কোথাও যেন যাবার জায়গা নেই। মাটি থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে যা সামনে পায়, তাতেই বাড়ি মারে। চোরকাঁটাগুলো হেলে পড়ে, ধানের শীষগুলি মচকায়। যাকেই মারুক, মনে করে পেসাদকেই চাবকাচ্ছে যেন।

মা'র চিতার কাছে ব'সে এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলে না। দোহাত্তা খালি কাঠিটা চালায়—হঠাৎ একটা বাদাম গাছের গায়ে লেগে কাঠিটা দু'খান হয়ে গেল।

তুমুল তোলপাড়—এগিয়ে এসে দেখে—অশ্বত্থগাছটার গোড়ায় কুড়ুল পড়েছে।

যেন শিকড়ে শিকড়ে হাহাকার, শাখায় শাখায়;—শুকনো হলদে খসা পাতায় মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস যেন। মাটির তামাম বুক যেন বেদনায় টনটন ক'রে উঠেছে।

যুগযুগান্তলালিত বর্দ্ধিতায়তন সংস্কারকে যেন এক নিমেষে টেনে ছিঁড়ে উপ্‌ড়ে ছারখার ক'রে দেবে—

ডালগুলো সব কেটে ফেলা হয়েছে, গাছটা এখন একেবারে ন্যাড়া, ব্যাজার—গরীব। খালি ধড়টা আছে, আর গোটা কুড়ি ঘা পড়লেই মড়মড় ক'রে উঠবে। অনাথ ছেলের মতো গাছটা নীরবে কাঁদছে।

পাখীর বাসাগুলি প'ড়ে গেছে, বহু ডিম চুরমার হয়ে গেছে—শিশু পাখীগুলি উড়তে না পেয়ে চেপটে মারা গেছে। যারা পালাতে পেরেছে, তাঁরা চেঁচিয়ে দুর্বল পাখার ঝাপটু দিয়ে এই উদ্ধত হত্যার বিরুদ্ধে অস্ফুট প্রতিবাদ করছে। কেউ কেউ চেনা বাসার সন্ধানে উড়ে গিয়ে ফের ফিরে এসে গাছের গুঁড়িটায় ঠোঁট ঘষছে—অস্থির, অসহায়।

ধুলোর একটা ঘূর্ণি হাওয়া উঠল। তারপর—

এমন চীৎকার ভেলুর হাট তার জন্মে শোনে নি। শুধু কানে তালা লাগে না, বুক বন্ধ হয়ে আসে।

মানুষের চীৎকার নয়, গাছের।—শিবঠাকুরের মতো নাদুস-নুদুস বুড়ো জটাওলা অশ্বত্থগাছটার।

মনে হয়, সমস্ত আকাশ যেন খালি হয়ে গেছে, মাঠটা যেন সন্ত-বিধবা। কি যেন নেই—প্রকাণ্ড পরিবারের বুড়ো জ্যাঠামশাই—সব তাই মুখভার। গাছের ছায়াটি পর্য্যন্ত ঘুচে গেল—ছায়া ত' নয়, রাজসিংহাসন।

নব্‌নে কুড়ুল নিয়ে লাক্‌রি ফাড়তেই লাগল। কিছুতেই যেন হুঁশ নেই।

দুঃখী ছেলের মতো ভোম্‌রা বললে—রাস্তাটা একটু বেঁকে ঘুরিয়ে নিলেই হ'ত, খামোকা—

কার্ত্তিক বললে ঘাড়ের ঘাম মুছে—শুধু কি রাস্তাই নাকি রে বোকা, এখানে—এদিকটায় সব আপিস হবে। এ বাবা সাহেবের হুকুম।

বেঁকি পর্যন্ত ঝুড়ি ক'রে শুকনো পাতা লাক্‌রির কাটা টুকরো কুড়োতে লেগেছে। এসে বললে—কুড়ো না ভোম্‌রা, দু'জনে অনেকগুলি হবে।

ভোম্‌রাও কুড়োতে লাগল। বেঁকি ওর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে বললে—কাল মা তোকে ঠেঙিয়েছে, মন খারাপ করিস নে—লুকিয়ে আমি তোকে গোলাপজাম খেতে দেব—এতগুলো, এক ডালা। মা জানতেও পাবে না।

শিশুর অভিধানে তাকে চুম্বন বলে না। কিন্তু আর কতগুলি বছর পেরিয়ে গেলেই দু'টি নিকটতম বুকের উত্তাপে গানের সুরের মতো তারা ফুটত আকাশে—অগণন, অনির্বচনীয়।

তারপর দু'টি বুক ফের দূরে সরে গেলে চোখের জল চুম্বনের চেয়েও মিঠা লাগত।

লাকড়ির একটা খোঁচা লেগে ভোম্‌রার আঙুল কেটে রক্ত গলতে লাগল। তক্ষুণি বেঁকি কাটা আঙুলটাকে মুখের মধ্যে পুরে ঠোঁট দিয়ে চুষতে লাগল। ফের আঙুল বের ক'রে ফেলে ছুটে দূর থেকে গাঁদার পাতা ছিঁড়ে হাতের তেলোয় চটকে তখখুনি আঙুলটার ওপর চেপে ধরলে। বাঁধবার কোনো ন্যাকড়া না পেয়ে বললে—বুড়ো আঙুলটা দিয়ে টিপে চেপে রাখ। ধর।

বেঁকি মাথায় ক'রে ঝুড়িটা নিয়ে বললে—ঘরে চল।

ভোম্‌রা ফাড়া গাছটার ওপর চুপ ক'রে ব'সে থাকে আঙুলটাকে টিপে ধ'রে। সবাই যে যার ঘরে চলে গেছে। অন্ধকার ঘুটঘুট্টি হয়ে আসছে—লক্ষ্য নেই।

মা ত' নেই-ই গাছটাও নেই।

সাত বছরে যা, সতেরো বছরেও তাই—যেমন কে তেমন; বাড়ে না একটুও। মা'র হাতে পোঁতা উঠোনের পিয়াল গাছটা পর্য্যন্ত কত বড়টি হ'ল! সেই দিনের বেঁটে গাবগাছটা আজ কতখানি ঢ্যাঙা—জোয়ান হয়ে উঠেছে।

ছিদাম বেড়েছে ফন্‌ফনে লাউ ডগাটির মতো। বেঁকি ত' নয়, অগুন্তি ফুলে ফুলন্ত শেকালির একটা ডাল।

গোঁফের রেখা দেখা দিল, বুকের ছাতিটাও ফুলল, উরু 'টোও চওড়া হ'ল—কিন্তু লম্বায় সেই আড়াই হাত-ই। যে কুল ছিদাম হাত তুলেই পাড়ে, সে-কুল পাড়তে ওর আঁকশি লাগে। বেঁকির মুখের দিকে চাইতে হ'লে ঘাড়টা অনেকখানি ঠেলে তুলতে হয়—বেঁকির মুখ যেন আকাশের তারা।

সবাই ক্ষেপায়। কেউ বলে—লাট্টুর আল; কেউ বলে—পাঁঠার শিং; কেউ বা বলে হোঁদল কুৎকুতে! নামটা সংক্ষিপ্ত ক'রে অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলে—ভোম্।

গলার শিরগুলো গোল হয়ে ওঠে। শত্রুকে আক্রমণ করতে হ'লে একেবারে বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়াতে হয়—দূর থেকে ঘুষি নাগাল পায় না। তার আগেই ওরা ওদের লম্বা ঠ্যাং দিয়ে ল্যাং মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দেয়।

কদম-গাছটার তলায় এসে উপুড় হয়ে ডন দেয়, ওঠ-বোস করে। নোয়ানো ডালটায় একটা দড়ি ঝুলিয়ে দু'-ধারে দু'টো হাত এঁটে বেঁধে শূন্যে ঝোলে—হাত দু'টো ছিঁড়ে পড়তে চায়—কিন্তু তবুও একটুও ঢ্যাঙা হয় না—এক ইঞ্চিও না।

ঘাসের ডগাটা পর্য্যন্ত বাড়ে—বেঁকির হাতের আঙুলগুলিও লতিয়ে লতিয়ে কেমন বাড়ল চুল, চোখের পাতার পালকগুলি।

ফুসি-মাসী ভাঙা কুলোটা দিয়ে পিঠে এক বাড়ী মেরে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে —ব'সে ব'সে গিলবে খালি, গাড়োল, পাঁঠার শিং! দেখতে ত' বুড়ো আঙুলটি—খাবার বেলায়—

মা'র ছেঁড়া, জায়গায় জায়গায় গেরো-মারা খেপলা জালটা নিয়ে ভোম্‌রা বেরুল—বোয়াল-পুকুরের ধারে। খেপলাজালে কি বোয়াল মাছ আটকাবে? যদি আটকায়!

গরুর গাড়ী ক'রে মাটি আসছে। বোয়াল-পুকুরের আধখানারো বেশী বোজা। বাকি জলটুকু মুমূর্ষু মা'র অশ্রুর মতোই টলটল করছে।

নব্‌নে বললে—এখানে সব বস্তি হবে। কুলিদের।

ওর কী নিদারুণ উৎসাহ! গাড়ী ত' হাঁকায়-ই, কোদাল দিয়ে দিয়ে মাটিগুলি টেনে ফেলেও।

ও যেন ঠিক মানুষ নয়, দু'পেয়ে একটা বুনো মোষ। শ্রমসহিষ্ণু বলিষ্ঠ দেহটার দুর্নমনীয় দৃঢ়তা!

বাকি জলটুকুতেই ভোম্‌রা জাল ফেললে। একটা মলন্দি মাছ পর্য্যন্ত নয়।

কার্ত্তিক একটা মাটির ঢেলা নিয়ে তেড়ে এল—বেরো আঁটকুড়ির বেটা—পায়ের কড়ে আঙুল, ঠুঁটো কোথাকার! জাল ফেলছেন? বেরো।

তারপর জালটা কাঁধে ফেলে হাঁটে। ঠাঠা-পড়া রোদ—গাছের ছায়াটি পর্য্যন্ত চুরি হয়ে গেছে। কতদূর এগোতেই পথ শেষ হয়ে যায়—সামনে পাঁচিল, তারের বেড়া। সব কোঠাবাড়ী তৈরী হচ্ছে। যেখানে শণের ক্ষেত ছিল, সেখানে একটা সুরকির কল বসেছে। ঘাসের কোমল রাস্তাটি ইটের ভারে হাঁপিয়ে উঠেছে।

পথ বন্দী।—তবু ভোম্‌রা এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল।

ছিদামের মাথায় কাঁচের চুড়ির ঝুড়িটা তুলে দিয়ে বেঁকি ঘাড়টা বাঁকিয়ে একটু হাসল। ছিদাম কাঁচের চুড়ি ফিরি করতে গেল।

গাঁ সহর হয়ে উঠেছে। যেন মাটির দুলালী মেয়েটির সারা গায়ে গিলটির গয়না, মুখে খড়ির গুঁড়ো। আবাদিও ত' ঢের হ'ল। রাস্তায় ছ্যাকড়া গাড়ী চলে, লোহার লোহা পেটে, দোকানিরা নানান জিনিষের সওদা করে। ছড়ি ঘুরিয়ে বাবুরা বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়।

বেঁকিকে দেখে ভোম্‌রার আড়াই হাত শরীরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

বেঁকি বললে—মাছ কিছু পেলি? মাছ না পেলে মা আজ তোর পাতে ভাত দেবে না।

—না দিক।

—কি খাবি তাহলে ?

এ প্রশ্নের যে এমন ধারা উত্তর হবে, বেঁকি তা স্বপ্নেও ভাবেনি।—ভোম্‌রা বেঁকির মাজাটা দুই হাতে একেবারে জাপটে ধরলে।

ভোম্‌রা তার দু'টি চোখ বেঁকির মুখের পানে তুলে ধরল—মিনতিতে ভিজা দু'টি চোখ। দশ বছর আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ে হয়ত, ঝাপসা, ফ্যাকাসে।

নেকড়ের মতো বেঁকি খপ ক'রে ভোম্‌রার ঘাড়ের ওপর এক কামড় বসিয়ে দিলে। ভোম্‌রা একটা চীৎকার ক'রে আলিঙ্গন ছেড়ে দিল।

বেঁকি তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়ে ডান পা-টা তুলে ওকে লাথি মারবার ভঙ্গী দেখাল।

ভোম্‌রা আবার জাল কাঁধে ফেলে পথ চলে। খালি মনে হয়, চীৎকার ক'রে ওঠাটা ভুল হয়ে গেছে। বেঁকির ক'টি দাঁতের স্পর্শের স্বাদের দাম এ নয়। যেখানটায় কামড়ে ছিল সে জায়গায় ধীরে ধীরে আঙুল বুলায়। দাগগুলি একটু ঠাহর হয়।

আবার মনে হয়, ওর পা-তোলাটি ভারী সুন্দর।

গয়লানির মেয়ে জেলেনির ছেলের প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে।

হোকনা গয়লানির মেয়ে—তবু ত' নবযৌবনা। এমন দিনে গয়লানির কালো মেয়েও রাজকুমারী বটে। সেও স্বয়ম্বরা হ'তে জানে। কাউকে আবার ঘৃণাও করে, চায় না।—জগতের সমস্ত নবযৌবনারই মতো।

বললে—মুখে ঝাড়ু, যেটা দিয়ে পাছদুয়ার ঝাঁটাই।

তারপর মুখে কাপড় ঠাসে, আর হাসে।

ভোম্‌রা লুকোনো ভাঁড়টা তুলে মা'র সেই সাড়ে এগারো আনা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজলে। কুসি-মাসী টের পেলনা বটে, কিন্তু এক পাশের পিয়াল গাছটা ভেঙে-চুরে প'ড়ে আছে দেখে কিছু সন্দেহ করলে হয়ত।

গাছের সরু কাহিল ডালগুলি মচকে ভাঙচে ভাঙতে ভোম্‌রা বলছিল—যা যা, সব যা। যে পুঁতেছিল তার চিতার কাঠ হ' গে যা।

দশ বছর আগে হ'তে পারত বটে। দিনের হিসেব ভোম্‌রা ভুলে গেছে। খালি মট মট ক'রে ডালগুলি ভাঙেই।

ভোম্‌রা জানেনা, এমনি দুঃখেই কেউ কেউ বিষ খায়, কেউ কেউ মদ—কেউ কেউ বা কবিতা লেখে।

ভোম্‌রা সাড়ে এগারো আনার কাঁচের চুড়ি কিনলে। ডালায় ক'রে ফিরি করে, যে পথে মাছের ডুলা নিয়ে বাজারে যেত মা'র পিছু।

দশ বছর আগেকার কর্‌করে আনিটার কথা মনে হয়। বৎসরে পুরোনো হ'লেও ওটার দাম লাখ টাকার চেয়েও বেশি ছিল হয়ত। খরচ করেনি।

রাস্তার ধারে একটা লোক উল্কি কাটছিল - অনেকেই হাত মেলে বসেছে। সামনে নমুনার একটা খাতা। ভোম্‌রা একটা মেয়েমানুষের ছবি বার ক'রে দেখালে। কাত্তিক একটা গোলাপফুল।

লোকটা বলেছিল—চার আনা।

ভোম্‌রা লোকটার হাতে সেই বহু-দিন-থেকে পুঁজি ক'রে রাখা আনিটা ফেলেই এমন চোঁচা ছুটেছিল যে লোকটার সামান্যতম প্রতিবাদও শুনতে পায়নি।

দৌড়ে একেবারে হাজির বেঁকির কাছে। বেঁকি তখন মশলা বাটছিল। ভোম্‌রা ওর বাঁ হাতটা মেলে ধ'রে বললে - এই দেখ তোর ছবি, আমার হাতের ওপর।

বেঁকি ঠোঁট কুঁচকে বলেছিল—ও ত' একটা পেত্নি, শাকচুন্নি—পরনে একটা কাপড় পর্যন্ত নেই।

বেঁকির সেই ব্যঙ্গের হাসি! —তার থেকে নোড়াটা ওর মাথায় ছুঁড়ে মারলেই ভালো ছিল।

ভোম্‌রা ধরা গলায় বলেছিল—কিন্তু ঠিক তোর নাকের মতো, তোর নাক ছাবিটা পর্যন্ত আছে।...

আজ সেই একানিটাও থাকলে কিছু তেলে-ভাজা কেনা যেত। ক্ষিদেয় দুটো পা পর্য্যন্ত ভেঙে পড়তে চাইছে। তবুও এ গলি ও গলি চার-পাঁচ বার ক'রে হাঁটে, হাঁকে বিকৃত গলায়, লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে—চাই কাঁ্যাচের চুলি!

হাত দিয়ে রগ্‌ড়ালে ত' আর ছবিটা মুছবে না। তাই কখনো কখনো ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখে।

ও-ও আর সব বিরহীদের মতোই ভাবে, প্রিয়ার মূর্তি ওর হৃদয়ের পাতে আঁকা!

ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটাকে মারে, খামচায়।—সেই শাকচুন্নি ছবিটাকে।

হাঁকে—চেয়াই কাঁ্যাচের চুলি –

ডালাটা ঝুড়ি হয়ে উঠেছে—দূরদূরাজ গাঁয়ের মধ্যে পর্য্যন্ত ভোম্‌রার কাঁচের চুড়ি মেয়েদের হাতে। কচুপাতা, রামধনু, সোনাল লতা চুড়ি। বলে - এটা

তোমাকে মানাবে না, তুমি পর এই পাকা আউষ ধানের চুড়ি, আর ছোট্‌খুকী, তুমি এই কাঁচা-ডালিমটা।

মেয়েটি বলে- তোমার হাতে ন্যাকড়া জড়ানো কেন ? ঘা ?

ঘাড় নামিয়ে ভোম্‌রা বলে—হ্যাঁ—

কলঙ্কের ঘা, যৌবনের সব চেয়ে প্রথম ভুলের দাগ। বোঝে কিন্তু বলতে পারে না। আর কাকেই বা বলবে ?

দর্জিরা কল চালায়, ঘণ্টা বাজিয়ে ছোকরা-বাবুরা পা-গাড়ী চড়ে, ভিস্তিওলা রাস্তায় জল ছিটোয়। মাছের বাজার শান-বাঁধান হয়ে গেছে। নামহীন অলি-গলির মোড়ে মোড়ে বাতির থাম—কাঠের। শুক্লপক্ষে জ্বালানো হয়না। তাই জ্যোৎস্না রাতগুলিই খালি চেনা লাগে - তাও ভারি বিমর্ষ।

ফের রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে। নল বসবে।

নব্‌নে গাঁইতিটা ফেলে রেখে ভাঁড়ে ক'রে কি কতগুলো ঢক ঢক ক'রে গেলে। বলে—হ্যাঁ বাবা, সর্ব শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে, চনচনে। এখন খাট, খেটে সুখ। জুম্। ব'লে হাঁটুর ওপরের কানীটা আরো একটু তোলে।

গরুর গাড়ীর সঙ্গে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ীর টক্কর লাগে। সেদিন ত' বুড়ি চাঁড়ালনী একেবারে চাকার তলায়ই প'ড়ে গেছল। গাড়োয়ান খাপ্পা হয়ে বললে—মাগী রাস্তার মাঝখানে বড়ি শুকোচ্ছে—

বুড়ি থেৎলানো পা-টা চেপে ধ'রে বলছিল—চিরকেল এখানেই বড়ি শুকোলাম, তুই—

বুড়ি গালমন্দ করে। সবাই বুড়িকেই মারতে আসে। বুড়িরই দোষ।

বড়লোকের মেয়ের কাঁচের চুঁড়ি পরবার সাধ গেছে। ফিরিওলাকে ডাকে—হেসেই কুটপাট।

মেয়েটি কেন হাসে, সে বিষয়ে ভোম্‌রা মনে মনে কোন প্রশ্নই করে না। ভাবে, মেয়েটির হাসি ভারি সুন্দর। যেন অঞ্জলিতে ক'রে ভ'রে নেওয়া যায়, তরল স্বচ্ছ জলের মতো।

মেয়েটি বললে—এই লাল চুড়ি জোড়ার দাম কত ?

ভোম্‌রা বললে—দশ পয়সা।

পেছন থেকে কে ব'লে উঠল—আমি ঠিক ঐ চুড়ি ছ' পয়সাতে দেব। দেখবে ?

ভোম্‌রা অবাক হয়ে চেয়ে দেখে—ছিদাম।

ছিদাম সত্যি সত্যি ছ' পয়সাতে ছাড়লে। মেয়েটির দু'টি হাতে পরিয়েও দিলে।

রাস্তায় এসে ভোম্‌রা বললে—শুধু শুধু চারটে পয়সা গরচা দিলি যে?

মুচকে হেসে ছিদাম বললে—নইলে ঐ দু'খানি নরম হাত—যেন দুধে ধোয়া। কত চায় পয়সাই ত'—হেঁ!

ভোম্‌রা নিজেকে বোকা অজবুগ বলে বকে। ইচ্ছে করে মেয়েটিকে অমনিই চুড়ি জোড়া দিয়ে আসে, মাগনা। একদিন সমস্ত ঝুড়িটাই মেয়েটির বাড়ীর বারান্দায় রেখে এল।

বেঁকির সাথে ছিদামের বিয়ে হবে।

সমস্ত সংসারে একটি লোককেই ও চায় বেঁকি ভাবে। ভোম্‌রা ভাবে—সমস্ত সংসারে একটি লোককেই ও চায়না।

তবুও, যেমন ক'রে বিয়ের রাতে জগতের সমস্ত তরুণ তরুণীর বুক দোলে, তেমনি ওদেরো বুকে দুলছিল। এক তিল কম নয়। তেমনিই স্বপ্ন দেখছিল ওরা—

নবনে বললে—আরো চিড়ে এনে দেব নাকি রে ভোম্‌রা! খা না, যত পারিস।

ভোম্‌রা গ্যাঁট হয়ে ব'সে বোকার মতো বলে—আন না। খাবই ত'।

দাঁতগুলি বের ক'রে রাক্ষসের মতো গেলে, চিবোয় পর্য্যন্ত না। শুকনো চিড়েগুলো ভেতরের দিকে অনবরত ঠেলে ঠেলে যেন উদ্গত বেদনার মুখ থেঁৎলে দেয়। দু'পাটি দাঁত খুলে বলে—আন। আরো খাব।

পরে ওরা যখন শুতে গেল, ও নির্জন রাতে আস্তে আস্তে ল্যাম্প পোস্টটা বেয়ে বেয়ে উঠে লণ্ঠনটা নামিয়ে আনলে। কতগুলি শুকনো খড়কুটো জ্বালাল। তারপর নিজের বাঁ হাতটা সেই আগুনের মধ্যে মেলে ধরল।

সেই ছবিটা পুড়ুক—সেই শাকচুন্নি ছবিটা। সেখানে সত্যিসত্যিই একটা ঘা হোক।

আরো বছর যায়—লম্বা লম্বা বছর।—

তবু সেই আড়াই হাতই—

রাস্তায় লোক গিসগিস করে, নোংরা বস্তিতে মারী লাগে—ছারখার হয়ে যায়; আবার বস্তি বসে। ভিস্তিওয়ালার বদলে জল-ফেলা গাড়ী হয়েছে, তাও গ্রীষ্মকালে। বর্ষাকালের শুক্লপক্ষের রাতগুলিতে কেরোসিনের বাতি জ্বলে আজকাল। একটি ছোট পোস্টাপিস, সাহেবদের একটা বাংলো, এক বিদেশী ব্যবসাদারের একটা চা'লের কারখানা—সারাদিন কলের হুসহুস।

কাক ডাকবার আগেই কলের কাৎরানিতে সারা সহরের ঘুম ভাঙে।

রাস্তার মোড়ে ভোম্‌রা দোকান ফেঁদে বসেছে—মনিহারী। সবাই বলে 'গুর-গণের ডুকান'। সবাই বলে, রাস্তায় শব্দর করতে করতে হঠাৎ ও ফিরির ঝুড়িটা নিয়ে থেমে পড়ল। ঝুড়ি ত' নয় লোহার সিন্দুক—তাই মাথায় ক'রে আর বওয়া যায়না।

সেই মাটির তলে পোঁতা সাড়ে এগারো আনা পয়সা পর্য্যন্ত সাড়ে এগারোশ' টাকায় বাড়ল—

মাইনে দিয়ে দু'টো ছোকরা চাকর পর্যন্ত রেখেছে, মাল এগিয়ে দিতে। বেঁটে মোটা ছেলেটাকে যখন খুসী মারে, ঢ্যাঙা ছিপছিপে ছোঁড়াটাকে কারণে অকারণে পয়সা দেয়, আদর করে। আর নিজের এই অন্যায় তরফ্‌দারিতে হাসে, মনে মনে বলে—একশো বার মারব, আমার ইচ্ছে।

কীই বা না বিক্রি হয়? ফিতিং বোতল থেকে সুরু ক'রে শিশি ক'রে আমের চাটনি পর্য্যন্ত। পাথরের থালায় ক'রে কেউ আর আমসত্ব দেয় না, দোকান থেকে কেনে। সাবান, বিস্কুটের টিন, চায়ের কৌটো, কনডেন্সড মিল্ক, ভিনিগার—সে দিন ছিদাম একটা দামী পমেটম পর্য্যন্ত কিনে নিয়ে গেল—বেঁকিরই জন্য নিশ্চয়।

ভোম্‌রা বললে—পয়সা-টয়সা কামাতে পাচ্ছিস না নাকি আজকাল? আমার দোকানে থাক না। রঙাকে না হয় উঠিয়ে দেব।

সেই ঢ্যাঙা ছোঁড়াটা—রঙ্গা চমকে ওঠে ছাড়িয়ে দিতে হ'লে তাকেই ছাড়িয়ে দেবে—এর তাৎপর্য্য ও বুঝে উঠতে পারে না। কালও ত' মুনিব ওকে হিসেবের ফালতু পাঁচ আনা পয়সা লুকিয়ে দিয়ে দিল।

ছিদাম অপমান বোধ করে হয়ত; রাজী হয় না। ধার কর্জ ক'রেই বেঁকির বিলাস জোগায়। বেঁকি বলে—একটা আলতার শিশি আনতে পারিস না কিনে, না গালে মাখবার একটা রং-এর বাক্স। বিয়ে করেছিলি কেন তবে মুখপোড়া?

রোজি মেলেনা সব দিন। তাই যার তার কাছে হাত পাততে হয়। ছিদাম সাহেবদের বাংলোতে পাখা টানে। অবশ হাতে পাখা টানতে টানতে এক মিনিটের জন্যও ঝিমোলে পিঠে খেতে হয় সেদিন, পেটে নয়।

বেহারি সওদাগরের কারখানায় কার্ত্তিক মিস্ত্রির কাজ করে—ট্যাঁকটা ওর ভরা। পায়ে ফুল-মোজা এঁটে চটি প'রে ফট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়ায়, ক্ষুর দিয়ে মাথার পেছনটা প্রায় চাঁছা, মাজায় রুমালের ফেট বাঁধা একটা। একটা ডুগি-তবলা নিয়ে সারা রাত তাল ঠোকে আর যা-তা গান গায়। তাই শুনে বেঁকি খিল্ খিল্

ক'রে হাসে, আর লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে, বলে কার্ত্তিকটা কী ছেনাল্! ম্নবড়া আমার!

কার্ত্তিক বলে—এই বেশ, গান গা, আর তুড়ি দে।

তারপর এই লাইনটাই খালি নানা সুরে তবলায় গুপো মেরে মেরে গাইতে থাকে—

বিজ্‌হু ধোপার ডবকা মেয়েটার দিকে প্যাট্‌প্যাট্‌ ক'রে তাকায়। বলে—বিয়ে করবি আমাকে?

মেয়েটা হেসে বলে—আমি কি তবলা নাকি রে, ছেনাল?

নব্‌নে দোকানের বেঞ্চিটার ওপর এসে বস্‌লে। ওর চোখে একটা চশমা, নিকেল্‌-এর—একটা ধার ভেঙে যাওয়াতে লাল সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা।

চশমা পরেছে—এ যেন ওর প্রকাণ্ড একটা গর্ব—এমনি ক'রে ঘোলাটে কাঁচ দু'টোর ভেতর থেকে চায়।

চশমাটা কপালে তুলে ময়লা কাপড়ের খুঁটে চোখ দু'টো রগ্‌ড়ে ফের চশমাটা নামিয়ে বললে—কি কলই বানিয়েছে বাবা, যেই চোখে লাগানো, অমনি সব দিক ঝিল্‌মিল্‌ ক'রে ওঠে।

রঙ্গা জিগ্‌গেস করলে—কিসে চোখ দু'টো গেল?

—কিসে আবার? অমনিই। একদিন কতগুলি সুরকি গেছল বটে ঢুকে। তাতে কি?

চশমাটা ওর মস্ত বাবুগিরি। বারে বারেই খালি কাঁচ দু'টো মোছে, লাল সুতোটা নানা ভাবে কানের সঙ্গে জড়ায়।

ওর গলাটা ভারি সরু দেখাচ্ছে—জামাটা খুল্‌লে পাঁজরও গোণা যায় হয়ত। বুনো মোষ নয়, খেতে-না-পাওয়া পিটি-খাওয়া কাঙাল বেতো ঘোড়া।

বললে—জানিস ভোম্‌রা, এবারে এখানে রেল বসবে। আবার াইতি নিয়ে বেরুব।

এক গাহেককে একটা লণ্ঠন ফিট ক'রে দিতে দিতে ভোম্‌রা বললে—তোর এই ভাঙ্গা দেহে কুলুবে?

চশমাটা নাকের ওপর ঠিক ক'রে বসিয়ে নব্‌নে বললে—কি যে বলিস। গাঁইতিটা হাতে নিলেই আমার ড্যানা দু'টো ফের ফুলে উঠবে। কাশিটাও আর থাকবে না। এতদিন রাস্তা-টাস্তা খুঁড়তে পাইনি ব'লেই ত' এমন ছিরি হয়েছে চেহারাটার।

পরে বললে—রেল-রাস্তা করবার মজুরি নিশ্চয়ই বেশি হবে। ট্যাঁক আবার ভ'রে উঠলেই একটা ভালো দেখে চশমা কিনব।

বলে, আর অন্যমনস্কের মতো শূন্য ট্যাঁকটার ওপর হাত বুলায়।

একসময় বললে হঠাৎ—জানিস কাল রাতে বৌকিতে আর ছিদামেতে ভীষণ মারপিট হয়ে গেছে। বৌকি মেরেছে ছুঁড়ে পিতলের থালাটা ছিদামের মাথায়, খুনখুন হয়েছিল আর কি! মেয়ে ত' নয় রাক্ষুসী।

প্রায় তক্ষুনিই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছিদাম এসে হাজির, মাথায় রক্তে-ভিজা ন্যাকড়ার একটা ফেটি বাঁধা।

হাত পেতে বললে—আমাকে একটা আলতার শিশি দিবি ভোম্‌রা?

ভোম্‌রা কোনো কিছুই লক্ষ্য না ক'রে বললে—দাম সাড়ে ন' আনা।

—বাকী দে এবারটি ভোম্‌রা—

ভোম্‌রা একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়ল যেন—যা যা বেরো আমার দোকানের সমুখ থেকে। বাকী নিতে এসেছেন? আলতার শিশি বেটপ্‌কা আকাশ থেকে পড়েছে যেন!

ছিদাম ম্লান মুখে বেরিয়ে যায়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

হঠাৎ ভোম্‌রা চেঁচিয়ে উঠল—শোন শোন ছিদাম, নিয়ে যা আলতার শিশি।

আলতার শিশিটা ছিদামের হাতে দিয়ে পরে খুব আস্তে বললে—বৌক নিজে এলেই ত' পারত চাইতে!

ছিদাম মিনতি ক'রে বললে—আর চারটে চুলের কাঁটা দিবি, রেশমী ফিতেও—এই একহাত হ'লেই হবে। রেল-রাস্তার মজুরি ক'রে সব তোর শুধে দেব ভোম্‌রা।

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক। এই নে। আর এই একটা ঠোঁটে মাখবার নতুন রং বেরিয়েছে, এটাও নিয়ে যা।

ছিদাম কাঁচুমাচু হয়ে বললে—দাম কত এর?

—যা যা, দাম জিগ্‌গেস করতে হবে না। আর এই নে, নতুন ঢঙের শাঁখা বেরিয়েছে, ওর খুব পছন্দ হবে।

দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত কীই বা না দিল? এসেন্সের শিশি, দার্জিলিঙের পাথরের মালা পর্যন্ত।

বলে—আর কি নিবি বল?

ছিদামের কোঁচড় ভ'রে উঠল।

নব্‌নে বললে—দোকান উঠিয়ে দিচ্ছিস নাকি রে?

—উঠলেই হ'ল আর কি? মাগনা উঠবে? এই লোহার কড়াটাও নিয়ে যা, বেঁকি তোকে মাছ ভেজে খাওয়াবে। আর এই বালতিটা।

ভোম্‌রা যেন পাগল হয়ে গেছে। একদিনেই দেউলে হয়ে যাবে।

ছিদাম চ'লে গেলে নব্‌নে ফিস ফিস ক'রে বললে—বেঁকির সঙ্গে ওর ভালো বনিবনাও হচ্ছে না। দিনে-রাত্রে সাপে-নেউলে লেগেই আছে। জানিস, বেঁকির চোখ কাত্তিক-মিস্ত্রির ওপর—

ভোম্‌রা কিছুই বলে না, এলোমেলো দোকানপাটের দিকে চেয়ে থাকে। একটা তাক প্রায় খালি হয়ে গেছে।

অনেকেই ভুল করে—বেঁকিও করেছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল, ছিদামকে ও চায়না—ছিদাম ফুরিয়ে গেছে।

কাকে চায় বুঝে উঠতে পারেনা। ভাবে, কাত্তিককেই বুঝি।

কাত্তিক তবলায় চাঁটি মেরে মেরে টপ্‌পা গায়, আর বেঁকি জামার তলা থেকে রুমাল বের ক'রে নেড়ে নেড়ে হাসে। বলে—কেয়াবাৎ কালোয়াৎ।

ছিদাম বাইরের থেকে ডাকে—ঘরে আয় বেঁকি।

বেঁকি চেঁচিয়ে বলে—যাবনা। এই আমার ঘর।

কাত্তিক বলে—এবারে গান বন্ধ। যা। খুনখারাপি হবে একটা। এক রকম জোর ক'রেই ঘর থেকে তাড়ায়। পরে ফের তবলা চলতে থাকে—অনেক রাত।

পাশের ঘর থেকে বিজয়ের মেয়ে বলে—ঘুমুবিনা? সারা রাতই—

কাত্তিক জবাব দেয়—সারা রাতই। তোকেও ঘুমুতে দেব না।

নতুন রেল বসছে। নব্‌নে খক্ খক্ ক'রে কাশে, তবু গাঁইতি চালায়। হঠাৎ সুতোর বাঁধ ছিঁড়ে চশমাটা ইটের গাদার ওপর প'ড়ে চুরমার হয়ে গেল।

নব্‌নে ফিরে এল। গাঁইতিটাও আর নিয়ে এলনা।

বললে—চোখে দেখতে না পেলে শেষে গাঁইতিটা পায়ের ওপরই চালিয়ে দিই আর কি!

সমস্ত পাঁজরগুলি মোচড় দিয়ে কাশ ওঠে—রক্ত। দু' হাতে বুকটা চেপে ধ'রে রাস্তার ওপর ব'সে পড়ে। ভোম্‌রা তাল-পাতার একটা পাখা দিয়ে হাওয়া করে, চোখে মুখে জল ছিটোয়।

রেল ব'সে গেল—টিনের ঘরে চাটাই-বেড়ার একটা ইষ্টিশান ঘর পর্য্যন্ত।

যাত্রীরা গাড়ী থেকে নেমে পান কিনে খেতে খেতে এঞ্জিন ড্রাইভারকে ন্যায় ধ'রে ডেকে বলে—পান-টান খেয়ে নি বাবা, তারপর চালাস্।

কেউ কেউ বলে—সেই সন্ধ্যে থেকে বদ্ধ গাড়ীতে ব'সে আসি। একটু হেঁটে নি বাবা মাঠের ধারে। তারপর গাড়ী ছাড়িস রে হেবো।

তারপরই গাড়ী ছাড়ে।—

মর্জি মতো নাবে, আবার দৌড়ে গিয়ে ধরে। গাড়ী ত' নয়, একটা লোহার বিছে—বেঢপ, বিচ্ছিরি।

নতুন নতুন লোকের আমদানী হয়—কাবলীওলা যাত্রাপার্টি, বহুরূপী। একবার গাড়ী ভ'রে নানা বয়সী কতগুলি মেয়েমানুষ এল—এক দঙ্গল। মজুমদার পাড়ার মাঠের নতুন বস্তিটাতে এসে উঠল। সাপের বাচ্চার মতোই কিল্‌বিল্ করছে।

ভোম্‌রার দোকানে মালপত্র আজকাল একেবারে ভেলুরহাট ইষ্টিশানেই আসে। সাতক্রোশ দূরে বড় ইষ্টিশান থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে আর আনতে হয় না। রঙ্গা বলে ভালোই হয়েছে।

বুড়ীরা আগে আগে রেল দেখে পেন্নাম করত, বলত—জগন্নাথের রথ।

ইদানী বলে—কী সারা দিন রাত ঘ্যানর ঘ্যানর, সোয়াস্তি নেই। দে না আগুন লাগিয়ে কেউ।

সেদিনের সন্ধ্যের গাড়ীটা ভেলুরহাট ছাড়িয়ে কদ্দূর এগোতেই হঠাৎ থেমে পড়ল।

যাত্রীরা সব নেমে জিগ্‌গেস করে—কি হ'ল রে হেবো?

হেবো বললে—কি একটা আচমকা হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল্ চাকায় তলায়।

গাড়ীটা 'ব্যাক' করে। উৎসুক জনতা চেয়ে দেখে, একটা মানুষ কাটা পড়েছে। কেউ কেউ চিনতে পারে হয়ত—আরে এ ছিদাম যে—

তারপর থানা থেকে পুলিশ এল লাঠি নিয়ে। ঠেঙিয়ে ভিড় তাড়াল ট্রেণটা 'পাস' করিয়ে দিলে।

বৌকি অবশ্যি শোকের কার্পণ্য করলে না। কাঁচের চুড়িগুলি ভেঙে থান কাপড়ো পরলে।

তবুও উদাসীর মতো মাঝরাতে কার্ত্তিকের ঘরের পাশে ঘুরে বেড়ায়। পাশাপাশি ঘরে কার্ত্তিকের আর বিজন্থর মেয়েটার কথাবার্তা চুপ ক'রে শোনে।

বিল্লুর মেয়ে আর কার্ত্তিক মিস্ত্রি এক সঙ্গে সমস্ত জীবন থাকবে—তাই আবার রোয়ালপুকুরের বস্তিতে ঢাক ঢোল বেজে উঠেছে। মশাল জ্বলেছে—ঘেয়ো কুকুরেরা লড়াই লাগিয়েছে পর্য্যন্ত।

সমস্ত ভেলুরহাট সরগরম। সবাই বলে—কার্ত্তিক মিস্ত্রি খরচ করছে বটে, পয়সা ত' নয় খোলামকুচি।

মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে, গায়ে জোব্বা—কাঁধ দিয়ে একট তলোয়ার পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে।

নব্‌নে বললে—খেয়ে নি পেট পুরে, আর কতদিনই বা বাঁচব? কাশে, আর কাশ থামলে লুচিগুলি মুখে গোঁজে আর গেলে।

বৃষ্টির জলে নালাগুলো থই থই ক'রে উঠছে—দু' একটা শাপলা এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন। নালার জলে পা ডুবিয়ে বেঁকি বসে—চুপচাপ—যেন্ কান্না ফুরিয়ে-ফেলা শফেদ্ একটা মেঘ।

আবার ঠুটোটা পেছনে। বেঁকির সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

জলের থেকে পা না তুলেই বললে—লুচি খেতে গেলি না? সেবার ত' খালি চিঁড়ে গিলেছিলি।

ভোম্‌রা কিছুই বলতে পারে না, খালি অনিমেষ চোখে চেয়ে থাকে। অনেক বাদে বোকার মতো খালি বলতে পারল—আমার দোকানে চল।

—কেন? বেঁকি ভুরু কুঁচকে ঝাঁঝালো গলায় আঁৎকে উঠল যেন।

চোখের জলের মতো ঘোলা চাঁদের আলো ভোম্‌রার হৃদয় পর্য্যন্ত যেন এসে পৌঁছুল। বললে—সেই দোকানই ত' আমার ঘর—

ব্যাকুলতা জানাবার ভাষা খুঁজে পায়না হয়ত, হাত দু'খানি ধরতেও অনির্ব্বচনীয় কুণ্ঠা লাগে।

বেঁকি ফট ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভোম্‌রা হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল হঠাৎ। তা দেখে বেঁকির মুখে কাপড় ঠেসে কী হাসি! তখন ভোম্‌রাকে বোধ হয় ঘাসের ডগার চেয়েও বড় দেখায়নি।

—তোর পায়ে আমি সমস্ত দোকান উজার ক'রে ঢেলে দেব বেঁকি, তুই আয়। নতুন নতুন ক্রিম এসেছে গালে মাখবার, নতুন নতুন গয়না—, তোকে টাকা বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুম পাড়াব।

নদীর ঢেউর মতো বেঁকি ভেসে উধাও হ'য়ে চ'লে যায়। তবুও তেমনি উবু হয়ে ভোম্‌রা ব'লে চলে—সে অনেক টাকা, তুই তা ভাবতেও পারিস না। কি করব আমি এ সব দিয়ে? সব তোর—তোর—

তারপর দূর থেকে একটা ঢিল ধুপ ক'রে প্রায় ভোম্‌রার মাথায় এসে পড়ে।

ভোম্‌রা দোকানে চ'লে গেল। সারারাত জেগে দোকানটা ভালো ক'রে নতুন রকম গুছোল, ঝাঁটা দিয়ে ধুলো ঝাড়লে, তারপর হিসাব মিলাতে বসল। বলতে লাগল—দেব ছোঁড়াছু'টোকে উঠিয়ে, অকম্মার ঢেঁকি—নিজেই পারব একা—আমারই তো সব—

তারপর নগদা টাকার থলিটায় হাত ঢুকিয়ে রেস্তগুলি নেড়ে চেড়ে বাজনাই বাজায় হয়ত।

আরো বছর ঘোরে—

সম্প্রতি এদিকে এক নতুন রকম ব্যায়রাম দেখা দিয়েছে—গায়ে সব ফুস্কুরি ওঠে।

মব্‌নে এসে তার নাপতের বাক্সটা ভোম্‌রার দোকানেই জিম্মা রাখলে। বললে—আমি এবার সত্যিসত্যিই চললাম ভোম্‌রা। যদি কোনো বেকার লোক দেখিস, তা'লে এ বাক্সটা দিয়ে দিস তাকে—

মব্‌নে শেষ পর্য্যন্ত মরল কাশিতে নয়—এই নতুন ব্যায়রামে।

সবাই এ-ওর মুখ চাওয়াচায়ি করে।

ভোম্‌রার দোকান আরো ফেঁপেছে। বছরো বেড়েছে বটে কিন্তু বয়স বাড়েনি যেন।

সেই বেঁটে চ্যাপটা-মুখ ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রঙ্গারো ব্যামো হওয়াতে ছুটি নিয়েছে—চিরকালের ছুটি। ভোম্‌রা এখন একেবারে একা। জিনিসপত্র নাড়ে চাড়ে আর খালি যেন হাঁপায়, ভাবে—কী হবে এ সবে? ছাই—

ঘর ছেড়ে বেরোয়। রাত ক'রেই—ঠাণ্ডায়। পাঁচহাত কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নেয়। কেউ বলে—এই শীতে তোর গায়ে কি একটা কম্বলো উঠবে না? কিপ্‌টে কোথাকার!

ভোম্‌রা হেসে বলে শুধু—তোর যদি দরকার হয় আসিস্ দোকানে—অমনি দেব; মাগ্‌না। যার যা দরকার।

আসতে আসতে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েগুলির নোংরা বস্তির কাছেই এল—যেন পথ ভুলে।

তখনো কতগুলি মেয়ে শীতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বেঁকির গায়েও একটা কম্বল নেই।

ওকে দেখে সবগুলি মেয়ে কিলবিল ক'রে হাসে, এ ওর গায়ে চ'লে পড়ে—নানান কথা ক'য়ে ক্ষেপায়। বেঁকিও হাসে—তেমনি, মুখের মধ্যে কাপড় ঠেসে।

যেন অনেকদিন ওরা মন প্রাণ খুলে হাসতে পায়নি—

ভোম্‌রা কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না ক'রে অস্থিরের মতো এ মোড় থেকে ও মোড় ঘুরে বেড়ায়—একটিও কথা মুখে আসে না। সব যেন বুকে আথালি পাথালি করে।

বেঁকি একেবারে একটা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে এল এবার—বেরো ছুঁচো কোথাকার—আবার তক্ষুণিই মুখে কাপড় ঠেসে হাসে।

প্রিয়ার দ্বার আজো ওর জন্যে রুদ্ধ—

চ'লে যেতে যেতে দু'খানা নোট বেঁকির দরজার গোড়ায় ফেলে দিল—বেটপ্‌কা।—ও যেন একটা কম্বল কিনে গায়ে দেয়। নইলে যে অসুখ করবে ওর—

তারপর দোকানেই ফিরে আসে।

সমস্ত জানলা কবাটগুলো এঁটে বন্ধ করলে। কেরোসিনের ভরতি টিনগুলো একসঙ্গে জড় করলে। তারপর ভালো ক'রে সমস্ত সাজানো জিনিসগুলির দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

নব্‌নের সেই নাপ্‌তের বাক্সটা পর্য্যন্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস শুধু—

তারপর কি?

তারপর শুধু দেশলাইর একটা কাঠি—

সন্ধ্যারাগ

বেশ বুঝতে পারছি শরৎ এসে পড়েছে। কিন্তু কি আস্তে আস্তেই যে এল! তার পদধ্বনি শুনতে পাই নি। আজ ভোরে হঠাৎ আকাশের নীল নিষ্কলঙ্ক নির্মেঘ প্রশান্তি দেখে মন ভারি মুগ্ধ হয়ে গেল। আকাশকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও উদার মনে হচ্ছে। এখনো চিমনির ধোঁয়ার কলঙ্কের ছোঁয়াচ পড়ে নি। দূরে শেফালিগুচ্ছের মতো একখণ্ড শাদা মেঘ প্রভাতের নির্মল রৌদ্রে স্নান করছে, যেন শাদা পালক-ওয়ালা একটা বক তার দু'টি পাখা বিস্তার ক'রে শুয়ে আছে। ঐ মেঘটা যেন মা'র রাশীকৃত সুকোমল পবিত্র ভালোবাসার মতো!

কিন্তু আমার জীবনে এই শরতের নির্মুক্ততা ও জ্যোতির্ম্ময়তার স্থান কই। সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার মতো কালো নিবিড় মন্থর মেঘস্তূপ। মমতার দু'টি স্তব্ধ বিশাল চোখে দূরকালের মেঘাক্রান্ত আষাঢ় যেন মূর্চ্ছিত হয়ে আছে।

ভাবছি, জীবনে মোটে পঁচিশটি শরৎ এসেছিল, এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। কত ক্ষণখণ্ড ধূলায় লাঞ্ছিত হয়ে মিশে গেছে, গলায় মালা ক'রে পরি নি। আজ আর

জন্যে এত অনুতাপ হচ্ছে! এই পঁচিশ বছরের জীবনে শতদলের পাপড়ির মতো একটির পর একটি ক'রে কতদিন এসেছিল—কোনোটি সূর্যোদয়ে পলাশের মতো রাঙা, গোধূলিতে বিরহবেদনার মতো মধুর, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে প্রিয়ার ব্যথিত দৃষ্টির মতো শীতল, নক্ষত্রদীপ্ত রহস্যগভীর অন্ধকারে দুঃখের মতো প্রশান্ত, কোনোটি বা পূর্ণিমার প্রচুর জ্যোৎস্নায় যূথিকার মতো প্রফুল্ল, কোনোটি মধ্যাহ্নের দগ্ধ নির্মম রৌদ্রে বৈরাগ্যসুন্দর সন্ন্যাসীর মতো উদাসীন! কত দিন হারিয়ে গেছে! দিগ্বধূর ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে অপরূপ প্রভাত ও সন্ধ্যাগুলি আমার জীবনে খ'সে খ'সে পড়েছে, একটিও কুড়িয়ে রাখিনি, রাখিনি!

মনে পড়ল, একজামিনের পড়া 'বার্ক' পড়তে পড়তে হঠাৎ আনমনা হয়ে পেছন চেয়ে দেখেছিলাম চাঁদের আলো একটি গরীব ঘরের ম্লানবস্ত্রা মেয়ের মতো আমার ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। মনটা ভারি ভিজে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি 'বার্ক'টা ছুঁড়ে ফেলে বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছিলাম। কে বলে সে গরীব ঘরের মেয়ে? জ্যোৎস্না পূর্ণ-যৌবনা ললিততনু সাকীর মতো শুভ্র ফেনোদ্বেল আনন্দের মদিরাপাত্র নিয়ে বিহ্বল আবেগে আমাকে বেষ্টন ক'রে ধরেছিল। সেই রাত্রে খোলা বারান্দায় অনেকক্ষণ নিঝুম হ'য়ে বেতের ভাঙা সোফাটায় শুয়েছিলাম। আর পড়া করি নি। নিজেকে এত সুন্দর এত মিষ্টি লাগছিল! সমস্ত আকাশের সঙ্গে একটি বন্ধুত্ব বোধ করেছিলাম যেন! ভাগ্যিস সে দিন 'বার্ক' ছুঁড়ে ফেলে দিয়াছিলাম। নইলে সেই দ্বারান্তবর্তিনী ম্লানমুখী জ্যোৎস্নার আনন্দ-প্রাচুর্যে স্নান ক'রে নিজেকে এত সার্থক ও সুন্দর ব'লে ভাবতে পারতাম না।

মনে পড়ল, পুরীর পুলিনে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ প্রশান্ত জলরাশির ওপর একদিন সূর্য্যাস্ত দেখেছিলাম। ভাগ্যিস দেখেছিলাম! তাই ত' সেই অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক মহত্ত্বভরা উদার সূর্য্যাস্তসময়ে নিজের মধ্যে একটি বিশালতা ও বন্ধনহীনতা অনুভব করতে পেরেছিলাম। ভাগ্যিস একদিন কোন এক নামহীন নিষ্পাদপ তৃণহীন শূন্য কঠিন গৈরিক ভূমিতে শ্রান্ত হয়ে শুয়ে নিজেকে একান্ত রিক্ত ও দরিদ্র ব'লে ভেবেছিলাম, সেই সুমধুর ব্যথিত মুহূর্ত্তটিকে ব্যর্থ হ'তে দিই নি! মনে পড়ে, এক বিয়ে বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়ে একটি চঞ্চলা সদাহাস্যময়ী কিশোরীর সঙ্গে ভাব ক'রে রাত্রে তারার পানে চেয়ে চেয়ে তার নাম রেখেছিলাম সন্ধ্যাতারা; মনে পড়ে, এক বছর বাদে তার বিয়ে হ'য়ে গেলে অকারণে চোখে জল এসেছিল, সে রাত ঘুমুতে পারি নি। সে রাত ব্যর্থতাবোধের কি অপার সুখেই যে কেটেছে!

ক'টি দিনই বা মনে করতে পারি? কত দিন বঞ্চিত উপেক্ষিত হ'য়ে অভিমান ক'রে চ'লে গেল। আকাশে নিদ্রাহারা কত তারা কত জ্যোৎস্না আমাকে

ডেকেছিল, আমি দরজা ও বাতায়ন বন্ধ ক'রে লজিকের সিলজিজম্ মুখস্থ করেছি, পরে আপিসের হিসাবের অঙ্ক মিলিয়েছি। দ্বারের পাশ দিয়ে কত মুশাফের ঝড় হেঁকে গেল, আমি নিশ্চিন্ত আলস্যে মগ্ন হয়ে দাবা খেলেছি বা পান চিবিয়েছি। কত রাত্রি শুভ্রব্রতা তপস্বিনীর মতো বৈরাগ্য ও বিরতির অর্ঘ্য বহন ক'রে আমার দুয়ারে নেমে এল, আমি বারোটা পর্য্যন্ত রাত জেগে গয়লানী আর মুদীর দোকানের হিসাব কষলাম, আর বেশী খরচ হচ্ছে ব'লে মমতার সঙ্গে অযথা ঝগড়া করলাম। এই ত' পঁচিশ বছরের কেরাণী জীবন।

তাই বুঝি অসময়ের যাবার লগ্ন এসে পৌঁছুল ব'লেই আজকের শরৎকে তৃষ্ণার্ত চকোরের মতো আকণ্ঠ পান করতে চাই। নইলে আজো হয়ত হিসাব মিলাতাম! ঝগড়া করতাম! পৃথিবীকে আজ কী সুন্দর মনে হচ্ছে! সকাল হ'তেই রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানে ভিড় লেগে গেছে। কত লোক যে জড়ো হচ্ছে। কত রকম আনন্দগুঞ্জন যে করছে তারা। সমস্ত সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপারটি আমার কাছে এত বিচিত্র মনে হচ্ছে যে কি বলব! ভোর না হ'তেই রাস্তায় জল দিয়ে গেছে। কালো পিচে মোড়া ভিজে রাস্তার ওপর দিয়ে মোটরগুলি ছুটছে—কি সুন্দর গর্বিত ছোটা! টেলিফোনের তারে ব'সে ছু'টি চড়ুই পাখী খানিক পরেই ফর্‌ফর্‌ ক'রে উড়ে চ'লে গেল—কি মধুর ওদের পাখার শব্দ—কি করুণ!

যাব, এ কথা একান্ত সত্য হ'লেও—আজকের নির্মল বিমুগ্ধ দিনটি প্রাণ দিয়েই উপভোগ ক রে যাব। নোটবুকটায় লিখে রাখছি—আজ এগারোই ভাদ্র, মঙ্গলবার, আটটা বেজে তেরো মিনিট হয়েছে। সকাল থেকে বারান্দায় এই কাঠের ইজি-চেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে শরতের জ্যোতির্ময় নীল আকাশ দেখছি। ভারি ভালো লাগছে। এক ফালি রৌদ্র আমার কোলের ওপর এসে পড়েছে। শরতের রৌদ্র-বিধৌত আকাশকে মনে হচ্ছে যেন কোন সদ্যস্নাতা তন্বুগাত্রী কিশোরীর চঞ্চল হাস্য—যেন আমার কোন একটি কল্যাণী বোন খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছে; এই রৌদ্র যেন তারই হাসির টুকরো। আবার মনে হচ্ছে এই প্রসারিত প্রশান্ত আকাশ যেন মৌন সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন, যেন কোন মা আপন ব্যথিত পুত্রের পানে বিশাল বিষণ্ণ নয়নে চেয়ে আছে! আবার ভাবছি, আজকের আকাশ যেন নাম-না-জানা প্রিয়ার রহস্যভরা দুই নির্নিমেষ নীল চোখ! আমাকে ইসারায় ডাকছে। এই এগারোই ভাদ্রের আকাশখানিকে জগতের কোন্‌ কবি এমন আনন্দময় চোখে অভিবাদন করল জানি না, আমি ত' আমার নোটবুকে লিখে রাখি!

ভাবছি এবং ভাবতে ভারি কষ্ট হচ্ছে, যে পৃথিবীকে এত ভালোবাসি, আমি চ'লে গেলে সে পৃথিবীর এতটুকুও লাগবে না। কাল ঐ যে ও পাড়ার বস্তি থেকে

জোয়ান মরা ছেলেটাকে ধরাধরি ক'রে শ্মশানে নিয়ে গেল, তাতে শুধু তার বুড়ো বাপ মা'র ক্ষণিক চীৎকার ছাড়া আর ত' কোথাও একটু দীর্ঘশ্বাস উঠল না। সব আবার যে কে সে-ই। নিঝুম, উদাসীন, নির্বিকার! আজো ত' অপরূপ ক'রে সূর্য্যোদয় হ'ল। জৈমু কতদিন ভোর বেলা ফুর্ত্তি ক'রে গায়ে মাটি মেখে এই পথ দিয়ে বাঁশের আড় বাঁশী বাজিয়ে গেছে, সে ত' আজ এই সুন্দর সূর্য্যোদয়টি দেখতে পেল না। তাতে এত বড় পৃথিবীর কি যায় আসে? আমি যখন যাব, তার পরেও ত' কত দিন কত রাত্রি আসবে, আমার জন্যে ত' একটি তৃণাঙ্কুরেও ঈষৎ রোমাঞ্চ উঠবে না। সে রাত্রে বিরহী কাঁদুক, কবি কবিতা লিখুক বীণা বাজাক, শিল্পী প্রতিমা গড়ুক, ব্যবসাদার হিসাব মিলাক, কেরাণী তার দুঃখিনী স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করুক, সেইখানে আমার স্থান কোথায়? কোথাও না। ভাবছি আজ পর্য্যন্ত এই নীল আকাশের তলে কোটি কোটি মানুষ হারিয়ে বিস্মৃত হয়ে গেল।। তাদের এতটুকু চিহ্নও কোথায় প'ড়ে রইল না। যে দিকে চাই সেখানেই মৃত্যুকে অবজ্ঞা ক'রে প্রাণের মিছিল ছুটেছে! কঠিন শ্মশানের ভস্মরাশির পাশে দামাল তৃণশিশুদলের দুরন্ত চঞ্চলতা। নোট-বইটায় লিখছি —বাঁচতে চাই, বাঁচবার স্পৃহাটুকুই আমার মরবার পর অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক!

মমতা চায়ের পেয়ালা ক'রে দুধ নিয়ে আসছে দেখছি। ও যেন শীতের বিশীর্ণ একটি কালো পাতা। ওকে আজ যে কেউই দেখবে, যেন ব'লে দিতে পারবে—ওর নাম মমতা, ময়লা একখানা কাপড় পরণে, এখানে সেখানে সেলাই করা, রান্নার কালি আর মশলা লেগে রয়েচে, তা' দিয়ে আপনার পীড়িত উপেক্ষিত যৌবনকে আবৃত করেছে। রুক্ষ জটিল চুলগুলি মাতৃহারা শিশুর মতো অযত্নপালিত, দেখলেই একটু আদর ক'রে গুছিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। হাতে গলায় কানে একটিও সোনার আভরণ নেই, শুধু এয়োস্ত্রীর পরম গৌরবময় একটি মাত্র চিহ্ন বাঁ হাতে আছে—একটি সরু লোহার চুড়ি! আর সব গয়না বিক্রী হ'য়ে গেছে। দু'টি চোখে কি সজল স্নেহমাখা! অথচ এই মমতাকে কত দিন অকারণে তীব্র তিরস্কার করেছি। কত রাতে ওকে একা বিছানায় ফেলে অস্থির হ'য়ে ছাতে টহল দিয়েছি। ও সমস্ত রাত ঘুমায়নি, বালিশে বুকটা চেপে ধ'রে খালি কেঁদেছে। কী করুণ তাপসীর মূর্তি ওর আজ! আজ ওকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল!

মমতা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে আসতে আমার পানে চেয়ে একটু ফিকা হাসল। এই ত' তুমি ঘুম থেকে একলা বারান্দায় উঠে এসেছ। তুমি ত' রোজ ভালো হচ্ছ। শুধু শুধু ভুল ভাব যত সব—

গরম দুধের পেয়ালাটা চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে, মমতা হাঁটু গে'ড়ে পাশে বসল। বলল—আজ কত জ্বর পেলে?

তার দু'টি স্নেহার্দ্র উৎসুক চোখের পানে চেয়ে ধীরে বললাম - নর্মেল।

নর্মেল? সে উৎফুল্ল হয়ে দু'টি চোখ সুখে ডাগর ক'রে মধুর কণ্ঠে 'সত্যি'? ব'লে আস্তে আস্তে আমার বুকের ওপর নিজের শ্রান্ত মাথাটি রেখে ছলছল চোখে চেয়ে আনন্দে বললে - আর কি, এবার থেকে আর জ্বর হবে না, আর ভাবনা নেই, তোমাকে আমার কাছ থেকে কে ছিনিয়ে নেবে?

ওর চুলগুলিতে ধীরে আঙুল বুলোতে লাগলাম। ও যদি আমার জামার তলা দিয়ে বুকে হাত দেয় তাহলে ওর হাত পুড়ে যাবে। জ্বর একশো এক ডিগ্রিই ছিল। কিন্তু থার্মোমিটারটার ওপর ভারি রাগ হয়ে গিয়েছিল আজ সকাল বেলা। রেগে এক ঝাঁকুনি দিতেই এক নিমেষে জ্বর নর্মেলে নেমে গেল। মমতার রাত্রির মতো ব্যথিত নিস্তব্ধ ব্যাকুল দু'টি চোখের পানে চেয়ে রূঢ় সত্য কথাটা মুখ দিয়ে বেরুল না। কাশতে কাশতে যে রক্তটা আজ উঠেছিল, সেই রুমালটাও সরিয়ে রাখলাম।

কিন্তু মমতাকে আজ ভারি মিষ্টি লাগছিল। সমস্ত দুঃখের মধ্যে আজ যেন অপরিসীম একটি তৃপ্তি পাচ্ছি। ওকে বুকে জড়িয়ে আর কোনো দিন যেন বুকটাকে এত ভরা মনে হয় নি। ভাবতে ভারি কষ্ট হচ্ছে, এই মমতাকে একদিন কঠিন কটুকণ্ঠে বলেছিলাম—ভালোবাসিনা। সে দুই হাতে খুকীর মতো মুখ ঢেকে কেঁদেছিল।

ওর আনত মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—ভারি লোভ হচ্ছে মমতা!

ও শুষ্ক মলিন মুখখানি খুশীতে উদ্ভাসিত ক'রে আমার পানে চেয়ে আমার বুকের ওপর মুখখানি রেখে গালটি এগিয়ে দিয়ে বললে—দাও।

ঠোঁট দু'টো এগিয়ে নিলাম। না, থাক।

ও আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে— কেন, গালে দিলে আমার কিছু হবে না, তুমি দাও।

দিলাম।

ওর শুকনো রঙহারা ঠোঁট দু'টি দু'টি আঙুলে স্পর্শ করছি। দূরে নিমগাছের একটা সদ্যোজাত শাখা তার অগুন্তি কিশলয় মেলে দিয়ে সূর্য্যকিরণে কাঁপছিল। আমার জীর্ণ বুকের তলায় যে অক্ষয় প্রাণ আছে তা যেন ওই পাতার মতোই মৃদুল, কচি!

ডাকলাম—মমতা!

মুখ তুলেই বললে - কি?

—আমাকে তাহলে তুমি রেখে দেবে?

মাথা তুলে বললে—নিশ্চয়ই। কিন্তু দুধটা এক্ষুণি খেয়ে ফেল। জুড়িয়ে গেল হয়ত,

ব'লে পেয়ালাটা মুখের সামনে তুলে ধ'রে ফের বললে—হাঁ কর, খাইয়ে দিই আস্তে আস্তে।

মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বললাম—কোথায় দুধটা জোগার হ'ল? পয়সা কোত্থেকে জোটালে?

—সে যেখান থেকেই হোক না, তুমি খাও।

—কিন্তু কাল রাত্রে তুমি কিচ্ছু খাও নি, পাশের বাড়ী থেকে বার্লি চেয়ে এনে খোকাকে খাইয়েছ, আমি সব জানি। এ দুধ তুমি নিয়ে যাও মমতা, খোকাকে দাও, তুমি খাও।

মা যেমন রোগা ছেলের পাগলামি শুনে হাসে, ও তেমনি হাসল। বললে—খোকার জন্যে দুধ আছে। জুড়িয়ে গেল, খাও লক্ষ্মীটি!

বললাম—পয়সা কোথায় পেলে?

মুখ নীচু ক'রে রইল।

—খোকার ধুকধুকিতে শেষ কালে হাত দিলে? মা'র শেষ স্মৃতিচিহ্নটির সম্মান তাহলে আর রইল না মমতা? অন্য দিন হ'লে তাকে কটু স্বরে কত তিরস্কারই না করতে পারতাম। আজ কথাগুলি কান্নায় ভিজে গেল। ওকে বকতে ভুলে গেছি।

মমতা বললে—বিক্রী করি নি, বাঁধা দিয়ে কুড়িটা টাকা জোগাড় করেছি। আর ত' কিছুর ভয় করি না এখন। কত ধুকধুকি আবার আসবে। আমি কিন্তু তোমার প্রথম মাসের মাইনে পেলেই একটা গরদ কিনে প'রে তোমাকে প্রণাম করব। কিন্তু আর না, একেবারে জল হয়ে যাচ্ছে দুধটা, খেয়ে ফেল।

দুধটা ধীরে ধীরে খেয়ে ফেললাম।

বললাম—কুড়ি টাকা! কি কি খরচ করবে?

—তোমার নতুন ওষুধটা, একটা তোমার জন্য র‍্যাপার, দু'টো কাঁচের গ্লাশ, আর খোকার গায়ে একটাও আস্ত জামা নেই—একটা জামা।

—আর? খাবার কিছু না?

—ও হ'য়ে যায়। খাওয়ার জন্যে কে ভাবে?

বললাম—তার থেকে আজই টাকাটা দিয়ে তোমার জন্য একখানা গরদ কেন মমতা!

—কিচ্ছু দরকার নেই। আমার এই ময়লা ছেঁড়া কাপড়টাই গরদ। ব'লে নীচু হ'য়ে আমাকে প্রণাম ক'রে সহসা উৎফুল্ল হয়ে বললে— দেখ দেখ কেমন সুন্দর নতুন ধরনের তেপায়া সাইকেল। তুমি এমনি থাক, কেমন? গায়ে রোদ লাগুক। আমি খোকাকে দুধ খাইয়ে আসি।

চ'লে গেল।

চোখে জল এসে পড়েছে। চ'লে যাব ব'লে নয়, মমতাকে আবিষ্কার করতে এত দেরী হ'য়ে গেল ব'লে। চোখের জলের আর এক নাম যে ভালোবাসা, তা আজ ঐ প্রসন্ন প্রসারিত আকাশ দেখে বুঝতে পারছি। মমতার এই অপরিচ্ছন্ন ছিন্ন বসনে অসংযত রুক্ষ কেশে শ্রীহীন রুগ্ন দেহে, আর এই পরিপূর্ণ সেবায় আমি একটি অপার মাধুর্য্য একটি অতল গভীরতা পাচ্ছি। ও এতদিন কোথায় ছিল? এই চোখের জলে ওর নব অভিষেক হচ্ছে।

গেল বছর অসুখটা বেড়ে গেলে পর ডাক্তাররা স্থান পরিবর্তন করতে বললে। এর আগে ছ' মাস বাড়ী ব'সে ওষুধ গিলে গিলে জমানো পুঁজি যা কিছু ছিল চুকে বুকে গেল। ছত্রিশ টাকার চাকরিটিও খোয়ালাম। ডাক্তাররা চ'লে গেলে মমতাকে বললাম—ওরা ভেবেছে তোমার কোল ছেড়ে ওয়াল্টেয়ারটাই আমার পক্ষে মৃত্যুর সব চেয়ে সুখকর স্থান হবে। ভুল। যতদিন আছি—

সেই দিন নিজেকে এত একলা অসহায় ও মমতাকে এত করুণাময়ী মনে হয়েছিল যে ও রকম কবিত্ব করতে পেরেছিলাম। চেয়ে দেখি. মমতা তার গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে ফেলেছে। বললাম—না যেতেই বৈরাগিনী? ও বাঁ হাতের লোহার চুড়িগাছি দেখিয়ে বলেছিল—এই আমার অক্ষয় কবচ।

প্রায় সাত শ' টাকা হ'ল। বিন্ধ্যাচল চ'লে গেলাম। ছ' মাসে বেশ তাজা হ'য়ে এলাম, জ্বর নেমে গেল। ওজন বাড়ল, কিন্তু…

পোকারাও দেশভ্রমণে গিয়েছিল দল বেঁধে. আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে।

কতদিন মমতা নিজের জন্য ভাত রাঁধেনি। জোটেনি ব'লেই রাঁধেনি। জুটলেও ভেবেছে, এ দিয়ে আমার জন্য দু'টো বেদানা হ'তে পারে, নিজের গ্রাসাচ্ছাদনটা ত' তার তুলনায় অতি তুচ্ছ। না খেয়ে দেয়ে রাত জেগে আমার বুকে কোমল করপল্লবখানি বুলিয়ে দিয়েছে। নিজের যা দু' একখানি বিয়ের দামী শাড়ী ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে গরীব ঝি গয়লানী ভুজাওয়ালীদের কাছে বিক্রী হ'য়ে গেল। আর কিছু রইল না। শেষকালে খোকার ধুকধুকিটিও।

মমতা আবার কাছে এল। হাত পেতে বললে—থার্মোমিটারটা দাও না।

বললাম—কেন?

—ও বাড়ীর পিসীমাকে দেখিয়ে আসি। দেখলে বেজায় খুসি হবেন।

দিলাম। ও একবার ঘাড় ফিরিয়ে হেসে চুলগুলি একটু দুলিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

আমার জ্বর কমেছে—ও যেন একটা অমূল্য সম্পদ। থার্মোমিটারটা এমন সস্নেহে তুলে নিল যেন ও ওর খোকা।

কিন্তু আমারই বা কি যোগ্যতা ছিল? আপন অধিকারের গর্বে তা ত' একদিনো চোখ চেয়ে দেখিনি। দেয়ালে ওর বছর চার আগেকার ফটোটি টাঙানো আছে। দেখা যাচ্ছে। কি নিটোল স্বাস্থ্য কি ললিত তনিমা! এই বুঝি তার ভস্মাবশেষ। আপন স্ত্রীকে একখানি কাপড় কিনে দিতে পারি না, শুধু তাকে খাটিয়ে নিজের সুবিধার চেষ্টা দেখি। এত বড় কাপুরুষ! ও আমার জন্য নিজেকে তিল তিল ক'রে দগ্ধ করছে। অথচ মুখে কি অনাবিল প্রসন্ন হাসি, কথায় কি অম্লান সহানুভূতি! নিজের ওপর এত বিরক্ত হয়ে উঠি। কিন্তু মরলেও ত' মমতার মুক্তি নেই। আমি ওকে মুক্তি দিতে চাই।

দানবী নগরীর বিকট অট্টহাসি সুরু হয়েছে। শরীরটা খারাপ লাগছিল। উঠে পড়লাম। আস্তে আস্তে হেঁটে বিছানার দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে এসে মমতা আমাকে দু'হাত দিয়ে ধ'রে ফেলে বললে—আজকে জ্বরটা ক'মে গেল ব'লেই হাঁটতে সুরু ক'রে দিও না। চুপ ক'রে শুয়ে থাক। আমাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল নোংরা শতছিন্ন বিছানায়। চ'লে গেল।

ও আজ ভারি ব্যস্ত। যেন ওর আজ একটা প্রকাণ্ড শুভদিন!

খোকা নাচতে নাচতে এসে হাজির। ওকে ওর মা একটা ফর্সা ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে আজ। এই সমস্ত বর্ষাটা ও অনাবৃতগাত্রেই কাটিয়েছে। ওর মুখখানি আজ আর অযত্নে অপরিষ্কার নয়, সদ্যস্ফুট শেফালি। চুলগুলি গোছানো। থপি থপি পা ফেলে কাছে এসে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলে—আবা! ওর সদ্যস্ফুট দাঁত ক'টি জুঁয়ের পাপ্‌ড়ির মতো ঝিলিক দিল।

হাত বাড়িয়ে ডাকলাম—খোকনটা!

বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু নিলাম না। মুখখানি ভার ক'রে থপি থপি পা ফেলে চ'লে গেল।

মমতা চুলগুলিতে আঙুল চালাতে চালাতে বললে—আজ মাথাটা ধুইয়ে দিই কেমন? জ্বর ত' আর নেই।

বারণ করলাম না। কি হবে মাথা ধুয়ে দিলে? শুধু শুধু ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে কি লাভ? মমতা মাথা ধুইয়ে দিল। ঘরে চিরুণী নেই। আঙুল দিয়ে চুলগুলি আঁচ্‌ড়ে সহসা অধর দিয়ে চুল স্পর্শ ক'রে বললে—কেমন তোমায় দেখাচ্ছে আজ।

ভালো লাগল না।

মমতা স্নান ক'রে যে শাড়ীখানি আজ পরল, তা ফর্সা দেখছি। কাপড় সকালবেলা

কেচে শুকিয়ে পরেছে। আজ ময়লা সে পরবে না। কালো চুলের আড়ালে সিঁথিটি সিন্দূরে উজ্জল। পান খেয়ে শুকনো ঠোঁট দু'টি দোপাটির মতো রাঙা! একদৃষ্টে তার ঠোঁট দু'টির পানে চেয়ে রইলাম। জানি ভাত সে আজো রাঁধে নি। ও বাড়ীর ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে কি আনাল দেখলাম। তবু পান খেয়ে ঠোঁট দু'টি লাল করল। অথচ···

পাশে বসল। শরীর খারাপ লাগছিল! জ্বর বাড়ছিল। বললাম—ঘুমুব। তুমিও ত' অনেক রাত ভালো ঘুমোও নি। আজ একটু শোও গে।

আর বিছানা ছিল না। নগ্ন মেঝের ওপর খোকাকে পাশে রেখে শুল। তপ্ত মধ্যাহ্নের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। চোখের পাতা জলছিল। যদি পাশে এসে শু'ত! না, তাহলেও ভালো লাগত না বুঝি।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। বারান্দায় কেরোসিনের ডিবেটা ধোঁয়াচ্ছে। চেয়ে রয়েছিলাম। এই কুশ্রী কঠিন একঘেয়েমির মধ্যে একটি বৈচিত্র্য যেন পাঁকের মধ্যে স্থলপদ্মের মতো ফুটেছে। কেরোসিনের আগুনের কোলে দু'টি পতঙ্গ। আজকের দিনটা রুটিনে বাঁধা নয়। আমার তেতো মিক্‌শ্চারটা আর মমতা দিলে না, দুপুর বেলা দুধের পরিমাণ বেড়ে গেল। একদিন জ্বর কমতেই মমতা প্রকাণ্ড ডাক্তার হ'য়ে পড়েছে। আজ ও সন্ধ্যায় চুল কেমন ক'রে জানি বাঁধল। তাতে আবার ফুল গোঁজা। দুয়ারে একটি মাটির বাতি জালিয়ে সন্ধ্যা দিলে। ধূপ জালালে। আজ সারা সন্ধ্যাটা সমস্ত ব্যস্ত কাজকর্মের মধ্যে ও গুণ গুণ ক'রে গান গেয়েছে, খোকাকে নিয়ে ছড়া কেটেছে, খোকার চোখে কাজল এঁকেছে, নিজের চোখেও আঁকতে চেয়েছিল, আমার পানে চেয়ে মুচকে একটু হেসে হাত নামিয়ে নিল। সর্বাঙ্গ থেকে ওর খুসি উছলে পড়ছে। ওর দেহখানি যেন নবমুঞ্জরিত মাধবীলতা। আজ ও সুন্দর ক'রে নাচের ছাঁদে হাঁটছে, সন্ধ্যাতারার মতো স্নিগ্ধ চোখে চাইছে, কথার মধ্যে একটি সলজ্জ অস্ফুটপক্ষ পাখীর মধুর কণ্ঠের মৃদুতা! কিন্তু বৃথা!

মমতা হাসতে হাসতে একখানা র‍্যাপার নিয়ে এল। খুসিতে সব কথাগুলি ভিজিয়ে বললে—এটা কিনলাম। বেশ সুন্দর, না?

কিন্তু আর বেশি না। বললাম—র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে দাও না, মমতা। ভারি শীত করছে।

র‍্যাপারটা গায়ে জড়াতে জড়াতে মমতা বললে—শীত? কেন?

—জ্বরটা ফের বাড়ল, মমতা।

উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছিল। ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারছিলাম। হয়ত ওর জন্যে এ বেলা ভাত রাঁধত। রাঁধা তাহলে হ'ল না।

—বাড়ল?—ব্যাপারটা জড়ানো হ'ল না! অন্ধকার হ'লেও বুঝতে পারলাম ওর মুখ পাংশু হয়ে গেছে। ওর গলার স্বর এত স্পষ্ট ছিল। জিগ্‌গেস করল—কত?

জ্বর রাত্রেও একশো এক ডিগ্রিই ছিল। বললুম—তিন।

—তিন? যেন স্বচ্ছন্দবিহারিণী চলচ্ছন্দা হরিণীর বুকের যে স্থানটা সব চেয়ে কোমল যে স্থানটায় শাণিত ছুরি বসেছে—এম্‌নি আর্তকণ্ঠ।

রুক্ষ কণ্ঠে বললাম—বিকেলে আমার জন্যে যে পেঁপের মোহনভোগ তৈরি করবে বলেছিলে তা আমার আর রুচবে না। আমি এখন ঘুমুব।

গভীর রাত। বিনিদ্র চোখে সে গভীরতাকে কী নৈরাশ্যময় ও অতল মনে হয়! মমতা ছেঁড়া মশারিটা টাঙিয়ে দিতে আজো ভোলে নি, মশারির বাইরে চ'লে এলাম। ঠাণ্ডা লাগবে জানি, তবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারটায় বস্‌তেই ঝির ঝির হাওয়া প্রেমের প্রথম অনুভবটির মতো একান্ত আদরে সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিল। এ যেন কোন্ দূর-দেশী প্রিয়ার গোপন শঙ্কিত প্রথম চুম্বনটি! চাঁদের আলো মেঘলা আকাশে থিতিয়ে রয়েছে। চরাচরব্যাপী অনন্ত নিঃশব্দতায় বিধবা রাত্রি যেন কাঁদছে।

পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দেখি, মমতা কঠিন মেঝের ওপর তার নগ্ন শীর্ণ বুকটা চেপে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাশে মেঝের ওপরই খসা তারার মতো খোকা শুয়ে, ঘুমন্ত, চাঁপার আধেক-বোজা কুঁড়িটির মতো। একফালি জ্যোৎস্না মমতার গায়ের ওপর মা'র সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনার মতো লুটিয়ে পড়েছে!

আবার কাঠের ইজি-চেয়ারটায় এসে বসেছি। একটা কাক প্রভাত হয়েছে ভুল ক'রে ভারি করুণ কণ্ঠে ডাকছে। একটা মোটর চ'লে গেল। দূর থেকে একটা চলন্ত ট্রেনের বাঁশী শুনছি। নোট-বইটায় লিখে রাখতে ইচ্ছে করছে, মশারির তলায় মরতে চাই না। এই বিস্তীর্ণ আকাশের তলে না-পাওয়া প্রিয়ার মতো মরণকে বুকে তুলে নেব। কোন ক্ষোভ নেই। এই জীবনে হয়ত জুয়ো খেলে গেলাম। তাতেই বা কি? কোনো মীমাংসাই ত' তবু হবে না। যে চল্লল, তার পা থেকে এই নিষ্ঠুর জীবন যাত্রার নিয়ম-নিগড়গুলি খুলে যাক, তাই এতদিনের সঞ্চিত নিষ্ফল আত্মপ্রবঞ্চনার কৌশলগুলি একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসে উড়িয়ে দিই। মশারি থেকে আজ একটিবার বেরিয়ে এসে এই নীল আকাশের সৌম্যতাকে নিশ্চল ভাবে গ্রহণ করি! আজকে একবার পরিপূর্ণ দ্বিধাশূন্যতায় ডাকি—কঙ্কা।

উঠে দাঁড়ালাম। ডিবিয়াটা জ্বেলে নোটবুকটায় এ কয়েকটি কথা না লিখে রাখতে পারলাম না।

—মমতা যদি হয় আমার এই ব্যর্থ হতাশা জর্জরিত ছত্রিশটাকার কেরাণীজীবন, কঙ্কা আমার এই ভূমাময় মহাকাশশায়ী উদার মৃত্যু। মমতার মন্দির যদি দেহের

এই ভোগায়তনে, কঙ্কার তবে ঐ দূরের দুস্তর সীমাহীনতায়! মমতা যদি এই প্রোড়ো ঘর, কঙ্কা তবে ঐ সুদূরবিস্তৃত কণ্টকিত অনির্দিষ্ট বাহির! বাহির আমাকে ডাকছে। আমি চললাম।

কিম্বা এরকম ভাবে লিখে রাখলেও চলে।

—মমতাকে বহু কষ্ট দিয়েছি। আমার জন্যে খেটে খেটে ও জর্জরিত হয়ে গেল। নিজের যৌবনকে লাঞ্ছিত করল। কত বেলা নিজে খেল না। আমার জন্য সমস্ত গয়না বেচল। নিজেকে সর্বপ্রকারে দীন বঞ্চিত ক'রে রাখল দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই অকর্মণ্য মৃত্যুপিপাসু হতভাগ্যকে নিয়ে দরিদ্র ভগ্ন জীবনের ভেলায় ভাসল, কোথাও কূল মিলল না। আমি আর পারি না। কুড়িটা টাকা ত কালই ফুরিয়ে যাবে। তারপর?…আমি ওকে আর পীড়িত করতে পারব না। আমি ওকে মুক্তি দিতে চাই। যতীন ত' ওকে ভালোবাসে। আমার অসুখের মধ্যে কতদিন ওকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল। ও নেয় নি। ওর রিক্ত আভরণশূন্য হাত দু খানি দেখে বন্ধুর বুকে নিদারুণ বেজেছিল। তাই ত' দু'গাছি সোনার চুড়ি গড়িয়ে ও মমতাকে বলেছিল পরতে। মমতা পরে নি। নিতেও চায় নি। রান্না ঘরের বারান্দায় সেই করুণ দৃশ্যটি আমি ভিজা চোখে ব'সে ব'সে দেখছিলাম এখান থেকে। মমতা নিতে না চাইলেও সেই চুড়ি দু'গাছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যতীনের মর্মান্তিক বাজছিল, বুঝছিলাম। তাই সে, আমি কেমন আছি জানবার অছিলায় ওপরে এসে তাকের ওপর মমতা যেখানে আমার দুধের বাটিটা রেখেছিল, তার পাশে চুড়ি দু'গাছি রেখে চ'লে গেল। শেষে সেই চুড়ি দু'গাছি বেচে মমতা ডাক্তারের ভিজিট দিয়েছে। যতীনের দেওয়া একখানি সবুজ ঘাসী শাড়ী পরতে মমতা বাধ্য হয়েছিল; আমার সামনেই যতীনের সে কি কাতর অনুরোধ! মমতাকে বেশ দেখাচ্ছে এ কথা আমি ও যতীন দু'জনে বলতেই ত' ও কেমন সুন্দর ক'রে হেসেছিল! তা ছাড়া আমার চোখের অলক্ষিতে যতীন ও মমতায় কি কি গোপন নিভৃত ও অস্পষ্ট স্নেহের বিনিময় হয়েছিল, তা না জানলেও অনুমান করতে ভালো লাগে। কোন ক্ষোভ নেই। যতীন ত' আমার চেয়ে কত কামনীয়! শক্তিমান তেজস্বী ছেলে, চওড়া বুক, দু'দশটা ঘুষি অকাতরে বুক পেতে নিতে পারে; বড় লোকের ছেলে, সুন্দর চেহারা—মমতাকে ভালোবাসে। আমি ম'রে গেলে মমতা ত' আনায়াসে—

মাথাটা বুঝি গুলিয়েছে। তাই বুঝি এ সব লিখছি। না, সত্যি সত্যি মমতাকে মুক্তি দিতে চাই, আমি মরলে পর যদি যতীনকে নিয়ে সুখী হয়, তাতে কার কি ক্ষতি আছে? আমি ত' ওকে কষ্ট দিলাম। কত তিরস্কার করলাম। ভালোবাসিনা—বললাম। যতীন যদি সুখী করতে পারে, তবে, তবে সে…,এ মিথ্যা আচারের কঙ্কাল নিয়ে

প'ড়ে থাকলে থাকবে, ওর ইচ্ছা। আমি ত' ওকে মুক্তি দিতে চেয়েছি। হয়ত এখানেও দেরী হয়ে গেল। কিন্তু মুক্তির অবাধ অগাধ বিস্তার ও প্রাণ ভ'রে ভোগ করুক এই আমার ইচ্ছা! যেমন আমি ভোগ ক'রে আজ কন্যাকে সম্বোধন করতে পারছি, কত কাল বাদে!

ঠাণ্ডা লাগছিল। নতুন র‍্যাপার দিকে বুকটা খুব জোরে জড়াচ্ছিলাম। যেন কে তার দুটি ললিত বাহুলতা দিয়ে আমাকে বেষ্টন ক'রে ধরেছে!

অনেকক্ষণ প'ড়ে ছিলাম। কাশির চোটে ঘুম ভেঙে গেল। ফর্সা হচ্ছে। মমতার চাপা গোঙানি তখনো থামেনি। ভারী বিশ্রী দেখাচ্ছিল ওকে। উঠে দাঁড়ালাম। মুহূর্তে বুকটা পাষাণ হয়ে গেল।...

দেরাজে একটা টিনের কৌটা। তাতে যতটা টাকা এখনো অবশিষ্ট আছে।...

হয়ত ভীষণ নিষ্ঠুরতা, কিন্তু জগৎজোড়া এই প্রচণ্ড প্রতিকারহীন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তুলনাই চলে না এর।

বাইরে এসে পড়েছি। তাকে একবারটি শুধু দেখতে ইচ্ছা করছে মরবার আগে। মিলনসুখতৃপ্তা ঐশ্বর্যময়ী নারী! একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। ডাকলাম। সার্কুলার রোড।

গায়ে তখনো মমতার দেওয়া র‍্যাপারটা।

* * *

দার্জিলিঙে জুবিলি স্যানিটেরিয়ম-এ ঠাঁই পেলাম। পৃথিবীর সবখান থেকে একেই আমি বেছে নিয়েছি। সন্ধ্যা। নার্সকে বললাম—বেডটা চাকরকে ডেকে ঐ জানলাটার পাশে দাও। আমি ওদের কথাগুলি আরো একটু স্পষ্ট ক'রে শুনি!

আমার দুই চোখে সন্ধ্যার ম্লান কুয়াসা কাঁপছিল হয়ত। নার্স আমার কথা শুনল। নার্সকে দেখে কেবল মা'র কথা মনে পড়ছে।

যতীন বলেছিল—তুমি এই সকালে বিছানা ছেড়ে? একদিন জ্বর কমতেই অত্যাচার সুরু করেছ?

আমার জ্বর কমেছে—এ খবরটা মমতা যতীনকেও জানিয়েছে। ওকে বললাম না যে সার্কুলার রোডের বাড়ীর দরজায় 'টু-লেট্' টাঙানো রয়েছে ব'লেই ওর কাছে এলাম। বলেছিলাম—মমতাকে তুমি বাঁচাও যতীন!

যতীন চমকে উঠেছিল।—কি হয়েছে মমতার?

—কাল রাত থেকে ভীষণ জ্বর, ভুল বকছে, তাই তোমাকে খোঁজ করতে আমি বেরিয়ে এসেছি। তুমি একবার যাও, যতীন। ঘরে একটি পয়সাও নেই।

যতীন জামার ওপর চাদরটা ফেলে তাড়াতাড়ি বললে—চল।

—তুমি যাও, আমি ডাক্তারকে একেবারে 'কল' দিয়ে যাই।—কিন্তু টাকা চাই যতীন।

—কত?

—প্রায় দু'শ।

—চল, আমার পকেটেই আছে।

বললাম—তুমি একলা খালি পকেটে গেলেই চলবে, টাকাটা আমার হাতে দাও।

যতীন আমার দিকে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে রইল।

বললাম—কাল রাতে মমতা আমাকে ভর্ৎসনা করেছে। বলেছে—রুগ্ন মুমূর্ষু স্বামী নিয়ে সে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে। তার সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সে খেতে পায় না। ছেঁড়া কাপড় প'রে কেঁদে কেঁদে জীবন গোঙায়। আমার কি অধিকার আছে এমনি ক'রে তার সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য কালো ক'রে দিতে? আমাকে ও ঘৃণা করে। যাকে ভালোবাসে না তাকে সেবা করার মধ্যে ওর সুখ নেই। তারপর আমি ম'রে গেলে নাকি ওকে ফের যাবজ্জীবন কৃত্রিম কঠিন বৈধব্যের শাস্তি বহন করতে হবে? কেন? যতীন, ও তোমাকে চায়। প্রলাপের সময় তোমার নাম করেছে খালি। তুমি একবার ওর কাছে যাও।

যতীন আমাকে হয়ত পাগল ভেবেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, দু'শ টাকা আমাকে দিল। এমন ভাবে দিল যেন ও ঐ দু'শ টাকা দিয়ে মমতাকে কিনে নিচ্ছে। হয়ত আমি চ'লে যাবার পর তখনই ও মোটরে ক'রে মমতার কাছে গিয়েছিল। হয়ত মমতাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। আমি চ'লে যাবার পর পৃথিবীর কি হবে তা ভাবতে পারি না, আমি ত' যাই। আমি ত' তাকে একটিবার, শেষবার দেখি!

চুপচাপ ছিল। হয়ত কঙ্কা এখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। কখন আবার জাগবে না জানি!

সুনির্মল যেদিন তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে কঙ্কাকে দেখিয়ে বলেছিল—এ আমার ওয়াইফ, তখন কঙ্কার কুণ্ঠিত লজ্জারুণ নম্র চোখের পাতার কাঁপনটি দেখে সমস্ত হৃদয় ব'লে উঠেছিল—ওরে এ যে সেই! অথচ, এই সে যে কে তা আজ পর্য্যন্তও জানিনি। কঙ্কা সেদিন দু'টি হাত জোড় ক'রে নমস্কার পর্য্যন্ত করতে পারে নি। কোন কথাও কয়নি। চোখে চায়ও নি একটিবার। অদূরে দাঁড়িয়ে রাঙা শাড়ীর আঁচলটা ঘর্মাক্ত দু'টি আঙুল দিয়ে শুধু খুঁটছিল। তবু মনে হচ্ছিল গন্ধরাজের পাপড়ির মতো পেলব ঐ মেয়েটিকে যেন খুব চিনি! ওকে কোথায় যেন আমি দেখেছি। ঠিক মনে করতে পারছি না। কোন বিস্মৃত শৈশবে, আমাদের বুনো গাঁয়ের গা-ঘেঁষা

না'-ভাসানো মরা গাঙের পারে হয়ত। হয়ত বা কোন মুখর ব্যস্ত রাজধানীর ভিড়ের মধ্যে, বা কোন আধেক-খোলা সলজ্জ বাতায়নের ফাঁকে! হয়ত বা এখেনে নয়। সে কোন শুকতারার দেশে! মধ্যরাত্রের অপরূপ স্তব্ধতায়! হয়ত বিষন্ন অপরাহ্নে ঘুমহারা রজনীগন্ধার অস্পষ্ট বেদনায়!

অবগুণ্ঠনের অবরোধ রচনা ক'রে মেয়েটি আজ কত দূর! তবু মনে হচ্ছিল যদি ওর ঐ শিথিল হাতখানি ধরি, ধ'রে চোখের পানে চেয়ে দু'টি কথা কই, মেয়েটি তাহলে একটুও রাগ করে না, সহজ পরিচয়ের সুরে উছল আনন্দে কত গল্প করে! মনে হচ্ছিল ও আর এক জন্মে আমার বোন ছিল, বা হয়ত আরেক জন্মে ও আমার বোন হবে, তখন আমাকে ছাড়া ওর জীবন কাটতে চাইবে না! যদি ওর ঘোমটাটি ফেলে দিই, ও তাহলে ক্ষণিক সরমে মুচকে একটু হাসে, ঘোমটাটি তুলে দেয় না; পিঠের ওপর দীর্ঘ চুলগুলি মেলা থাকে, তা দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়। সুনির্মল যেন একেবারে অচেনা। ও খালি ওর অয়েল মিল্ রাইস্ মিল এঞ্জিন বয়লার-এর গল্প করছে। কিন্তু ওর সঙ্গে চাঁদনী রাতে শেলীর Alastor পড়বার কথা, ওকে আজ রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' পড়িয়ে শোনালে ভারি মানাবে!

কিন্তু কঙ্কার সঙ্গে একটি দিনও কথা কইনি। শুধু নিস্তব্ধ হৃদয় দিয়ে ওকে সম্ভাষণ করেছি। ও-ও স্তব্ধতায় উত্তর দিয়েছে। একটি দিনের ছবি আজো আমার মনে থেকে গেল। উত্তরপাড়া থেকে নৌকা ক'রে আসছিলাম। বেলুড় পেরিয়ে যখন যাচ্ছি, পার থেকে কে মাঝিকে শুধাল তাদের আহিরীটোলায় নিয়ে যেতে পারবে কি না! তখন রাত। মঠে আরতির শঙ্খ থেমে গেছে। ভাগীরথী অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মতো একটি পবিত্র শান্ত শুশ্রূষা বহন ক'রে চলেছে। আকাশের জ্যোৎস্না নদীর জলের মতোই ঘোলা!

মাঝি আমার অনুমতি চাইল। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম—সুনির্মল আর সে! সর্বাঙ্গে ওর সুষমা! সুন্দর সেজেছিল। এ জ্যোৎস্নাবিকীর্ণ সুষুপ্ত ভাগীরথীর মতো নয়, অমাবস্যারাত্রির নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে তরঙ্গিণীকে যেমন দেখায় তেমনি! সুনির্মল ত' আমাকে দেখে ভারি উৎফুল্ল হ'ল। লাফিয়ে উঠল নৌকাটাকে নাগরদোলা ক'রে। ও ধীরে ধীরে দু'খানি পা ফেলে ফেলে এল। ইচ্ছে হ'ল একবার হাতটি ধ'রে তুলে আনি! নিজেই আসতে পারল। কোন কথা বলল না, সুনির্মলের সঙ্গেও না। ভাবলাম, আমার কাছে ওরা কথার বাজে খরচ করতে চায় না। সমস্ত রাতই ত' প'ড়ে আছে ওদের।

সুনির্মল মাঠের গল্প সাঙ্গ ক'রে মাঝিদের সঙ্গে মাছধরার গল্প সুরু করল। জেলেরা এক পায়ে বৈঠা চালিয়ে দুই হাতে মাছ ধরছে। ডিঙিগুলি স্রোতের

ফুলের মতো তুলছে। ওপারে চিমনিগুলি কালো ধোঁয়া দিচ্ছে। চুপ ক'রে ব'সে থাকতে ভাল লাগছিল না। অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু বাজে গল্প করবার রাত ত' এ নয়!

বাঁশীটা মাঝখানে থামিয়েছিলাম। ভাটার টানের সঙ্গে সঙ্গে ভাটিয়ালের টান ভারি মিল দিচ্ছিল। কঙ্কা নিঝুম হ'য়ে ব'সে ছিল ছাউনির বাইরে। সমস্ত বুক পেতে যেন ও বাঁশী শুনছে। ওর ব'সে থাকবার ভঙ্গিটি ভারি করুণ লাগছিল। ওর মুখখানিতে যেন কত দুঃখ! ঐ মুখখানিতে ব্যথার লাবণ্য না থাকলে মহিমা পেত না। কিন্তু কেন ওর ব্যথা? কে জানে? হয়ত ভুল দেখছিলাম। তবুও, ওর যদি ব্যথা না থাকে বুকে, তাহলে মনটা যেন খুসী হয় না, খুঁতখুঁত করে! যদি সত্যিই কোন ব্যথাই না এল ওর জীবনে, তবে ও একটি ব্যথা পাক, ওর চোখ দুটি গঙ্গার জলের মতো ছলছল ক'রে উঠুক, মন খালি এই কামনা করছিল। ওর জীবনে একটি পবিত্রতম দারিদ্র্য আসুক! ওর মুখখানা রক্ত-করবীর বিলাস ছেড়ে সন্ধ্যায় ফোটা অপরাজিতার মতো স্নিগ্ধ হোক! কি অন্যায় কামনা।

বাঁশীটা বারে বারে ফেলে দিতে ইচ্ছা করছিল। ইচ্ছা করছিল, দু'টি কথা কই। কথা কইলেই ও সুন্দর ক'রে জবাব দেবে নিশ্চয়। ওর সঙ্গে যে আমার কতকালের চেনা! কিন্তু মনে হচ্ছিল, কথা কইলেই যেন আজকের এই ঘুমন্ত ঘোলা নদীর ওপর নিঝুম জ্যোৎস্নারাতটা একেবারে মাটি হ'য়ে যাবে। আমার ইলিশমাছ ধরবার কৌশল জেনে কাজ নেই। বাঁশীতে ব'সে ব'সে একটা ভাঙা উর্দু গজল বাজাই!

ভাগ্যিস সেদিন বাড়ী ফিরে এসে অভিভাবক রাগী মামার অন্যায় বকুনির উত্তরে চটা চটা কথা কইনি। চুপ ক'রে বাঁশীটা কোলে নিয়ে বাইরে চেয়ার টেনে ব'সে নদীস্রোতের অপার স্তব্ধতার কথা ভাবছিলাম—আর···কথা কইনি, কথা কইনি। এ যেন একটি অপার সান্ত্বনা।

তারপর ত' সেই অপরূপ রাত্রিটি বার্ক আর ম্যাথু আর্নল্ডের পাতার চাপে মারা প'ড়ে গেল। জনসন্ আর কার্লাইল। তার মধ্যে সেই ঘুমহারা জ্যোৎস্না-জাগা নিশীথিনীর স্থান ছিল না। কিন্তু সে রাত্রিটি একবছর বাদে জন্ম পেয়েছিল আবার। তখন তা চোখের জলে ভরা!

একদিন বিকেল থেকে আমাদের বাড়ীতে সানাই বাজছিল। উৎসবের বাদ্য হ'লেও তার মধ্যে পরিপূর্ণ দুঃখের রাগিণী চলেছে। গরদের কাপড়টা কুচিয়ে পরতে পরতে আমার সেই বিষণ্ণ ক্লান্ত রাত্রিটির কথা মনে পড়ল। আর মনে পড়ল সেই যে

একটি কোমলকায়া দূর মেয়ে ছাউনিতে হেলান দিয়ে ব'সে স্তব্ধ প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়খানি মেলে ধরেছিল আকাশের তলে—তার নমিত ব্যথিত দু'টি চোখ! সমস্ত ব্যাপারটা ভারি বিরস মনে হ'ল। ভাবলাম, আমার পায়ে যেমন পাম্প-শু, মাথায় শোলার টোপর, গায়ে গরদের চাদর, তেমনিই হয়ত পাশে আমার স্ত্রী। ভাবলাম, ও-পাড়ার কান্তকে হ'লেও ত' আমার চলে। শোভাবাজারের ললনাসুন্দরী বা চিংড়িপোতার কৈবল্যদায়িনীর সঙ্গে মমতার তফাৎ কোন্ জায়গায়? ওদের যে কেউই ত' আমাকে দু'বেলা ভাত রেঁধে দিত, অসুখ হ'লে ওষুধ খাওয়াত, ম'রে গেলে বিধবা হ'ত। ওদের যে কেউই ত' বলতে পারত—কোটি কোটি জন্ম ধ'রে আমরা মিলিত হয়ে আসছি। সর্বনাশ! তাহলে ভাগীরথীর উর্মি-গুঞ্জন-ক্লান্ত বিস্তৃত জলরাশির ওপর অপূর্ব বিভাবরীর অসীম রহস্য ভ'রে যে কিশোরীটি গাঢ় চোখে চেয়েছিল—সে?

তাই মমতাকে আমি যে প্রথম চুম্বনটি দিয়েছিলাম তার মধ্যে যে একটি অতৃপ্ত কামনার প্রগাঢ় দুঃখ ছিল, তা ও বোঝে নি। স্ত্রীকে নাকি চুম্বন দিতে হয়!

তাই একদিন মমতাকে যে কটুকণ্ঠে তিরস্কার করেছিলাম, তাতে যে ও কেঁদেছিল সে শুধু আমার নির্দয়তায়—আমার দুঃখ স্মরণ ক'রে নয়। সে রাত্রে বারান্দায় মাদুরটা পেতে পূর্ণিমার প্রচুর জ্যোৎস্নায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে শুয়ে নোটবুকটায় লিখেছিলাম—আমার জীবনে এই দুঃখ অগাধ হ'য়ে রইল প্রভু, যে, ভালোবেসে সমস্ত জীবন ভ'রে একটি অপার অনির্বচনীয় দুঃখ বহন করতে পারলাম না। আমি যেন বন্ধ্যা মৃত্তিকা। ভালোবেসে যে তোমার জন্য কাঁদতে না পারল তার মতো দুঃখী ত' আর নেই। তার যে অপার ব্যর্থতা। ভাত খেতে না পেয়ে কাঁদি, সংসারের শত অপমানে উৎপীড়নে কাঁদি, মমতার সঙ্গে কলহ ক'রে কাঁদি, কিন্তু এ কান্নায় বুক ভরে না, প্রভু! আমি এই অপ্রচুর বিশীর্ণ দুঃখ নিয়ে কি করব? আমাকে তুমি পরিপূর্ণ ক'রে কাঁদাও! আমাকে তুমি বৈরাগী কর!

সে রাত্রে বহুদিন পরে ফের কীটসের **Ode to a Nightingale**টা পড়েছিলাম। প্রতিটি অক্ষর অপূর্ব অশ্রুজলে ভিজা ছিল।

আজ আবার ব্রাউনিঙের **Paracelsus**-এর কথা মনে পড়ছে।

ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। কঙ্কা আর সুনির্মল।

ভারি মিষ্টি সুরে বলছে—যাও এখন একটু হাওয়ায়, সব সময় রুগীর ঘরে থাকতে নেই। যাও, **bore** ক'রো না।—কথার সুরে সুন্দর আদর।

সুনির্মল কথা কইছে না। হয়ত ওর রুক্ষ চুলগুলি কপাল থেকে মাথায় আবার মাথা থেকে কপালে—এমনি খেলা করছে।

কঙ্কা বলছে—তুমি কি ভাব? কিসের দুঃখ? আমাকে চাও? আমার কঙ্কালটাকে ত' নয়? তবে আমাকে মরতে দিতে তোমার কি কষ্ট? না, না, তুমি এত সামনে মুখ এনো না। জান্ না, আমার নিশ্বাসেও পোকা হাঁটে!

সুনির্মল ভারি কাতর কণ্ঠে ডাকছে—কঙ্কা!

ও হয়ত ওর দুটি ঠোঁট কঙ্কার ঠোঁট দু'খানির কাছে নিয়ে এল।

কঙ্কা হয়ত ওর রক্তহীন পাণ্ডুর দক্ষিণ করতলখানি সুনির্মলের মুখের উপর রেখে আস্তে আস্তে মাথাটি সরিয়ে দিল। বলছে তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ। তোমাকে নিয়ে আর পারি না। তোমাকে আমি মরতে দেব না। তোমাকে বাঁচতে হবে।

—একলা?

—বাঃ, আমি ম'রে গেলাম ব'লেই বুঝি আর রইলাম না তোমার কাছে? বাতাস যে আছে, বিশ্বাস কর ত'? কিন্তু তাকে দেখতে পাও? অথচ তাকে প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছ।

—ও সব শুধু উপমা—

—না, তুমি আমাকে আর বকিও না, তুমি বেড়াতে না গেলে রাগ করব। কথা কইব না।

ভারি সুন্দর সুর! ওর মুখটি ক্ষণেকের জন্য মেঘলা হ'ল হয়ত।

সুনির্মল ও-পাশ দিয়ে চ'লে গেল। ওর জুতোর শব্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনতে পেলাম। ও এখান দিয়ে গেলে ওকে ডাকতাম।

পরের সন্ধ্যায় কঙ্কা সুনির্মলকে বলছিল—তোমাকে ছেড়ে যাব, এ বুঝি খালি তোমারই কষ্ট? আর আমার নয়? তোমার এই শক্ত বলিষ্ঠ বাহু দু'টি, রাখ ত' দেখি আমাকে ধ'রে, বল ত'—'যেতে আমি দিব না তোমায়।' তবু 'যেতে দিতে হয়!' আমি যে চলেছি, তোমাকেই পেতে চলেছি। কিন্তু এখন তুমি যাও, বার্চহিলে বা আর কোথাও বেড়িয়ে এসো, লক্ষ্মীটি। রাত্রে না হয় আমার কাছেই থেকো। বোধ হয় আজই শেষরাত্রি—শুভরাত্রি।

কঙ্কার চোখে নিশ্চয়ই জল এসে পড়েছে। সুনির্মলেরও। এক হাতে নিজের আর এক হাতে প্রিয়ার চোখের জল মুছে দিচ্ছে।

আজ সুনির্মল বারান্দাটার এ পাশ দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে। আমার দুয়ারের সমুখ দিয়ে যেতেই ওকে দু'টি হাত তুলে নমস্কার করলাম, ও থমকে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলাম ও সুনির্মল নয়, একটি সুকান্ত দীর্ঘায়তদেহ তেজী ছেলে, দু'টি চোখে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি।

ও একেবারে আমার পাশে এসে বসেছে। আমি যেন ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার শুক্‌নো একখানি হাত ওর মুঠির মধ্যে নিয়ে বললে—আমাকে ডাকছেন?

আমি যেন ওর একটুও পর নই! ওর বুকে একটি প্রকাণ্ড দরদ বাসা বেঁধেছে যেন। দুঃখ ওকে আপন পর ভুলিয়েছে।

বুকটা দুরুদুরু করে কাঁপছিল। বললাম – কঙ্কা আজ কেমন আছে?

আমার মুখে কঙ্কার নাম শুনে ও হয়ত একটু চম্‌কাল। হয়ত বা চম্‌কাল না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে থেকে বললে—আজ রাতটা পোহালে কাল আর ওকে রাখতে পারব না। রাখা যায় না। 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে'—গানটা শুনেছেন? তা'রে কে বাঁধবে?

মনটা হয়ত সন্দেহে দুল্‌ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি ওর কে হন? জিজ্ঞাসা ক'রেই প্রশ্নের অসঙ্গতিটা নিজের কাছে ধরা প'ড়ে যাওয়াতে ভারি লজ্জিত বোধ করলাম। আমি ত' জানি!

ও যদি বলত, স্বামী হই, তাহলে একটুও রাগ করতে পারতাম কি? কিন্তু ও চমৎকার একটি কথা বলল, বলল—কিছুই না।

বললাম—সুনির্মল কোথায়? আসে নি?

—কেন আসবে?

—ওর স্ত্রী…

ছেলেটির কণ্ঠস্বরে বাষ্প এসে জমেছে। আমার রোগা হাতটা চেপে ধ'রে বললে—জুতো ছিঁড়ে গেলে বড় লোক সেটা লাথিয়ে ফেলে দেয়, তা বুঝি দেখেন নি?

বুকটায় অসংখ্য কাঁটা বিঁধ্‌ছিল। বললাম—কিন্তু কঙ্কার মেয়ে?

ছেলেটি বললে এক পাটি জুতো ছিঁড়লে অন্য পাটি জুতোও ছুঁড়ে ফেলতে হয়। এই দস্তুর। শেফালি মারা গেছে।

আর্তনাদ বেরুল—সত্যি?

ছেলেটি আমার হাতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওর চোখে জল। বললে—মাসের বাজার-সওদার হিসাব মিলে গেলে যেমন হিসাবের খাতা লোকে ছিঁড়ে ফেলে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় ব'লেই ও কঙ্কাকে ছিঁড়ে ফেলল। ফাটা মোটরের টায়ার নিয়ে ও কি করবে? ও ওর জীবনের নতুন পাতা উল্টোল। রুগ্ন অসহায় কঙ্কাকে ফেলে ও চ'লে গেল। বম্বেতে কাপড়ের কারখানার বাণিজ্য-বারবনিতা ওকে ডাকল। কে জানত? যখন জানলাম, বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে। ওকে এখানে নিয়ে এসেছি আজ

ছ' মাস। পারলাম না। খানিক থেমে ফের বললে—আপনার কথা বলুন। আপনাকেও ত' ভারি অসহায় দুর্বল দেখাচ্ছে। এই ব্যাপারটা শুধু আপনার সম্বল। একটা স্টোভ নেই, কোন ওষুধ নেই, নো ট্রিট্‌মেণ্ট্! কি, কি আমায় খুলে বলুন না। নার্স কোথেকে পেলেন ?—

বললাম—আমি আনন্দে মরতে এসেছি এখানে। সার্কুলার রোডের বাড়ীর নীচের ঘরে যে দারোয়ান আছে, সে শুধু বললে—কন্যা দার্জিলিঙে, হাসপাতালে। ···নার্স ? মরবার সময় কাছে একটি নারী চাই। যাকে ভারি চাইছি।

আমার হতাশাময় গভীর বেদনাপূর্ণ কাতর কণ্ঠস্বর শুনে ছেলেটি উঠে প'ড়ে বললে এ কি অন্যায় ? দাঁড়ান, আমি এর একটা এক্ষুণি বিহিত করছি। পরে আপনার গল্প শুন্‌ব 'খন।

সিভিল সার্জন ডাকতে গেল হয়ত। কিন্তু বৃথা, বন্ধু !

রাত্রি সুরু হ'তেই ভীষণ বৃষ্টি সুরু হ'ল। জমাট পিচের মতো অন্ধকার। একেই হয়ত কবিরা সূচীভেদ্য বলেছে। থাইসিস ওয়ার্ডটা একেবারে মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। মনে হয় এখানে সবই মরা। শূন্য ঘরে ভূতগুলি তাদের কালো কালো লম্বা লম্বা পা ফেলে নিঃশব্দে হাঁটছে।

পা দু'টো কাঁপতে কাঁপতে ঠোকাঠুকি খাচ্ছিল। তবু বিছানা ছেড়ে বেরুলাম। যদি আজকের রাতটাই ওর না পোহায় ! যদি ওর মুখে এমনি পিচের মতো কালো অন্ধকার বাসা নেয় !

দুয়ারটা ঠেললাম। খোলা ছিল। একটু শব্দ হ'ল। আবার চুপচাপ। হয়ত ওরা ঘুমুচ্ছে। পাশাপাশি !

শেড-দেওয়া কমানো চাপা আলোতে ঘরখানিকে রহস্যময় মনে হচ্ছিল। প্রশস্ত বিছানার ওপর একমুঠো বাসি গত দিনের পূজায় দেওয়া গন্ধরাজের পাপড়ির মতো কন্যা শুয়ে—যেন বহুদূরের অস্পষ্ট একটি গীতরেখা ! যেন কীটসের Madeline ! আজো ওর পাণ্ডুর দুঃখিত করুণ মুখখানি দেখে সমস্ত প্রাণ ব'লে উঠছে—এ যে সেই ! অথচ সে যে কে, তা বুঝলাম না। ও যেন বাসনাবিহীন ম্লান গোধূলিবেলা ! ওর বিছানার দুই পাশে অজস্র ফুল— ডালিয়া ব্ল্যাকপ্রিন্স কনকচাঁপা—সব যা নিয়ে এসেছে ওর দেহখানির মতো ! ঘরে রোগীর জিনিস পত্র অগোছাল হ'য়ে রয়েছে—শিশি গ্লাশ ফিডিং কাপ প্যান বালতি বেদানার খোসা আঙুরের গুচ্ছ অডিকোলনের বাটি – কত কি ! শিয়রে একটা শোফায় ছেলেটি ব'সে ব'সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা মুখে করুণ একটি ক্লান্তি। এমন ভাবে ঘুমিয়ে পড়াটি কি মধুর ! ওরা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা কইছে। ছেলেটি এখুনি আবার জাগবে। ওর ঘরের নার্সটাও ঝিমুচ্ছে। বৃষ্টি থামছে না।

ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে এলাম; ওর রুক্ষ জটিল চুলগুলি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। মশারি টাঙানো ছিল না। ওর পাশে একটু বসি! ওকে যদি ডাকি—কঙ্কা, ও চোখ চেয়ে আমাকে দেখে হয়ত বলে—তুমি এসেছ? যদি ওর কপালে আমার জ্বর-শুষ্ক হাতখানি রাখি, তাহলে ও হয়ত আরামে একবার 'আঃ' বলে, হাতখানি বিশীর্ণ বুকের মধ্যে টেনে নেয়, আমার হাতখানি নিয়ে একটু আদর করে। যদি আমি ওর ঐ পাংশু শুকনো কঠিন ঠোঁট দু'টি চুম্বন করি, তবে ও আমাকে কিছুই বলে না, বিশাল চোখ দু'টি একবার মেলে ফের আবেগে মুদ্রিত করে। ওর বুকটি তাহলে এমন ক্লান্তিতে দোলে না যেন। সেই প্রশান্তা ভাগীরথীর মতো তল্ তল্ থৈ থৈ করে! আমি আর ও দু'জনেই নিরাময় হ্‌ই। বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!

দুয়ারের কাছে এসে আমি নাকি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম। একটা ক্ষণিক সোরগোল উঠেছিল। নার্স আমাকে বাহুতে ক'রে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে। নার্সকে মা বলতে চাইলেও ওর স্নেহসিক্ত বাহুটিকে কঙ্কা ব'লে ডাকতে ইচ্ছা করছিল।

শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনে খোকনটার জন্য সমস্ত প্রাণ কাঁদছিল। ওর চুলভরা মাথাটা বোঁচা নাকটা তুলতুলে পা দু'টোর জন্য প্রাণে প্রচণ্ড লালসা জমেছে। ওর সেই সবেফোঁটা যূথিকার কুঁড়ির মতো চারটি দাঁত! ওর উঁচু কপালটা।

বৃষ্টি আর কুয়াসা! কে বলবে ভোর হয়েছে? ঘড়িতে এগারোটা বাজতে না বাজতেই কঙ্কা চ'লে গেল।

ভেবেছিলাম ছেলেটি বুঝি খুব অস্থির হ'য়ে পড়বে। ওকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। ও যেন কিছুই হারায় নি, বুক ভ'রে সমস্ত জীবন ভ'রে কি যেন ও পেল! ওর প্রাণের সঙ্গে শুধু কস্তুরীমৃগের তুলনা চলে!

বললাম এবার আমার পালা।

ও ও-ঘর থেকে অনেকগুলি জিনিষ নিয়ে এসেছে চাকর দিয়ে। বললে—এসব আপনাকে কঙ্কা দিয়ে গেছে ব্যবহার করতে। ভারি বিশ্রী ঠাণ্ডা আজ, ওভারকোটটা গায়ে দিন।

কঙ্কার ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে দিল। তার ওপরে মমতার দেওয়া র‍্যাপারটা।

বললাম—ও দিয়েছে?

—হ্যাঁ, আপনার কথা ওকে বলেছিলাম। যাবার আগে আমাকে বললে—

তোমাকে যা দিলাম, দিলাম; এগুলি রোগা বন্ধুটিকে দিয়ো। হয়ত তার সঙ্গে ঐখেনে দেখা হ'তে পারে।

ওভারকোট্‌টা দু'হাত দিয়ে বুকের ওপর চেপে ধ'রে বললাম—কন্থা, দূর, পরম, তোমার কাছেই আমি যাচ্ছি; যুগে যুগে মানুষ তোমারই অভিসারে ঘর-ছাড়া হয়েছে।

বললাম—এই স্টোভ গ্লাশ প্যান যাগ টব কাপ কোট – সমস্ত?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বললে— সমস্ত।

কে যেন আমাকে খুঁজছে! আমার নাম ক'রে ওদিকের ঘরে একটা নার্সকে কি জিজ্ঞেস করছে। চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে। চোখে চশমা, মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, গায়ে ছাইরঙের র‍্যাপার। যতীনের গলা না? নার্স এই ঘর দেখিয়ে দিল। বারান্দায় যতীনের জুতোর শব্দ, হাঁ, আমি চিনতে পারছি। সঙ্গে আর কার লঘু পদধ্বনি?

মমতা আমাকে দেখে বুকের ওপর ছোট খুকীর মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ওর চুলগুলির ওপর হাত রাখলাম। ওকে কিন্তু আজ ওর নাম বদলে আর একটা নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে।

অচল টাকা

মা বলত— বয়াটে; বাপ বলত—আল্‌টপ্‌কা।

রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। একজন বললে—কি হে নরু, কলেজ ছেড়ে দিলে যে?

নরেন উত্তর দেয়—পার্সেণ্টেজ থাকে না।

একজন বললে—কোথায় থাক দুপুরে?—তারপর একটা গলির নাম করলে।

নরেন শুধু বলে- হাঁটি।

—কিসের খোঁজে? চাকরির?

আর একজন বললে—প্রিয়ার?

বন্ধুরা হাসে। হাসুক।

বাপ বলত—এত বড় অমানুষ! বুড়ো বাপ-মাকে এক মুঠো যে খাওয়াতে পারে না, সে থাকে কেন বেঁচে? হাড়-হাবাতে!

মা বলত—আঁতুড়ে এক ড্যালা নুন কেন মুখের মধ্যে গুঁজে দিই নি?

বাপের বাত, মা'র পিত্তশূল। সকালবেলা ইস্কুলের একটি ছেলে বাপের কাছে সংস্কৃত পড়তে আসে, কুড়িটে টাকা দেয়। সমস্ত সংসারের সেই আয়।

ছোট ছোট ভাই-বোনগুলি এক বেলা খেতে পায় কি পায় না। তিন বছরে তিনটি মারা পড়েছে।

— কি হে, কোথায় চলেছ ?

—এই, এদিকে।

আর কোনো প্রশ্ন করবার আগেই নরেন ছিটকে পড়ে—অন্য দিকে। পকেটে যদি ভুলক্রমে একটা পয়সা থাকে, অনেকগুলি বিড়ি কেনে। কোনো বন্ধুর কাছে হাত পেতে কালে-ভদ্রে যদি দশটা টাকা ধার পায়, তক্ষুণি সিল্কের পাঞ্জাবির অর্ডার দেয়, রেষ্টুরেণ্টে পেট পুরে খায়--কোনো বন্ধু জুটে গেলে খাওয়ায়ও। সিগারেটের টিন, সিল্কের রুমাল, এসেন্সের শিশি পর্য্যন্ত। তারপর আবার চলা সুরু হয় খালি পেটে—খালি পকেটে। বেহালা থেকে বাগবাজার—বেলেঘাটা থেকে শিবপুর।

রাত বারোটায় বাড়ী ফিরে কোনো-কোনোদিন চেঁচায় ভাত কৈ ?

মা হাঁকে · ভাত নেই।

বাপ মুখ খিঁচিয়ে ওঠে পাশের ঘর থেকে—গিলবার বেলায় তাগিদ আছে। ছুঁচো কোথাকার, বেরো বেরো, আস্তাকুঁড়···

ছেলে কই আর বেরোয় ? কলতলা থেকে হাত মুখ ধুয়ে সর্বশেষ বিড়িটা ধরিয়ে শুয়ে পড়ে। যতক্ষণ বিড়িটা জ্বলে, স্বপ্ন দেখে ;—জেগে জেগেই।

চাটায়ে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন—

যেন প্রকাণ্ড ভোজ দিচ্ছে ও। কাতারে কাতারে ভিখিরির দল ব'সে গেছে রাস্তার কিনারে। ও নিজেই যেন পরিবেষণ করছে—পোলাও, মাংস, কত কি! যে যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে কাপড়, নগদ টাকা, বৌ'র জন্যে বাজু খাড়ু—কেউ কেউবা জুতো জামা এষ্টকিং পর্য্যন্ত।

কিম্বা প্রকাণ্ড একটা হাসপাতাল। দলে দলে লোক এসে ওর কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে নিচ্ছে। যে খাচ্ছে সে-ই সেরে উঠছে। দেশে আর রোগা লোক নেই— সব জোয়ান, ইয়া বুকের পাটা, খিল খিল ক'রে হাসে সবাই। ঘোড়ার মতো মজবুত।

ওর বাপ বাতে পঙ্গু নয় আর, চমৎকার যুবা পুরুষ। উদার, অমায়িক। মা বিদুষী সুন্দরী—কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী। ছোট ছোট ভাইবোনগুলি যেন শরতের শেফালিকা! খোলার ঘর নয় প্রকাণ্ড ইমারৎ। গাড়ী-বারান্দায় মিনার্ভা।

আরো অনেক কথা ভাববার আগেই বিড়িটা নিবে যায়। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে।

নিয়মের ব্যতিক্রম বৈ কি! সন্ধ্যায় সময় বাড়ী ফেরা—নরেনের কুষ্ঠিতে লেখেনি। তবু সে-দিন এল।

বাপ বললেন—ঐ ঘরে যা, জুতো জামা বদলে নে।

ছেলে অবাক হ'য়ে তাকাল। বাপ কি বলে?

পাশের ঘরে এসে দেখে মা মেঝের ওপর আলপনা কাটছেন। এক কোণে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ীর নতুন বৌ-টি। গলা পর্যন্ত ঘোমটা নয় কিন্তু আজ। যেন অল্প একটু হাসছে। নরেন চোখ দু'টো একবার কচলে নিলে—স্বপ্ন দেখছে বুঝি!

মা বললেন—আলনার ওপর থেকে ঐ গরদের কাপড়টা পর নরু। কাপড়টা এগিয়ে দাও ত' মা, রাণু!

মেয়েটির নাম রাণু তাহলে! নরেন ভাবত—নীলিমা বুঝি! আশ্বিনের নির্মেঘ নীলাভার মোহ তার দুই চোখে।

রাণু কাপড়টা নরেনের হাতে দিলে। চন্দনের বাটি নিয়ে এসে বললে—এস, ফোঁটা এঁকে দিই।

অথচ এই মেয়েটির সঙ্গে যখনি জানলার কাছে দেখা হয়েছে, ভীত কুণ্ঠিত নীল চাহনিটির ওপর সলজ্জ ঘোমটাটি টেনে আত্মরক্ষা করেছে। জানলাটা বন্ধও ক'রে দিয়েছে কত দিন!

নরেন বললে—এর মানে?

বৌটিই জবাব দিলে—আমি কি জানি?

তারপর মুচকে একটু হাসলেও।

মা বললেন—তোর আজকে বিয়ে…

বাপের কাছে গিয়ে ছেলে শুধোল—এ সব কি?

বাপ বললেন—তোমার আজ শুভবিবাহ বাবা, তৈরি হ'য়ে নাও চট ক'রে…

নরেন শুধু বলতে পারল—কক্ষণো না।

জীবনে এই তার প্রথম প্রতিবাদ। অস্ফুট, অকারণ!

বাপের পাশে ভুঁড়িওয়ালা এক মাড়োয়ারী ব'সে। তাকে দেখিয়ে বাপ বললেন—দু'হাজার টাকার পাওনাদার। শোধবার আজ শেষ দিন। নইলে, নইলে কি মিশির-জি?

মিশির-জি হাসলে। বললে—নহি তো রাস্তামে নিকালনা।

লোকটার হাসি কি নিষ্ঠুর!

বৌটি নরেনের কপালে চন্দনের ফোঁটা কাটলে। নরেন যেন তার বুকের দুরু দুরু পর্য্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল।

বৌটি পরে বললে—এই মালাটা পর। পরতে হয়।

একটা গোড়ের মালা নরেনের গলায় দিতে চাইল।

নরেন সেটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে। হয়ত বৌটিরই কণ্ঠতল লক্ষ্য ক'রে।

পায়ে না হেঁটে এই প্রথম বোধ হয় ওর গাড়ী চড়া। বরযাত্রী মিশির-জি আর বৌটির ছোট একটি দেওর। আর বুড়ো বাপ।

মা উলু দিলে। বৌটি শাঁখ বাজালে।

নরেন মোটরে হেলান দিয়ে ব'সে ভাবে—'মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে!' নামটি হয়ত বা নীলিমা। হয়ত বা রাণুই। অন্তরলক্ষ্মী! চারিদিকে যেন হাসির দেয়ালি জ্বলে উঠেছে।

আকাশের তারাগুলির পানে চেয়ে চেয়ে নরেন স্বপ্ন দেখে।

বিয়ের সভায় হাজার টাকার পুঁটলিটা বাপ মিশির-জির হ'তে তুলে দিলে। আর একটি পুঁটলি নিয়ে নরেন বাসর করতে এল।

পুঁটলিটি সমস্ত রাত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে। মাকে ছাড়া আর কারু পাশে শুতে শেখেনি। নরেন গা-টা যদি একটু ছোঁয়, আঁৎকে ওঠে।

নরেন জিজ্ঞেস করে—তোমার নাম?

মেয়েটি বালিশটায় মুখ গুঁজে খালি কাঁপে।

বাতির ঝালরগুলির পানে চেয়ে চেয়ে নরেন ভাবে—পৃথিবীর আজ শুভরাত্রি। সমস্ত কাঙাল বিরহী যুগ-যুগ দীর্ঘ তপস্যার পর তাদের একাকিনী প্রিয়াকে শয্যা-সঙ্গিনী ক'রে পেল—একান্ত, সম্পূর্ণ ক'রে। সেই সে—মূর্তিতে ধরা দিয়েছে আজ।

শুভরাত্রির দিন মিশির-জি আবার এল। এবার মেয়েটির গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নিলে।

বাপ বলে—পা টিপে দে ত' বুড়ি।

মা বলে—আর হেঁসেল করতে পারিনে। হাঁড়ি ঠেল গে যাও।

দু' বেলা হাঁড়ি চড়েও না।'

ছোট ছোট ভাই বোনগুলি ডাকে—কেলো বৌদি। মা আবার মাঝে মাঝে শুধরে দেয়—চামচিকে।

বছর ঘুরে যায়।

নরেনের কাছে সে নীলিমাই। মা পর্যন্ত ঠাট্টা করে নীলি না কেরোসিনের কালি!—তবু নীলিমাই সে।

বলে—ওদের বাড়ীর বৌর গলায় সোনার দানা। আমার একটা গড়িয়ে দাও না।

আবার বলে—কোথায় থাক সারাদিন? আমাকে একদিন বেড়াতে নিয়ে যাও না—ইডেন গার্ডেন।

নরেনের জবাব দেবার সময় হয় না। বেরিয়ে যায়।

বৌ বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বলে—হতচ্ছাড়া।

বছর ঘুরে যায়। একটি ছেলে হয়েছে।

নরেন ভাবে—হয়ত বুদ্ধ, হয়ত বা নেপোলিয়া।

বৌ বলে—ছেলেটাকে বার্লি কিনে দেবার পর্য্যন্ত পয়সা জোটে না?

নরেন অন্যমনস্কের মতো পকেট হাতড়ায়। তারপর ছেলেটার মুখের দিকে তাকায়। ফের জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

বন্ধু একজন লিখিয়ে -নাম করেছে কিন্তু বেজায় গরীব।

বললে—তোমার হাত আছে নরু, বই লেখ। আমি বিক্রী ক'রে দেব।

—কি লিখব?

—এই তোমারই কথা—উপন্যাসে। অনেক পাবলিশরের সঙ্গেই জানা আছে ত'—একখানে পুশ্‌ করতে পারবই।

নরেন কাগজ কলম নিয়ে বসল। রাতে আর ঘুমোয় না। তেল ফুরিয়ে গেলে গ্যাসের তলায় এসে বসে।

বৌ বলে—কাকে লেখ চিঠি? আর কাউকে?

নরেন গ্যাসের তলায় ব'সে কী-ই বা না ভাবে? সেক্সপীয়র থেকে সুরু ক'রে বার্ণাড্‌ শ'। টলষ্টয়! বিয়র্ণসন্‌। কখনো কখনো বা আনাতোল্‌ ফ্রাঁস—নোবেল প্রাইজ—রুষিয়ার দুর্ভিক্ষ। কখনো কখনো বা বিশ্বভারতী।

বন্ধু এসে বললে—তোমার বই খুব এপ্রিসিয়েটেড্‌ হয়েছে। ওরা কিন্তু সমস্ত স্বত্বই কিনে নিতে চায়।

—বেশ, বেশ তা নিক্‌। কত দেবে?

বন্ধু একটা অঙ্ক বললে। পরে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—ছাপা কাল-পর্শু তক সুরু করে দেবে। এবার তোমার নাগাল কে পায়? কাল আমি আসব।

নরেন ভাবে, বাংলাদেশ নয়—এটা আমেরিকা। প্রতি মিনিটে হাজার বই কাটছে। সিনেমা হচ্ছে ওর বইয়ের। ব্রডকাষ্টিং পর্য্যন্ত।

বৌকে বলে—সোনার দানা ত' ছার্‌! 'কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে'।

বৌ বলে - ভারি মশা। ছেলেটার সারা গায়ে যেন বিছুটি লাগিয়েছে

তারপর মনে মনে বলে - জানোয়ার!

প্রকাশকের কাছে হাত পাতলে—টাকাটা?

প্রকাশক কপালের ওপর থেকে চশমাটা নাকের ওপর নামিয়ে তেরছা চোখে চেয়ে বললে—টাকা? সে ত' আপনার বন্ধু শৈলেনবাবু নিয়ে গেছেন।

—নিয়ে গেছে?

কথা যেন নরেনের গলা চিরে বেরুল।

—আপনি তাঁকে একটা বণ্ড্ সই ক'রে দিয়েছেন—দেখালেন। তাতে বই বিক্রির সমস্ত টাকাই ওঁর প্রাপ্য।

—ও! হ্যাঁ—তাকে লিখে দিয়েছিলাম বটে।

নরেনের সমস্ত রক্ত যেন কালিয়ে এল। পরে অস্ফুটস্বরে বললে—বেচারা ভারি গরীব—আমারো চেয়ে…

প্রকাশক বসতে বললে। নরেন বলে - না, যাই।

প্রকাশক আপন মনে খানিকক্ষণ বইটার প্রশংসা করে। তা-ই নরেন দাঁড়িয়ে একটু শোনে। ভাবে—ছাই অর্থমূল্য। বেরোক ত' বইটা।

পরে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্ন দেখে—মেঘদূত থেকে গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত।

ক্যানিং স্ট্রীটের একটা বাঁকে রংয়ের দোকান—বড় বাবু হিসেব-পত্র রাখবার জন্ত কেরাণী চান।

বন্ধু শৈলেনই অবশ্যি খবরটা দিলে যা হোক!

বড় বাবু বললেন—বেশ, অনেস্ট যদি হয়, তাহলেই চলবে। তুমি গ্যারাণ্টি শৈলেন!

নরেন ফিসফিসিয়ে বন্ধুকে জিগ্‌গেস করলে – কত মাইনে?

—ত্রিশ। গোড়ায়ই ব্যস্ত হ'লে চলে না। দোকানটা ফাঁপুক।

—না, না, বেশ—ত্রিশ টাকাই ক'জন কামায়?

এই দ্বিতীয় দিন নরেনের সন্ধ্যার পরেই বাড়ী ফেরা। মাকে গিয়ে বললে—মা, চাকরি পেলাম। বাপকে গিয়ে বললে—বাবা, চাকরি পেয়েছি।

বাপ শুয়ে শুয়ে কালীর গান ধরে · রামপ্রসাদী। মা হরির লুট মানত করে।

রান্না সেদিন স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে হাঁড়ি চড়ে। ঝগড়া ঝাঁটি চেঁচামেচি আর নেই। দোরের গোড়ায় মাটির বাতিটি পর্য্যন্ত যেন হাসে।

ঘরে এসে বৌকে আদর করতে ইচ্ছা হয় একটু। ঠোঁট দুটো একটু টেপে, চিবুকে একটি চুমুও খায়। ছেলেটাকে একটু কোলে নেয়—কত নাম ধ'রে ডাকে—বড় বড় নাম। গ্যারিব্যাল্ডি থেকে মুসোলিনি।

বৌ বললে—এবার আমাকে সোনার দানা দিতেই হবে। আর খোকার জন্য উলের একটা ফ্রক।

নরেন শুয়ে শুয়ে ফের স্বপ্ন দেখে—তিনখানি করকরে দশ টাকার নোট। প্রত্যেকটি আঁকিবুকি পর্য্যন্ত তার চোখে ভাসে। যেন গত জীবনের ফেলে-আসা ভুলে-যাওয়া তিনখানি প্রিয় মুখ। যেন তিনটি অক্ষরে কার নাম!

সারা রাত আর ঘুম আসে না।

মোড় ফিরতেই রংয়ের দোকানের বড় বাবুর সঙ্গে দেখা—ট্র্যামে উঠছেন। তাকে দেখেও যেন দেখলেন না। নরেনই শেষে সম্বর্দ্ধনা করলে।

—কাল থেকেই তাহলে জয়েন করব? দশটায় যেতে হবে? আমি দু' ঘণ্টা আগেই যাব 'খন। ওভার-টাইম্ চাই না তার জন্যে। দোকানটা জেঁকে উঠুক।

বড় বাবু প্রথম চিনতে পারেন না। পরে বললেন—ও! হ্যাঁ—অন্য লোক বহাল হ'য়ে গেছে। শৈলেনের ভগ্নীপতি—পঁচিশ টাকা মাইনে।

নরেন ঢোঁক গিলে বললে—আমাকে না হয় কুড়িটে টাকাই দেবেন। টাইমও বাড়িয়ে নিন।

বড় বাবু হেসে বললেন—তা কি হয়? সে যে আমারো ভায়রা……

নরেন ফের পথ ভাঙে—বারাকপুরের পথ।

বাড়ী এসে বৌকে বলে—আপিসের বেজায় খাটুনি।

দশটা বাজতে না বাজতেই বাপ হাঁকে—শিগ্‌গির নরুর খাবার জায়গা করে দাও বৌমা। আপিসের বেলা হ'য়ে যাবে। এদের একটুও যদি হুঁস থাকে—

মা আদর ক'রে ভাত বাড়ে—পরিপাটি ক'রে গুছোয়। আসন পাতে, সমুখের মাটিটা জল দিয়ে একটু লেপেও। বলে—তাড়াতাড়ি করিসনে, আস্তে আস্তে খা। এখনো ঢের সময় আছে।

বৌ ছোট বোনটির হাতে একটা পাখা গুঁজে দেয়। নিজের লজ্জা করে হয়ত। ছোট বোনটি হাওয়া করে।

বেরিয়ে যাবার সময় নরেনের হাতে একটা পান দিয়ে বৌ অল্প একটুখানি হাসে। রোজই বলে—সকাল সকাল ফিরো। জিরোবে।

বাড়ী ফিরে এলে বৌ আঁচলে নরেনের ঘাম মুছে দেয়। পা টিপে দিতে দিতে বলে—আপিস বুঝি অনেক দূরের রাস্তা?

পরে ফের বলে—মাইনে পেলেই সোনার দানা না হোক, একটা নাকছাবি অন্ততঃ। শিশু নেপোলিয়া আবোলতাবোল ক'রে বাপকে তার আনন্দ জানাতে চায়।

দিন যায়। বৌ খালি জিজ্ঞেস করে—মাস কবে ফুরোবে? মাইনে পয়লা তারিখেই পাবে তো? নাকছাবি না হয়, খোকার জন্য একটা ফ্রক এনো কিন্তু।

তার পর খোকাকে বুকের ওপর ফেলে আদর করতে থাকে।

মাস ফুরোতে আর কত দিনই বা বাকি? নরেন দিশেহারা হ'য়ে হাঁটে। মাঝে মাঝে পথের ওপর চোখ মেলে চলে যদি একটা নোট কুড়িয়ে পায়!

খালি মনে পড়ে বাপের পাঁজর-বের-করা জীর্ণ বুক—মা'র গালভাঙা রুক্ষ মুখের চেহারা। ছোট ভাই বোনগুলির ব্যাজার মুখ—সারা গায়ে ধুলো, কোমরে ছেঁড়া কদর্য ন্যাকড়ার টুকরো। কাল রাত থেকে খোকাটার জ্বর। বৌর গায়ে একটা সেমিজ নেই।

নরেন ভাবে, আর পথ চলে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলে মাঝে মাঝে ফষ্টিইয়াকিও করতে হয়। কেউ সঙ্গে নিলে বায়স্কোপে গিয়েও ঢোকে।

কাল মাসের পয়লা। ছোট মাটির ঘরে তাই উৎসব জমেছে। বিশেষ কিছুই নয়—একটু ভালো খাওয়া হবে—খিচুড়ি। ছোট ভাই বোনগুলি বিকেল থেকেই রান্না-ঘরের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। পরস্পরের মধ্যে কত আলোচনা যে হচ্ছে, তার অন্ত নেই। কেউ বলে—আমি খাব এক সের। আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বলে—বইয়ে লেখা আছে সাড়ে তিন ছটাকের বেশি ধরেই না পেটে। এ নিয়ে তারপর তুমুল তর্ক চলে।

রাত্রে বৌ উপদেশ দিলে—মাইনেটা বুক পকেটে রেখো না কিন্তু। পেয়েই কোঁচার খুঁটে বেঁধে রেখো। যে গাঁটকাটার মুলুক।

ভোর হয়। বাপের মুখ উজ্জ্বল, মার মুখে অপূর্ব কান্তি। মা বললে—ফিরবার মুখে এক মণ চাল কিনে নিয়ে আসিস একেবারে।

বাপ বললে—বাজারটাও ঘুরে দেখিস। যদি ইলিশ মাছ পাস।

বৌ বললে—একটু তাড়াতাড়ি যাও। হয়ত দোকান খুলেই মাইনে বিলি হবে আজ। কে জানে?

নরেন পথে বেরিয়ে পড়ে—উদাসীন, রুক্ষ পথ। জুতোর তলা ক্ষয়ে গেছে লক্ষ্য নেই; কোথায় যে যাবে, তাও নয়। তবু যেতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ঘরের ভেতর থেকে কে ডাকল—আরে নরু যে! অনেক দিন বাদে!

নরেন তাকিয়ে দেখলে।—বন্ধু! শৈলেন নয়। এক মুখ হাসি নিয়ে ঘরে এসে

ইস্কুলের সহপাঠী। এখন সওদাগরি আপিসের বড় চাকুরে।

ছেলে বেলার আলাপ জমে গেল। বাংলার মাষ্টার থেকে গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা। নধর দরাজ মানুষটি—বুক দুলিয়ে দুলিয়ে হাসে। নরেন চেয়ে থাকে।

ঘরের দেয়ালে দা ভিঞ্চি থেকে সুরু করে অবনীন্দ্রনাথের ছবি টাঙানো।

বন্ধু বললে—তুমি একটু বোস ভাই, আমি এই আসছি।

টেবিলের ওপর ড্রয়ারের চাবিটা ফেলে গেছে। নরেন চার দিক একবার চেয়ে নিয়ে আন্দাজে একটা চাবি গুঁজে দিলে। মোচড় দিতেই দরজাটা আলগা হ'য়ে এল।

থাকে-থাকে নোটের তাড়া সাজানো।—

পর্দা সরিয়ে বন্ধু ঘরে ঢুকে বললে—এ কী, নরু?

নরেন এক মুহূর্তে ঘেমে উঠল। সহজ সুরে বলতে চেষ্টা করল—আমাকে কয়েকটা টাকা ধার দেবে?

—ধার? এমনি ক'রেই ধার চাইতে হয় নাকি?

পরে এগিয়ে এসে বললে—কত?

নরেনের গলা দিয়ে খালি বেরোল—দশ।

—এই নাও। ব'লে একটা নোট ছুঁড়ে দিলে।

তারপর চেষ্টা ক'রেও আলাপ আর জমল না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে নরেন নিশ্বাস নিলে। ভাবলে—আরো দু'খানা চাইলে পারতাম।

একটা রেষ্টুরাণ্টে ঢুকে পড়ল। দুজন বন্ধু জুটে গেল। বললে—ফাউল খাওয়াও, নরু।

নরেন অর্ডার দিলে।

বাড়ী ফিরতেই সব হুড়্মুড়্ ক'রে এসে ঘিরে দাঁড়াল। বাপ বললে—মাইনে পেলি ?

—কাল দেবে।

মা বললে—তাহলে আজ রাতে উনুন আর জলবে না ?

ঘরে এলে বৌ বললে—খোকার ফ্রক কৈ ? নাকছাবি ?

—পা-টা টিপে দাও একটু। গিঁটে গিঁটে ব্যথা ধরেছে।

—কক্ষনো না।

বৌ রাগ ক'রে পাশ ফেরে।

নরেনের ঘুম আসে না। তেমনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে—

ঘরের দেয়ালে দা ভিঞ্চির ছবি। মেঝেয় পার্শি গালিচা পাতা। ড্রয়ারের মধ্যে থাকে-থাকে নোট সাজানো।

তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে হয়ত।

টাকাটা সিসের ;—বাজে, কিন্তু চলে না।

দুই বার রাজা

বাজ-পোড়া ঠুঁটো তালগাছটা উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে, যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশকে ঠাট্টা করছে। অথচ ম্রিয়মাণ, বিষণ্ণ।

বুকের মধ্যে যেন একটা হাপর আছে, উঁচু তাকিয়াটায় ঘাড় গুঁজে উবু হ'য়ে শুয়ে অমর হাঁপানির টান টানছে। ডাক্তার খানিকটা ন্যাকড়ায় কি একটা ঝাঁঝালো ওষুধ ঢেলে দিয়ে ব'লে গিয়েছিল শুঁকতে। তাতে টান কমা দূরে থাক, রগ দুটো বাগ না মেনে একসঙ্গে টন্‌টন্ ক'রে উঠেছে। বন্ধু সরোজ কতগুলি দড়ি পাকিয়ে মাথার চারপাশটা সজোরে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল। এখন ভীষণ লাগছে তাতে। কিন্তু দড়িগুলি খুলে ফেলতে পর্য্যন্ত জোরে কুলোয় না।

বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগাতে ইচ্ছে করছে না। পরিক্লান্ত ঘুমন্ত করুণ মুখখানি !

প্যাকাটির মতো লিক্‌লিকে দেহ—একটা টিকটিকি যেন। এই একটুখানি টিঁকে থাকার বিরুদ্ধে সমস্তটা দেহ ষড়যন্ত্র করছে! তার কী আর্তনাদ! যেন একটা ভূমিকম্প, বা বন্যা!

মা'র বিষাদস্নিগ্ধ মুখখানির পানে চেয়ে অমরের মনে পড়ল, হঠাৎ কবে কার মুখে গান শুনেছিল—'জানি গো দিন যাবে, এদিন যাবে'; শেলিও এ কথা বিশ্বাস ক'রে সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল—তারপর একশ' বছর এক এক ক'রে খসেছে। দিন আর এল না। বসন্ত যদি এলই—মহামারী নিয়ে এল, নিয়ে এল চৈত্রের চোখ ভ'রে রৌদ্রের রোদন!

'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে'—। সেদিনো পল্লবমর্মরে কোটি কোটি ক্রন্দন অনুরণিত হবে। প্লেটোও ত কত আগে স্বপ্ন দেখেছিল, বার্ণার্ড শ'ও দেখেছে। 'সে কবে গো কবে?'

অমরের হঠাৎ ইচ্ছে করল একটা কবিতা লিখতে—সমস্ত বিশ্বাসকে বিদ্রূপ ক'রে। ভুয়ো ভগবান আর ভুয়ো ভালবাসা। যেমন ভুয়ো ভূত!—মনে পড়ে বায়রণ, মনে পড়ে শোপেনহাওয়ার।

যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হ'য়ে অমর বাইরে বেরিয়ে এল, উঠোনে। সেই ঠুঁটো তাল-গাছটার গুঁড়ি ধ'রে হাঁপাতে লাগল। দু'জনে যেন মিতা; একসঙ্গে আকাশের তারাকে মুখ ভেঙচে ভয় দেখাচ্ছে।

সমস্ত আকাশে কিন্তু নিস্তরঙ্গ ঔদাসীন্য।

ঝড়ের পর যেমন অরণ্য।—টানটা পড়েছে।

মা বললেন নাই-বা গেলি কলেজে আজ। একটা ছাতাও ত নেই। যে রোদ—

অমর বললে হাজিরা থাকবে না। তা ছাড়া মাইনে না দেওয়ার দরুণ কি দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা দেখে আসি।

অবস্থা আর এর বেশি কি সঙীন হবে? দু' মাসের মাইনে দেবার শেষ তারিখ উৎরে গেছে দেখে নাম লাল কালিতে কেটে দিয়েছে।

সরোজ বললে—তুমি ফ্রি না?

দু' হাত দিয়ে বুকের ঘাম মুছে অমর বললে—তাহলে সুপারিশ লাগে—ঐ যে মোড়ের তেতলা বাড়ীর বারান্দায় ব'সে যিনি মোটা চুরুট টানেন তাঁর। তিনি আর প্রিন্সিপ্যাল ত আমার মার এই ছেঁড়া কাপড়, বন্ধক-দেওয়া দু-খানি সোনার বালা, এই ঝুল-ঝোলা নোংরা দাঁত-বের-করা খোলার ঘরটা দেখতে আসেন নি। আবৃত্তি একটা করেছিলাম বটে, সুপারিশ ছিল না ব'লে বাতিল হ'য়ে গেল। সোজা হ'য়ে আজো যেন দারিদ্র্য তার সত্য পরিচয় দিতে শেখেনি। আর মহীনকে চেন ত?

—বাইকে যে আসে—ফ্রি। বাড়ী থেকে মাইনে বাবদ যা টাকা আসে, তা দিয়ে 'পিকাডিলি' টিন কেনে, সেলুনে ব'সে দাড়ি কামায়।

মা হতাশ হ'য়ে বললে—উপায় কি হবে তবে?

যেন হঠাৎ একটা বাড়ীর ভিৎ খ'সে গেল; কাদায় ব'সে গেল চলন্ত গাড়ীর চাকা!

অমর বললে—ভিজিট পাবে না জেনে ডাক্তার যখন ন্যাকড়ায় ভোঁটকা-গন্ধওলা খানিকটা নাইট্রিক য়্যাসিডের মতো কি ফেলে ব'লে গিয়েছিল এ রোগে কেউ মরে না, তখন আশ্বস্ত হ'য়ে আমাকে তোমার বুকে নিয়ে কি বলেছিলে? বলেছিলে ঠাকুর তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, এইটুকুই শুধু চাই। বেশ ত আবার কি! কাল যদি ফের টান ওঠে, তোমার এ ভুতুড়ে হাতুড়ে ডাক্তার না ডাকলেও বেঁচে উঠব।

পরে ঢোক গিলে ফের বললে—তোমার সেই ঠাকুর উড়ে ঠাকুরদের মতোই বাজে রাঁধুনে মা। হয় খালি ঝাল, নয় খালি নুন। পরিবেশন করতে পর্য্যন্ত ভালো শেখেনি।

জামাটা খুলে ফেললে। ছাব্বিশ ইঞ্চি বুক, কঞ্চির মতো হাত পা, পিঠটা কুঁজো, মাথার চুলে চিরুনি পড়ে না—তবু মনে হয় যেন একটা উদ্ধত তর্জনী।

মা পাখা ক'রে ঘামটা মেরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। যেমন ক'রে পুরুত তার নারায়ণ-শিলা গঙ্গাজলে ধোয়;—ততখানি যত্নে।

সরোজ বললে—তা কি হয়? সামান্য ক'টা টাকার জন্য কেরিয়ার মাটি করার কোনো মানে নেই। আমি দেব টাকা, মাইনে দিয়ে দিয়ো ফাইনশুদ্ধ।

মা'র বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অমর বললে—কিছু লাভ নেই তাতে। তা ছাড়া পার্সেণ্টেজও নেই। হপ্তায় দু' বার ক'রে টান ওঠে। বানান ভুল নিয়ে ঘোষ-মাষ্টারের সঙ্গে তর্ক করা অবধি প্রক্সিও চলে না আর, খালি আমাকে জব্দ করার চেষ্টা। 'গোষ্ট'কে যদি অনবরত 'ঘোষ্ট' ব'লে চলে একঘণ্টা ধ'রে—তা আর যার সহ্য হোক, আমার হয় না, ভাই। বিনয়সহকারে প্রতিবাদ করলাম, মাষ্টার ত রেগেই লাল। প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে নালিশ—আমি নাকি অপমান করেছি। আমি বললাম —উনি 'গোষ্ট'কে বলেন 'ঘোষ্ট', 'পিয়ার্স'কে বলেন 'পায়ার্স'—তাই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম ও উচ্চারণগুলি কি ঠিক? উনি ভাবলেন, ওঁর বাড়ী বরিশাল ব'লেই বুঝি ঠাট্টা করছি আমি।

সরোজ বললে—প্রিন্সিপ্যাল কি বললেন?

—বললেন, প্রোফেসার তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। তাঁকে করেক্ট করবার তোমার রাইট নেই। ফের এমন বেয়াদবি কর ত ফাইন করব। অদ্ভুত! তা ছাড়া, আমি বিরক্ত হ'য়ে গেছি, সরোজ।

একটু থেমে বললে—আমি কী বিরক্ত হ'য়ে যে গেছি, তুমি তা ভাবতেও পারবে না। আমাদের যিনি পোয়েট্রি পড়ান, তিনি আবার উকিল। চাপকান প'রে ছুটতে ছুটতে হাজির, এক গাদা পানে মুখটা ঠাসা—কীট্‌সের 'নাইটিঙ্গল' পড়াবেন। ডাক্তার যেমন ছুরি দিয়ে মড়া কাটে ভাই, তেমনি ক'রে কবিতাটি দ'লে পিষে দুমড়ে চটকে একেবারে কাদাচিংড়ি ক'রে ছাড়লেন। ওঁর ব্যাখ্যা শুনে এত ব্যথা লাগল, যে মনে হ'ল বেচারা কীট্‌স যদি ছাত্র হ'য়ে শুনত ওঁর পড়া, ত বেঞ্চিতে কপাল ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করত। কী সে চেঁচানি, পানের ছিবড়ে ছিটকে পড়ছে—ভয়ে নাইটিঙ্গেলের প্রাণ খ হ'য়ে গেছে। 'রুথ' এর কথা যেখানে আছে, সেখানটায় এসে ওঁর কী বিপুল হাত ছোঁড়া – ও জায়গাটা মুখস্ত ক'রে এসেছিল নিশ্চয়ই। 'রুথ'-এর গল্প কি, বাইবেলের সঙ্গে কোথায় তার অমিল এই নিয়ে তুমুল তর্ক, তুমুল আস্ফালন। 'খুব সোজা' ব'লে বই মুড়ে কৌটোর থেকে গোটা চার পান মুখে পুরে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন আলপাকার পাল তুলে। বোধ হয় অনেক দিন বাদে একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলেন।—তখনো ভালো ছাত্রেরা বইয়ের ধারে-ধারে মাষ্টারের শব্দার্থ টুকে রাখছে ও পরস্পরে রুথের শ্বশুরবাড়ী নিয়ে পরামর্শ করছে। ভাই সরোজ, আর জ্যোৎস্নারাতে কীট্‌স পড়া চলবে না কোনোদিন।

পরে মাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি ভাবছ মা যে তোমার ছেলে বি-এ পাশ করতে পারল না ব'লেই ব'য়ে গেল ? নয় মা নয়। জান ?—যারা খুব বড় হয়েছে তাদের শব্দের অর্থ জানতে মা'র গয়না বন্ধক দিয়ে কলেজে প'ড়তে আসতে হয়নি। এ দিন যাবে, এ কথা ত তুমিই বেশি বিশ্বাস কর। দিন যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি তারপর কালো ঝড়ো রাত্রিই আসে, তাতেও ভড়কাবার কিছু নেই। আমাকে জন্ম থেকে এমন পঙ্গু পক্ষাহত ক'রে বানিয়েছেন ব'লে জবাবদিহি দিতে হবে বিধাতাকেই।

মা মিছরির জল ছেঁকে দুই কাচের গ্লাশে ক'রে দুই বন্ধুকে ভাগ ক'রে দিলেন। বললেন—আর একটা গয়নাও ত নেই—

—খবরদার মা। আমার কলেজে পড়া এইখেনে খতম। আমি এই ফাটা ফুসফুস নিয়েই লড়ব। তুমি আমার মা, আর ঐ তালগাছটা আমার ছেলেবেলার বন্ধু—কতকালের চেনা।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—কি করবে তাহলে এখন ?

– কবিতা লিখব। তুমি হেসো না, সরোজ। কথাটা ভারি বেতালা শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু আমি সত্যিই লিখব এবার। আমার সমস্ত প্রাণ চেঁচিয়ে উঠতে চাইছে।

সরোজ হেসে বললে—তাহলে আর কবিতা হবে না।

—না হোক। সোজা সত্য কথা বুক ঠুকে আমি খুলে ব'লে দিতে চাই। সৌন্দর্য্যের আবরণ দিয়ে কুৎসিত নগ্নতাকে ঢেকে রাখার জন্যেই না তোমরা ভগবান বানিয়েছ! যে কথা বায়রণ, সুইনবার্ণ বা হুইটম্যান পর্য্যন্ত ভাবতে পারেনি –

—তেমন আবার কি কথা আছে?

—দেখো। যে কথা ভেবেছিল খালি চ্যাটারটন।

সরোজ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সহসা পাংশু হ'য়ে বললে—খবরদার, অমর! ও রকম মারাত্মক ঠাট্টা ক'রো না।

অমর উদাসীনের মতো বললে—মারাত্মক ঠাট্টাই বটে। জান, বিধাতা যদি তোমাদের প্রকাণ্ড কবি হন, ত এই পৃথিবীটা তাঁর প্রকাণ্ড ছন্দপতন।

কিন্তু না, সত্যি সত্যিই সে রাতে অমর কালি কলম আর কাগজ নিয়ে বসল কবিতা লিখতে। মেটে মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে মা ঘুমিয়ে পড়েছে, ম্লান বাতির আলোয় সেই মুখখানির যেন তুলনা নেই। ঐ মা'র মুখখানি নিয়েই একটা কবিতা-লেখা যায় হয়ত!

সলতে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে—কিন্তু একটা লাইনও কলমের মুখে উঁকি মারছে না। 'বিট'-এর পুলিশ খানিক আগে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে জুতোর ভারী শব্দ ক'রে চলে গেছে। আবার সেই নিঃশব্দতা—প্রকাশ করতে না পারার ব্যথার মতোই অপরিমেয়।

অমরের মনে হ'ল, ভাষা ভারি দুর্বল, খালি ভেঙ্গে পড়ে। লিখতে চাইছিল - এই জীর্ণ পৃথিবী, এই দানবী সভ্যতা—সব কিছুই প্রকাণ্ড ভুল বিধাতার—এঁচড়ে-পাকা ছেলের ছিবলামি। এঞ্জিন-ড্রাইভার যেমন ভুল পথে গাড়ি চালিয়ে হায় হায় ক'রে ওঠে—তেমনি অকারণে ভুল ক'রে খেলাচ্ছলে এই পৃথিবীটা বানিয়ে ফেলে ভগবান তারায় তারায় চীৎকার ক'রে উঠেছেন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন।

এত বড় যে ব্যবসাদার - সেও দেউলে হ'ল ব'লে। কবে লালবাতি জ্বলবে — প্রলয়ের! তারই কবিতা।

লেখা যায় না। খালি সলতেটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হ'লে দীপ নিবে যায়।

বিকেলের দিকে অমর সরোজের বাড়ী গেল। পাশেই বাড়ী—লাগাও টিনের ঘরে একটা গাড়ী পর্য্যন্ত আছে।

শ্বেতপাথরের মেঝে দুটো দেয়াল প্রায় বইয়ে ভরা—ছবি খান তিন চার, সেক্সপীয়র, শেলি আর বার্ণার্ড শ'র। একটা চেয়ারের ওপর বই গাদা করা—মেঝেতে কাৎ হ'য়ে শুয়ে সরোজ, একজামিনের পড়া পড়ছে। আর ঘরের এক কোণে

ষ্টোভ জ্বালিয়ে তার বোন চায়ের জল গরম করছে আর দাদাকে বকছে সিগারেট খায় ব'লে।

অমরকে ঘরে ঢুকতে দেখে মেয়েটি আরো খানিকটা জল কেটলিতে ঢেলে দিয়ে বললে—যাই বল দাদা, বোহিমিয়াটা আর যাই হোক, আমাদের বহরমপুরের মতোই খানিকটা। নইলে—

সরোজ উঠে পড়ে বললে এস, অমর বসো। তুই লক্ষ্মী দিদি, পরোটা ভেজে দিবি আমাদের? দেখ না চট ক'রে—

বোন চ'লে গেলে সরোজ তাড়াতাড়ি দরজার পরদাটা টেনে দিয়ে শুধোল—এমনিই কি এসেছ, না কোনো কাজ আছে?

অমর সোজা হ'য়ে বললে—আমাকে কয়েকটা টাকা দাও—এই গোটা কুড়ি।

সরোজ হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল - লুসাই, লুসাই ও লুসী!

বোন দু'হাতে ময়দার ড্যালাটা নিয়ে এসে পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে বললে—কি হুকুম মশাইয়ের?

সরোজ বললে— চাবিটা দিয়ে দেরাজ থেকে কুড়িটা টাকা বার ক'রে দে ত শিগ্‌গির।

ঘরে ঢুকে ময়দা চটকাতে-চটকাতে লুসী বললে—কিসের জন্তে শুনি?

—উড়োতে। তুই দে খুলে। ফফরদালালি করিস নে।

দেরাজ খুলতে খুলতে লুসী বললে—দাঁড়াও না। দিচ্ছি এবার। ঠিক মতো হিসাব দিতে না পারলে রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কে চা ক'রে দেয়, দেখব।

ব'লে চ'লে গেল। পর্দাটা খানিক দুলে স্থির হ'ল।

টাকা দিয়ে সরোজ বললে—যদি আবার বিপদে পড় বলতে সঙ্কোচ কোরো না।—

চা খেতে-খেতে অমর ভাবছিল, সংসারে এ একটা কি চমৎকার ব্যাপার! উজ্জল স্বাস্থ্য - স্বচ্ছল অবস্থা—কল্যাণী বোন! নাম তার লুসী!

পেছন থেকে কে অতি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলছিল—একটা নতুন কাগজ বেরিয়েছে, যদি নেন—

সরোজ মুখ ফিরিয়ে দেখলে—অমর। খালি পা, যে ন্যাকড়া দিয়ে কালি-পড়া লণ্ঠন মোছে তেমনি কাপড় পরনে— হাঁপানির টানে ঝরঝরে পাঁজর দুটো ঝেঁকে উঠছে—কথা কইতে পারছে না।

সরোজ তক্ষুনিই কাগজটা নিয়ে দাম দিল, কথা কইল না কোনো। বরঞ্চ তারি লজ্জা করতে লাগল ওরই।

ট্র্যাম চলল। চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে অমর পা পিছলে প'ড়ে যেতেই সবাই রোল ক'রে উঠল। হাঁটুটা চেপে ধ'রে 'কিছু-না' ব'লে অমর কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে কাশতে লাগল। পরে ভিড়ের মধ্যে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। সরোজ নেমে আর খোঁজ পেলে না তার।

ফুস্‌ফুসটা যেন কে চুষে শুষে ফেলেছে।

অমর একটা গাছতলায় দু'টো হাত মাটিতে চেপে টান হ'য়ে ব'সে আকাশের বাতাস নেবার জন্যে গলাটা উঁচু ক'রে ধরেছে। কে যেন ওর টুঁটিটা টিপছে, ভিজা গামছার মতো ফুস্‌ফুসটা চিপে ফেলছে।

কাগজের বাণ্ডিলটার ওপর মাথা রেখে শুতে যেতে দেখে—পাশাপাশি দু'টো বিজ্ঞাপন। একটা এক ছাত্র পড়াবার জন্যে, আরেকটা কোন অরক্ষণীয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। যেমন-কে-তেমন হ'লেই চলে—ঠিক এই কথা লেখা আছে।

টানটা যদি একটু পড়ে বিকেলের দিকে—অমর ভাবছিল—তবে কোথায় গিয়ে আগে আরজি পেশ করবে? টিউশানির খোঁজে, না পাত্রীর?

আগে ভাবত—এক মুঠো ভাত, একখানি কুঁড়ে ঘর, আর একটি নারী। এখন মনে পড়ছে আরও কত কথা। হাঁপানিতে ভুগবে না, ঝড়ে কুঁড়ের চাল উড়ে যাবে না, ভাতে রোগের বীজ থাকবে না, নারীর ঠোঁটে কালকূট থাকবে না। এত! তবে!—

ক্লান্ত কাক ককায়, আর ককায় ও কাশে মাটির ওপর মায়ের ছেলে।

পাঁজরা দুটো খানিক জিরোলে তারপর কষ্টে পথ চলে। চলতে চলতে প্রথম ঠিকানাটাতেই ঠিক ক'রে এল—যেখানে মাষ্টার চায়।

বাড়ীর কর্তা ঘাড় বাঁকিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে শুধোলেন—কদ্দূর পড়া হয়েছে?

অমর বললে—বি-এ পড়ছি।

—কালকে আই-এর সার্টিফিকেটটা নিয়ে এস। দেখা যাবে।

একদিন খুব জোরে হাঁপানি উঠলে মা রাগ ক'রে অমরের গলার সবগুলি মাদুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল, আর অমর রাগ ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিল—ম্যাট্রিক আর আই-এর সার্টিফিকেট দু'টো।

মাদুলিগুলির মধ্যে একটা সোনার ছিল ব'লে মা তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে বাক্সে রেখে দিয়েছিল, অমরও ভালো হ'য়ে এক সময়ে সার্টিফিকেট দু'টোর ছেঁড়া খণ্ডগুলি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিল একটা চৌকো লেফাফায় আঠা দিয়ে সেই সার্টিফিকেট আজ জোড়া দিতে বসল।

কর্তা বহুক্ষণ সার্টিফিকেটটা নেড়ে চেড়ে দেখে জাল নয় প্রতিপন্ন ক'রে বললেন—কিসে ছিঁড়ল ?—

—একটা ছোট্ট দুষ্টু বোন আছে—নাম লুসাই—দুষ্টুমি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে।

কর্তা ঘাড়টা বার চারেক দুলিয়ে বললেন—আচ্ছা বাপু, বানান কর ত থাইসিস।

পরে বললেন - বেশ। বল ত ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কি ? আকবর কত সালে জন্মেছিল ? এখান থেকে কি ক'রে ডিব্রুগড় যেতে হয় ?

অমর বললে —আমি ত পড়াব ইংরিজি আর অঙ্ক। আমাকে এ সব প্রশ্ন কেন করছেন ?

কর্তা খাপ্পা হ'য়ে বললেন—আজকালকার ছেলেগুলো দু-পাতা মুখস্ত ক'রেই পাশ মারে। আমাদের সময় আমরা কত বেশি জানতাম।

কর্তার ছেলে পাশেই ছিল। একটু বেয়াড়া রকমের। বললে—যা যা জানতে তাই বুঝি জিজ্ঞেস করছ, বাবা। মাষ্টারদের যে প্রশ্নটা ভালো ক'রে জানা থাকে, সেইটেই পরীক্ষায় দেয়, আমি বরাবর দেখছি। যেন কাগজ দেখবার সময় অসুবিধায় পড়তে না হয়।

বাপ একটু দমে গিয়ে বললেন—আচ্ছা, একটা ইংরিজি রচনা লেখ ত—দেখি তোমার ইংরিজির কত দৌড়। একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয় ত, টুনু।

অমর বললে— কি লিখবো ? ক পাতা ?

কর্তা বললেন লেখ, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি। একশ' শব্দের বেশি নয়। এ রকমই আসে পরীক্ষায়।

টুনু একটু হেসে বললে—বাবা, যোলো 'থিয়োরেম' থেকে একটা 'এক্সট্রা' দাও না কষতে।

বাপ চটে বললেন যা, ও সব কি দেব ? দেব মানসাঙ্ক।

টুনু জোরে হেসে বললে ওটা বুঝি তুমি জান। না ?

কর্তা রচনার কি বুঝলেন, তিনিই জানেন—তবে দেখলেন হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার। বললেন—বেশ। তবে কি জান, ইতিমধ্যে একজন বহাল হ'য়ে গেছে। নইলে তোমাকেই নিতুম।

টুনু অস্ফুটস্বরে বললে—কিন্তু বাবা, ইনি ভালো, এঁকে আমার—

অমর শুধু বলতে পারলে—এ সব কেন লেখালেন তবে ?

কর্তা বললেন—লেখা ত তোমাদের অভ্যেস হ'য়ে আছে। কালে ত জীবনের পেশাই হবে। বরঞ্চ সাবেক কালের এণ্ট্রান্স পাশ করা বুড়োর কাছে একটা রচনা দেখিয়ে নিয়ে তোমার লাভই হ'ল। একটু প্র্যাক্‌টিস্ হ'ল লেখার। তা ছাড়া রচনার 'সাবজেক্ট' টা ত খুবই ভাল—কি বল? জান হে বাপু, সে-কালের এণ্ট্রান্স তোমাদের এ-কালের পাঁচটা এম্-এর সমান সেটি মনে রেখো।

অমর বললে এবার - উনি কততে পড়াবেন ?

—পনেরো টাকা।

—আমাকে দশটা টাকা দেবেন না হয়। দরকার হয় দু' বেলা এসেই পড়াব দু'ঘণ্টা ক'রে।

টুনু বললে—হ্যাঁ বাবা, এঁকেই—

কর্তা বললেন- বেশ, আসবে কাল। আর শোন, এ ফোর্থ ক্লাশে পড়লে কি হবে, এদের ইংরিজিটা বেশ একটু দাঁত-কামড়ানো। বাড়ী থেকে একটু প'ড়ে আসবে রোজ। আর আমি কাল সকালবেলাই একটা রুটিন ক'রে রাখব—কবে আর কখন কি পড়াতে হবে। বুঝলে ? একটু ঝিমিয়ো কম।

রোজ শেষ রাত্রেই টানটা টেনে আসে। তাই নিয়েই অমর বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি, পাছে আগের ঠিক করা মাষ্টার চেয়ার বেদখল ক'রে নেয়—দশ টাকা থেকে ন টাকা বারো আনায় নেবে।

কেওড়া-কাঠের একটা থুত্থুরো তক্তপোষ—ওপরে একটা চাটাই পর্য্যন্ত নেই। ফাঁকে ফাঁকে ছারপোকাদের বৈঠকখানা বসেছে।

কর্তা একটা জল-চৌকি টেনে নিয়ে কাছে ব'সে বললেন এই রুটিন ক'রে দিয়েছি, দেখে নাও। ঐ'চারঘণ্টা ক'রেই রইল-- সকালে দুই, বিকালে দুই। নইলে ত সেই মাষ্টারকেই রাখতাম—দিব্যি চেহারা, দেখলেই মনে হয় ছেলে মানুষ করতে পারবে। এম-এ পাশ।

পরে বিড়বিড় ক'রে বললেন—এখুনিই এসে পড়বে হয়ত। একটা ভাঁওতা মেরে দিতে হবে।

দরজা ঠেলে ভেতরে যে এল—অমর তাকে দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেল—মহীন। বোধ হয় বেচারা অনেকদিন আউটরাম ঘাটে গিয়ে চা খেতে পারেনি, তাই বুঝি এ চাকরিটা বাগাতে চেয়েছিল।

অমর প্রশ্ন করলে—তুই কবে এম-এ পাশ করলি, মহীন?

মহীন সিল্কের রুমাল বা'র ক'রে ঘাড়ের ঘাম মুছে বললে—তুই পাশ করিসনি নিশ্চয়। পনেরো তাহলে আর জোটেনি। 'থাইসিস্' বানান পেরেছিলি ত?

ব'লেই বাইকে ক'রে ছুট দিলে।

কর্তা বললেন—দেখলে কাণ্ডটা। ভাঁড়িয়ে জোচ্চুরি ক'রে ঠকাতে এসেছিল—ভাগ্যিস রাখিনি। পরে চৌকিটা আরো একটু কাছে টেনে বললেন—পড়াও ত বাপু, শুনি।

ছেলে বললে—তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে নাকি, বাবা?

কর্তা বললেন—দেখি না কেমন পড়ায়—মানেগুলো সব ঠিক বলতে পারে কি না। হ্যাঁ আরম্ভ ক'রে দাও—

অমর বললে—কি ভাবে আরম্ভ করব, তাও যদি বলে দেন।

কর্তা ঘাড় চুলকে বললেন—তাহলে আর তোমাকে মাষ্টার রেখেছি কেন?

—কি হ'লে আপনার মনোমত হবে, তাও ত একান্ত জানা দরকার দেখছি। নইলে—

ছেলে রেগে বললে—আমি আজ কিছুতেই পড়ব না বাবা, তুমি এরকম করলে। তুমি যাও চ'লে।

তৃতীয় পক্ষের ছেলে। বাপ জলচৌকিটা নিয়ে চ'লে গেলেন। যাওয়া মাত্রই ছেলে উঠে দরজায় খিল্ এঁটে একটা বালি-কাগজের ছেঁড়া খাতা বা'র ক'রে বললে—একটা কবিতা লিখেছি, মাষ্টার মশাই। শুনবেন? একটা হাঁস দুই সাদা ডানা মেলে জলে ভাসছিল—কতগুলি পাজি ছেলে তাকে ধ'রে কেটেকুটে কাট্‌লেট বানাচ্ছে—

সুকুমার ছেলে দুটি কালো চোখে সুগভীর সুদূর কৌতূহল, যেন দু'টি মণির প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকারে কি অনুসন্ধান করছে।

অমর শুধু বললে এখন ও-সব থাক। এবার পড়ি এসো

ছেলে অবাক হ'য়ে বললে—কেন বলুন ত—বাবা কবিতার নাম শুনে দাঁত মুখ খিচিয়ে খড়ম নিয়ে তেড়ে আসেন, মা প'ড়ে প'ড়ে কাঁদেন—আর আপনিও কবিতা ভালোবাসেন না? তবে আমাদের বইয়ে এত কবিতা লেখা কেন? শুনেছি, আমাদের দেশে এক প্রকাণ্ড কবি আছেন, তিনি নাকি ছেলেবেলায় আমার মতো ইস্কুল পালাতেন। আমার ইস্কুল একটুও ভালো লাগে না—যেন খানিকটা কুইনিন।

গায়ে খাকি সার্ট, পরনে ফিন্‌ফিনে কাপড়, কুচকুচে কালো পাড়—খালি পা—চোখের পাতার ওপরে বড় একটা তিল।

অমর জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি, ভাই ?

—কিশলয়। বড়দি রেখেছিল। বড়দিই ত আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছিল। ওঁর মরার পর আমি একটা লিখেও ছিলাম—দেখবেন সেটা ? উনি দেখে গেলে কত সুখী হতেন যে, অন্ত নেই।

—তুমি কি আজ পড়বে না ?

—রোজই ত পড়ি। -দেখুন, ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম - তারার বিষয়, ইংরিজিতে, আমার ভালো লাগেনি। তারাকে আমার কি মনে হয়, জানেন ? যেন কারা অনেকগুলি বাত্তি জ্বালিয়ে নীচের মানুষদের খুঁজছে, যারা বড়দির মতো কেঁদে কেঁদে ম'রে গেল। আমার এক এক সময় মনে হয় ঐ বড় তারাটা যেন বড়দি। এখান থেকে একজন যায়, আর আকাশে একটি ক'রে বাড়ে। আমি ঐ তারাটাকে নিয়ে কতদিন একটা কবিতা লিখব ভাবছি, পারি না। হয় না।

অমর অঙ্কের খাতাটা মুড়ে রেখে বললে নিয়ে এসো ত ভাই, তোমার কবিতার খাতাটা।

পুরো মাস গুজরানো হয়নি—দিন বারো পড়ানো হয়েছে মাত্র। পয়লা তারিখ অমর হাত পাতলে মাইনের জন্য।

কর্তা বললেন—সাত তারিখের আগে হবে না।

হ'তে হ'তে সতেরো তারিখে এসে ঠেকল।

অমর অবাক হ'য়ে বললে—বারো দিনের মাইনে এই তিন টাকা সাড়ে তিন আনা ?

কর্তা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কেন হিসেবের এক চুলও ভুল বা'র করতে পারবে না। নিয়ে এসো ত কাগজ, একটা রুল অফ থ্রি কষে ফেল। দু'দিন আসনি—তা ছাড়া এক দিন সাত মিনিট আর দু'দিন সাড়ে চার মিনিট লেট ক'রে এসেছিলে—

অমরের ইচ্ছা হ'ল মারে ছুঁড়ে টাকা তিনটা। কিন্তু মা'র পরনের কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে পুরোনো বইয়ের দোকানে সস্তায় একটা খুব ভালো বই দেখেছিল, যাবার সময় সেটাও কিনে নিয়ে যেতে পারে।

সকাল বেলাতেই হাঁপানি উঠেছিল সেদিন। তবুও কুঁজো হ'য়ে ঢিকোতে ঢিকোতে পড়াতে চলল। কিশলয় বললে—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ? বুকে হাত বুলিয়ে দেব ?

—যাও।

কতগুলি বই গাদা ক'রে তার ওপর মাথাটা রেখে অমর শোয় আর কিশলয় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প শোনে—

শেলিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বায়রণকে দেশ থেকে। ন্যুট হামস্থন ট্রাম-কণ্ডাক্টারি করত। ডষ্টয়ভস্কিকে ফাঁসিকাঠে তুলে নামিয়ে দিয়েছিল—গোর্কি থাকত উপোস ক'রে—মুসোলিনি ভিক্ষা করত পুলের তলায় বসে—

কিশলয় উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে শুনতে বুকের আরো অনেক কাছে এগিয়ে আসে।

অমর ঐ সুকোমল সুচারু বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির পানে চেয়ে চেয়ে অনেক কথা ভাবে—হয়ত এর মধ্যে ভবিষ্যতের ঋষি-কবি তন্ময় হ'য়ে আছেন।

হঠাৎ দু'জনে শিউরে আঁৎকে উঠল—জানালায় কার পাকানো ঝাঁঝালো দুই চক্ষু দেখে।

কর্তা বন্ধ দরজায় পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বললেন—খোল দরজা শিগ্‌গির—

কিশলয় ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলে।

কর্তা এক ঝাঁকানিতে অমরের হাতটা টেনে শোয়া থেকে তুলে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ব'লে উঠলেন, না পড়িয়ে শুয়ে শুয়ে উনি কবিতা শোনাচ্ছেন! গরচা পয়সা দেওয়া হয় কিসের জন্য শুনি? নবাবজাদার মতো তক্তপোষে গা ছড়িয়ে জিরোবার জন্য, নয়? যাও বেরিয়ে এক্ষুনি—

অমর বললে—তবে বাকি মাইনেটা দিয়ে দিন—

—মাইনে দেবে না, আরো কিছু। যা বাকি ছিল, সমস্ত এই বেয়াদবির জন্য ফাইন—কিছু পাবে না, যাও চ'লে।

দেনা টাকাটা দিয়ে নিশ্চয় আরেকবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে।

পশলা বৃষ্টির পর ধোলা আকাশে চাঁদ উঠেছে—মরা, মিউনো—পথের পাককে ঠাট্টা করতে।

হাঁপানির টানে কাঁকড়ার মতো কুঁকড়ে অমর নিশ্বাসের জন্য ফুসফুসের কসরৎ করছিল।

চোখ বুজে খালি একটি ছবি আজ ও দেখছে—বিষণ্ণ অথচ একটি সুকোমল ছবি।

বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। অমর দেখতে গিয়েছিল। শেফালির মতো শাদা ধবধবে বিছানা—তার ওপর এলিয়ে আছে ক্লান্ত তন্দ্রর কমনীয় কান্তি—ভাটায় জলস্রোত

যেন জিরোচ্ছে। চারপাশে রাশি রাশি ফুল স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে -বাতাস মন্থর হ'য়ে গেছে তাই। কারো মুখে একটি রা নেই, সবাইর মুখে নম্র বেদনার শীতল একটি ছায়া—সমস্ত গৃহে বিষাদপূর্ণ একটি মহাশান্তি। শিয়রের ধারে খান কয়েক বই—আত্মীয়ের মতো স্তব্ধ বেদনায় ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসেছে, আর কয়েকখানি পুরোনো চিঠি। নিষ্ঠুর ডাক্তার পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ক'রে আছে—মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে।

শুধু, পায়ের ওপর দু'টি হাত রেখে একটি দুঃখী মেয়ে বোবার মতো ব'সে আছে—যেন বিসর্জনের প্রতিমা। মুখখানি ভারি মলিন ও উদাস, তাইতে এত সুন্দর।—মা নয়, বোন নয়, বউ নয়, যেন আর কেউ।

অমরের সেদিন মনে হয়েছিল—মৃত্যুও একটা বিলাসিতা। মেয়েটির বুকের ব্যথাটি যেন এক অমূল্য বিত্ত। এ ত মরা নয়, মিশে যাওয়া। যেমন মিশে যায় ফুলের গন্ধ বাতাসে—যেমন গলে যায় সূর্য্যাস্তলালিমা অন্ধকারে।

সন্ধ্যায় টানটা ফের পড়লে অমর বালিশের তলা থেকে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি বা'র ক'রে ঠিকানা ঠাহর করতে চলল।

মা প্রশ্ন করলেন—কোথায় যাচ্ছিস?

—পাত্রীর খোঁজে। তোমার কত দিনের ইচ্ছা। অপূর্ণ রাখা অনুচিত মনে হচ্ছে।

এক কালে অবস্থা ভালো ছিল; বাড়ীর চেহারা দেখলে বুঝা যায়। এখন একেবারে গঙ্গাযাত্রী বুড়ি।

এখনো পাত্র জোটেনি। অমরের যেন একটু আসান হ'ল।

বহু কথা-বার্তার পর শ্যামাপদবাবু বললেন—ছেলেটি কি করেন? কত চাহিদা?

—বি-এ পড়ে। এত দিন মা'র গয়না বাঁধা দিয়ে চলছিল—আর চলে না। চাহিদা—পড়া খরচ দু' বচ্ছর—আর নগদ হাজার খানেক টাকা।

শ্যামাপদবাবু তাতেই স্বীকৃত ছিলেন। তার কারণ আছে—দরাদরি করতে গিয়ে কেবলই দাঁও ফসকেছে। তা ছাড়া মেয়ের ইতিহাসও বড় ভালো নয়; দেখতে ত নিতান্ত কুরূপাই—এত কুৎসিৎ, যে, ঘাটের-মড়ার পর্য্যন্ত নাকি দাঁত-কপাটি লাগে।

অমর বললে—ছেলেটির কিন্তু এক ব্যারাম আছে—হাঁপানি। প্রায়ই ভোগে।

শ্যামাপদবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন—এমন আর কি শক্ত ব্যায়রাম। ওতে ত আর কেউ মরে না। বয়েস কালে সেরেও যেতে পারে। তা, আপনি কি ছেলের বন্ধু, মেয়ে দেখে যাবেন একেবারে?

অমর বললে—আজ্ঞে না, আমিই পাণিপ্রার্থী—ওটা একেবারে বিয়ের রাতে সেরে ফেললেই চলবে। দিন ঠিক ক'রে খবর দেবেন আমাদের, ঠিকানা রইল।

শ্যামাপদবাবুর মনে অনেক প্রশ্ন ঘুলিয়ে উঠলেও কোনোটাই আমোল দিলেন না। খালি মেয়ে পার করতে পারবেন—তাও অবশ্যি বাষট্টি বছরের বুড়োর কাছে নয়—এই খবর গিন্নির কানে দিতেই গিন্নি উলু দিয়ে উঠলেন। বাড়ীতে সোরগোল পড়ে গেল। বাড়ীর এক কোণে একটি কুৎসিত কালো মেয়ে দীপশিখার মতো কেঁপে উঠল খানিক।

মা বললেন—জানা শোনা নেই, কেমন না কেমন মেয়ে—একেবারে কথা দিয়ে এলি?

অমর রাগ ক'রে বললে—আর তোমার ছেলেই বা কি গুণধর মা, যে একেবারে পক্ষী তার ডানা দু'টো সগগে ফেলে রেখে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফিটনে চ'ড়ে তোমার পদ্মবনে এসে দাঁড়াবেন! শাঁখ বাজাও মা। গুণে গুণে হাজারটি নগদ টাকা—আর দু' বচ্ছর পড়া খরচ।

মা অপর্য্যাপ্ত খুসি হ'য়ে গেলেন। বিয়ে হ'য়ে গেলে কাশী যাবেন, সঙ্কল্পও সম্ভব হ'ল।

অমর বললে—তোমার ছেলের এই ত চেহারা—একটা আরস্থলার চেয়েও অধম। তার ওপর বুকের পাঁজরায় ঘুণ ধরেছে। যা পাও, তাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ো।

মা বললেন—মেয়ে যদি খোঁড়া হয়?

—কি যায় আসে তাতে? তোমার ছেলে যে কুঁজো। টাকাগুলি ত চকচকে হবে।

সরোজ বললে—কবে প্রেমে পড়লে হঠাৎ? ফকুদা হাওয়ায় পর্দা বেফাঁস হ'য়ে গেল বুঝি?

লুসী সে ঘরে ব'সেই সেলাইর কল চালাচ্ছিল, বললে—কবে পড়েছেন উনি পাজি দেখে তারিখ লিখে রেখেছেন কি না! আর জন্মে পড়েছিলেন, এ জন্মে পেলেন।

সরোজ বললে—পড়তে মন যাচ্ছিল না মোটেই, ঘুম পাচ্ছিল। লুসীকে বললাম, —কল চালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে, দিদি। এবার থামাতে পারিস, আমি অমরের সঙ্গে বেরোচ্ছি। দে ত চাবিটা।

দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল।

পিঠের ওপর চুল মেলা, মান্দ্রাজি মেয়েরা যেমন ক'রে শাড়ী পরে তেমনই ধরন শাড়ী পরার, দু'টি হাতে সোনার কঙ্কণ, সুঁচে সুতো পরাবার সময় চোখের কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ললাটে আভা!

ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিষই সওদা করলে দু'জন—বাক্স বোঝাই ক'রে। টোপর পর্য্যন্ত। তিনটে মুটে।

ফেরবার মুখে আরেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বয়সে কিছু বড়।

অমরকে জিজ্ঞাসা করলে—কি করছ আজকাল?

—বিয়ে করছি। চূড়ান্ত। আর তুমি? টিউশানি পেলে?

—পেয়েছি একটা। যৎসামান্য। ঐ গলির বাঁকের লাল বাড়ীটা।

—ও! কত দেয়?

- কিঞ্চিৎ। ল-কলেজের মাইনে সাড়ে সাত টাকা।

সরোজ চোখ বড় ক'রে বললে—সাড়ে সাত টাকা!

লজ্জিত না হ'য়েই বললে বন্ধু হ্যাঁ, তাই সই। মাইনেটা ত চ'লে যায়। আর কি বেয়াড়া এঁচড়ে-পাকা ছেলেই পড়াতে হয়, ভাই। এইটুকুন্ বয়েস থেকেই পদ্য মেলাতে শিখেছে। ভাগ্যিস্ বাপ মা'র 'নাই' নেই এতে, নইলে উচ্ছন্নে যাবার সুড়ঙ্গ খোঁড়া হচ্ছিল আর কি! মা বলে দিয়েছেন, ফের পদ্য মেলালে বেত মারতে। তিনটে খাতা প্রায় ভরতি ক'রে ফেলেছে, ভাই। সবগুলি পুড়িয়ে ফেলেছি কাল।

অমর বললে খুব কাঁদলে?

—বাপের চড় চাপড়ও ত কম খায়নি মা তার হাতের শিল নিয়ে পর্য্যন্ত তেড়ে এসেছিল। কবিতা লিখতে গিয়েই না ছেলেটা এবার অঙ্কে একেবারে গোল্লা পেলে।

অমরের মনে পড়ছিল, সেই খাকি সার্ট, কোমরে কাপড়ের সেই ছোট আলগা বাঁধুনিটি সেই তরল জ্যোৎস্নার মতো দু'টি চোখ, সেই বালি-কাগজের ছেঁড়া-খোঁড়া খাতাটা, পেন্সিল দিয়ে লেখা কবিতা, নাম—"বড়দি বা বড় তারা"—এক দিন ছোট্ট কচি হাতখানি দিয়ে বুকটা আস্তে একটু ছুঁ'লে দিয়েছিল—

অমর ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললে—রোজ শেষ রাত্রেই হাঁপানিটা চেগে আসে। একটা ইন্‌জেকশান দিয়ে দিন, যাতে অন্তত আজ রাতটা রেহাই পাই। আজ আমার বিয়ে কি না।

ডাক্তার বিস্মিত হ'লেন বটে। যাবার সময় অমর টেবিলের ওপর একটা নিমন্ত্রণ-পত্রও রেখে গেল।

বউ-ভাতে ত কাউকে খাওয়াতে পারবে না, তাই যার সঙ্গে একটি দিনের জন্যেও প্রীতি-বিনিময় হয়েছিল তাকে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করলে। টাইম-অনুসারে একটা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে কি সুখ!

রাজা।

কেন নয়? সবাইর চেয়ে উঁচু জায়গায় আসন, সামিয়ানা খাটানো, তাতে তিনটে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে, ফুলদানিতে বিস্তর ফুল, গলায় প্রকাণ্ড মাল্য, গায়ে সিল্কের দামী জামা, জীবনে এই প্রথম পরেছে, পায়ে চৌদ্দ টাকা দামের জুতো—দু-মাস টিউশানি ক'রে যা জোটেনি।

ছেলেরা চেঁচামেচি করছে, মেয়েরা প্রজাপতির মতো উড়ছে ও বর্ষার জলধারার মতো কলবর করছে। বন্ধুরা এসে ঠাট্টা ইয়ার্কি ক'রে যাচ্ছে। চিকের পেছনে বর্ষীয়সী মেয়েদের ভিড় লেগে গেছে—উলু দিয়ে দিয়ে গলা ভেঙে ফেলছে। উলু দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বরটা বিকৃত হ'য়ে গেল দেখে একটি মেয়ের স্রোতের মতো কি স্বচ্ছ হাসি!

এ বাড়ীতে আজ যেখানে যা হচ্ছে সবই ত অমরের জন্য। খাবার নিয়ে আস্তা-কুঁড়েতে কুকুরগুলি যে লড়াই বাধিয়েছে, তাও। যা কিছু বাজনা, যা কিছু হাসি, যা কিছু কোলাহল!

ঐ যে নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী দু'টি হাত তুলে চুলের খোঁপাটা ঠিক ক'রে গুছিয়ে নিচ্ছে, চুলের কাঁটাগুলি ফের ভালো ক'রে গুঁজে দিচ্ছে—সেও ত তারই জন্য!—অমর ভাবছিল। নইলে আজ রাত্রে মেয়েটি কখনো এই নীল শাড়ীটি পরত না, মাথায় কখনো গুঁজত না ঐ শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি।

শুভদৃষ্টির সময় সবাই বললে বটে, কিন্তু অমর ঘাড় গুঁজে রইল, মুখ তুলে চাইল না। পাছে ভুল ভেঙে যায়! খালি একটি কথাই মনে পড়ছিল তখন।

লুসী জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম আপনার বউয়ের?

অমর বলেছিল—মনোরমা।

লুসী খপ ক'রে ব'লে ফেলেছিল—ওমা! আমারও ভালো নাম যে তাই। বলেই রাঙা হ'য়ে উঠে মুচকে হেসেছিল একটু।

পাছে তেমনি রাঙা হ'য়ে উঠতে না পারে। পাছে—

মনোরমা নিজে কুৎসিত হ'লেও আশা করেছিল ছবির পাতায় রাজপুত্রের যে ছবি দেখেছিল, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া না হ'লেও তেমনিই সুকান্ত হবে তার

প্রিয়তম! তাবলে—ক'ড়ে আঙুল দিয়ে কপালে এক টোকা মারলেই ঘাড় গুঁজে প'ড়ে যাবে বুঝি।

তবুও ত স্বামী। ডাক্তার এসে আর দড়ি দিয়ে কপাল বেঁধে দেয় না, সারারাত্রি মনোরমাই কপাল টিপে দেয়। কখনো অনাবশ্যক বল প্রয়োগ ক'রে বসে। রাগ ক'রেই হয়ত।

অমর সবচেয়ে ঘৃণা করত নিজের এই কদর্য্য ব্যাধিটাকে। আর ঘৃণা করে, যে মুখটা তার সত্যিই বত্রিশটা দাঁত আছে কি না অন্যকে গুণে দেখাবার জন্য সর্বদাই মেলে রয়েছে—সেই মুখটাকে। মনোরমা নাম বদলে নাম রেখেছে তিলোত্তমা!

মা কেঁদেছিলেন বটে একটু, এক ফাঁকে এক এক ক'রে নোটগুলি গুণেও নিয়েছিলেন বার চারেক।

হঠাৎ একদিন কয়েকখানি আঁচলের খুঁটে বেঁধে কাশী চলে গেলেন। ব'লে গেলেন—বউ ত হয়েছে। রেঁধেও দেবে, বুকে মালিশও করবে। আমি দিন কতক ধর্ম করে আসি, জিরিয়েও আসি।

শ্যামাপদবাবু এসে মেয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। অমর আপত্তি করলে না। বললে—এ কদিন না হয় কোনো একটা মেসেই থাকব। কারো হাত বুলিয়ে না দিলেও চলবে। তবে শিগ্‌গিরই যেন আসে।

বাড়ী ফিরে এসে শ্যামাপদবাবু মনে মনে বলছিলেন—এবার মর, ধর, বিধবা হ, —বাবাঃ, কাঁটাটা ত খসেছে গলা থেকে! বন্ধুদের বললেন—দু'মণ বস্তাও পিঠে ক'রে বওয়া যায়—কিন্তু এই কুৎসিত মেয়েটা কি হায়রানি ক'রেই মেরেছিল! তবু যদি—

তারপরের ব্যাপারটা একটু আকস্মিক বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

সন্ধ্যার দিকে রাস্তাতেই খুব জাঁক ক'রে হাঁপানি উঠে গেল। একটা গাড়ি ঠিক করতে রাস্তার মধ্যে আসতেই বেহুঁসের মতো একটা মোটর অতি আচমকা একেবারে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল কাঁধের ওপর। তারপর ঘষড়াতে ঘষড়াতে—

শ্যামাপদবাবুর কাছে খবর গেল। মনোরমা একবার যেতেও চাইল কেঁদে। বাপ বুঝিয়ে বললেন—এখন গিয়ে কি আর এগোবে বল? গঙ্গায় না হোক কলতলাতেই শাঁখা ভাঙলে চলবে। পানটা আর চিবোসনি, মা।

মা'র কাছে তার পৌঁছল না। ঠিকানা বদল করেছেন।

আরও একবার রাজা। সবাইর কাঁধের ওপর।

ওর জন্যই ত আজকের সূর্য্য অস্ত যাছে। ওর জন্যই ত লুসীর চোখে এক বিন্দু অশ্রু!

শ্রীবিষ্ণু দে

প্রিয়বরেষু—

২৫-২-৩২

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মেস্-এ আছি।—একটা চাকরি জোটাতে পারি কি না সেই ফিকিরে।

চেষ্টা-চরিত্র করবার মতো চরিত্রে আর বল পাই না, ছেঁড়া তোষকের ওপর একটা রঙ-চটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে উপুড় হ'য়ে দুপুরটা কাটিয়ে দিই, বিকেলে এ-দিক ও-দিক একটু হেঁটে আসি মাত্র—শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, নরসিংহ লেনের মোড়ে চা-এর দোকান—বড় জোর ওয়াই. এম. সি. এ। লোকে বলে, কুড়েমি ক'রে ক'রেই আমি বুড়িয়ে যাব—আমার দ্বারা কিছু হয়নি, হবেও না।

আমি মেস্-এ তক্তপোষে শুয়ে-শুয়ে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখি।—হাতে কোনোই ত আর কাজ নেই, সিলিঙ্ পর্য্যন্ত লম্বা একটা পেন্সিল পেলে বিছানায় চিৎ হ'য়ে জি. কে. চেষ্টারটন-এর মতো সিলিঙে ছবি আঁকতাম! চাকরি-বাকরি না জুটলে শেষ পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করব। চাকরি পেলেই বিয়েটা ক'রে বেশ তৈলসিক্ত নিরীহ সংসারী ব'নে যাই—কতটুকুই বা আমাদের চাহিদা!

এর মধ্যে একদিন আমাদের মেস্-এর ঝি সব বাসন-কোসন নিয়ে স'রে পড়ল : সবাই বললে—আপনি ত চুপচাপ ব'সে আছেন, আমাদের শ্বাস গ্রহণ করবারো সময় নেই, যান একটা ঝি-ফি জোগাড় ক'রে আনুন গে!

ঝি খুঁজতে বেরুলাম।

খুঁজতে খুঁজতে এসে গেলাম পাথুরিয়া-ঘাটা বাই-লেন। মোড়ের ওপর তেতলা বাড়ি সদর দরজার কাছে একটি মহিলা একটি হিন্দুস্থানি মেয়ের কাছ থেকে ঘুঁটে গুনিয়ে রাখছেন। দুপুর তখনো প্রায় পুরোপুরি-ই।

মাসিমারা যে এখানে আছেন এবং এ-পাড়ায়ই এ-রকম একটা জনশ্রুতি আমার কান এড়ায়নি। কিন্তু তখন বলসেবী বলশেভিকদের মন্ত্র নিয়ে নয়—অভিজাত জীবনের ওপর আমার স্বভাবজাত একটা বিতৃষ্ণা ছিল—তাই মাসিমার সীমাতেও আমি আসিনি। আন্দামান থেকে দেশে ফিরে এসে যখন মাকে ফিরে পেলাম না, তখন মাসির দিকে একবার ফিরে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, থাক গে; মেসোমশায়ের মনোভাব আন্দাজ করবার মতো বুদ্ধি আমার আছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এই চোদ্দ বছর পরেও মাসিমা আমাকে চিনে ফেললেন। একেবারে দুই উৎসুক বাহু মেলে পথের কাছে নেমে এলেন—মা যেন তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষার করুণাসিক্ত অধীরতাটুকু মাসিমার বুকে রেখে গেছে! রইল প'ড়ে ঘুঁটে গোনা মাসিমা আমাকে একেবারে বাহুতে জড়িয়ে বারান্দা দিয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলেন—নিয়ে এসেই গলা ছেড়ে ডাক : ও ভ্রমর, ও হেনা—ত্বাখ এসে তোদের ক্ষিতি-দা এসেছে!

ক্ষিতি-দা! যেন তেতলা বাড়ির তেত্রিশটা ঘর থেকে এক সঙ্গে তিয়াত্তরটা আওয়াজ বেরুলো।

মুহূর্তের মধ্যে তিন দিকের তিনটা সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে ছোট বড়ো কতগুলি প্রাণী যে নেমে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো তার ইয়ত্তা নেই। মনে হ'ল, এরা যেন এই ঘটনার আগে, নিশ্বাস নেওয়ার আগে পর্য্যন্ত ক্ষিতি-দার জন্য জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। যখন দীর্ঘ প্রবাস থেকে প্রথম কলকাতায় এসে পা দিই, তখন কোথায় ছিল এতগুলি মুখ, স্নেহে সুকোমল, কল্যাণকামনায় লাবণ্যময়! সেদিন নিজের ভাগ্যকে নিষ্ঠুর ব'লে তিরস্কার করেছিলাম—কোথায় ছিল মাসিমার বাহু-উপাধান! আমার চোখ ভিজে উঠলো।

মাসিমা কান্নামাখা সুরে বললেন—খবরের কাগজে কত দিন আগে—প্রায় দু'বছর হ'ল—জেনেছি তুই ছাড়া পেয়েছিস, কত তোকে খোঁজ—কোথাও তোর হদিস নেই। আছিস কোথায়?

হেসে বললাম—মেস্-এ। এখন একেবারে মেষ হ'য়ে গেছি কি না।

বললেন কেন, তোর মাসিমা কি বাসি হ'য়ে গেছে?

ব'লে আদর করে গালে একটি ছোট্ট চড় দিলেন।

বললাম—মেস্-এর জন্য ঝি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, ঝি-র বদলে মাসি পেলাম।

আমাকে ঘিরে যতগুলি প্রাণী দাঁড়িয়েছিল, সবাই আমাকে প্রণাম করবার জন্য ভিড় ক'রে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমি যেন মৃত্যুর মতোই ভয়ঙ্কর ও মহিমাময়, অথচ মৃত্যুর মতোই দয়ার্দ্রহৃদয় অদূর-আত্মীয়! হটে গেলাম, বললাম—প্রণাম ক'রে অন্যকে প্রভুত্বের মর্য্যাদা দেবে—আমি এই দৌর্বল্য সহ্য করিনে। একটু দুর্বিনীত হও।

একটি ছোট্ট ছেলে, হয়ত সবে পাঁচে পৌঁচেছে কিম্বা ছয়ে—দুই চোখে খুশির ঢেউ দুলছে—আমার হাত ধ'রে বললে—তুমি আমার ক্ষিতি-দা?

বুঝলাম ক্ষিতি-দা-র খ্যাতি এই শিশুটির কাছেও পৌঁচেছে। ছেলেটির নাম আগে ছিল রুসো—এখন হয়েচে রুষ্; ওর মেজদি হেনা ওর নাম রেখেছে।

রুষ্ আমার আদর না নিয়ে বললে—আমি তোমার মতন হ'ব, ক্ষিতি-দা!

আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললাম—আমার মতন কি। দূর বোকা! আমি ত একটুখানি—আমার চেয়েও ঢের বড়ো হবে।

রুষ্ বললে—তবে আমাকে তোমার কাঁধে চড়িয়ে দাও তোমার থেকে এক্ষুনি বড়ো হ'য়ে যাই।

ভ্রমর হেসে বললে—নাম দুষ্টু ছেলে!

রুণু বললে—আর ক্ষিতি-দা বুঝি দুষ্টু নয়! দুষ্টু ব'লেই ত তাঁকে এতদিন আটকে রেখেছিল—দুষ্টুমি করলে আমাকে যেমন তুমি তোমার ঘরে বন্ধ ক'রে রাখ।

মেসোমশাইরা তিন ভাই—বাড়িও তিন তলা। মেসোমশায় মেজো—আলিপুরের জজ্;—বড়ো যিনি, তিনি গোটা পাঁচেক কয়লার খনির মালিক, ছোটটিও ব্যবসাদার।

একান্নবর্তী পরিবার—সেইটেই আশ্চর্য্য—প্রতি বেলায় পাত-ও পড়ে একান্ন। বড়ো-র হাতে বারোটি সন্তান, মেসোমশায়ের দশটি, ছোটটি বিয়েতে দেরি করলেও দৌড়ে দাঁড়িয়ে পড়েননি। তা ছাড়া চাকর-বাকর বয়-খানসামা মালি-মেড়ো ত কতোই আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, সবকটিই বেঁচে আছে—আয়ু আর বিত্ত এদের য়্যাল্‌ফা এবং ওমেগা!

সন্ধ্যাসন্ধিতে মেসোমশায়ের ঘরে তলব পড়লো। হেসে বললেন—শিং ভোঁতা ক'রে এসেছ ত, চরকা নিয়ে? তা বেশ! আমাদের চরকায় তেল দিতে চাইবে না আশা করি।

তারপর মাসিমার দিকে চেয়ে বললেন—যাও, একে ঘি-দুধ খাইয়ে বেশ একটি নধর তাকিয়া বানিয়ে ফেলো—সাপকে দড়ি বানানোটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ফের হেসে বললেন—যাও, ক'দিন বেশ জিরিয়ে নাও এখেনে, ভ্রমরের এস্রাজ শোনো, ফ্রাই-র গান—মনটাকে ধুয়ে একেবারে সাফ ক'রে ফেল। সিনেমা ভাখো, মুর্গি কাটো, ঘুমাও—বেশ নিরীহ হ'য়ে যাও।

বললাম—তাই হ'য়ে গেছি। ভাবনা নেই আপনার।

কোথা থেকে কোথায় এসে মিশে গেলাম। ছিলাম ধাবমান নির্ঝরের ফেনসঙ্কুল দুর্নিবার খরস্রোত—এখন হ'য়ে আছি পুষ্করিণী—সীমাবদ্ধ, নিষ্প্রাণ, অগভীর! শেলির স্কাইলার্ক ওয়ার্ড্‌স্বার্থের হ'য়ে গেছি, কিম্বা হার্ডির। যৌবন হারিয়ে বুড়ো যযাতি হাই তুলছেন।

প্রত্যেকের জন্য—মানে যারা বয়স্ক—এক-একটি আলাদা ঘর এবং প্রত্যেক ঘরেই আমার নিমন্ত্রণ। তার কারণ এই নয় যে ষোলো বছর বয়সে কালাপানি পেরিয়েছিলাম—তার কারণ, আমি সবাইর চোখে একান্ত ক'রে আলাদা, সবাইর কাছে তাই একান্ত ক'রে আপন। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত—আমি ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলবার আগে হাতটা কপালে এনে ঠেকাই, সবাই তাই উৎসুক হ'য়ে দেখে—আমি আমার বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙুলের নোখটা অনেক বড়ো রেখেছি, এবং সেই নোখ দিয়ে অন্ধকারে একজনের চোখ কাণা ক'রে দিয়েছিলাম—

সকাল থেকে রাত একটা পর্য্যন্ত এ-বাড়িকে মনে হয় একটা কারখানা যেন অনবরত কল ঘুরছে;—পাঁচ বছরের ছেলে রুষ্‌ই হচ্ছে এ-কলের কলিজা। আমি রুষেরও বন্ধু ব'নে গেছি। রুষ্‌ মেয়ে-পুরুষ সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে; দু'নলা বন্দুক ছোঁড়ে, নিজে-নিজে ঘোড়ায় চড়ে, মোটরে ড্রাইভারের কোলে ব'সে হুইল্ না ধরলে ওর কোথায় যাওয়াই হয় না—ঘড়ি ভেঙে ফেলে তার কলকব্জা দেখে, কাঠ আর পেরেক দিয়ে এঞ্জিন বানায়, দোরের পাশে লুকিয়ে থেকে সমস্ত বাড়িকে তোলপাড় ক'রে ছাড়ে—পরে গুটি-সুটি বেরিয়ে এসে বেমালুম প্রশ্ন করে—কাকে খুঁজছ, মেজদি?—রুষ যেন বাংলার পলি-মাটি দিয়ে তৈরি নয়—রাশ্যার বরফ দিয়ে, কঠিন, হিম দুর্দমনীয়;—ওর দুই চোখে যেন বন্য দস্যুতা আছে - তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার!

ইহসংসারে আমিই নিস্পৃহ—তাই সবার কাছেই স্পৃহনীয়। আমাকে পেয়ে ওরা সবাই যেন হাঁপ ছেড়েছে—ওদের আহার সুস্বাদু, পানীয় সুশীতল হ'য়ে উঠেছে —ওদের ঘরের বাতাসে সুবাস এসেছে, যে-কথা বলবারো নয় ভুলবারো নয়—সেই কথা যেন মুক্তি খুঁজছে। বন্দী ভাষা, দুর্বোধ তার রহস্য!

তে-তলা এক-তলা আমি টানা-পোড়েন করছি।

মোটমাট সতেরোটি খোপ্‌রি—সুতরাং হাতে আমার সাতঘণ্টাও থাকে না। আমাকে ওরা বলে: তুমি দিনে ঘুমিয়ো, ক্ষিতি-দা -তুমি তো ঘানি ঘুরিয়েছ দিনেই—রাতেও ঘোরাও এবার।

ভ্রমর আমার মেসোমশায়ের বড়ো মেয়ে।

ভ্রমর তার খাটের ওপর ব'সে একটা সুটকেস উপুড়, উজাড় ক'রে কি-সব জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে বিভোর হ'য়ে আছে। আমাকে দেখে খাট থেকে লাফিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে প'ড়লো। যেন বেশ একটু বিব্রত হয়েছে। বললে আজ আর এস্রাজ নয়, ক্ষিতি-দা—এস্রাজের চেয়েও মিষ্টি বাজনা আছে, শুনবে? বোস তা'লে।

ভ্রমর মাথার চুলটা ঠিক করতে-করতে ফের বললে—চা খাবে?

—এই ভাত খেয়ে এলাম। তোমাকেও নেয়ে-খেয়ে নিতে বললেন মাসিমা। কত বেলা হয়েছে খেয়াল আছে? তুমি এখন যাও। তোমার এ-সব জিনিসপত্র আমি পাহারা দিচ্ছি। তুমি খেয়ে এলে পর মিষ্টি বাজনা শোনা যাবে'খন।

ভ্রমর আলমারি থেকে শাড়ি-সেমিজ বার করলে—তেল নিয়ে পিঠের ওপর সাপের মতো বেণী খসিয়ে একটু এদিক-ওদিক হেঁটে, দোলনায় ঘুমন্ত ছেলেকে

একটু আদর ক'রে যেতে-যেতে বললে তোমার ওপর এই সবের ভার রইল ঝুঁকি পোয়াবার, উঁকি দেবার নয়।

ব'লে একবার ছেলে ও আরেকবার খাটের ওপর বিশৃঙ্খল জিনিসগুলির দিকে করুণ দৃষ্টিপাত ক'রে চ'লে গেল।

ভ্রমর যেন শরৎ-মেঘের বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরি ওর মধ্যে যেন সেই নিষ্ফল নিরানন্দ উজ্জ্বলতা—ভ্রমর যেন মরুভূমির শুষ্ক নিষ্করুণ দিগন্তলেখা—সেই ঔদাস্য ওর ললাটে। এস্রাজের মাঝে ওর অজস্রতা নেই, গানে নেই প্রাণ—কোনো উৎসবে নেই উৎসাহ! ও ভ্রমে ভ্রমর নাম নিয়েছে।

আধঘণ্টা বাদে ভ্রমর এসে হাজির হাতে এক বাটি চা। ঘরে পা দিয়েই কলকণ্ঠে ব'লে উঠলো : তুমি এ-চেয়ারটিতে বসেছ, ক্ষিতি-দা! বাঃ! চা-টা হাতে ক'রে এইটুকুন আসতে আমার কী ভালো যে লাগছিল—

—তুমি কি পাগল হয়েছ ভ্রমর, এই দুপুর দুটোয় চা—ভাত খেয়েই?

—চায়ে তোমার অরুচি আছে তা'লে। থাক, রেখে দাও।

ভ্রমর সুন্দর ক'রে সীমন্তে সিন্দূর পরলে—মুখে গোধূলিবেলার নির্মল আভা, দুই ঠোঁটের কোলে ব্যথিত স্তব্ধতা ঘুমিয়ে আছে—দু'টি হাতে যেন ক্লান্তির কাতরতা। সেই ক্লান্তিই যেন ওকে কমনীয় করেছে!

ছেলের দোলনায় ছোট দু'টি ঠেলা দিয়ে বললে - গিলে আসছি। এলাম ব'লে।

ভ্রমর এলো খেয়ে। দুপুর প্রায় ফুরিয়ে এলো।

বললাম - তোমার মিষ্টি বাজনা শোনাবে না?

কাগজের স্তূপ থেকে কি-একটা বের ক'রে ভ্রমর বললে—শুনবে এসো! এসো এগিয়ে।

এগোলাম। ভ্রমর আমার চোখের কাছে একখানি ফটো এনে ধরলো। নষ্ট হ'য়ে গেছে—বহুদিনকার নিশ্চয়ই- কিছুই ভালো চেনা যায় না। তবু আন্দাজ ক'রে বললাম নীরেশবাবুর? এ বাজনা ত খালি তোমারই কাছে মিষ্টি!

ভ্রমর বললে – তোমারও কাছে লাগবে, শুধু মিষ্টি নয়, মিস্‌টিক্! শ ভিলিট্‌ ক'রে দন্ত্য ন বসাও।

অবাক হ'য়ে বললাম - তার মানে?

—এটুকুরো মানে তুমি করতে পারবে না ক্ষিতি-দা? সোজাসুজি মানে, নীরেন আমার বন্ধু ছিল।

হেসে বললাম—তোমার টেনস্-জ্ঞান আমার টেন্‌সান্ কমিয়ে দিয়েছে, ভ্রমর। 'ছিল' – এখন আর নেই তাহলে? বাঁচা গেল।

ভ্রমর ফটোটা চোখের কাছে তেমনি ধ'রেই আছে। অস্ফুটস্বরে বললে—না, এখন আর নেই। সেইটেই দুঃখের।

—কেন নেই ?

—রেপুটেশান্ ক্ষিতি-দা, রেপুটেশান্। তুমি ওথেলো পড়েছ ? ক্যাশিয়োকে মনে পড়ে ?

হেসে বললাম—যদি দন্ত্য ন তালব্য শ হ'য়ে রুখে ওঠে, সেই ভয়ে দরজায় তালা দিয়ে তাঁকে বাতিল ক'রে দিলে। এই তোমার মিষ্টি বাজনা, ভ্রমর ?—থাক, এ বিষের চেয়েও মারাত্মক।

ভ্রমর জ্ঞানীর মতো বললে—এ-বিষ নিরামিষ, ক্ষিতি-দা! সেইটেই বাঁচোয়া। আচ্ছা, তুমি এ-ব্যাপারের প্রতি এত নিরুৎসাহ কেন ? তুমি ত কোনোদিন ভালোবাসার বেসাতি করনি, বেহাতও করনি। তুমি কি একে অন্যায় মনে কর ?

মুরুব্বিয়ানা ক'রে বললাম—অন্যায় নয়, মূর্খতা।

—হ্যাঁ, মূর্খতা! নইলে তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্য কেউ কৃচ্ছ্রসাধনা করে—জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে বসে! শুনলাম বুড়ো মাকে ফেলে জাহাজের খালাসি হ'য়ে সাউথ আফ্রিকা যাবে।

—তুমি আবার হাসালে, ভ্রমর। এখনো যায়নি তা'লে ? বাঁচা গেল।···আচ্ছা, আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও ভ্রমর—তোমার বন্ধুর নাম কি নীরেন চক্রবর্তী ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ভ্রমর লাফিয়ে উঠল : তুমি চেন তাকে ? সুন্দর দোহারা চেহারা, পাঞ্জাবি ছাড়া কোনোদিন কোট গায়ে দেয় না, মোজা পরে না—খালি ক্রেভেন্-এ খায়, ডান দিক দিয়ে মাথার আদ্দেক অবধি টেড়ি কাটে! তার সঙ্গে তোমার কবে দেখা হ'ল ? বিয়ে করেনি এখনো ?

—মেস্-এ দেখা হয়েছিল—বোধ হয় দিন কয়েকের জন্য। পরে কোন্ দিকে যে পাল খুলে দিলো কেউ জানে না—

—কেউ জানে না ? আমার ভারি ইচ্ছা করে, আবার সে আসুক—এমনি নির্জন দুপুরে—ঠিক ঐ চেয়ারটিতে এসে বসুক—ভাত খেয়ে এসেই চা চা'ক। কেন তা হয় না, ক্ষিতি-দা ? জীবনের একটা চৌমাথার মোড়ে এসেও সে ট্রাফিক-পুলিশের মতো আমার গাড়ির গতি বন্ধ ক'রে দেবে না—এ তার কী অমানুষিক অভিমান!

—ঘৃণাও ত হ'তে পারে, ভ্রমর।

—হ'তে পারে। কিন্তু কেনই বা সে ঘৃণা করবে ?—আমাকে ত সে কোনোদিন চায়নি। আমি তাকে বুঝতেই পারলাম না, ক্ষিতি-দা। আমার আঙুলটির সঙ্গে তার আঙুলটিরো আত্মীয়তা হয়নি—

—তবু, হৃদয় যে প্রতিবেশী ছিল সেটা আজ বেশি ক'রেই বুঝছ।

—হ্যাঁ খুব বেশি ক'রে। বাড়ির সবাইর কাছে ছিল সে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, আমার কাছে সে ছিল শুধু সাইক্লোন!—আমি তার সে-চেহারা আজো মনে করতে পারি, ক্ষিতি-দা। কিন্তু সত্যিই হয়ত পারি না।

ভ্রমর ছেলেকে দোলা দিয়ে এসে ফের খাটের ওপর বসলো।

বললাম—এও ত হ'তে পারে, ভ্রমর, যে সে মোটেই তোমাকে পাবার মতো ক'রে ভালোবাসেনি—এমনিই তোমার পথের মাঝে ধূলির মতো উড়ে এসেছিল, এমনিই আবার ধুয়ে গেছে।

—সুবাসের মতো—ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে শুধু। আমি ত তাকে তাই চাই। সে আমার য়্যাকোয়েন্‌টেন্‌স—তার সঙ্গে ফের চা খেতে ইচ্ছা হয়, এক সঙ্গে জর্জ ম্যুর পড়ি, একদিন একসঙ্গে 'টকি' শুনে আসি। সে সবচেয়ে আমাকে বেশি বোঝে, সে পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে পা ফেলে চলে, তার মাঝে আমি নিজেকে বেশি ক'রে আস্বাদ করি ব'লেই ত সে আমার বন্ধু। আমাদের দুই পাখীর এক পালক! সে নাই বা এলো সন্দীপের মতো, সে সৌহার্দ্যের প্রদীপ নিয়ে আসুক—আমি তার বন্ধু, এও আমার একটা পরিচয় হোক। তা কেন সম্ভব নয়, ক্ষিতি-দা?

—তার উত্তর ত তুমি আগেই দিয়েছ। এর আরো একটা উত্তর হ'তে পারে, পুরুষের চাওয়াটা ভারি পুরু, মেয়েদের মিহি।—তোমার য়্যাকোয়েন্‌টেন্‌সে তার প্রয়োজন নেই।

—তুমি আমাকে কি ভাবছ জানি না—কিন্তু তার সঙ্গে আমার দেখা করার সাঙ্ঘাতিক দরকার আছে।—হয়ত শুধু আজকের জন্যই। তার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে না—শুধু আজকে হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ মনে হ'ল ক্ষিতি-দা, তাকে আমি ভুলিনি। আরেক দিন হয়েছিল—যেদিন হঠাৎ তুমি এলে। সেই হঠাৎ আসাটাই সেদিন ভারি রোমান্টিক লেগেছিল।

খানিক থেমে হঠাৎ ভ্রমর বললে—আমি আমার স্বামীকে খুবই ভালোবাসি, সে-কথা বলাই বাহুল্য—আমি ফোরসাইট সাগা পড়লেও বুঝিনি, আমি Ireneও নই, Fleurও নই—কিন্তু জান কি ক্ষিতি-দা, আমার স্বামী স্বামীই বটে, বন্ধু নন—বহু তপস্যার স্বামী, বিনা মূল্যের বন্ধু নন। কিম্বা ঠিক তার উলটো। আমি ডাক্তার চাই বটে, হার্ট-স্পেশালিষ্ট—কিন্তু সঙ্গে একটি হার্টি বন্ধু পেলেই বেশ হয়।

ভ্রমরের ছেলে তখন কাঁদতে সুরু করেছে। ভ্রমর তাকে শান্ত করে।

উঠছি—ভ্রমর বললে—তুমি মনে ভেবো না, তার সঙ্গে দেখা হয় না ব'লে

আমার ঘুম হয় না—তা হয়। শুধু সে যেন বিয়ে করে, যেন ভদ্রলোক ব'নে যায়—এইটুকু।

হেসে বললাম—দেখা হ'লে ভদ্রতা শিখতেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব'খন।

কে এই নীরেন চক্রবর্তী? সে একদিন ভ্রমরের নিকটবর্তী হয়ত হয়েছিল, কিন্তু আমি ত তাকে জানি না—আমি ভ্রমরকে ভাঁওতা দিয়েছি।

নীরেনের সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখা হবে না জানি। সে হয়ত এখন কেরানি, হয়ত বা স্পাই! তবু সে আমার বন্ধু। সে সাধ্যাতীতের জন্য সাধনা করেছিল--মন্দিরে পাষাণের বেদীকে সে দেবী বানায়।

তুচ্ছ মেয়েই ত বটে।

সুধাংশুর ঘরে আসি। সুধাংশু মেসোমশায়ের দাদার ছেলে।

—কি করছ, সুধাংশু?

এসো এসো ক্ষিতি-দা। কি আর করবো বলো? সেই ল'-সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য পাড়ে থেকে লগি ঠেলছি। ইকুয়িটেব্‌ল্‌ সেট-অফ মুখস্থ করতে-করতেই অস্ত যাব।

বসি এক পাশে। ভ্রমরের ঘরে একটি বিষণ্ণ দারিদ্র্য আছে—এর ঘরে একেবারে রৌদ্রের প্রখরতা। হঠাৎ মনে হয় যেন মিউজিয়মে এসেছি। ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝকঝক করছে—কাশ্মীর থেকে বর্মা ত আছেই, সুদূর আইসল্যাণ্ডও তার কিউরিয়ো পাঠাতে ভোলেনি। সুধাংশু পড়ে, আর তার চাকর চেয়ারের তলে ব'সে পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দেয়।

হঠাৎ সুধাংশু বললে--আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পার, ক্ষিতি-দা?

যেন পাহাড় থেকে পড়লাম। যার শালের এক ধারের পাড় বেচে একটা লোকের এক মাসের ভাত জোটে সে চায় চাকরি? ঠাট্টা আর কা'কে বলে?

কিন্তু ঠাট্টা নয়! সুধাংশুর মুখে মালিন্য এসেছে। বললে আমার দ্বারা পরীক্ষার সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হওয়া চলবে না, ক্ষিতি-দা। তিনবার ঘায়েল হয়েছি—আমি আর বৌয়ের কাছে অপমান সইতে পারি না। একটা ছোটখাটো চাকরি নিয়ে কোথাও ভেসে পড়তে ইচ্ছা করে!

—বল কি সুধাংশু?

—সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে গেরুয়ার লুঙ্গি প'রে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। বৌকে ছেড়েছিলেন ব'লেই ত শুদ্ধোধনের ছেলে সিদ্ধার্থ হ'তে পেরেছিলেন, ক্ষিতি-দা। আমিও আমার বিলাসের বস্তুটিকে ফেলে একান্ত শস্তা হ'য়ে বিকিয়ে যেতে চাই—

কেউ নেই আমার— শুধু আমি, আর আমার অকূল ভবিষ্যৎ। জেলে গিয়ে পচতেও চাই, কিন্তু এ-রকম জলো হ'য়ে যেতে চাই না।

বললাম—মাসে তোমার তামাকেই একশ' টাকা লাগে—

—আর, জুতোর কালিতে পঞ্চাশ। তাইতেই ত সব তেতো লাগে, ক্ষিতি-দা। আমার একেবারে আলাদা হ'য়ে যেতে ইচ্ছা করে— ছোট সংসারে ছোট গণ্ডীর মধ্যে একান্ত স্বার্থপর, একান্ত একেলা। একটা ছোটখাটো চাকরি তোমার হাতে নেই?

—আছে। রাস্তার ঝাড়ুদারের কাজ। এগারো টাকা মাইনে।

সুধাংশু যেন মরীয়া হ'য়ে উঠল: দাও ঝাড়ু, সত্যি আমি নর্দমা পরিষ্কার করব—

—তোমার শালের কোণটা মাটিতে প'ড়ে গেছে, তুলে নাও।

সুধাংশু শালটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে শান্তস্বরে বললে ঝাড়ুদার হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু ছোটখাটো এটা ইস্কুলমাষ্টারির যোগ্যতা হয়ত আমার আছে। এবারেই আমার শেষ চান্‌স্। এবারে লাফাতে না পারলে আমি চৈতন্য হ'য়ে যাব।

—মালকোঁচা বাঁধবার সময় সেই চৈতন্যটুকু থাকলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়।

—তুমি ঠাট্টা করছ, ক্ষিতি-দা, কিন্তু তুমি জান না, আমি কী অসহায়! বাবু বৌ, তিনটে রোগা ছেলে—এত খায়, তবু চেহারায় হায়া নেই। মাসের বরাদ্দ টাকায় আমার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ হয় বটে, তবু সত্যি আমার মনে সুখ নেই। আমার গরীব হ'য়ে যেতে ইচ্ছা করে।

বললাম - এবারে কোলড ওয়েভ এসেছে—টেম্পারেচার একান্ন। ভালো ক'রে শালটা বুকে জড়িয়ে নাও। জর্জ দি ফিফ্‌থ-এর মতো ফুঁসফুসে জল জমতে পারে।

সুধাংশু বোকার মতো আবার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে!

হেনার সঙ্গে কা'র তুলনা দেবে? গৃহস্থের গৃহকোণে স্তিমিত দীপশিখার, না মেঘম্লান বিষাদিত চন্দ্রালোকের? কি ব'লে বোঝানো যায় একে? সুস্নিগ্ধ রজনীগন্ধা, না বৃষ্টিসিঞ্চিত তৃণকণা? ওকে বোঝানো যায় না—স্বপ্নেও ও ধরা দিতে শেখেনি। ও একটা আইডিয়া!

ভ্রমরের সৌন্দর্য্য তার মুখের সুচারুতায়, হেনার মাধুর্য্য তার করতলে!

কিন্তু দুই চোখে ওর প্রতিভা ও প্রতিজ্ঞার দীপ্তি! ওকে ভাঙা যায়, বাঁকানো যায় না।

ওর ঘরে এলে মনে হয় যেন ছায়ায় এসেছি। সমস্ত ঘরে যেন টোয়াইলাইট্—সব সময়। ওর ঘরের সব রঙ ফিকা—ওর চেহারায় একটি ম্লানাভ নির্মলতা আছে। ওকে দেখলে চট্ ক'রে মনে হয় যেন স্তিমিত সন্ধ্যালোকে একটি ক্ষীণধারা নদী দেখছি। ও যেন নীল আকাশের একটি সঙ্কেত!

ঘর নয়—মন্দির। কোথাও এতটুকু আড়ম্বর নেই—ভূষণস্বল্পতা ওকেও অনির্বচনীয় ক'রে তুলেছে। শুধু দু'টি চেয়ার, পশ্চিমের দেয়ালের ধারে একটি ছোট গোল টেবিল, দু'খানি বই—উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে একখানি নীচু খাট—মাটি থেকে হয়ত শুধু বারো ইঞ্চি উঁচু—তোষকের ওপর গরদের চাদর পাতা আর তার ওপর কতগুলি ফুল! - হেনা গরদ ছাড়া পরে না—গরদে ওর পাড় নেই।

—কি করছ, হেনা?

· আরে, এসো ক্ষিতি-দা। কি আর করব? পড়ছি।

— আজকে এমন একটা শুভসংবাদ পেয়ে বেরিয়ে পড়োনি যে?

হেনা অল্প একটু হেসে বললে—সেই শুভসংবাদে কোনো উত্তেজনার আস্বাদ ত পাচ্ছি না, ক্ষিতি-দা বরং একটি পবিত্রতা পাচ্ছি। আমার এই ছোট ঘরটি দূর আকাশের মতো যেন পরমবিস্তার লাভ করেছে। একটা ভারি সুন্দর বই পড়ছি। মেয়েটি বলছে: তুমি দুঃখ কোরো না—আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে তোমার নিঃসঙ্গতার বিয়ে - তোমার লাঞ্ছনার সঙ্গে আমার লাঞ্ছনার!

টিপ্পনি কেটে বললাম—শেষ পর্য্যন্ত মেসোমশায় মত দিলেন তা'লে? যদি মত না দিতেন?

—মত না দিলে আমিও তেমনি, সেই মেয়েটির মতো তার হাত ধ'রে বলতাম: আমরা পরস্পরের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলাম বটে, কিন্তু এই বিচ্ছেদই আমাদের অন্তরের স্পর্শমণি হোক!...নারীর সতীত্বকে সবাই সম্মান করে, সম্ভব ব'লে বিশ্বাসও করে, কিন্তু নারীর প্রেমের প্রতি-ই যত বিদ্রূপ। তাঁরা বলেন, নারী স্নেহ করতে জানে বটে, কিন্তু ভালোবাসতে জানে না—সে তার গঠনগত অসম্পূর্ণতা। আমি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হতাম—আমি প্রমাণ করতাম ক্ষিতি-দা, যেমন অভিচারের চেয়ে সতীত্ব বড়ো, তেমনি সতীত্বের চেয়ে বড়ো প্রেম—যে-প্রেমে দুঃখদহন আছে, আত্মত্যাগ আছে! তুমি জান না, এই দুঃখ সহ্য করবার সাহসের অভাবেই সমস্ত সৃষ্টি শীর্ণ, বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। শকুন্তলা যেখানে তপোবনবাসিনী, তার চেয়ে উজ্জ্বল—শকুন্তলা যেখানে তপশ্চারিণী! পার্বতীর চেয়ে অপর্ণা!

—কিন্তু আই. সি. এস-এর চেয়ে শেষকালে আই-এস-সি-কে বরণীয় মনে করলে?

—তুমি আমাকে আর হাসিয়ো না, ক্ষিতি-দা! আমি পরীক্ষকদের পার্শ্যালিটির দরুণ একটা এম্. এ. হয়েছি ব'লেই ত আর ডানা গজাইনি। বাবার আপত্তি ছিল ত সেইখানেই। তিনি বলেন—প্রেমে পেট ভরে না।—কিন্তু পেয়ালা ত ভরে—সেই উত্তরটা সেদিন দিলে ভারি বেখাপ্পা শোনাতো; বলিওনি। দিদি এই পেট ভরাবার জন্যেই প্যাটরার উদ্দেশ্যে ডাক্তারের দোরে ধন্না দিলে। ডাক্তার অবশ্যি ওর হার্ট-ডিজিজ সারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জান ক্ষিতি-দা, আমার জীবনের চাহিদা ভারি সাদাসিধা—এখন মনে হচ্ছে কিছুই হয়ত আর চাই না—নিশ্বাসের জন্য পরিমিত বায়ু, দেহধারণের জন্য স্বল্প আহার! প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় না জানি, পরমায়ুও নয়—মানে, প্রেমের প্রগাঢ়তা ধোপে টেঁকে না—মানে, যেখানে পরস্পর পরস্পরকে পেয়ে ফেলে, পেতে থাকে না।—একটি ছোট নীড়, দু'টি ফোঁটা আঁখিনীর—আর ধরণীর ধূলি! তোমার রবীন্দ্রনাথ পড়া আছে, ক্ষিতি-দা?

সোজা বললাম—না। সময় হয়নি।

—আমার আজ কবির সঙ্গে সুর মেলাতে ইচ্ছে করছে:

বহুদিন মনে ছিলো আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
ক'রেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা;
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা॥

বললাম—রবীন্দ্রনাথের বাসা একটুকু নয়—সমস্ত পৃথিবীতে। তোমার বাসা দেখলে তে-তলা, না দেখলে পীযূষের হৃদয়!

হেনা হেসে বললে—ও কবির **ideal existence**। জান, আমিও একদিন কবিতা লিখেছিলাম, শুনবে?—

বহুদিন মনে মোর আশা—
চাহি না পাখীর নীড়,
আমি নহি ধরণীর;
গৃহতরে স্পৃহা নাই, পথের পিপাসা
করিলাম আশা।
তিমির-স্তিমিত রাত্রি নাহি দীপশিখা,
মৃত্যুর আহ্বান আসে : কে অভিসারিকা,
শ্লথবেণী চলিয়াছ চঞ্চল উধাও,
কাহার অলক্ষ্য লক্ষ্মী, কা'রে তুমি চাও?
অজানারে জিনিবারে
নিরুত্তর অন্ধকারে
ডুবিলাম, চক্ষে মম সুদূর-দুরাশা;
গৃহতরে স্পৃহা নাই, ভবিষ্যের ভাষা
করিলাম আশা॥

এ-কবিতাটি বহুদিন আগে লিখেছিলাম। কত দিন আগে বল ত?

সংক্ষেপে বললাম—পীযূষে যখন তোমার গণ্ডূষ ভ'রে ওঠেনি।

হেনার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল। ওর দুই চোখে কবিতার বাতি জ্বলছে।

বললাম—কিন্তু সারা জীবন হয়ত তোমাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

—আমি তার শক্তি পরীক্ষা করব।—হেনার উত্তরে একটা প্রাবল্য আছে : আমি অর্থোপার্জনে ত অযোগ্য নই, এবং যিনি আমার অযোগ্য নন তিনিও নিশ্চয়ই অনর্থক হবেন না।

—পীযূষবাবুর সঙ্গে আমার কবে দেখা হবে?

—বোধ হচ্ছে আজকের দিনটি ছাড়া। বোধহয় আজ সে আমারই মতো ঘরোয়া হ'য়ে আছে।…রংপুরে চাকরি করতে যাব, ক্ষিতি-দা।

—সঙ্গে গাধাবোটটি আছে?

—হাসিয়ো না বলছি। তোমার উপমাগুলি ভারি কাঠখোট্টা।

অবাক হ'য়ে যাই। কঠিন মাটিতে ব'সে হেনা ফানুস ওড়াচ্ছে। ওদের বিয়ে হ'তে এক মাসও দেরি নেই

সিঁড়ি দিয়ে নামছি—সুবলের সঙ্গে দেখা। সুবল মেসোমশায়ের ছোট ভাইয়ের চতুর্থ ছেলে। ষোলয় পড়েছে।

ও সব সময় টগ্‌বগ্‌ করছে। দমকার মতো সব সময়েই ও সজোরে ঝাপটা দিয়ে চলেছে।

আমাকে দেখেই ব'লে উঠল: জান ক্ষিতি-দা, ব্যাপার? হ্যামণ্ড সাট্‌ক্লিফের রেকর্ড ভাঙল?

কথাটা মাথায় একেবারে ধাঁ ক'রে লাগল। মনে হ'ল গ্রীক্ শুনছি।

—হাঁ হ'য়ে আছ কি? কোনো খবর রাখ না তা'লে? টেষ্ট ম্যাচ গো ফোর্থ টেষ্ট ম্যাচ—ইংলণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ায়। কুড়ি বছরের ছেলে জ্যাক্‌সন্ জীবনে প্রথম নেমে পাঁচ ঘণ্টার ওপর ব্যাট চালিয়ে একশ' চৌষট্টি করলে—ভাবতে পারো? যাবে র‍্যাণ্ডিলেড্?

সুবল আমার হাত ধ'রে টেনে বললে—এসো আমার ঘরে।

সুবলের ঘরটি ছোট—বলতে গেলে হকি-ষ্টিক্ আর ব্যাটে বোঝাই। কলকাতায় যখন এম্. সি. সি. এসেছিল তখন একখানা ব্যাটের ওপর ও তাদের এগারো জন খেলোয়াড়ের সই নিয়েছে—সেটা দরজার সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে।—পড়ার বই ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, টেবিলে ও খাটের ওপর খালি কতগুলি পিকচারগো আর স্ফিয়ার্ পত্রিকা।

সুবল কোনো ম্যাচে এখনো সেঞ্চুরি করতে পারলো না—এই ওর আপশোষ।

বললাম—পড়াশুনা কি তোমার রসাতলে গেছে?

—রস পাই না ব'লে তাদের সেখানেই পাঠিয়েছি। ম্যাট্রিক পাশ করতে না পারলে বাবা ডিস্‌ইন্‌হেরিট্ করবেন বলেছেন। ভারি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি। ভালো লাগে না পড়াশুনো।

—কি ভালো লাগে?

—সত্যি বলবো?—সিনারি আর মেশিনারি! সিনারির মধ্যে কি ভালো লেগেছিল শুনবে?—একটি তামিল ভিক্ষুক মেয়ে তার বুড়ো স্বামীর জন্ম ভিক্ষা চাইছে, আর একবার দেখেছিলাম ইটের ফাটলে ছোট কচি একটি বটগাছ। দেখবে সেই তামিল-মেয়ের ছবি?

ব'লে সুবল এক-ব্যাগ ফটো বা'র করলে। সুবলের ক্যামেরার সামনে কে যে না দাঁড়িয়েছে ঠিক নেই। বুড়ো মজুর, ভাঙা বাড়ি, পচা ডোবা - সবই কেমন খাপছাড়া।

-- আর মেশিনারির মধ্যে কি আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল, জানো? গয়া এক্সপ্রেস-এর চৌচির এঞ্জিনটা - যেন দেশলায়ের কাঠি। আমি ছিলাম সেই গাড়িতে—খালি এই দাঁতটা গেছে। জানো ক্ষিতি-দা, আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করছি।

—কি?

—তাতে ক'রে মানুষের astral body এক সেকেণ্ডে যে-কোনো জায়গায় চ'লে যেতে পারবে।

—সে ত যাচ্ছেই। উড়ে যেতে মনের এক সেকেণ্ডও লাগে না।

—তেমন যাওয়া নয়। এ সত্যি গিয়ে বসবে, শুনবে দেখবে, কথা কইবে— খালি ছোঁয়া যাবে না তাকে। হিমালয় তার বাধা হবে না, না বা আটলান্টিক। এ-বিষয়ে কোনান্ ডয়েলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হ'ত।

কৌতূহলী হ'য়ে বললাম—আর কি ভালো লাগে তোমার?

—তিনটি বিস্ময়কর আবির্ভাব একটি আকাশে, একটি জীবনে, আরেকটি ষ্টেজে! সহসা একদিন খুব ভোরে জেগে উঠে সমস্ত রাত্রির ঝড়ের পর সূর্য্যোদয় দেখেছিলাম—তা আজ ভাবলেও আমার আনন্দে হৃৎকম্প হয়। দ্বিতীয়টি— ভোরবেলায় স্নান ক'রে ক্ষৌমবাসে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার বসবার ঘরে এসে দাঁড়ান— তুমি তা ধারণা করতে পারবে না, ক্ষিতি-দা -- যেন একটি স্তব মানুষের মূর্তি নিয়েছে। আরেকটি দেখেছি আলমগীরের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ি যখন রঙ্গমঞ্চে এসে প্রথম দেখা দেন - কাছাকাছি একদিন আলমগীর দিলে দেখে এসো। ও! তুমি ত আবার থিয়েটারের ওপর চটা। সিনেমার ওপরো?

— নিশ্চয়।

—কেন নিশ্চয়? যাও, যাও একদিন চার্লি মারে আর জর্জ সিডনিকে দেখে এসো, হেসে-হেসে সুস্থ হবে—দেশের জন্য গুণ্ডামিটা ঠাণ্ডা কর দিন কতক। হলিউড ষ্টুডিয়োর ছবি দেখবে একটা? ডগলাস আর পিকফোর্ড। বলো ত, কেমন সুখে আছে ওরা!

হঠাৎ সুবল গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে তুমি নাচ ভালোবাসো?

– ভালুক-নাচ ?

—না না, আনা পাভলোভার নাচ ! এম্পায়ারে দেখতে গেছলাম সেদিন। সুপার্ব ! কিন্তু যাই বলো ক্ষিতি-দা, নটীর পূজার কাছে লাগে না ! তুমি দেখনি ত ? তুমি কেন আছ তা'লে—খালি মুগুর ভাঁজবে ? পাভলোভা মনকে অভিভূত করে বটে, কিন্তু প্রীত করে না, ঠিক হুইটম্যান্-এর কবিতার মতো মনে একটি বিষাদশ্রী আনে না। আচ্ছা, তুমি রেস্ ভালোবাসো ? আমার কাছ থেকে টিপ্‌স নেবে ? এই যা, তোমাকে একটা জিনিসই দেখানো হয়নি – এই দেখ, এই পাখার ওপর পাভলোভা তার নাম লিখে দিয়েছে। আমি গেছলাম দেখা ক'রতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

বললাম —আজ ত শনিবার, যাবে না বায়স্কোপ ?

হঠাৎ সুবলের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। বললে—সেই ত দুঃখ -- বাবা আর পয়সা দেন না। আজ He who gets slappedটা ছিল, শুনেছি খাসা ফিল্‌ম —আঁদ্রিভ-এর ড্রামা, পড়েছ নিশ্চয়ই ; দেখেছ লন্ চ্যানিকে ?—সহস্রানন ! কিন্তু ট্যাকে আধলাও নেই একটা। সেদিনকার ফ্ল্যাশ একেবারে ফতুর ক'রে দিয়েছে। জানই ত চার-আনা আট-আনায় আমার পোষায় না। আমাকে দেবে তিনটে টাকা ধার ? ব'লে হাত পাতলে।

ধমক দিয়ে উঠলাম। সুবল খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

খানিক বাদে মুখ গম্ভীর ক'রে বললে আজ যদি slumming করতে বেরিয়ে কোনো মজুরের দুঃখ দেখ, তা'লে নিশ্চয়ই তাকে তিনটে টাকা দিয়ে ফেলে তার দুঃখকে প্রশ্রয় দেবে। কিন্তু, আমি আজ বায়স্কোপ দেখতে পাচ্ছি না সেটা তোমার কাছে একটা দুঃখই নয়। তুমি ভারি সেন্টিমেণ্টাল, ক্ষিতি-দা ! আজ উপোস্ ক'রে থেকে সমস্ত রাত্রি তোমার মজুর-hero যে কষ্ট পাবে আমি তার চেয়ে ঢের বেশিই কষ্ট পাচ্ছি। মোটে তিনটি টাকা—দেবে ? আরো যদি দুটো টাকা বেশি দাও, একবার সোডা-ফাউন্টেনে ঢুঁ মেরে আসি। ব'লেই আবার হাসি।

উঠছি, সুবল বললে—সেজদার ঘরে যাচ্ছ ? নিশ্চয়ই কবিতা লিখছে এখন। ওঁকে দেখেছ ত ?

সুবল আবার হাসলে। বললে—তুমি কাউণ্টি কালেনের কবিতা পড়নি ?

Yet do I marvel at this curious thing :

To make a poet black, and bid him sing !

যাও যাও, সেজদাকে একবার দেখে এসো।—বাংলা কাব্যমন্দিরের কালাপাহাড় !

চট ক'রে প্রশ্ন করলাম—ওঁর কি দুঃখ ?

—বাংলা দেশে ওঁর নাম হচ্ছে না—প্রশংসা-কাঙাল সেজদার এই দুঃখেই

কবিতা অপাঠ্য হ'য়ে উঠছে। বাংলা দেশে এতগুলো যে খিস্তির কাগজ আছে তার একটাও ওঁকে গালাগাল দিয়ে পরোক্ষে ওঁর অধ্যবসায়ের তারিফ করছে না—এ ওঁর অসহ্য। তুমি যাও দেখা করতে, তোমাকে এক্ষুনি ওঁর কবিতার সমালোচনা লিখে দিতে বলবেন। যদি বলো অতি রোথো, থার্ড-রেট কবিতা, তবে একমাত্র রেগেই ওঁর passion দেখাবেন। এ-রকম সত্যিই একটা কাণ্ড ঘ'টে গেছে।

বললাম—কবিতা শোনবার মতো আমার অস্বাস্থ্য নেই।

—Eggzactly! বলো না ওঁকে সে-কথা, থামচে দেবেন। উনি নিজেই এক কাগজ বের ক'রে নিজের কবিতার কুকীর্তি কীর্তন করবেন ঠিক করেছেন—যদি তাতে অন্তত লোকের চোখ পড়ে। সেজদার জন্য আমার ভারি করুণা হয়, ক্ষিতি-দা! ওঁকে পিঁজরাপোলে কেন পুরে রাখে না? আমায় যদি বায়স্কোপ দেখতে কিছু টাকা দেন, আমি ওঁর কবিতার জন্য প্রোপাগাণ্ডা করি—কর্পাট ক্রক, ড্রিঙ্কওয়াটার, গিবসনরা যেমন করেছিল—

বেরুচ্ছি, সুবল চেঁচিয়ে বললে—সেজদার আরেক কীর্তি শুনে যাও, ক্ষিতি-দা।

ফিরলাম।

—সেজদা কবিতায় কুস্তি ত করেনই, এমনিও করেন। এগিয়ো না ওঁর কাছে। ওঁকে তৎক্ষণাৎ সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে। এখানেই আরেকটু বোস। আমার অটোগ্রাফের খাতাটা দেখে যাও।

ব'লে এক খাতা বের করলে। ভাবছিলাম বুঝি মহর্ষি বাল্মীকিরো দস্তখৎ দেখতে পাব। কেননা সুবলের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়!

সুবল বললে—এ সব খুব নিরীহ নগণ্য লোকদের সই—আমাদের উড়ে মালির, ঝাড়ুদারের, দরোয়ানের—

বললাম—ওরা লিখতে জানে নাকি?

—উড়ে মালিটাকে হাত ধ'রে-ধ'রে লিখিয়েছি, ঝাড়ুদারটা আঁকি-বুঁকি দিয়েছে কতগুলি। এই দেখ, বই-বাঁধানো দপ্তরির, ফোটো-ফ্রেমারের, বাজার-সরকারের, বোতল-বিক্রিওলার—কার নেই সই? এই একটা ভিখিরির। এ একটা দামী জিনিস বলতে হবে। আর এই দেখ সেজদার, একজন ব্যর্থ বোকা কবির।

হেসে উঠলাম। সুবল বললে—জীবনে যারা পতিত, পরাজিত—এই ক'টি আখরের আঁচড়ে তাদের দীর্ঘশ্বাস জমা ক'রে রেখেছি। তুমিও ত কত গুণ্ডামি করলে, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না—দেবে তোমার সই?

চুপ ক'রে রইলাম।

সুবল বললে—একটা কথা ভুল বলেছি। সেজদা যে-খিস্তির কাগজ বার

করছেন, তাতে তোমাকেও গাল দিতে পারেন তুমি ওঁর কবিতার সার্টিফিকেট দাওনি ব'লে—যদি তোমাকে গাল দেন তবে তুমিও কোনো কাগজে ওঁকে গাল দিয়ে ওঁকে একটু মর্যাদা দিয়ো, ক্ষিতি-দা। এত কষ্ট হয় ওঁর জন্য।

রুষের জন্ম আলাদা ঘর নেই— কিন্তু একটি বাক্স আছে। সেই বাক্স নিয়ে ওর দোকানদারি আর ফুরোয় না—সেই বাক্সই ওর সম্পত্তি, ওর শৈশবকবিতা!

রুষ্ বলে—আমি কবে বড়ো হ'ব, ক্ষিতি-দা?

হাত দুটো উঁচুতে ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠে রুষ্ বলে -আমি বড়ো হ'য়ে কবে আকাশ থেকে সূর্য্য পেড়ে আনব? ঐ মেঘটাকে কেড়ে আনবার জন্ম মইর মতো লম্বা হ'ব কবে?

এ-ছাড়া রুষের মুখে আর কোনো কথা নেই।

রুষ্ সমস্ত বাড়ি মাতিয়ে রেখেছে - রুষ ছাড়া কারো খাবার রোচে না। ভ্রমর রুষ্‌কে কাপড় পরিয়ে দেয়, হেনা কানে দেয় ফুল গুঁজে, হ্নাই দেয় চুল ছেঁটে, সুবল তার অটোগ্রাফের বইয়ে ওর আঁকিবুঁকি সই নেয়, মোটা সেজদা ওকে নিয়ে কবিতা লেখে।

রুষ্ ছোট সাইকেল চালায়, ছোট থালায় ভাত খায়—আর বড়ো হবার স্বপ্ন দেখে।

আমি থাকি নীচে একতলায়, ঠিক সদর দরজার পাশে। সকলের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে আলাপ ক'রে শুতে-শুতে রাত দু'টো বাজে।

এরা সবাই যখন একসঙ্গে থাকে, তখন মনে হয় এদের ঘিরে স্ফূর্তির ফোয়ারা চলেছে - বিলাসের প্রাচুর্য্য ও আড়ম্বরের কৃত্রিমতার মাঝে এদের দুঃখকে ছোঁয়াই যায় না। মনে হয় না নীরেন চক্রবর্তীর জন্য ভ্রমরের মন একদিনো উচাটন হয়েছিল, মনে হয় না পীযূষকে পাবে না জেনে হেনা কোনোদিন দুঃখের তপশ্চারণের প্রতিজ্ঞা করেছে। একসঙ্গে থাকলে মোটা সেজদাকেও মনে হয় না সে কবিযশভিখারী, মনে হয় বড়ো-বড়ো হাঁ ক'রে ভাত খাওয়াই ওঁর কাজ।

কিন্তু যখন ওরা একা থাকে, তখন যাও ওদের কাছে। ভ্রমর অতীতের একটি ছায়াশীতল দিনের কোলে এখনো ঘুমোয়, হেনার দুই চোখে এখনো অনিশ্চয়তার অন্ধকার, সুধাংশু স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচিত্ত হ'য়ে যেতে চায়, মোটা সেজদা কবিতা ভালো লিখতে পাচ্ছে না ব'লে কপাল কোটে। যদি মেসোমশায়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, শুনব হয়ত তিনি ইন্‌সলভেন্ট, তাঁর ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যাবে: আরো লাখ সাতেক ক্যাপিট্যাল চাই হে।

রাত তখন কটা হবে ?—তিনটা প্রায়। সদর দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। উঠে দরজা খুললাম। যিনি ঢুকতে পারছিলেন না তিনি মেসোমশাইয়ের দাদার তৃতীয় পুত্র—নাম ললিত।

ছি ছি, সারা গা ঘিন্‌ঘিন্ করছে। ললিতচন্দ্র দস্তুরমতো টলছেন।

ঘৃণার স্বরে বললাম— এ কি ললিত, ছিঃ! এততেও তোমার লজ্জা নেই ?

ললিত আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে বললে আমার পিঠে কয়েকটা লাথি মেরেও যদি তার আদ্ধেকের আদ্ধেক টাকা দাও, তাহলে আমি আরো খানিকটা খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে যেতে পারি। দেবে না ? সত্যি ক্ষিতি-দা, আমি বেহুঁস হ'য়ে যেতে চাই, থেমে যেতে চাই—

আমার বিছানায় ওকে শুইয়ে দিলাম। ললিত জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল : **I have been faithful to thee Cynara ! in my fashion.**

বললাম- তোমার এই দুর্মতি কেন, ললিত ?

—দুর্মতির জন্যই দুর্মতি. ক্ষিতি-দা। পিপাসার জন্য জল খেতে গিয়ে দেখলাম গলায় কে কলসী বেঁধে দিয়েছে।

—আর কোনোদিন খেয়ো না।

—কে ? তুমি বলছ, ক্ষিতি-দা ? সে এসে বললেও খেতাম, পেছ-পা হ'তাম না।

—কে সে ?

—স্বয়ং Cynara।

ওর চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বললাম— কাকে ভালোবেসেছিলে ?

—মোট্টে না। কোথায় সুযোগ ভালোবাসবার ? ভালোবাসা ত একটা air বই কিছু নয়। আমার উচ্ছন্নে যাবার কোনো ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল ব্যাখ্যা নেই আমি এমনি ডুবলাম।

বললাম—তবে কে এই Cynara ?

—চেন না তাকে ? যাকে শুধু in fashion-ই পাওয়া যায়।

বললাম—মিথ্যে কথা।

—একটা সত্য কথা না শুনলে বুঝি তোমার মন ওঠে না· Cynara আমার ভাবী স্ত্রী, মদ ছাড়বার জন্য ভালো হ'য়ে যাবার জন্য যাকে আমার বিয়ে করতে হবে, যাকে কোনোদিন আমি হারাতে শিখব না। সেই—আমার অনাগত প্রেমপাত্রী। তার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি কি না –

—কত উড়োলে ?

– বহু;—রেখেই বা কি হ'ত ? দারিদ্র্য আর স্বাচ্ছন্দ্য দুই-ই আমার কাছে সমান।

আচ্ছা, তোমার মনে হয় না ক্ষিতি-দা, সমস্ত সৃষ্টিটাই একটা নিরর্থক আর্ট! মনে হয় না, আমাদের জন্মটা একটা নিদারুণ পাপ—সমস্ত জীবনটা আমাদের অন্তরীণ-বাস, মুক্তি আমাদের মৃত্যু। মনে হয় না? তুমি ত দেশের মুক্তিকামী—তুমি তা'লে মদ খাও না কেন, ক্ষিতি-দা?

বললাম—তোমাদের মতো মেরুদণ্ড আমার কোমল নয়, ললিত।

ললিত বললে—ক্ষিতি-দা, তুমি একটা ইডিয়ট।

খানিকবাদে ললিত বললে—ঘুমোচ্ছ? শুনলে না Cynara কে? জীবন-ব্যাপারে তোমার কৌতূহল এত কম, ক্ষিতি-দা?

ঘুমোবার ভান ক'রে রইলাম।

ললিত বলতে লাগল: Cynara ত এলেন, রূপ আর বেশের বর্ণনা নাই বা করলাম, এসে যা বলবার বললেন।

—মানে?

—বললেন, ভালোবাসি। আমি কি বললাম, জান?

—না।

বললাম, দাঁড়াও, কাগজ কলম ষ্ট্যাম্প আনি—কণ্ট্রাক্ট-ফর্মে সই করতে হবে। ছ'মাসের জন্য ভালোবাসার কণ্ট্রাক্ট, ক্ষিতি-দা।

—ছ'মাস ত ছিল?

—ছ মাসের ছ'দিন কম।

এ-বাড়িতে আমার আর থাকা চলবে না। এদের নির্জীবতা এদের অস্বাস্থ্যকর ভাবাকুলতা আমাকে অসহ্য পীড়া দিচ্ছে। আমাকে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে ঝড়ো হাওয়ার মতো—আমি পায়রার কোটরে কয়েদ থাকব না!

ভ্রমরের সঙ্গে দেখা। ছেলেকে নিয়ে খুব আদর করছে।

বললাম—আমি যাচ্ছি, ভ্রমর।

—কোথায় যাচ্ছ?

—আপাতত পথে।

—বা রে, আমরা যেতে দিলে ত!

বললাম—কাউকেই ধ'রে রাখতে পারনি, নীরেন চক্রকেও নয়। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা সুসংবাদ দিয়ে যাব। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, ভ্রমর।

—আমার আবার মনস্কামনা কি ?

—তোমার ইচ্ছা ছিল নীরেন যেন ভদ্র ব'নে যায়। সে তাই হচ্ছে—আসচে সপ্তাহে তার বিয়ে।

যেন উল্লাসে ভ্রমর বললে—বল কি ! সত্যি ?

কিন্তু কথার সুরে একটা কাতরতা প্রচ্ছন্ন ছিল।

বললাম—তোমাকে নেমন্তন্ন করতে ব'লে দিয়েছে।

ভ্রমর সহসা উদাসীন হ'য়ে গেছে। বললে—ভালই ত, কিন্তু কে না কে—তার বিয়েতে আমি যাব কিসের জন্য ? সে আমার কাছে একটা পথের লোক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ক্ষিতি-দা, তোমরা ত মেয়েদের খুব ঠাট্টা কর, কিন্তু তোমাদেরই বা সেই আদর্শ-আরাধনা কই, তার জন্যে কঠোর কষ্টভোগ কই ? নীরেনের এই অধোগতি আমাকে যে কী অপমান করছে বলতে পারি না।

বললাম—এ মজা মন্দ নয় ! তুমি যে ভারি স্বার্থপরের মতো কথা কইছ, ভ্রমর।

—কিন্তু নীরেনকে আমি এত ছোট কোনোদিন মনে করিনি, ক্ষিতি-দা। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলেও তার নিষ্ঠার প্রতি আমার আসক্তি ছিল। ছি ছি।

—ঠিক এমনি তোমাকে সেও ছি-ছি করেছে।

—তবু, তবু ক্ষিতি-দা, নীরেনকে আমি সত্যি-সত্যি কত বড়ো মনে করতাম ! আমার সংসার-জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল আজ। নীরেনের স্মৃতি আমার কাছে আমার সন্তানের মতোই স্নেহাস্পদ ছিল ! তুমি আমাকে এ কী শোনালে ?

ভ্রমরের দুই চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে। করুণ ক'রে বললে—আমার জীবনে কবিতার একটি কণাও আর রইল না, ক্ষিতি-দা। নীরেনের বেদনা আমার জীবনে পরমমধুর একটি লাবণ্য বিস্তার করেছিল, আমি আজ একেবারে বিরস, বিগত-সৌরভ, বিফল হ'য়ে গেছি। কেউ আমার জন্যে মার্টার হয়েছে—এ ভাবার মধ্যে বেদনা ও স্নেহের সঙ্গে কী প্রকাণ্ড গৌরব ছিল !

ভ্রমর উদাসীনের মতো চুপ ক'রে ব'সে আছে খাটের বাজুতে কনুই রেখে। ভ্রমরের চোখে জল দেখে মনটা ভিজে উঠলো। বেচারা নীরেন !

হেনার ঘরে যেতে-যেতে শুনলাম সুধাংশু আর তার বৌর বাক্যুদ্ধ চলেছে। সুধাংশু কেন এবারো পাশ করতে পারল না—বৌর আপত্তি সেইখানে ; বৌ কেন বাইবেলের প্রথম উপদেশ বৎসরে বৎসরে পালন করছে—সুধাংশুর আপত্তি অবান্তরিক।

হেনার ঘরে এসে দেখি হেনা ভারি ব্যস্ত হ'য়ে জিনিসপত্র গুছোচ্ছে। ওর দুই উৎসুক করতলে সেই দিৎসা, সেই চঞ্চল স্নেহাকুলতা।

বললাম—এত তাড়াহুড়ো কিসের, হেনা?

হেনা বললে—আমি রংপুরে যাচ্ছি ক্ষিতি-দা, এক হপ্তার মধ্যেই। আমাকে সেই মাস্টারিটা নিতেই হ'ল।

—কেন? তোমার বিয়ে?

—সে আর হচ্ছে না। তুমি বুঝি শোননি কিছু? পীযুষের টি. বি…

হেনা যেন বলতে বলতে নিজেই শিউরে উঠছে।

বললাম—বল কি?

—তুমি তার চেহারা দেখলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, ক্ষিতি-দা—একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। আমাদের মিলনের মাঝে মৃত্যুকে দেখলাম। মৃত্যুর নিশ্বাসে প্রেম যদি পুড়ে যায়—আমি যদি আবার কোনদিন পীযূষকে ভুলে যাই—সে কী মারাত্মক ট্র্যাজেডি।

—তুমি তাকে ফেলে মাস্টারি করতে যাবে?

—সে-ই ত আমাকে ফেলে যাচ্ছে। মৃত্যুটা হয়ত তত শোচনীয় নয় ক্ষিতি-দা, মৃত্যুর পরে বিস্মৃতিটা যেমন। আর তাকে মনে রাখব না—তাকে ভুলে যাব, আবার তেমনি সময়ের চাকা গড়িয়ে চলবে—আমার জীবনের সেই দুর্দিনের চেহারা ভেবে আমি ভারি ভয় পেয়ে গেছি। আমাকে সারা জীবন যুদ্ধ করতে হবে, অথচ পরাস্ত হবার গৌরবটুকুও আমার রইল না।

হেনা ললাটের ঘাম মুছবার ছলে চোখের জল মুছে ফের বললে– আমি ত আমার বর্তমান শক্তির তৌলে ভবিষ্যতের জরার পরিমাপ করতে পারছি না, তাই হয়ত কোনোদিন অবশ্যম্ভাবী ঘটনার কাছে আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রতে হবে এটুকু দূরদর্শী হ'তে গেলেই আমার সমস্ত অস্তিত্ব সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে। আমার অতীতকাল ম্লানমুখে প্রার্থীর মতো চেয়ে থাকে। অতীতের প্রতি সেই অবমাননা কি নিদারুণ, ক্ষিতি দা!

বললাম আশায় একেবারে দেউলে হ'য়ে গিয়ে লাভ নেই, হেনা।

হেনা কি ভেবে খানিক বাদে ব'লে উঠল: আশা করব, না? তাহলে রংপুরের পোস্টটা না নিলাম, কি বল?' পুরী-ই যাই তাহলে। পীযুষ সেখান আছে —একবার প্রাণপণ দেখি না চেষ্টা ক'রে সে বাঁচে কি না। তবে রইল রংপুর।

ব'লে হেনা সব জিনিস-পত্র ওলোট পালোট করতে লাগলো।

হঠাৎ বললে—প্রেমের মাঝে মৃত্যুর আবির্ভাব—একটা এপিক লিখবার বিষয়,

না ক্ষিতি-দা? যদি লিখে উঠতে না পারি নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করব। আশা—আশা!

সুবলের ঘরে এসে দেখি দরজায় একটা পিজবোর্ড টাঙানো—তাতে লেখা: **To Let**।

কি ব্যাপার? বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সুবল নাকি বাড়ি ছেড়েছে। ও জাহাজের খালাসি হবে, এঞ্জিন-ড্রাইভার হবে, কলের কুলি হবে—তাও স্বীকার, ওর পয়সা চাই, ব'সে ব'সে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবার মতো আলস্যকে ও বরদাস্ত করে না—ও খেটে পয়সা কামাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

ওকে যেন কেউ না খোঁজে—দৈনিক কাগজে যেন বিজ্ঞাপন না দেয়।

তারপর এক দিন—সেই দিনের ঘটনাটা ব'লেই পাথুরিয়াঘাটা বাই লেনের তেতলা বাড়ির ওপর যবনিকা টানব।

তারপর এক দিন—তেতলার ছাতের ওপর দিয়ে একটা ঘুড়ি উড়ে যাচ্ছিল, রুষ্ গেল হাত বাড়িয়ে ধরতে।

রুষ্ পলকের মধ্যে তেতলার ছাত থেকে প'ড়ে গেল বাড়ির সিমেণ্ট-করা উঠোনের ওপর। মাঝের ফাঁকটা রুষ্‌কে ধ'রে রাখতে পারেনি, অদম্য রুষের গতি—উঠোনই ওকে আশ্রয় দিলে। স্তব্ধ রুষ্, রক্তাক্ত রুষ্!

সমস্ত অরণ্যে আগুন লেগেছে; প্রকাণ্ড জাহাজ রাত্রির ঝঞ্ঝাবিদীর্ণ অন্ধকারে সমুদ্রের তলায় ডুবছে; একটা আগ্নেয়গিরি যেন মুহূর্তমধ্যে মরীয়া হ'য়ে উঠল।

চিরকালের জন্য রুষ্ থেমে গেছে—এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে বোধগম্য, এর চেয়ে অপ্রতিরোধ্য আর কি আছে পৃথিবীতে?

নীরেন বিয়ে করছে ব'লে ভ্রমরের আর তিলার্ধ দুঃখ নেই, পীযুষের আসন্ন তিরোধানের অন্ধকার হেনার চক্ষু থেকে মুছে গেছে। Cynara ব'লে যে কেউ ছিল ললিত তা আজ মনে করতে পারছে না, মোটা সেজদা পর্য্যন্ত ভাবছে—শিশুর মৃত্যুর অন্ধকার সমুদ্রের মতোই বিশালবিস্তৃত—কবিতার সঙ্কীর্ণ আয়তনে তার স্থান নেই। সুবল হয়ত ভাবছে রুষের যাত্রা কত সুদূর অভিমুখে, এভারেষ্ট ছাড়িয়ে, কামস্কাট্‌কা ছাড়িয়ে! সুধাংশু ভাবছে—হোঁক সে ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু তার সব ক'টি সন্তানই যেন বেঁচে থাকে।

সমস্ত বাড়ির ভিত্তি ন'ড়ে উঠেছে যুদ্ধে সমস্ত দেশ যেন উজার হ'য়ে গেল। নির্জন রাত্রির কল্পনামণ্ডিত ছোট-খাটো সমস্ত দুঃখ শোকবন্যায় ভেসে চলেছে—

মানুষের স্নেহবন্ধন কত ভঙ্গুর, মানুষের আশা কত ক্ষীণায়ু, মানুষের প্রতীক্ষা কি বিশ্বাসঘাতক!

শুধু আমিই বিচলিত হইনি। শুধু আমিই বলতে পারলাম—মাসিমা, রুম্‌কে এবার ছাড়ুন, ওকে এবার নিয়ে যেতে হবে।

প্রশস্তি

ছোট ছেঁড়া র‍্যাপারখানি কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আসে। শীতটা খুব জোরেই পড়েছে।

ঘরে ঢুক্‌তেই নেপালি চাকরটার সঙ্গে দেখা—ঘর সাফ্‌ করছিল। মুখটা অনেকদিন থেকে পরিচিত, পাষাণের মতো নির্বিকার। ঐ উদাসীন মুখটার দিকে চাইলেই ওর ভয় হয়।

তবু, অকারণে বিনীত হ'য়েই বলে – ডাক্তারবাবু আছেন?

যেন কত অপরাধী! ঐ নেপালি চাকরটার সুস্থ দৃঢ় বিস্তৃত বুকটার পাশে ওর শীর্ণ কঙ্কালটা যেন ব্যঙ্গ ক'রে ওঠে। নিজেকে এত অনর্থক মনে হয়!

চাকর বেশ বিরক্ত হ'য়েই বলে—সাব্‌ সাড়ে আট্‌টার আগে ত কোনোদিনই নাবেন না।

জানা কথা। তবু একটি নিদ্রাহীন দীর্ঘ রজনী কাটাতেই যেন কত যুগ কেটে গেছে। অপরিসীম ক্লান্তি।

নির্দিষ্ট বেঞ্চিটাতে বসে। অনেকক্ষণ। পাশের বাড়ির পাঁচিল টপ্‌কে বারান্দার টবের কি-একটা শিশু-গাছের নবোদ্গত পাতায় আঙুল বুলিয়ে রৌদ্র ডাক্তারের ঘরে আসে। কত প্রফুল্ল, কত বাঞ্ছনীয়!

খবরের কাগজওলা দিনের কাগজ রেখে যায়—দু'তিন রকম। ও হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ও না। সব বিস্বাদ লাগে। চীনে মারামারি—তাতে ওর কি? ও কান পেতে ডাক্তারের জুতোর শব্দের জন্য প্রতীক্ষা করে। ভাবে, সমস্ত চীন যদি তুব্‌ড়ির মতো একদিন ফেঁসে যায়, যাক্‌—আর ও যদি আরেকবার বেঁচে ওঠে! কিই-বা হবে বেঁচে?—তাও মাঝে মাঝে ভাবে।

চাকরটার দারুণ বিরক্তি লাগছিল নিশ্চয়। এক সময় উপরে উঠে গেল।

পর্দাটা একটু সরিয়ে বললে—বাবু, সেই লোকটা। অনেকক্ষণ থেকে ব'সে আছে।

—জ্বালালে! যা, যাচ্ছি। ননসেন্স্‌।

রমার কিন্তু স্বামীর এই আকস্মিক ঘৃণার কারণ জানবার এতটুকুও কৌতূহল

হ'ল না কি নিয়ে যেন দু'জনে একটা বচসা হচ্ছিল—তার স্রোতকে আরো মুখর ক'রে দিয়ে বললে—এটা আমার চাই-ই, তুমি ঠাকুরঝিকে আর একটা কিনে দাও গে—আরো দামী, আরো মজবুত—

ডাক্তার জুতোর ফিতে বাঁধ্‌তে-বাঁধ্‌তে বললে দু'বার ক'রে খরচ করবার মতো আমার পয়সা নেই।

—আল্‌বৎ আছে। নইলে আজ কক্ষনো—। যে-হাতে মড়া কাটো সে-হাত দিয়ে ছুঁতেও দেবো না আমাকে। শোনো, যাচ্ছ যে বেরিয়ে, বায়স্কোপে যেতেই হবে আজ। আমার আরো একজোড়া ব্রেস্‌লেট চাই-ই।

ডাক্তার বললে আর একজোড়া নাকছাবি?

হঠাৎ রমা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে বললে আর একজোড়া—

নেপালি চাকরটার আবার অভ্যুদয় হয়। বলে—লোকটা একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। বলে, আপিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার জুতো মস্‌মসিয়ে নামে। রমা চেঁচিয়ে ওঠে: রাস্তায়-রাস্তায় রোদ্দুরে না ঘুরে চট ক'রে চ'লে এসো—ঢের কথা আছে। পরে চাকরটাকে ধম্‌কায়: রুগীর আবার আপিস কি রে? যাক না আপিসে, কে ধ'রে রাখছে? আপিসে যাবার গাড়ি চাই না?

ডাক্তারের প্রথম সম্ভাষণ: আমার ভিজিট কই? তিন-দিনেরটা জ'মে গেছে। দিয়ে দিন এবার।

রেবতী পাংশুমুখে বললে—মাইনে ত এখনো পাইনি। মাসের মোটে সতেরো দিন আজ।

ডাক্তার বললে—রোগ চোদ্দ দিন ছেড়ে চোদ্দ বছর অপেক্ষা করতে পারে, আমরা পারি না। দিন। তা ছাড়া ইনজেক্‌শন্‌গুলোর দাম দিতে হবে একুণি—

—কিছুই ত নেই—

ডাক্তার বললে নাচার! আমাদের ব্যবসা চলে কি ক'রে তাহলে বলুন?

অতিশয় সত্য কথা।—তোমার সামান্য ব্যবসার থেকে আমার জীবনের দাম ঢের বেশি—এ অত্যন্ত বাজে যুক্তি। নিরুপায় নিঃসহায় ভাবে রেবতী চেয়ে থাকে।

তবু বলে—কিন্তু কাল রাত্রে যন্ত্রণাটা বড্ড বেড়েছিল।

কথাটা নিতান্ত খাপছাড়া শোনায়।

ডাক্তার সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলে—কিন্তু পেটের যন্ত্রণা ব'লে আমাদেরো

একটা ব্যায়রাম থাকতে পারে। পয়সায় যখন কুলোয় না, হাসপাতালে গেলেই ত পারেন—

রেবতী বলে কিন্তু আপিস। চোদ্দ দিন ফুরুলে কয়েকটা টাকার আশা।

ডাক্তার বিরক্ত হ'য়ে বলে—বটে! অত বাবুগিরি ক'রলে কি ক'রে চলে? এই ইস্‌মাইল—

ইস্‌মাইল মোটরে ষ্টার্ট দেয়।

গাড়িতে উঠে ডাক্তার উপদেশ দেয় বিনি পয়সায় ব'লেই হয়ত: অন্যায় করলে শাস্তিভোগ করতেই হবে। বলেছিলেন, পনেরো দিন বাদেই সব চুকিয়ে দেবেন—আমি বিশ্বাস করেছিলাম। ভুল হয়েছিল। - এই, চালাও।

টাকার জোগাড় হয়। কেমন ক'রে হয়—কি কাজ ডাক্তারের জেনে?

টাকায় সাড়ে তিন আনা সুদ—কাবলিওয়ালা বাঁচিয়েছে। মনে-মনে বিধাতাকে রেবতী প্রণাম করে। কাবলিওয়ালার কর্কশ নিষ্ঠুর বুকের অন্তরালে ব'সে বিধাতা ওকে অভয় দেন। একবার ত ভালো হোক—আপিস ত আছেই, দু'বেলা ছেলে পড়াবে--বাড়তি সময়ে মোট বইতেও নারাজ নয়। নিজের ক্লান্তকাতর দেহটার দিকে একবার তাকায়।

একরকম ছুটেই চলে।

দরজার কাছেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা—বেরুচ্ছিল হয়ত। অদূরে একটি মেয়ে—ভালো দেখা গেল না, রেবতীকে দেখেই স'রে গেছে।

রেবতী হাঁপ নিয়ে বললে—টাকাটা এনেছিলাম।

ডাক্তার অত্যন্ত কটুকণ্ঠে জবাব দিল: এই কি দেখা করবার সময় নাকি? জানেন না? আপনাদের নাড়ী টেপা ছাড়া আমাদের কি আর কাজ নেই?

তবু না ব'লে পারে না: ভারি যন্ত্রণা হচ্ছে, অসহ্য!

—কাল সকালে আসবেন।

ডাক্তার হাত নাড়া দিয়ে চ'লে যেতে বলে। তবু রেবতী খানিকক্ষণ অন্যমনস্কের মতো প্রতীক্ষা করে।

ভিক্ষুকই ত বটে। ডাক্তারের কাছে ভিক্ষা করতে এসেছিল—এক মুঠো ভাত, দু'টি নিদ্রাক্রান্ত দীর্ঘ সুমধুর রাত্রি—কয়েকটি সহজ নিশ্চিন্ত নিশ্বাস!

আবার চলতে সুরু করে। জুতোর গোড়ালিতে একটা লোহা ক্ষুধার্ত দাঁত দিয়ে ওর বাঁ পা-টা ক্ষতাক্ত ক'রে দিচ্ছিল। ফুটপাতের ওপর ব'সে জুতোটা খুলে ফেলে একটা ইট দিয়ে রেবতী লোলুপ লোহাটাকে ঠুকতে লাগল।

শীতের দুপুরে রাস্তায় স্বভাবতই ধুলো জমে। তার ওপর একটা মোটর যদি হুঙ্কার দিয়ে চ'লে যায় —দিগ্বিদিকে ধুলোর ঝড় উঠবেই। অভিযোগ করবার কি আছে ?

তবু রেবতীর মনে হয় সামান্য একটা মোটর পর্য্যন্ত ওর বিরুদ্ধে চিৎকার ক'রে উঠেছে—নেই নেই, বাঁচবার অধিকার নেই তোমার—

উদ্ধত লৌহাগ্রকে বশীভূত করা যায় না।

একটা পড়ো জমিতে কতকগুলি হিন্দুস্থানী মেথর জড় হ'য়ে হল্লা করছিল। কেউ বাজাচ্ছে ঢোল —কেউ করতালি। কারো গলায় গাঁদাফুলের মালা কারো কাঠ-গোলাপের। নেচে হেসে চেঁচিয়ে পাড়াটাকে মাৎ ক'রে তুলেছে। এপারের বস্তির বারান্দায় কতগুলি নোংরা মেয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই নৃত্য ও সঙ্গীত সম্ভোগ করছে।

রেবতী এক পাশে ব'সে পড়ল। কোথা থেকে একটা ঘেয়ো কুকুর হাঁচতে-হাঁচতে ওরই কাছটিতে এসে বসেছে। রেবতী এই গানের একটি বর্ণও বোঝে না—পথের অন্য লোকেরা বধির উদাসীনের মতো চ'লে যায়, কেউ কেউ বা বিরক্ত হয়—তবু রেবতী তন্ময় হ'য়ে এই আনন্দহিল্লোল দেখে—ওর হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণ রক্তস্রোত চঞ্চল হ'য়ে উঠতে চায়। মনে হয় ও-ও যেন এই সঙ্গে হঠাৎ পা ফেলে নেচে উঠবে। এমনি অকারণ আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠবে।

হঠাৎ পাশের রুগ্ন বৃদ্ধ জরাজীর্ণ কুকুরটাকে অসহ্য লাগে। মনে হয় ও যেন এই আনন্দোৎসবকে ব্যঙ্গ করছে। একটা ঢিল কুড়িয়ে কুকুরটাকে ছুঁড়ে মারে - কুকুরটা গোঙাতে-গোঙাতে খানিকটা দূরে স'রে গিয়ে বসে —যেন বেশি দূর হাঁটতে পারবে না আর।

যত দোষ কুকুরটারই। রেবতীর নিজের মনে হয়, ওর শরীরে আর কোন যন্ত্রণা নেই, জুতোর কাঁটাটাও অদৃশ্য হয়েছে। ও খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকে—চোখ মেললেই ও দেখতে পাবে ওর পঙ্গু কুঁজো দেহটা দীর্ঘায়তন সবল ও সতেজ হ'য়ে উঠেছে— মনে এসেছে অগাধ সাধ, দু'টো হাতে বিপুল কর্ম-প্রবণতা, দু'টো পায়ে অনন্ত পথপ্রেম !

চোখ খুলেই দেখে সামনের খেজুর গাছটার আড়ালে একটি তারা কাঁপছে। বেশ লাগে দেখতে ! কখন যে উৎসব থেমে গেছে, সভা ভেঙে কখন যে সবাই বিদায় নিয়েছে, রেবতীর খেয়াল নেই। দূরে ট্র্যাম-লাইন থেকে থেকে-থেকে চাকার অস্পষ্ট আর্তনাদ ভেসে আসছিল। কুকুরটাও চ'লে গেছে।

রেবতীও উঠল।

পাখীর নীড়—

আকারে ছোট হ'লেও এ উপমা চলে না। একটা গর্ত—যেমনি স্যাঁতসেতে এঁদো, তেমনি অন্ধকার। একটা একতলা বাড়ির একটি ফালি—ঘর মোটে একটিই, এক পাশে শোয়া, শুয়ে শুয়েই খুন্তি নেড়ে শাক-চচ্চড়ি রাঁধা যায়।

একটি ভাঙা তক্তপোষ, একটি ভাঙা লণ্ঠন একটি ছেঁড়া ছাতি -

দু'খানি কাপড়, দু'টো থালা, দু'টি বালিস—

আর প্রাণী তিনটি। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের একটি প্রতিনিধি। তাদের কামনার, তাদের প্রেমের, তাদের ব্যর্থতার।

কুপিটা জ্বালানো হয়নি। গলির গ্যাসের আলো যেটুকু এসেছে, তাই। রেবতী ঘরে ঢুকে জুতোটা খুলে তক্তপোষটার ওপর বসল।

শিপ্রা বললে খোকার জ্বর খুব বেড়ে গেছে। তোমাকে এক্ষুনিই আবার বেরুতে হবে - যে ক'রে হোক একটা ডাক্তার আনতেই হবে। একেবারে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছে টু শব্দটি নেই। শুনছ?

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে ব'লে রেবতী দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে হাঁপ নেয় একটু। মুখে কোনো কথা আসে না, চুপ ক'রে থাকে।

শিপ্রা আবার বললে - হাতে-পায়ে ধ'রে যেমন ক'রে হোক কাউকে আনা চাই-ই। বাছা আমার এতক্ষণ কি রকম ছটফট করছিল। যাও, ওঠ—

তবু রেবতীর হুঁস নেই। কান পেতে কি যেন শোনে -

বাসর-রাত্রে ও ওর স্ত্রীর নাম রেখেছিল, শিপ্রা। না-জানি কোন কবির কবিতায় এই নদীটির কথা প'ড়ে ও মুগ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হয়েছিল যখন একটি ভীতু কিশোরী তার প্রথম অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে ওর পানে দু'টি অর্থহীন ও অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য প্রসারিত ক'রে ধরেছিল। অর্ধস্ফুটযৌবনা পার্শ্ববর্তিনী প্রেয়সীর দেহে ও যেন কোন নদীর অতিমধুর কলগুঞ্জন শুনতে পেয়েছিল: আমার কাছে তুমি শিপ্রা! আর সবাইর কাছে যাই কেন না হও -

শিপ্রা এবার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে: বাপ হ'য়ে ছেলেটাকে এমনি অচিকিৎসায় মারবে নাকি? ছেলেকে পথ্য দিতে পারবে না তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

রেবতী নিঃশব্দে উঠে পড়ে। ছেঁড়া ছোট র‍্যাপারটি কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে নেয়, জুতো আর পায়ে দেয় না। আস্তে বেরিয়ে পড়ে।

শিপ্রা ফের বলে—শিগ্‌গির ফিরো, কেমন করছে খোকা।

রেবতী যেন কেউ নয়—ওকে একবার জিজ্ঞাসাও করে না—কেমন আছ? ছেলেই সব। এর চেয়ে বড়ো আর কিছুই নেই শিপ্রার কাছে।

তবু রেবতী একরকম দৌড়েই চলে। মাঝে-মাঝে দু'টো হাঁটুতে দু' হাতের ভর রেখে পথের মধ্যেই হাঁপায়। ভাবে—আমি শিপ্রার কেউ নই, শিপ্রারও না।

শ্বশুরের পয়সাতেই ডিসপেনসারি, ল্যাবরেটরি সব কিছু সরঞ্জাম। বাড়িখানা পর্য্যন্ত। দু'টো চাকর, একটা বেয়ারা, তিনটে কম্পাউণ্ডার—সবই শ্বশুরের দৌলতে। মোটরখানাও।

মার পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বলছিল—একদিন এসো পাত্তাড়ি গুটোই। দরজা জানলা সব বন্ধ ক'রে কাউকে না ব'লে-ক'য়ে এসো একদিন টুপ ক'রে বেরিয়ে পড়ি। কি হবে এই সব মাথা মুণ্ডু ক'রে?

ডাক্তার রমার দু'টি স্বচ্ছ ও চঞ্চল চোখের পানে চেয়ে বললে কোথায় যাবে?

—যেখানে কেউই যায় না, এমনি একটা গণ্ডগ্রামে। যেখানে সব গণ্ডমূর্খের বাস। যাবে? চল না—

ডাক্তার বলে—তুমি খুব ফাজিল হয়েছ।

রমা ঘাড় দুলিয়ে বললে—যেতেই হবে কোথাও। আচ্ছা, চল সিম্‌লে—

—এই শীতে?

—হ্যাঁ, তাই ত মজা। আচ্ছা একবার নিউজেল্যাণ্ড-এ যাবে? না না, ঠাট্টা না, সত্যিই নিউজেল্যাণ্ড-এ গেলে ভারি চমৎকার হয়। সমুদ্রগামিনী হ'তে আমার এত ইচ্ছা করে। আমাকে কে একজন বলতেন, আমার চোখে নাকি দুই অগাধ নীল সমুদ্র দেখা যায়। সত্যি? তুমি কি দেখতে পাও বলবে?—যাক সে কথা, সত্যি কোথাও চল।

ডাক্তার বললে তোমার মতো লক্ষীছাড়া হ'লে ত আমার চলবে না।

রমা হেসে ঢ'লে প'ড়ে বললে—লক্ষীছাড়া হ'তেই দেব না তোমাকে। অঞ্চলে বেঁধে রাখব।

যথাসম্ভব মুখ গম্ভীর ক'রে ডাক্তার বললে আমার অনেক কাজ। তুমি মেয়েমানুষ, কি বুঝবে?

ঠোঁট কুঞ্চিত ক'রে রমা বললে—বটে? কতগুলো নিরীহ নিরপরাধ প্রাণীকে অকারণে যমের বাড়ি পাঠানো। এ-বাড়িতে একটি কৈকেয়ী থাকত! তোমার সঙ্গে-সঙ্গে তাহলে আমি পরম সতীর মতো বনবাসে যেতাম। মোটরটাকেও নিয়ে যেতাম অবিশ্যি।

নেপালি চাকরটা পর্দার ওপার থেকে ডাক দেয়।

ডাক্তার বলে—চললাম নিচে। তোমার সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করার বাড়তি সময় আমার নেই।

টুপিটা মাথায় দিয়ে গটগট ক'রে নেমে যায়। রমার হু'টি গাঢ় গভীর চোখে ক্ষণেকের জন্ত একটি মন্থর মেঘ ভেসে আসে। টেবিল পরিষ্কার করে—পরে একটু চিঠিপত্র নিয়ে বসে—রান্নাঘরে গিয়ে হিন্দুস্থানি ঠাকুরটার সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে একটু বচসা করে—একটা বই নিয়ে ইজিচেয়ারে শোয়—

অনন্ত অবকাশ—স্তব্ধ হ'য়ে একটি মুহূর্ত কাটালেই ওর মনে হয়। কিন্তু মোটেই চুপ ক'রে বেশিক্ষণ ব'সে থাকতে পারে না। নিজে ষ্টোভ ধরিয়ে কিছু একটা রাঁধতে বসে। মনগড়া নানান রকম খাবার তৈরি ক'রে—স্বামীকে অবাক ক'রে দেবে।

স্বামী হয়ত বলবেন, বেড়ে হয়েছে ত! এ সব অদ্ভুত খাবার কোত্থেকে এল?

ও বলবে—আকাশ থেকে।

স্বামী খেতে-খেতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলবেন—তুমি বুঝি ফের রান্নাঘরে ঢুকেছিলে? তোমাকে—কতবার বলব কয়লার ধোঁয়ায় তোমার চোখ আরো খারাপ হ'য়ে যাবে। চোখ হু'টো গেলে খেয়ে ফেলতে চাও নাকি?

ও বলবে—মোটেই না। কিন্তু খুব গাঢ় নীল আকাশ বা ভীষণ গাঢ় নীল সমুদ্র না দেখলে আমার চোখ কিছুতেই ভালো হবে না। খালি-খালি তোমার ঘরের চারদিকের এই অসভ্য যন্ত্রপাতিগুলো দেখে-দেখে আমার চোখ ক্ষ'য়ে গেল।

স্বামী গম্ভীর হ'য়ে বলবেন—এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়, রমা। তুমি দিন-কে-দিন বড্ড অবাধ্য হচ্ছ।

ব'লে তিনি রাগ ক'রে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়বেন।

রমার তা খুব ভালো লাগবে। ছুটে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে বলবে—তোমার জন্ত রাঁধলে কখনই আমার চোখ নষ্ট হবে না। আর, তোমাকে সেবা ক'রে যদি অন্ধই হই—

ব'লে ও ওর ভীরু বাঁ চোখটি স্বামীর ঠোঁটের কাছে রাখবে।

স্বামী তা গ্রাহ্যও করবেন না। ওকে ঠেলে দিয়ে আঁচিয়ে নিচে চ'লে যাবেন।

রমার আরো ভালো লাগবে। কাজকর্মের মধ্যে স্বামী একবারো অন্তঃপুরে এসে তাঁর অবকাশরঙ্গিনীর সঙ্গে মধুরালাপ করবেন না। এক গ্লাশ জলের দরকার হ'লে চাকরকেই ডাকবেন—ওপর থেকে চেঁচিয়ে নিজে ঠাকুরকে তাড়া দেবেন শিগ্গির

রান্না করতে। খেয়ে-দেয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বেন, নিজেই মশারি ফেলবেন। সংসারে তাঁর যেন কেউ নেই—কেবল ঠাকুর আর চাকর।

রমাও রাগ ক'রে থাকবে। খাবে না, চুল বাঁধবে না—ঠাকুর জিগ্‌গেস করতে এলে বলবে—খিদে নেই। জীবনে যা কোনোদিন বলে নি। মশারি তুলে আগের মতো সন্তর্পণে স্বামীর পাশে শুতে যাবে না, ইজিচেয়ারটা দক্ষিণের বারান্দায় টেনে এনে চুপ ক'রে শুয়ে থাকবে।

ঘরে বাতিটা জ্বলতেই থাকবে। ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে স্বামী বিরক্ত হ'য়ে এক সময় উঠে আলোটা নিবিয়ে দেবেন। ওকে বারান্দায় ঠাণ্ডায় প'ড়ে থাকতে দেখে একবারো ঘরে গিয়ে শুতে বলবেন না। তেমনি লেপের নিচে গিয়ে শোবেন—একাই।

রমা চোখ বুজে প'ড়ে থাকবে। তাই বেশ।

ওর স্বামীর সঙ্গে এমনি ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে। দৈনন্দিন ভালোবাসার একঘেয়েমি আর ভালো লাগে না।

যেমন-কে-তেমন—সেই লোকটা আছেই। অপয়া, অনামুখো। দেখেই ডাক্তারের সমস্ত গা রি-রি ক'রে উঠল।

কোনো কিছু ভূমিকা না ক'রেই হাঁকলে : এবারে দিয়ে দিন টাকাটা—

রেবতী মুখ কাঁচুমাচু ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল, ঠোঁট দু'টো বারকয়েক চেটে ভিজিয়ে নিয়ে বললে—টাকাটা খরচ হ'য়ে গেছে।

ডাক্তার বললে—তবে অন্যত্র দেখুন।—আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

বেঞ্চিতে অন্য একটি রুগী ব'সে ছিল, গৌরবর্ণ – কিন্তু সমস্ত গায়ে বীভৎস একটা বিবর্ণতা এসেছে। তার দিকে চেয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে –কদ্দিন ভুগছেন ?

রেবতী তেমনি দাঁড়িয়েই ছিল। নবাগত রুগীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর সারা হ'য়ে গেল। দরে বনল না দেখে রুগীটি চ'লে গেল। দু'টো ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে এসেছিল তা হয়ত ভুলে ফেলে গেছে।

ডাক্তার রেবতীকে বললে—আপনিও পথ দেখুন।

রেবতী বললে –ছেলেটা রাত্রে হঠাৎ হাত-পা নীল হ'য়ে মারা গেল। আপনাকে দেব ব'লে যা যোগাড় করেছিলাম সব সেই রাত্রেই ডাক্তারের পিছে ফুরিয়ে গেল।

ডাক্তার এতেও বিচলিত হয় না। বলে—সেই ডাক্তারের কাছেই যান। এখানে জোচ্চোরদের জায়গা হবে না।

রেবতী তবু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে সেই ছেঁড়া ছোট র‍্যাপারের তলা থেকে শীর্ণ একখানি হাত ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দেয়। বলে— আপনার কাছে একটি ভিক্ষা চাই—

ডাক্তার টেবিলের খবরের কাগজের ওপর চোখ রেখেই বলে —এখেনে ভিক্ষে-টিক্ষে মেলে না, মশায়।

রেবতী বলে—আমাকে এমন একটা সহজ ওষুধ দিতে পারেন যা সন্ধ্যাবেলা খেয়ে শুলে সকালবেলা আর ঘুম থেকে উঠতে হয় না? লোকে কেমন ক'রে ট্রেনের তলায় বুক পেতে মরে আমি তা ভাবতে পারি না। ভয়ানক ভাবে আত্মহত্যা করতে আমার ভারি ভয় করে। বেশ আরামে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আমার ম'রে যেতে ইচ্ছা করে। টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত না। তেমনি একটা ওষুধ আমাকে দেবেন, ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার এবার রেবতীর মুখের দিকে তাকায়, বলে —আপনি পাগল হয়েছেন?

স্বরটা যেন তত রুক্ষ নয়।

রেবতী বেঞ্চিটার ওপর ব'সে পড়ে। বলে—মোট কথা, মরতে আমি চাই না হয়ত। কিন্তু বাঁচবারো অধিকার নিশ্চয় নেই। তবু এমনি এই অসুখ নিয়েও এই শোক ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে ভালো লাগে। কিন্তু কত দিন? সবাইরই ত একটা সমাপ্তি চাই।—আপনাকে হয়ত খুব বিরক্ত করছি। যাচ্ছি এখুনি, কিন্তু একটা কিছু ওষুধ দেবেন?

ডাক্তার নিরুত্তর। রেবতী দরজার দিকে পা বাড়ায়।

পরে হঠাৎ ফিরে এসে বলে - আচ্ছা, আপনি আমাকে ভালো করতে পারেন না? দেখুন না একবার চেষ্টা ক'রে? জগতে এর চেয়ে আর বড়ো কীর্ত্তি কী আছে? একজন আপনার কাছ থেকে জীবন-ভিক্ষা ক'রে চেয়ে নিল—আপনি তা পরম গৌরবে দান করলেন। আপনি বিধাতার চেয়েও বড়ো। পারেন না ভালো করতে? সংসারে কত অল্পই চাই আমরা—শুধু টিকে থাকার, শুধু বুক ভ'রে নিশ্বাস নেবার সহজ ও সাধারণ আনন্দটুকু। দিনের পর রাত, আবার রাতের পর দিন—ঘুমোবার রাত আর খাটবার দিন—এর বেশি আর কিছুই চাই না। আমাকে ভালো করা সত্যিই কি যায় না, ডাক্তারবাবু?

রেবতী পথে নেমে পড়ে। ডাক্তার কি ভেবে ওকে ডাকে। পরে নেপালি চাকরটাকে জল গরম করতে হুকুম দেয়, আরো নানা ফরমাজ করে। দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে যেতে বলে।

রেবতীর চিকিৎসা চলে।

রেবতী বিদায় নেয়। ডাক্তারই বলে—কালকে আবার আসবেন। ভয় করবেন না, ভালো হ'য়ে যাবেন।

রেবতী প্রফুল্লমুখে ডাক্তারের দিকে তাকায়। এই একটি কথায় ও বুকের মধ্যে প্রকাণ্ড বল পায়, মুহূর্তের জন্য রৌদ্রের প্রখরতাটি পর্য্যন্ত ভালো লাগে। এমন ভাবে চলতে চেষ্টা করে যেন ওর কিছুই হয়নি।

ঘরে ফিরে এসে শোকাকুলা শিপ্রার মাথার কাছে বসে একটু। শিপ্রা দিনরাত ছেলের জন্য অশ্রুবিসর্জন করছে। রেবতী একসময় ওর একখানি হাত শিপ্রার মাথার ওপর রাখল—একটি শীতল শিথিল স্পর্শ। কোনো সান্ত্বনার কথা মুখে আসে না, চুপ ক'রে ব'সে ঘরের চারপাশের ঝুলগুলি দেখে আর ভাবে। মৃত ছেলের কথাই নয়—একদিন ও আবার ভালো হবে, একদিন শিপ্রার দুই চোখ জলভারে এমনি মলিন থাকবে না—

মেটে মেঝের ওপর বুকটা পেতে শিপ্রা কাঁদতেই থাকে। রেবতী উঠে আপিসে যাবার জন্য তৈরি হয়।

রেবতী বিদায় নিলে ডাক্তার খানিকক্ষণ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বিমনা হ'য়ে ব'সে রইল। পরে নেপালি চাকরটাকে ডাকিয়ে কতকগুলি বই পেড়ে কতক্ষণ পাতা উল্টোল, একটু পড়লও বুঝি। পরে বললে—এই, ইসমাইলকে বল ত, বেরুব।

ডাক্তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য ব্যাপার। রমা চাকরকে ডেকে বললে—বলিস কি রে, বাবু বেরিয়ে গেছে?

এমন কাণ্ড ঘটেনি কোনোদিন। এর আগে সূর্যের পশ্চিমে ওঠা উচিত ছিল। এই বেলায় ডাক্তারের বেরিয়ে যাওয়াটা রমার কাছে যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি যেন কতকটা অপমানসূচক। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের কৃত্রিম কোপস্ফুরিত ঠোঁটের পানে চেয়ে ভাবলে—সত্যিই রাগ করব আজ।

সাহেব-ডাক্তারকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। বাঙালি ডাক্তার বললে—তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। একটা সিরিয়াস কেস এসেছে হাতে।

দু'জনে খানিকক্ষণ পরামর্শ হয়। সাহেব-ডাক্তার বাঙালি ডাক্তারকে দুই একটা নতুন ওষুধ বাৎলে দেয় হয়ত।

বাড়ি ফিরে ডাক্তার তখুনিই রমার দু'খানি করপল্লব স্পর্শ করবার অভিলাষে উন্মুখ হ'য়ে অন্তঃপুরে ছোটে না। ল্যাবরেটরিতে ব'সে কি খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে।

ওর কেবলই মনে হয়—হু'খানি ব্যাধিজীর্ণ দুর্বল হাত ওর দিকে কে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে, ঘোলাটে দুই চোখে কি বিবর্ণ বেদনা, ওকে বলছে : আপনার কাছে আমি আমার জীবন ভিক্ষা করছি—আপনি বিধাতার চেয়েও বড়ো!

অনেকক্ষণ ব'সে পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয় না।

তারপরে খুব আস্তে-আস্তে সিঁড়িগুলি ভেঙে ওপরে আসে। মানিনী রমা খাটের ওপর শুয়ে আছে—চুল আলুলিত, রুক্ষ—তনু-লতায় একটি বিপর্য্যস্ত শোভা—মুখে একটি বিনম্র ঔদাস্য। শুয়ে-শুয়ে একটা বই দেখছে। ডাক্তার পাশে ব'সে বললে—একটা সিরিয়াস্ কেস হাতে এসেছে, তাই দেরি হ'য়ে গেল। ভারি ক্লান্ত হয়েছি।

তবু রমা কোনো কথা কয় না। ক্লান্তি নিরাকরণের অমোঘ ঔষধ কি আজ ওর ফুরিয়ে গেল! ডাক্তার একটু বিস্মিত হ'য়ে বললে—কি গো, অসুখ করেছে বুঝি? শোও আরো জানলা খুলে!

ব'লে ওর নাড়ী দেখে, কপালে ও বুকে হাত দিয়ে উত্তাপ অনুভব করতে চায়।

রমা একটু স'রে শোয়।

ডাক্তার আরো বিস্মিত হয়। বোতাম খুলতে-খুলতে বলে—তোমার জন্য কি আমার ব্যবসা ছাড়তে হবে নাকি? এদিকে রুগী মরবে আর আমি—

রমা ঠোঁট হু'টো কুঞ্চিত করে মাত্র। বলে—এমনি শান্তিতে মরত, শেষকালে কতগুলি অমানুষিক যন্ত্রণা পেয়ে যাবে আর কি। বেচারা!

ডাক্তার বলে—তোমার কী হ'ল আজ?

রমা কথা কয় না, চুপ ক'রে বই-এর দিকে চেয়ে থাকে। ডাক্তারও জামা-জুতো ছেড়ে চুপ ক'রে বসে—ওরই পাশে। সময় গড়িয়ে চলে। একটি বিষাদক্লিষ্ট মুখের ওপর হু'টি ব্যথাতুর নিষ্প্রভ চোখ মনে হয়, সেই বিশীর্ণ হু'খানি হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সেই ক্ষুদ্র শতচ্ছিন্ন নোংরা আলোয়ানটা—পায়ে জুতো নেই, কাল রাত্রে ওর ছেলেটি মারা গেছে!

রমা উঠে পড়ে; স্নান ক'রে আসে। ডাক্তারও স্নান ক'রে খেয়ে নেয়। দুপুরটা তেমনি মদকলকূজনে অতিবাহিত হয় না—ডাক্তার নিয়মিত অভ্যাসের ব্যতিক্রম ক'রে নিচে ল্যাবরেটরিতে চ'লে যায়, রমা শিশিরমথিত ম্লান পদ্মকোরকের মতো চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে অদূরবর্তী রাস্তাটা দেখে—

সমস্ত ঘরে যেন আসন্ন বিরহের সুমধুর একটি শোকচ্ছায়া ঘনায়িত হ'য়ে উঠেছে।

ডাক্তারের পরীক্ষা তখনো সফল হয়নি। অনেক রাত্রে শুয়ে অন্ধকারে ডাক্তারের চোখে রেবতীর সেই ক্লিষ্ট বিপাণ্ডুর মুখ ভেসে আসে, সেই বিকৃত দেহটা যেন একটা উদ্ধত তর্জনীর মতো ওকে শাসায়, সেই প্রসারিত দু'টো হাত যেন ওকে নিষ্ঠুর মুষ্ট্যাঘাত করবার জন্ত উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। ও সহসা পার্শ্বচরী রমাকে দুই বাহু-বন্ধনে অনুভব করে, ভাবে—ভাগ্যিস্ ঐ রুগী রমা নয়, ও নিজে নয়—ওর কোনো আত্মীয়-বন্ধু নয়, একজন অপরিচিত পথিক! যেন স্বস্তি পায়। ওর পাশে সত্যিই রমা—স্বচ্ছকান্তি, অভিনবযৌবনা. অভিমানিনী।—ও নিজে সুস্থ, সবল, অর্থশালী। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

রমা আজ আর ভালো ক'রে কথা কয়নি, হাসেনি। ভাবে, চঞ্চলা রমার চেয়ে এই মানিনী অবনম্রা রমার মধুরতা কোনো অংশে হীন নয়।

ডাক্তার নিয়মভঙ্গ ক'রে একটু আগেই নিচে নামল আজ। যেন রেবতীর বেশীক্ষণ ব'সে থাকতে না হয়, কেমন আছে না জানি! রমা স্বামীর তাড়াতাড়ি চ'লে যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

তখনো রেবতী এসে পৌঁছোয়নি—কেউই নয়। বিশেষ কেউ আসেও না। শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারিই করতে হবে এ-সম্বন্ধে ডাক্তারের কোনোই স্থিরতা ছিল না। ডাক্তার হওয়াটা ওর জীবনে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। তবু ভাবে—তবু যদি একজন এল, শুধু টিকে-থাকার আনন্দের কাঙাল হ'য়ে, ওরই দোরে ওকে বিমুখ ক'রে কী লাভ?

ডাক্তার জানলা দিয়ে রেবতীর সেই ধূলিলিপ্ত ব্যাধিজীর্ণ পা-দু'টো দেখবার আশায় রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে।

রেবতী আসে—অতি কষ্টে। ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে ওকে সম্বর্ধনা করে। বলে—কেমন আছেন?

রেবতী অত্যন্ত কাতর-স্বরে বলে—যন্ত্রণা আরো বেড়েছে। আজকে আর আপিস যাওয়া হবে না।

ডাক্তার ওকে চেয়ারে বসতে ব'লে বলে—খুব কি?

—খুব।

ডাক্তার ওকে প্রবোধ দেয়: ও কিছু নয়, সেরে যাবে।

মুহূর্তের জন্ত রেবতী আবার ওর সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যায়। বলে—আর কতদিন?

—এই মাসখানেকের মধ্যেই ভালো হ'য়ে উঠবেন।

রেবতী ভারি তৃপ্তি অনুভব করে। ভাবে—একমাস! বিস্তীর্ণ আয়ুর সমুদ্রে একটা মাস ত একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ! এক বৎসর বাদে ও কোনোদিন হয়ত এই পরম দুঃখদায়ক পরম কুৎসিত মাসটার কথা মনেও করবে না। একবার একটা মাস কোনোরকমে কাটাতে পারলেই হয়! এটা মাঘ—চৈত্র মাসে যখন দক্ষিণ থেকে হাওয়া দেবে, সে হাওয়া ওরই জন্য বিধাতা পরম স্নেহে পাঠিয়ে দেবেন—ভাবতে চোখের কোণে জল আসে।

বাড়ি এসে রেবতী দেয়ালে-টাঙানো বাংলা ক্যালেণ্ডারটা নেড়ে-চেড়ে দেখে। চৈত্র মাসের একটা তারিখ পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়—সাতাশে চৈত্র। সেদিন হয়ত ওর শরীরে এই দুঃসহ ক্লান্তি থাকবে না—বিশীর্ণা শিপ্রা আবার কলধ্বনি ক'রে উঠবে। ডাক্তারের সময় নির্ধারণ ক'রে দিতে কিছু ভুল হ'তে পারে—একমাসে না হোক বড় জোর দু'মাসে ও সেরে উঠবেই। ও মনে-মনে সেই আগামী সাতাশে চৈত্রের বেলা বারোটার কথা মনে করে—ক্যালেণ্ডারে চেয়ে দেখে সে-তারিখটায় রবিবার পড়েছে, আপিস যেতে হবে না! সেদিন রৌদ্র কত প্রখর হবে, কত ধুলো উড়বে··কে জানে? সেদিন ও আবার স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে পারবে, অতি সহজে নিশ্বাস নিতে পারবে—এই ওর সুখ! হয়ত সেই রৌদ্রেই ও বেরিয়ে পড়বে—কিম্বা হয়ত আর কিছু করবে যা মোটেই অসাধারণ নয়।

তবু কিছু না খেয়েই আপিসের দিকে রওনা হয়। কিছুই রাধা হয়নি। ভাবে, পথের থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে নিলেই হবে। দিন কয়েক পরেই ত মাইনেটা পাবে—আরো কয়েক দিন পরে—থাকই বা না এ রোখো চাকরি—যদি আবার স্বাস্থ্য ফিরে পায়, মোট বইতেও নারাজ হবে না।

কিন্তু কত দূর গিয়েই রেবতী ফিরে এল। শিপ্রা তখনো কাঁদছে। ওর মাথার কাছে ব'সে বললে ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে। যেতে পারলাম না।

শিপ্রা তবু মুখ তোলে না। যে-জায়গাটায় ওর সন্তান শেষ চোখের পাতা দু'টি বুজেছে, সেইখানেই বুকটা দিয়ে প'ড়ে আছে। এখন আর একটুও আওয়াজ করতে পারছে না।

রেবতী চুপ ক'রে ব'সে ভাবে—সাতাশে চৈত্রেও ও এমনি আপিস যাবে না। কিন্তু আজকের সঙ্গে সেদিনের কত তফাৎ!

আরো অনেকগুলি দিন গেল। যে-পথ আসতে আগে রেবতীর পনেরো মিনিট লাগত, এখন সেই পথটুকু ভাঙতেই ওর একঘণ্টার ওপর লাগে। আসে—অতি

আস্তে-আস্তে লাঠি ভর দিয়ে—তবু ডাক্তারকে তার করুণার জন্য মনে-মনে ধন্যবাদ দেয়। নিজের কষ্টটাকে বেশি ব'লেই মানে না, ডাক্তার যে ওকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছে, সেইটেই বেশি।

দিন-কে-দিন ওর অবস্থা ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠছে। হলদে দাঁত, চোখ পাঁশুটে, বরাবর সেই ছোট র‍্যাপারটাই গায়ে দিয়ে আসে—খালি পা—বিকট, বীভৎস!

তবু যদি বলে: কবে ভালো হবো? ডাক্তার জবাব দেয়: সবই সময় লাগে মশায়।

আবার যদি বলে: ভালো হবো ত? ডাক্তার স্বাভাবিক মুরুব্বিয়ানা ক'রে বলে: বড্ড দেরি হ'য়ে গেল ব'লেই এতটা বেগ পেতে হচ্ছে। তা, আমার হাতে যখন আছেন, ভালো হ'য়ে যাবেন বৈ কি। এ ত আর হাতুড়ে চিকিৎসা নয়।

ক্ষণিক মৃদু একটি হাসিতে রেবতীর ঠোঁট দু'টো একটু বিস্ফারিত হয়। সেই হাসি দেখে ডাক্তারের বুক শিউরে ওঠে।

এক-এক সময় ডাক্তারের মন দারুণ ঘৃণায় কিলবিল ক'রে ওঠে। ইচ্ছে করে, শক্ত মুঠি দুটো দিয়ে বকের ঠ্যাং-এর মতো রেবতীর গলাটা টিপে ধরে। কিম্বা এমন একটা ওষুধ দেয়, যাতে যেতে-যেতে মাঝপথেই—

পারে না তা। নিজের ট্যাঁকের পয়সা থেকেই ওষুধ-পত্রের খরচ জোগায়। খেতে শুতে সব সময়েই ভিক্ষার্থীর দু'টি প্রসারিত হাত ওকে যেন অনুসরণ করে। ও মনে একটুও স্বস্তি পায় না।

দিন-রাত্রি পরীক্ষা চলে। শরীর অবসন্ন হয়, মন বিমুখ হ'য়ে আসে, তবু ল্যাবরেটরিতে রাত জেগে ব'সে-ব'সে নানান রকম তথ্য আবিষ্কারের আশায় প্রহর গোনে। রমার নিশ্বাসপতনের অস্পষ্ট শব্দ শোনবার জন্য ওর আর এতটুকুও কৌতূহল নেই। ও ভাবে, একটা ওষুধ ও বের করতে পারত—আর রেবতী যদি খালি একটি দাগ সেই ওষুধ খেয়েই ভালো হ'য়ে যেত—ওর চোখের সুমুখে রোজ ভোর বেলা এমনি পাংশু মুখে জীর্ণ বেশে ভিক্ষুকের মতো, অপরাধীর মতো আর দাঁড়াত না—

রাত বেশি ক'রেই ওপরে যায়। রমা এক পাশে ঘুমিয়ে থাকে, কোনো কোনোদিন ইজি চেয়ারেই—ডাক্তার খানিকক্ষণ খোলা ছাতে পাইচারি করে, আর কেবলই রেবতীর সেই কুৎসিত রোগবিকৃত ব্যথিত মুখটা ওর মনে পড়ে। মনে হয়, কে যেন ওর পিছে-পিছে একান্ত নিঃশব্দে, একান্ত অলক্ষিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে, যেন দুই হাত মেলে কী ভিক্ষা চাইছে—কী কাহিল দু'টো হাত! ডাক্তার তখুনি ঘরে এসে শোয়, ঘুমন্ত রমাকে একটু স্পর্শও করে না। চোখ বুজে থাকে, মনে হয় সমস্ত

বাড়িতে যেন রেবতীর ক্ষুধিত মূর্তি অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন ভিক্ষুকের বেশেই নয়, দস্যুর বেশে। যদি যেচে না পায়, তবে যেন চুরি ক'রে, জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

এক-এক সময় ডাক্তার ভাবে, শহরের একজন সেরা ডাক্তার দিয়ে ওর চিকিৎসা করানো যাক। নিজের ওপর ওর একটা দারুণ ঘৃণা হয়। ভাবে, এতদিন বিলেতে থেকে পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তারি শিখে আসার এই কি পরিণাম? ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব'লে ওঠে: আমিই ভালো করব। খাটের ওপর উঠে বসে। দেখে পাশে রমা নেই। কখন যে বারান্দায় চেয়ারটা টেনে নিয়ে শুয়েছে, কে জানে? ডাক্তার অস্থির হ'য়ে খোলা ছাতে টহল দিতে লাগল। আপন মনে বলল – মৃত্যুর সঙ্গে আমারই এ যুদ্ধ। কখনই জিততে দেব না ওকে।—খুব জোরে পা ফেলে তাড়াতাড়ি হেঁটে বেড়ায়।

পরে আবার ভাবে—কে এ রেবতী? কোথাকার কে না কে একটা কেরানি, তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? ওর জন্য এত খরচপত্র করা, বিনামূল্যে এত পরিশ্রম করা—কি বোকামিই না হয়েছে! ও ম'রে গেলে ডাক্তারের কী-ই বা ক্ষতি, চিকিৎসা-শাস্ত্রের কী-ই বা অপমান? যে ভুল করবে, শাস্তিভোগ করতেই হবে তাকে—তার জন্যে পরের কী এসে যায়? রেবতীর কাছে ডাক্তারের কী দায়িত্ব আছে? পৃথিবীতে এত বড়ো দয়ার সাগর না হ'লেও ত চলে! ভগবানের ইচ্ছা, ও কষ্ট পাবে, মরবে –তাতে ডাক্তারের কিছুই করবার নেই। কী হবে এ-সব পরের ঝক্কি মাথায় নিয়ে? ডাক্তার ত আর রেবতীর কাছে ধারে না কিছু। ওর ইচ্ছে নেই আর ডাক্তারি করবার, তাতে রেবতীর অভিযোগ করবার কিছুই নেই। নিশ্চয়।

ডাক্তার হঠাৎ রমাকে ঠেলে তুলে বললে—চল, কাল ভোরেই আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ি। আর ভালো লাগছে না কলকাতা—

রমাও হঠাৎ তার অভিমানের ঘোমটা টেনে ফেলে উৎসুক উৎফুল্লস্বরে বললে—যাবে?

ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—কিন্তু হাতে যে প্রকাণ্ড একটা রুগী, কেমন ক'রে যাই?

রমা ঘাড় ফিরিয়ে ফের চোখ বুজে প'ড়ে থাকে। ডাক্তার বললে বাঁচবার কি অদম্য ইচ্ছা ওর! সমস্ত ইচ্ছার চেয়ে প্রচণ্ড। কালই যাওয়া হ'তে পারে না।

বিনিদ্র রাত্রি রমার অসহ্য লাগে। যেন কোন্ একটি অপরিচিত বেদনা, কোন একটি আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকার ওর আর স্বামীর মধ্যে কি একটি অদৃশ্য যবনিকা বিস্তার করেছে। এই অভিমানের ভার কবে ঘুচবে? রমার চোখ জলে

ভ'রে আসে। ভাবে, স্বামীর থেকে ও যেন কত দূরে স'রে গেছে। এই নিষ্ঠুর অকারণ বিচ্ছেদ আর ও সইতে পারে না।

ডাক্তার আবার গিয়ে শোয়। ভাবে—ভোর হ'লেই আবার রেবতীর সঙ্গে দেখা হবে। ভাবতেই ভয় হয়। সারা রাত আর ঘুম হয় না। রমারও না।

একদিন সত্যি-সত্যিই রেবতী আর এল না।

ডাক্তার ঘুম থেকে উঠেই নিচে নেমে এসেছিল রেবতীর প্রত্যাশায়। পুবের জানলাটা দিয়ে বহুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল—এই বুঝি রেবতী আসে! যে যায় তারই মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে; ইচ্ছে করে ডেকে সবাইকে শুধায় কারু কোনো ব্যাধি আছে কি না, সমস্ত ব্যাধির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবার অদম্য স্পৃহা জাগে।

হঠাৎ এক সময় নেপালি চাকরটাকে শুধায়: সেই বাবুটি এসেছিল রে?

চাকর উত্তর দেয়: না ত!

আর কখনই বা আসবে? এসে ফিরে যাবার মতো অসহিষ্ণু সে নয়। তবু রেবতী আসছে না দেখে ডাক্তার একটুও স্বস্তি বোধ করছিল না। এটা ওটা ক'রে আরো খানিকক্ষণ কাটালো, আবার চুপ ক'রে চেয়ারটায় বসলো। ভাবলো আজ যদি রেবতী আসে, তবে নিশ্চয়ই ওকে ডাক্তার ওর মনোমত ওষুধ দিয়ে দেবে। ও সত্যিই এবার যাক, ডাক্তারকে মুক্তি দিক!

কিন্তু, কেন রেবতীকে ভালো করা যাবে না?—ডাক্তার নিজের ভীরুতা ও অক্ষমতাকে সহসা মনে-মনে কশাঘাত ক'রে সজাগ হ'য়ে উঠল। আবার হেলান দিয়ে ভাবতে বসলো—ব'য়ে গেছে! দুনিয়ার সবাইকে যদি ভালো ক'রতে হবে তাহলে এখানে মানুষের পা ফেলবারো জায়গা হ'ত না। রেবতী মরবে, সে একটা বেশি কথা কি? ও ত একটা না-খেতে-পাওয়া গরিব কেরানি মাত্র!

ডাক্তার আরো খানিকক্ষণ ব'সে থেকে কি ভেবে ওপরে উঠে গেল।

রমার ঘুম ভেঙেছে বটে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে তখনো ওঠেনি। ভোরের রোদ একটুখানি চুলে এসে পড়েছে, দুই চোখে সদ্য-জাগরণের একটি প্রশান্ত আভা! উঠে কি-ই বা করবে ভেবে ওঠেনি, শুয়ে-শুয়ে কিছু না-ভেবে সময় কাটানোটা বেশ উপভোগ করছে।

ডাক্তার ঘরে এসে চেয়ারে বসলো। রমা ভাবছিল অন্যদিন হলে এই বিছানায় এসেই উনি বসতেন, ওকে চুমু খেতেন, এখনো ওঠেনি দেখে একটু বকতেন, হয়ত বা হাত ধ'রে টেনে তুলে দিতেন—

ডাক্তার অপরাধীর মতো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে সেই রুগীটি আজ এখনো এলো না।

রমা শুয়ে শুয়েই বললে—বোধ হয় হ'য়ে গেছে।

—না না, হ'তেই পারে না তা।—ডাক্তার একরকম চেঁচিয়ে উঠল: আমি ওকে ভালো ক'রবই। ওকে আমার ভালো ক'রতেই হবে।

রমা ঠাট্টা ক'রে বললে—হঠাৎ এত পরার্থপরতা?

ডাক্তার ততোধিক ব্যঙ্গ ক'রে বললে—মেয়েমানুষ, তুমি তার কি বুঝবে? এ হচ্ছে যুদ্ধ, আমি জয়ী হ'তে চাই।—কিন্তু কেন সে এলো না।

রমা উঠে ব'সে একটা ফাঁস খোঁপা বাঁধতে-বাঁধতে বললে—চিকিৎসার হাত থেকে সরতে পারলেই হয়ত ও বাঁচে।

ক্ষেপে গিয়ে ডাক্তার বললে—ওর মৃত্যু বুঝি এতই সস্তা কেননা ভালো ক'রে চিকিৎসা করবার ওর টাকা নেই, ওর পথ্য জোটে না, ও পাপী? বাঁচবার অধিকার যদি কারু থাকে, ত খালি ওর। আমার তোমার নয়।

রমা ভুরু কুঞ্চিত ক'রে বললে—কেননা ওর আপিস করতে হয়, না খেতে পেয়ে ওর ছেলে মরে—ওর জীবনে কোনো উদ্দেশ্য, কোনো আনন্দ, কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই—তাই?

নিচে কিসের আওয়াজ শুনে ডাক্তার উৎকন্ঠিত হ'য়ে ব'লে উঠল: ঐ বুঝি ও এলো। ওকে আজ আর বাড়ি যেতে দেব না, এখানে রেখেই চিকিৎসা করব। দেখি পারে কি না।

ব'লে তাড়াতাড়ি নেমে যায়। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ডাকে: ঝুন্‌টু, ঝুন্‌টু!

নেপালি চাকরটা পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়ায়। ডাক্তার বলে—বাবুটি এসে বুঝি ফিরে গেল? আমি ওপরে ছিলাম, ডেকে আনলি না কেন? বোকা!

ঝুন্‌টু বললে—কোই বাবু আসেনি।

—আসেনি? ডাক্তার জানলার কাছে এসে একটু দাঁড়ায়। পরে চাকরটাকে টাকা দিয়ে বলে—সিগারেট নিয়ে আয় কিনে। একটা কাগজে সিগারেটের নাম লিখে দেয়। আরো বলে—রাস্তায় যদি সেই বাবুটিকে দেখিস, বলিস যে ডাক্তারবাবু এখনো বাড়িতেই আছেন। বুঝলি?

বিকেলেও রেবতী এলো না। দিনের মুমূর্ষু আলো দেখে রেবতীর রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর কুৎসিত মুখ মনে পড়ে।

ডাক্তার ওপরে উঠে গিয়ে রমাকে বলে—চলো, কার্নিভালে যাই।

পরে বলে—চিরকাল আমার ডাক্তারি করতেই হবে এমন কথা কুষ্ঠিতে আমার লেখেনি। ছেড়ে-ছুড়ে একদিন পরম বৈষ্ণব হ'য়েও যেতে পারি। যখন যা মন চায় তাতেই মন দেব—তাই সুখ। একটাকে নিয়েই চিরজীবন আঁকড়ে থাকতে হবে এ-কথা মানায় বোকা বা প্রতিভাবানের মুখে। আমি ও দু'টোর কোনটাই হ'তে চাই না। নাও, চটপট সারো।

রমা সাদাসিধে একখানি শাড়ি পরে। রুচি নিয়ে ডাক্তারের আজ আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এ-বাড়িটা থেকে কোনো সুযোগে বেরিয়ে পড়তে চায়—রমাকে একলা ফেলে যেতেও মন যেন কিছুতেই সরে না।

গাড়িতে রমার একখানি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে কঠিন ক'রে চেপে ধ'রে ডাক্তার বলে—আমরা কত ছোট আমরা একটি মানুষের সামান্য চোখের জলও মুছে দিতে পারি না। কত অক্ষম আমরা।

কার্নিভাল রাজোদ্যানের মতো শোভা পাচ্ছে। রমা আর ডাক্তার দু'জনেই অন্য-মনস্কের মতো হেঁটে বেড়ায়, যেন পথ ভুলে এসে পড়েছে এখানে, কোনো উদ্দেশ্য নেই। ডাক্তার বলে—হুইপ-এ চড়বে ?

রমা বলে—না, থাক।

সমস্ত উৎসবের আলোকমালা ম্লান ক'রে ডাক্তারের চোখে একটি রোগবিবর্ণ বিকৃত ও বিষণ্ণ মুখ ভেসে বেড়ায় দুই চোখে তার কি নিঃশব্দ ব্যাকুল যাচ্ঞা! স্বামীর ব্যর্থতা-বোধের বেদনা অনুভব ক'রে রমা নিজেকেও ব্যর্থ মনে করে, হেসে কথা কইতে চায়, নিজের হাসি নিজের কাছেই অত্যন্ত করুণ লাগে।

ফিরে যাবার সময় গাড়িতে কেউ একটিও কথা কয় না।

বাড়ি এসে অন্ধকারে ডাক্তার যেন কা'র বিষাক্ত দীর্ঘনিশ্বাস শোনে—যেন কা'র হাহাকার রাশীকৃত হ'য়ে আছে। ও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে—শোবার আগে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেয়, যাতে রাতে আর ঘুম না ভাঙে।

রমা তক্ষুনিই শুয়ে পড়ে না, ড্রেসিং টেবিলে আয়নায় নিজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নিজেকে হঠাৎ অত্যন্ত বিফল ও নিরাশ মনে হয়। অস্পষ্ট ক'রে অতীতের একটুখানি আবার মনে পড়ে।

সকাল বেলা উঠে ডাক্তারের অত্যন্ত ক্লান্তি লাগছিল, তবু দেরি না ক'রেই নিচের ঘরে গিয়ে বসলো।

ঝুনুটুকে জিগ্‌গেস ক'রে জানা গেল—সে-বাবুটি আজো এখন-তক্‌ আসেনি।

রোদ যত চড়া হয়, ডাক্তারের মন ততই হুতাশ, চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

তারপর এক সময় মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, সঙ্গে কতগুলি টাকা নিয়ে। সাহেব-ডাক্তারকে তাঁর বাড়ি গিয়ে পাওয়া গেল। তাঁকে তার প্রাপ্য ভিজিট আগে দিয়েই ডাক্তার বলে—তোমাকে আমার সঙ্গে এক্ষুনি এক জায়গায় যেতে হবে। বোধ হয় আর নেই।

সাহেব টাকাটা ড্রয়ারে রেখে বলে—আগে দেখেই আসি।

এঁদো গলি—এক পাশ দিয়ে একটা কাঁচা নর্দমা--সাহেব নাকে রুমাল দিয়ে দাঁড়ালো। ডাক্তার ঠিকানাটা আরেকবার মিলিয়ে দেখলে। পরে চেঁচাতে লাগলো : রেবতীবাবু, রেবতীবাবু!

ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না, একটা কান্নার শব্দও না। শুধু দুপুরের-রৌদ্রের প্রখরতা নির্ণয় করবার জন্যই যেন একটা কাক নিদারুণ কর্কশস্বরে চীৎকার করছে।

অগত্যা দরজা ঠেলেই ডাক্তার ঢুকে পড়ে—পেছনে সাহেব। এই পথ দিয়েই হয়ত মৃত্যু এসেছে, কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, কী অলক্ষিতে—কাপুরুষের মতো।

একেবারে ঘরে ঢুকে প'ড়েই ডাক্তার বলে—রেবতীবাবু কেমন আছেন?

তক্তপোষটার ওপর রেবতী শোয়া—হিক্কা উঠেছে। এবারে যাবে, বড় জোর ঘণ্টা দু'য়েক আছে। দেখেই ডাক্তারের মন হাহাকার ক'রে উঠল। পাশে ব'সেই নাড়ী পরীক্ষা করলে। সাহেবকে বললে—হোপলেস।

সাহেব কি-একটা ওষুধের কথা ব'লে চ'লে গেল।

মুমূর্ষুর শিয়রে একটি স্ত্রীলোক ব'সে মৃদু-মৃদু পাখার হাওয়া করছে--ডাক্তার অনুমানে বুঝলে, মেয়েটি রেবতীর স্ত্রী। ভারি শীর্ণ, মলিন—কোলের ওপর কার ছোট একটি লাল জামা, একটি ভাঙা ঝুমঝুমি। ওদের দেখে সন্ত্রস্ত হ'য়ে ঘোমটা টেনে দিয়েছিল, এখনো ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সেই ছোট লাল জামাটিই দেখছে।

মেঝের ওপর কতগুলি বমি—কতগুলি মাছি ভন্-ভন্ করছে।

ডাক্তার বললে—বমিটা কখন হয়েছে?

প্রথম কিছু বলতে চায় না, পরে বহু অভয় পেয়ে শিপ্রা বললে—কাল।

—এখনো নিকোন নি কেন?

শিপ্রা উত্তর দেয় না।

ডাক্তার বললে—আপনাদের আর কেউ নেই?

শিপ্রা ঘাড় নেড়ে বললে—কেউ নেই।

ডাক্তার বললে—বসুন, আমি এই ওষুধটা নিয়ে আসছি।

ওষুধ এনে রেবতীকে খাইয়ে দেয়। রেবতীর আর খাবার শক্তি নেই, কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার ভাবে, শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রেই যাবে নাকি? কী লাভ থেকে? কে ওর রেবতী?

সমস্ত ঘরে দারিদ্র্যের কী কদর্য্য বীভৎসতা! বাসনপত্র ওলোট-পালোট, এঁটো তোলা হয়নি কত দিন থেকে কে জানে, নোংরা জামা-কাপড় আর পোড়া কয়লার ছাই, রোগীর বমিতে আর জামাতে একাকার! আর রেবতীর মুখটা কি বিকট, ভয়ঙ্কর—হাঁ-করা ঠোঁট দু'টোর মাঝে কি কুৎসিত ঘৃণা!—ডাক্তারের সমস্ত শরীর রি-রি ক'রে উঠল। আবার বললে—আপনাদের কেউ নেই আর?

শিপ্রা তেমনি ঘাড় নেড়ে জানালে—কেউ নেই।

ডাক্তার তারপর আর কিছু না ব'লেই টুপ ক'রে বেরিয়ে এলো।

মোটরে ক'রে অনেকক্ষণ বিমনার মতো ঘুরতে লাগলো। ভাবে—এই বুঝি রেবতীর নিশ্বাস থেমে গেল, কি হবে তারপর? ঐ মেয়েটির কি হবে? কোথায় যাবে? রেবতীই বা কোথায় গেল? হয়ত এখনো যায়নি, হয়ত এখনো আরেকবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়।

কিন্তু কেন? যাক না।

বাড়ি এসেই ডাক্তার রমাকে বললে—ও গেল। পারলাম না বাঁচাতে।

রমা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বললে গেছে?

—এখনো হয়ত একেবারে যায়নি। কিন্তু যাবে। কেউ নেই একা স্ত্রী। কোথায় যে ভাসবে কে জানে। মেয়েটি কিছুই হয়ত বুঝতে পারছে না।

পরে বললে—সত্যিই ও আর ভাল হ'ল না, রমা। হ্যাঁ, ঐ অসুখ হ'লে ভাল হয়ও না, এমনি বেয়াড়া অসুখ। আমি চেষ্টা করতে আর কসুর করলাম কই? এই রোগে প্রতি বছরে আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক মরে। হাজার হাজার রেবতী।—কে কার খোঁজ রাখে?

পাইচারি করে আর বলে—যাক, বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন ফের ভুগত। বাঁচাটা বিড়ম্বনা বই আর কিছুই মনে হ'ত না। এই বেশ হ'ল—শান্তি পেলে। আমার কাছ থেকে একদিন আত্মহত্যা করবার জন্ম বিষ পর্য্যন্ত চেয়েছিল। যাক, আত্মহত্যার পাপ ত আর করেনি—

চেয়ে দেখে রমা দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।—কেন? রেবতী মরল ব'লে সেই দুঃখে, না ডাক্তার তাকে ভালো করতে পারল না—সেই লজ্জায়?

আবার অন্ধকার জ'মে উঠেছে। কন্‌কনে শীতের হাওয়া বইছে। একটু মেঘও করেছে বুঝি।

ডাক্তার ছাতে পাইচারি ক'রে বেড়ায়—মনে হয় ওর অপরাধের যেন অন্ত নেই। মনে হয়, রেবতী যেন লক্ষ-লক্ষ করতল প্রসারিত ক'রে ওর কাছে তার জীবন ভিক্ষা করছে। যেন বলছে— যে-জীবন আমার নিলে, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও!

ডাক্তার ঘুমের ওষুধ খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। রমাও।

বাতাসের বেগ বেড়েছে · অন্ধকারে মরাকান্নার মতো!

হঠাৎ রমা ঘুমের মধ্যে উৎকট চীৎকার ক'রে উঠল: ওগো, কে যেন ডাকছে

ডাক্তারও অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে আর্তনাদ ক'রে উঠল: কে? রেবতী?

এবং উঠেই জানলা দিয়ে নিচে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে দেখলে রেবতীর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিছুই দেখা গেল না। খালি, এই শীতের রাতেও ফুটপাতের ওপর কতগুলি গৃহহীন পথিক শুয়ে আছে।

আর কিছু না!

যে-কে-সে

লাল দীঘি—উত্তর-পশ্চিম কোণে অন্ধকূপ!

ছবিটার বিশেষ কোনো অর্থ আছে ব'লে কারুই কোনোদিন মনে হয়নি—জিরিয়ে-জিরিয়ে অর্থ করবার মতো সময়ও কারো সস্তা নয়। মোড়ের মাথায় ট্রাম থেকে নেমেই অন্ধকার খোপরিতে গিয়ে মাথা গলাতে হয়। বাইরে যে একটা প্রকাণ্ড আকাশ আছে · মনে করবার মতো কারো ফুরসৎ নেই। না থাক, তাতে কারু কিছু ক্ষতি হয়েছে ব'লেও মনে করে না কেউ।

বাঁধা রাস্তা, ছোট পৃথিবী, বোবা আশা—স্বল্পায়ু কেরানিরা আছে বেশ বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে বউবাজারে প'ড়ে সোজা ড্যালহৌসি-স্কোয়ারে গিয়ে ওঠা —সমস্তটা পথ বিনয়ের মুখস্থ হ'য়ে আছে। ফিয়ার লেনের কাছে সেই বুড়ো রিক্সাওয়ালাটা কিরায়ার আশায় ব'সে ব'সে ঝিমোয়; চিৎপুরের মোড়টা পেরতেই সেই খোঁড়া ভিক্ষুকটা তমনি হাত পেতে ভিক্ষা চায় সেই একঘেয়ে সুরে—কতদিন থেকে যে এমনি বলছে তার হদিস নেই— না বদলেছে একটা কথা, না বা সুরের একটা টান! আর কত দূর এগিয়ে এলেই কতগুলি অসহায় রোগা, পাণ্ডুর মুখ, পানে-ঠাসা তোবড়ানো গাল, চালশে চোখ, পাগুটে কপাল—মুখের আগাগোড়ায় এমন একটা ঘোলাটে, ফ্যাকাসে ভাব! সেই সস্তা রসিকতা, রাজ্যে ফাজলামো, সেই

ব'সে ব'সে কলম-চালানো—পুরোনো, পচা, ভেজাল!—এত বড়ো পৃথিবীতে ওদের আর কিছুই করবার নেই।

সেই ভিখিরিটার কাছে তার কান্নার যেমন অর্থ নেই—তেমনিই।

দিন যায়—এর মধ্যে এইটুকুই শুধু লাভ যে মাস ফুরোয়। ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে-চেয়ে ওরা প্রত্যেকটি দিন গোনে— সপ্তাহের আর ছ'টা কালো দিনের ওপর চোখ বুলিয়ে যেই রবিবারের লাল দিনটির কাছাকাছি আসে অমনি চোখ খুশিতে ডাগর হ'য়ে ওঠে—সেই দিনটির সম্ভাবনায় ওরা ব'সে ব'সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—শনিবার আপিস থেকে গিয়েই বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে ঠেসে ঘুম দিতে পারবে ভেবে তৃপ্তির শেষ থাকে না, কেননা রবিবার সকালে কেউ আর আপিসের দোহাই দিয়ে ঘুম ভাঙাতে গা ঠেলবে না বাঁচা যারে!

কিন্তু দিন কি সত্যিই কাটে?

আপিসে ঢুকেই নিজের চেয়ারটা টেনে বসতে যেতেই—সেই মুখ! একদিনো নড়চড় হয় না। সেই, সুতোয় বাধা নিকেলের চশমাটা নাকের ডগায় এসে ঠেকেছে, সেই কুঞ্চিত কুৎসিত মুখের উপর একটা বীভৎস বিবর্ণতা, নীচের পুরু ঠোঁটটা চেপে রেখে দু'টো অপরিষ্কার লম্বা দাঁত চোখা হ'য়ে ঝুলে রয়েছে, বাঁ গালে প্রকাণ্ড একটা মাংসের ঢিপি, তার মাথায় বড়ো একটা আঁচিল—ঐ মুখটা দেখলেই বিনয়ের সমস্ত গা কালিয়ে আসে; মনে হয়, ওঁর টুঁটিটা চেপে ধ'রে ওঁকে একেবারে সাবাড় ক'রে দেয়! বেঁচে থেকে ওঁর লাভ কি—কি দরকার? কৃপণ কুণ্ঠিত আকাশের যেটুকু করুণ আলো এ-ঘরটিতে এসে পড়েছে, হাত বাড়িয়ে তাকে লুফে নেবার অধিকার ওঁকে কে দিল? সামনে থেকে উনি স'রে গেলে বিনয় যেন ভালো ক'রে আরো একটু নিশ্বাস নিতে পারবে, খোলা জানলা দিয়ে এক টুকরো নীল আকাশ ওর দিকে চেয়ে এক মুহূর্তেই যেন চেনা ক'রে ফেলবে। বুড়ো শিববাবুকে ওর মনে হয় যেন শ্মশান থেকে উঠে এসে চেয়ারে ব'সে একটু হাঁফ নিচ্ছেন!

অথচ লোকটার বিন্দুমাত্র ভব্যতা নেই। যাট ছোঁয়ছোঁয়, কিন্তু ওঁর চরিত্রে না আছে বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য, না বা বয়সোচিত ব্যবধান। যৌবনে লোকটা দেদার খরচ ক'রে ক'রে এখন একেবারে ফতুর দেউলে হ'য়ে গেছেন—শুধু স্বাস্থ্যেই নয়, সহজ সামাজিক শ্লীলতায়ও। সমস্তটা মুখ ব্যাভিচারে চিম্‌সে হ'য়েও ধারালো আছে, দু'টো চোখে সমস্ত দুঃখের অন্তরালেও একটা অকৃত্রিম ধূর্ততা, বুকের পাঁজরগুলি জ'লে জ'লে শেষ হ'য়ে এলেও ওদের তলাকার আগুন এখনো নেভেনি। হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তোলা, সার্টে একটাও বোতাম নেই, মুখে তাড়ির গন্ধ, খক খক ক'রে কেশে মেঝের ওপরই থুতু ফেলেন, আর সময় নেই অসময় নেই পকেট থেকে চাকা

চাকা তালের মিছ্‌রি বার ক'রে কড়্‌মড়্‌ ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে খান—কোনোদিন পকেটে ক'রে কাঁকড়া-ভাজাও নিয়ে আসেন কাগজে মুড়ে।

যৌবনে কা'কে নাকি উনি ভালোবেসেছিলেন! সে-কথা জাঁক করে বলতে ওঁর একটুও লজ্জা নেই, বরং যেন খুব মজা পাচ্ছেন চোখ-মুখের এম্‌নি একটা ভাব করেন। বলেন: ভালোবেসেছিলাম বটে, কিন্তু তাকে মর্য্যাদা দেবার মতো আমার সাধনা ছিল না, সাধ্যও ছিল না।

ওঁর সারা মুখে প্রতিহিংসার একটা কঠোর উগ্রতা আছে। সমুখের দাঁত দুটো অত তীক্ষ্ণ হ'য়ে ঝুলে রয়েছে ব'লেই হয়ত। চোখ বুজে ওঁর কথা ভাবলে খালি ঐ হিংস্র দাঁত দু'টোই চোখে পড়ে।

বলেন—সাধে কি আর বাপ-মা সখ ক'রে নাম শিব রেখেছিলেন?—শুধু ভাঙ্‌ খেয়ে টং হ'য়ে প ড়ে থাকবার জন্যেই নয় হে—

গলা খাঁখরে পরে বলেন—কাঁধ দু'টোতে যে সতীর দেহভার ব'য়ে বেড়াবার ক্ষমতা ছিল তাও ওঁরা জানতেন নিশ্চয়। কিন্তু সে-মেহনৎ আর করতে হ'ল না। সেই কাঁধে আজকাল আপিসের ফাইল ব'য়ে বেড়াচ্ছি। বাঁচা গেছে। যাই বলো ভাই, মরা মানুষের ওজন আছে কিন্তু।

সবাই উৎসুক হ'য়ে বলে—ব্যাপারখানা কি, শিব-দা? মদন-ভস্ম?

—ব্যাপারখানা সুরুতেই ভারি গুরুতর। দশ বছর প্রণয়ের রিহার্সেল দিয়ে-দিয়ে ঠিক বিয়ের আগে সুরমা দেখা করতে এলো করজোড়ে নিবেদন করলে: আপনি আমার দাদা, আপনাকে চিরকাল দাদার মতোই পুজো ক'রে এসেছি। বললাম: সে কি সুরমা? সেদিনো যে কবিতায় প্রেমনিবেদন ক'রে চিঠি লিখেছ? সুরমা বললে: ওসব ছোট বোনজ্ঞানে আমাকে ক্ষমা করবেন। বললাম: বেশ। শেষকালে আমাকে তোমার স্বামীর কাছে শালা বানিয়ে রেখে গেলে?

সবাইর হাসি ও আগ্রহ আরো বেড়ে গেল, গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে—চলে গেল সুরমা?

—সহজে কি যেতে চায় ভাই?—প্রণাম ক'রে যাবে। বললাম: সন্ধেবেলা হাত পা ধুয়ে তক্তপোষের ওপর ব'সে আছি, পায়ে ধুলো ত নেই; দাঁড়াও, বাইরে থেকে খালি পায়ে একটু ঘুরে আসি গে। ঘুরে এসে দেখি সুরমা ঘরে নেই। তখন মাইরি একটা সনেট লিখতে ইচ্ছে হয়েছিল, বুকটা একেবারে ফুটো হ'য়ে গেছে কি না—সনেট লেখবার তুরীয় অবস্থা।

—তারপর?

—এর আবার তারপর কি? বছর কয়েক পরে নারেঙ্গাবাদ-এ দেখা।

দেখলাম—খাসা মোটা হয়েছে—দিব্যি টাবা নেবু। একেবারে একটি নধর চোজ, কিম্বা তারো রাজসংস্করণ—পিপে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল! ভগ্নীপোতটির নাম শুনলাম, কন্দর্পারি। নাম শুনে কিন্তু বিশেষ ভরসা হ'ল না, ভাই। কেননা, নামের সঙ্গতি রাখতে গিয়ে তাঁকে যদি সতীদেহ কাঁধে ক'রে বেড়াতে হয়, তাহলেই হয়েছে!

সমস্ত নির্মম ব্যঙ্গোক্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন একটি নিরানন্দতা আছে। ওঁর বিবাক্ত বীভৎস মুখের পানে চেয়ে সবারই একটা ভয়াবহ বিতৃষ্ণা জাগে বটে, কিন্তু কেমন একটা করুণাও হয়। ওঁকে ঘৃণা করা অসম্ভব।

ব'লে চলেন: কিন্তু ভগ্নীপোতটির আমার সেই দায়িত্ব বইতে হ'ল না। ছোট বোনটিকে পটল-সেদ্ধ খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে নিজে আলগোছে এক দিন পটল তুললেন। সেদিন সত্যিই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, বিনয়। ভাবলাম, ওর বৈধব্যের সঙ্গে-সঙ্গেই আমার বিয়ের লগ্ন এসে পৌচেছে

মুখের প্রত্যেকটি কর্কশ রেখা চোখকে বিদ্ধ করে। সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে ওঁর কথাগুলি যেন গিলতে থাকে, কারু জিভের ডগায়ই প্রতিবাদের ভাষা আসে না।

একটু থেমে শিববাবু ফের বলেন—উনপঞ্চাশ বছরে বাত আর বউ ঘরে আনলাম। তার পরের ইতিহাসটা আগের মতো ক্ষিপ্ত না হ'লেও নেহাৎই সংক্ষিপ্ত। বউ বাতের ছুতোয় শয্যাশায়ী হ'য়ে রইলেন, বড়ো বড়ো ছেলে দু'টো মারা পড়লো, একটা ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাত থেকে প'ড়ে—আরেকটা কালীপুজোয় হাউই ছুঁড়তে। একটা মেয়ে হয়েছে—এইটুকুন, পাঁচ বছর বয়স – কোমর থেকে পা পর্যন্ত অবশ। শামুকের মতো বুকে হেঁটে-হেঁটে চলে—দেখতে সে ভারী মজার! মেঝের ঘষায় বুকে ঘা পর্যন্ত হ'য়ে গেছে। তোমরা একদিন যেয়ো আমার বাড়ি। আমার মেয়ের বুকে-হাঁটা দেখে আসবে। পয়সা দিয়ে দেখবার মতো। সত্যি। —শুধু কি তাই? ওর নাম রেখেছি ফুৎফুৎ। যদি বলি: ফুৎফুৎ, মা আমার! গালভরা হাসি ওর দেখে কে? ছোট-ছোট দু'খানি হাত বাড়িয়ে আমার দাড়ি ধরতে চায়! পারে না। ওর মুখের সামনে উবু হ'য়ে ব'সে ওর এই নিষ্ফল চেষ্টাটি উপভোগ করি। তোমরা যেয়ো একদিন।

শিববাবুর স্ত্রী বিছানায় শুয়ে শুয়েই পাড়া মাথায় করতে থাকেন। তখন আপিস-ফেরৎ শিববাবু মাত্র বাড়ি ঢুকেছেন।

—বলি, তোমার কি হায়া হবে না কোনোদিন? আমাকে তুমি এমনি শুইয়ে-

শুইয়েই মারবে নাকি? আমার সারা পিঠে ঘা হ'য়ে গেল সেদিকে ত আজো নজর পড়ল না? বুড়ো হ'য়ে কি চোখে ছানি পড়েছে? উঠে খেতে পারি না ব'লে কি উপোস ক'রে ক'রেই আমসি হ'য়ে যেতে হবে? দাঁত বার ক'রে হাসতে হয়, ত' কেওড়াতলায় গিয়ে হাস গে।

স্বর ক্রমেই সপ্তমে চড়তে থাকে।

শিববাবু বলেন—তোমার আর-আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো জিভটা যে কবে অসাড় হবে আমি তাই খালি ভাবি।

স্ত্রী আর্ত চীৎকার ক'রে ওঠেন: দাও না, তাই দাও না, টুঁটিটা ধর না টিপে, জিভটা বেরিয়ে পড়ুক।

শিববাবু হেসে বলেন—ছি! স্ত্রীলোকের একচেটে অধিকার সেই বৈধব্য থেকে তুমিই বা বঞ্চিত হবে কেন? আর ক'টা দিনই বা সবুর করতে হবে?

ব'লে শিববাবু মাটি থেকে বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে আগুন দেবার চেষ্টা করেন। ধরাতে কি পারেন ছাই! রোজই এমনি হয়। মেয়েটাকে উপুড় ক'রে নামিয়ে রেখে চুপ ক'রে ফ্যানের টগবগ শোনেন।

কোনো রকমে ভাত ডাল নামিয়ে একটা থালায় ক'রে খানিকটা নিয়ে স্ত্রীর মুখের কাছে এনে ধরেন। বলেন—প্রিয়ে, খাও।

স্ত্রী মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠেন: তোমার হাতের ছোঁয়া আমি খাব না। ব'লে মুখ সিঁটকোন।

স্বামী বলেন—আমার হাতের চড়-চাপড়ো ত আর কম খাওনি। হাতের এ দুটো গরম ভাতও তোমার সইবে।

স্ত্রী তেড়ে বললেন—ফেলে দাও আস্তাকুঁড়ে।

মুখের কাছে থালাটা আরো একটু ঠেলে নিয়ে স্বামী বললেন—তাই ত ফেলছি। হাঁ কর।

স্ত্রী দাঁতে দাঁত দিয়ে রইলেন।

শিববাবু বললেন—তোমাকে যতই কেন না ঘেন্না করি, এক বিষয়ে তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে—তুমি মোটা নও ব'লে। ঢ্যাঙা ছিপছিপে গড়ন আমার ভারি পছন্দ। তোমার এই অসুখটিকে তাই আমি অহরহ ধন্যবাদ দিই। নইলে, আমার কপালে তুমি একটি আস্ত পিপে হ'য়ে দাঁড়ালেই হ'ত আর কি! সন্ন্যেসী হ'তে হ'ত!

স্ত্রী মুখ খিঁচিয়ে বললেন—চেলাকাঠ আর ঝাঁটার কাঠি দুটোই ঢ্যাঙা আর ছিপছিপে

—সত্যি! এই উপমাটার জন্য তুমি ফুল-মার্ক পেতে পার— ও-হ্’টোর যে খুব ভালো সাদৃশ্য আছে এ কথা আমার আগে মনেই হয়নি। নাও, খেয়ে নাও। কেননা রাগটা জুড়িয়ে খেতে গেলে দেখবে কপালদোষে ভাতটাও জুড়িয়ে গেছে। সে-বোকামি তোমাদের ধাতে আছে কিনা।

ভাতের থালাটা বিছানার ওপর রেখেই শিববাবু উঠে এলেন।

স্ত্রী ভাবলেন—প্রতিশোধ একটা নিতে হবেই। কিন্তু না-খেয়েই নয়। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, রাগের চেয়ে ক্ষুধার ধারই বেশি।

বিছানাটার কাছেই শিববাবুর সেই বোতামহীন ডোরাকাটা সার্টটা প'ড়ে ছিল। খেয়ে না-আঁচিয়ে সেই সার্টটাতেই হাতের এঁটো রগড়ে-রগড়ে মুছলেন। কাল কি প'রে আপিসে যান, দেখা যাবে।

পাশের ঘরে শিববাবু মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে পাইচারি করছিলেন। আকাশে হয়ত কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ ছিল, ফাল্গুনের রাতে কুঁড়ির অন্তরালে কত কিশোরী রজনীগন্ধা হয়ত প্রফুল্ল যৌবনের স্বপ্ন দেখছিল—কত কি হচ্ছিল, তার কি কিছু হিসেব আছে? অগুন্তি আশা, অফুরন্ত অন্ধকার, অঢেল অশ্রুজল! কিন্তু শিববাবু ভাবছিলেন মদের দোকানে গত মাসের দেনাটার কথা—সব চুকিয়ে না দিতে পারলে গলায় একটি ফোঁটাও গলবে না। কত বাকি আর মাস ফুরোতে?

হঠাৎ আপিসে সেদিন শিববাবু বিনয়কে প্রশ্ন করলেন: আপনি বিয়ে করেছেন?

বিনয় বললে—করেছি বৈ কি। বিয়ে আবার কে না করে?

—বলেন কি! আপনাকে খুন করব, বিনয়বাবু!

বিনয় হেসে বললে—কেন? বিয়ে করেছি ব'লে?

শিববাবু শূন্যে একটা ঘুসি মেরে বললেন—নিশ্চয়ই। তেত্রিশ টাকার কেরানির আবার বিয়ে কি।

বিনয় বললে—পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই বুঝি টাকায় ধার্য্য হয়, শিববাবু? বিবাহ কি শুধু একটা বিলাস?

শিববাবু ভ্রূকুটি ক'রে বললেন—কে বলে নয়? অর্থটাই সেখানে প্রকাণ্ড উপসর্গ। কাটুন উপসর্গ—থাকে কি তাহলে? শুধু লাস। লাস-বাহক হওয়াটা খুব সুখের নয়।

বিনয় বললে—আপনি কি বলতে চান, টাকাই ভালোবাসার কম্পাসের কাঁটা? তেত্রিশ টাকার কেরানিকে বুঝি কেউ ভালোবাসতে পারবে না?

শিববাবু অবাক হ'য়ে বললেন—আপনাদের দিনে ভালোবাসার বাজার-দর প'ড়ে গেছে বুঝি। তেত্রিশ টাকা?—ভারি সস্তা ত। মেলে ঐ দরে?

—এ আপনার বাড়াবাড়ি, শিববাবু। সব জিনিস উড়িয়ে দেওয়াই আপনার ফ্যাসান। হরিশ্চন্দ্র যখন ভিক্ষুক হ'য়ে পথে বেরুলেন তখন শৈব্যার ভালোবাসাটি কিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর ট্যাঁকে তেত্রিশটা আধলাও ছিল না। ভুলে গেছেন বুঝি?

– কিছুই ভুলিনি ভাই। কিন্তু আজকালকার শৈব্যারা যে বেজায় সভ্যা হ'য়ে উঠেছেন। কত তেত্রিশ টাকায় একখানা 'কার' হয় মুখে-মুখে হিসাব কষতে পার?

·· ছাই! কবিরা বলেন এক ফোঁটা অশ্রুজল শুধু।

মুখ গম্ভীর ক'রে শিববাবু বললেন · আপনার ফাঁসির আরেকটা চার্জ পাওয়া গেল, বিনয়বাবু! আপনি আজকাল নিশ্চয়ই কোনো ছিঁচকাঁদুনে কবিতা পড়ছেন। কেরানির আবার ও কেন? চালাবেন কলম, শুয়ে শুয়ে বউ-এর মেরুদণ্ডে ঘা হ'লে লাগাবেন মলম। খালি এই দুই কাজই ত দেখতে পাচ্ছি।

খানিক থেমে ফের বললেন—ধরুন, আপনারো একটা উপসর্গ আছে—আপনি গ্রাজুয়েট। কাটুন আপনার উপসর্গ—কি থাকে? নয়, নয়, নয়! তেত্রিশ টাকাও নয়।

তর্কের খাতিরেই হয়ত তর্ক করা—নইলে বিনয় কি জানে না সব?

জীবনে যে সব বাড়তি আশা ছিল সব কেটে-কুটে মানানসই ক'রে এই তেত্রিশটাকার কেরানিগিরির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। টিকে থাকবার জন্য আলো আর হাওয়াটুকুও হিসেব ক'রে কিনে নিতে হয়—দোকানি একটি কাণাকড়িও ভুল-চুক করে না। যে সমস্ত চোখা ও ধারালো আকাঙ্ক্ষা ছিল ভাগ্য তার লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে-পিটিয়ে সব ভোঁতা ক'রে দিয়েছে। পরিচিত জুতোর মধ্যে পা গলালেই যেমন তাকে আত্মীয় ব'লে মনে হয়, তেমনিই এ জীবন। কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম নেই—নিটোল, নির্ভাজ। ছিঁড়ে গেলে ফের তালি লাগিয়ে নিতে হয়।

যেমন, প্রথম পক্ষটি মুক্তপক্ষ হ'য়ে পলাতক হ'তেই বিনয়ভূষণ ফের তালি লাগিয়ে জীবনের ফাঁকাটা ভরাট ক'রে তুলেছে।

এক খুনে ডাকাত নাকি একবার সন্ন্যাসীর গেরুয়া প'রে ফেরার হয়েছিল। মজা এই, সংসারে আর নাকি ফেরবার নামও করেনি ঝুলি নিয়েই ঝুলে পড়েছে। তেমনি ধারা বিনয়ভূষণও কেরানির মুখোস প'রে ঠিক তারই মধ্যে মুখের ভৌলটি মানানসই ক'রে নিয়েছে—মুখের মধ্যে এমনি একটা হতাশা, এমনি একটা মালিন্য।

—এপারে ওর এই পুরোনো বালিখসা নড়বড়ে ঘরের মধ্যে নড়বড়ে তক্তপোষটি ; ওপারে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে প্রায়ান্ধকার ঘরে একখানা ছারপোকাসঙ্কুল চেয়ার—জীবনের ওর সদর রাস্তার টার্মিনাস ঐ পর্য্যন্ত। এর বাইরে কোথায় এরোপ্লেনে ঠোকাঠুকি লাগলো, কোথায় কোন্ দেশ যুদ্ধের সাঁজোয়া প'রে সঙিন উঁচিয়ে ব্যাপার সঙিন ক'রে তুলেছে,মড়ক লেগে কোথায় সমস্ত সহর উজার হ'য়ে গেল – এ-সব বাজে খবরে ওর প্রয়োজন নেই। আজকাল বাঙলা দেশে নিবারণ চক্রবর্তী নামে যে একজন অমিত-শক্তিশালী কবি উঠেছেন, ও তার খবরই রাখে না। রাখলেও, তাকে আসতে দেখে বারণ করতে বা বরণ করতে কোনটাতেই ওর স্পৃহা নেই।

অথচ তর্কের মুখে মুখ বুজে থাকা ওর ধাতেই নেই--সব বিষয়ে মত জাহির করা চাই-ই। সে-মত যেমনি পুরোনো তেমনি পচা—তার মধ্যে একটা উৎকট উগ্রতা আছে। মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে ও খড়্গহস্ত, স্ত্রী-স্বাধীনতা ওর দু' চোখের বিষ, তপোবল যতটা না হোক্ তপোবনই ও বেশি পছন্দ করে। বিধাতা ওকে যেন ফরমায়েস দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা। ড্যালহৌসি-স্কোয়ারের চার-পাশের রাস্তাগুলোতে লোক কিলবিল করছে। আপিস ভেঙে গেছে ; বউবাজারের সরু ফুটপাত ধ'রে কেরানিরা সার বেঁধে মার্চ ক'রে চলেছে—কাঁধে ছাতি। যেন যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরছে।

কিন্তু এই সন্ধ্যায় ওর ঘরের কি অবস্থা ও বেশ ভেবে নিতে পারে। বড় ছেলেটা আজ ন' দিন ধ'রে জ্বরে পুড়ছে- এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি। ছোট মেয়েটা ট্যা ট্যা করছে নোংরা মেঝের ওপর প'ড়ে—অবাঙ্মুখী চারু নিঃশব্দে ঘরের কাজ ক'রে যাচ্ছে ক্ষিপ্রপদে—পরনের কাপড়টা সেলাই-করা, দু'টি হাতে খালি দু'টি শাঁখা, নাকের উপর একটা নাকছাবি আছে ব'লেই মুখখানিকে বেশি করুণ মনে হয় !—নিশ্চয়ই এখন উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে, সমস্ত পাড়াটা দম বন্ধ ক'রে আছে, কাঁচা ড্রেনের ওপর মশাগুলি গুঞ্জন ক'রে ফিরছে।

চিরাভ্যস্ত পদক্ষেপে বিনয় এগুতে থাকে।

মাসের পনেরোই—মেল-ডে। কাপড়ের তাড়া থেকে মুখ তুলে শিববাবু বললেন—যাই বলুন, আপনাদের পরম ধার্মিক ভগবানবাবুটি আর যাই হোক, ভারি বেরসিক।

কথাটা কোথায় গিয়ে পৌছুবে ঠাওরাতে না পেরে বিনয় কলম থামিয়ে চুপ ক'রে রইল।

শিববাবু ঘৃণার হাসি হেসে বললেন—দরকার হয়নি ব'লেই আপনাদের ভগবান-

বাবুটিকে খোসামোদ করিনি, তার জন্তেই বোধহয় এমন একটা খেলো রসিকতা করলেন। আমার মতন গরিব গোবেচারার ওপর হাত না তুললে বুঝি তাঁর ভদ্রতার লাঘব হ'ত। বলিহারি!

বিনয় বললে—ব্যাপার কি?

—ব্যাপারটা জলের মতোই তরল ও সোজা। বড়বাবু বললেন—এই দিন পনেরো ফুরুলেই আমাকে তলপি গুটোতে হবে। বললেন: বুড়ো নিয়ে আর কাজ চলবে না, এম্. এস. সি. আসছেন। মনে-মনে বললাম: তোমাদের ভগবানবাবুটির ত বয়সের গাছ-পাথর নেই, তাঁকে খারিজ করবার কারু মুরোদ নেই ব'লেই বুঝি আমার ওপর তম্বি! বড়বাবু বললেন: ডিস্‌মিস। বললাম: সেলাম, গুডমর্নিং। এমন ভাবে ডিস্‌মিস কথাটি বললেন যেন আমাকে মোলায়েম কিসমিস খেতে দিলেন আর-কি।

বিনয় ব্যথা পেয়ে ব'লে উঠল: চাকরি গেল, শিববাবু?

টেবিলের ওপর কলমটা ছুঁড়ে ফেলে শিববাবু বললেন—শুধু কি চাকরি? সকালে-বিকালে তু' পেয়ালা চা পর্য্যন্ত। বেতো স্ত্রী, বিকল শিশু। সংসারে আর রইল কি?

বিনয় কঠিন ক'রে বললে—সংসারে যা ছিল তা নিয়ে কোনো দিনই ত আপনাকে গর্ব করতে দেখিনি। স্ত্রী পিটটান দিলে আপনিও যে বুক-টান ক'রে আপনার নামের মর্য্যাদা রাখবার জন্য কিছু ব্যস্ত হবেন তেমন তুর্বলতা ত আপনার চরিত্রে নেই। আপনার ভাবনা কি?

শিববাবু বললেন—স্ত্রী পিটটান দিলে শ্মশান থেকে তাঁর শ্রাদ্ধবাসরের পথটুকু হাঁটতে গিয়েই আমাকে সটান শ্রীঘরে গিয়ে ঘরজামাই হ'তে হবে—ভাবনাটা তারি জন্তে। বিয়োগান্ত নাটিকায় আমি পেছপা নই বিনয়বাবু, খরচান্ত নাটিকাতেই আমার ভয়।

হঠাৎ কণ্ঠস্বরটা কোমল ক'রে বললেন—কিন্তু মুঠির মধ্যে থেকে একজন এমনি ফসকে যাবে এও যে সয় না সহজে। বহু বছর আগে এমনি একদিন একজন ভোজ-বাজির মতো উবে গিয়েছিল! মানুষের নাগালটা এত ছোট, মুঠি তুটো এত তুর্বল কেন? বারে বারে ভাগ্যের কাছ থেকে এ-হার আর হাত পেতে নিতে পারি না যে।

বিনয় ভুরু কুঁচকে বললে—নিতে পারবেন না জেনেও ত অনেক জিনিস নিয়েছিলেন, শিববাবু। এ-হারও তাই নিতে হবে।

—নিতে হবে। সেইটেই কথা, শত চেষ্টা ক'রেও রাখা যায় না।

—রেখে লাভ ?

—এমনি রাখার জন্যে রাখা—রাখতে পারার মধ্যে ভারি একটা গৌরব আছে। যেতে দিতে তবু যে মন চায় না। কিন্তু আমি রেখে দিতে চাই—আমার বেতো স্ত্রীকে, কাঙাল শিশুটিকে, যেমন আজো এই বুড়ো বয়সেও সেই বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবনের প্রথম দুঃখটিকে রেখে দিয়েছি।

শিববাবুর চোখ জলে ভরে আসে বুঝি, বিনয় হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে থাকে।

শিববাবু চোখের জলটা রুখে রেখে বললেন—আজ আমার গতযৌবনা কাহিল কঙ্কালসার স্ত্রীর শুকনো কুৎসিত মুখের পানে চেয়ে যেন নিজের জীবনের শূন্যতাটাকে মুখোমুখি ক'রে দেখলাম। তার সীমা কে নির্দেশ করবে ?

আপিস ছুটি হ'তেই শিববাবু কুঁজো হ'য়ে ছাতি বগলে ক'রে আস্তে আস্তে পথ চলতে সুরু করলেন। কোন্ পথে বাড়ি যেতে হবে তারো যেন হদিস নেই—কোথায় এর শেষ, তারো ঠিকানা নেই কোনো। গিয়ে আবার উনুন ধরাতে হবে, সকালে আপিসের তাড়াতাড়িতে এঁটো বাসন ক'টা মাজা হয়নি, তাই মাজতে হবে গিয়ে—মেয়েটা হয়ত কাঁদছে আর বুকে হেঁটে-হেঁটে বাপকে হয়ত এ-ঘরে ও-ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে! তাকেও একটি বার কোলে নেওয়া চাই।

সেদিন বিনয়কে শিববাবু বলেছিলেন : আপনার কি, জোয়ান বয়েস, একদিন সংসারে বীতস্পৃহ হ'য়ে বেরিয়ে পড়বেন। গৌতম যদি পৃথিবীর কাছে ক্ষমাভাজন হ'য়ে থাকে, আপনিও হবেন।

বিনয় বলেছিল : আপনার ত মহাপ্রস্থানের সময় এগিয়ে এসেছে শিববাবু, বানপ্রস্থ নিয়ে ভেসে পড়ুন না।

কি জানে বিনয় ? বিকলাঙ্গ অবোলা শিশুর কী কাকুতি—রোগা পঙ্গু মুমূর্ষু স্ত্রীর কাতর দৃষ্টির কী গভীরতা!

শিববাবু চোখ ছাড়িয়ে যেতেই বিনয়ের মনে হ'ল—লালদীঘি কথাটার মধ্যে একটা রূপক প্রচ্ছন্ন আছে। দীঘির জল কেরানিরই রক্তে লাল হ'য়ে উঠেছে! উত্তর পশ্চিম কোণে অন্ধকূপ - ওদেরই কিংসটন কোম্পানির আপিসটা।

আজকের ঘটনা সুদূর ভবিষ্যতে যখন পুরাতত্ত্ব হ'য়ে উঠবে, তখন এই হবে তার ব্যাখ্যা।

মাস ফুরোয়—কুণ্ঠিত স্মিত মুখে নূতন মাসের প্রথম তারিখটি যেন বহু যুগ পরে হেসে এসে দেখা দেয়।

শিববাবু বললেন—আজই শেষ, বিনয়বাবু।

বিনয় চম্‌কে ওঠে : কিসের ?

—আমার চাক্‌রির, আমার স্ত্রীর।

—আপনার স্ত্রীর মানে ? কেমন আছেন তিনি ?

—সকাল থেকেই শ্বাস উঠেছে। টেঁসে যাবে এবারে।

—বলেন কি ? তবে এসেছেন কেন ?

একটু হেসে শিববাবু বললেন—এসেছি কেন ? চল্লিশটা টাকার জন্তেই ত সব—মরন্ত স্ত্রী, বিকলাঙ্গ শিশু। তাকে আর অর্জন করতে না পারলেও বর্জন করতে ত পারিনে।

বিনয় বললে—আচ্ছা, এখন চলুন বাড়ি, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

হাত জোড় ক'রে শিববাবু বললেন—মার্জনা করবেন। আমার জন্য কষ্ট সইতে হবে না আপনার। ব'লেই চোখের নিমেষে শিববাবু খ'সে পড়লেন। বিনয় থ হ'য়ে রইল।—ভাবলে, বুড়োর বড়াই এবার ঘুচেছে।

যেমন-কে-তেমন—আস্তে আস্তেই পা চালিয়ে চলছিল—অন্যমনস্ক, উদাসীন। হঠাৎ একটা মোটর গায়ের ওপর হুড়্‌মুড়িয়ে পড়ছিল আর-কি! আচমকা মোটর থেকে কে ডেকে উঠল : আরে, বিনয় যে!

কলেজের বন্ধু—সৌরীন। হাওয়া খেতে চলেছে, পাশে নবপরিণীতা স্ত্রী। সপ্রতিভ সুন্দর মেয়েটি!

বিনয় বললে—বহুদিন পরে খুব জাঁকালো রকমই সম্ভাষণ করছিলে, ভাই! কেমন আছ ?

স্ত্রীর সুন্দর মুখখানির পানে চেয়ে সৌরীন বললে—চমৎকার। আর তুমি ?

—ছ্যাক্‌ড়া গাড়ি। তোমাকে দেখে ভারি খুশি হ'লাম। মোটর কবে কিন্‌লে ?

—মেয়েকে মোটরে চড়িয়ে বেড়াবার জন্য শ্বশুর যৌতুক দিয়েছেন। আচ্ছা, যাই।

ততক্ষণে সোফার ষ্টার্ট দিয়েছে। মোটর বেরিয়ে গেল।

সেই দিকেই খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিনয় আপন বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটি বাক্যহীন অস্পষ্ট বেদনা অনুভব করলে। হাওয়ায় মেয়েটির চুল ও ঘোমটার গুড়া থেকে পশ্চিম আকাশে প্রথম অস্ফুট তারাটির ফোটার মধ্যে যেন একটি সুমধুর সুখাবেশ আছে। এই স্তিমিত সন্ধ্যালোকে আকাশের নিচে ওদের জীবনের এই

নিভৃত মুহূর্তগুলি খালি একলা ওদেরই! কোথাও এতটুকু বাধা নেই, না বা এতটুকু আড়াল! মেয়েটির মুখে অপরিসীম তৃপ্তি, সৌরীনের চাপা ঠোঁটের কোণে কি উজ্জ্বল অহঙ্কার! সব, সব মিছে—সমাজ, সংসার, শ্মশান—সমস্ত। আজকের সন্ধ্যায় এই সুনিবিড় অন্তরঙ্গতার তুলনা কোথায়?

পকেটে তিনখানি দশটাকার নোট, আর তিনটি খুচরো টাকা। এই টাকা তিনটি ও অপব্যয় করবে। ও ট্যাক্সি ক'রে চারুকে হাওয়া খাইয়ে আনবে। হিসাবের খাতায় খরচের ঘরে এত বড় রাহাজানি জীবনে কোনোদিন হয়নি, না হোক্; এই ডাকাতির বিরুদ্ধে ও বিবেকের কোনো ডাকেই কান দেবে না। শুধু চারুকেই চৌরঙ্গী আর গড়ের মাঠ দেখিয়ে আনবার জন্য নয়, নিজেকেও ও ভালো ক'রে নক্ষত্র-দীপ্ত আকাশ দেখিয়ে আনতে চায়—প্রিয়া নারীর অন্তর্লীন রহস্যটি উদ্ধার ক'রে নিতে চায়, ও চায় ক'টি মুহূর্তের জন্য ওর কেরানি-জীবনের গ্লানি ভুলে যেতে, চারুর ম্লান দু'টি চোখের মণি কৌতুকে কলহাস্যে সান্নিধ্যে চুম্বনে চঞ্চল ক'রে তুলতে।

মনে অফুরন্ত খুশি নিয়েই ও চলেছে—হঠাৎ পাশে থেকে কে ডাকলে: বিনয়বাবু!

চেয়ে দেখলে- শুঁড়ির দোকান। বেজায় ভিড় লেগেছে। কে ডাকে ওখান থেকে?

মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখলে—শিববাবু! মদ খেয়ে চুচ্চুরে মাতাল হ'য়ে ব'সে আছেন—হতশ্রী চেহারাটায় এমন একটা দুর্বিষহ কদর্যতা আছে যে গা রি-রি ক'রে ওঠে।

বিনয় একটু এগিয়ে এসে বললে—এ কি হচ্ছে, শিববাবু? আপনার স্ত্রী মর-মর, আর আপনি—

শিববাবু বাধা দিলেন: আরে ভাই, এমনিই যাবে, এতক্ষণে কাবার হ'য়েও গেছে হয়ত। মিছিমিছি ডাক্তার ডেকে কতগুলি গরচা দিই কেন? কত দিন ধ'রে গলাটা কাঠ হ'য়ে ছিল, খবর ত রাখ না? নিজের প্রাণ উৎসর্গ করাটা যত বড়োই মহৎ কাজ হোক না কেন দাদা, আত্মরক্ষা করাটা তারো চেয়ে মহৎ।

বিনয় বললে—আপনি যে এত বড়ো পাষণ্ড জানতাম না।

শিববাবু না চটেই বললেন—কোনোদিন ত খাওনি, তাই ওর স্বাদও জান না। পাষণ্ডই বটে। আরে ভাই, মদ না খেয়ে যে শ্মশানে মড়া পুড়তে পারি না আমি।

বিনয় বললে—সব টাকাটাই গেছে?

—এই শেষ পাত্তর। একটা ফুটো পয়সাও নেই। খাবে ভাই একটু? মিষ্টি!
বিনয় গর-গর করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তা'রি জন্যেই আজকের দিনে চারুর মুখে গালে ঠোঁটের কোণে ও হাসির হাসনুহানা ফোটাবে এই ওর পণ। শিববাবুর স্ত্রীর মতো যদি অভিমান ক'রে ও-ও মৃত্যুর অভিসারিণী হয়! নারীজাতির ওপর শিববাবুর এই মর্মান্তিক অপমানের ও প্রতিশোধ নেবে। যে-চারুকে অবহেলায় ঠেলে রেখেছিল তাকে আজ ও আদরে, স্নেহের ঐকান্তিকতায় ডুবিয়ে দেবে। চারু তা'র অভ্যস্ত সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুক ওর হাত ধ'রে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও চায় না বটে - কিন্তু খালি আজকের সন্ধ্যাটুকুর জন্য যদি একটু ব্যতিক্রম হয় তাতে গোটা মহাভারতটা অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না।

সেই উনুনের ধোঁয়া, সেই ছোট মেয়েটার প্রাণান্তকর চ্যাঁচানি, সেই ড্রেনের ভ্যাপসা গন্ধ—কিন্তু বিনয়ের মুখে বিরক্তির চিহ্নটি পর্য্যন্ত নেই। প্রশান্ত লাবণ্যে মুখ ছেয়ে গেছে। বললে—চারু, মাইনে পেলাম, নাও, রাখ।

চারু তার পেলব করতলে টাকা কয়টি গ্রহণ করলে। চাবি দিয়ে টিনের বাক্সটি খুলে কাপড়-চোপড়গুলির তলায় যত্ন ক'রে টাকা কয়টি রেখে দিল।

হঠাৎ বিনয় বললে—ট্যাক্সি ক'রে বেড়াতে যাবে, চারু?

ওর চোখে ভাসছিল সৌরীনের গর্বোজ্জ্বল প্রদীপ্ত মুখ ও পাশে তার অকুণ্ঠিতা স্বল্পাবগুণ্ঠিতা নববধূটির কথাভরা দু'টি চোখের স্বচ্ছ আভা! পৃথিবীতে উনুনের ধোঁয়া আর ড্রেনের গন্ধই ত সব নয়!

বিনয় বললে—চল, বেরিয়ে পড়ি, একখানা ফর্সা দেখে শাড়ি প'রে নাও। আছে ত?

চারুর চোখে মুখে খুশি উপচে পড়তে লাগল, বললে- হঠাৎ এই সখ?

—সখটা হঠাৎই হয় চারু—কতদিন যে ফাঁকা আকাশ দেখিনি, তুমি শুনে বলতে পারবে না। চলো, দেরি ক'রো না।

মেয়েটা তখনো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। মেয়েটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে তাকে একটু আদর করলে, বাপের হাতের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আদর লাভ ক'রেও মেয়েটা কণ্ঠ থামিয়ে নীরবে বাপকে ধন্যবাদ জানালে না। বিনয় বললে—নন্দার কাছে রেখে এসো।

নন্দা বিনয়ের ছোট বোন। শ্বশুরবাড়ি থেকে দাদার বাড়ি বেড়াতে এসেছে।

চারু বললে—ঠাকুর-ঝিকে নিয়ে গেলে হয় না?

বিনয় হেসে বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি! আজকের দিনে পৃথিবীতে খালি আমি আর তুমি, সেখানে আর কেউ নেই।

চারু অবাক হ'য়ে বললে—সে কি! খুকিকেও নিয়ে যাব না?

—না। ওকে তক্তপোষের নিচে না-হয় ফেলে রেখে চল, শিগ্‌গির! ভাববে, আমাদের সংসার নেই, সমাজ নেই, শাসন নেই - খালি আমরা, আমি আর তুমি! ওপরে চলেছে তারার সারি, নিচে শুধু আমরা দু'জনে।

বিনয়ের যেন কি হয়েছে। চারু কিছু ঠাহর করতে না পেরে পাশের ঘরে চ'লে গেল।

নন্দা ব'সে ব'সে বিনয়ের আগের পক্ষের বড়ো ছেলেটার মাথায় পাখা করছে। চারু ঘরে ঢুকে ক্রন্দনরত মেয়েটাকে নন্দার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললে—রাখতে বললেন উনি।

নন্দা পাখা থামিয়ে বললে—মহারাণী প্রজাপালনে ইস্তফা দিলেন নাকি?

-- আমাকে উনি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন ট্যাক্সি ক'রে—

—বল কি? হাওয়া গাড়িতে? কত খরচ পড়বে, জান?

—সে-হিসেব উনি করবেন।

—জান, যেই টাকাটা অমনি হাওয়ায় উড়োবে তা দিয়ে এই রোগা ছেলেটার মুখে দু'চামচে ওষুধ পড়ত। বেচারার মুখপানে চেয়ে দেখেছ একটিবার? পেটে ধর নি ব'লে কি একটু মমতাও হ'তে নেই?

চারু বললে মোকদ্দমা করতে হয় ওঁর সঙ্গে কর গে।

ব'লে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে পিঠে দুম দুম ক'রে কিল বসিয়ে ওর কান্না আরো চড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগল: তুই মরিস না কেন হতভাগি? তুই মরলেই ত আমার হাড় জুড়োয়! তোর কেন জ্বর হয় না, তুই কেন চোখ বুজিস্ না?

মেয়েটাকে যত মারে, যতই কোল থেকে নাবিয়ে দিতে চায়, ততই ও কাঁদে আর মায়ের আঁচল আঁকড়ে ধরে। তারপর মেয়েটাকে জোর ক'রেই ঠেলে দিয়ে চারু কাপড় বদলাতে গেল।

বিনয় মোড় থেকে ট্যাক্সি ধ'রে আনতে গেছে।

যখন ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এলো, মেয়েটা তখন চেঁচিয়ে সমস্ত বাড়ি মাথায় করেছে। বিনয় বললে - মেয়েটাকে নিয়েই চলো সঙ্গে ক'রে। সব মাটি।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। মেয়েটার কান্না তবু থামে না। চারু মেয়েটার কান্না থামাবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করতে লাগল।

বড়ো রাস্তায় পড়েছে। চারু বললে ঠাকুর-ঝি খুব টাস টাস কথা শুনিয়ে দিল। সোয়ামি বড় চাকরি করে ব'লে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।

বিনয় প্রশ্ন করলে : কি বলছিল ?

— বলছিল, ছেলেটা মরছে, আর ওঁরা দেব-দেবী হাওয়া খেতে যাচ্ছেন। কী কুটুনি ক'রে ফোড়ন দিয়ে কথা বলা !

বিনয় হেসে বললে— ও সব কথা আজকের জন্য ভুলে যাও, শিকেয় তুলে রাখ ; —ছেলের অসুখ, বাড়িভাড়া বাকি, মুদি কাল শাসিয়ে গেছে ;— সে-সব আর কারুর, আমাদের নয়। আমাদের দেহে প্রচুর স্বাস্থ্য, সিন্দুকে মেলাই টাকা আমরা ট্যাক্সি চড়ছি। বেশ পা ছড়িয়ে গা মেলে বোস। জবুথবু কেন ?

চারু বললে— আপিসের বাবুকে ব'লে তোমার মাইনে বাড়িয়ে নাও না। আমায় অন্তত একজোড়া দুলও কিনে দাও না। দেখেছ, শাড়িটা ফর্সা হ'লে কি হবে, আঁচলের দিকটা কি রকম ছেঁড়া। একটা নিকার ছাড়া মেয়েটার একটাও আস্ত জামা নেই।

বিনয় বললে—ওসব কথা ছেড়ে দাও এখন, বাড়িতে ব'লো যত খুশি।

চারু ফের ঘটা ক'রে বলছিল - রায়দের বাড়ির কাণ্ডখানা শুনেছ ত ?—

বিনয় বাধা দিয়ে বললে—ওসব কথায় এখন কি দরকার ?

আকাশে অল্প অল্প মেঘ করছে। বিনয় ভাবছিল, এ নয়, এ ও চায়নি। হঠাৎ বললে—আচ্ছা, এ কি হ'তে পারে না যে তুমি চারু নও, আর কেউ—আমিও বিনয় নই, আর কেউ। হ'তে পারে না, না ?

খালি মনে পড়ছিল—শিববাবুর সেই লোলুপ বিকৃত মুখচ্ছবি নয়, সৌরীনের দাম্ভিক অথচ সুন্দর মুখকান্তি। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ও উড়ুনি, কেমন পরিপাটি ক'রে চুল আঁচড়ানো, হাতে সোনার ঘড়ি। পাশে যেন একটি ফুলের গেলাস !

নয়, নয়। এ ও চায়নি। যাকে ও চায় তাকে ও চেনে না, নাম জানে না— যে আজ এত কাছে ব'সে থেকেও দূর থাকবে—সমস্ত নিঃশব্দতাই বাঙ্ময়, যার দূরত্বের মধ্যেও সুনিবিড় সান্নিধ্য আছে। কে সে ? বিনয়ের ছোট পৃথিবীটিতে কোনোদিন তার পদচিহ্ন পড়েনি।

বিনয় মুখ বাড়িয়ে সুমুখে কি দেখছিল।

চারু ততক্ষণ অনর্গল কণ্ঠে তার সাংসারিক অভিযোগ বিবৃত করছে। মাসে ধনে-সর্বের খরচ থেকে সুরু ক'রে রায়েদের মেয়ের হাতের পনেরো ভরি সোনার ডায়মনকাটা বালা পর্য্যন্ত ! বুলি-পাড়া থামিয়ে বললে—কি দেখছ ?

বিনয় বললে—দেখছি, মিটারে কত উঠছে। দেড় টাকা হ'লেই ফিরতে হবে। তিন টাকার বেশি হ'লেই গেছি আর কি।

এর খানিক বাদেই ড্রাইভারকে ও বললে—ফের।

চারু বললে—এরি মধ্যে ?

বিনয় বললে আজ্ঞে হ্যাঁ।

চারু বললে—টাকা তো সঙ্গে আনোনি।

—বাড়ি ফিরে গেলেই দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা ভাবছি, অমনি পায়ে হেঁটে যখন বেড়াই তখন কত চেনা লোকের সঙ্গেই যে অকারণে দেখা হ'য়ে যায়। আজকে আমার এই সৌভাগ্যের দিনে রাস্তায় কি কেউ নেই যে এই পরম আশ্চর্য্যকর ব্যাপারটি তাদের খাতায় নোট ক'রে রাখে? তুমি আমার স্ত্রী নও, এমনি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রিয়া—এ কথাও ত কেউ কেউ ভুল ক'রে ভেবে নিতে পারে! সেদিক দিয়ে আজ আমার পরম দুর্দিন, চারু। স্ত্রী ছাড়া তুমি আর আমার কেউ নও - আর কারু চোখেও আর কিছু নও। এই আমার ভয়ানক দুঃখ!

মিটারে যখন দু' টাকা উঠেছে, হঠাৎ একটা চাকা দারুণ আর্তনাদ ক'রে ফেটে ফেঁসে গেল।

বিনয় ব'লে উঠল : এই যা! উপায়?

ড্রাইভার বললে - অন্য গাড়িতে যান। ব'লে প্রাপ্য টাকার জন্যে হাত পাতলো।

বিনয় বললে—টাকা সঙ্গে নেই, আমার বাড়ি যেতে হবে।

ড্রাইভার কিছুতেই রাজি হয় না। এই নিয়ে একটা তুমুল কোলাহল বেঁধে গেল —ভিড়ের মধ্যে চারু আকণ্ঠ ঘোমটা টেনে ক্রন্দনরত মেয়েটার মুখ চেপে ধ'রে নিঃশব্দে ঘামতে লাগল।

অবশেষে পাঁচ জনের মধ্যস্থতায় ঠিক হ'ল ড্রাইভারকে বিনয়ের সঙ্গেই আলবৎ বাড়ি গিয়ে টাকা নিয়ে আসতে হবে।

বিনয়ের পিছু-পিছু চারু গুটি-গুটি এগুতে লাগলো। বিনয় খুব বড়ো-বড়ো পা চালিয়ে এগিয়ে গেল, যেন পশ্চাদ্বর্তিনী নারীটির সঙ্গে ওর কোনই সংস্রব নেই, তাকে ও চেনেই না। চারুর প্রতি বিনয়ের মন একেবারে তিক্ত হ'য়ে উঠেছে। চারু যে প্রকাণ্ড ঘোমটা ঝুলিয়ে রোরুদ্যমান মেয়েটাকে শান্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে পথ ভাঙছে তার জন্যে ওর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। পথের লোক যে এই অভিভাবকহীনা মেয়েটির প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে তাতে ওর কুণ্ঠাও নেই কিছু।—একবার ইচ্ছে হচ্ছিল পাশের গলি দিয়ে স'রে পড়লে কেমন হয়!

মোড়ে এসে একটু দাঁড়াল। পেছন থেকে প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে চারু এসে ওকে ধরল। ঘোমটা না খুলেই ধমক দিয়ে উঠল : ভিড়ের মাঝে তোমার ঐ জুতো-জোড়া চিনে-চিনে আর কতদূর চলব আমি?

বিনয় বললে—বেশ ত ব্যায়াম হচ্ছে।

ব'লেই আবার এগিয়ে চলল। ট্যাক্সি ড্রাইভারটাও সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

মেঘ যে এত ঘন হ'য়ে এসেছে বিনয়ের খেয়াল নেই। পেছনে তাকিয়ে দেখলে চারু তার ঘোমটা খুলে চোখ ওপরে তুলে আকাশে মেঘের সমারোহ দেখছে! মেঘেরই মতো ওর বুক ভয়ে দুরু দুরু ক'রে উঠেছে বুঝি। চারু যে তার কালো দু'টি চোখ তুলে মেঘ দেখবে এ বিনয় কোনোদিন ভাবেনি। ঐ অবগুণ্ঠনটি আছে ব'লেই ওর মুখখানি যেন সুমধুর একটি অপরিচয়ের রহস্যে ঢাকা আছে ; কিন্তু বাড়ি গিয়ে ঐ ঘোমটাটি যখন কমিয়ে আনবে, তখন ওকে আর এমন সুন্দর লাগবে না।

বৃষ্টি পড়তে সুরু করল, সবাই গাড়ি কিম্বা গাড়িবারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিলে। খালি বিনয়ই থামল না, পেছনে ওর পুরাতন স্ত্রী আর মেয়ে! বড়ো ছেলেটা বিছানা নিয়েছে, ছোটটাও নেবে—না ভিজলেও নিত। শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা কিছুতেই দাঁড়াতে দিচ্ছে না—নিজে একটা ওয়াটার-প্রুফ গায়ে চাপিয়েছে কি না।

ললাটে এত বিড়ম্বনাও লেখা ছিল।

কোনো রকমে বাড়ি এসে পৌঁছুনো গেল।

নন্দা বেরিয়ে এসে বললে—এ কি কাণ্ড!

বিনয় চেঁচিয়ে বললে – টাকা বার ক'রে দাও দু'টো।

ভিজে কাপড় নিয়েই চারু চাবি খুঁজতে গিয়ে দেখলে চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল চাবি? দেখতে-দেখতে ডানা গজাল নাকি ওর? কাপড়-চোপড় বালিশ তোষক ছরকোট্ ক'রেও কোথাও মিলছে না।

নন্দাকে বললে –আমার চাবির রিংটা তাড়াতাড়ি ফেলে গেছলাম, দেখেছ কোথাও?

নন্দা মুখ বেঁকিয়ে বললে—তোমাদের ট্রাঙ্কের চাবিও জানি না, মনের চাবিও জানি না।

বিনয় একেবারে রুখে এল : কোথায় টাকা? ব্যাটা সেই কখন থেকে জোঁকের মতো লেগে আছে। ঝকমারি! এত দেরি হচ্ছে কেন?

চারু মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে—চাবি পাচ্ছি না।

বিনয় মুখ ভেঙচে উঠলো : চাবি পাচ্ছি না! টাকাগুলি গেল বুঝি লোপাট হ'য়ে? হতচ্ছাড়ি!

আনাচ-কানাচ আস্তাকুঁড় পর্য্যন্ত চাবি খোঁজা হ'ল। উনি নিরাকার অদৃশ্যই থেকে গেলেন।

অগত্যা বিনয় রাগ ক'রে বাক্সটা দু' হাতে মেঝের ওপরে সজোরে আছড়ে ফেললে। বাক্সর ডালাটা খুলে গেল। তখন দেখা গেল ছোট্ট চাবিটি বাক্সর মুখেই আটকে আছে। দু'টো টাকা বার ক'রে নিয়ে যেতে-যেতে বিনয় বললে—তোমার

জন্য শুধু-শুধু ছুটো টাকা উড়ে গেল আজ—একেবারে খামোখা। তা দিয়ে দশ বারো দিন বাজার খরচ হ'ত—ছেলেটার ওষুধ হ'ত, হয়ত মরত না। সাধে কি বলেছে—স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ? সাধে কি শিববাবু এত বিগড়েছেন? কেলেঙ্কারি না কেলেঙ্কারি! কেরানির স্ত্রী, তার আবার কেরামতি দেখ—যাবেন গাড়ি চ'ড়ে! খেঁকশিয়ালি রাজা হ'লেও জুতো খায়। ছোঃ!

টাকা পেয়ে ড্রাইভারটা গালি পাড়তে পাড়তে চ'লে গেল।

বৃষ্টি থেমে গেছে—কাপড় ছেড়ে চারু গিয়ে নোংরা সেই রান্নাঘরে ঢুকেছে, মেঝেতে চিৎ হ'য়ে মেয়েটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, ড্রেন থেকে ফের গন্ধ উঠছে—জীবনে এই সত্যি।

সবচেয়ে বড়ো সত্যি—কালকে আবার ভোর হবে। কালকে থেকে আবার আপিস স্বরু।

দিনের পর দিন

সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নামবার আগে ডাক্তার একটুখানি থামলেন।

—এই যে।

বিমল তাড়াতাড়ি তাঁর কুণ্ঠিত হাতের মধ্যে ভিজিটের টাকা কয়টা গুঁজে দিলো। তারপর অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মতো প্রশ্ন করলো: সত্যিই কেমন দেখলেন?

বিমলের ধারালো চোখের দিকে চেয়ে সে-প্রশ্ন আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না; ডাক্তার শুধু একটু হাসলেন।

বিমল গম্ভীর হ'য়ে বলল—মিথ্যে আশা দেওয়াই আপনাদের ব্যবসা। রুগী মরবে—সরাসরি এমন রায় দিলে আপনাদের কে আর ডাকতো বলুন। সব জানি। তবু বলুন—একটুও লুকোবেন না—কদ্দিন আর ও আছে। বেশ স্পষ্ট ক'রে বলুন, আমি তৈরি হই।

কথা শুনে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—আরো ছু'সপ্তাহ না গেলে কিছুই বোঝা যাবে না।

—ছু' সপ্তাহ!

কাতর, অসহায় কণ্ঠস্বর! কিন্তু হয়ত তার মাঝে বিশ্রী একটা বিস্ময়ের সুরও প্রচ্ছন্ন ছিল: ছু'সপ্তাহের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হবে ত। না, তারপরেও—

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হবার আগেই ডাক্তার বললেন—আর ছু' সপ্তাহ টিকলে এ-যাত্রা রক্ষা পেলেন। তবে ভয় নেই আর!

—ও

ডাক্তার চ'লে গেলে বিমল নিচের ঘরে একটা চেয়ারে চুপ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আলো জ্বালা হয়নি। কাল থেকে ঠিকে-ঝি-র জ্বর, ঠাকুরটাও পলাতক। বাড়ি থেকে সনাতনের আজ আসবার কথা—এখনো ফেরেনি। একটা লোক ধ'রে না আনলে উনুন পর্যন্ত ধরানো হবে না। রাত্রে উপোস ক'রতে হবে।

বেশিক্ষণ একমনে নিজের দৈন্য-দুর্দশার কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ বিমল বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। এত দুঃখ তাকে সইতে হবে কেন? এত বড়ো সৃষ্টির পক্ষে তার কি প্রয়োজন ছিল? প্রার্থনা একটা মনের মধ্যে পুঞ্জিত হয়ে ওঠে হয়ত, কিন্তু তা উচ্চারণ করবার আগেই সে দু'হাত দিয়ে অন্ধকার অনুভব করতে-করতে উপরে চ'লে আসে।

বিভা এরি মধ্যে মোমবাতিটা জ্বেলেছে। স্বামীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে বিভা খেঁকিয়ে উঠলো : কী করছিলে এতক্ষণ? ডাক্তারের গাড়ি ক'রে হাওয়া খেয়ে এলে বুঝি? ওষুধটা নিয়ে আসতে হবে না?

—এই এবার যাই।

বিমল ঘরে এলো।

—তোমার কি—বেরুতে পারলেই হ'ল। ওষুধ আনতে গিয়ে পাঁচটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে আস আর-কি! আজ ক্লাবে ব্রিজ খেলতে গেলে না? যাও না, আমি তোমার কে?

এ-সব আর সয় না। বিমল রুক্ষস্বরে বলল—কি করতে হবে বাপু স্পষ্ট ক'রে বলো। ওষুধ আনতে যাব, না এখানে ব'সে তোমার সঙ্গে আড্ডা দেব?

—আমাকে বলতে হবে? তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? ভিজিট দিয়ে ডাক্তার ডাকলে তার মুখ দেখাতে নাকি? ওই কাগজটায় সে আমার কুষ্টি লিখে গেছে?

কাগজটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিমল বলল—তা বললেই হয়। যাচ্ছি ডিসপেন্সারিতে।

ঠোঁট ফুলিয়ে বিভা বলল—তাই যাও! আর তোমাকে পায় কে? ধর্মের ষাঁড় হ'য়ে এই ছুতোয় বেরিয়ে পড় আর-কি! কিন্তু কুঁজোটা যে বিকেল থেকে ঠন্‌ঠন্ করছে সে-খেয়াল আছে? তেষ্টায় গলা যে কাঠ হ'য়ে গেল। ঝি আসেনি ব'লে কুঁজোটায় জল ভরলে তোমার হাতে ফোস্কা পড়তো নাকি? শোন, জল না পেলে

জিভ্ বের ক'রে আমি ম'রে যাবো দেখো। ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

কথায় কান না পেতে প্রেসক্রপশানটা হাতে ক'রে বিমল নিচে নেমে এলো। ঘর-দোর এলো, জানলাগুলি হাওয়ার হাহাকার করছে— নোনা-পড়া দেয়ালে রাস্তার গ্যাসের আলোয় একটা জাম-গাছের শীর্ণ ছায়া কিল্‌বিল্ করছে—দেখে বিমলের গা কেমন ছম্‌ছম্ ক'রে উঠলো। গ্যাসের আলো প'ড়ে নিচের অন্ধকারটা যেখানে একটু ফিকে হয়েছে, হঠাৎ বিমল দেখতে পেলো—সেখানে নিরালায় ব'সে কে-একটি মেয়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে! কিন্তু একটু ভালো ক'রে ঠাহর করতেই চোখে পড়লো মেয়েটিও ব'সে নেই, প্রসাধন-সাধনাও তার শেষ হয়েছে। শূন্য মেঝেটা বিধবার সিন্দুরহীন কপালের মতো বিধুর হ'য়ে উঠলো। বিমল থমকে গেল। এই নিরাত্মীয় সংসারে কে এই মেয়েটি—কা'র মানসস্বর্গস্খলিতা কবিতা না-জানি! হঠাৎ পাশে কার পায়ের শব্দ শুনে বিমল চমকে চেয়ে দেখলো সেই মেয়েটিই দ্রুত-পদে রান্নাঘরে ঢুকেছে—হাঁড়ি-কুঁড়ি খুন্তি-হাতার স্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রসাধন ছেড়ে মেয়েটি এবার রন্ধনে মনোনিবেশ করেছে। কড়া-য়ে খুন্তি-নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের চুড়ির বাজনাটি হাল্কা কবিতার মতোই মিঠে। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের ক'রে বিমল রান্না ঘরের দরজার কাছে এনে ফস্ ক'রে কাঠি ধরালো। কোথায় বা উনুন, কোথায় বা কে! স্তূপীকৃত ঘুঁটের ওপর দাঁড়িয়ে একটা বেড়াল থাবা বাড়িয়ে পোকা ধরবার কসরৎ করছে। কাঠিটা আধাখানা না পুড়তেই কে যেন পেছন থেকে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলে। হাতের স্পর্শের চাইতে সে-নিশ্বাস ঢের বেশি স্পষ্ট, ঢের বেশি স্থূল! বিমল আরেকটা কাঠি জ্বালালো। খানিকটা অন্ধকার বিপন্ন হ'য়ে পথ ছেড়ে দিলো—দু' পা অগ্রসর হ'য়ে এ-দিক ও-দিক চাইতেই কানে এলো খাবার-ঘরে ব'সে কে যেন কাঁসার বাটির গায়ে ঝিনুকের আওয়াজ করছে। দুধ-খাওয়ানোর বেলায় কাঁদুনে ছেলেকে মা'র প্রবোধ-প্রয়াসের মতো। কিন্তু ঘরে নয়, বাইরের এই বারান্দাতেই—একেবারে বিমলের পায়ের কাছটিতে। সে-মুখে অথচ ভাববিহ্বল মাতৃত্বের এক বিন্দু সুষমা নেই, কঠিন শীর্ণ মুখে কেমনতরো একটা রুক্ষ বীভৎসতা। সে-বীভৎসতা স্বাভাবিক শ্রীহীনতার নয়, অচরিতার্থ কামনার। তবু মুখটি যেন বিমলের কেমন চেনা-চেনা লাগলো। অথচ আশ্চর্য্য এই, প্রসাধনরতা লাবণ্যললিতা সেই মেয়েটি হঠাৎ কেমন ক'রে বেশ-বাস পরিবর্তন ক'রে এমন কুৎসিত হ'য়ে গেল! ভয়ে বিমল পড়লো পিছিয়ে। মেয়েটিও সলজ্জ অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথায় ঘোমটা টান্‌লে। সে-মুখ অদৃশ্য হ'ল বটে, কিন্তু কোলের তার শিশুটি যে মরা, অসাড়! এই না সেই ছেলেটি দুধের ঝিনুক ছুঁড়ে

ফেলে স্তন্যলোভে মা'র বক্ষবিস্তীর্ণ রাশীকৃত আঁচলের তলায় বারে-বারে মুখ গুঁজছিল। দৃঢ়কায়, পূর্ণাবয়ব, সুস্থ ছেলে। বিমল গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠতো হয়ত, কিন্তু এতক্ষণে কুপিটা সে জ্বালতে পেরেছে। পুঞ্জিত অন্ধকার তরল হ'ল। তাতে বিমল স্পষ্ট দেখতে পেলো মরা ছেলেকে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে উপর-তলায় ছুটে পালাচ্ছে। স্পষ্ট বিভা—বিমলের আর-সন্দেহ নেই। যে-ছেলে তার পেটে মরেছে তারই এ বিফল-স্বপ্ন! মেঝের উপর চূণখসা দেয়ালের খানিকটা চল্‌টা প'ড়ে আছে মাত্র—কখন প'ড়ে থাকবে কে জানে!

বিমলের সমস্ত শরীর শির-শির ক'রে উঠলো—খোলা জানলা-দরজাগুলি অন্ধকারে এমন একটা বিপুল বহির্জগতের দিকে সঙ্কেত করছে যে বিমল না পারলো চেঁচাতে, না বা সেই অপসৃয়মানা প্রেতিনীর পশ্চাদ্ধাবন করতে। ঘরের বাইরে কলকাতা যেখানে কোলাহল-হলাহলে ফেনিল হ'য়ে উঠেছে, সেখানে নেমেছে মৃত্যুর সুচির স্তব্ধতা—শুধু পারহীন পরিধিহীন প্রান্তর; না আশা, না আশ্রয়।

ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে বিমলের মুহ্যমান অবস্থাটা সহজ হ'য়ে এলো। তার আর সন্দেহ রইলো না যে দীর্ঘ দিনরাত্রির অক্লান্ত প্রতীক্ষার পর বিভার আজ এত দিনে উড়ে পালানো! তাই অন্ধকার সাঁতরে নব-নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা করবার আগে নিচে নেমে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মা যখন দেশের বাড়িতে মরেন, তখন বিমল জব্বলপুরে—প্লেগের ভয়ে দেহাতে গিয়ে তাঁবু গেড়ে পেণ্টালুন প'রে সাহেব সেজেছে। মারা যাবার রাতে মা বিমলের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে মশারি তুলে বললেন: চললুম; বিয়ে ক'রে সংসারী হোস্, বিমল। আমার এই শেষ ইচ্ছাটি রাখিস বাবা। আশ্চর্য্য, বিকেলেই এলো টেলি; মা নেই। বিভাও তেমনি যাবার আগে তার অতৃপ্ত সংসার-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বহন ক'রে নিচে নেমে এসেছিল—রান্নাঘরে, সেবা-সুধায়; মুকুর সন্নিধানে, লাবণ্যচর্চায়; শিশুপালনে, গর্ভধারণের গর্বিত ঐশ্বর্য্যে! আবার সে উপরে চ'লে গেছে—কত উপরে, কত মেঘস্তর পেরিয়ে, আবিষ্কৃত ও অনির্ণীত কত তারায় বিশ্রাম নিয়ে-নিয়ে—নীল, সবুজ, হলদে তারা! উপরে উঠলেই ঠিক বিমল দেখতে পাবে সেই ম্লান শয্যার উপর বিভা মধ্যগগনে কৃষ্ণপক্ষের অন্তিম চাঁদের মতো বিবর্ণ;—দেহ ত নয়, দড়ি! হার্ট যে এত দুর্বল এ-কথা অথচ ডাক্তার ব'লে গেলেন না। বেচারি স্বামীর কাছে জল খেতে চেয়েছিল, সে-অতৃপ্ত পিপাসা নিয়েই সে বিদায় নিয়েছে।

নিমেষে বিমলের গলা কাঠ হ'য়ে এলো। চীৎকার করতে পারলে হয়ত সে বাঁচতো, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু সম্বন্ধে এমন একটা অটুট সন্দেহ পোষণ ক'রেও সে সামান্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেললো না। মৃতদেহ সৎকার ক'রে সে তাহলে আর

এ-বাড়িতে ফিরবে না—এই ফাঁকা বাড়িতে কিসের বা তার আকর্ষণ- সে সোজা সুধীরদের মেস্‌-এ চ'লে যাবে। আজ রাত্রে আর ব্রিজ নয়, হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা চৌকস একটি ঘুম।

কুপিটা হাতে ক'রে বিমল উপরে উঠতে লাগলো। ভয়ে সমস্ত হাত-পা কালিয়ে আসছে কবে কোনদিন বিভার প্রতি অন্যায় করেছিল সে-ভাবনায় প্রতি মুহূর্তে সে তার টুঁটির উপর দু'টো জিঘাংসু থরনথর হাতের মুঠো কল্পনা করছে—নবযুগের নতুন কানুনে তাকেই বুঝি এবার সহমরণে যেতে হ'ল। স্ত্রীজাতীয়া এবং জৈব জগতে প্রিয়তমা হ'লেও অদেহা বিভার সঙ্গে নিশ্চয়ই সে এঁটে উঠবে না। সেই ভেবেই তার ভয়।

ঘর স্তব্ধ—মোমবাতিটা নিবে গেছে। জানলার সার্সিতে একটা পোকার অনবরত মাথা-ঠোকার আওয়াজকে বিমল আরেকটু হ'লে বিভার নিশ্বাস ফেলবার শব্দ ভেবেছিল! পোকাটা পালিয়েছে—ঘরে জীবন-চাঞ্চল্যের আর এতটুকু আভাস নেই। মৃত্যুর সঙ্গে এই স্তূপীকৃত অন্ধকারের একটা চমৎকার সঙ্গতি আছে। ফুল-শয্যার দিনে (রাতে নয়) বিমল যেমন চোখে একটি দোদুল্যমান কৌতূহল নিয়ে বিভার অবগুণ্ঠিত মুখশ্রী দেখবার জন্যে উঁকি মেরেছে, আজো তার মৃত্যু-কলঙ্কিত চিরসুষুপ্ত মুখখানি দেখবার জন্যে লালসার আর তার শেষ নেই। আজকের ঘর জনাকীর্ণ নয়, ধরা পড়বার আর লজ্জা কোথায়—তবু চোরের মতো নিতান্ত নিঃশব্দে, টিপে-টিপে পা ফেলে বিমল একটু-একটু ক'রে এগোতে লাগলো। পাছে বিভা তার ঘুম থেকে জেগে ওঠে, পাছে বিমলের সকল সন্দেহ একটি কদর্য্য কৃশ করুণ দেহ দেখে মিথ্যা হয়! বিমলের চোখে মৃত দেহের মতো সুন্দর আজ আর আছে কী!

দরজার ওপার থেকে বিমল ডাকলো : বিভা!

এক মুহূর্ত কোনো সাড়া নেই। সৃষ্টিব্যাপিনী সেই নিঃশব্দতা বিমলের চিত্তকে অভিভূত করলে।

এবার বিমল সাহস ক'রে ঘরে ঢুকেছে। বিছানার উপর বিভা উপুড় হ'য়ে শুয়ে—ভঙ্গিটা কঠিন, চুলগুলি বিস্রস্ত। ডাকবার কি আর প্রয়োজন আছে? সে-ডাক খালি তারায়-তারায় প্রতিধ্বনিত হবে, মর্ত্যতলে তার আর উত্তর কৈ? রোগী যেমন আপন ক্ষতস্থানে হাত রাখে, তেমনি সন্তর্পণে বিমল বিভার খোলা পিঠের উপর হাত রাখলো। নিবিড় শীতল স্পর্শে তার হাত এবার ম্লান করুক!

—এ কি! তুমি যাওনি এখনো ওষুধ আনতে?—বিভা খেঁকিয়ে উঠেছে : ওষুধ-বিষুধ যদি না-ই খাওয়াবে, তবে পা দিয়ে গলাটা চেপটে দাও না শেষ ক'রে।

আচমকা হাত থেকে কুপিটা ছিটকে প'ড়ে গিয়েছিল, সেটাকে লক্ষ্য না ক'রে বিমল পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে মোমবাতিটা জ্বালালো। তার হাত কাঁপছে। বাতিটা তুলে বিভার মুখের কাছে আনতেই বিভা ধমকে উঠলো: কী দেখছ ইদিকে? ঐ তো কুপিটা প'ড়ে আছে। কী যে কর!

আলোটা বাঁচিয়ে রেখে বিমল বললে—তোমার জল তেষ্টা পেয়েছিল না? কাঁচের গ্লাশটা কৈ? কলে এখনো হয়ত ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়াচ্ছে, ধ'রে নিয়ে আসি খানিকটা। সুধীর আসুক, সে তোমার কাছে বসলে আমি গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসবো।

গ্লাশ নিয়ে বিমল আবার নিচে নেমেছে। কোথায় সেই ছায়ামূর্তি? রাতের পর রাত অনিদ্রায় মস্তিষ্ক তার ক্লান্ত হ'য়ে গেছে—এই ছায়া তার রাশি রাশি নৈরাশ্যের ছায়া! কিম্বা তার জীবনে যে-প্রেতিনী দিনের পর দিন পদচারণা করছে এ হয়ত তারই অশরীরী প্রতিচ্ছবি!

জল নিয়ে বিমল উপরে এলো। তার কাঁধের উপর ভর দিয়ে বিভা সেই জলটুকু অতি কষ্টে পান করলে; ঠোঁটের প্রান্তের জলটুকু বিমলই দিলো মুছিয়ে।

স্নিগ্ধ আলো, একটুখানি পিপাসা, একটুখানি স্পর্শ—ঘরের হাওয়া ক্ষণতরে আবার মিঠে হ'য়ে ওঠে। বিছানায় গা এলিয়ে বিভা বলে: ডাক্তার কী ব'লে গেল? বাঁচবো না?

মাথার চুল প্রায় সব উঠে গেছে, তারই মধ্যে আঙুল বুলুতে-বুলুতে বিমল বলে: ডাক্তারের সাধ্য কি ও কথা বলে? আমারই প্রার্থনার কি আর জোর নেই? ডাক্তার বললে, দু'সপ্তাহের মধ্যেই তুমি সেরে উঠবে। কাল থেকে জ্বর ত তোমার আজ অনেক কমেছে।

—কমেছে নাকি? বিভার শুক্‌নো ঠোঁটের ধারে স্বল্পায়ু একটি হাসি ভেসে উঠলো: কৈ, আমাকে ত বলনি। আমাকে কিন্তু উনি বললেন এই নতুন ওষুধটা খেলেই পেটের যন্ত্রণা অনেকটা আরাম হবে।

—নিশ্চয়। আমি যাই, নিয়ে আসি গে।

—না, তুমি আরেকটু বোস আমার কাছে। রাতে কি খাবে?

বিমল নিচু হ'য়ে স্ত্রীর কপালে ধীরে একটি চুম্বন দিলে।

সিঁড়িতে কা'র জুতোর আওয়াজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। বিমল তাড়াতাড়ি মুখ তুলে বললে—সুধীর এতক্ষণে এলো বোধহয়।

ঘরে ঢুকেই সুধীর প্রশ্ন করলো: আজ কেমন আছ, বৌদি? ব'লে জামার সবগুলি পকেট উজাড় ক'রে সে নানা জাতীয় ফল বের করতে লাগলো—বেদানা,

আপেল আর কমলালেবু : এইসব সওদা ক'রে আসতে দেরি হ'য়ে গেল। কেমন আছ আজ ?

বিভার মুখ সুখে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে : আজ অনেক ভালো মনে হচ্ছে। জানো, জ্বর আজকে নেই বললেই হয়। নতুন ডাক্তার আজ যিনি এসেছিলেন তাঁকে দেখলেই কেমন ভরসা হয় ভালো হ'য়ে উঠবো। (বিমলকে) তুমি এবার যাও, ঠাকুরপোই ত এখন বসতে পারবে।

—হ্যাঁ, আর কি—। সুধীর কোটটা খুলে ব্র্যাকেটের হুকে টাঙিয়ে রেখে বিভার শিয়রে ব'সে রুমাল বের ক'রে ঘাড় নাড়তে লাগলো : নিচেটা একেবারে অন্ধকার। ঝি-চাকর কেউ আসেনি বুঝি ?

স্বামীর নীরবতা লক্ষ্য ক'রে বিভা অন্যমনে কখন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল—আকাশ, না তারা, না তার বর্ণহীন ভবিষ্যৎ—কী যে সে নির্ণয় করছিল বলা কঠিন ; হঠাৎ স্বামীকে সম্বোধন ক'রে কি-একটা কথা বলতে গিয়ে টের পেলো ঘরে বিমল নেই।

—উনি চ'লে গেলেন ?

বিভার একখানা হাত মুঠির মধ্যে টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে করতে সুধীর বলল—হ্যাঁ, এইমাত্র। তারপর একটু থেমে : তোমার জ্বর কিছু কমেছে ব'লে ত মনে হচ্ছে না।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বিভা ফিকে একটু হেসে বলে তুমি ছাই ডাক্তার হবে। ছাই তুমি অমন মোটা-মোটা বই পড়। রুগীর সামনে সত্য কথা বলতে নেই। ব'লেই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল : কোনো রকমেই কি ভালো হওয়া যায় না, ঠাকুরপো ? ওঁকে এক দিনের জন্যেও খুশি করতে পারলাম না। বিয়ের পর বছর খানেক যেতে না যেতেই এই যে বিছানা নিয়েছি, বোধ হয় চিতেয় চড়বার আগে আর ছাড়া পাবো না।

মাঝখানে সুধীর কি বলতে যাচ্ছিল, বিভা বাধা দিয়ে বললে সেদিন ওঁর মুখে শুনলাম কে-একটা ছেলে নাকি নিজের মাথার মধ্যে স্বচ্ছন্দে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মরার মধ্যে নাকি ভীষণ মজা আছে। আমি ত তা ভাবতেই পারি না, ভয়ে সমস্ত শরীর আমার কেঁপে ওঠে। সেদিন যে ভূমিকম্প হয়েছিল, মনে আছে, ঠাকুরপো ? দেয়াল-ছাত ভেঙে মাটির মধ্যে মিশিয়ে যাবো ভাবতে সে-ক'টা মুহূর্ত যে আমার কী ক'রে কেটেছে বলতে পারবো না। তারপর থেকে সব সময়েই আমার মনে হচ্ছে আমি যেন শূন্যে ঘুরতে-ঘুরতে মাটির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। মরতে আমি

কিছুতেই পারবো না। কিন্তু মরতে যখন সত্যিই হবে একদিন, তখন হয়ত টেরও পাবো না একটু। কি হবে ?

বিভার শঙ্কিত দুই চোখে অসহায় বেদনা !

অন্যমনস্কের মতো সুধীর বললে—ভালো হবে। জরটা যের একটু নামলেই হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাবো তোমাকে। তুমি তখন আবার অনুভব করবে তুমি নববধূ মনে দেহে পরিচয়ে। যৌবনকে আবার আবিষ্কার করবে, বৌদি।

বিভা বলে—তোমাদের কত কষ্ট দিলুম। মা আর মলিনা এসেছিল, ওঁদের পেয়ে জর-টর সব পালালো—পুরী যাওয়া ঠিক ক'রে ফেলেছিলুম। ওদিকে বাবা মরমর, মলিনারও সম্বন্ধ একটা প্রায় পাকা হ'য়ে এসেছে, মা আর দোর করতে পারলেন না। বললেন : পুরী গিয়ে ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিস। হুড়মুড় ক'রে আবার জর এসে গেল। কোথায় বা পুরী, কোথায় বা কী !

বিভার কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলুতে বুলুতে সুধীর বললে—তোমার পুরী যেতে ইচ্ছে করে ?

—খালি যেতে ইচ্ছে করে, ঠাকুরপো। ট্রেনে চাপলেই আমি ভালো হ'য়ে যাবো মনে হয়। গায়ে হু-হু ক'রে হাওয়া লাগলেই জর নেমে যাবে দেখো। আমাকে তোমরা এমন ক'রে আটকে রেখেছ কেন ? পেটের ব্যথাটা আবার টের পাচ্ছি যে, ঠাকুরপো। ওষুধটা নিয়ে উনি এখনো ফিরলেন না। ষ্টোভটা ঠিক ক'রে রাখ, উনুন-টুনুন আজ ধরানো হয়নি ; পেটে হট্-ওয়াটার ব্যাগটা একবার চাপাতে হবে। মাগো !

সুধীর নিচে গিয়ে ষ্টোভ মেরামত করতে বসলো। উপর থেকে বিভার আর্তনাদ কানে আসচে : ওষুধটা এক দাগ খেলেই কিন্তু এতক্ষণে ব্যথাটা নিশ্চয় পড়ে যেত। তা হয়ত ঐ টাকা দিয়ে উনি গেছেন ফিল্ম দেখতে। মানুষের মরতে ভয় করলেই কি আর মরণ হয় না নাকি ?

বিমল যখন ফিরে এলো, সুধীর ষ্টোভ সারিয়ে তার মাথায় এনামেলের ডেকচি চাপিয়ে জল প্রায় ফুটিয়ে এনেছে। বিমলকে দেখতে পেয়েই সুধীর উদ্বিগ্ন হ'য়ে প্রশ্ন করলো : ওষুধ এনেছ ?

বিমলের কণ্ঠে উদ্বেগের বাষ্পটুকুও নেই : কেন ?

—বৌদির যে ভীষণ ব্যথা উঠেছে, এতক্ষণে বোধ হয় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন।

শুকনো হাসি হেসে বিমল বললে—অজ্ঞান ! বল কি ! এই নাও ওষুধ।

ওষুধের মোড়কটা খুলতে খুলতে সুধীর প্রায় ছুটে উপরে উঠে গেল। বলতে-

বলতে গেল : ব্যাগে জলটা পুরে তুমিও শিগ্‌গির এস, বিমল-দা। ডাক্তারকে আরেকটা কল দিতে হ'তে পারে। হয়ত একটা ইন্‌জেকশান্‌ লাগবে।

ডাক্তারকে ফের ডাকতে যেতে হয় কি না তারই সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় বিমল নিচে একা অন্ধকারে উৎকর্ণ হ'য়ে ব'সে রইলো। কিন্তু ডাক্তারকে আর দরকার নেই। ওষুধ তাঁর জোরালো; এক ঢোঁক পেটে পড়তেই বিভা বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।

খবরটা সুধীরই এসে দিল : মিনিট পনেরোর মধ্যেই ওষুধটা ধরেছে, বিমল-দা। মুখ-চোখের চেহারা যেমন হ'য়ে উঠেছিলো তার ওপর ওষুধ নিয়ে তুমি ফিরছ না —আমি একেবারে অথৈ জলে প'ড়ে গিয়েছিলাম আর-কি। ভাবলাম আর বুঝি রাখা গেল না।

সুধীরের মুখের পানে চেয়ে বিমল নীরবে সামান্য একটু হাসলে।

—যখন ওঁর এমনি ব্যথা ওঠে তখন একা-একা কী ক'রে তুমি থাক ?

অত্যন্ত অসহায় স্বরে বিমল বললে—এই ভরসায়ই থাকি যে, ভগবানের কৃপায় আবার সে-ব্যথা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাবে। হয়-ও তাই। নিবতে-নিবতে বাতি আবার জলে ওঠে।

—এই ডাক্তারই 'কন্টিন্‌' কর। এতেই হয়ত উনি সেরে উঠবেন।

বিমলের মুখে সেই বিবর্ণ হাসি আবার ভেসে উঠলো।

সিঁড়ির এক ধাপ নেমে সুধীর বললে—তুমি একলাটি অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন ?

বিমল বললে—এই ত বেশ আছি। তোমার বৌদি ত এখন একটু ঘুমুচ্ছেন।

—না, খুঁজছেন তোমাকে। উপরে যাও এবার।

সুধীরের মুখে উচ্চারিত হ'ল ব'লে এই খবরটি মিথ্যা হ'লেও বিমলের কেন-না-জানি ভালো লাগলো। বিমল বললে—তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

—একটা ফিডিং-কাপ কিনে নিয়ে আসি গে। যাব আর আসবো। তুমি ততক্ষণ ওঁর কাছে গিয়ে বোস একটু। রুগীকে একা-একা থাকতে দিতে নেই।

শেষের কথাটা শুনে বিমলের মুখ সহসা কেমন গম্ভীর, কঠিন হ'য়ে উঠলো। তারপর অল্প একটু কেশে বললে—তার চেয়ে আমিই বরং ফিডিং-কাপটা নিয়ে আসি গে না। আমারই বা কতক্ষণ লাগবে ?

—না, বৌদি আমাকে বারে-বারে ব'লে দিলেন তোমাকে ওপরে পাঠিয়ে দিতে। আমি এসে পড়লেই আবার ছুটি পাবে। আজকে থেকে রাতে আমিই ডিউটি

দেব'খন। তুমি ঘুমিয়ো। ব'লে পকেট থেকে টর্চ বার ক'রে পথ চিনতে-চিনতে সুধীর বেরিয়ে পড়লো।

সেই রুগ্ন শ্রীহীন লুণ্ঠিতলাবণ্য নারীদেহ, ঘরের দেয়ালে মৃত্যুর নিয়তদোদুল্যমান ছায়া—বিমলের মন বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয়ে এলো। সেই ঘরে এমন একটা চাপা বিশ্রী গন্ধ আছে যা বিমলের জীবনকে একেবারে পঙ্কিল ক'রে ছেড়েছে। ওষুধের মতোই বিস্বাদ বিভার সান্নিধ্য—তার চেয়ে এই খানিক আগে শহরের অজস্র মুখরতায় সে যে নির্বারিত চঞ্চল জীবনানন্দ ভোগ করে এসেছিল তার মাদকতা কতো নিদারুণ!

তবু তাকে পা টিপে-টিপে উপরে উঠে যেতে হয়।

বিভা নির্জীবের মতো প'ড়ে আছে। ঘড়ির হৃৎপিণ্ডে মুহূর্ত-মালার পদধ্বনি বাজছে; তা ছাড়া অটুট নিস্তব্ধতা। বিভা সত্যিই নিশ্বাস নিচ্ছে কি না, কৌতূহলী হ'য়ে বিমল তার নাকের কাছে মুখ নোয়ালো। প্রেসক্রুপশানে ডাক্তারেরও ত ভুল হ'তে পারে। কিম্বা, এক ওষুধ দিতে হয়ত অন্য ওষুধ কম্পাউণ্ডার ভুল ক'রে মিশিয়ে ফেলেছে। এমন যে হ'তে পারে না কোনোকালে তার অবশ্যি কোনো প্রমাণ নেই। কে জানে তাই টের পেয়ে সুধীর হয়ত আগে থেকে সরে পড়েছে।

নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে না। নিমেষে বিমলের মনে হ'ল ঘর-দেয়াল বাধা-বন্ধন সব ভেঙে-চুরে ছত্রখান হ'য়ে চারদিক একেবারে ফাঁকা পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। এখন যে তাকে চীৎকার ক'রে উঠতে হবে তার ভাবার্থ প্রতিবেশীরা ঠিক বুঝতে পারবে ত? শুভরাত্রির পর এত গভীর আনন্দে বিমল আর কোনোদিন স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করতে যায়নি। আকুল সম্ভাবনায় তার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলো।

বুকের উপর স্বামীর স্পর্শ পেয়ে বিভা কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো: এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ওষুধ আনবার নাম ক'রে কোন্ রাজ্যজয়ে বেরিয়েছিলে শুনি? ও কি, পান খেয়ে ঠোঁট দু'টো ত খুব লাল করেছ দেখছি। বলি, পান কে দিলে?

বিমল বিমূঢ়, মুখে কথা নেই; এবার নিজে সে অনুভব করতে চেষ্টা করছে সত্যিই সে নিশ্বাস ফেলছে কি না।

—বলি, কোন্ শ্রী-হস্তের পান খাবার লোভে রোজ সন্ধেবেলায় এমনি যাওয়া হয় শুনি? আমি ত একটা হাড়গিলে হ'য়ে আছি, তাই বুঝি এবার থেকে উড়ু-উড়ু! ক'টা পান খেলে? আর কিছু?

বিমল তবু নিরুত্তর, ঘৃণায় যে সরে যাবে তার পর্য্যন্ত শক্তি নেই।

—'বেশ ত তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলেই হয়। আমি বুঝি তোমার পথের

কাঁটা। মালিশের ঐ ওষুধটা শুনেছি বিষ, দাও না খানিকটা মুখে ঢেলে—চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাই। তারপর আমাকে যা-সব বলেছিলে সব আবার তাকে বোলো। আমি কিন্তু তাকে শাপ দিয়ে যাবো সে যেন বিধবা হয়; সিঁদুর নিয়ে আমার মতো মরার সৌভাগ্য তার যেন সাতজন্মেও না হয় কখনো।

বিমল এবার স্ত্রীকে আদর করবার ভান ক'রে বললে—কী বলছ যা-তা। ঘরে রান্নার আজ কিচ্ছু জোগাড় নেই, তাই ওষুধটা তৈরি করতে ব'লে এক হোটেলে কিছু খেয়ে নিলাম। খাওয়ার পর দু'বেলায় দু'টি যে আমার পান চাই সে-কথা তুমি ভুলে গেলে নাকি?

বিভা আর্তনাদ ক'রে উঠলো: কিছুই ভুলিনি গো, কিছুই ভুলিনি, কিন্তু আমার এখনো মরণ হয় না কেন?

আচম্বিতে বিমলেরও মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: হয় না কেন?

কথাটা যে ফস্‌কে যাবে বিমল তা স্বপ্নেও ভাবেনি, কিন্তু বিভা উঠলো ক্ষিপ্ত হ'য়ে। বললে—কেন, কেন আমি মরতে যাবো? তুমি আমার কে যে তোমার জন্যে প্রাণটা আমার বলি দিতে হবে? ব'লেই দু'হাতে মুখ ঢেকে হু-হু ক'রে সে কাঁদতে সুরু করলে।

মুশকিল! বিমল তাড়াতাড়ি তাকে কোলের কাছে আকর্ষণ ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে ছি বিভা, কি শুনতে কি যে তুমি শোন তার ঠিক নেই। আমার কাছ থেকে কে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে? তোমার মরতে চাওয়ার চাইতে আমার বাঁচাতে চাওয়ার ইচ্ছাটা ত আর কম নয়। আমি তোমাকে না যেতে দিলে তুমি যাবে কী ক'রে?

কিন্তু কা'র কথা কে শোনে? কেঁদে-ককিয়ে হাত পা ছুঁড়ে ধাক্কা মেরে আঁচড়ে-কামড়ে বিভা স্বামীকে একেবারে বিপর্যস্ত ক'রে ফেললে। রাগে বিমল বোধহয় তাকে আরেকটু হ'লে আঘাত ক'রে বসতো, কিন্তু এমন সময় ফিডিং-কাপ হাতে সুধীরের আবির্ভাব দেখে সে সামলে গেল:

– নাও, তোমার বৌদিকে সামলাও এবার। তোমাদের সবাইকে ছেড়ে যাবেন ভেবে কেঁদে একেবারে ভুবন ভাসাচ্ছেন। আমি কাছে থাকলে উচ্ছ্বাস আরো বেড়ে যাবে। বার্লি-ওয়াটারটা তুমিই ক'রে নিয়ো ভাই, কেমন?

বিভার অজস্রোৎসারিত কান্নার দিকে চেয়ে সুধীর বললে—সে আর বলতে হবে না।

ওষুধ-পত্রে কাপে-গ্লাশে বোঝাই টেবিলটার কাছে এসে বিমল কি একটা ছোট শিশি তুলে ধরলো; বললে—দু'ঘণ্টা পর পরই তো মিকশ্চারটা রিপিট করতে

হবে, না ? এই রইলো এটা। ও, না, এটা সেই মালিশের ওষুধ। দেখো, ভুল ক'রে এটা খাইয়ে দিয়ো না যেন। এটা আলাদা ক'রে রাখা উচিত।

মালিশের ওষুধটা বিমল একধারে সরিয়ে রাখলো—আলাদা ক'রে। যাবার সময় মুখ না ফিরিয়েই ব'লে গেল : ওটার দিকে একটু দৃষ্টি রেখো, সুধীর।

দু'সপ্তাহেও কিছু সুরাহা হ'ল না—বিভার অসুখ আরো বেড়ে গেল। পর্শু সাঁতাশে ভাদ্রে তার রোগভোগের এক বৎসর পুরো হবে।

বিভা বলে—মাকে শিগ্‌গির খবর পাঠাও, শেষকালে সেবার অভাবে মারা পড়বো নাকি ?

তিক্তস্বরে বিমল বলে—সেবার কোনখানটায় তোমার ত্রুটি হয়েছে শুনি ? ওষুধে-পথ্যে ডাক্তারে-কবরেজে একটা জমিদারি প্রায় ফতুর ক'রে এনেছ।

সুধীর মাঝে প'ড়ে ঝগড়াটাকে আর গড়াতে দেয় না ; বলে—তবু অসুখের সময় সব সন্তানেরই মাকে কাছে পেলে ভালো লাগে, বিমল-দা। চাই কি, মাকে পেয়ে বৌদি সেরেও উঠতে পারেন। তাছাড়া মলিনার বিয়ে হ'য়ে গেছে, এখন ত ওঁর ছুটি।

অতএব মাকে টেলি করা হ'ল।

মাকে পেয়ে বিভা আবার সত্যিই সেরে উঠছে।

—ডাক্তার আজ কী ব'লে গেল বলো না।

—ব'লে গেল আর ভয় নেই। দিন সাতেক পরেই তুমি একটু চলতে পারলে আমরা পুরী যাবো। বাড়ি আমাদের ঠিক হ'য়ে আছে—ঠিক সমুদ্রের পারে

- কিন্তু আমি আর তুমি। ঠাকুরপো যেতে চাইলে তাকে বারণ ক'রে দিয়ো। তার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে নিশ্চয়ই। মাকে ত ফিরে যেতে হবেই - বাবার হাঁপানিটা নাকি ফের বেড়েছে।

—বিদেশে একা-একা থাকতে তোমার অসুবিধে হবে না ?

—একা কোথায় ? এক দিকে তুমি, অন্য দিকে সমুদ্র। তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমার আনন্দের আর অবধি থাকবে না। জরটা আর না-হয়, এক ঘুম পরে চোখ চেয়ে জেগে দেখি সাতটা দিন স্বচ্ছন্দে ফুরিয়ে গেছে ! জর আর আসবে না, কি বলো ?

স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বিমল বলে না, এই সেরে উঠলে আর-কি ! বহুদিন পরে মাথাটা আজ ধোয়াতে তোমাকে ভারি সুন্দর লাগছে।

দুপুরের নির্জনতায় হারানো সুর বুঝি আবার ফিরে আসে।

বিভা বলে—আরেকটু ঘেঁষে এসে বোস না। মাকে এখন একটু ছুটি দিয়েছি।

এ ক'দিন তাঁর আর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ ছিল না। তারপর একটু থেমে : সত্যিই আমি খুব কুৎসিত হ'য়ে গেছি, না ? দেয়াল থেকে আমাদের ঐ ফোটোটা পেড়ে আনো না, আর ঐ আয়নাটা।

বিমল পালঙের উপর আরো একটু বিস্তৃত হ'য়ে ব'সে বলে—কপালে তোমার সিন্দুর—এই তোমার বড়ো সৌন্দর্য্য, বিভা।

বিভার চোখে জল আসে ; স্বামীর একটা হাত গালের উপর টেনে এনে বলে—কত পয়সা আমার জন্যে তোমার বেরিয়ে গেল। চাকরি না ক'রে যা দু' পয়সা আছে তা আরামে ভোগ করবে ব'লে কত-কিছু মতলব করেছিলে, কিছুই আমি হ'তে দিলাম না। আচ্ছা, আমি যদি ম'রে যাই, তবে তুমি আবার বিয়ে করবে ?

বিমল তার গালে হাত বুলুতে-বুলুতে বলে—ও-কথা বলতে নেই, বিভা। কে কার আগে মরে, কিছু ঠিক আছে ?

- না, কেন তুমি বিয়ে করবে না। এমন বাজে স্বার্থপরতা আমার নেই। তুমি আবার বিয়ে কোরো। আমার জন্যে তুমি সন্ন্যেসি হ'য়ে থাকবে সে-কথা ভাবলেও আমার দুঃখ হয়। ম'রে গেলে আমি উঁকি মেরে তোমাদে' দু'জনকে দেখতে পাবো ত ?

কোন কথা না ক'য়ে বিমল তাড়াতাড়ি নিচু হ'য়ে স্ত্রীকে চুম্বন ক'রে বাক্যস্রোত বন্ধ ক'রে দেয়।

বিভা বলে—আজ ত আমি ভালো আছি, ক্লাবে যাও না আজ।

—হ্যাঁ, আজকে একবার যাবো !

চকিতে বিভার মুখ মেঘলা হ'য়ে আসে। শিথিল হাতটা ধীরে কপালের উপর রেখে সে চোখ বোজে। আলাপ আর জমে না।

– তুমি এখন একটু ঘুমোও। ব'লে বিমল উঠে পড়ে।

সুর যায় কেটে।

ক্লাব থেকে রাত ক'রে বাড়ি ফিরে এসে শুনলো বিভার আবার জ্বর এসেছে। সঙ্গে পেটে সেই তীব্র ব্যথা। সুধীর ডাক্তার ডেকে এনেছিল, ইন্‌জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। ক্লাবে বিমলকেও খবর দেওয়া হ'ত, কিন্তু অযথা তাকে বিব্রত করবার ইচ্ছা নাকি বিভার ছিল না ; তাই চাকরকে অ র পাঠানো হয়নি।

বিমল শাশুড়িকে লক্ষ্য ক'রে বলল সে কেমন কথা ? বাড়িতে যমে-মানুষে টানাটানি আর বাইরে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাস পিটবো ? ভাবনা বুঝি খালি আপনাদেরই ? আমি বুঝি কেউ নই ?

ব্যথাটা আর পড়তে চায় না। তবু বিকেল হওয়া-মাত্রই বিমল বেরিয়ে পড়ে, ফেরে গভীর রাতে। ফেরবার সময় ওদের গলির মুখের কাছে একটু দাঁড়ায়, একটা আর্তনাদ শোনবার আশায় কান পেতে থাকে। এমনো হ'তে পারে প্রথম আঘাতের প্রাবল্যে সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। হয়ত বিমলের আবির্ভাবে সে-স্তব্ধতা সহসা টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে।

দুরু-দুরু বুক নিয়ে বিমল উপরে উঠে আসে। সমুখেই সুধীরকে দেখতে পেয়ে শুধোয় : কেমন আছে ?

সুধীর বলে— সেই একই অবস্থা।

কোনো কোনোদিন বলে— একটু ভালো। ব্যথাটা নেই। অরো নামবার দিকে।

শাশুড়ির আর সয় না, একদিন বলেন— বাড়িতে এমন একটা রুগী, এত রাত ক'রে বাড়ি না ফিরলে কি আর চলে না বাছা ?

বিমল মুখের 'পরেই জবাব দেয় : আপনারাই ত আছেন। আমি থেকে আর কি করব। সুধীরই ত সব তদারক করছে। বাড়িতে ডাক্তার-বদ্যির ত হাট ব'সে গেছে। এততেও যদি না সারে তবে আমি আর কি করি বলুন।

ক্লাবে তাসের আড্ডা দারুণ জমে উঠেছে এমনি সময় সনাতন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে একেবারে ফরাসের ধারে আছড়ে পড়লো : বাবু, শিগ্‌গির বাড়ি চলুন।

তাস ভাঁজা না থামিয়েই বিমল শুধোল : কেন, কি হয়েছে ?

উত্তর কি হবে বিমলের বুঝি জানা ছিল। নইলে কি আর চাকর পাঠিয়ে দিয়েছে ?

সনাতন হাঁপ নিয়ে বলল - শিগ্‌গির চলুন বাবু, মা'র অবস্থা ভালো নয়। দাদাবাবু আপনাকে ডাকতে পাঠালেন।

ঘরের সব লোক স্তব্ধ হ'য়ে সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বিমল বললে—বেঁচে আছে ত ?

উত্তর কি হবে বিমলের জানা ছিল বৈ কি।

—এখনো আছেন, কিন্তু বেশিক্ষণ বোধহয় আর নেই।

—চল যাচ্ছি। সঙ্গে তোমরা কেউ আসবে নাকি হে শম্ভু ? তুমি পাঁচুগোপাল ? শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক আমাদের নেই তেমন।

শম্ভু বললে—কাল থেকে আমার সর্দি ভাই।

পাঁচুগোপালের বাড়ি চেৎলার হাট পেরিয়ে, মড়া পুড়িয়ে একা ফিরতে তার ভয় করবে।

অগত্যা বিমল একাই বাড়ি চললো।

সনাতন বললে আপনাকে মোটরে ক'রে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছে। মা হয়ত আর নেই।

বিমল ধম্‌কে উঠলো : এত রাত্রে কোথায় তোর মোটর ? রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একটাও ?

—আপনি যদি বলেন ত বড় রাস্তা থেকে একটা ধ'রে নিয়ে আসি।

—তোর আসতে আসতে ওদিকে সব সাফ হ'য়ে যাক্। দরকার নেই। চল্ পা চালিয়ে।

গলির মুখে এসে বিমল দাঁড়ালো ; সনাতন খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে সমুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো : মা আর নেই, বাবু। তাঁকে আর দেখতে পেলেন না।

—কি, কি ক'রে জানলি তুই ?

—কান্না শুনতে পাচ্ছেন না ?

—তুই পাচ্ছিস ? কোথায় ?

দুইজনে উৎকর্ণ হ'য়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। কান্না কোথাও সত্যি শোনা যায় না। ফাঁকি !

বিমল ধমকে ওঠে : ঠেসে গাঁজা খেয়েছিস বুঝি ? কানের মধ্যে বুঝি লাট্টু-ঘোরার আওয়াজ হচ্ছে ?

—তাই যেন হয়, বাবু। আমাদের যেন কাঁদতে না হয় কোনোদিন।

কিন্তু কে জানে, হয়ত খানিকক্ষণের জন্যে কান্নাটা চাপা প'ড়ে আছে। কাঁদবার মধ্যে ত শাশুড়ি—বুড়ো ফুসফুসে আর কত জোর হবে !

নিচেই সুধীরের সঙ্গে দেখা। ব্যাকুল হ'য়ে বিমলের ফেরবার প্রতীক্ষা করছে।

পাংশুমুখে বিমল প্রশ্ন করলো : কি ?

সুধীর বললে—অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল মাঝে ; পরাণবাবুদের বাড়ি থেকে ব্যানার্জিকে ফোন ক'রে দিলাম। ইন্‌জেকশান দিয়ে ব্যথাটা বন্ধ ক'রে দিলেন বটে, কিন্তু হার্টের অবস্থা সুবিধের নয়। রাতে ফের ব্যথা উঠলে একটা ওষুধ খেতে দিয়ে গেছেন। তাতে যদি না ধরে, তবে আবার তাঁকে কল দিতে হবে। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যথাই যে এবার সুরু হয়েছে !

—আমাকে আগে খবর পাঠাওনি, সুধীর ? ব'লে বিমল অত্যন্ত দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল।

উপরে শোকের সমারোহের ত্রুটি হয়নি। সমবেদনা জানাতে প্রতিবেশিনীরা পর্য্যন্ত এসে জুটেছে। মা বিস্ফারিত শূন্য দৃষ্টিতে অন্ধকার দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন।

বিভার চেহারা দেখে সন্দেহ হয় এই রাত্রিও সে টি কবে না। মুখচ্ছবি শ্রান্ত, পাণ্ডুর, আভাহীন!

বিমলকে ঘরে ঢুকতে দেখে পাড়ার মেয়েরা সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন। বিমল অতিব্যস্ততার ভান ক'রে সেই জনতার মাঝেই স্ত্রীকে স্পর্শ করতে যাচ্ছিলো, এক জন বর্ষীয়সী মহিলা তাকে বাধা দিয়ে বললেন—অনেকক্ষণ পর এই একটু ঘুমিয়েছে বাবা, তোমার ছোঁয়া পেলে তন্দ্রাটুকু ভেঙে যেতে পারে। তুমি ত আর অবোধ নও। তোমার অধীর হ'লে কি চলে? ঘুম যখন এসেছে একটু, এ-রাত্রি হয়ত কেটে যাবে।

প্রেম প্রমাণিত করতে বিমল বিভার পায়ের কাছে অতি সন্তর্পণে বসতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ বিভা তন্দ্রা ভুলে স্পষ্ট প্রখর কণ্ঠে ব'লে উঠলো : এখেনে আবার মরতে এসেছ কেন? যাও যাও, দূর হও এখান থেকে। পান খেয়ে আসনি আজ? আমি মরলেই ত তোমার রাস্তা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। অত দিন আর দেরি কেন? এক্ষুণিই ধ'রে আনো না একটা। দু'জনে মিলে খুব তাস পিট্‌তে পারবে। যাও আমার সমুখ থেকে। ঠাকুরপো একে আবার এ-ঘরে ঢুকতে দিয়েছ কেন?

এ-জগতে এমন অপমান কে কবে পেয়েছে? তবু অলৌকিক উদারতার ভান ক'রে বিমল উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে—রোগে ভুগে-ভুগে বেচারি একেবারে গেল। কাঁহাতক আর মাথার ঠিক থাকে। কিন্তু ঈশ্বর ব'লে সত্যি কি কেউ নেই?

বাইরে বারান্দায় এসেই হাঁক দিলো : সুধীর!

সুধীর ততক্ষণে সাইকেল ক'রে ওষুধের দোকান ঘুরে এসেছে।

—ওষুধটা আনলে?

—হ্যাঁ এই যে। আচ্ছা দাম নিলে যা হোক্।

—তা নিক্। দেখি।

সুধীরের হাত থকে ওষুধটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে-দেখতে বিমল বললে—ব্যথাটা আবার উঠ্‌লেই খাইয়ে দিতে হবে বলেছে? এমন কালো রং! বিষ-টিষ নয় তো?

অল্প একটু হেসে সুধীর বললে—তোমার মাথা খারাপ নাকি?

—যাই, টেবিলের উপর রেখে আসি। তোমার খাওয়া হয়েছে ত?

—না। এবার মেস্ থেকে একটু ঘুরে আসি গে। বৌদি ত এখন একটু ঘুমুচ্ছেন—ব্যথাটা উঠ্‌লেই হার্ট অ্যাফেক্ট্ করে—সেই যা ভয়।

—সে কি, মেস্-এ যাবে কি? এখানে তোমার খাওয়ার জোগাড় হয়নি? ঠাকুরটা পালিয়েছে এরি মধ্যে?

—না না, সে-জন্যে নয়। মেস্-এ আমার সামান্য একটু কাজ আছে।

—কিন্তু কখন কি হয় বলা যায় না।

—আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো।

গভীর হতাশার স্বরে বিমল বললে—কিন্তু সত্যিই কি আর আশা নেই, সুধীর?

সুধীরের কণ্ঠে অভয়: কার সাধ্য বৌদিকে ছিনিয়ে নেয়? তুমি যাও ওপরে—এর মধ্যে ব্যথা উঠ্‌লে ওষুধটা এক দাগ খাইয়ে দিয়ো। আমি এই আস্‌ছি।

বিমল উপরে উঠে গেল, কিন্তু রোগীর ঘরে নয়—একেবারে ছাতে, খোলা ছাতে। জীবনে এবার সে সত্যিই ছুটি পাবে, পাবে বিস্তৃতি, অমেয় অধিকার। প্রতিদিনের এই অপরিবর্তনীয় পুনরাবৃত্তির মাঝে নিজেকে আর সে ক্ষয় ক'রে ফেল্‌বে না। তার অনেক কর্ম, অনেক সাধনা, অনাবিষ্কৃত ভবিষ্যৎ! সে চায় স্রোত—অজস্র, ফেনিল, গাঢ়! সে-স্রোতে মৃতদেহ ভেসে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক্। একা সে পরিপূর্ণ ক'রে বাঁচলেই বিপুলা পৃথ্বী আর নিরবধি কাল কৃতার্থ হবে।

কিন্তু বেশিক্ষণ ছাতে থাকলে চলবে না, সুধীর এসে খোঁজ পেলে লজ্জার ব্যাপার হবে। ঘরে না থাকলেও কাছাকাছি কোথাও প্রতীক্ষা করা উচিত।

দোতলায় নামতেই সুধীরের সঙ্গে দেখা—এইমাত্র সে ফিরেছে। সুধীর জিগ্‌গেস করলো: বেদ্‌নাটা ওঠেনি?

বিমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: না বোধহয়।

—বোধ হয়? খবর নাওনি? সুধীর বিমলের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হেনে ঘরে গিয়ে দেখলো বিভা তখ্‌নো চুপ ক'রে চোখ বুজে আছে। নিশ্বাস যেন আর টানতে পারছে না।

বিমল একবার একটু উঁকি মেরে অবস্থাটা আন্দাজ ক'রে অতি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পড়লো।

সব চুপচাপ। কারো মুখে রা নেই। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনবার আশায় সবাই যেন ধ্যান করছে।

কিন্তু কতক্ষণ! হঠাৎ সমস্ত শরীরে আহত সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বিভা বিকটস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো। সেই ব্যথা!

সুধীর লণ্ঠনটা তুলে টেবিলটা হাতড়ে চেঁচিয়ে উঠলো : ওষুধ ? নেই ওষুধটা ?

বিমল বিভার বিকৃত বেদনার্ত মুখের দিকে চেয়ে শুকনো গলায় বললে—কেন, ঐ টেবিলের ওপরই ত রেখেছিলাম। কোথায় আর যাবে ?

টেবিলে ছোট-বড়ো নানা মাপের শিশি-বোতল রাশীকৃত হ'য়ে আছে—সুধীর অল্প আলোকে কিছুরই ঠিক দিশে পায় না। মেয়েরাও সন্ত্রস্ত হ'য়ে খুঁজতে লেগেছে। পালঙের তলা থেকে কেউ ফিনাইল-এর বোতল বের ক'রে শুধোয় : এটা ? কেউ স্মেলিঙ সল্টের নীল শিশিটা খুজে এনে বলে : এটা নিশ্চয়ই।

বিমল স্থির, জিজ্ঞাসাহীন।

বিভা সমানে চীৎকার করছে। বিভার মা দেয়ালে কপাল কুট্‌তে লেগেছেন।

সুধীর তীক্ষ্ণস্বরে ধমকে উঠলো : কোথায় রেখেছ ওষুধ ? তোমার এতটুকু দায়িত্ব নেই ? শিগ্‌গির খুঁজে বার ক'রে দাও বলছি।

বিমল টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে নির্লিপ্তের মতো বললে—তোমার হাত থেকে নিয়ে এখেনেই ত রাখলাম। উড়ে ত আর যায়নি। সব ওলোট-পালোট ক'রে রাখলে কী ক'রে খোঁজা যায় বলো ? আলোটা একটু বাড়িয়ে দাও না।

সহসা শরীরে একটা মোচড় দিয়ে বিভা দাঁতে দাঁত ঘষে একটা বীভৎস শব্দ করলে। লণ্ঠনটা মেঝের উপর বসিয়ে সুধীর তাড়াতাড়ি বিভার কাছে ছুটে এলো, অশ্রুবিগলিত করুণ স্বরে ডাকলে : বৌদি।

সুধীরের কণ্ঠে এই কাকুতি শুনে ঘরময় শোকবন্যা উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। বিভার জীবনের পরমলগ্ন ঘনিয়ে এলো বুঝি। এই দৃশ্য বিমল আর স্থির হ'য়ে দেখতে পারলো না। সহসা চেঁচিয়ে উঠলো : এঁ্যা ! ওষুধের শিশিটা যে আমার পকেটেই ছিল দেখছি।

সুধীর বিভার শয্যাপ্রান্তে নত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, এবার খাড়া হ'ল। রূঢ়, নির্মম সে-ভঙ্গি ! হাত বাড়িয়ে বলল—শিগ্‌গির দাও।

—এ কি ? শিশিটা যে ভাঙা ! ওষুধ সব যে কখন প'ড়ে গেছে, সুধীর ! কী হবে ?

ঘরে শোকের আরেকটা প্রবল ঢেউ আলোড়িত হ'য়ে উঠলো।

—শিগ্‌গির ছুটে যাও, ব্যানার্জিকে ডেকে নিয়ে এসো। আমার সাইকেলটা নিয়ে যাও। এক্ষুণি। ঘুমের থেকে টেনে তুলে নিয়ে আসবে। আর তোমরা একটু থাম দেখি দয়া ক'রে। এখনো আশা আছে। দেখি আমি কী করতে পারি।

এখনো আশা আছে !

বিমল অবশ্যি সাইকেলটা নিলে না। সে যে সাইকেল চড়তে জানে এ-সম্বন্ধে

সুধীরের কাছে কোনো নজির নেই। রাস্তায় বেরিয়ে এসে গলির মোড়ের পানের দোকান থেকে সে বিড়ি কিনলো ও আরো খানিকটা এগিয়ে এসে একটা পাহার-ওয়ালার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলে।

ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া, তাঁর ঘুম ভাঙানো, মোটরের সোফার বাগানো—ব্যানার্জি নিজে ড্রাইভ করতে পারে কি না কে জানে—ইত্যাদি ত একটা তুড়ি মেরে লাফ দিলেই ঘটে ওঠে না। ঘড়ি ত ইলেকট্রিকে চলে না আর। কত দিনের গুমোটের পর দক্ষিণ থেকে আজ কেমন হাওয়া দিয়েছে। আকাশ-ভরা তারা। একটা ট্যাক্সি পেলে চৌরঙ্গিতে বেশ একটু বেড়ানো যেত যা হোক।

ঘণ্টা খানেক স্বচ্ছন্দে কেটে গেছে। বিমল মন্থর পায়ে বাড়ির মুখে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু গলির মোড়ে এসে দাঁড়াতেই সেই সুষুপ্ত নিস্তব্ধতা। পাড়াটা নিঝুম। আরো দু' পা এগিয়ে এসে বিমল থামলো। তার বাড়িটা পটে আঁকা ছবির মতো স্থির। খোলা জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু একটিও অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ব্যাপার কী ?

সদর দরজা খোলা—সনাতন বাইরে শুয়ে আছে। তবে ওকে ফেরবার সুযোগ না দিয়েই বিভাকে ওরা নিয়ে গেছে নাকি ? সোজা শ্মশানে যাবার খবরটা বলতেই সনাতন এখনো ব'সে আছে বুঝি। এখন ক'টা বাজলো ? পার্কে বেঞ্চিতে ব'সে ও ঘুমিয়ে পড়েছিলো হয়ত, ঘণ্টার আর হিসেব নেই।

বিমল চাকরটাকে শুধোল : কি ?

—একটু ভালো আছেন এখন।

—সে কি রে ? ভালো আছেন কি বলছিস ?

—হ্যাঁ, বাবু, যান না ওপরে।

চোরের মতো বিমল উপরে উঠে এলো। দোতলার মাঝের দালানটায় সুধীর অস্থির হ'য়ে পাইচারি করছে। রোগীর ঘর স্তব্ধ। আলোগুলি কমানো। আবহাওয়াটি হাল্কা।

বিমলকে দেখেই সুধীর ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো : কৈ ? ডাক্তারবাবু এলেন ?

নিতান্ত অপরাধীর মতো ধরা গলায় বিমল বললে—বাড়িতে নেই। কোন্ এক জরুরি কল্-এ চুঁচড়োয় চ'লে গেছেন বললে।

—চ'লে গেছেন ? সে কি কথা ? আমার সঙ্গে appointment ক'রে চ'লে গেলেন ? এ হ'তেই পারে না। রাতের ফি কি আর আমরা দিতাম না ?

—দিতামই ত।

—তুমি কোন্ ব্যানার্জির বাড়ি গিয়েছিলে? চক্রবেড়ের প্রতাপবাবুর বাড়িতে না?

চোখ কপালে তুলে বিমল বললে—না ত। আমি গিয়েছিলাম বিডন ষ্ট্রীটে। ছি ছি! যাবো এবার? এই ত কাছেই।

বাধা দিয়ে সুধীর বললে—দরকার হবে না। বৌদি এখন বেশ ভালো আছেন।

—ভালো আছেন?

—হ্যাঁ, ভাগ্যিস তখন বুদ্ধি ক'রে মেস্ থেকে সিরিঞ্জটা নিয়ে এসেছিলাম, মরীয়া হ'য়ে নিজেই ঈশ্বরের নাম নিয়ে দিলাম ইন্‌ট্রাভেনাস্। এম. বি. হ'য়ে বেরুবার দিন পর্য্যন্ত ছ' মাস প্রতীক্ষা করতে গেলে বৌদিকে আর এ-যাত্রা ঠেকানো যেত না, বিমল-দা। সাহস ক'রে বিদ্যা জাহির ক'রে দিলাম—অবশ্য মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেই। হাতে-হাতে ফল মিলে গেল। হার্ট দুর্বল বটে, কিন্তু বোধহয় আজ আর ভয় নেই।

নীরবে আর দু' চক্কর হেঁটে ফের বললে—তুমি খুব বেশি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছ, সনাতন তোমার জন্যে বিছানা ক'রে রেখেছে—তুমি এবার ঘুমোও গে।

বিমল শুধু বলতে পারলো: আর তুমি?

—আমাকে সারা রাত জেগে পাহারা দিতে হবে। তুমি যাও।

এবার আর ব্যানার্জি নয়, সুধীর সাহেব-ডাক্তার নিয়ে এলো।

সঙ্গে-সঙ্গে ভোজবাজি!

তেরো দিন যেতেই জ্বর গেল নেমে, ব্যথা গেল তলিয়ে। একুশ দিনের দিন বিভা বিছানায় উঠে বসতে পারলো। বিমলের হাত ধ'রে ধীরে-ধীরে জানলায় এসে দাঁড়াতে পারলো আরো সপ্তাহ খানেক বাদে।

বিভাকে আর পায় কে? যতো কিছু ছেলেমান্‌ষি, যতো কিছু আখখুটেপনা! ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াবে, বৃষ্টিতে ভিজবে, তেঁতুলের টক না খেলে ইহজীবনে আর অর্থ থাকবে না। রোদ্দুরে দিয়ে নতুন শাড়ি পরে, পরিত্যক্ত দু'চারগাছি চুল নিয়ে বিনুনি বাঁধবার চেষ্টা করে, রূপানুশীলনে ব্যর্থকাম হ'য়ে স্বামীর সংজ্ঞানুসারে কপালে সুন্দর ক'রে সিন্দুর আঁকে।

কিন্তু পৈতৃক সম্বন্ধের কি সূত্র ধ'রে হঠাৎ একদিন বিভার হাঁপানি দেখা দিলো।

সাহেব ডাক্তার বললেন: হাওয়া বদল কর। পুরী মন্দ নয়।

বিভার খুশি আর ধরে না। বাড়ি ত কবে থেকেই পাকা, সঙ্গে যাবে সনাতন আর ঠাকুর, মা আসবেন, বয়ের সঙ্গে মলিনা এসেও বেড়িয়ে যেতে পারে।

সুধীর বলে—আর আমি বুঝি বাদ?

বিভা হেসে বলে—তুমি না গেলেই ত বাদ।

আর—দেহরক্ষী বিমল, ভারবাহক! একটি অস্থিস্তূপকে কাঁধে ক'রে তার সমস্ত জীবন পরিক্রমণ করতে হবে!

বিভা বলে—সমুদ্রের নাম শুনেই আমার নিশ্বাস ভ'রে আসে, ঠাকুরপো। লোনা জল গায়ে লাগিয়ে আমি সোনা হ'য়ে ফিরে আসবো দেখো।

সাহেব ডাক্তার ব'লে দিলেন: যত খুশি গায়ে হাওয়া লাগিয়ো, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে হুঁসিয়ার। Ozone-এই ওজন বাড়বে।

বিভা নাক সিঁটকে বলে: রেখে দাও ডাক্তারি। আমার নিজের জোরে শরীরে স্বাস্থ্যের জোয়ার নিয়ে আসবো। আমার দেহই হবে আমার কাব্যসৃষ্টি।

ট্রেন ছাড়লে বিভা বললে—আমার আবার নতুন ক'রে বিয়ে হচ্ছে! কী যে ভালো লাগছে বলবার মতো ভাষা খুঁজবো ব'লেই এখনো বেঁচে আছি। ব'লে নির্জন কামরায় বিভা বিমলের বুকের উপর মাথাটা এলিয়ে দিলো।

বিমল বললে—ওষুধপত্র, নতুন atomizerটা—সব সঙ্গে নিয়েছ ত?

বিভা বিমনা হ'য়ে বললে—নিয়েছি। কিন্তু ও-সব আর লাগবে না দেখো।

—বেশ ঠাণ্ডা আসছে কিন্তু। র‍্যাপারটা ভাল ক'রে গায়ে দাও। কম্ফর্টারটা কোথায় রাখলে আবার? গলাটা জড়াও। পায়ে মোজা আছে ত?

বিভা আপত্তি করলো: ঠাকুরপো বলে হাওয়া লাগালে বুকের কিচ্ছু ক্ষতি হয় না।

—ফোঁপরদালালি করতে ঠাকুরপো আজ আর সঙ্গে নেই—এই রক্ষে। নাও, কথা শোন।

অপরাধীর মতো নির্বিরোধে বিভা ক্রমশ একটি জামা-কাপড়ের পুঁটলি হ'তে থাকে।

—এই হাঁচতে সুরু করেছ ত? হয়েছে! দাঁড়াও, জানলাটা তুলে দি।

—জানলা তুলে দিলে আমি ম'রে যাবো।

কাঠের জানলাটা নামিয়ে ও কাঁচেরটা তুলে দিতে-দিতে বিমল গম্ভীর হ'য়ে বললে—মরা অত সস্তা নয়।

দূরের দিকে জানলা দিয়ে বিভা শূন্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলো।

পরে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় স্বামীর কাছে এসে করুণকণ্ঠে বললে—আমি ম'রে গেলে তুমি কাঁদতে? কী ব'লে কাঁদতে বলো না।

—কাঁদবার দিন মানুষের ফুরোয় না একদিনে। কিন্তু রাত্তির ক'রে বক-বক না ক'রে এখন একটু ঘুমোও দেখি। বেশি রাত জেগে পেট-গরম হ'লে আবার সেই ব্যথাই টের পাবে'খন!

কথাটা অভিশাপের মতো কানে লাগে। বিভা চুপ।

তারপর আবার সে-ই বলে—আমি এমন একটা কঠিন অসুখ থেকে ভালো হ'য়ে উঠলাম, অথচ তুমি একদিনো আমাকে একটু আদর করলে না।

বিমলের কথাটা বিদ্রূপের মতো শোনায়: ভালো হ'য়ে উঠেছ নাকি?

—নিশ্চয়। বাঁচবো—আমার এই ইচ্ছাই আমাকে আয়ুষ্মতী ক'রে রাখবে।

—তুমি পাবে আয়ু, আর তাকে টিঁকিয়ে রাখতে আমার আয় যাবে শূন্যের ঘরে—হিসেবটা ঠিক হ'ল না।

বিভার মুখ মলিন হয়ে ওঠে: কিন্তু তোমার আশীর্বাদে আমি যদি আয়ু পাই, তবে আমার কল্যাণে শূন্য তোমার বামবর্তী সংখ্যা নিয়ে অজস্র হ'য়ে উঠবে। আমি বামে থাকলে তোমার শক্তি ও সম্পদের আর অভাব কোথায়?

এই ব'লে সে নিজেই স্বামীর গ্রীবাবেষ্টন ক'রে নিজের গাল এনে বিমলের গালে ঠেকালো। মুহূর্তে বিমল আহত হ'য়ে বললে—তোমার জ্বর হয়েছে ফের?

বিভার মুখ শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল। চোখ দু'টি ভীত, মুখে অপার বিষণ্ণতা! নিজের কপালে নিজেই হাত রেখে অস্পষ্ট ক'রে বললে—জ্বর? না ত?

—না ত কি? স্পষ্ট জ্বর। বা'র করো থার্মমিটার।

পাছে রূঢ় নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি হ'তে হয় সেই ভয়ে বিভা আর বাক্স খুললে না।

—বেশ। জ্বর-জ্বর করতেই জর্জর হ'য়ে থাক আর কি। তারপর ধমকে: শুয়ে পড় এক্ষুণি। ওঁকে আবার আদর করতে হবে!

বিভা দ্বিরুক্তি না ক'রে গুটিসুটি হ'য়ে অমনি বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়লো। মনে-মনে গুনে-গুনে তেত্রিশ-কোটি দেবতার কাছে সে প্রার্থনা করতে লাগলো—জ্বর যেন তার না আসে! হাঁপানি হ'লে এক সময় কমবার সম্ভাবনা আছে, অল্প-অল্প পেটে-ব্যথা কষ্ট ক'রে তবু চাপা যায়, নিজে না ঢাক পেটালে কেউ টের পায় না; কিন্তু জ্বর একবার হাড়ের মাঝে বাসা নিলে আর যেতে চায় না—গায়ে হাত

ছোঁয়ালেই যে ধরা পড়বার ভয়! তবে সমুদ্রে সে কেমন ক'রে স্নান করবে? সমুদ্রে স্নান না করলে সারবে কী ক'রে?

সমুদ্রের ধারেই ছোট একতলা বাড়ি—নূতন চূণকাম করা, ফিটফাট। সামনে সমুদ্র · ফুলশয্যার রাতে বিভারই হৃদয়ের মতো ব্যাকুল। অহর্নিশি গর্জন করছে। কলকাতায় রোগের যন্ত্রণায় সে যখন আর্তনাদ করছিলো তখনো সমুদ্র এমনি প্রতিধ্বনি করেছে। বিভা তার জীবনের নিবিড়তম শুদ্ধতম মুহূর্তটির কথা ভাবতে চাইলো। সে কবে? কোথায়? বিভা তা জানে না, তবু তখনো এই সমুদ্রে সহানুভূতিতে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে-স্তব্ধতার পরিমাপ করেনি। কিসের তার এই গর্জন?

জানলার পাশে ব'সে বিভা প্রভাতে-সন্ধ্যায় দুপুরে-রাত্রে খালি সমুদ্র দেখে। যেন কোন বীরবল্লভ! নীল সবুজ লাল কালো সমুদ্র। রুক্ষ কর্কশ বন্ধুর নিষ্ঠুর সমুদ্র! উত্তরঙ্গ, উদ্বেল! বালিতে ঝিনুক, জলে ফেনা। ব'সে ব'সে বিভা তন্ময় হ'য়ে ঢেউ গোনে।

সেই যে ট্রেনে সে হেঁচেছিল তাই থেকে তার আবার জ্বর হ'ল। পুরীতে ডাক্তার আর ডাকা হ'ল না। দু'দিন যেতে না যেতেই হাঁপানি। সেদিন পেটের ব্যথাটাও একটু টের পেলো বোধ হয়। মুখ ফুটে বিমলকে আর বলল না অবশ্যি।

বিভা কাতর স্বরে বললে · আমাকে বুঝি স্নান করিয়ে আনবে না একদিন? নিজে ত দিব্যি দু'বেলা স্নান করছ।

বিমল রুক্ষ হয়ে বললে—কেন করব না? আমার ফুসফুস ত আর আমসি হ'য়ে যায়নি?

—কিন্তু সমুদ্রে নামলে আমারও সব অসুখ ধুয়ে যাবে দেখো।

—যেমন ট্রেনে চাপলেই তোমার সব ব্যাধি উড়ে যাবে! লজ্জা করে না বলতে?

—দেখি না একদিন। আজকে ত আর জ্বর নেই। বেশ ভালই ত আছি।

মুখ ভেঙচে বিমল বললে—বেশ ভালই ত আছি। তারপর বলবে, বেশ ভালই ত হাঁচি। পুরীতে আসবার জন্যে এত পেখম মেলেছিলে কেন? কলকাতায় মরতে বুঝি মন ওঠে না? মাঝখান থেকে টাকার শ্রাদ্ধ। কালই কলকাতা ফিরে যাবো, বুঝলে?

বিভার অভিমানের আর মুখ নেই; অনুনয় ক'রে বলে—কিন্তু যাবার আগে আমাকে একদিন সমুদ্রে স্নান করিয়ে নিয়ো, লক্ষ্মীটি। একটিবার।

বিমল বললে—না।

—আমি তোমাকে লুকিয়ে রাত্রে চ'লে যেতে পারি স্নান করতে, কিন্তু একা আমার সমুদ্রকে ভারি ভয় করে।

পরে চিঠির কাগজ ছিঁড়ে সে সুধীরকে চিঠি লিখতে বসে: খালি সমুদ্র হ'লেই চলে না ঠাকুরপো, তুমি এসো। কবে আসবে?

জানলা দিয়ে বিভা সমস্তক্ষণ খালি সমুদ্র ও সমুদ্রতটের দৃশ্য দেখে।

কিন্তু কালকের রাতে বিমলকে আর সে লুকুতে পারেনি। পেটের ব্যথায় তাকে চেঁচাতে হয়েছে।

আজই রাত্রে বিমল তাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রাচীরের চাপে সমুদ্র এবার শুকোল! আর তরঙ্গ নয়, চাকা! বিভা চোখ বুজে কলকাতার সেই এঁদো ক্ষুদ্র কুঠুরিটার কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো।

বিমল অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে এসে জিগ্‌গেস করলে: সমুদ্রে নাইতে যাবে?

বিভা প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে চেয়ে রইলো। কাল যে তার প্রায় দু'য়ের কাছে জ্বর ছিল, আর এখনো যে তা নর্ম্যাল হয়নি তা স্বামীর অজানা নেই। সে আমতা-আমতা ক'রে বললে—গায়ে বোধ হয় এখনো জ্বর আছে। নেব টেম্পারেচার?

বিমল বললে—দরকার নেই। ওটুকু জ্বরে কিছু হবে না। কিছুতেই কিছু হয় না তোমার। সমুদ্রে নাইবার তোমার এত সাধ—এসো। সনাতনকে সঙ্গে নাও।

আনন্দে বিভা সহসা লাবণ্যময়ী হ'য়ে উঠলো। সমুদ্রের ঢেউ—প্রথম পুরুষ-স্পর্শের চাইতেও রোমাঞ্চময়! কোমরে কাপড় জড়িয়ে বিভা ছোট খুকির মতো হাত-তালি দিয়ে উঠলো।

স্বামীর হাত ধ'রে কাঁধে সামান্য একটু ভর দিয়ে বিভা বালিতে পা ডুবোতে-ডুবোতে অগ্রসর হ'তে লাগলো। বহন ক'রে নিয়ে যেতে স্বামী কষ্ট পাচ্ছেন এ-কথা ভাবতে লজ্জার আর তার শেষ ছিল না। সে হাঁপিয়ে পড়েছে দেখে বিমল তাকে এক সময় কোলে তুলে নিলো। বিভা বিমলের কাঁধের উপর মুখ লুকিয়ে ভাবছিল—সমুদ্র ত সে পেয়ে গেছে।

পেছনে সনাতন—কাপড়-চোপড় নিয়ে আসছে দু'জনের।

হাওয়ায় বিভাকে উড়িয়ে নেয়। পায়ের তলায় ঢেউ এসে তাকে আছাড় দিয়ে

ফেলে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো, সে বিমলের একটা পা ধ'রে ফেললো : শিগ্গির তোল আমাকে।

ঢেউটা পিছু হটতেই নিজেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো।

বলল—আর একটু হ'লে হয়েছিল আর কি। তুমি আমাকে ধ'রে থাকো।

স্বামীর হাত ধ'রে ভয়ে-ভয়ে বিভা জলে নামতে থাকে। বিমল বলে—ভয় কি? আমিই ত ধ'রে আছি। ঢেউটা এলেই নিচু হ'য়ে ডুব দেবে—ওটা চ'লে গেলেই আবার সাফ।

বিভা বিমলকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে বলে—নুলিয়াগুলোকে ডাকো।

—দরকার নেই।

—আমার ভারি ভয় করছে। কাজ নেই সমুদ্রস্নান ক'রে। চলো উঠে পড়ি।

—কিসের ভয়? ব'লে বিমল বিভাকে শক্ত ক'রে ধ'রে আরো দূরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। প্রচণ্ড একটা ঢেউ আসে, বিভাকে নিচু হ'তে বলে—বিভা সব সময়েই মিল রাখতে পারে না, একটা অদৃশ্য হ'তে না হ'তেই আরেকটা এসে তাকে গ্রাস করে।

হঠাৎ সে হাত তুলে চীৎকার ক'রে উঠলো : আমি গেলাম। শিগ্গির আমাকে বাঁচাও।

সে-স্বর বিমল ছাড়া কেউই আর শুনতে পায় না। সে তাকে আরো দূরে জলের তলায় টেনে আনে।

ক্ষণতরে ঢেউয়ের মাঝে বিভার মুখ একবার ভেসে ওঠে—ভয়বিহ্বল বীভৎস কদর্য্য সে-মুখ। দুই চোখে অসহায় অনুনয়। স্বামীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে সে আর্তনাদ ক'রে উঠলো : আমার বুকটা কেমন করছে! কেমন যেন! পারি না আর। তুলে নিয়ে চলো আমাকে।

বিমল হয়ত এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। বা হয়ত করলো না। বিভার দৃঢ় মুঠিটা অত্যন্ত জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে সে তাকে উন্মত্ত ঢেউয়ের মধ্যে আলগোছে ছেড়ে দিলো।

পারে সনাতন ব'সেছিল। বিমলকে একা উঠতে দেখে সে আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করলো : বাবু, মা, মা কোথায়?

বিমল উত্তর দেবার জন্ম আর দাঁড়ালো না।

ইতি

দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠি ছিল না, তাই মুখের নিবন্ত চুরুটটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্ত গোটা চার-পাঁচ টান দিয়ে রমেশ শুধোল : এখন কি উপায়, কৃতার্থ?

কৃতার্থ ঠোঁট উল্টে বললে—উপায় একটা হবেই—

রমেশ ঘাড় নেড়ে বললে—কিন্তু গোঁফ-কামানো ছেলে আমি নামাতে পারবো না ব'লে রাখছি।

কৃতার্থ বললে—তা আমি জোগাড় ক'রে দেব-ই। এ-জায়গাটায় বহু বছর আগে একবার এসেছিলাম। সামনের ঐ বাবলা গাছটার ধার দিয়ে যে-পথটা খালের দিকে এগিয়ে গেছে—ঐ পথটা ভারি চেনা-চেনা। আপনি ঘাবড়াবেন না।

চুরুটের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রমেশ বললে—না ঘাবড়েই বা কি করি! জোগাড় ক'রে আনো একটি। এ বিষয়ে ত তোমার হাত আছে। কিন্তু খালি জোটালেই ত চলবে না, টালও ত সামলাতে হবে—

—আচ্ছা দেখি। ব'লে কৃতার্থময় চাদরটা কাঁধে ফেলেই তক্ষুণি বেরিয়ে গেল।

একটি অখ্যাত ছোট শহর আশে-পাশে দু'শ খানি গ্রাম ম্যালেরিয়ায় ঠাসা।

বড় দিনের ছুটিতে বড় শহর থেকে এক থিয়েটার পার্টি এসেছে—বিনা নিমন্ত্রণেই। দু' রাত্রি থিয়েটার হবে ব'লে আগেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল—মালতী : শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী।—মানে, মেয়ের পার্টে যিনি নামবেন তিনি মেয়েই।

এ খবরে সারা শহরে ও গাঁয়ে হৈ চৈ প'ড়ে গেছ্‌ল—ষ্টেজে দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষ বইয়ের কথা গড়্‌ গড়্‌ ক'রে মুখস্ত ব'লে যাবে—এ আশে-পাশের গাঁয়ের লোকের কাছে একেবারে অবাক কাণ্ড—কিন্তু শহরের যাঁরা মাথা, মানে যাঁরা টাক ও টিকি, তাঁদের কেউ-কেউ এ নিয়ে মহা গোল পাকিয়ে তুলছেন—বলছেন : ছেলেরা যাবে বিগড়ে, মেয়েদের মন যাবে বিষিয়ে। বন্ধ ক'রে দাও।

রমেশবাবু বললে—আপনিই হয়ত বন্ধ হ'য়ে যাবে। আপনাদের যা দেশ—মশায়ই মশগুল। আসতে-আসতেই আমাদের চমৎকারিণী দাসীর জ্বর-চমৎকার হয়েছে। আমরা নিজেরাই পাল গুটোব।

শহরের উকিল বগলাবাবু বললেন—তাই গুটোন মশায়;—হাওয়া উত্তুরে। মেয়েমানুষ নাবালে এক পয়সাও মিলবে না আপনাদের—চমৎকারিণীর ওষুধের খরচটি পর্য্যন্ত নয়। আমাদের এখানে বনের মশা আছে থাক—বিলাসের মশাল চাইনে। অভিনয় আমরা চাই বটে, কিন্তু অবিনয় নয়।

বগলাবাবুর আর যাই থাক, গলা আছে বটে ; – দেখতে, ও শুনতে।

বগলাবাবু যেতে-না-যেতেই একখানা ছ্যাক্ড়াগাড়ি এসে দাঁড়ালো। দোর খুলে কৃতার্থ নামছে। পিছনে একটি মেয়ে।

কৃতার্থ ঘরে ঢুকেই বললে—এনেছি মশাই, দেখুন বাজিয়ে এবার।

মেয়েটি ভারি ভীরু, ঘোমটাটি একটু টেনে দেয়ালের সঙ্গে মিশে রইল। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটি কোমলতা আছে। প্লে-তে মালতীকে এমনি একবার দাঁড়াতে হবে, —রমেশবাবু পছন্দই হ'ল হয়ত।

বললে—তুমি যে আমাকে কৃতার্থ করলে হে! ব্যাপার ?

বুক চাপড়ে কৃতার্থ বললে—খালের পারে যে এমন কলি ফোটে কলিকালের পক্ষে এ একটা সৌভাগ্য, রমেশবাবু। বাৎ-চিৎ ক'রে হাল-চাল সমঝে নিন। চলবে ? র' এক পেগ পেটে যাওয়ার মতো একটি ঘোর-ঘোর লাগছে না ?

মেয়েটি ততোই যেন মাইয়ে যেতে থাকে।

রমেশ শুধোল : তোমার নাম কি ?

মেয়েটি ঘোমটার ফাঁক থেকে জবাব দিলো : সরলা।

স্বরটা একটু ভীতু বটে, একটু জোলো কিন্তু ভারি স্পষ্ট।

কৃতার্থ বললে—ঘোমটাটা একটু কমিয়েই আনো না, দিনের আলোয় এত ভয় কিসের ?

নিবিড় অন্ধকারের মতোই কালো দু'টি চোখ—ঘোমটা একেবারে মাথার ওপর তুলে আনলে – কিন্তু দু'টি চোখেই যেন অন্ধকারের অগাধ স্নেহ মাখা। সমস্ত মুখে একটি ভারি মিষ্টি কমনীয়তা আছে, পাতলা ঠোঁট দু'টি পরস্পরের সঙ্গে ভারি আল্‌গোছে ছোয়াছুঁয়ি ক'রে আছে, একটুখানি কপাল— রমেশের মনে হচ্ছিল মাপলে হয়ত দু' আঙুলের বেশি হবে না, চিবুকটি একটু চ্যাপটা হ'য়ে গালের দু'দিকে ছড়িয়ে পড়াতেই মুখখানিতে এমন একটি পেলবতা এসেছে।

মেয়েটি একটি লাবণ্যের নদী। খুব স্রোত নেই – যেন বিকেলের আলোয় টল্‌টল্ করছে।

নাটকের নায়কের সঙ্গে কল্পনায় যতবার রমেশের সম্ভাষণ হয়েছে - অমনি তার মুখের ডৌলটি, ভাসা-ভাসা দু'টি চোখে অমনি একটি সস্নেহ কুণ্ঠা, শুধু দাঁড়ানো-টিতেই অমনি একটি সুষমা! মেয়েটি বেশ।

রমেশ ঢোঁক গিলে বললে—তুমি পড়তে জানো ত ?

সরলা বললে—জানি একটু-একটু। তবে কয়েকবার শুনলেই মনে ক'রে রাখতে পারি।

রমেশ হঠাৎ উৎসাহিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো : তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ রে, নিমাই ? দে ঐ চেয়ারখানা সরলাকে এগিয়ে।

তিন-চারখানা হাত বেরিয়ে এলো একসঙ্গে।

চেয়ারের দরকার হ'ল না। সরলা মাটিতেই বসলো।

রমেশ জিজ্ঞেস করলে : তুমি আমাদের সঙ্গে প্লে করবে ? প্লে মানে খেলা নয়, নাটক।

কৃতার্থ ভুরু কুঁচকে বললে -ও, তা খেলা-ই। কি বলো হে -

ঠোঁটে হাসি ফুটতে না দিয়েই সরলা বিজ্ঞের মতো বললে—সংসারটাই ত খেলা শুনেছি।

কৃতার্থ হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল : কেয়াবাৎ। সরলা শুধু আমাদের দর্শন দেনই না, শেখানও।

রমেশ বললে পারবে করতে ?

সরলা বললে—শিখিয়ে দিলে কেন পারবো না ? আমাদের শুধু পাখা নেই, নইলে ত আমরা পাখীই।

কৃতার্থ ফের ভুরু কুঁচকোল। বললে—পাখা নেই, কিন্তু উড়তে জানো খুব। তোমরা পোকাও।

সরলা বললে —আগুন দেখলেই উড়ে পড়ি। তাতে আগুন নেভে না, পাখাই পোড়ে।

মেয়েটি দেখতে ভীতু, কিন্তু কথায় জিলিপি !

রমেশ বললে ছোট্ট একটুখানি পার্ট, কিন্তু ভারি শক্ত। দু' তিন দিনে তৈরি ক'রে দিতে হবে। আমরা আস্‌চে শনিবারেই নামিয়ে দিতে চাই, আজ মঙ্গলবার —পারবে ত ? মোটে তিনটি সিন্।

সরলা ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিলে।

—আজ দুপুরেই তাহলে তোমাকে নিয়ে আসবো। যার এই পার্ট করবার কথা ছিল, সে পড়েছে অসুখে তাই মুশকিল যেমন মারাত্মক, তাড়াও তেমনি। কেননা আস্‌চে হপ্তায় বগুড়ায় একটা বায়না আছে - আগাম টাকা নিয়ে ব'সে আছি। খেয়ে-দেয়ে দুপুরে আস্‌বে ত ? বাড়ির ভিড় এ দু'দিন একটু সরিয়ে দাও ;—এই নাও।

ব'লে রমেশ মনিব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট সরলার দিকে প্রসারিত ক'রে দিলো। সরলা আঁচলের খুঁটে নোটটি বেঁধে কোমরে ভালো ক'রে গুঁজে নিলে। ওর দুই চোখ খুশিতে উছলে উঠেছে।

রমেশ বললে—গাড়ি ক'রে ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো, কৃতার্থ।

সরলা বললে—গাড়ি কি হবে? কতটুকুই বা পথ—দু' কদম। হেঁটেই যাচ্ছি।

রমেশ ব্যস্ত হ'য়ে বললে—তবে যা নিমাই, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।

নিমাই পা বাড়াচ্ছিল, সরলা পেছন না চেয়েই বললে—দিনের বেলায় লোক লাগবে কেন? একলাই ত যাওয়া-আসা করি—আমি খুব যেতে পারব। আসব দুপুরে।

সরলার চলাটিও বেশ—এক মুঠো ঝিরঝিরে বাতাসের মতো, বেশ জিরিয়ে-জিরিয়ে চলে। বাবলা গাছের গোড়া থেকেই পথটা বাঁক নিয়েছে। আর দেখা যায় না।

কিসের গাড়ি—কিসের লোক!

সরলার সঙ্গে পৃথিবীর আজ নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি—মগডালের লাজুক হলদে ফুলটির পর্য্যন্ত। খালে জেলেরা জাল ফেলেছে নৌকোর গলুই-এ দাঁড়িয়ে, পারে কা'রা বেত চাঁছছে, রোদ্দুরে খোলা পিঠ পেতে কা'দের বাড়ির বৌ কলার পাতায় তেল মেখে বড়ি দিচ্ছে—সরলার ইচ্ছা করে সবাইর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়। ওদের ছায়া মাড়ালে স্নান করে—ঐ যে পুরুতঠাকুর আসছেন তাঁকে দূর থেকে একটা সাষ্টাঙ্গ ক'রে বসে; কাউকে খামোকা জিজ্ঞেস করে: বাবুইহাটির এ-রাস্তা দিয়ে নাক-বরাবর পেরিয়ে গেলে কত দূরে ঐ সবুজ মেঘটাকে মুঠির মধ্যে ধরা যায়—

সরলা ট্যাঁকে-গোঁজা নোটটা বারে-বারে অনুভব করতে-করতে বাড়ি চলে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই সরলা ডাক ছাড়ে: ওলো ও ভুতি, কি করছিস্? দেখে যা শিগ্‌গির—আমি থেটার করবো। খোদ ফরিদপুর থেকে থেটারের দল এসেছে—আমাকে পার্ট দিয়েছে। আমি রাণী সাজবো—মাথায় মুকুট, গলায় মটরমালা, পায়ে সেই জুতো—ঐ যে ঘোড়ায় চ'ড়ে ছোটলাট এসেছিল, তার বিবির সেই খুর-তোলা জুতো দেখেছিলি, তেমনি। রাজা আমার পায়ের কাছে প'ড়ে কত কাঁদবে কপাল কুটবে—আমি ঘাড়টা এমনি ক'রে থাকব—

সরলা ঘাড়টা তেমনি ক'রে দেখালো।

ভুতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরলার এ অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে একেবারে থ' হ'য়ে গেছ্‌ল। বললে—কি লো, ঘোড়দৌড় দেখে এলি নাকি?

সরলা বলতে থাকে: এই ভাখ বায়না দিয়েছে দশ টাকা। দশ পয়সার বেপারি—দেখেছিস এমনি কাগজ—সবুজ নীল কালো কালি—পড়তে পারিস? দশ রূপেয়া! ক' আনা জানিস? এক টাকায় ষোল আনা—দশ টাকায়?

এবার সত্যিই ভুতির চোখ চড়ক-গাছ। দম নিয়ে বললে—সত্যি বলছিস, সরি? পথে কুড়িয়ে পেলি নাকি লো? এত ভাগ্যি তোর?

—পথে আমার জন্যে সব মুক্তো ঢেলে রেখেছে, তোদের জন্য তেঁতুল-বিচি! পাঁচ মুখে পাঁচ হাটে আমার নাম বিকোয়—কে জানত আগে? কোথা সে ফরিদপুর, সেখান থেকে আমার নাম শুনে এসেছে এই শহরে! আমাকে তাদের দলে ভর্তি ক'রে নেবে। ভারি শক্ত প্লে নিয়ে নেমেছে রে ভুতি—সব চেয়ে শক্ত পার্ট পড়েছে আমার হাতে। কে আর করবে বল? সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটাকে—মুখ দিয়ে একটা রা বেরুল না—আর আমাকে যেই বলা, দিলাম ব'লে গড় গড় ক'রে: প্রাণনাথ, রাখ তব পদতলে! বাবুদের সে কী তারিফ! বললে—সরলা, তোমার ছাড়া কারু আর সাধ্যি নয়।—বারে-বারে হাঁটু গেড়ে বসতে-বসতে পা দু'টো ব্যথা হ'য়ে গেছে।

কি যে বলবে সরলা ঠিক ঠাহর করতে পারে না। বলে—আসছে শনিবার সন্ধ্যায় হবে। তোদের দেখিয়ে দেবো মাগনা—পাশ পাওয়া যাবে ঢের। দেখবি রাণীর পোষাকে কী মানায় আমাকে! রাজা—সে সেজেছে নবিগঞ্জের জমিদারের ছেলে—আমার পায়ের কাছে মুক্তো ঢালবে; মাথার মুকুট খুলে রাখবে, রুমাল মুখে পুরে কত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে—আমি ঠায় সিংহাসনে ব'সে থাকবো, মাথা উঁচু ক'রে রাখবো।

ব'লে সরলা মাথাটা কড়িকাঠের দিকে উঁচু ক'রে ধরে।

ভুতি বলে—মাগনা দেখাবি ত সত্যি? ছাপানো কাগজ বিলি হবে না?

—হবে লো, সব হবে।

ব'লে সরলা বারান্দার ওপাশে গিয়ে আমার ডাক ছাড়লো: ও বাড়িউলি-দিদি! বড়ো যে সেদিন ঘরভাড়ার পাওনা টাকা নিয়ে তম্বি করছিলে, নাও তোমার টাকা,—সাড়ে পাঁচটাকা ফিরিয়ে দাও দিকিন।

বাড়িউলি নোটটা হাতে পু'রে বললে—সাড়ে পাঁচ টাকা কি? সেদিন যে তোর অটলবাবু দু' পাইট মদ খেয়ে গেল—তার দাম কে দেবে?

সরলা বললে—তা আমি কি জানি? যে গিলেছে তার থেকে নাও গে—

—তা ত বটেই লো, ছুঁড়ি। কে সে যে তাকে আমি সখ ক'রে মদ দিতে যাবো? তোরই পীরিতি পোড়ে ব'লে না আমি। সে আমি বুঝছিনে বাছা, হাতের কাছে কড়কড়ে টাকা আমি ছাড়ছিনে, নিতে হ'লে তুমি আদায় ক'রে নিয়ো—

সরলার মোটেই ঝগড়া করবার মন ও অবসর ছিল না; বললে—নাও- নাও,

ঝামেলা রাখো, যা নেবার নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দাও শিগ্‌গির। হিসেব-কিসেব পরে হবে'খন। আমার ঢের কাজ।

খুচরো টাকা ক'টা নিয়ে যেতে-যেতে সরলা বললে—অমন বাবুর মুখে ঝাড়ু!

বাড়িউলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে কার মুখে ঝাড়ু লো, ছুঁড়ি? লজ্জা করে না বলতে? সেদিন ত ঐ বাবুই জুতোর গোড়ালিটা দিয়ে বোঁচা নাকটা থেঁৎলে দিয়েছিল! ঐ থেঁৎলানো নাক নিয়েই ত সেই বমি-মুখো বাবুর সামনে পিকদানি তুলে ধরেছিলি!

পরে গম্ভীর হ'য়ে বললে—অত ছুটোছুটি ভালো নয় সরি, বাবুর কানে তুলবো কিন্তু!

সরলা বললে তুলো না! সরি এবারে সরে পড়ছে—বাবুর তোয়াক্কা আর সে রাখে না। পায়ের ক'ড়ে আঙুলের ডগায় বেঁধে রাখতে পারি—

বাড়িউলি চাপা গলায় শুধু বললে—আচ্ছা।

সরলা ঝিকে পাকড়ালে। বললে—তোমাকে এক্ষুণি সাজো-ধোপার বাড়ি যেতে হবে, মাসি। পয়সা না পেলে কাপড় দেবে না ব'লে শাসিয়েছে—এই ছ'টা পয়সা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে দিয়ে এসো ত। বলো—এবার থেকে ছ' টাকা দিয়ে বিলেত থেকে কাপড় কাচিয়ে আনবো। ও ভয় দেখায় কি? এক্ষুণি যাও, মাসি—গঙ্গাজলিটা প'রে আমার এক্ষুণি আবার বেরুতে হবে। আর শোনো, এখন আর রাঁধবার সময় হবে না দু' পয়সার ফুলুরি নিয়ে এসো—আর, আর দু'পাতা আলতাও কিনে এনো—কতটুকুনই বা হাঁটতে হবে যাও লক্ষ্মী! মোটমাট দশ পয়সা দিলাম—কিছু ফিরলে আমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, তোমার ছেলে হরির নামে নিয়ো—

ঝি বলতে-বলতে যাচ্ছিলো: ফিরবে তোমার মাথা—

সরলা আর একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বললে-নাও তবে আরেকটা—

সরলার চোখে নিজের ঘরটাই শুধু আজ বিশ্রী লাগছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘরের সমস্ত কদর্য্যতা যেন বা'র ক'রে ফেলেছে। নোংরা বিছানা, ছেঁড়া বালিশ, আ-মাজা বাসন-কোসন, দেয়ালে ঝোলানো মাংসের ও মদের দাগ-লাগা অটলবাবুর চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবিটা। দিনের আলোয় ঘরটাকে যে এত বিরস এত বেমানান লাগে সরলার তা কোনোদিন চোখে পড়েনি।

সরলা জানলাটা বন্ধ ক'রে খালের পারে এসে দাঁড়ালো। রোদ কতটা চড়া হ'লে ওখানে যাবার মতো দুপুর হবে মনে-মনে ও তারই হিসেব করছিল। ছাই গাড়ি! ওর পা বেতো ঘোড়ার চেয়ে আগে যাবে।

ঝি এসে হিসেব দিলে। মোট এগারো পয়সাই লেগেছে।

বললে – দু' পয়সার ফুলুরিতে 'ক লোকের পেট ভরে?

সরলা বললে—তুমি কি বোকা, মাসি! আমি কি পেট ভ'রে খাবার জন্যে তোমাকে বাজারে পাঠিয়েছি নাকি? আমার যে আজ নেমন্তন্ন থেটার-পার্টিতে। আমি রাণী সাজছি - সেখানে কত খাবার দেবে 'খন। ক'টা না ক'টায় খাওয়া হয়, সে-জন্যে ক্ষিদেটাকে একটু মেরে রাখবার জন্য দু'টো চিবিয়ে যাওয়া। ও আর আমি ছোঁব না মাসি, ও তোমার হরিকে নিবেদন ক'রে দাও গে। আর শোন আমি তোমাদের মাগনা থেটার দেখিয়ে দেব'খন। তুমি যেয়ো হরিকে নিয়ে—বাপের বয়সে তোমরা তা কখনো দেখনি।

সরলা তাড়াতাড়ি চান ক'রে নিলে। আয়নার কাছে ব'সে-ব'সে অনেক কসরৎ করবার সময় নেই মনে ক'রে তাড়াতাড়ি চুলটা জড়িয়ে নিয়ে, ধোয়া শাড়ি সেমিজ প'রে পায়ে টাটকা আলতা আর কপালে কাঁচপোকার টিপ লাগিয়ে না-খেয়েই বেরিয়ে পড়লো। বড়ো রাস্তার উকিলবাবুর বৈঠকখানায় ঘড়িটা দেখবার জন্য একবারটি নিচু হ'য়ে চোখ পেলো না। যা হোক গে, একটু আগে যাওয়াই ভালো। এখন কোচোয়ানরা সব খেতে গেছে, আড়গাড়ায় গাড়ি মেলাই ভার হবে। থেটারের বাবুদের শুধু-শুধু কষ্ট দিয়ে লাভ কি? সরলা এমন কি নবাবের বেটি!

পথ যেন সরলার এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে গেল। পায়ের কাঁচা আলতার দাগ তখনো শুকোয়নি. কাঁচা মাটির রাস্তায় ছোট-ছোট দাগ লেগেছে।

শহরের এ-বাড়িটা রমেশবাবুরই—এতদিন প'ড়ে ছিল।

পাশের মাঠে সকাল থেকেই ষ্টেজ খাটানো চলেছে—এ-পাড়ার সমস্ত ঘরামিই লেগে গেছে—হোগলা তেরপল বাঁশ দড়ি পাটাতন বেঞ্চিতে ঠাসা। ময়মনসিং থেকে সিন্ এসে পৌঁচেছে। কে একজন সিন্‌গুলিকে তদারক করছে, একটু-একটু মেরামৎ করছে ছোট-ছোট ছেলে মেয়েদের ভিড়—একজন ধমকে উঠলেই সবাই ছিট্‌কে পড়ে—আবার গুটি-গুটি এসে জড়ো হয়-- কোলাহলে বাতাস যেন টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে যাচ্ছে!

সরলা এসে দাঁড়ালো।

রমেশবাবু তখন ভেতরে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল। শহরের কয়েকটি বয়স্ক ছেলে রমেশকে অভয় দিচ্ছিল: বগলাবাবুর গলাবাজিতে ভড়্‌কাবেন না, মশায়। আর যাই হোক, গেঁজেল ছোঁড়াদের হেঁড়ে গলায় 'প্রাণনাথ' ডাক শুনতে কক্ষণো পারব না আমরা আত্মারাম খাঁচাছাড়া আর কি! চোখ বুঁজে কানে আঙুল ঢুকিয়ে কতক্ষণ ব'সে থাকা যাবে?

রমেশ হেসে বললে—সে-ভয় আমার নেই—ঢের ঢের বগলাবাবু দেখেছি।

ছেলেদের থেকে একজন বললে—নিচু ক্লাশের টিকিট চার আনাই করবেন মশাই—তাই জোটাতে আমাদের প্রাণান্ত।

রমেশ বললে—যতই কেন না উনি বগল বাজান, আমাদের চমৎকারিণীকে দেখে ও তার য়্যাক্‌টিং শুনে উনি যদি বিস্ময়ে হাঁ হ'য়ে না যান্, ত কি বলেছি!

এমনি সময় নিমাই উৎফুল্ল হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো : সরলা এসেছে।

রমেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে ছেলেগুলিকে বিদায় দেবার চেষ্টায় বললে—আচ্ছা, তাই কথা রইলো। একদিন না-হয় ষ্টুডেন্টদের হাফ ক'রে দেবো।

—বেশ, বেশ, চমৎকার। ব'লে ছেলেরা হাসিমুখে বিদায় নিলো।

তেমনি কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠন টেনে সরলা এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোমটার তলা দিয়ে ভিজা চুলগুলি পিঠের দু'দিকে ঝেঁপে পড়েছে—ফিন্‌ফিনে শাড়িটি পরাতে সরলাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—সরলার কটিটি যেন মুঠির মধ্যে ধ'রে নেওয়া যায়—এমনি হালকা! সমস্ত মুখে বিষাদের একটি স্তিমিত অপূর্ব শ্রী!

রমেশ খুশি হ'য়ে বললে—তুমি এসেছো সরলা? বেশ, বেশ। খেয়ে এসেছ ত?

সরলা ঘোমটাটা আলগোছে একটু কমিয়ে আনলে; বললে—খেয়েই এসেছি।

—তবে তুমি ওখানে একটু বোস, আমরা চান ক'রে খেয়ে নিই, পরে মহড়া সুরু হবে। ও নিমাই, সরলাকে একখানা বই এনে দে ত! তুমি ত পড়তে পার একটু-একটু—এখন একটু চোখ বুলিয়ে নাও—পরে হাত-পা নাড়া সব আমি শিখিয়ে দেবো। মোটে তিনটি সিন তোমার—লাষ্ট সিনটার সমস্তই তোমার ওপর নির্ভর করছে—তুমি বেঁকলেই সমস্ত বই বেফাঁস্। ঐটেই বেশ ভালো ক'রে করতে হবে। পার্টে তোমার নাম মালতী-মালা—জালন্ধরের রাজার একমাত্র মেয়ে। তুমি রাজকুমারী।

সরলা অবাক হ'য়ে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল—গলা যেন শুকিয়ে আসছে। জেগে-জেগে রোদ্দুরের দিকে চেয়ে-চেয়ে ও স্বপ্ন দেখছে। ওর সমস্ত জীবনের সঙ্গে বেথাপ্পা এই মুহূর্ত ক'টি যেন সুমধুর মদিরায় ভিজে গেছে। ও রাজকুমারী!

রমেশ একটু হেসে পাশের ঘরে চলে গেল।

সরলা চেয়ারে না ব'সে ঘরের একটি কোণে মাটির ওপর তেমনি বসেছে—দেয়ালে পিঠ রেখে। নিমাই বই নিয়ে এলো। পাতাগুলি উল্টোতে-উল্টোতে কাছে

এসে বললে - তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তোমার আবির্ভাব—ষ্টেজে তুমি আর আমি। দু'জনে প্রগাঢ় প্রেম হচ্ছে। মাঝের দৃশ্যটাতে তুমি আমার প্রেমে সন্দিহান হবে—শেষ দৃশ্যে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে ছুরি নিয়ে মারতে আসবে—কিন্তু—

ও-ঘর থেকে রমেশ হেঁকে উঠলো : নিমাই!

নিমাই বললে—যাই···কিন্তু আমাকে, আমাকে কি ক'রে মারবে তুমি? কে আমার নাগাল পায়? তোমাকে পেয়ে সরলা, সত্যিই আমার য়্যাক্‌টিং খুলে যাবে, পিপের মতো মোটা চমৎকারিণীর সঙ্গে ষ্টেজে প্রেম করাও একটা প্রকাণ্ড দুর্ভোগ। ওর দু'পল্লা গলার চামড়া দেখলে ভয়েই আমার গলা কাঠ হ'য়ে আসে—প্রেমের বুলি বেরুবে কি ছাই! তুমি এসেছো—ভালোই হয়েছে। এমনি একটি মেয়েই আমি চেয়েছিলাম—দু'টি চোখে এমনি একটা লজ্জা—তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে সমস্তগুলি সিন যেন একেবারে জীবন্ত হ'য়ে উঠবে—গানের মতো, ছবির মতো!

সরলার দু'চোখ কৃতজ্ঞতায় ভ'রে এসেছে—নিমাইর প্রতি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধায় ও স্নেহে ওর মুখের সমস্ত রেখাগুলি কোমল, কমনীয় হ'য়ে এলো। কিছুই বলতে পারলো না, খালি একটি সপ্রেম কুণ্ঠায় নিমাইর মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলো।

ও-ঘর থেকে রমেশবাবুর আরেকটা বিকট আওয়াজ আসতেই নিমাই তাড়াতাড়ি বইখানা সরলার কোলের ওপর ফেলে পিঠ দেখালো।

চমৎকার ছেলে এই নিমাই! উনিশ কুড়ির বেশি হবে না। ছিপছিপে পাত্‌লা চেহারাটা, টানা-টানা চোখ, কথায় যেন মধু ঢালা। এর সঙ্গে প্রেম করবার সময় ষ্টেজে দাঁড়িয়ে কি-কি কইতে হবে জানবার জন্য সরলা তাড়াতাড়ি বইয়ের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য খুলে বসলো। একটু কষ্ট ক'রে-ক রে পড়্‌তে লাগলো—চমৎকার!

প্রথমেই মালতী অর্থাৎ সরলা বলবে: কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে—জ্যোৎস্নায় আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে! পিকগণ কলরব করছে—ফুলের গন্ধে, আকাশের নীলিমায় এত মধু! চলো উদ্যানে যাই।

তারপর হিরণকুমার ওরফে নিমাই বলবে: উদ্যান? ছার উদ্যান—এ গৃহই আমার আকাশ, আমার স্বর্গ, মালতী! তোমার মুখখানি আমার চাঁদ, তোমার কণ্ঠস্বরে লক্ষ পিকের কুহরণ, তোমার দু'টি পরিপূর্ণ অধরের রঙিন পেয়ালায় রঙিন মদিরা!

সরলা আর পড়তে পারে না, আবেশে সমস্ত গা অবশ হ'য়ে আসে। কে যেন ওর দিকে দু'টি সকম্প সাগ্রহ বাহু বিস্তার ক'রে দিয়েছে—কা'র কণ্ঠস্বরে যেন স্নেহপূর্ণ কাতর কাকুতি! শুধু কথার মধ্যে যে এত মাদকতা থাকতে পারে সরলা কি তা জানত? নিমাই—নিমাই ওকে এই সব বলবে?

তার পরে—

খাওয়া-দাওয়ার পর রিহার্সেল সুরু হ'ল।

দি ইয়ং ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল পার্টির প্রোপ্রাইটার, ম্যানেজার ও প্রধান স্যাক্টার—সমস্তই রমেশবাবু। এমন কি জালন্ধর-পতন নাটকের লেখকও স্বয়ং উনিই। লোকটি চৌকোস।

যাই হোক—সুরু হ'ল রিহার্সেল। সবাইরই পার্ট তৈরি—দু'বছর নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে জালন্ধর-পতনেরই অভিনয় চলেছে। তাই সমস্ত দিন-রাত্রি ভ'রে শুধু সরলার পার্টেরই মহড়া দিতে হবে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য : সরলা আর নিমাই! দূরে চাঁদ, কাছে নদী—দৃশ্যের পৃষ্ঠপট।

সমস্ত রাজ্যের লজ্জা এসে সরলাকে গ্রাস করেছে। দু'বার তিনবার চেষ্টা ক'রে সরলা যা বললে তার আর তুলনা হয় না। স্বাভাবিক লজ্জায় ওর কণ্ঠস্বরে একটি অস্ফুট কোমলতা এসেছে, তা শুনে সবাই মুগ্ধ হ'য়ে গেল। সমবেত অভিনেতার তারিফ শুনে সরলার মন গভীর আনন্দে স্নান ক'রে উঠলো—জীবনের এই আনন্দের আস্বাদ যিনি ওকে প্রথম দিলেন, ওর ইচ্ছা হচ্ছিল, ছুটে সেই কৃতার্থবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নেয়—রমেশবাবু, নিমাইবাবুরও।

আর নিমাই! এই দু'বছরের মধ্যে নিমাই আর কখনো এত ভালো অভিনয় করেনি।

রমেশ সরলাকে মোশন দেখিয়ে দেয়, উচ্চারণের তারতম্য শেখায়, ষ্টেজে চলা-ফেরার ভঙ্গিতে সজুত করবার চেষ্টা করে। সরলা ঠিক-ঠিক শিখে নেয়—যেখানে যেটুকু ভুল করে সেই ভুলটুকুই যেন সবার চোখে সুষমামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে।

কৃতার্থ বললে—কেয়াবাৎ! এই ঠিক!

একেবারে একটি আনকোরা মেয়ের পক্ষে এমন ষ্টেজ-ফ্রি হ'য়ে অভিনয় ক'রে যাওয়া—সবাই প্রশংসাসূচক বলাবলি করে। ততই সরলার মনে একটা আত্মবিশ্বাস আসে, তেজ আসে, নিমাইর প্রতি ওর সত্যিকার স্নেহ যেন ততই একটা প্রকাশ পাবার আশা করতে থাকে।

এই এক দিন-এই সরলা দাঁড়িয়ে গেছে।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আবার সরলার অভ্যুদয়—এবারে অন্য প্রকার মনোভাব নিয়ে। মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর সঙ্গে হিরণকুমারের প্রেম হ'য়েছে মনে ক'রে মালতীর ক্রুর সন্দেহ, আহত অভিমান!

মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর ভূমিকায় যে নেমেছে সে রোগা, চিমসে—তার দিকে তাকালে সরলার রাগের চেয়ে করুণাই বেশি হয়।

সে-সিনটাও কোনো রকমে উৎরে গেল—চলনসই।

এবারে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য। রমেশবাবু কলমের খোঁচা মেরে এই দৃশ্যটিকে একেবারে জমজমাট ক'রে তুলেছে—সব দৃশ্যকে টেক্কা মেরেছে এ।

কিন্তু এই সিনটিতে এসে সরলা হাঁপিয়ে পড়লো। কিছুতেই পারলো না ফোটাতে।

এই সিন-এ মালতী হিরণকুমারকে হত্যা করবার জন্য হাতে বিষাক্ত ছুরিকা নিয়ে প্রবেশ করবে—চোখে জ্বলবে দীপ্তি, অধরে কুটিল হিংসা, ক্রোধে সমস্ত দেহ যেন একটি লালায়িত বহ্নিশিখা! সরলা কিছুতেই মুখে-চোখে সেই দৃপ্তভাব আনতে পারে না—মুখখানি তেমনি সুকোমল ও সুকুমারই থেকে যায়।

ছুরি তোলা-টিও ঠিক হয় না।

কৃতার্থ অবজ্ঞাসূচক শব্দ ক'রে বলে—না, হ'ল না। আমাদের চমৎকারিণী এ-জায়গাটা কি চমৎকার ক'রত!

নিমাই প্রতিবাদ করে: প্রথম দিনে চমৎকারিণীর সাধ্যি ছিল না এমন উৎরোয়। দু' পাঁচবার দেখিয়ে দিলে সরলা চমৎকারিণীর ওপর ডবল প্রমোশন পাবে।

রমেশবাবু সরলাকে দেখিয়ে দেয়, গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে মুখে একটা বিকটতা আনে, কণ্ঠস্বরকে হেঁড়ে ক'রে তোলে;—সরলা অনুকরণ করে বটে, কিন্তু মুখে কিছুতেই সে-দৃঢ়তা আসে না। ওর নিটোল চিবুকটিই ওর মুখের এই কৃত্রিম অমানুষিক বন্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—ওর দু'টি চোখের সেই ব্রীড়ার কুয়াশা কিছুতেই কাটে না, কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হয় বটে, কিন্তু তার মৃদুতা ঘোচে না। হাতে ছুরি ত নয়, যেন ফুলের মালা নিয়ে এসেছে।

কৃতার্থ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—হবে না। কিন্তু এ-সিনটাই সব—একে মার্ডার হ'তে দিলে প্লে-ই ফক্কা। এখানে চমৎকারিণীর কি আশ্চর্য্য রকম ভেলিভারি ছিল।

রমেশও হাল ছেড়ে দেয়। সরলার মুখ এতটুকু হ'য়ে আসে।

সরলা ঢোঁক গিলে বলে—একদিনেই কি আর হয়? অভ্যেস ত নেই—কালকেই দেখবেন ঠিক হ'য়ে যাবে।

নিমাই সায় দিয়ে ওঠে: নিশ্চয়ই। একদিনে ওর পার্টসের যা প্রমাণ পাওয়া গেল, কোচিং পেলে চমৎকারিণী ত ছার, প্রভাও ওর কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আচ্ছা, তার পরেরটুকু হোক।

সরলা উৎসুক হ'য়ে প্রম্প্‌ট্‌ শুনতে লাগলো—এর পরে কি আছে!

মালতীমালা প্রথমে ত ছুরি উঁচিয়ে হিরণকুমারকে খুন করতে এলো—এসে খুব খানিকটা স্বগত উক্তি ক'রে যেই সত্যি-সত্যি ঘুমন্ত হিরণকুমারের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে যাবে, দেখবে—হিরণকুমার আগেভাগেই বিষ খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে! তখন মালতীর কী সে অনুশোচনা! ছুরি ফেলে দিয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কী কান্না সে—হিরণকুমারের বুকের ওপর লুটিয়ে-লুটিয়ে!

সেই কান্নার মধ্যেই যবনিকা-পতন।

নিমায়ের মাথাটা কোলের কাছে টেনে এনে সরলা সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললে—চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। নিমাইর কোঁকড়ানো চুলগুলি নিয়ে ওর শীর্ণ আঙুল ক'টির কী সে আদর, যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো সমস্ত হৃদয় গ'লে পড়ছে!

নিমাই চোখ বুঁজে স্তব্ধ হ'য়ে সরলার কোলের কাছে মাথাটা রেখে মড়ার মতো প'ড়ে আছে। সরলার কান্না শুনে ওর নিজেরও চোখ ভিজে উঠছে। খালি ওর সেই দিদির কথা মনে পড়ে, যিনি ওর অসুখের সময় প্রাণপণ সেবা করেছিলেন সেবার।

সরলার কান্না ও কাকুতি শুনে সবাই মুগ্ধ হ'য়ে যায়। একজন বললে—অডিয়েন্স্‌-এর বুক ফেটে যাবে।

খালি কৃতার্থ-ই সর্বান্তঃকরণে মানতে চায় না। বলে—বুক ত ফাটবে, কিন্তু এর খানিক আগে যে ছুরি-হাতে দেখে হেসেই বুক ফেটে গেছে। ফাটা বুক আবার ফাটে কি ক'রে?

সেই লোকটা বললে—তবে ফাটা বুক জোড়া লাগবে, কৃতার্থবাবু।

প্রম্পট করতে-করতে রমেশ এতক্ষণ ভাবছিল—জালন্ধররাজের পার্ট ছেড়ে হিরণকুমারের পার্টেই নেমে যাবে কি না! বললে—কিন্তু এই দেখো চমৎকার মানিয়ে যাবে, কৃতার্থ!

—তা মানিয়ে নিতেই হবে এক রকম ক'রে। কিন্তু চমৎকারিণী কি সুন্দর ক'রেই যে কনট্রাস্‌টটা ফুটিয়ে তুলত! পড়লো জ্বরে—

রমেশ তাড়াতাড়ি বললে—ওকে ওষুধ-পথ্য দিয়েছিস ত রে নেমা! সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে যে!

নিমাই ওষুধ-পথ্য নিয়ে ও-ঘরে গেল। চমৎকারিণী বিছানায় শুয়ে ককাচ্ছে। জ্বরটা একটু কমেছে বিকেলের দিকে। উঠে ব'সে কান খাড়া ক'রে সরলার রিহার্সেল শুনছিল।

বললে—কে নিয়েছে মালতীর পার্ট ?

নিমাই উদাসীনের মতো বললে—চিনি না।

চমৎকারিণী বললে—পারছে না বুঝি! বোকার মতো হাপুস্-হুপুস্ কি রকম কাঁদছিল, একলা হাসতে-হাসতে আমার কোমরে ব্যথা ধ'রে গেছে—

নিমাই চ'টে উঠে বললে—তোমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো করে। ওকে পেয়ে আমি বর্তে গেছি। হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছি—

—বটে ? হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছ ? খাব না আমি ওষুধ, ডাক রমেশবাবুকে।

—ডাকছি। ব'লে নিমাই স'রে পড়ল।

রাত বাড়ছে।

এক-থালা খাবার ও এক-পেয়ালা চা দু' হাতে ক'রে নিমাই সরলার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, খেয়ে নাও খানিকটা।

সরলা অল্প একটু হেসে বললে—আপনার মুখও তো শুকনো, আপনিও খান।

—আমি খাব'খন।

—আপনি না খেলে আমি খাব না।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দু'জনে খাবারের থালাটা শেষ করলো।

রমেশ ডাকলে : নিমাই!

নিমাই তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটা সরলার হাতে নামিয়ে দিয়ে বললে—যাই।

রমেশ সরলার হাতে আবার একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলে। বললে—গাড়ি ডেকে দি ?

সরলা বললে—দরকার হবে না।

—কালকে ঘুম থেকে উঠেই এসো। এখানেই খাবে-দাবে। বুঝলে ?

ঘাড় নেড়ে সাড়া দিয়ে সরলা একা পথে বেরিয়ে পড়লো।

বাবলা গাছটার বাঁক ঘুরতেই সরলা অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখলে সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িতে আছে নিমাই। গাড়িতে উঠে এসো, সরলা।

সরলা আপত্তি করলো না। গাড়ি খালের দিকে গড়ালো।

দু'জনে মুখোমুখি বসেছে। নিমাই বললে—তোমার দিকে টেনেছিলাম ব'লে চমৎকারিণী ফণা তুলে আছে। কিন্তু তোমাকে ব'লে রাখছি সরলা, তুমি না থাকলে আমি কক্ষণোই এবারে প্লে করবো না; ডাঙার কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মারবো ওদের।

সরলা যেন সমুদ্রের কূল দেখে; গর্বে, সুখে ওর বুক ডগমগ ক'রে ওঠে!

নিমাই পকেট থেকে সিগারেট বা'র ক'রে বলে খাবে?

সরলা ঐ সিগারেটই খায়; তবু বলে—না। নিমাইর সামনে ওর সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে না।

নিমাইও খায় না। বলে—ঐ সিনটাতে খুন করতে আসাটাই বড়ো নয়, ভালোবাসার লোককে ম'রে গেছে দেখে ছুরি ফেলে আর্তনাদ করাটাই বড়ো কথা। কার্টেন পড়বার সময় লোকের মনে খালি তোমার ঐ কান্নাই ঘুরে বেড়াবে—চোখের জলে ভেজা তোমার মুখখানিই তাদের চোখের তারায় আঁকা থাকবে।

সরলা বলে—আপনি পৃথিবীতে আর নেই, এ-কথা মিথ্যি-মিথ্যি ক'রে ভাবলেও আমার কান্না পায়।

কিন্তু কথাটা শেষ করতে না করতেই সরলার ভারি লজ্জা পেলো।

নিমাই ভাবে—সরলার ঐ আঙুল ক'টি আবার নিজের চুলের মধ্যে রাখে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরবার পর্য্যন্ত সাহস হয় না। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

খালের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সরলা নিজেই কবাট খুলে নেমে পড়ে। বলে—আসবেন? কিন্তু ব'লেই মনে-মনে পীড়িত হ'য়ে ওঠে।

নিমাই বলে—কৃতার্থবাবু ওরা তোমাকে অপমান করেছে, কিন্তু তার শোধ আমি নেব। আচ্ছা, যাই।

নিমাই গাড়োয়ানকে বললে—শহরটার খানিক এদিক-ওদিক ঘোরো। ডবল ভাড়া পাবে।

এবারে সিগারেট ধরায়।

সরলা ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে—গাড়িটা যে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে তার পর্য্যন্ত হুঁস নেই।

ভেতরের দাওয়ায় পা দিতেই বাড়িউলি খ্যা খ্যা ক'রে উঠলো: বলি, সরি এসেছিস? তুই কেমনতরো মানুষ লো, ছুঁড়ি! সারা দুপুর-সন্দে টো টো ক'রে বেড়াবি, আর এখেনে যত রাজ্যের লোক এসে মুখ খারাপ ক'রে যাবে?

সরলা যেন গাড়ি থেকে এবারেই সত্যি নেমে আসে। ওর গতানুগতিক কদর্য্য বিরস জীবন ওর সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ায়। ফুলশয্যার ওপর কে যেন এক বোতল মদ ঢেলে দেয়—ওর গা ঘিনঘিন্ ক'রে ওঠে।

বলে—কি হ'ল বাড়িউলি-দিদি?

—কি হ'ল? সেই অটল ছোঁড়া বিকেলের দিকে এসেছিল কতকগুলো চেলা জুটিয়ে। তোকে ঘরে না দেখে কি কেলেঙ্কারিটাই না ক'রে গেল! আমার থেকে

তিন চার পাঁইট ক'রে দিশি-বিলিতি চেয়ে নিয়ে খেয়ে বমি ক'রে গালাগালি দিয়ে জিনিসপত্র ছত্রকট ক'রে লম্বা দিলে—একটি পয়সা দিয়ে গেল না। বললে—সরি দেবে।

সরলা ক্ষেপে ওঠে: হ্যাঁ, সরিই ত দেবে! কেন? সরি কি ওর জুতোর সুখতলা নাকি? খালি বোতলগুলো ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে পারলে না? এবারে আসুক না, ঝ্যাঁটাপেটা ক'রে যদি না তাড়াই ত আমি বামুনের মেয়ে নই।

বাড়িউলি বলে—বামুনের মেয়ে ব'লে আর দেমাক করিসনি ছুঁড়ি। কেন বাড়ি থাকবিনে শুনি? বাঁধা লোকের টাকা খেয়ে আবার তার ওপরে চালবাজি! কেন সে গালাগাল করবে না?

সরলা বলে—রেখে দাও, অমন লোক বাজারে কাণা কড়িতে বিকোয়। ও রকম বাবু আমার চাইনে। আমি কালই এ-বাড়ি থেকে খ'সে পড়বো?

—থেটার-ফেটারের কথা সব তার কানে উঠেছে। বলেছে—থেটারে আগুন লাগিয়ে দেবে, আর তোর মুণ্ডুটা আস্ত রাখবে না।

—তার হ'য়ে তুমি লড়তে এসো না, বাড়িউলি-দিদি। আসুক সে, দেখি তার বাপের ঘাড়ে ক'টা মাথা। তার মুখে যদি নোড়াটা আমি না ঘসি, ত কি বলেছি! কত টাকার মদ খেয়েছে সে? কত টাকা পেলে তুমি গলা থামাবে? ব'লে সরলা আঁচলের খুঁট থেকে নোটটা বাড়িউলির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

সব ঘর নোংরা, জিনিসপত্র এলোমেলো, কাচের জাগ গ্লাশ ভাঙা, ট্রে-টা উল্টোনো—কোথা থেকে একটা উৎকট গন্ধ আসছে। সরলা অন্ধকারে থমকে রইলো—দেশলাই জ্বালাবার পর্য্যন্ত যেন সামর্থ্য নেই।

বুকের মধ্যে সরলা যে গানের সুরটি নিয়ে এসেছিল, টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেল—ও যেন আত্মার নরককুণ্ডে এসে পড়েছে, যেখানে সেই অটল আর সরলা, সেখানে না আছে মালতী. না বা হিরণকুমার!

সরলা ঘর থেকে বেরিয়ে খালের পারে এসে দাঁড়ালো।

পরে কি ভেবে আবার ঘরে গেল, ল্যাম্প জ্বালালে—কোমরে কাপড় জড়িয়ে বালতি ক'রে জল এনে ঘর সাফ করতে বসলো।

পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নিমাইর মাথাটি কোলে নিয়ে যে-হাত দিয়ে ওর কপালে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে সেই হাতে ঘৃণ্য অটলের বমি নিকোতে হচ্ছে ভেবে ওর চোখ দিয়ে টস টস ক'রে জল পড়তে লাগলো। ও সত্যিই আর এখানে থাকবে না, থিয়েটারে ভিড়ে যাবে—যে-থিয়েটারে হিরণকুমার আছে, যে-থিয়েটারে মৃত বন্ধুর উদ্দেশ্যে কৃত্রিম শোক করতে গিয়ে সত্যি-সত্যিই কান্না পায়।

ভুতি ঘরে এলো। বললে—আজ কি হ'ল রে, সরলা ?

সরলা বললে—কত ! কত বড়ো শক্ত পার্ট যে হাতে নিয়েছি, সে দেখবি গিয়ে। ষ্টেজে খুন করতে হবে।

ভুতি ভয়ে আঁৎকে ওঠে, সরলাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে—বলিস কি লো ?

সরলা হেসে অভয় দিয়ে বলে—সত্যি-সত্যিই কি আর খুন করবো নাকি বোকা মেয়ে ! পুলিশ নেই ? খুন করতে যাবো খাঁড়া উঁচিয়ে—এমনি ক'রে—চেয়ে ছাখ, এমনি দাঁত খিচিয়ে— ছাখ ত ঠিক মতো হচ্ছে কি না—

ভুতি অত-শত বোঝে না, বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়েছে—তারপর কি হবে ?

রসবোধের চেয়ে ভুতির কৌতুহল বেশি।

—তারপর যেই খাঁড়া চালাতে যাবো, দেখবো হিরণকুমার আগেই বিষ খেয়ে ভবলীলা ঘুচিয়েছে। তারপরে অস্তর ফেলে দিয়ে তার মাথাটা কোলে নিয়ে কাঁদবো। বললে-বলতে সরলার চোখে ব্যথার কুয়াশা ঘনিয়ে আসে।

সরলা ভুতিকে ফের অভয় দেয় : সেই হিরণকুমার সত্যিই বিষ খাবে না রে, পরে পর্দা প'ড়ে গেলে জেগে উঠবে।…আমাকে খাবার খাইয়ে দিলে, গাড়ি ক'রে বাড়ি পৌছে দিলে—ভারি সুন্দর ছেলেটি, ভাই। মনের মতো। দেখিস এখন।

দোর-গোড়ায় কে একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়ালো—ঝি-মাসির ছেলে, হরি।

হরি বললে—আমাকে আর মাকে সত্যি-সত্যি মাগনা থেটার দেখাবে, সরলা-দি ?

সরলা হাসিমুখে বললে—দেখাবো। যাস তোরা।

হরি খুশিতে উছ্‌লে প'ড়ে বললে—তোমাদের হ'য়ে গেলে দেখো আমরাও একটা থেটার করবো বাবুতলার মাঠে। কাগজ দিয়ে সব ভীমের গদা বানিয়েছি, বাঁশের ধনুক।—সেদিন তোমাদের নিয়ে যাবো। দেখবে—

ছুটতে-ছুটতে চ'লে গেল।

ঐ সামান্য ছু'টি মিষ্টি'খেয়েই সরলার পেট ভ'রে আছে। ঝিকে বিদায় ক'রে দিলো।

পাড়াটা নিরিবিলি হ'য়ে এসেছে। সরলা দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে ওর ছোট্ট আয়নাখানি বেড়ার গায়ে মানানসই ক'রে লাগিয়ে ছুরির অভাবে চিরুণীটাই ছুরির মতো বাগিয়ে নিজের মনে শেষ দৃশ্যের মহড়া দেয়। আয়নায় সমস্ত মুখের ছায়া পড়ে না দূর থেকে—যেটুকু পড়ে তাতেই ও ওর মুখের চেহারার আন্দাজ ক'রে নিতে পারে। যতই ও ওর মুখ রুক্ষ কর্কশ বলদৃপ্ত করতে চায়, ততই ওর মুখের শীর্ণতা

বীভৎসতর হ'য়ে উঠতে থাকে! গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে হিংসার কাঠিন্য মেশাতে পারে না —তাই দেখায় কুৎসিত, হাস্যকর!

কি ক'রে যে মানিয়ে নেবে ভেবে উঠতে পারে না।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে একটা ছেঁড়া বালিশ কোলে নিয়ে পার্টের বাকি অংশটুকুর মহড়া দেয়—বালিশকে ভাবে হিরণকুমার; তার জন্য রাত ক'রে সরলা অনর্থক অশ্রুবর্ষণ করে।

এমন সুন্দর ক'রে সরলার জীবনে ভোর হয়নি। ভোরবেলাটি ওর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন লাগছে।

ঘুম থেকে উঠে সরলা ভাবছে—কে যেন ওর কাছে আসবে আজ। নিমাইকে ত ও আসতে ব'লে দেয়নি। কিন্তু না ব'লে দিলে কি আসতে নেই? অটলকে তাড়িয়ে দিলেও ত সে আসে।

বেলা বেড়ে চলে, কিন্তু সরলার ভারি খালি-খালি লাগে। অদূরে রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ পেলেই ওর বুক আশায় দুলে ওঠে। কিন্তু পরে ভাবে—ওর কাছে আসবার এই একটিই ত সদর রাস্তা নয়—শুধু গাড়িই ত তার বাহন নয়—সে এসেছে তার ঘুমের মধ্যে, অজানতে ঘুম ভাঙার মধ্যে, মনের গোপন খিড়কির দুয়ার দিয়ে।

যে আসবে না, তার জন্যে এমনি অনর্থক প্রতীক্ষা ক'রে থাকবার মধ্যে যে দুঃসহ সুখ আছে, সরলা কোনোদিন তা জানত না।

রোদ উঠতে-না-উঠতেই সরলা বেরিয়ে পড়লো।

নিমাইকে কাছে পেয়ে সরলা শুধোল: ভেবেছিলাম সকালবেলা আসবেন।

নিমাই বললে- ম্যানেজারের হুকুম তালিম করতে-করতেই সব গরমিল হ'য়ে যায়। আজ থেকেই ষ্টেজ-রিহার্সেল সুরু হবে। তোমার প্রবেশ-প্রস্থানগুলি ঠিক ক'রে নিতে হবে। মুখস্থ হয়েছে?

সরলা বললে—একটু-একটু হয়েছে।

—ম্যানেজার বলেছিল পার্টটা তোমাকে লিখে দিতে—আমার হাতের লেখা ত আর বুঝবে না ছাই, তাই আমার বইখানাই তুমি নাও।

ব'লে নিমাই পকেট থেকে ছেঁড়া জালন্ধর-পতন বইখানি সরলার হাতে গুঁজে দিলো।

নিমাই বললে—দেখো, আজ আরো ভালো হবে। তোমার হাতের আদর পাবার জন্য আমার কপালটা নিস্‌পিস্ করছে। তোমার কান্না শুনলে আমার মন কেমন ক'রে ওঠে।

সরলার ঠোঁট দু'টি শুধু একটু কাঁপে।

ষ্টেজ বাঁধা হ'য়ে গেছে—বেড়া ও টিন দিয়ে চারদিকে ঘেরা, পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো ফুটো ক'রে উঁকি দিতে চায়, আর কে ওদের সব ভাগিয়ে দিতে থাকে। ঐখানে গানের আর নাচের মহড়া চলেছে—এ পারে র‍্যাকৃটিং—ঐখানে সিন্ পেন্টিং, সিন্ সিফটিং চলেছে।

সমস্ত বাড়িটা গঁ গঁ করছে—যেন একটা উৎসব!

সরলা সব ভুলে যায়—খালপারে সেই নোংরা ঘর, সেই শীতকালে রাত বারোটা পর্য্যন্ত ফাঁকে জবুথবু হ'য়ে ব'সে থাকা, সেই একঘেয়ে বিশ্রী কথাবার্তা, সেই অটলবাবুর বীভৎস মুখ! ওর বন্দী পৃথিবী যেন হঠাৎ একটা অপরিমিত পরিধিলাভ করে। আকাশকে আজ ওর খুব বড়ো লাগে—সমস্ত অবকাশ পূজার আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ভাবে, ও সত্যিই অটলের রক্ষিতা ক্রীতদাসী নয়—ও সত্যই রাজকুমারী! ও ভালোবাসে, প্রেমিককে হারিয়ে ও বৈরাগিনী হয়েছে—ওর দারিদ্র্য, ওর বিরহের কি সুন্দর ব্যাখ্যা! সরলা সব ভুলে যায়, মিথ্যার মাদকতা ওর ক্লান্তি ঘুচোয়—ও নতুন ক'রে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।

শুধু দু'টি দিনের জন্যেই। তা হোক।

আজ ভোরে চমৎকারিণীর জ্বর ছেড়েছে। শরীর দুর্বল বটে, কিন্তু অচল নয়—গড়াতে-গড়াতে এসে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো। অভিনয় সম্বন্ধে টিপ্পনির তার আর শেষ নেই। কৃতার্থময় পেছনে দাঁড়িয়ে চমৎকারিণীর টিপ্পনিরই তারিফ করে।

রমেশ বলে—তুমিই আজ থেকে প্রম্পট কর হে, মধুসূদন। তোমারই ত কাজ।

মধুসূদন বই হাতে করে।

আজকে একেবারে গোড়াগুড়ি থেকে। তৃতীয় অঙ্কে পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় বারোটা বাজে।

সুরু হ'ল তৃতীয় অঙ্ক। সরলা মাৎ ক'রে দিলো।

কিন্তু শেষ দৃশ্য আসতেই সরলার আর হ'য়ে ওঠে না। মারবার সময় এমন একটা ভাব হয়, যেন খুব শক্ত একটা দড়ির গেরো খুলছে মাত্র—খুন করতে আসছে না। মুখ কিছুতেই কুঞ্চিত কর্কশরেখাসঙ্কুল হ'য়ে উঠতে পারে না। একটা বিশীর্ণ দৈন্য ফুটে ওঠে শুধু।

চমৎকারিণী মুখ টিপে টিপে হাসে। কৃতার্থ তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাসির সুর সপ্তম গ্রামে তুলে দেয়। বলে—হবে না, রমেশবাবু। লুডিক্রাস্!

রমেশ বলে—হবে না বললেই ত হয় না। এ নিয়েই চালিয়ে দিতে হবে আপাতত।

চমৎকারিণীর হাসি কিছুতেই থামে না। যেন মদের পিপের মুখ ছুটে গেছে, তার থেকে ফেনিল উচ্ছ্বাস উঠছে।

নিমাই একেবারে রুখে ওঠে; বলে· চোখের সামনে অমনি হাসলে কে পার্ট করতে পারে? রইলো আপনার থিয়েটার। চ'লে এসো সরলা।

সরলা আয়ত চোখ মেলে নিমাইর দিকে তাকায়। ওর অপমানের বেদনা স্নেহে সুশীতল হ'য়ে ওঠে।

রমেশ হাঁকে: নিমাই! এ কি অন্যায় কথা তোর। পরের সমালোচনা কি ক'রে বন্ধ করবি? এগিয়ে এসো সরলা, আবার চেষ্টা কর। অমন হাসাহাসি ক'রো না, চমৎ! আমাদের এ-ই চালিয়ে নিতে হবে। জ্বরে প'ড়েই ত তুমি সব বিতিকিচ্ছি ক'রে দিলে।

—বিতিকিচ্ছি? নিমাই ফের প্রতিবাদ করে: সরলার সমস্ত শরীরে প্রেমের যে একটি সহজ লীলা ও পেলবতা আছে তা চমৎকারিণীর কোথায়? ওর স্বরে আপনি-থেকে একটি স্নেহের সুর আছে- কেমন চমৎকার মানায় ওকে! চমৎকারিণীকে খুনের পার্টেই বেশি খোলে—কিন্তু সরলা যেন. মূর্তিমতী সরলতা! আপনার বই থেকে ঐ খুনের অংশটুকু কাটা-প্রুফের মতো বাদ দিন।

রমেশ এ-সব কথা কানেই তোলে না। আবার পার্ট চলে। সরলা আবার ব্যর্থ হ'য়ে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

পরেরটুকু আর আসে না। নিমাই বলে—ও যেমনি হচ্ছে হোক, বাকিটুকুতে কেঁদে সরলা আগের সমস্ত ত্রুটি ধুয়ে নিয়ে যাবে। দেখেছেন, একদিনে কেমন মুখস্থ ক রে ফেলেছে—চমৎকারিণীর লেগেছিল পুরো একটি বছর।

চমৎকারিণী চেঁচিয়ে ওঠে: আমাকে এমনি ধারা অপমান করলে আমি আজই চললাম কলকাতায় ফিরে।

কৃতার্থও চেঁচিয়ে ওঠে: মুখ সামলে, নিমাই!

ঝগড়ার সম্ভাবনাটা কাটিয়ে ওঠবার জন্ম রিহার্সেলটা খানিকক্ষণ বন্ধ থাকে।

রাত্রে সরলাকে গাড়ি ক'রে এগিয়ে দিতে-দিতে নিমাই বললে আমার যদি অনেকগুলি টাকা থাকত, তবে তোমাকে নিয়ে নতুন একটা থিয়েটার খুলতাম। তোমাকে কো-য়্যাক্ট্রেস পেয়ে সত্যিই আমার ভেতরে এক'া আবেগ আসে—কাউকে দিয়ে খুব মিষ্টি ক'রে একটা প্রেমের গল্প লিখিয়ে নিতাম!

সরলা হেসে বলে— আপনি নিজেই ত পারেন। পরকে খোসামোদের দরকার হয় না।

একটুখানি মাত্র পথ—এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে যায়। সরলার ইচ্ছা করে, নিমাইকে ঘরে নিয়ে যায়, নিজ হাতে রেঁধে ওকে কিছু খাওয়ায়, ফর্সা চাদর বা'র ক'রে ওর জন্য নিজ হাতে নতুন একটি বিছানা পেতে দেয়. ও ঘুমিয়ে পড়লে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মতো ওর চুলগুলিতে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে দু'টি ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

সরলা মুখ ফুটে নিমন্ত্রণ করতে পারে না।

ভাবে, এই বদ্ধ গাড়ির মধ্যেই শুধু দু'টি মুহূর্তের জন্য ওর এই ছোট্ট ক্ষণিক সংসার --নিমাইর সঙ্গে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন—মালতী আর হিরণকুমার।

গাড়িটা থামলে সরলা নামে, নিমাই হঠাৎ ওর আলোয়ানটা সরলার গায়ে জড়িয়ে দেয়, বলে—তোমার শীত করবে না হ'লে।

সরলা আপত্তি করে না, আলোয়ানটি আরো নিবিড় ক'রে জড়িয়ে পরিচিত ঘরে এসে ঢোকে। আজ আর কারু সঙ্গে কথা কয় না—ভূতির সঙ্গেও না। আলোয়ানটা গায়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

সরলার জীবনে আরেকটি পরিচ্ছন্ন রাত্রি কাটে, ঘুম থেকে জেগে পবিত্র প্রভাতকে মনে-মনে অভিবাদন করে।

শুক্রবার। কাল প্লে। আজ ড্রেস-রিহার্সেল।

পার্ট সরলার মুখস্থ হ'য়ে গেছে। ওর একাগ্র মনোযোগের দরুণই তা সম্ভব হ'ল। ছুরি-মারার ভঙ্গিটিও এক-রকম চলনসই ক'রে এনেছে।

ও এর মধ্যে নিজের ত্রুটির ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত বা'র ক'রে ফেলেছে ; বুঝিয়ে বলে— এই অবস্থায় মালতীর মুখে খুব একটা হিংস্রতা আসতেই পারে না. সেই হিংসা ও ক্রোধের সঙ্গে যে ওর একটি মমতা ও শোক মেশানো আছে তাই তার মুখে কোমলতাটা স্বভাববিরুদ্ধ নয়।

বলা বাহুল্য ভাষ্যকার স্বয়ং নিমাই।

সকালবেলা ছুটতে ছুটতে হরি এসে হাজির - হাতে একখানা ছাপানো কাগজ। সরলার দোর-গোড়ায় এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে - গাড়িতে ক'রে কাগজ বিলি হচ্ছে, সরলা-দি। আমাকে কি দেয় ? বললাম --আমার সরলা-দি থেটার করবে,

তখন দিলে। গাড়ির ছাতে ব'সে সানাই বাজাচ্ছে—আর কত লোক যে গাড়ির সঙ্গে ছুটছে, সরলা-দি! রামু ত চাকার তলায়ই পড়ে গেছ্‌ল আরেকটু হ'লে!

গর্বে আনন্দে সরলার বুক দুলে ওঠে—এত বড়ো একটা আনন্দব্যাপারে ওর কিছু অংশ আছে ভেবে ও ধন্য হ'য়ে যায়।

ভুতি কৌতূহলী হ'য়ে কাছে আসে। সরলা হরির হাত থেকে কাগজটা নিয়ে প'ড়ে সকলকে বুঝিয়ে দেয়। মাঝখানে একটা ছবি আছে—তার অর্থ করে।

বলে—এই হিরণকুমার বিষ খেয়ে শুয়ে আছে, আর আমি এমনি ছুরি নিয়ে মারতে আসছি।

সমস্ত নাটকের মধ্যে এই ব্যাপারটাই সব চেয়ে রোমহর্ষক ব'লে তারই ছবি ব্লক ক'রে বিজ্ঞাপনে ছেপে দেওয়া হয়েছে।

ভুতি ও আর-সব মেয়েরা ঈর্ষায় জর্জর হ'য়ে সরলার পানে তাকায়। ভুতি বলে—কিন্তু এ ত তোর ছবি নয়।

সরলা তা জানে। এ চমৎকারিণীর ছবি—যেন নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা;—হিরণ-কুমারকে ও কোনোদিন ভালোবেসেছিল তার কোনো প্রমাণই তাতে পাওয়া যায় না—যেন বরাবরই ও একটা শাঁকচুন্নি। আর শুয়ে আছে—নিমাই, রুখু চুল, চোখের পাতা বোজা—একখানি হাত মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে।

সরলা হেসে জবাব দেয়: আমার ছবি কোথায় আর পাবে বলো। এমনি একটা এঁকে দিয়েছে। আমার অমনি মোটা হ'লেই হয়েছিল আর কি! পার্ট থেকে নাকচ ক'রে দিত।

কিন্তু নিজের মনকে এই ব'লে বোঝায়—অনেক দিন আগে থেকেই এগুলি ছাপা ব'লে মালতীর ভূমিকায় সরলার নামটা আর হ'য়ে ওঠেনি।

সরলা বলে—আজ সব পোষাক প'রে রিহার্সেল হবে—এখুনি যেতে হবে।

হরি মিনতি ক'রে বলে—আমাকে টুপ ক'রে কোনোখান দিয়ে আজ ঢুকিয়ে দিতে পারবে না, সরলা-দি? তোমাদের পোষাক-পরা নাটক দেখবো।

সরলা হেসে ওকে প্রবোধ দেয়: আজ কি, কালই ত দেখবি। খুব ভালো জায়গায় বসিয়ে দেব'খন। মাকে নিয়ে যাস।

হরির যেন তর সয় না, বলে—খুব ভালো জায়গা দেবে? বাঃ, কেয়া মজা! রামু ওরা ত জায়গাই পাবে না।

হরি নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল।

সরলাকে এখুনিই বেরুতে হবে। ঘরে যেটুকু সময় থাকে—স্নান করা, একটু খাওয়া কি না খাওয়া—সব সময়েই অস্ফুটস্বরে পার্ট আওড়ায়। ও এই নিয়েই

আছে। ওর তিনদিন আগেকার অতীত জীবনের সঙ্গে যেন ওর কোনোই সম্পর্ক নেই—তাকে ও চেনেই না।

ড্রেস্-রিহার্সেল সুরু। সবুজ রঙের শাড়ি প'রে জালন্ধর-রাজকুমারী শ্রীমতী মালতীমালা ওরফে সরলাসুন্দরী যেন সবুজ মেঘের পরীর মতো পাখা মেলে এই শহরের মাটিতে নেমে এসেছে!

সরলার দিকে চেয়ে কে বলবে ও সত্যিই একগাছি মালতীর মালা নয়!

পিঠে কালো পরচুল মাটি ছোঁয়-ছোঁয়, শাড়ি-পরার ভঙ্গিটিতে কি আশ্চর্য্য সুষমা! হাতে আভরণ! গলায় পুষ্পহার!

আর সম্মুখে হিরণকুমার—রাজপুত্রের বেশে। মাথায় সোনার মুকুট, তাতে পাখীর পালক গোঁজা।

সমস্ত ষ্টেজ গমগম ক'রে ওঠে—ডে-লাইটের সুতীব্র আলোতে পরস্পরের চোখে একটি বিহ্বল মুগ্ধতা আবিষ্কার ক'রে দু'জনে আবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। অভিনয় শুনে সবাই তব্ধ হ'য়ে যায়।

কিন্তু শেষ দৃশ্য আবার তেমনি জলো হ'য়ে আসে। কৃতার্থময় কিছুতেই সায় দেয় না, দুর্বল ব'লে উচ্চহাস্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে চমৎকারিণী একটা বীভৎস কটু আওয়াজ করে।

নিমাই বলে—আর-আরদের অভিনয়ের প্যাঁচে কত যে গলদ থাকে তার কেউ খোঁজ করে না, এ-বেচারির ছুরি-ধরা ঠিকমতো হয় না ব'লেই যত ঠাট্টা। আপনারা ত ছাই সমঝদার, দেখবেন লোকে কি রকম নেয়!

কৃতার্থ বলে—লোকে ত আর তোমার মতো গাড়োল নয়—তাদের রসবোধ ব'লে একটা জিনিস আছে।

রমেশ মীমাংসার সুরে বলে—না না—এই আমাদের চালিয়ে নিতে হবে। বেশ হবে, সরলা। তুমি একটুও ঘাবড়িয়ো না।

রিহার্সেলের শেষে, সরলা দামী পোষাক ছেড়ে তার আটপৌরে শাড়িখানি পরলে। সরলা যেন নিমাইর চোখে রহস্যময়ী হ'য়ে উঠেছে!

নিমাই বললে—দেখবে কি রকম ভিড় হবে, হাততালিতে প্রত্যেকটি কথা ডুবে যাবে, দেখো।

সরলা মনে-মনে ছবি আঁকে—বিপুল জনসমারোহের কূল-কিনারা করতে পারে না।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে সরলা কারুর দেখা পায় না। গাড়ি নিয়ে কেউই বাবলা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নেই। সরলা ভাবে, হয়ত গাড়ি আনতে গিয়ে দেরি

হচ্ছে;—একটু অপেক্ষা করে, কেউ আবার পাছে কিছু সন্দেহ করে এই ভয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও পারে না। অন্ধকারে গা ছম্‌ছম্‌ করে। এ কেমনতরো লোক—একটুও ভাবনা নেই? সরলা বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ভাবে, দোরের বন্ধ তালাটা খুলতেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে।

নিমাইর র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। ভাবে, হয়ত তক্ষুণিই নিমাই শাড়ি নিয়ে এসে ঘুরে গেছে।

রাতের মতো রাত একটা—আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা! ওর চোখের সমুখে রাশীকৃত লোক—সবাই হাততালি দিচ্ছে, মুগ্ধ হ'য়ে ওর মুখের ওর পোষাকের দিকে চেয়ে আছে। অটল যদি যায়, সেও হাঁ হ'য়ে যাবে, চিনতেই পারবে না। কেউ দিস্তা খানেক নোট নিয়ে আসতে পারে, ও তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে—ও হিরণকুমারের বাসনাবাসিনী প্রিয়া! তার জন্যেই ও গেরুয়া পরবে।

শনিবার—দিনের মতো দিন। পাঁজিতে এ-দিনটি যেন সরলার জন্য রিজার্ভড ছিল।

চোখ মুখ ধুয়েই নিমাইর র‍্যাপারটি গায়ে জড়িয়ে সরলা রওনা হ'ল থেটার বাড়ি।

যাবার সময় তৃপ্তিকে ব'লে গেল: দুপুরে একবার এসে পাশ দিয়ে যাবো তোদের।

সরলার সুখের আজ অন্ত নেই। ওর মধ্যে এত বড়ো শক্তি প্রসুপ্ত ছিল, এত বড়ো কাজের যোগ্যতা ছিল জানতে পেরে ও গর্বে একেবারে ফুলে উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করবার মতো অহঙ্কার বোধকরি আর কিছু নেই। ও এ ক'দিন একটা মাতালেরো মুখ দেখেনি, ওর সমস্ত আচরণে একটি ভদ্রতা এসেছে—মনে একটি বিশ্রামের সঙ্গে প্রশান্তির স্বাদ পাচ্ছে! কত ভালো লাগছে ওর - জীবনের বৃহৎ বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়ে ও ধন্য হয়েছে।

সত্যিই, আজ ও মালতীমালার মতো সন্ন্যাসিনী হ'য়েও যেতে পারে।

সরলা এসে পৌঁছুলো। সব ফিট্‌ফাট। সব সিজিলমিছিল হ'য়ে গেছে।

কিন্তু সবাই কেমন উদাসীন। সরলাকে দেখে কারু ঔৎসুক্য নেই। নিমাই কই?

রমেশবাবুকে বললে—আজ রিহার্সেল হবে না?

রমেশ বললে—হ্যাঁ, দুপুরের পরে একবার হবে - কয়েকটি সিন।

সরলা কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

রমেশ আর যাই হোক মুখচোরা নয়; বুঝিয়ে দেয়। বলে—তোমাকে আর আমাদের প্লে-তে লাগবে না। চমৎকারিণী সেরে উঠেছে, সে-ই মালতীর পার্টে নামবে।

সরলা ব'সে পড়লো। ওর তাসের ঘর দমকা হাওয়ায় ছত্রখান হ'য়ে গেল।

রমেশ আরো খুলে বললে—মার্ডারের সিনটা তোমাকে দিয়ে কিছুতেই হ'ল না—কৃতার্থ ওরা কিছুতেই রাজি হয় না। তা ছাড়া চমৎকারিণী ভালো হ'য়ে এই পার্টটা এখানে আবার করবার জন্য ভারি ঝুঁকে পড়েছে। জানই ত ও আমাদের দলের সেরা য়্যাকট্রেস্। ওকে ত আর চটাতে পারি না।

সরলা দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, ছেলেমানুষের মতো! এক মুহূর্তে ও যেন একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

রমেশ বৃথা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে: তুমি কিছু মনে কোরো না, সরলা। বিকেলে তুমি এসো থিয়েটার দেখতে। তোমাকে আর কয়েকটা টাকা দেব'খন, থিয়েটারের পরে কিম্বা কাল সকালে এসে নিয়ে যেয়ো।

রমেশ চ'লে গেল।

সরলা কোথায় গিয়ে যে ওর এই কান্না লুকোবে, জায়গা খুজে পাচ্ছে না। ওর কাছে পৃথিবী যেন আজ সমস্ত জায়গা খুইয়ে বসেছে।

খানিকক্ষণ এ-দিক ও-দিক নিমাইর খোঁজ করলে—কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুজতে পোষাকের ঘরে এলো—সেখানেও নিমাই নেই। মধুসূদন বাক্স থেকে পোষাক আর চুল খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখছে। কাল রাত্রে সরলা ঐ সবুজ শাড়ীটি পরেছিল—আর নিমাই ঐ মুকুটটা।

একজনকে জিজ্ঞেস করলে: নিমাইবাবু কোথায় বলতে পারেন?

লোকটা কি কাজে ব্যস্ত ছিল, বললে—জানি না।

চট ক'রে একটা কথা সরলার মনে প'ড়ে গেল—বোধহয় নিমাই পালিয়েছে। নিমাই ওকে বলেছিল, যদি সরলাকে শেষ পর্য্যন্ত না নামায়, তবে ও বেঁকে বসবে, পালিয়ে যাবে, পারের কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মারবে!

ঠিক তাই। সরলাকে নামাবে না জেনে অভিমানে বেদনায় নিমাই বিবাগী হয়েছে।

সরলার মনে বল এলো—ধর্মের জয় আছেই। এই প্রবঞ্চকদের সমুচিত শাস্তি দরকার! বেশ হবে। নিমাই না থাকলে থিয়েটারই হ'তে পাবে না, হিরণকুমারের পার্টে আর কেউ তৈরি নেই।

নিমাইর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় সরলার মন ভ'রে ওঠে।

সরলা বিমর্ষ মুখে থিয়েটার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। বাবলা গাছটার তলায় ব'সে ও চোখের জল আর চেপে রাখতে পারে না। জীবনে ও ঢের কেঁদেছে, এর চেয়ে ঢের বড়ো বেদনায়—কিন্তু আজকের মতো নিজেকে কোনোদিন এমন ব্যর্থ মনে করেনি। ওর চোখের থেকে দিনের আলো যেন কে শুষে নিয়েছে।

কিন্তু নিমাইকে আজ ওর চাই—একান্ত ক'রে চাই। এ সংসারে ও-ই সরলার একমাত্র বন্ধু- খালি ওকেই সরলার অপমান স্পর্শ করেছে। নিমাইকে আজ সরলা তার ছোট ঘরটিতে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর নাগালের থেকে আড়াল ক'রে রাখবে।

নিমাইকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে! বাজার, গাড়ির আড্ডা, অলি-গলি কোথাও নিমাই নেই। নিমাই নেই। নিমাই দেশ-ছাড়া হয়নি ত?

হঠাৎ মনে হ'ল, নিমাই হয়ত ওরই বাড়ি গিয়ে ব'সে আছে—ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্য। সরলার সমস্ত শরীর আনন্দে শিউরে উঠল।

সরলা তখুনি বাড়ি গেল। রোদ তখন বেশ চড়া হয়েছে। সরলার ঘরে কেউ আসেনি, কেউ ওর খোঁজও করেনি।

বাড়িউলি ঠাট্টা করে: আজ যে লোকের ওপর ভারি দরদ—

ভুতি তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সরলার চেহারা দেখে থম্‌কে যায়। বলে—তোর কী হয়েছে, সরলা? কাঁদছিস কেন?

সরলা বলে—এই মাত্র পার্ট ক'রে আসছি। আমার যে কাঁদবারই পার্ট।

মুখে ঠুন্‌কো হাসি ফুটোবার চেষ্টা ক'রে বলে—সেই তখন থেকেই কাঁদছি। নিজে কেঁদে পরকে কাঁদাবো—তাই বড়ো শক্ত রে। হ্যাঁ রে ভুতি, আমার কাছে কেউ আসেনি· ঢ্যাঙাপানা ফর্সাপানা একটি ছেলে, গায়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি? আসেনি? কেউ না?

সরলা ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে-বলে—তবে যাই ফের থেটার-বাড়ি। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তার সঙ্গেই আমার পার্ট। তাকে কোথাও না দেখে সবাই ভারি ভড়কে গেছে। কোথায় যে গেল!

ব'লে সরলা ফের বেরিয়ে পড়লো থিয়েটার-বাড়ির দিকে।

ভুতি বললে—আমাদের পাশ কই সরলা?

সরলা বলতে-বলতে গেল: দরজায় গিয়ে আমার নাম করলেই ছেড়ে দেবে—ভাবিস্‌নে।

সেখানে গিয়ে ফের নিমাইর খোঁজ নিলে—কেউ কিছু জানে না। কিন্তু কারু মুখে লেশমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। স্বয়ং রমেশবাবুও হাসিমুখে গল্পগুজব করতে-করতে তদারক ক'রে বেড়াচ্ছে—সরলার দিকে চেয়েও দেখছে না।

ঠিক উচিত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হিরণকুমার মালতীর অপমান সইতে পারেনি, তার দণ্ড দিয়ে গেছে।

একজন বললে—নিমাই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়িতে-বাড়িতে উঁচু ক্লাসের টিকিট বেচতে গেছে।

টিকিট বেচতে গেছে? অসম্ভব!

অসম্ভবই বা কেন? হয়ত এই অন্যায় পরিবর্তনের খবর এখনো নিমাইর কানে ওঠেনি। তাই সরলার অভিনয় সবাইকে দেখাবার জন্য টিকিট বেচতে নিমাইর এত আগ্রহ! নইলে নিজে গা ক'রে টিকিট বেচবার মতো ছেলেই নয় সে।

সরলা যেন নিমাইর মনের সমস্ত গলি-ঘুঁজি চিনে ফেলেছে।

চললো ফের শহরের দিকে। যদি রাস্তায় দেখা হয়।

ক্ষুধায় শরীর টা টা করছে—সরলার হুঁস নেই। ও এই অবিচারের প্রতিবিধান চায়—যে তার প্রেমিক, যে তার সর্বস্ব—তার কাছে।

কোথাও নিমাইর দেখা নেই। যদি গেলই, সরলাকে কেন সঙ্গে নিয়ে গেল না?

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই হরি আর তার মা সরলাদের বাড়ি এসেছে।

হরি বললে—আমাদের জন্য পাশ রেখে গেছে, ভুতি-দি?

হরি নতুন জামা-কাপড় প'রে এসেছে, হাতে একটা খেলনা রিষ্ট-ওয়াচ বাঁধা, মাথায় দিব্যি টেরি বাগানো। হরির মা-ও কাপড় কেচে শুকিয়ে প'রে এসেছে।

ভুতি বললে—পাশ রেখে যায়নি। বলেছে, টিকিট নিতে দরজায় যে থাকবে তাকে সরলার নাম করলেই বসবার জায়গা ক'রে দেবে।

হরি ব্যস্ত হ'য়ে বললে—তবে আগে-ভাগে চলো, ভুতি-দি, জায়গা পাওয়া যাবে না। বেজায় ভিড় হ'য়ে যাবে। আর কাপড় বাছতে হ'বে না, একখানা এমনি প'রে চলো।

ভুতি ধমক দিয়ে উঠলো: এখনো আরম্ভ হ'তে দু' ঘণ্টা বাকি—

ভুতিও তার সাধ্যমতো সেজে নিলো। তিন জনে বেরিয়ে পড়লো—হরি আগে আগে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাত দুলিয়ে-দুলিয়ে। পথ ঘাট ওর নখদর্পণে।

দারুণ সোর-গোল—লোকে গিসগিস করছে। বগলাবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক রূপেও সফল হয়নি। হরি বললে—বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে, ভুতি-দি। জায়গা পেলে হয়। মেয়েমানুষগুলো চলতেই পারে না, কাপড় পরতেই তিন ঘণ্টা।

থিয়েটার আরম্ভ হ'তে এখনো কিছু দেরি আছে। হরি দরজার সামনের লোকটিকে গিয়ে গম্ভীরভাবে বেমালুম বললে—সরলা-দিকে ডেকে দাও ত?

লোকটি বললে—কে সরলা-দি ?

হরি অবাক হবার ভান ক'রে বললে—কে সরলা-দি ? বাঃ—তুমি নতুন লোক বুঝি ? সরলা-দি, যে য়্যাক্টো করছে, কাগজে-কাগজে যার ছবি উঠেছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সেই যে একটা মরা মানুষ খুন করতে ছুরি নিয়ে ছুটেছে—সেই সরলা-দি !

ভুতি বুঝিয়ে বলে : এই নাটকে মালতীর পার্ট নিয়ে যে নামবে আজ।

লোকটি বিরক্ত হ'য়ে বললে—সরলা-ফরলা ব'লে এখানে কেউ নেই। মালতীর পার্টে যে নামছে তার নাম চমৎকারিণী দাসী—সরলা আবার কে ?

—বাঃ, আমাদের বলেছে গেটে এসে তার নাম বললেই আমাদের ছেড়ে দেবে, ভেতরে জায়গা ক'রে দেবে —তার নাম সবাইর মুখে-মুখে !

লোকটি বললে—তোমাদের সরলা-দিটি ভারি সৌখীন দেখছি। যাও, জায়গা ছাড়, অন্য লোকদের পথ ক'রে দাও।

হরি বিমর্ষ হ'য়ে বললে -ঢুকতে দেবে না ? দেখ না ভেতরে গিয়ে, সরলা-দি ব'সে আছে, হয়ত সাজছে। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, ভদ্রলোক, আমাদের ছেড়ে দাও।

ভদ্রলোক কথা গ্রাহ্য করে না।

ও দিকে ঘণ্টা পড়ে, সিন ওঠে, য়্যাক্টিং সুরু হয়।

হরি এবার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। হরির মা বলে—কি দারুণ মিথ্যুক এই ছুঁচো হারামজাদি—কি ভীষণ চালবাজ ! এ যে জাঁহাবাজ ডাকাত বাবা—একে পুলিশে দিতে হয়।

ভুতি দুম দুম ক'রে পা ফেলতে-ফেলতে বলে—ফিরুক ও বাড়ি। ওর দেমাক আমি ভাঙছি অটলবাবুকে দিয়ে।

হরি কিছুতেই আসবে না, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে ও কি দেখছে ওই জানে। মা যত টানে ও ততই বেড়া আঁকড়ে থাকে। শেষে মা'র হাতের চার পাঁচটা কিল খেয়ে হরি হেরে যায়। হরির চীৎকারে বাইরের অন্ধকার বিদীর্ণ হ'তে থাকে।

সরলা আরেক প্রতিবেশিনীর ঘরে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, যখন ঘুম ভাঙে তখন থিয়েটার আরম্ভ হবার সময় কাবার হ'য়ে গেছে।

নিশ্চয়ই এখনো নিমাই ফেরেনি—রমেশবাবুর উদ্বেগ অশান্তির আর সীমা নেই। চমৎকারিণী খুব জব্দ হয়েছে। কৃতার্থের ফুটুনি ঘুচেছে। খুব মজা ! নিশ্চয়ই থিয়েটার

আর হয়নি, লোকেরা খুব গালাগাল করছে, রমেশবাবুকে বাধ্য হ'য়ে পয়সা ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

মজা দেখতেই হয়ত সরলা ও দিকে পা চালালো। কিন্তু একটু কাছে আসতেই ওর সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে ভারি শীত করতে লাগলো—এত শীতেও পিপাসায় গলা কাঠ হ'য়ে এলো। দূরে ডে-লাইট দেখা যাচ্ছে। থিয়েটার হচ্ছে বৈ কি!

সরলা গেল এগিয়ে। ওর দম বন্ধ হ'য়ে আসছে।

ছুটে গিয়ে দরজার লোকটিকে বললে—নিমাইবাবু এসেছেন?

—সে কখন—

—তাঁকে একটু ডেকে দিতে পারেন?

...বাঃ, এই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হচ্ছে। উনি য়্যাক্ট করছেন যে—

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য! সরলার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগলো। সমস্ত দৃশ্যটি সরলার মুখস্থ! সেই সব কথাগুলি নিমাইকে আবার চমৎকারিণী বলছে—সরলা যা বলেছিল আগে! কণ্ঠস্বরে সেই আবেগ, স্পর্শে সেই উত্তাপ! তার মনের কথাগুলি যা বইয়ের আখরে সরলার অজানতে প্রকাশ পেয়েছিল তা চমৎকারিণীর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে!

তবু নিমাই বলেছিল—তোমাকে পেয়ে সরলা, আমার মনে ভাবের জোয়ার আসে, তোমাকে না নামালে আমি ওদের ডুবিয়ে মারবো।

ঈর্ষায় অভিমানে অপমানে কেঁদে সরলা ধূলার সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

কানে কিছুই আসে না বটে, কিন্তু সরলা চোখের সামনে সমস্ত হাব-ভাব আঁকা দেখতে পায়। সেই মোটা বেঁটে চমৎকারিণী তার মৃত নিমাইকে কোলে নিয়ে আদর করবে ভেবে সরলা নিজে নিজের চুল ছেঁড়ে, হাত কামড়ায়, কপালে করাঘাত করে।

ইচ্ছা করে একটা ক্ষুধিত আর্তনাদের মতো ষ্টেজের ওপর গিয়ে ফেটে পড়ে। বিকট চীৎকার ক'রে অভিনয়ের সমস্ত সজ্জা ঢেকে দেয়।

ক্ষুধায় সমস্ত গা অবশ— নিমাইর খোঁজে হেঁটে-হেঁটে পা একেবারে ভেঙে পড়তে চাইছে।

আস্তে-আস্তে থিয়েটার ভেঙে যায়। কোলাহল ক'রতে-ক'রতে লোক স'রে পড়তে থাকে। ততক্ষণ সরলা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। সবাই চমৎকারিণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে বাড়ি ফেরে। প্রত্যেকটি কথা সরলার কানে আসে।

—খুনের সিনটা কি রকম করলে! ওয়াণ্ডারফুল!

—কি সুন্দর! অথচ কি ভীষণ! ভয় লাগে, ভালোও লাগে। পয়সা সার্থক, ভাই।

সরলা আর বসে না, বাড়ি চলে। চলতে আর পারে না। কেঁদে-কেঁদে মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে।

নিঃঝুম পাড়া সবাই ঘুমিয়েছে। ভুতিও হয়ত। সদর খোলা ছিল।

ওর ঘরে এসে দেখে মিটমিট আলো জ্বলছে। ভেতরে অটল একা ব'সে মদ খাচ্ছে। সরলার সমস্ত শরীর কালিয়ে এলো।

অটল তখনো বেহুঁস হ'য়ে পড়েনি, সরলাকে দেখেই ওর রক্ত ফুটে উঠলো। হাতের মুঠিতে ধরা ছিল মদের গ্লাশটা, তাই মারলো ছুঁড়ে সরলার মাথা লক্ষ্য ক'রে।

বললে শালির আমার থেটার করা হচ্ছে—তিন দিন ধরে ঘুরে-ঘুরে আমি হায়রান হ'য়ে পড়েছি—

সরলা 'বাবা গো' ব'লে ঘুরে পড়লো। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে।

এতেও অটলের তৃপ্তি হয় না, জুতোটা দিয়ে সরলার পিঠের খাল ছিঁড়ে দেয়। বলে বলে কি না থেটারের দলে ভিড়ে যাবো···মদের দাম দেবে না, রাত্তির বেলা বাড়ি আসার নাম নেই···

বলে, আর লাথি-জুতো চলতে থাকে।

সরলা অটলের পায়ের নিচে প'ড়ে একেবারে ভেঙে গেছে। বাড়িউলি প্রথম মনে-মনে মজা দেখে, পরে অটলকে থামাতে আসে। ভুতিই মাথায় ব্যাণ্ডেজ ক'রে দেয়।

ভোরবেলা সরলার যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন সারা গায়ে বিষম ব্যথা, জ্বর, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে যেন সারা বছর ও কিছু খায়নি। পায়ের কাছের জানলা দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছে।

এত দুঃখেও ওর স্বপ্ন কাটেনি! ভোরের আলোয় মনে হচ্ছে যেন ওর কাছে ওর হিরণকুমার আসছে—মাথায় তার সোনার মুকুট, তাতে পাখীর পালক গোঁজা।

কৈশোরক

দ্রষ্টব্য : এই পর্বে অচিন্ত্যকুমারের প্রাথমিক যে সকল রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, অথচ পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়নি, সেই সকল রচনাবলী ক্রমশ সংযোজিত হবে।

গুমোট

ভাঙা ধ্বসে-পড়া একটা একতলা বাড়ীতে গরীব এক কেরাণী আর তার মমতাময়ী প্রিয়া একটি সুন্দর খোকাকে ঘিরে আনন্দ-জাল বয়ন করত আর তাদের ছোট দুটি হৃদয়-পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করত।

কিন্তু একদিন মেঘলা আকাশের কালো গুমোট তাদের খুশীভরা জীবনের ওপর ছায়া ফেললে।

খুনশুটি তাদের প্রায়ই হয়, অভিমানে তাদের হাসি-কান্না দিয়ে তারা নব-নব প্রেমের খেলা আবিষ্কার করে। ছেলেটি হয়ত মেয়েটির ঘোমটা খুলে ফেলে চুলের খোঁপার হালকা বাঁধুনিটা এলো ক'রে সারা মুখে কালো চুলগুলি ছড়িয়ে দেয়, মেয়েটি 'যাও' বলে অভিমান করে আর কখন খিক্ ক'রে হেসে ফেলে।...

ছেলেটি হয়ত পড়ছে, মেয়েটি কাছে দাঁড়িয়ে নানান কথা কইছে, আর কথা কইবার ফাঁকে-ফাঁকে একটা দড়ি দিয়ে ছেলেটির পাঞ্জাবির সঙ্গে চেয়ারের পায়াটা বেঁধে দিচ্ছে। ছেলেটি মেয়েটির কথার মধুপান করতে করতে এত মশগুল যে কিছুই টের পাচ্ছে না। মেয়েটি পাৎলা রাঙা দুটি ঠোঁটের আড়ালে একটি দুষ্ট হাসি চেপে রেখে চলে যায়, ছেলেটি প'ড়েই চলে।

পড়া সাঙ্গ ক'রে হঠাৎ তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ে যায়, মেয়েটি ঝর্ণার মত খিল খিল ক'রে হাসে, ছেলেটিও অপ্রতিভ হয়ে দড়ির বাঁধন খুলে মেয়েটিকে ধরে, তার লাল গালে আস্তে দুটি চড় ও পিঠে ছোট্ট মিষ্টি একটি কিল মারে, মেয়েটি হাততালি দিয়ে হাসে ও অবশেষে একটি মধুর চুমায় এই অভিনয়টির শেষ হয়।

কোনোদিন বৃষ্টি নেমে আসে সারা আকাশ অন্ধকার ক'রে, শিল পড়ে, মেয়েটি তার ক্ষীণ কটিতে আঁচলটা বেঁধে চুলগুলি ঝুঁটি ক'রে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে শিল কুড়োতে উঠোনে ছুটে আসে, জলে ভিজার আনন্দে দুজনে মাতাল হয়ে শিল কুড়োয়, চেঁচামেচি করে; আর ওপরে জানলায় দেড় বছরের ছোট খোকাটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাবা-মা'র কাণ্ড দেখে আর নব-নব অর্থহীন অস্ফুট কথায় আনন্দ জানায়।

খোকাকে একটা চেয়ারে দাঁড় করিয়ে দুজনে হাত বাড়িয়ে সামনে দাঁড়ায়। মা বলে—আমার কোলে, বাবা বলে—আমার কোলে।

দুষ্ট খোকা চেয়ারটিতে তার ছোট-ছোট পা ফেলে নাচে, কারো কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে না, তারপর মা-বাবা দুজনেই খোকাকে জড়িয়ে ধ'রে তাকে চুমায়

আচ্ছন্ন ক'রে দেয়, খোকা ব্যাচারী ভারী বিব্রত হয়ে পড়ে। খোকাকে চুমু দেবার ফাঁকে ছল ক'রে নিজেদের মধ্যেও একটু বিনিময় হয়। শ্বশুর ভাসুরহীন এই দূর প্রবাসে একা-একা এই দুটি ছেলে মেয়ে খুশির হাট খুলে সারা দিন-রাত বেচাকেনা করে আর দিনের পর দিন কাটায়।

কি একটা পর্ব উপলক্ষে সেদিন অফিস সকালেই ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢুকে দেখে মেয়েটি মেঝের উপুর হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চোদ্দ লাইন মিলিয়ে-মিলিয়ে কবিতা লিখছে! মেয়েটি কল্পনায় এত দিলভোল ছিল, ছেলেটি যে ঘরে ঢুকে উঁকি মেরে তার কবিতায় খানিকটা দেখছে তা টেরই পেলে না। ছেলেটি তাড়াতাড়ি নীচু হ'য়ে বললে, বেশ কবিতা লিখছ ত! মেয়েটি অত্যন্ত লজ্জায় উঠে বসে তাড়াতাড়ি কাগজটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললে। ছেলেটি অনেক সাধাসাধি করতে লাগল লেখাটা দেখ'তে, মেয়েটি কিছুতেই রাজী হ'ল না। ছেলেটি অত্যন্ত রাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ ক'রে বললে, ভারী তো বিদ্যে, তা আবার কবিতা লেখা হচ্ছে!

মেয়েটি অভিমানে সারা মুখখানি রাঙা ক'রে বললে, আচ্ছা বেশ, আমার ছাই লেখাই ভালো! বলে কাগজটা বা'র ক'রে তক্ষুণিই টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে রাগ ক'রে খোকাকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

সামান্য একটি ঘটনা, তারপর থেকে এই দুটি স্বামী-স্ত্রী কথা বন্ধ ক'রে আছে আজ পাঁচ দিন। কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, তবুও ঠিক তেমনি নির্বিবাদে সংসারের কাজ চুকে যায়। এই অতল অভিমানের মধ্যেও তাদের খেলা চলে। দিনের মধ্যে তারা চোখে চোখ মিলাতে ভয় করে, কেউ কারুর কাছে এক মিনিটের জন্যও বসে না।

রাতে ছেলেটি একলা তক্তপোষের ওপর ঘুমিয়ে পড়লে মেয়েটি মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে শোয়, মাঝরাতে ছেলেটি উঠে ঠাণ্ডা লাগবে ব'লে খোকাকে নিজের কাছে তুলে নেয়, আর একটা কাঁথা মেয়েটির গায়ে বিছিয়ে দিয়ে খোকাকে বুকে নিয়ে ঘুমায়। কেউ কারু সঙ্গে কথা না কইলেও খোকাকে উপলক্ষ ক'রে তারা কথার খেলা করে। ছেলেটি খোকাকে কোলে নিয়ে সুর করে পদ্য মেলায়—

মুখটি যেন হাঁ-ড়ী,
চলল বাপের বা-ড়ী,
পুড়ি রাগের ঝাঁ-জে,
পদ্য মেলে না-যে!

মেয়েটি আবার তখুনি খোকাকে কোলে ক'রে তেমনি সুরে বলে—

খেয়ে দুটি ভা-ত
সকাল থেকে রা-ত
যেজন কলম পি-ষে,
পদ্য জানে কি সে ?

সকাল বেলায় ছেলেটির কাছে মেয়েটি একটা সিকি কি আধুলি ছুঁড়ে দেয়, ছেলেটি পয়সাটা কুড়িয়ে একটা ধামা নিয়ে বাজার করতে যায়, বাজার ক'রে এনে ধামাসুদ্ধ সমস্ত মাছ তরকারী রান্নাঘরে মেয়েটির কাছে ঢেলে দিয়ে আসে, মেয়েটি অল্প একটু হেসে ছড়ানো জিনিসগুলি গুছোতে থাকে।

রবিবারের দুপহর। ছেলেটি চেয়ারে হেলান দিয়ে একখানি বাংলা উপন্যাস পড়ছে, আর মেয়েটি ঘরে খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছে মুখে-মুখে ছড়া বানিয়ে, ছেলেটি একমনে সেই সব শুনছে ও মনে-মনে ভারী খুশি হচ্ছে। মেয়েটি বলছে মিষ্টি স্বরে—

খোকা এখন ঘুমো,
চোখের পাতায় চুমো !
খোকন আমার মাণিক,
নীল আকাশের খানিক !
খোকন আমার সোনা,
কপাল চাঁদের কোণা !

তারপর আবার সুর-ফের্তায় গাইছে—

টুলটুলে তোর মিশমিশে চোখ
তুলতুলে তোর গাল,
কোন্ পটুয়া আঁকল ঠোঁটে
ভোরের মেঘের লাল !

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ ক'রে কড়া নড়ে উঠল, ছেলেটি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই দেখতে পেলে তাদের বাড়ীর সামনে একটি গাড়ী দাঁড়িয়ে, ও একটি সুবেশা তরুণী প্রফুল্ল মুখে দাঁড়িয়ে বাড়ীর চেহারা দেখছেন। ছেলেটিকে দেখেই তরুণী একটু হেসে বললে, চিনতে পাচ্ছেন না ?

ছেলেটি বললে, হাঁ পাচ্ছি বৈকি, আসুন। কোত্থেকে ?

তরুণী বললে, কলকাতা এসেছিলুম বোনের বাড়ী, এখুনিই পাঁচটার ট্রেনে যেতে হবে আবার। তা পাপড়ি আছে তো এখানে ? না, বাপের বাড়ী ?

ছেলেটি বললে, আছে আসুন। বলেই একছুটে মেয়েটির কাছে এসে হাজির হয়ে তাড়াতাড়ি বললে ওগো তোমার সই এসেছে।

কে সই ? ব'লে মেয়েটি চমকে সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে চলল। এগিয়ে দেখে পাপড়ি ! খুব প্রফুল্ল হয়ে মেয়েটি তরুণীটির হাত ধরে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে বসাল আর ছেলেটি তরুণীটির ঠাকুরপোর সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে গল্প-গুজব করতে লাগল।

এই সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণীটির সঙ্গে মেয়েটির আলাপ ও ভাব হয় সেবার ট্রেনে কলকাতা আসবার সময়। ভাব এতদূর গড়ায় যে, তারা সই পাতিয়ে বসে 'পাপড়ি'।

প্রায় এক বছর পরে তরুণীটির সঙ্গে তার দেখা। তাদের এই নগণ্য নোংরা ভাঙা বাড়ীতে এই ধনীর গৃহিনীটির যথেষ্ট অভ্যর্থনা হচ্ছে না বলে মেয়েটি ভারী পীড়িত হচ্ছিল, তবুও তার স্নেহ, সেবা ও হাসি দিয়ে সমস্ত বজায় রাখছিল সে। খানিকক্ষণ আলাপ ক'রে, খোকার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে চুমু খেয়ে, মেয়েটির ভরন্ত গালদুটো একবার টিপে দিয়ে তরুণী বললে—এবার উঠি, উনি একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। আজ পাঁচটার ট্রেন ধরতে না পারলে একেবারে সর্বনাশ। এবার থেকে চিঠি লিখো কিন্তু—

তরুণী উঠতে যাচ্ছে দেখে মেয়েটি বললে, বা মিষ্টিমুখ ক'রে যাবে না বুঝি ?

তরুণী 'না-না' বলে আপত্তি জানালেও মেয়েটি মানা মানলে না।

চাবির রিঙ ও চুড়ীর আওয়াজ শুনে ছেলেটি বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটি একটি টাকা ছেলেটির হাতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, কিছু খাবার কিনে নিয়ে এস। ছেলেটি তক্ষুণিই খাবার কিনতে ছুটল।

খাবার কিনে এসে ছেলেটি ডাকলে—খোকা—

মেয়েটি বেরিয়ে এসে খাবারের ঠোঙাটি হাত থেকে নিয়ে বললে, পাপড়ি নাকি মিষ্টি খায় না, তুমি কিছু কমলানেবু কিনে আন ! নেবু না পেলে একটা লেমেনেড্ নিয়ে এস।

ছেলেটি তক্ষুণি নেবু আনতে ছুটল।

নেবু নিয়ে এলে মেয়েটি একখানি সাজানো থালা তার হাতে দিয়ে বললে এখানা বাইরে ঠাকুরপোকে দিয়ে এস। আমি নেবু নিয়ে যাচ্ছি।

দোরের গোড়া পর্যন্ত এসে মেয়েটি তরুণীকে বিদায় দিলে, তরুণী গাড়ীতে গিয়ে উঠল রাঙা মুখ বাড়িয়ে বললে চিঠি লিখো কিন্তু এবার ; আর ছুটি হলে পুজোর, ওঁকে নিয়ে আমাদের ওখানে একবার বেড়িয়ে এস।

গাড়ীটা চলে গেল।

মেয়েটি সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে দেখলে বাড়ীতে আবার তেমনিই একটি নীরব আনন্দে কাঁপছে, কে যেন এসে দমকার মত সমস্ত গুমোট উড়িয়ে দিয়ে গেল !

তাদের কথা কওয়া যে এমনভাবে সুরু হবে, এ-কথা মেয়েটি কোনোদিন ভাবেনি। এতদিনের চুপ ক'রে থাকার পর এখন সে ছেলেটির কাছে কেমন ক'রে যে এগোবে ভেবে পাচ্ছিল না, একটি আনন্দময় লজ্জায় তার সমস্ত গতিটি নিথর হয়ে পড়েছে।

ছেলেটি উৎসুক হয়ে মেয়েটির প্রতীক্ষা করছে ঘরে বসে কিন্তু মেয়েটি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তাকে এই লজ্জা থেকে কে বাঁচায়। কি ক'রে সে তার মুখের পানে চাইবে তারপর?—

সে আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল তার সমস্তটি দেহ হাসির রঙে ছুপিয়ে, তার পরিপূর্ণ চোখে ঠোঁটের টানে গালের কাঁপনে হাতের তালে বুকের দোলায় সবখান থেকে হাসি ঝরে পড়ছিল।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এসে হেসে তার হাসিটিকে অভ্যর্থনা ক'রে মেয়েটির দুটি হাত কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে তার সমস্ত গুমোট মুছে দিল—অনির্বচনীয় আনন্দভরা ছোট্ট একটি—

নায়ক-নায়িকা

একটা চমৎকার গল্পের প্লট্ পাওয়া গেচে।···দিশেহারা হয়ে গল্পের নায়ক-নায়িকার নাম খুঁজচি, কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে একটা আনকোরা একেবারে নূতন কবিত্বময় নাম কিছুতেই আসচে না।···

রাত তখন বারোটা প্রায় হয়ে এল, কেবল ভাবচি, মনোমত নাম কিছুতেই মিলচে না, এ যেন তীর্থ-কাকের মতন ধর্ণা দিয়ে প'ড়ে থাকা!

হঠাৎ আমার মনে হ'ল আমার খোলা জানলার সুমুখে কে একটা কালো বলিষ্ঠ লোক অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে পরুষ কণ্ঠে বললে - আমাকে তোমার গল্পের নায়ক করো!

আমি আঁৎকে উঠলাম—তোমাকে নায়ক করব? কি তোমার নাম?

লোকটা দৃঢ় কণ্ঠে বললে-- বামাচরণ।

—বামাচরণ? আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম।

লোকটা কঠিনভাবে জানলার শিকটা ধ'রে বললে—কেন? আমার নাম তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তোমার উপন্যাসের নায়ক হবার যোগ্যতা কি আমার একটুও নেই? চিরকালই তুমি আমাকে কেবল চাকর, দরোয়ান, বাজার-সরকার

আর দেওয়ান করবে ? কেন, আমাকে নায়ক করলে তোমার উপন্যাসের কাটতি কি অনেক ক'মে যায় ?

আমি লোকটার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলুম।

লোকটা বললে— আমার জন্যে কেবল রেখেছ হুঁকো আর গাঁজা। কেন, আমি কি ভালোবাসতে পারি না ? আমার প্রেমের উপাখ্যান কি তোমার গল্পের খাতায় লেখা যায় না, না, আমার প্রেমটা এতই খেলো আর বাজে, যে তার মূল্য একটুও নেই ? আমি বি. এ -এম. এ. পাশ করি না, প্যাঁসনে চশমা পরি না, সিগারেট খাই না, টেড়ী কাটি না, বাঁশী বাজাই না, মার্কেটে ঘুরি না—তাই কি আমি নায়ক হবার যোগ্য নই ? আমার নাম বামাচরণ এই কি আমার চরম অপরাধ ?

আমি হাসি চেপে বললুম— কিন্তু তোমার সঙ্গে নায়িকা হবে কে ?

লোকটা হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাকতে লাগল। খানিকবাদে একটি অদ্ভুত স্থূলতনু কালো রমণী তার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথার চুলগুলি টেনে ক'ষে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, কপাল ও চুলগুলি দুর্গন্ধ তেলে চপ্‌চপ্ করচে, নাকে সুদর্শন-চক্রের মতো একটা নৎ, দু-কানে প্রায় গোটা কুড়ি মাকড়ি, দাঁতে অমাবস্যা-রাতের মতন মিশি মাখানো, গলায় একটা লোহার হাঁসুলি, পরনে একটা লাল পাছা-পেড়ে শাড়ী তাতে চ্যাপমা হলুদের দাগ লাগানো, দু-পায়ে দুটো রুপোর মল—বয়স এই ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

রমণী স্থির কণ্ঠে বললে - আমি তোমার গল্পের নায়িকা হব।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললুম— তোমার নাম কি ?

মেয়েটি বললে আমার নাম ? আমার নাম··· । হাসতে হাসতে পেটে খিল পড়ল। জগদম্বা ? তাহলেই হয়েছে ! হাঃ হাঃ হাঃ।

রমণী বিরক্ত হয়ে বললে—আমার এই চেহারায় ও নামে কিছুতেই তোমার উপন্যাসের নায়িকা হতে পারব না ? লেখা, পাপড়ি, যূথিকা, হাস্নাহানা—এমনি ঢং-করা বিবিয়ানার নামই তোমার পছন্দ হয়, এমন ঠাকুর-দেবতার নাম মনে ধরে না ? আমি আনারসী-বারানসী শাড়ী পড়ি না, এলানো চুলে ফাঁসগেরো দিয়ে কান ঢেকে চুল বাঁধি না, উচু হীল-ওয়ালা জুতো প'রে দুলতে-দুলতে চলি না ও আছাড় খাই না, পুডিং কাটলেট্ রাঁধতে পারি না, তাই কি আমি তোমার নায়িকা হবার অযোগ্য ? আমার এ কালো বুকে তোমার গল্পের সুন্দরী শিক্ষিতা নারীর মতনই প্রেম জাগে না, কবিতা উথলে ওঠে না ?

আমার হাসির মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

দেখি বামাচরণ আর জগদম্বা খোলা জানলাটা পেরিয়ে আমার ঘরে এসে

ঢুকল। কি করবে রে বাবা! ঐ শক্ত কালো দু-হাতে দু-গালে দু-চাটি বসিয়ে দেবে না তো? না না ওগো, তোমাদেরই আমি গল্পের নায়ক-নায়িকা করব।...

আমার ঘরের দেওয়ালের এক নিরালা কোণে রাধা-কৃষ্ণের যামিনী-মিলনের একটি বর্ণ-বহুল সুন্দর ছবি ছিল। কিন্তু তার ওপর আমার কোনো মোহ বা আকর্ষণ ছিল না, হয়ত আমার আধুনিক রুচির সঙ্গে এই ছবিটা একটুও খাপ খেত না ব'লে। দেখি, বামাচরণ আর জগদম্বা বেশী কিছু নামসুলভ উপদ্রব না ক'রে ধীরে-ধীরে সেই ছবিটার মধ্যে লীন হয়ে গেল।...

যাঃ, কি এতক্ষণ বাজে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিলাম! মনে-মনে খানিকক্ষণ হাসলুম। গল্পলেখা আর এগোলই না। আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

মাঝরাতে মনে হ'ল সেই ছবির কৃষ্ণ সেই কদমশয়ন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাধাকে বললে—চল, এই কারাগার থেকে মুক্তি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি! এই তরুণ কবি দিনান্তেও আমাদের মুখের পানে চোখ তুলে চায় না, আমরা যে গোপনে এখানে ভালোবাসার অভিনয় করচি তার একটুও মর্ম গ্রহণ করতে পারে না, তার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার নাম খুঁজে মরে; আর, আমরা যে তার বুকের আগারে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্চি, এত নিকটে থাকি, আমাদের কথা সে একটুও ভাবে না, অতি-পুরোনো ব'লে সে আমাদের অবহেলা করে ফেলে দ্যায়! চল, আমরা এই ভণ্ড পূজারীর মন্দির থেকে বেরিয়ে যাই।

ব'লে কৃষ্ণ তার বাঁশী তুলে নিলে, আর রাধিকা তার অগোছাল কেশ-বাস বিন্যস্ত ক'রে কৃষ্ণের পাশে-পাশে চলতে লাগল মেঘের পথে-পথে চাঁদনী আলোর স্নিগ্ধ রূপার দেশে!

কৃষ্ণ ঘাড় হেলিয়ে বাঁশী বাজাচ্চে আকুল করা সুরে, আর রাধিকা তার বাঁ হাতের ভঙ্গিমাটিকে বেঁকিয়ে কৃষ্ণের গ্রীবাটি বেষ্টন ক'রে চলেচে ভাষাহীন আনন্দ-ছন্দে!

কতদূর এগিয়ে গেলে মনে হ'ল—ওরা যেন সেই গোকুলের কৃষ্ণ-রাধা নয়, আমাদেরই পাড়ার পচা বস্তির বামাচরণ আর জগদম্বা, অনন্ত অভিসারের পথে নূতন রূপ নিয়ে সত্যিকারের প্রণয়ী-প্রণয়িণী, চিরযুগের কবির কল্পনার নায়ক-নায়িকার যুগল-মূর্তি!

"পারে যাবার আর কে আছে ?"

প্রকাণ্ড জাহাজটার মধ্যে চূড়ান্ত গোলমাল চলেছে।

গোপন অশ্রু, উচ্ছল কলহ স্থ, উত্তপ্ত স্পর্শ-বিনিময়, চিঠি দেবার প্রতিজ্ঞা, ব্যস্ত সারেঙ্ ও খালাসী, দেরী-হয়ে-উদ্বিগ্ন যাত্রীদল।

জনতা থেকে একটু দূরে একটি প্রত্যক্ষগোচর নির্জনতায় জাহাজের রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে একটি পুরুষ ও নারী পারের দিকে চেয়ে ছিল, যেখানে পঙ্কিল পিছল ঘাটের ওপর পাতলা বাদল টিপ্ টিপ্ ক'রে ঝ'রে পড়ছে।

খুব সুখকর দৃশ্য সেটি নয়। এও সম্ভবতঃ খুব আশ্চর্য নয় যে মেয়েটি সর্বাঙ্গ ঢাকা প্রকাণ্ড গরম জামাটা গায়ে দিয়েও ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল পারের দিকে চেয়ে।

"শীত করছে, নোরা ?" ছেলেটির হাত একমুহূর্তের জন্য মেয়েটির হাতখানি স্পর্শ করল।

"বাতাসটা যেন বিঁধছে," মেয়েটি বললে—"কিন্তু আমি ঠাণ্ডা লাগার কথা ভাবছি না।"

মেয়েটি দাঁত দিয়ে তার নীচের ঠোঁট চেপে ধরল। ছেলেটি তার পানে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল : সে জানত, নোরা তার মেয়ের কথা ভাবছে। ঐ ক্ষুদ্র শিশুটিই তাদের মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীটা অসভ্য মাতাল, সে ত অনেক দিনই গ্রামের বাইরে চ'লে গেছে, শুধু সেই এক রত্তি জুইফুলের মতো টাটকা খুকীটিই তার জীবনের এই পাঁচ বছর ধ'রে ছেলেটির প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অথচ দুরতিক্রম্য বাধা বিস্তার করেছিল।

কিন্তু এখন একান্ত হতাশ ও নিরুপায় হয়ে নোরা ছেলেটির সঙ্গে চ'লে যাওয়ার অনুরোধে সম্মত হয়েছে। ছোট ছেলে যেমন প্রজাপতির পাখায় হাত রাখে, এমনি ক'রে আত আলগোছে ছেলেটি যখন আনন্দকে স্পর্শ করতে পারছে, তখন কি না নোরা তার কথা না-ভেবে অন্য পুরুষের উপহারদত্ত বঞ্চিত রিক্ত নিঃসম্বল সন্তানের কথা ভাবছে !

প্রচণ্ড ঈর্ষা তাকে গ্রাস করছিল, ক্রোধ এত তপ্ত হয়ে উঠেছিল যে মুখ দিয়ে তার কথা বেরুল না। নোরা তার এই নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করেনি। সে রেলিঙে ভর দিয়ে তন্ময় হয়ে ঘাটের ভিজা শীতল বৃষ্টি-ঝলমল পাথরগুলির পানে চেয়ে রইল।

ঝির ঝির ঝির—বাদল:চলেছে। যেন তার কাছে ছুটে আসবার জন্য কার দুটি অস্ফুট পদশব্দ !

সে কান্নায় ফুঁপে উঠল; নীল ঘোমটার অন্তরালে তার মুখখানি চোখের জলে ভিজে গেছে। তার পার্শ্বের এই লোকটিকে একমুহূর্তে একান্ত মূল্যহীন ব'লে মনে হ'ল। তার দুটি বাহু পরম ঔৎসুক্যে কামনা করছিল একটি সুকোমল শাদা ও গোলাপী জামা পরা ক্ষুদে টুকটুকে দেহ, দুটি তুলতুলে পা ও একটি সুডৌল মাথাভরা সোনালি চুলের ঢেউ! এই লোকটিকে মনে হচ্ছিল বিদেশী—অপরিচিত। কিন্তু সে যে তার দেহের মাংস, বুকের হাড়! যৌবনের সমস্ত সুগন্ধ দিয়ে যে সে তাকে রচনা করেছে! অনাগত সুদূরবিস্তৃত ভবিষ্যতে তার কি হবে? যে মা তাকে নির্দয় অনাত্মীয়দের হাতে ফেলে চ'লে গেল সে মাকে কি ও ঘৃণা করবে না?

ঝির্ ঝির্ ঝির্—বাদল সমান তালে ঝ'রে চলেছে।

ওগো, কে যেন অস্ফুট পদধ্বনি তুলে তার কাছে ছুটে আসতে চায়!

কোথা থেকে একটা জলচর পাখী চেঁচাতে সুরু করেছে। কাছের থেকে একটা লোক তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচাচ্ছিল—"পারে যাবার আর কে আছে?"

আবার চাঞ্চল্য সুরু হ'ল। ঘাটের কাছে ভিজা ছাতার তলায় আশ্রয় নেবার জন্ত সবাই ছুটাছুটি ক'রে বেরুতে লাগল। ম্লান মেঘলা আকাশের দিকে লক্ষ্য করে এখানে সেখানে কয়েকটি রুমাল উড়তে লেগেছে যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের পাপড়ি!

এবার জাহাজ ছাড়বে। পাশের ছেলেটি তাড়াতাড়ি তার বাহু দিয়ে মেয়েটিকে বন্দী করল। মেয়েটি ঘাড়ের ওপর তার নিশ্বাসের স্পর্শ পেল। ছেলেটি বিজয়গর্বে বলে উঠল—"এবার আমাদের ছুটি, নোরা ছুটি, ছুটি!"

তার তপ্ত তীব্র দৃষ্টি যেন মেয়েটির দুটি চোখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি তাকে জোর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দিল। সে তাকে ঘৃণা করে—এই অচেনা বিদেশীকে।

"আমাকে যেতে দাও।" নোরা আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠল। ছেলেটি তাকে ধ'রে রাখবার জন্য চেষ্টা করতে যেতেই মেয়েটি তার সেই দুটি ব্যগ্র লোলুপ হাতে আঘাত করল।

"পারে যাবার আর কে আছে?"

শেষ ডাক বেজে উঠল আবার।

"হাঁ, আর একজন।"

নিজের গলার স্বর সে নিজেই চিনতে পারছিল না। সে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে চলল।

অবশেষে তার দুই উৎসুক পা যখন পারের মাটি স্পর্শ করল, তখন সমস্ত বৃষ্টিবিন্দুগুলি একত্র হয়ে একসঙ্গে বলে উঠল—"মা!"—*

---

*লুইস্ হিলজার্স হইতে।

কাকের বাসা

জানা নেই শোনা নেই একেবারে অপরিচিত দুটি ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

সানাই বাজল, আলো জ্বলল, উলু উঠল, হাউই উড়ল, আর দুটি অচেনা অজানা প্রাণী হাতে হাত ঠেকিয়ে দুর্বোধ সংস্কৃত বচন শুনতে লাগল, আর তাদের দুটি হৃদয় তারার আলোর মত ধীরে ধীরে কাঁপতে লাগল।

মেয়েটি সলজ্জ ঘোমটার আড়াল থেকে চোখ দুটি আনন্দে একটু ডাগর ক'রে ভাবলে—চমৎকার বর হবে আমার, কত খুশী, কত…

ছেলেটি ভাবলে—চমৎকার ক'রে গ'ড়ে তুলব আমার প্রিয়াকে, কেমন সুখে দিন যাবে। শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। দু'জন পরস্পরের পানে চেয়েই চোখ নামাল—কেউ যেন তত খুশী হতে পারল না চেহারা দেখে। ছেলেটি ভাবলে - রংটা যেমন চাঁপা ফুলের মতো বলেছিল তেমন তো মোটেই নয়, এ কি ছাই! মেয়েটি ভাবলে—কৈ, তেমন জোয়ান ত নয়, এ যে ভারী হালকা শীর্ণ!

বাসর ঘরে ছেলেটি বললে - তুমি গান গাইতে পার শুনলাম, একটা যন্ত্রও তোমাকে দিয়েছে দেখলাম বাজাবার। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে ঐ সবের কিছু চর্চা নেই। বাবা গান একদম পছন্দ করেন না, থিয়েটার বায়স্কোপ তাঁর দু'চক্ষের বিষ। তাই ওটা নিয়ে যাওয়া চলবে না বুঝলে?

মেয়েটি অন্তরে ভারী পীড়িত হয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে—আচ্ছা…

মেয়েটি ছেলেটির সঙ্গে ঘর করতে এল তার কর্মস্থানে কলকাতায়।

ছেলেটি একদিন বাড়ী ফিরে এসে দেখে মেয়েটি আর একটি ছেলের সঙ্গে বাইরের ঘরে ব'সে গল্প গুজব করছে ও হাসছে। দেখেই ছেলেটির সর্বাঙ্গ যেন পুড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে কর্কশ কণ্ঠে ডাকলে—শুনে যাও! মেয়েটি ভয় পেয়ে তাকে অনুসরণ করলে।

পাশের ঘরে ঢুকে ছেলেটি নিষ্ঠুর স্বরে বললে—ও কে? ওর সঙ্গে যে বেশ গলা ছেড়ে হাসি ঠাট্টা করছ? বাড়ীর বৌ হয়ে যার তার সামনে বেরুতে লজ্জা হয় না?

মেয়েটি সন্ত্রস্ত হয়ে বললে—উনি যে আমার নরেন দা, আমাদের গাঁয়েই ত ওঁরা থাকেন, কত আপনার…

ছেলেটি ক্ষিপ্ত হয়ে বললে—হোক গে, রক্তের সম্বন্ধের ত কেউ নয়, কি কাজ ওর কাছে বেরুনো? যাও ভেতরে।

মেয়েটি কাতর কণ্ঠে বললে—সে কি কথা! উনি এখানে এসেই আমার খোঁজ নিতে এসেছিলেন। একটু জলখাবার।

ছেলেটি মুখ খিঁচে বলে উঠল—আবার জলখাবার! যে লুকিয়ে পরের বৌর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাকে জলখাবার! কোথাকার…

মেয়েটি দুই কানে দু'হাত দিয়ে সেখানে ব'সে পড়ল।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে, মেয়েটি দরজার কাছে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। তারার আলো মৃদুকম্পমান কচি দেবদারুর পাতায় এলিয়ে পড়েছে। সমস্ত আকাশটা যেন তন্দ্রা। এই নরেনদার সঙ্গে তার ছেলেবেলার দিনগুলি কত আমোদে কেটে গিয়েছিল। ফুলের পাপড়ির মত সেদিনগুলি হাওয়ায় সে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে। এই নরেনদাই একদিন তার চিবুকের পাশে ছোট তিলটি দেখে বলেছিলেন—জান পরী, তোমারই মতন একটি মেয়ের গালের তিল দেখে এক পার্শী কবি এই সমস্ত ভুবন দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন! এই নরেনদাই তার বিয়ের রাতে দূরে নদীর বালুচরে ব'সে ব'সে খালি বাঁশী বাজিয়েছিল, ঝাউয়ের মর্মরতানের সঙ্গে বাঁশীর কান্নার সে কি কাতর কোলাকুলি!

হঠাৎ স্বামীর আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠল। ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে—এখনো উনুনে আগুন দেওয়া হয়নি যে! রান্না চড়বে না আজ?

মেয়েটি চোখের জল মুছে আস্তে-আস্তে কয়লা ভাঙতে চলল।

একদিন মেয়েটি স্বামীকে গিয়ে বললে—আমার জন্য দুটো সেমিজ কিনে এনো আপিস থেকে আসবার সময়।

ছেলেটি অবাক হয়ে গেল—সেমিজ কেন?

—আমার বিয়ের যতগুলি ছিল, সব ছিঁড়ে গেছে; সম্প্রতি আর দুটো না হলে চলবে না। ছেলেটি বিকৃত কণ্ঠে বললে—অত সব বাবুয়ানির আস্কারা আমার কাছে পাবে না, যাও। আমাদের মেয়েরা খ্রীষ্টান নয়, আমাদের মা দিদিরা সব সেমিজ বিনেই ঘরকন্না করেছে। অত রূপ ফলাবার সখ থাকে, বাপের বাড়ীতে ভাই-এর কাছে লেখো, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

আপিস সকাল-সকাল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি বাড়ী ফিরে এসে দেখে মেজেয় বুক পেতে মেয়েটি একখানি বই পড়ছে। ছেলেটি থপ ক'রে বইটা কেড়ে নিয়ে দেখলে বইখানি—বিন্দুর ছেলে; বিয়ের উপহার! কর্কশ কণ্ঠে বললে—এ সব রাবিশ অশ্লীল বই পড়ছ যে?

মেয়েটি ঘাড় তুলে শুধোলে—পড়েছ বইখানি?

ছেলেটি মুখ বিকৃত করে বললে—আর আমার কাজ নেই, এই সব ননসেন্স

প'ড়ে মরালস্ খারাপ করি আর কি! কতকগুলো বাজে গুলিখোর বাংলায় অশ্লীল বই ছাপিয়ে দেশের ছেলেমেয়েগুলোকে একেবারে নষ্ট ক'রে দিলে। এই সব বই পড়ো না খবরদার। মেয়েদের পড়া শোনারই বা বিশেষ কি প্রয়োজন—তাদের ত জজ ম্যাজিষ্টেট হবার জো নেই—এ নিয়ে ছেলেটি বক্তৃতা দিয়ে চলল।

এ সব কথার উত্তরে কিছু বলা যায় কি না মেয়েটি তাই ভাবছিল। চড়া রোদ যেন অশ্রুহীন বেদনার মত জ্বলছে। উদলা পিঠে চুলগুলি মেলে ঘোমটা তুলে মেয়েটি দাঁড়াল। জানলা দিয়ে তাদের রুদ্ধ বাঁকা গলিটার শেষ দেখা যাচ্ছিল না। একটা কুলি মেয়ে চুপড়ি ক'রে কয়লা কুড়োচ্ছে। একটি কালো কুলি-ছেলে তার খোঁপা ধরে টেনে গুন্‌গুনিয়ে একটা সুর ভেঁজে মেয়েটির চুপড়িতে পোড়া কয়লা তুলে দিতে লাগল। মেয়েটি হঠাৎ ছেলেটির গালে ছোট্ট একটি চড় দিলে। তার কচি আঙুলে যে কালি লেগেছিল তা ছেলেটির গালে কলঙ্কের মত চুম্বনের মত হয়ে রইল! ছেলেটির হাসি কি স্বচ্ছ! হাসির মধ্যে অস্ফুট একটি কথার কুঁড়ি যেন কাঁপছে।

পাশের বাড়ীর বৌটি এসে মেয়েটিকে তাদের বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে গেল বেড়াতে। ছেলেটি বাড়ী ফিরে এসে তাকে দেখতে না পেয়ে একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠে বেশ তীব্রস্বরে মেয়েটিকে লক্ষ্য ক'রে গালি বর্ষণ করতে লাগল। স্বামী এসেছে জেনেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে ছুটে বাড়ী চ'লে এল। ছেলেটি রাগে গিস্‌গিস করতে-করতে কর্কশকণ্ঠে বললে—সবাইকে এ রূপ না দেখালে বুঝি ভাল লাগে না? অচেনা পরের বাড়ীতে ঢং ক'রে বেড়াতে যাবার কি দরকার ছিল শুনি?

মেয়েটি নরম গলায় বললে—ওদের বাড়ীর বৌ আমাকে ধ'রে নিয়ে গেল। আমি কি করি?

—ওরা জানে এ বাড়ীতে পুরুষ-টুরুষ নেই, তাই এসেছিল, কিন্তু ওদের বাড়ীতে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেন গেছলে ওদের বাড়ী?

মেয়েটি বললে—তা কি আমি জানি?

—আমি তোমাকে বলিনি বউ-মানুষ ঘরের মধ্যে থাকবে, অত বাইরে বেরিয়ে রূপের ঝিলিক হানবার জন্য তারা জন্মায়নি। কেন কথা শোনা হয় না?

মেয়েটি আর কি বলবে? তার সমস্ত বাক্য অসাড়—সে প্রতিবাদ করবার ভাষা খুঁজে পায় না। স্তিমিত সায়াহ্নের মত বিধুর একটি বিষাদ খালি তার দুটি চোখের তারায় মেঘের ছায়ার মতন কাঁপে!

উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে মেয়েটি স্থির হয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে ব'সে ছিল। তার সমস্ত তনুতে শ্রান্তির শিথিল সুষমা! জানলা দিয়ে আকাশের খানিকটা দেখা

যাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, পূবের আকাশ অন্ধকারে ভারী, অসাড় হয়ে রয়েছে, মৃত্যুর মত পাংশু, গুমোট! ভাঙা চাঁদ কখন উঠবে তারই জন্য তমস্বিনী রাত্রি যেন প্রতীক্ষা করছে। মেয়েটিও এই কৃষ্ণপক্ষের পাংশু মলিন আকাশ, সেখানে চাঁদ উঠবে না।

হঠাৎ ছেলেটি ছুটে এসে তাকে এক ঝটকায় উঠিয়ে চেঁচিয়ে বললে—তুমি ওদের বাড়ীতে পায়েস খেয়েছ?

মেয়েটি ভড়্‌কে গিয়ে বললে—কে বললে তোমাকে?

—যেই বলুক না, খেয়েছ কি না বল।

—খেয়েছি।

ছেলেটি মুখ বিকৃত ক'রে বললে—খেয়েছি? লজ্জা হয় না বলতে? জান না ওরা কায়েৎ, তুমি বামুনের বৌ হয়ে···

মেয়েটি জ্ব'লে উঠে বললে—কায়েতের রান্না খেলে কি হয়? জিভ্‌ খ'সে পড়ে?

ছেলেটি তিক্তকণ্ঠে বললে—কি হয়? গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত না করলে আমি তোমার হাতের জল গ্রহণ করব না।

মেয়েটি মরীয়া হয়ে বললে—না করলে গ্রহণ! প্রায়শ্চিত্ত তো তোমার করা উচিৎ যার মুখ থেকে এমন জঘন্য—প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না। ইস্‌?

—প্রায়শ্চিত্ত না করলে তোমাকে আমি ত্যাগ করব।

মেয়েটি দৃঢ় কণ্ঠে বললে—করো ত্যাগ। তোমার ত্যাগকে কে ভরায়?

ছেলেটি রুখে উঠে বললে—কি? এত বড় কথা? জুতো মেরে একেবারে মুখ ভেঙে দেব। মেয়েটির বুক দু'লে উঠল ঢেউয়ের মত। দৃপ্ত কণ্ঠে বললে মারো দেখি জুতো? ব'লে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—কি, মারতে পারি না? ব'লে ছেঁড়া জুতোটা ছেলেটি ছুঁড়ে মারলে। কিন্তু মেয়েটির গায়ে না লেগে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে পড়ল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে।

তখন আকাশে চাঁদের উত্তরীয় দেখা দিয়েছে।

* * *

একদিন ছেলেটির ঘরে মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সমাজ মেয়েটিকে অসচ্চরিত্রা কুলটা ব'লে ভর্ৎসনা করলে, নরেনকে জাতিচ্যুত একঘরে করলে, আর সেই অন্ধ ভক্ত ছেলেটিকে তার দ্বিতীয়পক্ষ জুটিয়ে দিলে তার হিঁদুয়ানির পুরস্কার-স্বরূপ।

জীবন দেবতা তাঁর রসের পেয়ালাগুলি খালি ভরাট ক'রে চলেছেন।

সবচেয়ে সে আপনার

পড়ার ঘরে ব'সে সে লিখছিল।

প্রিয়ার কল্পনা প্রজাপতির মতো পাখা ছড়িয়ে তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যেন আঙুরের মতো তার আঙুলগুলি ছেলেটির চুলগুলির মধ্যে লতিয়ে দিচ্ছে—এমনি মনে হচ্ছিল।

কাগজের ওপর দিয়ে কলমটা খস্‌খসিয়ে ছুটছিল—আর ছেলেটির চাপা ঠোঁটের কোণে মৃদু একটি হাসি। সে-প্রিয়াকে ভালোবাসতে পাওয়া বা ফেরা-ফিরতি তারো ভালোবাসা পাওয়ার মধ্যে নিবিড় অসহ্য সুখ! ছেলেটি কলমটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিল। লিখতে চেষ্টা করা বৃথা। তার শুধু এখন গা এলিয়ে দিয়ে চুপটি করে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল। সে তার প্রকাণ্ড চেয়ারটায় শুয়ে পড়ে পাইপ্‌টা ধরাল। রুদ্ধ ঘরের এই উত্তাপটি কি মিষ্টি! আশ্চর্য, মায়্‌রা তার কাছে নেই আজ—তাকে ছাড়া এটুকুনও তেতো লাগে। সে তো অনায়াসেই তার হতে পারতো—

বিয়ে করাটা তার কি বোকামিই হয়ে গেছে! অসহায় চিররুগ্ন স্ত্রী—হয়ত কালকেই ম'রে যাবে, কিম্বা হয়ত বছরের পর বছর বেঁচেও থাকতে পারে।

এর মধ্যে পাঁচটি বছর তো এই রোগের সাঁ্যাতসেতে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। এ পাঁচ বছরে তার প্রেমও তো মীইয়ে গেছে। প্রেম কতদিনই বা বাঁচে? তার ঘরে যেতেও এখন ঘেন্না বোধ হয়—মেয়েটি তার কাছে একটা পাঁকের পোকা। সেই লম্বাটে মুখ, ঘোলাটে ঝাপসা দুই চোখ, শীর্ণ শিটিয়ে-পড়া হাত,—আর দুই ঠোঁটের মাঝে ওষুধের সেই চিরন্তন গন্ধ - সে এগোতে পারে না। কিন্তু তবু, তবু একদিন সে কী সুন্দরীই না ছিল!

টেবিলের একধারে তার স্ত্রীর একখানি ছবি। অন্যমনস্কের মতো সেদিকে তাকাল! কত বছর বাদে সেদিকে তাকাচ্ছে সে আজ! এতদিন তো ঐ ছবিটা প্রাণহীন, আসবাবেরই সামিল ছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে ছবিটিকে নিজের কাছে নিয়ে এল। একটি কিশোরী মেয়ের ছবি, দুটি চোখ উজ্জ্বল বিশ্বাসে পরিপূর্ণ, মাথায় একরাশ চুল! তার চুল কি সুন্দর পাশুটেই না ছিল! কতদিন ঐ ঘন কেশগুচ্ছে সে তার শ্রান্ত আঙুলগুলি লুকিয়ে রেখেছে। সে পাখীর মতো গান গাইত। তাদের ঘর তো তখন সূর্যের আলোয় আর ফুলের গন্ধে ভরা ছিল।

ছবিটা তাড়াতাড়ি সে ঠেলে দিলে। পেছনের দিকে চোখ ফিরিয়ে লাভ কি? এই সমুখ—এই নিকটই তো তার সব কিছু—তার মায়্‌রা। তার মায়্‌রা জীবনে একটি দিনের জন্যও রোগে ম্লান হয়নি, তার টুলটুলে ভরা দুটি গালে অর্ধস্ফুট গোলাপের আভা, দুটি নৃত্যচঞ্চল পায়ের তালে স্বাস্থ্যের মদিরা উছলে পড়ছে।

যায়,যার সর্বাঙ্গে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শ্যামল সুগন্ধ,—তার চুম্বনে ওষুধের তেতো গন্ধ নেই।

পড়ার ঘরের দরজা খুলে গেল। নার্স ভেতরে এসে বললে—"আপনাকে বিরক্ত করছি হয়ত। কিন্তু মিসেস্ গ্রাহামের অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। আপনাকে না দেখে কিছুতেই ঘুমোতে চাচ্ছেন না। আসবেন ?"

ছেলেটি নার্সকে অনুসরণ করলে। অনবরত উঠে যাওয়ায় সে মনে-মনে ভারি চটে। কিছুই তো করতে পারে না সে—সে একা থাকতে চায়। কিন্তু রোগীর ঘরের চৌকাঠটার কাছে এসে দাঁড়াতেই মুহূর্তের মধ্যে কেমন ক'রে কি জানি হয়ে গেল। ঘরে বাতি ছিল না। সূর্যাস্তের লালিমা সে ঘরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বিছানায়ও এসে পড়েছে। আশ্চর্য! মেয়েটিকে এত তাজা ও তরুণ তো কোনোদিন দেখায়নি। ছেলেটি খুসি হয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন করলে। ভুলে গেল তার চুলে পাক ধরেছে, তার চোখের কাছের চামড়াগুলি কুঁচকে গেছে। এই চুম্বনে অনেক-দূরে-ফেলে আসা গত দিনের হারানো স্মৃতি যেন শিউরে উঠল।

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে তাকাল। তারপর অজান্তে কখন সে তার কাহিল বাহুটি স্বামীর গলার ওপর তুলে দিয়েছে। ধীরে নিশ্বাস ফেলে বললে,—"তুমি আমাকে আগের মতোই চুমু দিলে। তুমি যেন আমাকে ভালোবাস।"

"তোমাকে ভালোবাসি বৈকি।"—হঠাৎ মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে এল। কিন্তু ব'লে ফেলার পর সে ভেবে দেখলে সত্যি কথাই সে বলেছে। বিবাহের রহস্যময় সূক্ষ্ম বন্ধন-ডোর আবার তাকে ধীরে-ধীরে যাদু ক'রে মেয়েটির কাছে নিয়ে এসেছে। এ তো তার একান্ত তার! সে তাকে ভালোবাসে বৈকি—নিশ্চয়ই! সবচেয়ে এই তো তার আপ্‌নার। মেয়েটি হাসল—দুর্বল ক্ষীণ হাসি—কিন্তু সান্ত্বনায় ও তৃপ্তিতে তা ভিজা!

—"আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। কতদিন অন্যায় ক'রে ভেবেছি তুমি আমাকে চাও না, আমাকে নিয়ে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কী সুখ, তুমি আমার কাছে—একেবারে আমার বুকের কাছটিতে!"—মেয়েটি তার শিথিল শীর্ণ আঙুলগুলি দিয়ে স্বামীর গালে অতি কোমল আঘাত দিতে লাগল—চুম্বনের মতো।

—"আমি আজ সন্ধ্যায় কী দুঃস্বপ্ন দেখেছি, জান? যেন তপ্ত বালুচরে আমি একা হেঁটে চলেছি—মাইলের পর মাইল। আমি একেবারে একা। তুমি আমাকে ফেলে চ'লে গেছ। তোমাকে খালি ডাকছি, তুমি আসছ না। মনে হচ্ছিল, তোমাকে আমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছি।"

—"বোকা মেয়ে!" ছেলেটি আবার তাকে চুমু দিলে।—"আমি যে তোমার

পিছু-পিছু ছুটে আসছিলুম, দেখনি ? বালির ওপরে পায়ের শব্দ, কি করেই বা শুনবে ?"

মেয়েটি নিশ্বাস ফেললে।—"আশ্চর্য, আমার তখন তা মনে হয়নি কিন্তু। স্বপ্নেও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছিলুম না। মরণের বিরুদ্ধে আমার তো খালি এই-ই নালিশ যে তোমাকে সেখানে পাব না। নইলে মরতে আমার কত সুখ। আমার কি মনে হয়, জান ? মনে হয় আমি এম্‌নি এক সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাব।—কোথায় ? সূর্যাস্তের লালিমার মাঝে। তুমি কাঠের বাক্সটায় সত্যি-সত্যি আমাকে গোর দিতে পারবে না।"

ছেলেটি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। মায়্‌রা তখন অনেক দূরে চ'লে গেছে —হারিয়ে গেছে যে মেয়েটি তার বাহুর বন্ধনে বন্দী—সে-ই তার প্রিয়া, সে তার স্ত্রী।

কিন্তু মেয়েটি মারা যাবার পর—সে এর পরে হঠাৎ একদিন মারা গেল, সেদিন মেঘলা ছিল, সূর্য ওঠেনি—ছেলেটি মায়্‌রাকে বিয়ে করল।

তবেই দেখা যাচ্ছে, জীবনে সবচেয়ে যে কাছে, বাহুর মধ্যে—সবচেয়ে সে সত্যি,—সবচেয়ে সে আপ্‌নার !*

ডোরা

স্যানাটোরিয়াম-এ আটজন রুগী—সবাই যক্ষ্মায় ভুগছে। সব রুগীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগীই বেশি খামখেয়ালি। জ্বর একটুখানি বেড়ে গেলেই ভয়ে, রাগে বা হতাশায় ওরা অবুঝ ঘ্যানঘ্যানে হয়ে ওঠে।

যক্ষ্মার পোকাগুলির কিন্তু এক অদ্ভুত শক্তি আছে—রুগীকে মারে, অথচ বাঁচবার প্রবল তৃষ্ণা তার মনের মধ্যে নিরন্তর জাগিয়ে রাখে। যে রুগী মৃত্যুর দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তারও অগাধ বিশ্বাস যে সে বেঁচে উঠবে ;—আর প্রেমের জন্য আতুর হওয়া তো যক্ষ্মা রোগের প্রধান লক্ষণ। নৃতত্ত্ববিদ ট্রমপেল-ই, মনে হচ্ছে, এই অবস্থার নাম দিয়েছিল "যক্ষ্মারোগীর আশা।"

ক্রিমিয়ার এক রুগী-আবাসে আটজন যক্ষ্মারুগী ;—ডোরা নামে এক অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ে তাদের সেবা ও তত্ত্বাবধান করত। মাঝে মাঝে ও বলত যে ওর বাড়ী এসথোনিয়ায়, আবার কখনো বলত ওর দেশের নাম কেরিলিয়া। ও ছিল বেজায় মোটা ও ঢ্যাপসা, কিন্তু লঘুচরণ—ওর গতি যেমন দ্রুত তেম্‌নি নিপুণ। ওর

* লুইস্‌ হিল্‌ডার্স হইতে।

সারা মুখে ঘোড়ার ভালমানষির ভাব মাখানো ; ওর আঁটা লাল ঠোঁটের ফাঁকে করুণ একটু হাসি— চর্বির মতো তেলতেলে ; ওর বেগুনি-রঙের বড় বড় চোখ দুটিতে সেই হাসির তেল যেন ভাসছে।

ও যখন কিছু ভাবত, ওর মিওনো চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠত ও চোখের দৃষ্টি সীসের মতো ঘোর হয়ে যেত। যেমন অশিক্ষিত তেমনি বোকা—বেশি চালাকি করতে গেলেই বোকামি বেরিয়ে পড়ত। তাই রুগীরা ওকে ঠাট্টা ক'রে 'বোকা' ব'লে ডাকত। ও কিন্তু তাতে রাগ করত না - খালি হাসত। রুগীদের প্রতি মা'র মতোই ওর সহিষ্ণুতা। যখন যক্ষ্মা রুগীরা তাদের চটচটে বিবর্ণ হাত দিয়ে ওকে আঁচড়াত, সুড়সুড়ি দিত, ও মরণ-পথযাত্রীদের সেই ভিজা দুঃখী হাতগুলি নিজের বড় বড় লাল থাবা দিয়ে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বলত "না। এ কি করছ ?"

অনেকেই কাতর কণ্ঠে ওকে প্রেম জানাল,—দোকানি, দালাল,— একটা জোয়ান জেলেও, বউ তার মারা গেছে বটে। সবাই ওর সৌন্দর্যের কর্কশতায় মুগ্ধ হয়েছে —ওর দৈহিক বল, অবিশ্রান্ত উদ্যম, ওর স্বচ্ছন্দ সহজ স্বভাব। সবাই এই শান্ত, বিনম্র মেয়েটিকে জীবনের সহচরী ক'রে নেবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু ওর ভাবখানা এমনি উদাসীন,— যেন ধনী মহাজন ঠিকই জানে কখন ও কি করে তার মূলধন গচ্ছিত রাখতে হবে। এই সব রুগীদের অবিরাম কাকুতি যেমন শুনত, তেমনি বোকার মতো, কিন্তু একান্ত নম্রতায় বিয়ের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত,— একটি আব্দারও হাত পেতে নিত না।

যখন উত্তুরে হাওয়া দেয়, তখনো ওর গরম ঘোচে না। পাহাড়ের ওপর ছোট বাড়ীটিকে ঘিরে ঘন কুয়াশা গুমোট ক'রে যখন ঘুপটি মেরে থাকে গরম কোট ও মোটা কম্বলে গা মুড়ে রুগীরা যখন অসন্তোষে বক্ বক্ করে. ওর তখনো গরম ! রাতে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে ডোরা ওর মাথাটা এক কালো রুমাল দিয়ে ঢাকে,— রুমালের এক কোণে একটি লাল গোলাপ তোলা,— ছাতে এসে দাঁড়ায়, আর আমারই জানলার নীচে নতজানু হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রার্থনা করে—

"ওগো ভগবানের মা…যীশু আমাদের প্রভু ! হে সেণ্ট নিকোলাস, ঈশ্বরের গরীব ভৃত্য !…"

ডোরার মধ্যে কবিতার একটি রেশও আমি পাইনি। ফুলকে ও ভালবাসত না, বলত—ওরা খালি ঘরের জঞ্জাল ও ধুলো বাড়ায়। এক রাতে এক পুরোতের স্ত্রী যখন পাকস্থলীর যক্ষ্মাতে মারা যাবার সময় আকাশ ও তারার ঐশ্বর্য দেখে বিভোর,

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল .ডোরা নিষ্ঠুরের মতো ওর সমস্ত উৎসাহ ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিল—"আকাশটা ঠিক ডিম-ভাজার মতো !"

একদিন ন'য়ের নম্বরের রুগীটি হাজির হ'ল। অনেক কষ্ট ক'রে হাঁপাতে-হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে রেলিঙটা ধ'রে ডোরাকে বললে—"দেখ কেমন সুন্দর আমি! না?"

ঐ কথার সুরে ফুর্তি ও বেদনা মিশে রয়েছে। হেসে ও ঐ বিপুলবপু মেয়েটির পানে চেয়ে রইল,—ওর স্ফীত বুকের দিকে।

"বাঃ। কি চমৎকার মজবুত জোয়ান তুমি।" বাতাস গিলে গিলে ও তাড়াতাড়ি কথা কয়,—"তুমি আমাকে ফের ভালো ক'রে দেবে? দেবে না?"

"নিশ্চয়ই। দেব বৈ কি।" ডোরা বললে।

লোকটার মুখ প্যাঁচার মতো, বিড়ালের মতো গোল গোল চোখ, নাকটা ডগার কাছে বেঁকে এসেছে, কালো একটুখানি গোঁফ—নিষ্ঠুর মুখ, যেন ঠাট্টা করছে।

সেই দিন থেকে ডোরা একেবারে বদ্‌লে গেল। কে যেন ওকে যাদু করেছে। আমাদের অসুবিধের আর শেষ রইল না। আমাদের কথা আর তত শোনে না, তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরের মধ্যে দিয়ে ছুটে যায়, গাফিলি ক'রে ঘর সাফ করে, আমাদের বকুনি ও নালিশের উত্তরে রাগে খালি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে—কিন্তু ওর কাদাটে দুই চোখে যেন অপরূপ নেশা,—আলোর নেশা!

ও সহসা যেন কালা আর কানা হয়ে গেছে। কেবলই গভীর ঔৎসুক্যে ছাতের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ায়—যেখানে সেই বেচারা ছাত্রটি—নাম ফিলিপফ—প্যাঁচার মতো মুখ,—অনবরত কাশে ও হাঁপায়। একটু ফাঁক পেলেই ডোরা ওর কাছে ছুটে যায়, সূর্য ডুবলেই ওর ঘরে গিয়ে সেঁধোয়—আর বেরিয়ে আসে না।

ও? ও ত মরতে বসেছে। অদ্ভুত রকমের মরা—হেসে আর ঠাট্টা ক'রে। সব সময়েই একটা হালকা সুর শিস্ দিচ্ছে, আর বারে বারেই কাশ উঠছে তাতে—মাটি হয়ে যাচ্ছে সুরটা। ওর চারধারে যেন একটা কৃত্রিমতা আছে,—বেপরোয়া বিবাগীর ভাব—আর যাই হোক, বেশ কায়দা ক'রেই মুখোপটা পরেছে কিন্তু।

"তুমি এই সব মাথা-পাগলামি দেখে কি ভাবছ?" ওর বেড়ালের চোখ মটকে ও আমাকে শুধোয়—"কেমন লাগে তোমার? দিন, রাত্রি, জন্ম, ভালোবাসা, জ্ঞান, মৃত্যু—কি বল? খুব মজার না? আমার মতো ছাব্বিশ বছরের লোকের কাছে কিন্তু ভারি মজার এ সব।...ডোরা!"

জিনিস পত্রের ওলোট-পালোট, চামচের নাড়া-চাড়া শুনি ডোরা এসে দাঁড়ায়,

—নীরবে দুটি চোখ আগ্রহে বিস্ফারিত হয়ে থাকে। এই লোকটির হুকুম তামিল করতে।

"ওগো আমার ছোট্ট হাতীটি, চট্ ক'রে কিছু আঙুর এনে দাও।" আমাকে শুনিয়ে পরে বলে -"নেহাৎই হাঁদা মেয়েমানুষ।"

ও সমস্ত রুগীকেই ঘৃণা করে আর তাদের ছোটখাট সমস্ত মুদ্রাদোষকে নির্দয়ের মতো ঠাট্টা করে। ওকেও কেউ ভালোবাসে না। আমরা দুজনে কিন্তু বন্ধু হয়ে গেছি,—আমরা দুজনেই সাহিত্য ভালোবাসি কি না।

"মানুষের সব কিছু আবিষ্কারের মধ্যে সাহিত্যই সেরা।" বিবর্ণ হাত দিয়ে ঠোঁট দুটো ঘ'সে ও বলে—"আর যতই জীবন থেকে দূরে সরানো, ততই সুন্দর।"

আমার মনে হয়, ও ঠিক যক্ষ্মাতেই মরছে না,—ওর বুকের ঠিক মাঝখানটাতে কে যেন ঘুষি চালিয়েছে।

এই রুগী-আবাসে আসবার আটষট্টি দিন বাদে ও মারা গেল,—মৃত্যু যখন কামড় বসিয়েছে, তখন ও খ্যালি প্রলাপ বক্‌ছিল—"ফিমা,…সমস্ত জীবন…আমি ভালোবেসেছি তোমাকে …একা…চিরকাল ফিমা…প্রিয়া…"

বিছানার পায়ের তলায় ব'সে ছিলাম আমি, আর ডোরা দাঁড়িয়ে ছিল ফিলিপফের পাশে, আর ওর প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে ওর নোংরা চুলগুলি টানছিল। ওর বাহুর তলায় একটা ছোট পুঁটলি।

"কি বলছে ও?" ভেব্‌ড়ে গিয়ে ডোরা আমাকে জিগ্‌গেস করলে—"কে এই ফিমা?"

"একটি মেয়ে নিশ্চয়ই—যাকে ও এতদিন ভালোবেসেছে, এখনো বাসে।"

"ভালোবাসে?—এই ফিমাকে?" ডোরা মূঢ়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল—"না, না, ও যে আমাকেই ভালোবাসে। যে দিন ও এখানে এল, সেই দিন থেকেই—"

কিন্তু ফের ফিলিপফের প্রলাপ শুনে ডোরা ওর মলিন ভ্রূলতা দুটি তুলে ওর ভিজা মুখটা জামাটা দিয়ে মুছে ফেলে সেই পুঁটলিটা আমার হাঁটুর ওপর ছুঁড়ে দিলে। বললে—"এই ওর শব আস্তরণ; মোজা, একটা সার্ট, আর কতকগুলি ঢিলা পাজামা।" তারপর ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চ'লে গেল।

প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে ফিলিপফের প্রলাপ থামল। ও খানিকক্ষণ শাদা দেওয়ালের মাঝে জানলার কালো গরাদটার দিকে আকুল চোখে চেয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কিছু বলতে চাইল হয়ত, গলা বুজে এসেছে। ঘুনে-খাওয়া ওর ছোট কুঁকড়ানো দেহটা মোচড় দিয়ে একেবারে টান, লম্বা হয়ে গেল—অগাধ শান্তি!

ডোরাকে ডাকতে গেলাম। ও ছাতে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,—আর যে

দূরান্তসীমায় দুই কালো আকাশ আর পৃথিবীর বুক যে ঘাষেঁষি করে রয়েছে,—কে কোন্ জন চেনা যাচ্ছে না—সেই দিকেই ওর উদাস চোখ দুটি! ও ওর ঢ্যাপসা মুখটা আমার দিকে ফেরাল—সে মুখ কী কর্কশ ও নিষ্ঠুর! অদ্ভুত কিন্তু।

"ওর হয়ে গেছে। যাও, ওকে বা'র কর, ডোরা।"

"ককৃখনো না।"

ডোরা ওর পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

"ককৃখনো না।" ফের ও বললে—"ও রকম লোকের কোন কাজে আমি আসব না। ভাব, কি রকম লোক? আমাকে বললে যে আমাকে নাকি ও ভালোবাসে, কিন্তু বরাবর···"

"হাঁ, কিন্তু ও যে মরতে বসেছিল, তা বুঝি দেখনি?"

"তাতে কি? হাঁ, তা ত দেখেছিলাম; আমি ত আর কানা নই। আমার শেষ পয়সা ক'টি দিয়ে পর্যন্ত ওর জন্য মৃত্যু-উপহার কিনে দিয়েছি। যেদিন ও আসে সেইদিনই মনে-মনে বলেছিলাম—আহা, বেচারা!···মরতে বসেছিল বটে! মরে ত সবাই। তার জন্যে মিথ্যা কথা কেন,—ঠকানো কেন? 'আমি আর কাউকে ভালোবাসিনি'—আমাকে ও বললে?—কেমন?—এই ত তোমার প্রিয়া কে, বেরিয়ে গেল।··যতবার খুসি মর, কিন্তু মিথ্যা কথা কয়ো না।"

চাপা গলায় কথা কইছিল ও, আর যেন কি ভাবছিল।

হঠাৎ ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল!—যেন বুক ভাঙা দুঃখ! যেন এক বাটি ফুটন্ত গরম জল গিলে ওর সমস্ত বুকটা ও পুড়িয়ে ফেলেছে।

"এস ডোরা।"

"তোমার যদি এতই দয়া হয়ে থাকে, তুমিই গিয়ে ওকে সাজিয়ে দাও। আমি ককৃখনো যাব না। আমার কে ও?···খেলনা একটা।"

"মরা মানুষকে কি ক'রে সাজাতে হয় আমি যে জানি না।"

"আমার কি তাতে? আমি ওকে চিনি না।"

"কিন্তু শত হ'লেও ও যে ম'রে গেছে।"

"কি হয়েছে তাতে? আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না। ওরকম লোককে আমি চোখ দিয়ে আর দেখতে চাই না।—ঠক, মিথ্যুক।"

শেষ পর্যন্ত ডোরা গেলই না, গোঁ ধ'রে একলা চুপ ক'রে ছাতে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি যখন ফিলিপফকে সাজাচ্ছিলাম, চাপা অথচ বুকভাঙা ককানি শুনে ছাতে দৌড়ে চ'লে এলাম।

মানুষকে এক এক সময় জলন্ত অশ্রু বিসর্জন করতে হয়,—তাতে না থাকে

শীতলতা, না থাকে শান্তি ;—ডোরার চোখেও সেই আগুনের মতো অশ্রু। মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে ও ওর মাথাটা রেলিঙে কুটছে, আছড়াচ্ছে,—ফুঁপিয়ে উঠছে, ককাচ্ছে—আর অনবরত চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে—

"আমার উৎকট প্রিয়তম, আমার ক্ষুদ্র রাক্ষস, আমার ছাগল ছানাটা…"*

সাত খুন মাপ

ফুর্তির ফুর্ফুরি ! মেলা বসেছে !

ঝিনুকের ছোট্ট নোলকটির মতোই মুখ,—কচি, টুলটুলে। বাপের হাতটা টেনে ঝুঁকে প'ড়ে বললে বাবা, ঐ ঘোড়াটা।

বাপ ধমক দিয়ে বললে—দূর বোকা মেয়ে ! মেয়েমানুষ বুঝি ঘোড়ায় চড়ে ? ফুলুরি কিনবি ?

বাপ যত না করে, মেয়ে তত গোঁ ধরে ;—বাপ মেয়ের গালে একটা ঠোনা বসিয়ে দিল।

না কেঁদে মেয়ে বায়নাটা আরো চেঁচিয়ে জাহির করে শুধু। হাত পা ছোঁড়া ছেড়ে মিনতি করে বলে—দাও না গো। চাই না আমি তেলে-ভাজা।

না-ছোড় মেয়ে—ন্যাওটা, নাছোড়বান্দা।

দোকানী হাঁকলে -দশ আনা—

বাপ মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে পারে না, মেয়ে বসে পড়ে ঘোড়াটাকে দু'হাতে আঁকড়ে বুকের ওপর চেপে ধরেছে। যেন কতকাল পরে ওদের দুজনের দেখা,—নতুন করে চেনাচিনি।

অগত্যা বাপ ট্যাঁক থেকে দশ আনা পয়সাই বের ক'রে দেয়।

বললে—রাতে কিন্তু এক মুঠো মুড়িও চিবোতে পারবি না রাক্ষুসি।

মেয়ে স্বচ্ছন্দে ঘাড় কাৎ ক'রে বলে—আচ্ছা। আজ আমার ক্ষিদে পায়ও নি।

কাঠের ঘোড়াটা একবার কাঁখে, একবার কাঁধে ক'রে চলে।

বাপ বললে -আমার কাছে দে ! ফেলে দিবি।

ভুরু বেঁকিয়ে মেয়ে বললে—ঈস্ ?

শুতেও এল ঘোড়াটা কোলে নিয়ে।

বাপ বললে—এ কি পোড়ারমুখী ? এটাকে বিছানায় তুলছিস কেন ? রেখে আয় দাওয়ায়।

---

* পকির ডায়ারি হইতে।

মেয়ে ভারিক্কি গলায় বললে—হ্যাঁ! রেখে আসি দাওয়ায় ফেলে—আর রাজা-বাবুর ছেলেরা চুরি করে নিক!

তারপর আর বৃথা কথা কয় না! বাপের আদেশ উপেক্ষা করেই নিশ্চিন্ত মনে শোয়,—ঘোড়াটাকে বুকে জড়িয়ে।

বাপ মেয়েকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে আনতে চায়, মেয়ে ঝাম্‌টা দিয়ে বললে ও তা হ'লে কার কাছে শোবে? একলা? ঈস্!—

অশ্বত্থ আর ঘেঁটু। - জমিদার-বাড়ীর চ্যাপসা গম্বুজ, আর কাহিল থুত্থুরো পাতার কুঁড়ে। যেন হনুমানের বগলের তলায় সূর্যের খোঁচ্‌ কাটা—ছেঁড়া চ্যাপটানো।

ভোরবেলা দাওয়ায় ব'সে, বুড়ো বেচারাম শিলে জল ঢেলে ক্ষুরে শান দেয়। জমিদার বাড়ীর মুহুরি দড়ি-বাঁধা ঠুনকো কাঁচের চশমাটা খুলে রাখতে রাখতে বললে দাড়িটা চেঁচে দাও হে বেচু।

রোজ এমনি করেই বেচারা বেচারামের বউনি হয়—মাগনা। মুহুরি এক আধ সময় বলে বটে—মাসকাবারে। তা, কাবার হয়, কিন্তু থাবার হয় না। বেচারামের ট্যাঁক দুটো অনবরত ফ্যা ফ্যা-ই করে।

তবুও কামাতে হয়। জমিদার-বাড়ীর দেউড়ি দিয়ে দু'বার যে যাওয়া আসা করে, তার প্রতাপে আর যাই হোক, বেচারামের শান-দেওয়া ক্ষুরটা অন্ততঃ সায় দেয়।

নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে ঘাড়টা দুলিয়ে দুলিয়ে চলে তারপর।

কাঠের ঘোড়ার সঙ্গে মাটির মেয়ের নিবিড় জানাশোনা,—যেন এ জন্মেরই শুধু নয়। তখনো মাটি আর কাঠ কিছুই ছিল না।

পাঁচ বছরের মেয়ে কাঠের ঘোড়ার কারিগরের কেরামতি দেখে মনে মনে তারিফ করে। জিভ দিয়ে আওয়াজ ক'রে মুরুব্বির মতো বলে - হ্যাট্ হ্যাট্—

কাঠের ঘোড়াও মাটির মেয়ের কারিগরের কেরদানিতে বোকার মতো মুগ্ধ হয়ে থাকে। তাই নড়ে না বুঝি।—

বেশী সক্ষম নয় বলেই চলতে পারছে না ভেবে পেসাদি ঢেঁকিশাক থেকে সুরু ক'রে পেঁপে গাছের ডাঁট পর্যন্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে এনে ঘোড়াটাকে খাওয়ায়। তবুও ঘাড় বাঁকায় না দেখে ভাবে,—এ বুঝি একেবারেই শিশু। তাই আনাড়ী ঘোড়াটাকে কোলে ফেলে পেসাদি হাঁটু দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়ায়, আবোল তাবোল ছড়া কাটে। ঘোড়াটা ঘুমোয় না হয়ত। তাই ফের কখন সওয়ার হয়ে ঘোড়ার ওপর

চেপে বসে। নিজেই ঠেলে ঠেলে চলে তারপর। তালে তালে বলে—গড়্ গড়্ গড়্—

দাওয়ার এক ধারে ব'সে বেচারাম গামলাতে ভাতের ফ্যান্ গালছিল।

বললে—উহুনের মধ্যে ছিটকে পড়বি পেসাদি।

খানিকক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে হায়রান হয়ে পেসাদি চুপ ক'রে ব'সে থাকে—ঘোড়ার পিঠেই। হয়ত ভাবে।

হয়ত বা সেদিনের কথাই, যখন এই বুড়ী পৃথিবী পেসাদির মতোই পাঁচ বছরের টুলটুলে খুকী ছিল—নাকে চাঁদের চিকণ নোলকটি!...

তারপর হঠাৎ ঘোর ভেঙে গেলে পেসাদি দ্বিগুণ উৎসাহে ঘোড়ার ঘাড়টা ধ'রে বিষম ঠেলা দিয়ে বললে—চল চালতাতলা।—রোগা দুর্বল ঘোড়াটা একেবারে চিৎপাৎ হয়ে পড়ল পেসাদিকে শুদ্ধই। পেসাদির মুখ দিয়ে খালি বেরুল—এই যা—।

জ্বলন্ত উহুনের মতোই ডগডগে বেচারামের রাগ—যেন ফুটন্ত ফ্যান। পেসাদির মাথার সমস্তগুলি চুল একসঙ্গে মুঠির মধ্যে খামচে ধ'রে দারুণ ঝাঁকি দিতে দিতে বেচারাম বললে মুখ খিঁচিয়ে—শারামজাদি, ফেললি—ফেললি তো ভেঙে দশ আনা দামের জলজ্যান্ত ঘোড়াটা।

সঙ্গে চড় চাপড়, আর জিভের গোড়ায় গালমন্দ যা আসে। তপ্ত খোলায় খই ফোটে।

—সভেরো দিন কামিয়ে সাতটা পয়সার আমদানী নেই,—বেটি, ছুঁচোর বাচ্চা—

মা-ছোড়্ মেয়ে চাছা-স্বরে চেঁচায়, আর মা'র মতো মাঝে মাঝে মরা ঘোড়ার পানে চায়,—অসহায়! চারটা পা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে খসেছে। মার সাঙ্গ হ'লে পেসাদি খোঁড়া ঘোড়াটাকে কোলে তুলে নিয়ে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, আর নিজের চোখের জল মোছে। ভাবে, ও যেন ওর রোগা ছেলে!

পরে ফুঁপোতে ফুঁপোতে বললে—আমার জিনিষ আমি ভেঙেছি—

বাপ তেড়ে এসে মেয়ের কোল থেকে ঘোড়াটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—মর ঘুঁটে। পরে ঘোড়াটা চুলোর তলায় ঠেলে দিল।—কাঠের ঘোড়ার চিতা।

পুকুর জমিদারের, পুকুর-পাড়ের সজনে-গাছটা বেচারামের এলাকায়।

সেই সজনে গাছের তলায় ছাতা মাথায় দিয়ে ব'সে জমিদারের নাদুস-নুদুস দোল-গোবিন্দ ছেলেটা জলে ছিপ ফেলে চেয়ে থাকে,—পলক পড়ে না। গা বেয়ে

ঘামে ঝরে, পাশের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খায়,—মাঝে মাঝে পেছনে ব'সে চাকর পাখা করে—ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

অপরাজিতা-লতার মতো গাঁয়ের বৌ-টি, যেমন শ্যামল, তেমনি নুয়ে-পড়া। আলগোছে ঘোমটাটা একটু টেনে বলে—ভারি অসুখ ছেলেটার, একটু সজনের ছাল যদি দেন—

গেঁয়ো মেয়ের গা ভরা সবুজ মাঠের স্বপ্ন, বুড়ো বেচারামের চোখ দুটো নরম হয়ে আসে।

পেসাদি তক্ষুণি নোলক নেড়ে ঘাড় কাৎ ক'রে ব'লে উঠল—হ্যাঁ, নাও না যত খুসি। আমাদেরই তো গাছ। মা'র হাতে পোঁতা। দেখবে চল কেমন আমি গাছটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে পারি—

বেচারাম আপত্তি করে না। চোখের জলে মুছে-যাওয়া হৃদয়ের পুঁথির ঝাপসা আখরগুলি যেন হঠাৎ ডাগর হয়ে ফুটে ওঠে;—বোকা নাপিত তাই প'ড়ে প'ড়ে বিভোর হয়ে যায়। যেমন আখর ফোটে তারার—রজনীগন্ধার।

ঐ বৌটিকে যেন ও চেনে। ঘোমটার তলায় যে চোখ দুটি দেখতে পায়নি, সেই চোখ দুটিকে!

তারপর শিলের ওপর ক্ষুর ঘ'ষে ঘ'ষে শান দিতে থাকে।

বৌটি ছোট দুটি হাতে ভোঁতা দা-টা ধ'রে বহু কষ্টে চেঁছে চেঁছে ছাল ছাড়ায়। পেসাদি ব'কে চলে। বলে—এই দেখ, কেমন মজার জিনিষ,—তোমাদের আছে?

বৌটি সত্যিই অবাক হয়ে দেখে।—প্রকাণ্ড একটা উইর ঢিপি,—যেন প্রকাণ্ড একটা রাজ্য।

কি ব্যস্ততা!—বৌটির দুটি চোখ জলজ্বল ক'রে ওঠে। ভাবে,—এ আরেকটা পৃথিবী,—কি ভাবে, বোঝে না। পেসাদির টানা টানা চোখ দুটি দেখে রোগা ছেলের কথা মনে করে বুকটা টন্‌টন্ ক'রে ওঠে। আঁচলে সজনের ছাল বেঁধে নেয়। উঠোনটা পেরোবার সময় তেমনি আলগোছে একটু ঘোমটা টানে।

রোজই আসে ছাল নিতে। সজনে গাছটা ছিল বলেই ত তবু মনে ক'রে আসে,—নইলে ত এতদিন ভুলেই ছিল। বেচারামের এক এক সময় ভারি ইচ্ছা হয়, বৌটিকে শুধোয়—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কিন্তু ঘোমটা তুলে ফেললেই পাছে ও অচেনা, পর হয়ে যায়, সেই ভয়ে কিছুই বলতে সাহস পায় না। খানিক চোখ মেলে, পরে চোখ বুজে ওকে দেখে।

বৌটি আঁচলে ক'রে বেঁধে খই আর মুড়ি নিয়ে আসে রোজ। উইর ঢিপিটার চারপাশে সেগুলোর হরির লুট দেয়। বলে—এরাও তো প্রাণী। আমি তো আমার

ছেলের কল্যাণে এতগুলো গরীব মানুষকে খাওয়াতে পারব না। এদেরই খাওয়াই, তুমি চোখ মেলে দেখো হরিঠাকুর।

উইর রাজ্যে তোলপাড় লাগে,—মারামারি,—ভাগবাটুরা নিয়ে কামড়া-কামড়ি। —যুদ্ধ,—বিপ্লব,—সঙ্ঘর্ষ।

সেদিন গাছটার দুর্দশা দেখে বেচারাম একেবারে থামের মতো থ হ'য়ে গেল। গোড়ার দিকটা একেবারে ন্যাড়া হয়ে গেছে। যেমন রাগ বুড়োর,—শান দেওয়া ক্ষুরের মতোই ধার!

অভ্যেস মতো সেদিনও বৌটি এলে বেচারাম একেবারে ফেটে পড়ল—তুমি বড্ড বেশি 'নাই' পেয়েছ, না? কি করেছ গাছটার চেহারা? এ কি তোমার বাপের জমিদারি নাকি?

দুর্বল বৌটি ঘোমটাটা আরো একটু টেনে আস্তে আস্তে ফিরে যায়। আঁচলে-বাঁধা মুড়ির পুঁটলিটা পথের ওপরই ছিটিয়ে দেয়।

রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে পেসাদিকে একটা অকারণ চড় মেরে বেচারাম বগলের তলায় গামছার পুঁটলিটা নিয়ে বাজারে চ'লে যায় তারপর। বুকটা যেন কেন খালি খালি লাগে।

বৌটি আর আসে না। ফের যেন ভুলে গেছে, —এমনিই মনে হয় বেচারামের। অন্যমনস্কের মতো গাছের গোড়ায় পায়চারি করে একটু। গাছটা যেন অশ্রুজল ফেলছে। পরে উইদের বৃহৎ সংসারের ব্যস্ত অভ্যস্ত জীবনযাত্রা দেখে। তারপর ভাতের ফ্যান উতলে পড়ছে দেখে ছুটে যায়।

বৌটি আসে না। বৈশাখের ঝাঁঝালো বাতাসে বুড়ো বেচারাম যেন কোন্ ছেলে-হারা মা'র কাতর ককানি শোনে!

যেন কোন্ বিরহিনীর –

বাজার থেকে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে এসে বেচারাম উঠোনে দাঁড়াতেই,—দক্ষিণ দিকটা কেমন যেন ফাঁকা ঠেকল। এগিয়ে এসে দেখল—একেবারে ফক্কিকার।

সজনে-গাছটার ডালগুলো সব কাটা, –ঠুঁটো। শুধু ধড়টা জড়িয়ে ধ'রে পেসাদি হাপুস চোখে কাঁদছে।

বেচারাম চেঁচিয়ে উঠল,—কি ব্যাপ্যার, রাক্ষুসি?

পেসাদি বলে না, বলে জমিদারদের বেদরদী দারোয়ানটা। ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়, বড় রাজাবাবুর বঁড়শীতে একটা কাৎলা প্রায় কাৎ হয়েছিল, হেঁচকা টান মারতে

শিকার তো ফসকালই, সুতো গিয়ে আটকালো সজনের ঠালায়। তাইতেই বাবু খাপ্পা হয়ে গাছটাকে একেবারে বেকুব ক'রে ছাড়লেন।

বেচারাম বোকার মতো চেঁচিয়ে ওঠে,—ফেটে পড়ে বোমার মতো।—কে তোর বড় রাজাবাবু, নিয়ে আয় আঁটকুড়ের ব্যাটাকে,—দেখি তার ঘাড়ে ক'টা মাথা। ইয়ার্কি পেয়েছে হেতা ?

দারোয়ানটা দাঁত দেখিয়ে হাসে।

বেচারাম কপাল কোটে গাছের গোড়ায়,—পেসাদি তেমনি দু'হাতে জড়িয়ে কাঁদে,—যেন আবার মা হারিয়েছে।

খাবার আর মুখে তোলে না,—অভ্যেস মতো দাওয়ায় ব'সে বেচারাম ক্ষুর শান দিতে থাকে। ভাবে, দুটি খাড়ু হীন পারুল-পায়ে কেউ তার উদাস উঠোনকে চমকে পুকুর-পাড়ে যাবে না আর। তার যে আরেক ছেলে মরল—

ক্ষুর দিয়ে জমিদারের ছেলের দাড়িই পরিপাটি ক'রে কামিয়ে দিতে হবে,—ঐ পর্যন্ত।

সেই রাতেই।

একলা একলা কাঁহাতক আর একঘেয়েমি ভালো লাগে ? বিধাতা মাঝে মাঝে মুখ বদলান। ছিঁচ্‌কাঁদুনের হঠাৎ খেয়াল হল, কাঁদবেন, কুঁদবেন। আকাশের ঝাঁঝরা ফুঁড়ে লাখো ফুটো দিয়ে কান্না নামল মাটির পাঁজরা কাঁপিয়ে,—মীরের যখন যা মর্জি।

ফলে, ভুষো কম্বলের তলায় জমিদারের ডাম্বেল-করা তোম্বল-ছেলেটার ভুঁড়ি ফাঁপিয়ে চৌকস ঘুম হল, আর মরা সজনে-গাছের তলায় উইর ঢিপিটা গেল ভেসে, হারিয়ে,—ছত্রখান হয়ে।

যুদ্ধ বেঁধেছিল, সাম্রাজ্যের ইস্তক কাবার হয়ে গেল। কিংবা মহামারীতে উজাড়, —ভূমিকম্পে সাবাড়। আবার কি !

পেসাদি একটু হুতাশ করে, বুড়ো বেচারাম একবার চেয়ে দেখে খালি ক্ষুর শানাতে থাকে—

যেন কিছুতেই মনোমতো ধার হচ্ছে না।

আখখুটে খোকার নতুন মর্জি, পিচকিরিতে রঙ ছুঁড়বেন। আকাশ গাঢ় নীল, মাটি পাৎলা সবুজ, ফুলে ফুলে প্রজাপতির পাখায় রঙের দীপান্বিতা।—

জমিদারের হোঁৎকা ছেলেটার বিয়ে।

বেচারাম বললে—বাঁশের কুলুঙ্গি থেকে তোর মায়ের খাড়ু জোড়া বার কর পেসাদি—

পেসাদি বললে—কোথা যাচ্ছ বাবা ? রাজাবাবুর বাড়ী নেমন্তন্নে যাবে না ?

—শেষ পুঁজি খাড়ু জোড়া নিয়ে বাজারে যাচ্ছি মা, বাঁধা দিতে। কে যাবে ঐ ছোটলোকদের বাড়ী ? আমরাও ফুর্তি করব আজ,—মায়ে-পোয়ে মিলে।

পেসাদি মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে—বারে, যাব না বুঝি লুচি খেতে ?

—আমরা নুন দিয়ে ফ্যান-ভাতই খাব, মা। ওদের চেয়ে ঢের ভালো—তারপর বাজারেই যায়।

ফিরে আসতেই পেসাদি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—পেট ভ'রে লুচি মোণ্ডা খেয়ে এলাম বাবা,—সন্দেশ তিনটে খেয়ে, আরো—

বেচারাম ঠাস ক'রে মেয়ের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে রুখে বললে—পরের বাড়ীতে কেন খেতে গেলি পোড়ারমুখী ? বললাম না—

কোঁচড় থেকে চালগুলো রাগ করে মাটির ওপর ফেলে দিল। পেসাদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আর মাটিশুদ্ধু চালগুলো গুছোয়।

বেচারাম বুকের মধ্যে দুটি খাড়ুর রুনুঠুন শোনে,—অশ্রুত ধ্বনি। পায়ে পায়ে, পাতাবাহারের পাতায় পাতায়, পোকার পাখায় পাখায় খাড়ু বাজিয়ে কে যেন এল।

তারপর ও এক সময় নিজেই জমিদার বাড়ীতে খেয়ে যায়,—হয়ত তাকেই দেখতে।

খেতে খেতে ভাবে খাড়ু দু'গাছি বাঁধা দেবার কি দরকার ছিল ?

যা হোক, পেট ঢাক করেই বাড়ী ফেরে—

দেখা হয় না। শুধু শুয়ে শুয়ে বুড়ো বেচারাম খাড়ুর আওয়াজ শোনে,—আপন বুকের মধ্যে।—

বেড়া বেয়ে বেয়ে চালকুমড়োর ডগাটা আকাশের পানে আঁকুপাঁকু ক'রে উঠেছে। তুলতুলে ফুল ফুটতে দেখে পেসাদি হাততালি দিয়ে উঠল। যেন পেসাদিরই নাকে ঝিনুকের ঠুনকো ছোট্ট নোলকটি। চালকুমড়ো লতাটা যে ওর সই।

বেচারাম বললে—আরো পুঁতে দেব বিচি,—বেচব। বেশ হবে।

পেসাদি দুটি চোখ চালকুমড়োর ফুরফুরে পাৎলা ফুলের মতো কাঁপিয়ে বললে—তুমি আমাকে কাঁধে ক'রে তুলে ধরবে আর আমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডালা ভরব।

বেচারাম দুই চোখের তরল স্নেহে দুর্বল লতাটাকে ভিজিয়ে দিয়ে বললে—নামুক একবার বিষ্টি,—থন্‌থন্‌ ক'রে উঠবে।

বুড়োর চোখে বোধ হয় ঘোর লাগে। ভাবে সে সব দিনের কথা,—বুড়োর বুকটা

যেন এই পোড়া খোলার চাল, আর তার বুক জড়িয়ে লতিয়ে লতিয়ে কার যেন অসংখ্য পেলব বাহু-লতার ব্যাকুলতা !···

সকালবেলা মুহুরি বলেছিল—একটু দাঁড়িয়ে যাও হে বেচু। হেঁচেছি।

বেচারাম বোধহয় দাঁড়িয়েই গেছল একটু। কিন্তু বাজার থেকে অভাবনীয় রূপে সাড়ে তিন আনা পয়সা ট্যাঁকে ক'রে নিয়ে আসতে আসতে বেচারাম হাঁচির বদনামের ওপর দস্তুর মতো সন্দিহান হয়ে উঠল।

খাঁ খাঁ রোদ হঠাৎ কুটে কালো মেঘের আঠায় একেবারে লেপ্‌টে চেপ্‌সে গেল। দমকা হাওয়ার বেদম ধমক সুরু হয়েছে,—দেয়ার গমক। বেচারাম টিমিয়ে টিমিয়েই চলেছে,—বগলের তলায় ন্যাকড়ার পুঁটলিটা। ভাবতে ভাবতে চলেছে,—চৌদ্দটা পয়সা একসঙ্গে দেখে পেসাদির দুই চোখ খানিক-আগের রোদে-উজ্জ্বল আকাশের মতো খুসিতে উছল হয়ে এখনকার ঠাণ্ডা আকাশের মতো সান্ত্বনায় শীতল হয়ে যাবে।

ঝাপটা মেরে বৃষ্টি নেমে এল।

বেচারামের হঠাৎ মনে পড়ল ছুঁচো মুহুরিটার হাঁচি। বুকটা ছাৎ ক'রে উঠল। মনে হল, সমস্ত আকাশ যেন হাঁচছে।

ঘরে এলো, বাতি বাতাসে নিবে গেছে। বেচারাম কুলুঙ্গি হাতড়ে দেশলাই বার ক'রে জ্বালালে, দাওয়ায় উঠে; হাওয়ায় হারিয়ে গেল। ঘরে এসে জ্বালালে এবার।

মাটির ওপর শোয়া পেসাদি—

সলতেটা বাড়িয়ে পিলসুজের ওপর রাখতে রাখতে বেচারাম বললে ঠাণ্ডায় মাটির ওপর শুয়ে আছিস কেন? রাঁধার কিছু জোগাড় করিস নি বুঝি?

খালি পুকুরের ভরপুর বুকে টুপুর টুপুর নূপুর বাজে। পেসাদি টুও করে না, পাশ ফিরেও শোয় না, গা মোড়াও দেয় না। অন্ধকারের মত অচল।

বেচারাম এগিয়ে এসে দেখল,—নীল; মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে।

দু'হাত দিয়ে মেয়েকে ঝাঁকি দিতে দিতে বললে—ঘুমিয়ে আছিস কেন লো? বিছানায় শুবি চ। লুকিয়ে কি খেয়েছিস, রাক্ষুসি? বাবুদের ছোট দস্যি ছেলেটা বুঝি ঢিল ছুঁড়েছে আজো? নে ওঠ, পেসাদি, বুড়ো বয়সে সারাদিন হয়রানি ক'রে আর রঙ্গ করতে পারি না—

বেজায় ঘুম পেসাদির,—ঘরের ও-কোণ থেকে কোন্ একটা প্রাণী ঘুম ভেঙে নিজের ছিপছিপে কৃশ শরীরটি টান ক'রে সটান ঘরের বাইরে চ'লে যায়—বেচারাম ঠাহর ক'রে দেখল—ডোরা-কাটা সাপ!

বিদ্যুৎ-লতা যেমন অন্ধকার চুঁড়ে চুঁড়ে কী খুঁজে মরে, তেমনি বেচারামের চামড়ার চোখ দুটো চকচকে ক'রে উঠল। চাপা, বসা, ভাঙা গলায় কেমন একটা শব্দ ক'রে উঠল—বাঘের নিশ্বাসের মতো!

হঠাৎ পেসাদির দুই গালে ঠাস ঠাস ক'রে কতগুলি চড় মারতে মারতে বলতে লাগল—ওঠ হারামজাদি, অবেলায় ঘুমোনো হচ্ছে? ঘর ঝাঁট দেওয়া পর্যন্ত হয়নি? সারাদিন কেবল খেলা, কেবল ছুটোছুটি? ভিজেকাঠ ধরিয়ে কে এখন ফুঁ দেবে?—

অভিমানিনী পেসাদির মতোই আকাশ থেকে কে যেন ফুঁপোতে ফুঁপোতে বলছে—আমার জিনিষ আমি ভেঙেছি, তোমার তাতে কি?

বেচারাম ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল বৃষ্টিতে,—হয়ত সেই সাপটারই খোঁজে। এদিক ওদিক ওপড়ানো সজনে গাছটার গর্তের কাছে, উজার-করা টিপিটার পাশে সাপটাকেই চায় হয়ত। চায় হয়ত সাপের বন্ধু আকাশের বিদ্যুৎকে,—চাকুর চাবুক ক'রে যেন চাবকে চাবকে কাকে ঘেয়ো ক'রে দিতে চায়।

কিছুই না,—ভরন্ত পুকুরের বুকে বেহায়া শাপলা দুলে দুলে নাচে, নব নেবুর মৃদু গন্ধে ভিজা হাওয়া উচাটন হয়ে চালকুমড়োর লতার ডগায় আলগোছে চুমু দেয়। আর জমিদার-বাড়ীর আস্তাবলের ঘোড়াটা পর্যন্ত—নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

চালকুমড়োর লতা,—আর সাপ।

বিধাতার যখন যা খেয়াল, যখন যে রকম ফুটানি। কেঁচো আর কচ্ছপ।—

ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়. জমিদারের ছোট ক্যাবলা ছেলেটা সহিসের হুঁকো থেকে জলন্ত কলকেটা তুলে ছুঁড়ে দিয়েছে শূন্যে। দিয়েই বাহাদুর ছেলের বাহবা আর ধরে না। কলকেটা পড়েছে গিয়ে খড়ের গাদায়।

ঝামার মতো ঝাঁ ঝাঁ রোদ—চোখে ঝাল লাগে, কান্না আসে। আগুনের শিখা যেন সূর্যের সঙ্গে একটু খোসগল্প করবার জন্য আকাশে উঠেছে।

পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে বেচারাম হঠাৎ দাঁত কড়মড় ক'রে উঠল—বেশ হয়েছে। যায় আগুনটা ও পাশ দিয়ে আগু বাড়িয়ে, ব্যাটাদের সর্বস্ব যায়,—আমার যেমন পেসাদি গেল।

ভিড় জ'মে গেছে। পেসাদি থাকলে ও এদের মতোই চোখ ডাগর ক'রে আগুনের রাক্ষুসেপনা দেখত।

পরের জিনিষ পুড়তে দেখলে সবারই মজা লাগে—

সহিস দারোয়ান চাকর বাকররা বালতি নিয়ে ছুটে জল আনতে যাচ্ছিল,

জমিদারের বড় তরমুজ ছেলেটা খেখিয়ে ব'লে উঠল— কি হবে জল এনে ? যাক না এ ক'টা খড় পুড়ে !—

বেচারামের ইচ্ছা হল, সঙ্গে সঙ্গে এ জাম্বুবানটারও মুখ পুড়ুক !

তা কি হয় ? হঠাৎ এক সময় আগুনের শিখা খামোকা বেচারামের চাল বেয়েই এল যা হোক !

যেন চালকুমড়োর লতার জন্য পেসাদি ওর চিতা থেকে বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে !

বেচারাম বোকার মতো চীৎকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি দারোয়ানের হাত থেকে বালতিটা কেড়ে নিয়ে ছুটে পুকুর থেকে জল তুলে ছুটল ঘরের দিকে। ঐ একবারই। খালি নিজের ন্যাকড়ার পুটলিটা বাঁচাতে পারল। কিই বা ছিল আর ?

সজনে গাছটার কাটার পর যেমন—তার চেয়ে বড় ফাঁকা, একেবারে আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি। চাল নেই চুলোও নেই।

চালই খারাপ হয়েছিল খেলার,—যে খেলোয়াড় এমনি বেচালই খেলে। পাকা ঘুঁটি ঘরের কাছে এসে মারা পড়ে।

তারপর আবার সন্ধ্যা হয়, তারা ফোটে,—মরা মাদারের ডালে বাতাস কপাল কোটে, শেফালিকারা শিশিরের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে।

সারারাত হাতে কোন কাজ নেই। অগত্যা বেচারাম সারারাত বাইরে ব'সে ব'সে ভোঁতা ক্ষুরটাতেই শান দেয়।

এক এক ক'রে গোনে। কাঠের ঘোড়া, সজনে-গাছ, উইর ঢিপি, খাড়ু, পেসাদি, ঘর, আর চালকুমড়োর লতা ; এক এক ক'রে সাত। বেচারাম আঙ্গুলের কড় গোনে —আর ক্ষুরে শান দিতে থাকে।

বিধাতার সাত খুন মাপ।

কিন্তু আটবারের বার—

এমন কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে ? বুড়ো নাপিত, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, লাউবিচির মতো দাঁত, পথের লেড়িকুত্তার সামিল—সে কি না প্রতিজ্ঞা করে বিধাতার ওপর প্রতিশোধ নেবে ? কথা শুনে আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত দাঁত বের ক'রে হাসে !

কিছুর মধ্যে কিছু না—হঠাৎ বেচারাম শান দেওয়া ক্ষুরটা দিয়ে ঘাড়ে একটা পোঁচ্ দিলে—

পরেই ভ্যাবাচ্যাকার মতো চেঁচিয়ে উঠে চুপ করে যায়। গোঙায়।

চেঁচানি শুনে মুহুরি ছুটে এল কাছা খুলে। সঙ্গে বিস্তর লোক। রক্তের ফিনিক। গরুর গাড়ী করে লোকজন বোকা নাপিতকে পাশের সহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল। এখনো প্রাণটা ফুটো দিয়ে বেরোয়নি।

তারপর আবার ভোর হয়ে আসে, ফিঙে ফড়িঙের দল ফুর্‌ফুর্‌ করে উড়ে বেড়ায়, মাঠে গরুর দুধ দোয়ার শব্দ গরুর গলায় মৃদু ক্ষণিক ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়!

তিন বচ্ছর ধ'রে বুড়ো বেচারাম জেল খাটছে।

কাল ছাড়া পাবে।

প্রবন্ধ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঙলার আকাশে আবার নবীন নীল মেঘের মিছিল সুরু হল, কিন্তু বাঙলার কাজরী পঞ্চাশৎ-এর কবি আর নেই। বর্ষার কবি বৃষ্টিকে সঙ্গে ক'রে এসেছিলেন আবার বৃষ্টিকে সাথে ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। জানি না আজ বাঙলার কোন্ ঘরে কোন্ ভাবুকের দু'নয়নে ব্যথার কুয়াসা জমে এল এই বিরহী আষাঢ়ের কাতর কান্না শুনে। আজ আষাঢ়কে অভিনন্দন দেবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ নেই। মনে হয় বাঙলা সত্যেন্দ্রনাথকে ভুলে আছে। তাই দেখি, পঁচিশে বৈশাখের জন্ম-তিথি-উৎসব শুধু শান্তিনিকেতনের শাল-শিশুর প্রাঙ্গণ-তলেই সারা হল, বাঙলার ঘরে ঘরে সে উৎসবের বাতি জ্বলল না।

শুভ পঁচিশে বৈশাখটি সুন্দর ও পবিত্র করে তুলবার জন্য বাঙলার ঘরে ঘরে কল্যাণী অন্তঃপুরলক্ষ্মীরা সদ্যস্নান করে নব পুষ্পমঞ্জরীতে গৃহপ্রাঙ্গণ বিভূষিত করল না, শঙ্খ-নির্ঘোষে পল্লীতে পল্লীতে কবির জন্মবার্তা প্রচার করল না, আনন্দচ্ছটায় সমস্ত সংসারের বর্ণহীন বিরস আকাশকে রঙিয়ে দিল না। তাই যেমন দিনের পর দিন আসে তেমনি করেই লুকিয়ে লুকিয়ে দশই আষাঢ় এসে চলে গেল। শুধু মর্মাহত আকাশ একবার গুমরে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। আর কিছু না! আমরা এখনো আমাদের দেশের সাহিত্যকে জাতীয় সম্পদ বলে ভাবতে শিখিনি। আমরা দেশকে ভালবাসি, মিথ্যা কথা!

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা করবার ঠিক সময় এখনো আসেনি। কারো সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য বিচার করতে হলে তাকে একটু দূর থেকে দেখতে হয়।

বাঙলার কবিতার এখন যা স্রোত চলছে সত্যেন্দ্রনাথ তার মধ্যে মিশে আছেন। তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার এখনো সময় হয়নি। তবে এটা খুব নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে যে বাঙলা দেশে আধুনিক যুগে এমন কোন কবি জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি সত্যেন্দ্রনাথকে ডিঙ্গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পাশে গিয়ে বসতে পারেন। সত্যেন্দ্রনাথ যেমন একজন ওস্তাদ **technician** তেমনি প্রকাণ্ড আর্টিষ্ট। তাঁর সমস্ত কবিতার সুর কথাকে উত্তীর্ণ করে অপরূপ পেয়েছে। ধ্বনিই তাঁর কবিতার প্রাণ, এবং এই ধ্বনিতেই তাঁর সমস্ত কবিতার **impression**। বাঙলা ভাষার পায়ের বেড়ী খুলে দিয়ে হাঁটতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর পায়ে নুপুরও বেঁধে দিয়েছেন কিন্তু নাচতে শেখালেন সত্যেন্দ্র। আর সে নৃত্যের কী বিলাস! যেন বিশ্ব-উর্বশী স্বর্গের সভায় তার যৌবন-পুষ্পিত তনুদেহলতা লীলায়িত ক'রে নৃত্য করছে! লোহা-ঢালাইর মত বাংলা সাহিত্যের কামার-শালায় রবীন্দ্রনাথ জড় শক্ত ভাষাকে গলিয়ে তাকে দিলেন স্রোত-গতি-বেগ, আর সত্যেন্দ্রনাথও সেই কারখানায় এই গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে সেই পূর্ণ-উজানি স্রোতস্বতীকে শাখা প্রশাখায় প্রধাবিত ক'রে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর আর কেউ বাঙলা ভাষাকে এত নমনীয় ও এত গতিশীল করতে পারেনি, কথার ভাণ্ডারে ভাষাকে এত সম্পৎশালী কেউ করতে পারেনি সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া।

আমাদের দৈন্য দেশেও, ভাষায়ও। দেশের দৈন্য ঘুচল কি না জানি না, কিন্তু ভাষার দৈন্য অনেকটা ঘুচেছে, বলতে পারি। আজ যে পরিপূর্ণ প্রচুর আবেগে বাঙলা ভাষার গোমুখী বয়ে চলল, সে এসে কোন মহাসাগরে লীন হবে কে জানে, কত শুষ্ক ঊষর মৃত্তিকা রসাপ্লুত হয়ে উঠবে তারও বা হিসাব কৈ? রবীন্দ্রনাথ যদি সমস্ত বাঙলার মাথার মুকুট, সত্যেন্দ্রনাথ তার গলার মণিমালা!

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় আবার সহিষ্ণু সুশ্যামল বাঙলার ম্লান আর্দ্র মাটির সৌরভ উঠছে! বাঙলার কথায় সত্যেন্দ্রনাথের বুক ভরে আছে। বাঙলার শ্রীকে এমন সহজ অনাড়ম্বর ও স্নিগ্ধ ক'রে আর কেউ আঁকেননি।

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধভরা,—
শীতলকরা,—ক্লান্তি-হরা ·

যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি !

* * *

মউল ফুলের মালা মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী জোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে
আট্‌টি শীষে বাঁধা আটি।

সত্যেন্দ্রনাথের এই বাঙলার কবিতাগুলি যেন নিরাভরণা কৃশতনু শ্যামা পল্লী-কিশোরীর মত! তার দুই চোখে সন্ধ্যার স্নেহ ভরা! বাঙলার কথা বলতে সত্যেন্দ্র-নাথের ছন্দ ও ভাব আহ্লাদে দুলে উঠছে মুহুমুহু। বাঙলার ছেলেরা ছুটির পর হল্লা করতে করতে বাড়ী ফিরে চলেছে, তাদের চোখের জ্যোতি দেহের কান্তি তাদের স্ফূর্তির চাঞ্চল্য ও প্রজাপতির মত লঘু নৃত্য দেখে কবি আনন্দে বিভোর হচ্ছেন। এর মাঝে সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণের সরসতার সন্ধান পাই। তিনি মুখ গোমরা করে, কখনো নিজের দেশ বা জাতিকে নির্জীব পঙ্গু ব'লে স্বীকার করেননি, তাঁর সকল চিন্তায় ও কর্মে ছিল প্রচণ্ড নির্ভীকতা ও সুদুর্লভ তেজ। তিনি আনন্দবাদী ছিলেন। বিশ্বাসেই বিশ্বেশ্বর—এ তাঁরও জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তাই তিনি নিজের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিরদিন আশান্বিত ছিলেন। এবং এই আশার শঙ্খ বাজিয়ে গেছেন তিনি—

তবু ওরাই আশার খনি—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্ম কোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

তাঁর 'তাতারসির গানে' সত্যি সত্যিই রসের ভিয়ান উঠছে। বাঙলার প্রাণের মিষ্টি একটি গন্ধ তাতে পাচ্ছি—ঠিক তাতারসিরই মত। এমন মিঠা হাতের এত সুন্দর কবিতা আর পড়েছি ব'লে মনে হয় না।

মিঠার মিঠা ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি !
বিধাতার এই সৃষ্টি মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি !
প্রথম শীতে রোদের মত
তপ্ত যত মিষ্টি তত,
মিতা তুমি পদ্ম মধুর—অমৃত বৃষ্টি !
লোভের জিনিষ ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি !

* * *

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি ।
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু,
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ•) তাতারসির জন্মদিনে•ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী ।

শব্দ-চয়ন ও সন্নিবেশে তাঁর মত নিপুণ রূপদক্ষ বড় দেখা যায় না, এক বিদেশী রসেটি ও সুইন্‌বার্ণ ছাড়া । কয়েকটি কথার আঁচড় কেটে একটি পরিপূর্ণ সুন্দর ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলায় তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা । 'ভাদ্র-শ্রী' কবিতাটিতে বাঙলার শ্যামল সুগন্ধ-স্নিগ্ধ রমণীয় মূর্তিখানি কি অপরূপ করেই না ফুটেছে তাঁর নৃত্যশীল কয়েকটি কথার মোলায়েম রেখাপাতে !

ছাতিম গাছে দোল্‌না বেঁধে দুলছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইল্‌শে গুঁড়ির কোলাকুলি ;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল-সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে !

তাঁর 'চিত্র শরৎ' কবিতাটিও এমনি picturesque । দুটি সরল কথার আড়ালে একখানি ছবি টাঙানো

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা !
দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল পোনাদের তরুণ পিঠে আল্‌পনা যে যাচ্ছে এঁকে !

কবিতা যে শুধু কথার মিল নয়, সে যে একটা আর্ট, তা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়

পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। তার সমস্ত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে ভাবের মুক্তির ঐশ্বর্য্য নিহিত রয়েছে। এই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বড় পরিচয়! তাঁর 'কিশোরী' কবিতাটি ছন্দ-সম্পদে যতই সুন্দর হোক্ না কেন, কথার কেরামতি যতই থাক না কেন, সব কিছু মিলে যে ঐ কবিতাটি একটি চমৎকার রস সৃষ্টি, আর্ট, একখানি হীরার টুকরো তা দুটি চারটি লাইন পড়লেই বোঝা যায়। মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ শুধু কবিই নন, তিনি যেন **water colour**-এ ছবি আঁকছেন।

সে যে ঘাটে ঘট ভাষায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
চাঁদমালা তায় ভাস্‌তে থাকে!
জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে,
কলমী-লতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাস্‌তে থাকে!
সে ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়,
বিনি সুতার হার সে গড়ে,
দোলন চাঁপার ননীর গায়ে
আলোর সোহাগ ছড়িয়ে পড়ে!
কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,
তার কাজল দিতে চক্ষে আজো
চোখের পাতায় শিশির নড়ে;
সে বেনীতে দেয় বকুল মালা
বিনি সুতার হার সে গড়ে।

'ইল্‌শে-গুঁড়ি' কবিতাটিতেও তাই। একটি অতি সাধারণ তুচ্ছ জিনিসকে কথার রঙে কি সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তোলা! সমস্ত ব্যাপারটি যেন একটি অপূর্ব শ্রী লাভ করেছে। এই কবিতাটিতে আমরা শুধু লঘু একটি ছন্দ পাই না, এর মাঝেও আমরা শ্রীমতী বাঙলার একটি অপরূপ রমণীয়তা দেখতে পাচ্ছি।

ইল্‌শে-গুঁড়ি পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে ?
ঝুমরো চুলে ইল্‌শে-গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে !
ধানের বনের চিংড়িগুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নূলো ;
ব্যাঙ ডাকে ওই গলাফুলো,
আকাশ গলেছে ;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁ ঝি
বাদল চলেছে।

খুঁটিনাটি তুচ্ছ জিনিসগুলিকে রঙিয়ে তোলায় তাঁর ভারি ওস্তাদি। স্বামী স্ত্রীকে 'ওগো' বলে সম্বোধন করছে—সেই মিষ্টি ছোট্ট ডাকটির মাঝে কি মধুই না লুকিয়ে ! সত্যেন্দ্রনাথ তাকে ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন—

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো',
চাষের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue-ও !
ফুল-শেষে সেই 'মুখে-মুখের' 'ওগো',
রোগের শোকের দুঃখ-সুখের 'ওগো' !
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক পেশে এক চোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা 'ওগো' !

তাঁর 'সাড়ে চুয়াত্তর' কবিতাটির মধ্যেও একটি অনাড়ম্বর ভাবের লাবণ্য আছে। একটি অশিক্ষিতা পল্লীবধূ প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখছে। চিঠিটির প্রতি ছত্রে একটি মধুর প্রীতি ও কৌতুকের নৃত্য—যা শুধু আর্দ্রহৃদয়া বাঙলার মেয়ের মনেরই বাসিন্দা। সত্যেন্দ্রনাথ তাকেও ভাষায় জীবন্ত করেছেন।

কিন্তু তাঁর বাঙলার প্রেমকে জাজল্যমান দেখতে পাই, 'গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমিতে'। বাঙলার প্রতিটি তৃণ প্রতিটি ধূলিকণা প্রতিটি জলবিন্দু তাঁর বুকে আনন্দের রোমাঞ্চ

তুলছে। তিনি সেখানে বিশ্ব-বাঙলার রাজরাজেশ্বরী মূর্তির ধ্যান করছেন সাধকের মতো—

কামরূপা তুই কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়নী দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দানহীনা!
'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গা-হৃদি নামটি গো,
গতির ভূখে চলিস্ রুখে, বাংলা! সোনার তুই মৃগ!
চির যুবনমন্ত্র জানিস্ চিরযুগের রঙ্গিনী,
শিরীষ ফুলে পান্-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী!

রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমে বিভোর হয়ে 'সোনার-বাংলা'র গান গেয়েছিলেন, তেমনি সুরে সত্যেন্দ্রনাথও গেয়েছেন—

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল?

বাঙলার গঙ্গা পদ্মা মেঘনা তিস্তা দামোদর কর্ণফুলী সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরে ভাবের মন্দাকিনী বইয়ে দিয়েছিল। সুদূর দার্জিলিঙ থেকে সুরু ক'রে চট্টলা পর্য্যন্ত কিছুই তিনি বাদ দেননি। চট্টলাকেও তিনি মহিমময়ীর মূর্তিতে দেখছেন—

সুন্দরী তুমি কোমলে-কঠিন, বিরাজিছ কিবা গৌরবে,
কঠিনতা তুমি ঢেকেছ সবুজে—সবুজ বনের সৌরভে;
নীলিমা-শ্যামলে কঠিনে-কোমলে অপরূপ রূপ-স্ফূর্তি গো,
চট্টলা! তুমি বঙ্গভূমির ভুবনেশ্বরী মূর্তি গো!
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের অভেদ-ধাত্রী চট্টলা!
কমনীয়া! তুমি সহ নমনীয়া রূপসী! কপাল-কুণ্ডলা!

কিন্তু বাঙলার আর একটা রূপ আছে যা অনাহারে জীর্ণ, ভয়ে পাণ্ডুর, দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, রোগে জর্জর, কুসংস্কারে কলুষিত; সত্যেন্দ্রনাথ ধূলিধূসর বাঙলার সেই মূর্তিখানিও দেখেছেন, কিন্তু ভয় পাননি, আশা হারাননি। বাঙলা তার শ্মশানের বুকে পঞ্চবটি রোপণ করেছে। শত বন্ধন দুঃখের মধ্যেও মুক্তবেণীর গঙ্গা বঙ্গের কূলে কূলে মুক্তি পরিবেশন করে যাচ্ছে। তাই তিনি লিখলেন—

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশীষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি তাই বাঙলার মানচিত্রেই আবদ্ধ নয়, সমগ্র ভারতকে সেই প্রেম আলিঙ্গন করেছে। এবং অবশেষে এই প্রীতি দেশ কাল পাত্র অতিক্রম ক'রে সমগ্র স্বষ্টির মাঝে এসে লীন হল। তিনি হিমালয়ের স্তব করছেন—'হিন্দুর হৃদি-গগনের চির উজ্জ্বল শশী বারাণসীর বন্দনা গান গেয়েছেন, যেখানে নব নব আত্মার সঙ্গে নব নব আত্মার নবীন আত্মীয়তা চলেছে।

শুভব্রত পূজারীর মত তিনি ভারতের আরতি করছেন ছালিক্য ছন্দের অনুসরণে। আবেগে তাঁর ভাষা গদগদ হয়ে উঠেছে। তাঁর এ ধরনের কবিতাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অপরিসীম। তিনি শুধু ভাবুক কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বহুবিদ্য পণ্ডিত, কৃতী সমালোচক। তিনি পুরোনো শাস্ত্র ও কাব্য মন্থন করে নূতন ভাবের অমৃত স্বষ্টি করেছেন। কাব্যে ও পুরাণে এমন কোন ছন্দ নেই যা সত্যেন্দ্রনাথ বাঙলার সহজ দ্রুত গতিশীল ভাষায় গড়ে তোলেননি। তাঁর ক্ষমতা এদিক দিয়ে কবিতায় ও ভাষায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জয় জয় ভারত! বিশ্বের স্তুতা!
পৃথ্বীর তিলক! তীর্থভৃতা!
মন্দার-মুকুল! নন্দন চ্যুতা! জয়! জয়!
পদ্মের মেলায় লক্ষ্মীর ছবি!
কাব্যের কবির তুই বান্ধবী!
নিষ্কাম যাগের নির্মল হবি! জয়! জয়!

ভারতের বন্ধনের বেদনা নিরন্তর তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই তিনি বন্দী ভারতের মুক্তির স্তোত্র রচনা করেছেন! সমসাময়িক কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টার কল্পনা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখেননি। এর মাঝে তাঁর প্রকাণ্ড সহানুভূতির সঞ্চয় দেখতে পাই। 'জালিনওয়ালের জ্বালা' তাঁরও মর্ম স্পর্শ করেছিল।

অন্যায়ের প্রতি তিনি চিরকাল ক্ষিপ্তের মত মুষল প্রয়োগ করেছেন এবং যা কিছু সত্য সুগভীর বিশাল সুন্দর তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল অনির্বচনীয়। তাই তিনি বীর-বৈষ্ণব মহাত্মা গান্ধীকে যে অপরূপ স্তোত্র রচনা ক'রে অভিনন্দন করেছেন, তাতে তাঁর নির্মল আকাশের মত উদার মহান চরিত্রের, বৃহৎ স্পন্দমান প্রাণের ও শক্তিমান নিরহঙ্কার প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট দেখতে পাই। এমন কবিতা বাঙলা দেশের সাহিত্যে অতুলনীয়। কবির পরিচয় যদি কাব্যই ঘোষণা ক'রে থাকে, তবে সত্যেন্দ্রনাথ সত্যিসত্যিই সত্যেন্দ্র, দীপ্তিতে সে ভাস্কর, সীমাহীনতায় সে সমুদ্র, ঔদার্য্যে সে আকাশ!

কৃষাণের বেশে কে ও কৃশতনু কৃশাণু পুণ্যহবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি!
কৌসুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি,
কার মৃদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী!
ক্রোর টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে, অপরূপ অবদান,
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান!
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁ ঝিঁ
কে রে ও খর্ব্ব সর্ব্ব-পূজ্য? 'গান্ধিজী!' 'গান্ধিজী!'

এবং এই দেশ-পূজায় প্রণোদিত হয়ে তিনি দেশের কীর্তিমান ত্যাগী বিদ্রোহী বৈরাগী সন্তানের যশোগাথা প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন। যে কেউ-ই 'ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মাল্য' পুণ্য জ্যোতির জ্বালায় জ্বালিয়ে রেখে গেছেন, তিনি তাঁদেরই গান গেয়েছেন প্রাণ ভ'রে। তাঁর আদর্শ যে কত বড়, সে যে হিমাচলের চূড়া চুম্বন করছে তা বুঝতে পাই তাঁর এই সমুদ্র-নির্ঘোষের মত উদাত্ত কবিতায়! তিলকের তিনি যে স্তোত্র রচনা করেছেন তাতে তাঁরও শক্তিব্যঞ্জক দৃঢ় দৃপ্ত কঠোর চরিত্রের পরিচয় পাই, যা ইস্পাতের মতই ধারালো ও কঠিন!

সাচ্চা পুরুষ-বাচ্চা সে যে মর্দ্দ তেজের ছবি—
নয় কোনদিন ত্রস্ত জুজুর ভয়ে;
ভিক্ষা-পন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী,
স্পষ্ট কথা বল্‌ত ঋজু হয়ে।
খোসামোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই,
আড়াই-কড়ার অনারেব্‌ল্ নয়,
সে ছিল লোক-মান্য তিলক, তুলনা তার নাই,
জাতীয়তার তিলক সে অক্ষয়!

তিনি এই সুরে গোখ্‌লের গান গেয়েছেন। যে কেউ চরিত্রে তেজে সাধনায় অমরত্বের অমৃত পান করেছেন তাঁদের সবাইকে তিনি প্রমাণ করেছেন। রামমোহন নিবেদিতা বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর জগদীশচন্দ্র মধুসূদন দীনবন্ধু অক্ষয়কুমার দ্বিজেন্দ্রলাল গোবিন্দদাস সবাই তাঁর চিত্ত-তীর্থে আসন পেয়েছেন। তিনি বৈদীভুমক ছন্দে রাজর্ষি রামমোহনকে বন্দনা করেছেন। বিদেশিনী নিবেদিতা তাঁর দেবতার-দেওয়া পুণ্যবতী ভগিনী ছিলেন। 'বীরসিংহের সিংহশিশু'র তর্পণ করতে তিনি গাইলেন—

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজ্‌ব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাক্‌ব প্রতীক্ষায়,
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়,

'সাগরে যে অগ্নি থাকে' সত্যেন্দ্রনাথই প্রথমে তা আবিষ্কার করলেন বিদ্যাসাগরের মধ্যে। জগদীশচন্দ্রের স্তুতি গানে তিনি গাইলেন—

মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে এ কি হেমকাঠি!
হিম যা ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত,
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চ্চিত!
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে।

কিন্তু স্বদেশের মহাত্মাদেরই তিনি পূজা করেননি খালি, পৃথিবীর যে কেউ গৌরবে ও ঔজ্জ্বল্যে মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মত উচ্চতম আকাশ-শিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন তাঁদের সবারই কাছে তিনি বিনীত ভক্তের মত কাব্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। ম্যাকসুইনির মৃত্যুতে তিান গাইলেন—

কে তাহারে বন্দী করে? ফন্দী এঁটে বাঁধ্‌বে কে সিন্ধুকে?
মুক্ত পুরুষ, মুক্তি তাহার হাতের মুঠায় মুক্তো হ'য়ে আছে;
'মুক্ত হবই'! এ কথা যে বল্‌তে পারে জোর ক'রে বুক ঠুকে—
পাষাণ-কারা তাসের গৃহ, লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে।

তিনি মৃত্যুঞ্জয় কবি মনীষি টলষ্টয়, অগ্নি-সত্ত্ব তেজস্বী বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম ষ্টেড-এর আরাধনা করেছেন। তাই তিনি 'সাত মনীষির বন্দনীয় রাখালের' জন্মদিনে ক্রুসের কাঁটার জ্বালা সহ্য ক'রে যে অপরূপ স্তব রচনা করেছেন তাতে তাঁর নির্মুক্ত পবিত্র স্বচ্ছ চিত্তখানি দর্পণের মত প্রতিভাত হ্চ্ছে। তাঁর মাঝে সঙ্কীর্ণতার কুণ্ঠাক্লেদ ছিল না, তিনি ছিলেন বন্ধহীন বাউল বৈরাগী।

তাই ত তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান চিত্ত স্বার্থলীন
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে, এই এসিয়ার আছে নাড়ীর টান।
ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, এই এসিয়ায় দাঁড়াও স'রে এসে—
বুদ্ধ জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সণকের দেশে ;
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী লয়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ভক্ত মালে নূতন মণি হয়ে।

এবং এই ঋষির ঋষি মহাপ্রাণ খৃষ্ট নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করলেন ধৈর্য্যগূঢ় জিষ্ণু এই মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতির মধ্যে অন্ধতা ছিল না। তাই যা কিছু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, স্পন্দনের অভাবে নিবীর্য্য নিশ্চেতন, যা কিছু চিত্তের সঙ্কীর্ণতায় অন্ধ ও সীমাবদ্ধ, তার প্রতি তাঁর বিদ্রোহ ছিল প্রচণ্ড ও প্রচুর! রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল নির্মম,
করুণ কোমল।

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে পাই প্রাচুর্য্য, তেজ, দৃঢ়তা, শক্তি, সংযম যা আর কোন কবির মধ্যে পাই না। তাঁর বিদ্রোহের মধ্যে মাতলামি নেই, তা কেন্দ্রীভূত শক্তির সাহায্যে সংযত ও স্থির ; আর এই সংযমই আর্ট ও impression-এর গোড়ার কথা। শক্তির পরিস্ফুরণই তাঁর কবিতার বিশেষত্ব। অন্যায়কে তিনি চিরকাল শাসন করেছেন। তাই 'মৃত্যুস্বয়ম্বরে' তিনি লিখলেন—

হায় অভাগ্য ! বাংলা দেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে কুলবালার মূল্য নাই !
... কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি ?
... যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান ;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ।

সমাজের অন্যায় উৎপীড়ন তিনি সইতে পারতেন না। রঘুনন্দনের মৌলিকত্ব-হীন উদ্বাহ-সংহিতায় যে নির্জলা একাদশীর বিধান রয়েছে তাতে তিনি ব্যাখ্যা-কারের নীচতা ও নিষ্ঠুরতারই প্রমাণ দেখছেন। তাই তিনি বাঙলার ছেলেদের ডাকছেন—

কে নেবে এই পুণ্যব্রত ? কে হবে মার পুত্র গো ?
একাদশীর তেপান্তরে খুলবে কে জলসত্র গো ?
কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতির আশীর্বাদ ?
আশায় আছি দাঁড়িয়ে যে তার করতে বিজয়-শঙ্খনাদ।

সত্যেন্দ্রনাথ অভেদের বেদ রচনা করেছেন। জাতির বন্ধন তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছেন। 'গো-র আঁকড়ি গরুরা থাকুক, মানুষ মিলুক মানুষ সাথে!' জন্মের সঙ্গে যে জাতির সম্বন্ধ, সেখানে জাতির বড়াই কোথায় ? জন্ম ত একটা **accident**। মনুষ্যত্বই জাতীয়ত্বের মাপকাঠি। পৈতা ত মোটে সিকি পয়সার সুতো। তাই তিনি আশার বাণী প্রচার করে গেছেন **prophet**-এর মতো যে—

আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাকাশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।

Patel bill পাশ করবার সময় টিকি-পন্থী সনাতনীদের যে শিবা-হল্লোড় উঠেছিল তার ব্যঙ্গ করে তিনি একটি অতি **comic** কবিতা রচনা করেছেন 'পাণ্ডিত্য প্রমাদ বা প্রসহ্য প্রতিবাদ'। এমন ধারালো ও বুদ্ধিমান **humour** খুব দুর্লভ। তিনি বারাণসীকে উল্লেখ করে বললেন—

তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি অশুচির ভেদ ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর ব্যাপী চির জনমের বেদ।
শ্বপচ হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী ভূমি !

তাই তিনি মেথরের মধ্যে দেবতাকে দেখলেন। নফর কুণ্ডুর মধ্যে তিনি খৃষ্টকে দেখলেন ; যে পথে অগৌরব মানেনি, অস্পৃশ্য মেথরকে বিপন্ন দেখে তার উদ্ধারের জন্য অকাতরে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিল।

রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দে বলাকায় যৌবনের অর্চনা করেছেন, সেই আনন্দে সত্যেন্দ্রনাথও সবুজের ছত্রতলে যৌবনকে রাজটীকা পরিয়েছেন। যে পাতা শীতে জরায় পীত হয়ে গেছে, যা কিছু শুকনো নিস্তেজ নিশ্চেষ্ট তাকে তিনি ভাল বাসেননি। তিনি সবুজ পাতার গান গেয়েছেন। যারা কাঁচা সাঁচা, যাদের মরা বাঁচার খেয়াল নেই, যারা ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্রতালকে ভয় করে না, যারা সতেজ প্রাণের দীপান্বিতা জ্বেলে বসেছে, তাদেরই জয়গাথা তিনি রচনা করলেন। জগৎ মোক্ষলাভের যন্ত্র নয়।—

নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা নয় সে মাত্র মত্ততা,
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্‌ছে সবুজপত্র তা।

কিশলয়ের হাতে তরুণ হয়ে তরুর দল তরুণ হতে ডাকছে। ফুলবিলাসী দখিন হাওয়া তার ফুঁয়ে তুলোট-পুঁথি উড়িয়ে দিচ্ছে। এর মাঝে সাল-পহেলীতে তিনি নবীনকে আহ্বান করছেন—বৃহৎ প্রাণের রসদ জোগাতে—

জানিয়ে দে রে এই প্রভাতের নবীন প্রভার দেব্‌তাকে
নূতন হবার শক্তি চিরন্তন,
ডুবিয়ে দেরে অনুশোচন যা কিছু আক্ষেপ থাকে—
আজকে ক্ষাপা সব দে বিসর্জন !

তাঁর 'জাগৃহি' কবিতাতেও এই নবযৌবনের স্তোত্র। পুরাতনের জীর্ণ স্তম্ভ বিদীর্ণ ক'রে যৌবনের সিংহমূর্তি বাইরে আসছেন। সর্ষেপারা বটের বীজে ভবিষ্যতের বনস্পতি বাস করছে। পুরাতনের ডিম্ব টুটে নূতন পাখী আঁখির আলোক দিয়ে অন্ধকারে আঁখি ফোটাচ্ছে—তারই জয়গান। তিনি জন্মাষ্টমী কবিতায় ভয়-পাণ্ডু পাণ্ডবের বন্ধু-জনার্দনকে অভিনন্দন দিচ্ছেন, রাসনৃত্যে যৌবনের আনন্দ হিল্লোলিত ক'রে লোহার ভয়ঙ্কর কবাট বিচূর্ণ করে আসতে। তাই তিনি সিন্ধু-দোলায় বিরাট বুকের স্পন্দনে দুলবার জন্যে বন্ধুদের আহ্বান করছেন বন্দরে দাঁড়ানো ওই জাহাজে চ'ড়ে লক্ষ্মীর সন্ধানে বেড়িয়ে পড়তে। কাঁটার বুকে

ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তিনি যৌবনকে ডাকছেন—শত অপথ আপদের মধ্যে। মহেশ্বরের কটাক্ষেতে কাঁটা যে কুসুম শয্যা হয়। যে কাঁটাকে কোল দিতে পারে সেই ত শিব, নিষ্কণ্টক! ডোবা-জাহাজ তুলবার প্রতিজ্ঞা ত খালি যৌবনেরই। গাঁই-গোত্রের গ্রাম্য স্বার্থ ঘুচাবে ত এ যৌবনই। যমুনার কালো জলের সঙ্গে গঙ্গাজলের যে কোলাকুলি, তা শুধু জলে জোয়ার এসেছিল বলেই যৌবনের জোয়ার!

আমরা এতক্ষণ ভাবুকতার দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। এখন তাঁর ছন্দের বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করব। সত্যেন্দ্রনাথ সারা সাহিত্য-জীবন ধ'রে ছন্দের বোঝা ঘাড়ে করে বেড়িয়েছেন—এ অনেকের অভিযোগ, জানি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের বন্ধন ঠিক নদীর দুই পারে স্থীর তীরের বন্ধনের মতন। ইন্দ্রিয়ের বেদীর ওপরই তিনি অতীন্দ্রিয়ের মন্দির রচনা করেছেন। নদী যেমন দুই কূলের সীমা বজায় রেখে আপন আনন্দে অভিসারিকা নটীর মত চলেছে দূরের যাত্রায় নব নব ছন্দে, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ছন্দের ক্রন্দনে অহরহ সেই যাত্রার আনন্দ বিচ্ছুরিত ক'রে চলেছে। তাঁর সমস্ত কবিতা চলছে। কথার তকমা এঁটে তাঁর ভাবগুলি সেপাইর মত সঙীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়নি। তিনি ব'সে ব'সে মৃদঙ্ করতাল বাজাচ্ছেন না। তিনি বাউল হয়ে চলেছেন। কখনো বাজাচ্ছেন বাঁশী, কখনো বা একতারা, কখনো বা খঞ্জনী, কখনো বা নূপুর। তিনি তাঁর কবিতাকে নদীর পারে নৌকার মত বেঁধে রাখেননি, তিনি তাঁর না' ভাসিয়ে দিয়েছেন। ছন্দ কৃত্রিমতা হতে পারে, কিন্তু তার ভেতরেই স্বাধীনতার স্ফূর্তি, মুক্তির আনন্দ। তিনি ভাবকে ছন্দের কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছেন। তিনি শুধু নীরস ছন্দের ভেল্কীবাজী দেখাতেই কবিতা লেখেননি, তাঁর অন্তরে যে রসের বেদনা বা অসীমের কাকুতি উঠেছিল সেই অরূপকে তিনি রূপ দিয়েছেন ছন্দে। ভাবের প্রতিমা হচ্ছে এই ছন্দ। পাখী যেমন উড়ে চলে নীড় ছেড়ে আকাশের পানে পাখার ঝাপট্ দিতে দিতে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাও তেমনি ছন্দের ক্রন্দন-কলরোল তুলে ছুটে চলেছে ভাবের রথে চ'ড়ে সেই নিত্যকালের ও নিত্যলোকের আদিম রসিকের সন্ধানে। তিনি শুধু ছন্দের পটুয়া ছিলেন না, তিনি ভাবেরই উপাসনা করেছেন ছন্দের সৌন্দর্য্যে।

আর এই ছন্দের বর্ণচ্ছটায় তিনি বাঙলাভাষাকে অপরূপ সম্পৎশালী করেছেন। তার হাতে পরিয়েছেন কঙ্কন ও পায়ে বেঁধেছেন মঞ্জীর। বাঙলা ভাষা তাই ছন্দের অহঙ্কারে পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভের দাবী করতে পারছে।

আধুনিক যুগে যাঁরা বাঙলায় কবিতা লিখছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের চিহ্ন প্রতিমুহূর্তে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের পদতলে ব'সে রসের দীক্ষা নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের গুরু, তবে ছন্দের এই স্পন্দনের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকেই গুরু স্বীকার ক'রে এসেছেন! বাঙলার সাহিত্য-আকাশে এই দুটি সূর্য্য চন্দ্র অক্ষয় হয়ে জলবে।

আগেই বলেছি সত্যেন্দ্রনাথের সমস্ত ছন্দের মধ্যেই যাত্রার আনন্দ বাজছে। সব চলছে। কেউই থেমে রয়নি। তাই তিনি গিরি-দরী-বিহারিনী চঞ্চলনৃত্যা ঝর্ণায় এই যাত্রার আনন্দগান শুনছেন—যেন ঝর্ণা উতরোল সিন্ধুর সন্ধানে যাত্রা করেছে।

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাল্কীর গানেও চলার ছন্দ বেজে চলেছে। ছয় বেয়ারা পাল্কী নিয়ে যেমন দ্রুত তালে ছোটে, তাঁর কবিতাও তেমনি তালে ছুটেছে; যথা—

পেরজা পতি
হলুদ বরণ—
শশার ফুলে
রাখ্‌ছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায়!

যখন পাল্কী বইতে বইতে বেয়ারারা ক্লান্ত হয়ে এল, তখন তাদের সেই ক্লান্তির সুরটি অবধি তিনি কথায় ধরে ফেললেন—

পাল্কী চলে রে !
অঙ্গ ঢলে রে !
আর দেরী কত ?
আরো কত দূর ?
"আর দূর কি গো ?
বুড়ো শিবপুর
ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

তিনি চরকার গানে চরকার ছন্দকে বাঁধলেন। তাঁর ছন্দের এই বিশেষত্ব যে তিনি অবিকল কবিতার তালের সঙ্গে কথাবস্তুর সম্পর্ক রেখেছেন, চরকার গানকে পয়ারের ছন্দে লেখেননি।

ঝর্‌কায় ঝুর্‌ঝুর্‌ ফুর্‌ফুর্‌ বইছে !
চর্‌কার বুল্‌বুল্‌ কোন্‌ বোল্‌ কইছে ?
কোন্‌ ধন দরকার চর্‌কার আজ গো ?—
ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজ গো !
চর্‌কার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর ঘি'র দীপ,— আপনায় নির্ভর !
পল্লীর উল্লাস জাগ্‌ল সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

মাঝিরা দূরের পাল্লা দিয়েছে পান্সীতে। মাঝিদের দাঁড় ফেলার তালে তালে তিনি ছন্দ রচনা করলেন। তিনি ত্রিপদীতে পান্সীর গান লেখেননি।

চুপ্‌ চুপ্‌—ওই ডুব
ভায় পান্‌কৌটি,
ভায় ডুব চুপ্‌ চুপ্‌
ঘোমটায় বউটি।
ঝক্‌ঝক্‌ কল্‌সীর
বক্‌বক্‌ শোন গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক রয়,
মন উন্মন গো !

এই ছন্দে চলার মধ্যে বেশ একটি ধীর ও সংযত আনন্দ রয়েছে। কিন্তু বিপদ সম্মুখীন দেখে তারা দাঁড় খুব কষে ধরে তাড়াতাড়ি নৌকা চালাচ্ছে। সেই ছন্দ—

পাঁচ পীরেরই শীর্ণি মেনে
চল্‌রে টেনে বইঠা হেনে ;
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ-কোপানো।

আবার শ্রান্ত হয়ে সবাই চলেছে খুব আস্তে বেয়ে। বিপদ আর নেই। তখনকার ক্লান্তির সুর—

ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা মাঝি পড়ছে থ'কে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছ গুলোকে !

তাঁর 'ঘুমতি-নদীতে'ও নদীটি তন্বগাত্রী কিশোরীর মত লঘু ছন্দে ঠুমরী তালে নেচে চলেছে। তাঁর কবিতার আর কতগুলি ছন্দের নমুনা দিচ্ছি। এগুলি একদিকে যেমন তাঁর শব্দনির্বাচন ও ভাবব্যঞ্জনার অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে অন্যদিকে তেমনি ভাষার লালিত্যে কবিতার কথাবস্তুকে অনির্বচনীয় সুন্দর করে তুলেছে। ভাবের নগ্নতা তৃপ্ত করতে পারলেও মুগ্ধ করতে পারে না। ছন্দের অবগুণ্ঠন টেনে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার রূপ-প্রভার আর অন্ত রইল না।

(১) সেথা তন্দ্রায় বীন্‌কার মর্দ্দল গায় !
সেথা মেঘমল্ লীর্‌বন অঞ্জন ছায় !
সেথা অর্ব্বদ পর্ব্বত অদ্ভুত ঠায় !
সে যে দুর্গম দুশ্চর যক্ষের ধাম !

আবার আর এক রকম

(২) আহা ঠুক্‌রিয়ে মধু- ফুলফুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাটকা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি !

(৩) বাহুপাশে বাঁধাবাহু গৌরী ও কৃষ্ণা !
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !
কালো চুলে পিঙ্গলে একি বেনী- বন্ধ !
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব !
সখী-সুখে মুখে মুখে দুহুঁ নিঃ- সঙ্গা !
জয়তু য- মুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

(৪) Young Lochinvar-এর ছন্দ—

ওই সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস তাম্বুল-বন কেশ।
যার উত্তাল তাল- কুঞ্জের বায়— মন্থর নিশ্- শাস্ !
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

তাঁর 'হরমুকুট' কবিতাটি যেন পাহাড়ের চূড়া ক্রমশ অতিক্রম করে যাচ্ছে, ধাপের পর ধাপ। ওঠবার ছন্দ !

(৫) হর মু- কুট ! হরমু- কুট !
ভূ-স্বর- গের সুমেরু-কূট
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট !

(৬) আবার—
একি চঞ্চল তার ডানা কুন্ তে বাঁধা
একি মূর্চ্ছনা- ময় গীতি মৌ নে সাধা !
একি স্নিগ্ধ দী পান্বিতা পাপ ড়ি আলোর !
একি নীল নাগি নীল মরি চক্ ষেরি লোর !

সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের মত হ্রস্ব দীর্ঘের উচ্চারণ অনুসরণ করেননি ; বাঙলায় স্বভাবত উচ্চারণের কোন ভেদ নেই, তাই তিনি বাঙলা উচ্চারণকেই অনুসরণ করেছেন। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অনেকগুলি কঠিন ছন্দকে তিনি বাঙলা রূপ দিয়েছেন। একটুখানি নমুনা দিয়েই তিনি ছেড়ে দেননি। যতদুর সম্ভব ও দরকার ততদূর তিনি সেই ছন্দে uniformity বজায় রেখে টেনে নিয়ে গিয়েছেন ; তার জন্যে ভাব তাঁর কোন কালেই খর্ব হয়নি ; বরং মাঝে মাঝে চমৎকারকে লাভ করেছে। কঠিনতম পঞ্চচামর ছন্দকেও তিনি রূপ দিয়েছেন—'সিন্ধুতাণ্ডবে'—

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক্ কেবল 'ববম্' ববম্'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।
জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ!
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাষায়!
প্রেমের ক্ষুধার কী অন্বেষণ!

মালিনী ছন্দের উদাহরণ—

উড়ে চলে' গেছে বুলবুল্,
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে তিনি বর্ষার বোধন করেছেন—

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত-নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর, বচন কও;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দের নমুনা—

সিন্ধুর রোল
মেঘে ভিড়্‌ল আজ,
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ বিলোল—
রক্ত চোখ!
ঝঞ্ঝার দোল
সারা সৃষ্টিময়—
জাগে প্রলয়;
তাণ্ডব বিভোল—
ছায় দ্যুলোক!

যে যৌবন কল্পনায় ভাবে ও অনুরাগে গোলাপের মত সুগন্ধ-আকুল ও রামধনুকের মত রঙীন, সে যৌবন সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁর যৌবন ছিল মহীরুহের

মত নির্ভীক বলিষ্ঠ ও দৃঢ়। তিনি যে কয়েকটি lyric লিখেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর গুজরাতী গর্‌বা একটি অপূর্ব রত্ন। সেই ছন্দে লেখা, এবং বিরহের বেদনায় আকুল।

পার্‌ব না একলাটি আজ ঘরে পার্‌ব না রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে ছুটো কথা কইতে!
নিরালার কোল ভরা ফুল জাগে আলো-করা,
কেঁদে কার খুন্‌সুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হল হাওয়া চৈতে।
কী ফুল ফোটায় হায় দুনিয়ায় চোখের চাওয়া!
চোখের চাওয়ায় কত হারানো, পাওয়া!
চোখে চোখে দেয়া নেয়া চোখে পাড়ি চোখে খেয়া
চাহনিতে চৈতী হাওয়া!
চাহনির উড়ো পাখী মন হরে দিয়ে ফাঁকি।
চোখে-চোখে চামেলী-ছাওয়া!

তাঁর 'কাজরী-পঞ্চাশৎ'-এ বর্ষার ভিজা দিনে মাটির ব্যাকুল গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় থেকে আনন্দের ব্যাকুলতা উঠেছে—

তোমরা চোখে কাজল দিয়ো
হরিণ-লোচনা!
ওই কাজলে আমরা করি
কাজ্‌রী রচনা।
ওই কাজলে হয় গো সজল
বাদল জোছনা,
ওই কাজলে উজল হিয়া
লুকায় শোচনা!

তাঁর 'কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ'-এ অনুরাগের গান—

—সখী আবীর গোলে বল্ কি জল দিয়ে?
—আঁখি গুলাব কুঁড়ি সই! নিঙাড়িয়ে!
অনুরাগের আবীর
আর জল ছু'আঁখির
সাঁচা হোলির খেলা হায় ইহাই নিয়ে।

সত্যেন্দ্রনাথ চিরকাল আনন্দ ও যৌবনের তর্পণ করেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে ব্যর্থতা বা ব্যাকুল বেদনার সুর ছিল না। তাঁর আবেগ সমুদ্রের মত উদ্দাম নয়, হ্রদের মত প্রশান্ত।

অনেকে সত্যেন্দ্রনাথকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলে স্বীকার করতে চান না, কারণ তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই দেশ বিদেশের কবিদের কবিতার অনুবাদ। কিন্তু যাঁরা তাঁর অনুবাদ-কবিতাগুলি ভাল করে পড়েছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা সেই অনুবাদে নূতন শক্তিতে পরিস্ফুরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—"অনুবাদগুলি যে জন্মান্তরপ্রাপ্তি। আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য্য। বাংলা সাহিত্যে এ অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে—ইহাদিগকে পূর্ব্বনিবাসের 'পাস' দেখাইয়া চলিতে হইবে না।" তার অল্প অনুবাদ-কবিতাতেই বিদেশের গন্ধ মিলবে, সত্যেন্দ্রনাথ অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে সেগুলিকে দেশী ছাঁচে ঢেলেছেন; এবং সেইখানেই তাঁর অনুবাদের বিশেষত্ব। এমন কি মাঝে মাঝে তিনি বিদেশী ছন্দ অবধি বজায় রেখেছেন। দু-একটি নমুনা দিলেই বোঝা যাবে। পার্শী-কবি অরদেশর্ খ্যবর্দার-এর গুজরাতী অঁজ্নী ছন্দে লেখা খোকা কবিতাটি বাঙলা তেমনি ছন্দেই লেখা—কে বলবে এ অনুবাদ?

> হাস্ তুই খেল্ তুই কলরব কর্ তুই
> সুমধুর হাসি দিয়ে মুখখানি ভর্ তুই
> বাপ মার কোল জুড়ে থাক সুন্দর তুই
> খোকা তুই ভালো থাক্ রে।

ফরাসী মেয়ে-কবি মার্সেলিন ভালমোর-এর 'খুকীর বালিশ' কবিতাটি ভারি মিষ্টি। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ পড়ে কেউ বুঝবে না যে, এ মৌলিক নয়। এত সোজা তর্জমায় এত মিষ্টত্ব লুকিয়ে রয়েছে যে বলা যায় না।

> আমার ছোট বালিশটিরে! কি মিষ্টি ভাই তুই,
> তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমুই।
> আমার জন্যে তৈরী তুমি, কেমন তোমার গা,
> তুলোয় ভরা তুলতুলে, আর কিছু ভারি না।
> আকাশ যখন ডাকছে, বালিশ! ভাঙছে ঝড়ে দেশ,
> তোমার ভিতর মুখ লুকিয়ে ঘুমুই আমি বেশ।

জাপানী মেয়ে ওহারু প্রজাপতির মন্দির-কুট্টিমে জানু পেতে বসে বরের প্রার্থনা করছে। কে বলবে ও নোগুচির লেখা? অনুবাদক যেন নিজেই কবিতা লিখছেন মন থেকে। তিনি অন্য দেশের বধূকে যেন নিজের ঘরে এনে আলতা কুঙ্কুম অবগুণ্ঠন সিন্দুর দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন—

"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্‌-ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি,
কল্প আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপড়িগুলি!"
ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল ওঠে দুলি'।
"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
উষার অরুণ মুখে;
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি।"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি,
ঢুলে চেরীফুল-পাতি।

সত্যেন্দ্রনাথ এমনি ক'রে সাহিত্য-মহাপীঠ থেকে বিন্দু বিন্দু ক'রে তীর্থ সলিল সংগ্রহ করেছেন। তিনি যে বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, অনেক ভাষায় যে তাঁর জ্ঞান ছিল, তাঁর এই রাশি রাশি বিভিন্ন ভাষা থেকে চমৎকার সুন্দর অনুবাদগুলি থেকেই সত্যিই বোঝা যায়। তাঁর প্রবল ও প্রচণ্ড স্বাদেশিকতা তাঁকে সঙ্কীর্ণমনা করেনি। তিনি সকল দেশের রসিক সাহিত্যিকের সঙ্গেই পরম আত্মীয়তা অনুভব করতেন। এবং এই আত্মীয়তার রাখী পরিয়ে সকলকেই তিনি বাঙলার সাহিত্য-মণ্ডপে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। যে-কেউ সুন্দরের তপস্যাকার, যে-কেউ শিল্প-কলায় নিত্যকালের রসিককে বন্দনা করেছে তাকেই তিনি প্রণাম করেছেন। তাঁদের লেখা অনুবাদ ক'রে তিনি একদিকে যেমন তাঁর অন্তরের ভক্তি জানিয়েছেন, তেমনি বাঙলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণে পংক্তিবিভাগ ছিল না। সমস্ত

কবিকেই তিনি এক ছত্রতলে স্থান দিয়েছেন। রুষিয়ার কবি লার্মণ্টফ, য়েলাইয়েফ, টলষ্টয়; ফ্রান্সের পল্ ভার্লেন, মিস্ত্রাল, আলফ্রেদ দে মুসে, আঁদ্রে শেনিয়ে, ভল্টেয়ার, লেঁকং দি লিল প্রভৃতি; ইংলণ্ডের শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং, য়েটস, ব্রীজেস্, সুইনবার্ণ প্রভৃতি; পোলাণ্ডের সিঙ্কিভিচ্, ফ্রেড্রিক নীছি; বেল্‌জিয়ামের মেটারলিঙ্ক, মস্তনাইকেন প্রভৃতি; ইতালির দান্তে বোয়ার্দো পেত্রার্ক; আমেরিকার পো, হুইটম্যান; জাপানের নোগুচি; চীনের লো-তুং; স্পেনের লোপ ভি ভেগা প্রভৃতি পৃথিবীর বহু বহু কবি ও রসিকেরা তাঁর নিমন্ত্রণে অতিথি হয়ে বাঙলার সাহিত্য-সভা উজ্জ্বল করেছেন। এবং এই নিমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথই সম্মানিত হয়েছেন বেশী।

কিন্তু তিনি তাঁর প্রাণের পরিপূর্ণ প্রীতি-অর্ঘ্য স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরমপদমূলে। তাঁর মত রবীন্দ্রনাথকে কোন কবি এত celebrate করেননি। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নিত্য আনন্দ-উৎসব জমেছে। তাঁর এই রবীন্দ্র-প্রীতি থেকে তাঁরই সরস স্নিগ্ধ সুন্দর প্রাণের সুগন্ধের স্বাদ পাচ্ছি। কবির মর্য্যাদা করে তিনি নিজের কবিতাকেই সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা দান করেছেন। বাঙলার গৌরবের নিধি সত্যেন্দ্রনাথেরও বুকের কৌস্তুভমণি ছিল! রবীন্দ্রনাথের স্নেহ তাঁর ছিল প্রকাণ্ড বিত্ত। তিনি রবীন্দ্রনাথের জয়গানে নিত্য মাতোয়ালা।

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।

তাঁর 'অর্ঘ্যে' 'আভ্যুদয়িকে' 'দিগ্বিজয়ীতে' 'মালাচন্দনে' 'পরমান্নে' 'কবি-জুবিলীতে' সব খানেই কবি-প্রশস্তি-স্তোত্র উঠছে। শ্রদ্ধা-হোমে তিনি গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দে কবিগুরুর স্তব করছেন।

জয় কবি! জয় জগৎ প্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয়!
অগমশ্রুতির শ্রোত্রিয়! জয়! জয়!
পাবনী-বাগদেবীর কবি!
পাবীর বীর গায়ন রবি!
পুণ্য পাবকচ্ছবি! জয়! জয়!

তাঁর সঙ্গে সমস্ত বাঙলা বিশ্বকবি-ছত্রপতিকে নমস্কার করছে—

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তিনিবেদন,
গুরু বলি শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,

ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী হে নির্ব্বন্ধ সাধনায়—
নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার !

'যে তারা হারাল জ্যোতি যে পাখী ভুলিয়া গেল গান,
এ সংসারে কোথা তার স্থান ?'

সত্যেন্দ্রনাথের অকাল তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের কি ভীষণ ক্ষতি হয়েছে তা আমরা আজো রবীন্দ্রনাথের ছায়ার তলায় বসে বুঝতে পারছি না। তিনি নানান গ্রাম্য ও অপভ্রংশ শব্দে বাঙলা ভাষাকে পরিপুষ্ট ও বেগবান করেছেন। তিনি যে-বিষয় নিয়েই কবিতা লিখুন না কেন, তাঁর হাট-হদ্দ সমস্ত জেনে লিখতেন। তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর 'দিল্লী-নামা' কবিতা তার সাক্ষ্য দেবে। মৃত পত্রের দল যেমন তরুণ কিশলয়ের মধ্যে আবার জন্মলাভ করে, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও নবীন কবিদের কবিতায় বারে বারে জন্মলাভ করবেন। যে সমুদ্রে বান ডাকালেন রবীন্দ্রনাথ ও যে সমুদ্রে পান্সী দোলালেন সত্যেন্দ্র, সে পান্সী চড়ে বহু বহু কবির দল বিরাট উত্তাল ঊর্মি ভেদ করে সুদূরের আশায় পাড়ি জমাল ব'লে! সত্যেন্দ্রনাথের অপরিপূর্ণ সাধনা ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে।